নব্যভারত

সপ্তত্রিংশ খণ্ড, ১৩২৬।

কালের তরঙ্গাঘাতে নব্যভারত।

"All men, all things, the state, the church, yea, the friends of the heart, are phantasms and unreal beside the sanctuary of the heart. With so much awe, with so much fear, let it be respected.

* * * *

"That reality, that causing force, is moral. The Moral Sentiment is but its other name. It makes by its presence or absence right and wrong, beauty and ugliness, genius or deprivation * * I read it in glad and in weeping eyes, I read it in the pride and in the humility of people, it is recognized in every bargain and in every complaisance, in every criticism, and in all praise; it is voted for at elections, it wins the cause with juries, it rides the stormy eloquence of the senate, sole victor, histories are written of it, holidays decreed to it, statues, tombes, churches, built to its honor, yet men seem to fear and to shun it, when it comes barely to view in our immediate neighbourhood.

* * * *

For that reality let us stand that let us serve, and for that speak."—*Emerson.*

কালের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, নিরাশার তরঙ্গে আঘাত পাইতে পাইতে, জীর্ণ শীর্ণ মলিন নব্যভারত আজ কোথায় উপস্থিত হইয়াছে? উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে ভারত-মহাসাগর, পূর্ব্ব পশ্চিমে সাগর-মেখলা পরিবেষ্টিত ভারত চিরনিদ্রিত—থাকে থাকে জাগে, থাকে থাকে ঘুমাইয়া ডোবে—উলটি-পালটি কত যুগ ধরিয়া ক্রমাগত আঘাত পাইতে পাইতে আজ কোথায় আসিয়াছে? মনস্বিগণ একথার উত্তর দিন, ইতিহাস একথার তত্ত্ব নিরূপণ করুন।

ইতিহাস?—সে ত আর কিছুই নয়, সে মনেরই ক্রিয়া। মন যাহা চিন্তা করে, কার্য্যে তাহা ফোটে;—কার্য্যে যাহা ফোটে, ইতিহাসে তাহাই পরিব্যক্ত হয়। মনস্বিগণ ও ইতিহাসজ্ঞ, সুতরাং একাত্মক। ভারতকে বর্ত্তমান অবস্থায় আনিয়াছে কে? চিন্তার ভিতর দিয়া মানবত্ব ফুটিয়াছে, মানবত্বের ভিতর দিয়া নব ইতিহাসের পৃষ্ঠা রঞ্জিত হইতেছে। নির্ব্বাসন ও রক্তপাতে ভারত আজ টলটলায়মান।

এ দেশে মানবত্ব কুটিল-বিস্রপে; পাপের

অত্যাচার, প্রলোভনের কষাঘাত থামিয়াছে কি? দরিদ্র নারায়ণগণ জাগিয়াছেন কি? জাতীয় ভাষার উত্থান হইয়াছে কি? এক-ধর্ম্মপ্রাণতা আশ্রয় পাইয়াছে কি? এক-জাতি, এক-প্রাণ, এক-বাক্য, এক-ধ্যান কোথা হইতে আসিতেছে? কে ভারতকে রক্তপিপাসু করিয়া তুলিতেছে? কে এ কথার উত্তর দিতে পারে?

গবর্ণমেণ্ট ভাল কাজ অনেক করিয়াছেন, মন্দ কাজও করিয়াছেন, সে সব প্রিয় এবং অপ্রিয় কথার উল্লেখ না করাই ভাল। উল্লেখ ক'রলেই বা শুনিবে কেন? ঢের ঢের মহাত্মা দেখিয়াছি, তাঁহারা শুধু আপনার কথা লইয়াই ব্যস্ত—অন্যের কথায় প্রণিধান করার লোক বড় অধিক নাই। আর? দাসত্ব ও খোসামুদীর যত দিন রাজত্ব আছে, তত দিন ক্ষুদ্রের কথা মহতে মানিবে কেন? সামান্যের কথা অসামান্যের কর্ণে পৌঁছিবে কেন? নির্ধন কাঙ্গালের কথা ধনীর বৈঠকখানায় পৌঁছিবে কেন? গবর্ণমেণ্ট ভাল করিয়াছেন অনেক, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় জাতি সমূহকে ঘুষে এবং খোসামুদীতে ডুবাইয়াছেন। নিরপেক্ষতার ভাণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট সোণার ভারতকে ভাষার প্রলোভনে অধর্ম্মের পঙ্কে নিমজ্জিত করিয়াছেন। উন্নতির কুহকে ভুলাইয়া দাসত্বের পালঙ্কে কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছেন। সে কথা বলিয়া সুব্রহ্মণ্য তিরস্কৃত, লাজপত রায় ও হার্নিম্যান দেশান্তরিত, কত কত মহাত্মা নিগৃহীত!! মহাত্মা গান্ধি সব দেখিতেছেন এবং নীরবে সহ্য করিতেছেন, আর করিবেনই বা কি? যাহা জাগিলে দেশ জাগে, মনুষ্যত্ব জাগে, সে মনের বল, নৈতিক বল কোথায়? ইতিহাস বলেন, অত্যাচারের সদুত্তর অত্যাচারেই নিবদ্ধ,—তাহা না হইলে জার, আমীর, সুলতান, ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের এরূপ পতন হইত না;—কাইজারও পলায়ন করিতেন না,—দেহত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠের আশ্রয় লইতেন।—আর কি বলিব? টলষ্টয়ের সাধনার ফল কি জগতে ফলে নাই? দেশাত্মবোধের অঙ্কুর কি গজায় নাই? তবুও তাঁহারা বলেন—অত্যাচার ও নিষ্পেষণেই সব শান্ত হইবে! ডেলি-নিউস বলেন—

"Many people, indeed, think, that even forty years of Martial Law will fail to conciliate a Province like the Punjab." (*Indian Daily News, April 28th, 1919*)

মানুষ অত্যাচারের সদুত্তর অত্যাচারের দ্বারাই দিয়া থাকে। আমরা কখনও তাহার পক্ষপাতী নই। কিন্তু জগতে আদিকাল হইতে তাহাই ঘটিতেছে। মানসিক শক্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে চিরকাল রক্ত-রঞ্জিত করিতেছে। বুদ্ধ গেলেন, খ্রীষ্ট গেলেন, মহম্মদ গেলেন, কনফিউসস্ গেলেন, শঙ্কর গেলেন, শ্রীচৈতন্য গেলেন—কই জগতে শান্তি সংস্থাপিত হইল? শান্তির নেতা মহামতি উইলসন এবং পঞ্চম জর্জ্জের চেষ্টা আজ পরাস্ত হইতেছে কেন? সকল ঘটনার ভিতর দিয়া শুধুই যেন স্বার্থমূলক অত্যাচার জাগিয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর কি শোচনীয় অবস্থা! শান্তির বৈঠকের কার্য্য শেষ হইতে না হইতেই ভারতে মহা-বিপ্লব-সমস্যা উপস্থিত। ধর্ম্মনিরত ভারতকে বধ করিলে রাজ্যে কখনও মঙ্গল হইবে না। জাগাইতে চাও যদি, নৈতিক বল জাগাও। আমরা সুদীর্ঘ কাল গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে থাকিয়া থাকিয়া, গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতী হইয়া হইয়া, নৈতিক বল জাগে কি না, তাহাই শুনিবার জন্য উৎকর্ণ

হইয়াছিলাম। গবর্ণমেণ্ট শাসন সংরক্ষণের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নৈতিক বল জাগাইতে কিছুই চেষ্টা করিলেন না। তাঁহারা "জোর যার মুল্লুক তার"—নানা কার্য্যে, নানা দৃষ্টান্তে, নানা কথায়, নানা লেখায়, নানা ঘোষণায়, নানা বার্ত্তায় তাহাই বরাবর প্রচার করিতেছেন। ভারত জাগিয়া জাগিয়া ঘুমাইতেছিল—ক্রমে ক্রমে মড়িয়া হইয়া উঠিতেছে। হায় ভগবান, হায় বিধাতা, ভারতের এ কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইল !!

তবুও আমরা আছি !! আছি, তরঙ্গে তরঙ্গে নিত্য উত্তোলিত, আন্দোলিত, নিষ্পেষিত হইতেছি! প্রতি মানুষ উত্তর দিক্, কি অবস্থায় কে আছে? নদ নদী শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, পর্জ্জন্যদেব নির্ম্মম হইতেছেন!—ঝরণা বহে না, পাখী গায় না, মানুষ হাসে না, পশুপক্ষী নৃত্য করে না! ঘোর বিষাদ যেন চতুর্দ্দিকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। পেটে আহার নাই, মাথায় তেল নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই,—পানীয় জলের অভাব, রোগীর ঔষধ দুর্ঘট—চতুর্দ্দিকে নির্ম্মম হাহাকার! তোমরা বল দুর্ভিক্ষ, তোমরা বল মহামারী, তোমরা বল ম্যালেরিয়া, তোমরা বল ইনফ্লুয়েঞ্জা, তোমরা বল ওলাউঠা, তোমরা বল বসন্তে ভারত যায় যায় হইয়াছে। আমরা বলি, দুঃখ দারিদ্র্যের কারণ ওখানে নিবদ্ধ নয়, শুধু ধর্ম্ম ও নৈতিক বলের অভাবে ভারত যায় যায় হইয়াছে। একজন যখন কাঁদে, অন্যে তখন হাসে, একজন যখন ম্রিয়মাণ, অন্যে তখন নৃত্যগীতে বিভোর। কোথায় সহানুভূতি, কোথায় একতা, কোথায় একপ্রাণতা? এই ত দেশের অবস্থা, মহাত্মা আশুতোষ সাহিত্য-সম্মিলনে বলিলেন, জাতীয় সাহিত্য ইউনিভার্সিটীর মধ্য দিয়া জাগিবে। হায় রে হায়, সাহিত্য যে দুর্নীতির যশ ঘোষণায় ব্যাপৃত, সে কথা একবারও তিনি বলিলেন না! শুধু অসার গল্পে, শুধু অসার কবিতায় ভাষা প্লাবিত হইয়া যাইতেছে, সাহিত্য ব্যবসাদারীতে পরিণত হইতেছে, সে কথা একবারও তিনি বলিলেন না, বলিলেন—বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সাহিত্য জাগাইবে !! যাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া সাহিত্য জাগাইতে তিনি সচেষ্ট, তাঁহারা নৈতিক বলে বলীয়ান কি না, সে বিচার করিলেন না। সাহিত্যের বাজার দলাদলিতে ছারখার হইয়া যাইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলেন না। গবর্ণমেণ্ট শিল্প বাণিজ্য মাটী করিয়া চাকরের দল সৃষ্টি করিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় সুদীর্ঘকাল তাহারই সাহায্য করিলেন,—নৈতিক বল জাগাইতে চেষ্টা করিলেন না। সে সব কথা একবারও বলিলেন না। এ কথা বলিলে অসত্য হয় কি যে, বিশ্ববিদ্যালয় শুধু হাকিম ও উকীলই সৃজন করিলেন—শিল্পী ও ব্যবসায়ী জাগাইলেন না? গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ডাকিয়া সাহিত্য-সম্মিলন জাগাইতে চেষ্টা করিলেন, নৈতিক বল যাহাতে সাহিত্যে জাগে, সে চেষ্টা করিলেন না। এখন সাহিত্য যাহাতে শিল্প বাণিজ্যে উৎসাহিত করে, সে সম্বন্ধে নীরব রহিলেন। শ্রীযুক্ত পি, সি, রায় মেলা খোলার সময়ে যে সব অতি সত্য কথা বলিলেন, তাহার প্রতিধ্বনি কেহই করিলেন না! তোমরা বল বেশ হইতেছে, বেশ হইতেছে, সবই বেশ হইতেছে, কিন্তু আমরা তাহা বলিতে পারিতেছি না। নৈতিক বল ভিন্ন মানবত্ব জাগে না, নৈতিক বল ভিন্ন একপ্রাণতা জন্মে না, নৈতিক বল ভিন্ন আত্মার স্বাধীনতা লাভ হয় না, নৈতিক বল ভিন্ন মানব পশু অপেক্ষাও হীন, অগ্রাহ্য ও দুর্ব্বল।

আর শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য যদি সাহিত্য না জাগায়, তবে সাহিত্য বৃথা! যে বারমাস রিপুর অধীন,—পরনিন্দা, পর-কুৎসার দ্বারা যে আত্মচরিত্র বজায় রাখিতে সদা-তৎপর, তাহার দ্বারা দেশোদ্ধার হয় না। স্বৈরিণীর পদতলে তাহার সর্ব্বস্ব নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হইয়াছে। সাবধান, চরিত্রহীন লোকের কথায় মজিও না, ভুলিও না, আত্মহারা হইও না। তাহার কুশ-পুত্তলিকা পোড়াও, নচেৎ এদেশের মঙ্গল নাই। যদি ইচ্ছা থাকে, নৈতিক বল জাগাইতে সচেষ্ট হও। যদি দেশ জাগাইতে চাও, ব্যভিচারের মুকুট চূর্ণ বিচূর্ণ কর।

নব যুগের নব ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম নৈতিক বলের সমস্যা পূরণের চেষ্টা করিয়া ধন্য হইয়াছেন, কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ভক্ত কেশবচন্দ্র, সাধু অঘোরনাথ, আনন্দমোহন, রামতনু, শিবচন্দ্র, রাজনারায়ণ ও উমেশ-চন্দ্রের পর ক্রমেই জ্যোতিহীন হইতেছেন, সেখানে চরিত্রের পরিবর্ত্তে আত্মম্ভরিতা প্রাধান্য ঘোষণা করিতেছে, চরিত্রহীন লোকেরাও নেতৃত্ব পাইতেছেন ;—কত কত ধর্ম্মপ্রাণ লোক অনাদৃত হইতেছেন, সুতরাং সেখানে বেশী আশা আছে বলিয়া মনে হয় না। পরন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহারা পাচাটাদের দলে নাম লেখাইতেছেন। সুতরাং সেখানে শেষ আশা রাখিতে পারিতেছি না। বিবেকানন্দ যদি থাকিতেন, নৈতিক বলে দরিদ্রনারায়ণেরা মাথা তুলিতে পারিতেন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বিলাসিতা, চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্যপেয় আহার, চা পান ও তাম্রকূট সেবনের আধিপত্য বাড়িতেছে!! বৈরাগ্য যেন শুধু গৈরিকে! এক মহাত্মা বলেন, —বড় বড় নামধারী ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীরা চোষ্যচোষ্য লেহ্যপেয় দ্বারা শরীর পুষ্ট করিতেছেন, ভিক্ষার অন্ন সারমেয় খাইতেছে, দরিদ্রনারায়ণেরা তাহার অতি সামান্য অংশ পাইতেছেন! তবু মহাত্মা রামকৃষ্ণের জয় ঘোষিত হইতেছে, ইহাই দেশের পরম সৌভাগ্য। আর মহাত্মা দয়ানন্দের দল? সকল আশা ভরসা বর্ত্তমান যুগে আর্য্য-সমাজের উন্নতির উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু এ সমাজের উপর গবর্ণমেণ্টের তীব্র দৃষ্টি। হায়, হায়, কত কত মহাত্মা আজ নির্ব্বাসিত। মুখ খুলিয়া সব কথা বলারও উপায় নাই।

আমরা ব্রাহ্মসমাজের সভ্য নই, ভারত-সভার সভ্য নই, সাহিত্য-পরিষদের সভ্য নই, সাহিত্য সম্মিলনে যাই না, কংগ্রেসের প্রতিনিধি হই না, কোন আন্দোলনে যোগ দেই না। ইহা আমাদের বড় দোষ! এজন্য আমরা চির-নিন্দিত, চির উপেক্ষিত, চির-অবহেলিত, চির-তিরস্কৃত। যাইব কোথায়? —যাঁহারা নৈতিক শক্তি জাগাইতে চেষ্টা করিবেন না, আমরা চির উপেক্ষিত থাকি, সেও স্বীকার, তবু আমরা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে চাহি না। ৺মহেন্দ্রলাল সরকার প্রাণ মন সঁপিয়া বিজ্ঞান সভা স্থাপন করিলেন, কে তাহার আদর করে? শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সরকারের "বিজ্ঞান পত্রিকা" কয় জনে পড়ে? সাহিত্যের বাজারটা কেমনে চুটকি সাহিত্যে ভরপুর হইয়া যাইতেছে, সাহিত্য-পরিষদ বা সাহিত্য-সম্মিলন চাহিয়াও দেখিলেন না। দেশের শিল্প বাণিজ্য বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে—কোন হিতৈষীরা তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। লোক অনাহারে মরিয়া যাইতেছে, কাহারও সে দিকে বড় একটা দৃষ্টি নাই। জল কষ্টে গ্রাম সকল মরুভূমিতে পরিণত, ম্যালেরিয়া ও মহামারীতে গ্রাম সকল শূন্য—তদুপরি দুর্ভিক্ষ নিত্য চিতা জ্বালিয়া রহিয়াছে, কেহ সে জন্য কপর্দ্দক দিতেও চান না! ভিক্ষার ঝুলি লইয়া যাও না বড় বড় নেতাদের বাড়ী, কোথায় কি পাও, বলিয়া যাইও, আমাদের মত পরিবর্ত্তন করিব। পায়ে ধরিয়া বহু বন্ধুকে, বহু হিতৈষীকে দেশের সাহায্যের জন্য লিখিলাম, সকলে নিরুত্তর—একজন লক্ষপতি দুটী টাকা পাঠাইয়া লিখিলেন—"আমি অন্য জেলার জন্য দান করি না, অর্থাভাবও আছে। আপনার দ্বারা উপকার পাইয়াছি বলিয়া সামান্য দিলাম।" দিনাজপুরের মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ শুধু ১৫৲ পাঠাইলেন।

একজন নামজাদা ডেপুটী কোন সভায় বার্ষিক দুটী করিয়া টাকা দিতেন. তাঁহার চাঁদা ১১১০ হইতে বাকী; পা ধরিয়া চাঁদা চাহিলাম, তদুত্তরে সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া সভার দোষকীর্তনে তৎপর হইলেন! সহৃদয় নলিনীরঞ্জন ৺ব্যোমকেশ ও গোবিন্দ দাসের জন্য কত চীৎকার করিলেন, অরণ্যে রোদন হইল! পরার্থপরতা জাগে কিসে? আপনি খাইব, অন্যে মরে মরুক, এ চিন্তা যত দিন, তত দিন দেশের আশা নাই। "আমি অত্যাচারিত হই নাই, লাহোরে, অমৃতসারে অত্যাচার হইতেছে, তাহাতে আমার কি?"—এরূপ চিন্তা যত দিন,ততদিন কিছুর আশা নাই। এক দল অন্য দলের নিন্দা ঘোষণায় যত দিন উৎসুক, তত দিন আশা নাই। সকলের ঘরেই মা ভগ্নী আছে, অথচ অন্যের মা ভগ্নীর প্রতি এ দেশের লোকের কুদৃষ্টি যত দিন তত দিন—একেবারে আশা নাই। যাইব কোথায়? চাহিয়া দেখ, নৈতিক বলের অভাবে এদেশ একেবারে যায় যায় হইয়াছে!

দেহাত্মবোধ, পরার্থবোধের নিয়ন্তা। আপন সম্মান-জ্ঞান থাকিলে, অন্যের সম্মান বুঝা যায়। নিজের সম্মানই নিজেরা বুঝি না, অন্যের সম্মান আর কি বুঝিব? দেহাত্মবোধ—রিপু-বোধ নয়। দেহাত্মবোধ ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা নয়! দেহাত্মবোধ—আপনাকে বিধাতার লীলাক্ষেত্র বলিয়া বুঝা। আমি কে? কীটাণুকীট—নগণ্য, অস্পৃশ্য তুচ্ছ ততক্ষণ, যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের দাস; আমি মহৎ হইতেও মহৎ তখন, যখন বিশ্বেশ্বরের অনুপ্রাণনায় ইন্দ্রিয় ও রিপু জয় করিয়াছি, যখন আত্মার মূলে পরমাত্মাকে দেখিয়াছি আমি, না তিনি? আমার মধ্যে কে নিয়ত জাগিতেছেন? যখন তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন মানুষ বিশ্বেশ্বরের বিশেষত্ব শিরোধার্য্য করিয়া বলেন—"মুই সেই, মুই সেই", "I and my father are one." তখন মার শিশুনকে পরাজয় করিয়া ইন্দ্রিয়-বিজয়ী বীর ঐ দেখ নিরঞ্জন-তটে উত্থিত হইতেছেন,—ঐ দেখ, সত্য রক্ষার জন্য মানব-শিশু ক্রুশে দেহপাত করিতেছেন, দেখ, দেখ, ঐ দেখ, সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রেমিক নিমাই সকল জ্বালার উপশম করিতেছেন! আরো দেখিতে চাও, ঐ দেখ টলষ্টয় ও ম্যাট্‌সিনির পূত-চরিত্র-ধারায় জগতে আজ কি পরিবর্ত্তন আসিতেছে। মানব পশু, মানব দেবতা;—রিপুর দাস মানুষ পশুরও অধম ঈশ্বরানুপ্রাণিত মানব মানবের রাজা;—সকল রাজেশ্বরের মুকুট তাঁহার চরণে বিলুণ্ঠিত। তিনি হইতে পারেন, তুমি পার না? মিথ্যা কথা—চেষ্টা কর, সাধনা কর, নিশ্চয় পারিবে। নেপোলিয়ন বলিতেন,"এ জগতে অসম্ভব কিছুই নাই, মানব যাহা করিয়াছে, মানব তাহা করিতে পারে, যদি সাধনা থাকে। সাধনা কর, চেষ্টা কর—আলস্য উত্তীর্ণ হওয়াও সোজা কথা।"

দেখ না, মানবের জ্ঞানে কত কি অসাধ্য সাধিত হইয়াছে। নৈতিক বল লাভের জন্য সাধনা কর—আত্মবোধ জাগিবে। আত্মবোধ—অর্থাৎ তিনি-বোধ। আমিই তিনি। তিনি আমাময়—আমিত্ব উড়িয়া গিয়াছে—মহাশক্তি কেবল জাগিতেছে। এই মহাশক্তিই আদ্যাশক্তি—তাঁহার বিধানেই উত্থান পতন। দেখ, দেখ, ঐ দেখ তিনি আমাতে, তিনি তোমাতে—তিনি সর্ব্বভূতে। তিনি নিত্য-নিরঞ্জন, নিত্য-সনাতন, নিত্য-জাগ্রত, নিত্য-প্রস্ফুটিত, নিত্য-প্রকাশিত, নিত্য-প্রকট। তোমাতে তিনি, তাহাতে তিনি, আমাতে তিনি। আমাতে তিনি, এই বোধ জন্মিলে তন্ময় জ্ঞান জন্মে। যাঁহার তন্ময় জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তিনি তোমার ভিতরে তাঁহাকে দেখিয়াই মজিতেছেন এবং বলিতেছেন, "এস এস বঁধু এস, প্রাণ ভরিয়া তোমায় দেখি।" তৎপরই পরার্থপরতা প্রাণ পূর্ণ করে। সর্ব্বদেহে তাঁহাকে দেখিয়া মানুষ তন্ময় হইয়া বলে—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তি-রূপেন সংস্থিতা, নমঃস্তস্যৈ নমঃস্তস্যৈ নমো-নমঃ। এইরূপে ধরায় অহেতুকী প্রেম স্বর্গ হইতে অবতরণ করে। একপ্রাণতা সাধন শুধু কথার কথা নয় গো, কথার কথা নয়। সাধনা কর,চেষ্টা কর,দেহ ও প্রাণ পাত কর, তবে ত হইবে। বৃথা চীৎকারে বা বক্তৃতায় কিছুই হইবে না গো হইবে না। ভারত

তরঙ্গাঘাতে তরঙ্গাঘাতে এমন এক মানব-শিশুকে জাগাইয়াছে, যাহা সকলের প্রণিধানের বিষয়। এ ভারত রক্তপাতের দ্বারা জিত হইবে না, শুধু আধ্যাত্মিক বলে জিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি এ কথা বুঝেন, সতর্ক হউন, তাঁহার কোন ভয় নাই। আর গবর্ণমেণ্ট যদি এ কথা না বুঝেন, গান্ধি-প্রমুখ ব্যক্তিগণ জাগুন, তাঁহাদের তপস্যার ফলে এ ভারত আবার আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হইবে, আবার সোণার নৈতিক বলের মুকুট মাথায় উঠিবে। কঠোর তপস্যা ভিন্ন এভারতে আধ্যাত্মিক বল জাগিবে না। সে বল না জাগিলে কিছুতেই কিছু হইবে না। এমারসন বলেন, "Every experiment, by multitudes or by individuals, that has a sensual and selfish aim, will fail."

ঠাট্টা করিতে চাও, কর; গালাগালি দিতে চাও, দেও; উপেক্ষা করিতে চাও, কর; কিন্তু নিশ্চয় জানিও, একপ্রাণতা, নৈতিক বলের অভাবে এ ভারত কখনও জাগিবে না। একপ্রাণতা, এক ধর্ম্মবলের অন্য কথা। জাতীয় সাহিত্য ধর্ম্মমূলক হউক, সকল চেষ্টার মূলে ধর্ম্ম সংস্থাপিত হউক—আবার ভারত চরিত্রবলে বলীয়ান হউক, রজ্জুতে সর্প-ভ্রম-সঞ্জাত-রক্ত-রঞ্জনে ব্যথিত আমরা নব বর্ষে বিধাতার নিকট কেবল ইহাই প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সঙ্কলিকা

(১)

২৮শে এপ্রিল (১৯১৯) সোমবারের ডেইলি-নিউজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে;—

"We gave our opinion the other day of what to do in the present crisis and we still think the two suggestions, namely, the veto of the Rowlatt Act and no firing on crowds quite correct. But we forgot the question of Delhi which is really the first and most important matter to-day as it has been for years. Unless the idea of Delhi as a Capital is abandoned, we may as well give up India at once without further discussion. Ever since it was suggested the whole world of India has been filled with dismay and it has seemed incredible that the King should have been so badly advised. Delhi has been the doom of all dynasties that have made it a Capital, and everyone in India however humble, was aware of that. Lord Hardinge, of course, never informed the King of that no doubt, because he was not aware of it, it being no part of the Viceroy's business to know what people are saying and the Press Act having been expressly invented to prevent people reading the unpleasant things which, everyone is saying. But ask anyone in India their views of Delhi he will say it was an unlucky thing for the country that it was started and unlucky for the Raj, and that the war was only one of these bits of bad luck. It may be a silly bit of superstition which no Government that calls itself, "western" and therefore enlightened should listen to but the immense population of this country believe it to a man. So, why ignore it? The British Government ignored the fact that Sir Ian Hamilton was called "unlucky Hamilton," and the result was Gallipoli. At present we know that Mr. Montagu purports to be extremely anxious that India should have a voice in its own affairs. The first utterance of that voice we know would be "Abandon Delhi," and will be (bar the seven vetoes), when the Reforms come (which they won't). To Europeans, who also have superstition or instincts,

we may tell them what is not generally known. The foundation stone of Delhi was a piece of marble that was in process of being made into a tomb stone. It was required in a. hurry, as we know and the only thing at hand was a block of stone booked for the tomb of Mr. So and So. We do not know if the inscription was actually cut away, but we believe it had been begun, and the block was redressed, and sent along at a few hours' notice. So Delhi was well and truly laid by His Majesty King George V., on a second hand tombstone. But that stone did not remain where His Majesty laid it. The site was discovered to be unhealthy. (Lord Hardinge was quite unaware of this also), and one day or night the second-hand tombstone was taken up and set up at a place five miles away, and well and truly laid by a subordinate of the P. W. D. Those two facts even a Calcutta bank manager would admit are rather odd. A Capital city founded on a tombstone, and the foundation removed within a month seems rather a weird episode. Those who have read their 'Bagh o-Bahar', no doubt, would say, "Ai Kambukht" (Alas ! unlucky one). So, let the King cut the painter of Delhi and give India a chance."

বঙ্গ বিভাগ রদ করিয়া দিল্লীতে যখন রাজধানী স্থানান্তরিত হয়, তখন আমরা তাহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। তাহার ফল ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে বুঝিতে পারিতেছেন। ডেইলী নিউজের সম্পাদকীয় মন্তব্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি।

(২)

অমৃত-বাজারের জামীনের টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে এবং আবার দশ সহস্র টাকা জামীন গৃহীত হইয়াছে। বোম্বে ক্রণিকেলের সম্পাদককে ভারত হইতে তাড়িত করা হইয়াছে এবং ঐ পত্রিকাখ সেন্সরের হাত দিয়া প্রকাশিত হওয়ার অনুজ্ঞা প্রকাশিত হওয়ায়, অধ্যক্ষেরা কাগজ বন্ধ করিয়াছেন। অপর দিকে, দেশ-হিত-যজ্ঞে শান্তি ঘুটে পুড়িতেছে দেখিয়া গোবর-গণেশগণ হাসিতেছেন! এ দেশের মডারেটগণ দিল্লী ব্যাপার সংক্রান্ত বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং আবেদন নিবেদনের আয়োজন করিয়া বিলাতে "রিফরম স্কিমের" জন্য প্রতিনিধি পাঠাইতেছেন। উঁহারা যাহা বলিতেছেন, এক্‌ষ্ট্রিমিষ্টগণও তাহাই বলেন। যাঁহার দ্বারাই ভারতের যে উপকার হয়, তাঁহাকেই আমরা প্রণাম করি। কিন্তু কিছু হইবে কি না, আমাদের নিকট সন্দেহের বিষয় বলিয়া মনে হয়। বায়ু যে নিষ্পেষণের দিকেই বহিতেছে। শ্রীমতী এনিবেসেণ্ট বেসুরা তান ধরিয়াছেন। লাল মুখের বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় কি? তবে হর্নিম্যান স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত, একথা না বলিয়া পারি না। তিনি যেন এদেশে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ। বিধাতা তাঁহার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল করুন।

(৩)

যেমন হইয়া থাকে, এবারও তেমনি সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হাবড়াতে হইয়া গিয়াছে। টাকা বেশ উঠিয়াছিল, লাভের ধন কোন্ পিপড়ায় খাইবে, এখন তাহাই বিবেচ্য। ঢাক ঢোল কাঁসাইও বেশ বাজিয়াছিল। লাল মুখের ইঙ্গিতে কি না হইতে পারে? দুর্গাদাস বাবু গৌরবান্বিত ব্যক্তি। খোসামুদীকে ধরিয়া থাকুন, তিনি এদেশে অদ্বিতীয় ব্যক্তি হইতে পারিবেন। যে কথা বলিতেছিলাম, শ্রীযুক্ত আশুতোষকে স্থায়ী সভাপতি করার কি হইল? বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা চালাইয়া তিনি অমর হইয়াছেন। নৈতিক-বল যে সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসিত হইতেছে, সে সম্বন্ধে তিনি উদাসীন কেন? সে অপ্রিয় কথা থাকুক। কেহ কেহ বলেন, বুরোক্রাটদিগকে সাহিত্যের আসরে ডাকা ভালই হইয়াছে। ভাল যদি হয়, প্রতি পরিবার ও সমাজের কর্ত্তার পদে বুরোক্রাটদিগকে বসাইয়া দেও না কেন? আমাদের আর কিছুই বক্তব্য থাকিবে না,

সব তাঁহারাই করিবেন। আবেদন নিবেদনের বাজারে এই নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় ভালই হইল বুঝি!! হায় রে কর্ত্তাভজার যুগ!! আমাদিগকে কিছু করিতে না হইলেই তবেই আমরা ঘুমাইয়া পড়িতে পারি। বন্ধু, তুমি বল?

(৪)

বুরোক্রাটদিগকে ডাকিতে হয় কি স্বেচ্ছায় নচেৎ যে কেহ কিছু চাঁদা দেয় না। যে সব বড় বড় লোকের নাম কর, দেশের উন্নতির জন্য তন্মধ্যে কয়জন মুক্তহস্ত, জান কি? সভা বল, সমিতি বল, টাকার অভাবে সকলেরই কষ্ট। প্রণয়-চিত্রমূলক চুটকি গল্পের দ্বারা যে মাসিক সকলের কলেবর পূর্ণ, তাহার কারণও ঐ;—ঐরূপ না করিলে কেহ যে টাকা দেয় না! নীতি ধর্ম্ম ডুবিতেছে, ডুবুক; আপনাপন স্বার্থ সিদ্ধ হইলেই হয়! এই ত অনেকের ধারণা। চুরি ডাকাতিতে যে ভদ্রলোকদের নামও শুনা যাইতেছে, স্বার্থ সিদ্ধির কারণই তন্মধ্যে নিহিত। আমরা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়াছি। দেশের গতি কোন্ দিকে?

(৫)

শ্রীযুক্ত গান্ধি এবং প্রফুল্লচন্দ্র যদি নেতৃত্ব পান, এদেশের হাওয়া কতকটা ফিরিতে পারে। কত সুন্দর সুন্দর কথাই সে দিন প্রফুল্লচন্দ্র হাবড়ার কন্‌ফারেন্সে বলিলেন। উকীল সৃজন সম্বন্ধে এরূপ তীব্র মন্তব্য আমরা আর কোথাও পড়ি নাই। বিশ্ববিদ্যালয় কি করিতেছেন? শিব গড়িতে বানর গড়িতেছেন নাকি? শিল্প-বাণিজ্য-মূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য সকলের কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা উচিত; নচেৎ এদেশের উদ্ধার নাই। ঐ দেখ, সাহায্যের অভাবে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ যায় যায় হইয়াছে। মাড়োয়ারীদের দিকে চাহিয়া দেখ না কেন? খালি খোসামুদী লইয়া ঘুমাইয়া পড়িলে বা পাচাটাচাটি করিলে দেশের উদ্ধার নাই। হাকিম হুকিম প্রস্তুতের কল বন্ধ করিয়া দেও, প্রকৃত মানুষ বানাও, প্রকৃত বণিক বানাও, প্রকৃত শিল্পী বানাও। দোহাই বন্ধু, খালি অসার গল্পে মজিয়া ইন্দ্রিয়-প্রেমে মেয়ে কাড়াকাড়ি করিয়া ঘুমাইয়া পড়িও না, নৈতিক বলে বলীয়ান হইয়া গান্ধির ন্যায় বীর বেশে একবার দাঁড়াও দেখি? দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে।

(৬)

ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত রাজমোহন দাস মহাশয় নিম্নশ্রেণীর লোকের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিতেছেন। আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। নিম্নশ্রেণীর উদ্ধার ভিন্ন এদেশের মঙ্গল নাই। ব্যথিতের বেদনা ব্যথিতই জানই বুঝিতে পারে। "কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।" ঠিক লোকের হাতেই কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছে। টাকাও খুব আসিতেছে, গবর্ণমেণ্টও খুব সাহায্য করিতেছেন। আমরা বহুদিন এক্ষেত্রে কাজ করিয়া বুঝিতেছি, নিম্নশ্রেণীর উপরে দুর্নীতির পলি-মাটী পড়িয়াছে, কঠোর তপস্যা ভিন্ন তাহা অপনীত হইবে না। তাহা না হইলে, কিছুতেই কিছু হইবে না। নীতিবিহীন অর্থকরী বিদ্যায়, সে অবস্থায়, অহঙ্কারই জাগিবে, প্রকৃত মানুষ জাগিবে না। বড় কঠিন কার্য্য। বাঘ ও সাপ লইয়া খেলা করা বড় শক্ত কাজ।

(৭)

সঞ্জীবনী, ২৫ শে বৈশাখ, ১৩২৬, লিখিয়াছেন—"অমৃতবাজার শাসন সংস্কার প্রস্তাবের উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। কলিকাতার হোমরুল লীগের নেতৃবর্গও শীঘ্র উহার উপকারিতা স্বীকার করিবেন, আমরা এই আশা করি। আমাদের আশার কারণ এই যে, যাঁহাদের বিন্দুমাত্র বুদ্ধি আছে, তাঁহারা উহার উপকারিতা অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন।

"গুতাতে বাবা বোলায়" যে দেশের প্রবাদ, সে দেশে এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়; নচেৎ সাহসের সম্রাট সঞ্জীবনী-সম্পাদকের এরূপ বুদ্ধি হইবে কেন? এরূপ কথা বলা বড়ই ধৃষ্টতা। যাঁহারা শাসন-সংস্কারের পক্ষপাতী নয়, তাঁহারা নির্ব্বোধ! নির্ব্বাসনের পর হইতে সঞ্জীবনী-সম্পাদক কোথায় যাইতেছেন?

পরলোক তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শিশুরা জলুকার মত দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। সাধারণ বয়স্ক ব্যক্তিরা মৃত্যুর পরক্ষণেই জন্মলাভ করিতে পায় না। পরিত্যক্ত দেহের উপর উৎকট মায়ামমতা থাকিতে নূতন দেহ গ্রহণের আকুলতা জন্মে না। স্থূলদেহ দাহ হইবার পর যখন পুনঃ প্রাপ্তির আর আশা থাকে না, দেখিতেও পাওয়া যায় না, তখন ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব দেহের ঝোঁক কমিতে আরম্ভ করে। সাধারণ পাপ-পুণ্য-কারী ব্যক্তিই জগতে অধিক। নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া যাইতে হয় বলিয়া, তাহাদিগকে যে কোন দেহ গ্রহণ করিলে চলে না। কাজেই কর্ম্মার্জ্জিত অনুরূপ শরীর গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। "যথা প্রজ্ঞতং হি সম্ভবঃ"। যে যে জাতীয় কর্ম্ম করিবে, সেই জাতীয় শরীরই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। মুক্ত ব্যতীত জগতে সকলকেই জন্মিতে হয়, "ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ"।

এই অপেক্ষা এক বৎসর মধ্যে বা এক বৎসর পরে হইয়া থাকে। শাস্ত্রে উক্ত আছে—

"পূর্ণে সংবৎসরে প্রাপ্তে দেহমন্যং প্রপদ্যতে"

এই সাধারণ পাপ-পুণ্যকারী ব্যক্তিরা মৃত্যুর পর পূর্ব্ব দেহের ছায়ামূর্ত্তি লইয়া কিছুদিন ভ্রমণ করে, নূতন দেহ গ্রহণের কাল উপস্থিত হইলে, ছায়ামূর্ত্তি ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া বিলীন হয়। পশ্চাৎ নূতন জন্ম লাভ ঘটে। অন্তরীক্ষস্থ বায়ুভূত নিরাশ্রয় থাকিয়া মৃত -আত্মাগণ লোকলোচনের অগোচরে অপেক্ষিতব্য কাল কাটাইয়া দেয়। এই অপেক্ষা কাল মধ্যে ইহাদিগকে কৃত-কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিতে হয় না। পারলৌকিকার্থে পুণ্য নাই যে স্বর্গভোগ হইবে, অত্যুৎকট পাপ নাই যে নরকভোগ হইবে। পারলৌকিকার্থ পুণ্য ও অত্যুৎকট পাপের ফল লোকান্তরে ভোগদেহে পাইতে হয়। এই ভোগদেহ লিঙ্গদেহের প্রকার-ভেদ মাত্র। স্বর্গ নরক ভোগোচিত-লিঙ্গ দেহের নামই ভোগদেহ। ভোগদেহে কৃতকর্ম্মের ফলাফল হয়। তবে লিঙ্গদেহে (সাধারণ) কৃতকর্ম্মের ফলাফল না হইলেও প্রাণিদিগের স্বভাব নিরত সুখ দুঃখের বোধ থাকে, জীবদ্দশার যাবতীয় সংস্কার বিদ্যমান থাকে, স্থূল দেহাভ্যস্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা, ক্লান্তি অব-সাদ, আকাঙ্ক্ষা আকুলতাও থাকে। নিরবচ্ছিন্ন অপূর্ব্ব মানস সুখ এবং ধারাবাহিক অপরিসীম মানসিক দুঃখ নাই বলিয়া, জীবদ্দশোচিত সুখ দুঃখের বোধ থাকায় কোন বাধা নাই। মৃত্যুর পর সপ্তদশ লিঙ্গোপেত জীব গমন করে। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় প্রাণ-সমন্বিত মনই লিঙ্গদেহে সুখ দুঃখ অনুভব করে। স্থূলদেহে মনের যে জাতীয় যত ছাপ পড়ে, মৃত্যুর পর লিঙ্গদেহে সেই ছাপ অবিকল থাকে।

মৃত্যুর পরই স্থূলদেহের উপর এবং অন্যান্য প্রিয়পাত্রের উপর ঝোঁক কাটিয়া যায় না, দুই দশ দিন সময় লাগে। কিছুদিন পরে পূর্ব্ব দেহের ঝোঁক কাটিলে নূতন শরীর গ্রহণের জন্য ব্যাকুলতা জন্মে। যত দিন যায়, ততই ঐ ব্যাকুলতা বিষম উৎকণ্ঠায় পরিণত হয়।

সে অবস্থায় কোথায় দেহ, কোথায় দেহ করিয়া উন্মত্তের মত ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। লিঙ্গদেহে—ছায়ামূর্ত্তিতে থাকা আর ভাল লাগে না। মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রাণ বাহির হইবার সময় যেমন ছটফট করে, লিঙ্গদেহ হইতে নূতন স্থূলদেহ গ্রহণের সময়ে জীব তদ্রূপই ছটফট করে। জন্ম নহিলে তখন যেন আর চলে না। ক্ষিপ্ত কুকুরের মত সে কি বিষম অবস্থা! ক্রমে পূর্ব্ব দেহের ছায়া মিলাইয়া যায়; জীবও তখন সূক্ষ্ম জীবাণুরূপে শস্যাদি আশ্রয়ে অবস্থিতি করে। শস্যাশ্রয় ব্যতীত জীব জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। এই শস্য আশ্রয়ের নাম স্থাবর সংশ্লেষ, স্থাবরে জীব সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ লগ্ন থাকে। শস্যের ভিতর দিয়া, রক্তকণিকার মধ্য দিয়া ক্রমে গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। এ স্থাবর সংশ্লেষ কেবল জন্ম লাভের জন্য। পুণ্যবান্, পাপী, স্বর্গভ্রষ্ট ও সাধারণ পাপ পুণ্যকারী সকলকে স্থাবর সংশ্লেষ লাভ করিতে হয়। এ সংশ্লেষ কালে জীব সংমূর্চ্ছিতবৎ থাকে। অনুভূতি সুপ্তই থাকে। শস্যের ছেদন ভেদনে তৎস্থ জীবের কোন কষ্টই হয় না।

জীবের স্থাবর সংশ্লেষ, আর জীবের স্থাবর জন্ম এক জিনিষ নহে। মহা পাপী মহা পাপের ফলে, কখন কখন স্থাবর জন্ম বা স্থাবর ভোগ লাভ করে। ইহা আরও কষ্টকর জঘন্যতম অবস্থা।

"স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথা কর্ম্ম যথাশ্রুতং"

(কঠোপনিষৎ)

মনু বলিয়াছেন—১২,৯

শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাং॥

স্থাবর যোনিতে জীবের সূক্ষ্ম অনুভূতি থাকে। স্থাবরের দেহই জীবের দেহ। জীবের আত্মাই স্থাবরের আত্মা। স্থাবর যোনি হইতে সেই জীব যখন অব্যাহতি পাইবে, তখন ঐ স্থাবরের নাশ বা মৃত্যু হইবে। স্থাবরে সংশ্লেষ দুই দশ দিন মাত্র। স্থাবর জন্ম বহুকালব্যাপী। স্থাবর জন্মে জীবের বহু সময় ব্যর্থ হয়। যতকাল ঐ স্থাবর যোনিতে থাকিবে, তত কালের মধ্যে মনুষ্য জন্ম পাইলে হয়ত কতবার উন্নতি করিবার সুযোগ মিলিতে পারিত। স্থাবর যোনি বলিতে বৃক্ষ প্রস্তরাদি জন্ম বুঝিতে হইবে। প্রস্তরাদি জন্মে প্রস্তর ক্ষয় না পাইলে ঐ জীবের প্রস্তর দেহ বিমুক্তি ঘটিবে না। দার্শনিকগণ বলেন, "সর্ব্বে ভাবাশ্চেতনা" ভাব পদার্থ মাত্রেই চেতন। মনু বলেন, "সকল পদার্থই অন্তঃসংজ্ঞাসমন্বিত।" বৃক্ষাদির মধ্যে যে জীব আছে, তাহা অবিসংবাদিত। কিন্তু লৌহ পাষাণাদির মধ্যে যে জীব আছে, তাহা আমাদের উপনিষৎ সংহিতা প্রভৃতিতে উক্ত হইলেও অবিসংবাদিত গণ্য হয় নাই। কিন্তু বসু মহাশয়ের মাহাত্ম্যে আর বোধ করি কাহারও মনে দ্বিধা নাই।

স্মৃতিশাস্ত্রে আতিবাহিক দেহ নামক অপর একটী দেহের কথা উক্ত হইয়াছে। ঐ আতিবাহিক দেহও লিঙ্গদেহের প্রকার ভেদ মাত্র।

আতিবাহিক সংজ্ঞেতাঽসৌ দেহো ভবতি ভার্গব।
কেবলং তন্মনুষ্যানাং নান্যেষাং প্রাণিনাং কচিৎ॥

মনুষ্য ব্যতীত অপর প্রাণীর আতিবাহিক দেহ গ্রহণ করিতে হয় না। মৃত্যুর পর বড় জোর দশ দিন মাত্র এ দেহে অবস্থিতি করিতে হয়। ঐ আতিবাহিক দেহ নষ্ট হইলে, স্বাভাবিক লিঙ্গদেহ ধারণ হয়। যদি স্বাভাবিক নিয়মে আতিবাহিক দেহনাশ না ঘটে, তবে আমরা দশপিণ্ডাদি দ্বারা উক্ত নাশ

ব্যাপারে সাহায্য করিতে পারি। অণ্ডজ প্রাণী জন্মিবামাত্র অণ্ডরূপ বেষ্টনে আবৃত থাকে, ঐ অণ্ডরূপ বেষ্টন ভাঙ্গিয়া যাইলে তবে অণ্ডজ প্রাণী বহির্গত হয়। ঐ আবরণই যেন আতিবাহিক দেহের মত। খনি হইতে মণিরত্ন উত্তোলিত করার পর তাহার গুণ বা ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায় না। যে মালিন্য রত্নের গুণ বা ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাইতে দেয় না— উহারই সহিত আতিবাহিক দেহের তুলনা। মৃত্যুর পর পূর্ব্ব দেহেরই ভাবে জীব আচ্ছন্ন থাকে, অত্যন্ত মায়া মমতা ও ঝোঁকে বিমূঢ়বৎ অবস্থিতি করে। ঐ ভাবের আচ্ছন্নতা ঐ ঝোঁকে বিমূঢ়বৎ অবস্থিতি থাকিতে লিঙ্গ দেহের গুণ বা ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। লিঙ্গদেহে থাকিয়া লিঙ্গদেহের গুণ, ক্রিয়া ও শক্তি লাভ করাই ত আবশ্যক। কাজেই ঐ মালিন্য, ভাব বা ঝোঁক থাকা ভাল নহে। ঐ আতিবাহিক দেহনাশ-প্রণালী এক প্রকার চিকিৎসা। লিঙ্গদেহের প্রথম দুই চারি দিনের অবস্থারই আতিবাহিক সংযুক্ত।

মৃতদেহ দাহ হইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত জীবেরা সকলেই অতি সহজেই স্থূলদেহের ছায়ামূর্ত্তি লইয়া আত্মীয় স্বজনকে দেখা দিতে পারে। দাহের পর পূর্ব্ব দেহের ছায়া গ্রহণ করিয়া, অবস্থিতি করা দাহের পূর্ব্বকার তুলনায় কঠিন। আতিবাহিক দেহ নাশের পর পূর্ব্ব দেহের ছায়ামূর্ত্তিতে থাকা তুলনায় আরও কঠিন। এক বৎসরের পরে সাপিণ্ড্য-করণাদির পর ছায়ামূর্ত্তিতে অবস্থিতি করা অত্যন্ত কঠিন। জন্মান্তর গ্রহণের পর ত আর সম্ভবই নহে। মৃত্যুর পরক্ষণে দাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীব ছায়ামূর্ত্তিতে আত্মীয় স্বজনকে মুহূর্ত্তের জন্য দেখা দিয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে (যশোহর) মহেশপুর গ্রাম-নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ মহোদয় ব্রাহ্মণ-সমাজ পত্রিকায় তাঁহারই কন্যার বিষয়ে একটী ঘটনার কথা বলিয়াছেন।

মৃত্যুর পর কেহ কেহ আত্মীয় স্বজনকে দেখা দিতে আসে, কিন্তু আত্মীয় স্বজন কেহই সে সূক্ষ্ম ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পায় না। অনেক দিন যাবত যত্ন করিয়াও মৃত ভ্রাতা ভগ্নীকে ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করাইতে পারে নাই, এমন একটী ঘটনা ব্রহ্মবিদ্যা পত্রিকায় পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয়। চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া, মৃত আত্মা তখন সে সংকল্প ত্যাগ করে। আত্মীয় স্বজন মৃত আত্মা আসিয়াছিল বলিয়া মনেই করে না। স্থূল চর্ম্ম চক্ষুর সম্মুখে লিঙ্গদেহীরা দাঁড়াইয়া থাকিলেও লোকে দেখিতে পায় না। লিঙ্গ-দেহ বায়বীয় ও অপার্থিব, পূর্ব্ব দেহের ছায়া মাত্র। স্থূল দেহের তুলনায় অতি সূক্ষ্ম। মৃত আত্মা কখন কখন স্বপ্নে দেখা দেয়। স্বপ্নে এমন দুই চারিটী সত্য ঘটনার কথা আমরা জানি, যাহাকে আর কেবল স্বপ্ন মাত্র বলা চলে না। তবে স্বপ্ন সাধারণতঃ স্বপ্ন-মাত্র।

কোন কোন মৃত আত্মা দেখা দিতে আসিয়া সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ, তৃপ্তির পরিবর্ত্তে অতৃপ্তি, সান্ত্বনার বিনিময়ে অশান্তি লাভ করে। ধর, জননী সন্তানের নিকট আসিয়াছে, ইচ্ছা ক্রোড়ে তুলিয়া লয়। মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। সে কি কম কষ্ট! সম্মুখে শীতল জলপূর্ণ সরোবর, তৃষ্ণায় কণ্ঠ বিশুষ্ক, অথচ জল খাইবার উপায় নাই! আপাততঃ একটু শান্তিলাভ করিয়া পরিশেষে দারুণ অশান্তি, অতৃপ্তি ও মনোদুঃখ লইয়া জননী প্রস্থা

করিল। এইরূপ দুই একবার মনের টানে আসিল, পরিশেষে আসা বন্ধ করিয়া দিল।

মৃতের আত্মীয় যদি কোন প্রকারে সন্দেহ করে, তবে যৎপরোনাস্তি গালি দেয়। মেয়েদের মধ্যে 'ঝাঁটা মার' 'গু খা' ইত্যাদি কটূক্তি করার ব্যবস্থা আছে। এ ব্যবস্থা অতি উত্তম। মৃত আত্মা যদি কোনরূপে আশা পায়, আদর লাভ করে, তবে মধ্যে মধ্যে আসিবে। আর ঐ মৃত আত্মা যদি কোন প্রিয়পাত্রকে আকর্ষণ করে, আর কোনরূপ আশা পায়, প্রশ্রয় লাভ করে, তবে প্রিয়-জনের অনিষ্টের সম্ভাবনা। কটূক্তি শুনিলে মনেও ধিক্কার আসে, প্রশ্রয়ও লাভ হয় না। আর মনের সম্যক্ বল থাকিলে মৃত আত্মা নিকটে আসি-তেই পারে না।

কোন কোন আত্মা এই ভাবিয়া আইসে না, যে "আমার উপকার নাই, উহাদের অপকারেরই সম্ভাবনা। যে মায়া দূর করিতে হইবে, সম্বন্ধ লোপ পাইয়াছে ভাবিতে হইবে, সে মায়া সে সম্বন্ধ হইতে দূরে থাকাই ভাল।"

মৃত আত্মারা পরবশ, যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার মত কৃতকর্ম্মানুযায়ী গতি লাভ করে, বা তৎতৎস্থানে অবস্থিতি করে। ইচ্ছা থাকিলেও তাহাদের শক্তি থাকে না। মৃতদেহ গৃহের বাহির করিয়া দিল, মুখে আগুন জ্বালিয়া দিল, আর তাহাদের সহিত সম্বন্ধ কি ভাবিয়া মৃত আত্মা আত্মীয়স্বজনের মায়া লোপ করে। আত্মীয় পরিজনের উপর মায়া ঝোঁক যত কম হয়, ততই মৃত আত্মার উপকার।

সাধারণতঃ জীবমাত্রেই স্থূল দেহ ত্যাগের পর নূতন স্থূল দেহের জন্য লালায়িত হয়। "কোথায় দেহ, কোথায় দেহ" করিয়া অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। উন্মত্তের মত, কিন্তু শৃগালাদির মত জীব নিজের জ্বালাতেই অস্থির থাকে, সে সংসারে কেই বা আমার প্রিয়জন—এ সকল চিন্তাই আইসে না। উৎকট ঝোঁকে ছুটাছুটি করিতে থাকে; যেন কি একটা উৎকট নেশা তাহাকে পাইয়া বসে। সে সঙ্কটময় অবস্থায় পরের ভাবনা আর ভাবা সম্ভব নহে।

জীবিত অবস্থায় মানব যে সকল কার্য্য করে, যেরূপ ভোগে ব্যাপৃত রহে, যে প্রকার পার্থিব সংস্কারে আচ্ছন্ন থাকে, সূক্ষ্মদেহে সেই সকল ছায়ার মত অনুবর্ত্তিত হইয়া থাকে। স্থূলদেহে পাপ পুণ্য যাহা অনুষ্ঠিত হয়—তাহাই অদৃষ্ট আকারে সূক্ষ্মদেহে অন্তঃকরণে জড়াইয়া থাকে। সূক্ষ্মদেহে জীব পরবশ থাকিয়া জড়যন্ত্রবৎ নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে চালিত হয়। সূক্ষ্ম-দেহে যদি কোন নূতন কার্য্য করিতে দেখা যায়—তাহা জীবিত কালেরই উৎকট ভাব-নার কার্য্যাকারে অভিব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। মন ফনোগ্রাফ যন্ত্রের মত। যেমন যেমন স্বর প্রবেশ করিবে, সেই সেই মত বহি-র্গত হইবে। জাগ্রৎ কালের বাহ্যজগতই স্বপ্ন কালে অন্তর্জগতে সাধারণতঃ প্রতিভাত হয়, কিম্বা অন্তর্জগৎ সৃষ্টি করে।

স্থূলদেহে প্রত্যহ ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভূত হয়, অন্ন জলে সে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যায়। সূক্ষ্ম-দেহেও সংস্কারবশতঃ ক্ষুধা তৃষ্ণার অনুভূতি জন্মে, অন্ন জল পাইলাম—এই প্রকার সংস্কার জন্মিলে সেই ক্ষুধা তৃষ্ণার শান্তি হয়। স্থূল শরীরে ক্ষুধার সময়ে অন্ন, পিপাসার সময়ে জল না পাইলে দারুণ কষ্ট, পশ্চাৎ স্থূলদেহের নাশ ঘটে। লিঙ্গদেহেও কষ্ট সমানই। তবে স্থূলদেহ নাশের মত তখন সূক্ষ্মদেহের পাত হয় না। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তিনী

মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হইয়া, পরে সে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া যায়, এই মাত্র বিশেষ। স্থূলদেহেও মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সকলকারই অতি অল্পক্ষণের জন্যও মূর্চ্ছা হয়, সেই মূর্চ্ছার অন্তরালেই জীবের মৃত্যু হয়। এজন্য দেহী "ঐ আমার প্রাণ বাহির হইতেছে" কিম্বা "আমি বাহির হইলাম", এ প্রকার বলে না বা ভাবেও না। মূর্চ্ছাপন্ন অজ্ঞান অবস্থায় মৃত্যুই বিধিদত্ত ব্যবস্থা। লিঙ্গদেহে ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, আপনার কর্ম্মপ্রভাবেই দেহী পাইতে পারে ; যদি না পায়, পাইবার বাধা থাকে ; তাই আমরা সেই সংস্কার জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করি, বাধা দূর করার ব্যবস্থা করি। সন্তানের রোগ হইলে মাতা ভগবানকে ডাকে, তাহাতে সন্তানের রোগ সারিতে দেখা যায়। পতির জন্য সতী হত্যা দেয়, সুফল ফলে। আমরা ইচ্ছা ও মন্ত্রশক্তি সাহায্যে শ্রীভগবানকে এক মনে ডাকিয়া মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক সদ্গতিই বা করিতে পারিব না কেন ?

স্থূলদেহে অন্ন জল অভাবে যেমন কষ্ট হয়, লিঙ্গদেহে সংস্কারবশতঃ সেই জাতীয় কষ্টের অনুভূতি জন্মে। এই অনুভূতি মাত্র মানসিক। পিতৃগণের ভোজনও মানসিক। তজ্জন্য তৃপ্তিও একটী মানস ধারণা মাত্র। দেবগণের অমৃত পানও দৃষ্টিমূলক, পিতৃগণের শ্রাদ্ধান্ন ভোজনও দৃষ্টিমূলক। আর সেই দৃষ্টিভোজনেই মৃতের তৃপ্তি।

"ন বৈ দেবা অমৃতমশ্নন্তি অমৃতেন দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি"

স্থূলদেহে ভুক্তদ্রব্য রস রক্তাদিরূপে পরিণত হয় ; লিঙ্গদেহে অবশ্য তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে মনের তৃপ্তি হওয়ায় মনের পরিপুষ্টি হয়, আধ্যাত্মিক বল জন্মে। স্থূলদেহের সুখ দুঃখ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, তৃপ্তি অতৃপ্তির সহিত লিঙ্গদেহের সুখ দুঃখ, ক্ষুধা তৃষ্ণা ও তৃপ্তি অতৃপ্তির অনুভবাংশে কোন পার্থক্য নাই। জাগ্রৎ কালের দর্শন স্পর্শনাদি ও সুখ দুঃখ এবং স্বপ্নকালের দর্শন স্পর্শনাদি ও সুখ দুঃখের পার্থক্যের মত স্থূলদেহের ভোগে এবং সূক্ষ্ম দেহের ভোগে সমানই পার্থক্য।

স্বপ্নে একা মনই সুপ্ত ইন্দ্রিয়াদিকে দ্বার করিয়া দর্শনাদির ব্যাপার সমাধা করে। মনই যে জাগ্রত থাকিয়া পূর্ব্ব-দৃষ্ট রথাদির সৃষ্টি করে—তাহা "ন তত্র রথা রথযোগঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবচনে অবগত হওয়া যায়। জাগ্রৎকালে ইন্দ্রিয়াদির সহিত মনের সাক্ষাৎ সংযোগ থাকে, স্বপ্নে সাক্ষাৎ সংযোগ না থাকিলেও দর্শনাদি ব্যাপারের কোন ক্ষতি হয় না। লিঙ্গদেহে একা মনই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে দর্শনাদি ব্যাপার সমাধা করে ; স্থূলদেহে সাক্ষাৎ স্থূলেন্দ্রিয় সংযোগ ঘটিয়াছিল বলিয়া, লিঙ্গদেহে স্থূলেন্দ্রিয় না থাকিলেও তাহার সংস্কার লইয়া মনই দর্শনাদি করিয়া থাকে। স্থূলেন্দ্রিয় সংস্কার আর সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় একই কথা। স্থূলেন্দ্রিয় সংস্কারই সূক্ষ্মেন্দ্রিয় থাকা। পাত্র হইতে মৃগনাভি তুলিয়া লওয়ার পরও পাত্রে মৃগনাভির গন্ধ থাকে। ঐ গন্ধ থাকার মানেই মৃগনাভির সূক্ষ্ম আকারে থাকা।

সাধারণ পাপ পুণ্যকারীরা মৃত্যুর পর আকাশে অন্তরীক্ষে শূন্যে, জলে স্থলে প্রান্তরে পূর্ব্বদেহের ছায়া লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তখন ঐ ছায়াময় দেহ বায়বীয়। তবে পার্থিব সংস্কার-বিশিষ্ট মন প্রাণোপাধিক জীব সেই অভ্যন্তরে অবস্থিতি করেন বলিয়া, উহার দেহী আখ্যা। পার্থিব সংস্কার আছে, কাজেই লিঙ্গদেহে পার্থিব কিছু নাই, এমন

বলা যায় না। তবে স্থূল ভার নাই। উক্ত বায়বীয় দেহ সাধারণতঃ চক্ষুগ্রাহ্য মহত্ত্ব না থাকায় চর্ম্ম চক্ষুর গোচর হয় না। উক্ত দেহ কদাচিৎ চকিতের মত দৃষ্টির পথিক হইয়া থাকে। এই ছায়াদেহ বিশিষ্ট লিঙ্গ-দেহী ভৌতিক যোনি নহে। একবার আমি ও আমার প্রিয় বন্ধু শ্রীমান্ বীরেন্দ্র-কিশোর মজুমদার আমাদের বাটীর সম্মুখস্থ বেড়ার ধারে পথের উপর দণ্ডায়মান ছায়া দেখিতে পাই। বন্ধুটী অগ্রে দেখেন, তৎপরে তাহার আহ্বানে আমি তথায় উপস্থিত হই। সে সময়ে আমাদের কৌতূহলই মাত্র হইয়াছিল, ভয় কিছুমাত্র হয় নাই। আমি ধরিতে যাইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ সেই ছায়া দেহ বিদ্যুৎগতিতে উর্দ্ধদিকে চলিয়া যায়। আমাদের কাণের উপর দিয়া যেন একটী বৃহৎ পক্ষী পাখা মেলিয়া প্রস্থান করিল। তৎপরে আমাদের ভয় হইয়াছিল।

উক্ত লিঙ্গদেহীরা স্থূলদেহ গ্রহণের উৎকট আকাঙ্ক্ষায় পৃথিবী তলে উন্মত্তের মত বিচরণ করে। স্বায়ুরূপ কৃতকর্ম্মানুযায়ী জন্মগ্রহণের কাল উপস্থিত হইয়া আসিলে, পূর্ব্বদেহের ছায়ামূর্ত্তি ক্রমে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম হইয়া পশ্চাৎ মিলাইয়া যায়। ছায়ামূর্ত্তি মিলাইয়া যাইলেই তৎক্ষণাৎ জীব স্থাবর সংশ্লেষ লাভ করে—অর্থাৎ জন্মের দ্বার স্বরূপ শস্য আশ্রয় করত অবস্থিতি করে। স্থাবর সংশ্লেষ ব্যতীত মানবাদি দেহীরা জন্মিতে পারে না। লিঙ্গ-দেহে দেহী পূর্ব্বকৃত পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করে না, তবে অভ্যস্ত সংস্কারবশতঃ তাহাদের মোটামুটী সুখ দুঃখানুভূতি ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ, উৎকণ্ঠা ব্যাকুলতা প্রভৃতি থাকে। কৃত-কর্ম্মের সুখ দুঃখ ভোগ ভোগদেহে হয়। লিঙ্গদেহের পর দেহী ভোগদেহ লাভ করে। স্বর্গ নরক ভোগোপযোগী দেহই ভোগদেহ। ভোগদেহ লিঙ্গদেহের প্রকার ভেদ মাত্র হইলেও দুইয়ের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতাও আছে।

সাধারণ লিঙ্গদেহে অবস্থিতি জন্মার্থ বা ভোগদেহ প্রাপ্ত্যর্থ। লিঙ্গদেহে অবস্থিতির ফলে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের কোন ক্ষয় হয় না। পাপ পুণ্যাত্মক কর্ম্মদ্বারা গঠিত প্রকৃতির বশে দেহী বলিলেও লিঙ্গদেহে থাকায় দেহীর কোন কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না। লিঙ্গদেহ যত শীঘ্র যায়, ততই ভাল। লিঙ্গদেহে অবস্থিতি হাজত বাসের মত। তবে ঐ অবস্থিতিই জন্মিবার দ্বার। মুক্ত ব্যতীত সকলেরই জন্ম যখন অপরিহার্য্য "ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" তখন কালক্ষেপ যত কম হয়, ততই ত প্রার্থনীয়। লিঙ্গদেহে পুণ্যবান কি পাপী (শিশু ব্যতীত) সকলকেই কিয়দ্দিন থাকিতেই হয়। ক্রমশঃ

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

শিক্ষা ও শিক্ষক

জনসাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে মনোযোগ বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের কার্য্যতৎপরতার অভ্যন্তরে একটী শুভলক্ষণ। প্রকৃত জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইলে, লোকশিক্ষা যে মূল, ইহার কার্য্যকারিতা ও যথার্থতার উপর যে জাতির যশ কিংবা অপযশ নির্ভর করিতেছে, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহা বাস্তবিকই আশার কথা। স্বর্গীয় গোখেলের বাধ্যতামূলক শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিলের পর প্রত্যেক প্রদেশে এই সম্বন্ধে যে চেষ্টা করা

হইতেছে ও যাহা ফলবতী হইয়াছে, তাহা এই কার্য্যতৎপরতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, মহিশূরের বিশ্ববিদ্যালয়, ওস্‌মানিয়া ইউনিভার্সিটী প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষা যাহাতে প্রকৃতপক্ষে উপকারী হয়, উপাধিধারী কেরানী গঠন না করিয়া যাহাতে প্রকৃত মানুষ গঠন করিতে পারে, এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু স্কুলের শিক্ষা (Matriculation পর্য্যন্ত যে সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে) তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইতেছে কি না সন্দেহ। প্রাথমিক শিক্ষা লোকের মনে অনুসন্ধানের ইচ্ছা জাগাইয়া দিয়া, সাধারণ-ব্যবহারোপযোগী জ্ঞানের উন্মেষ করিয়া জাতীয়তার ভিত্তি-স্থাপন করে, তৎপরবর্ত্তী Secondary শিক্ষা এই জ্ঞানের প্রসার করিয়া মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর মেরুদণ্ড স্বরূপ হইয়া থাকে। অন্ততঃ আমাদের দেশে এই স্কুলে যে প্রকার শিক্ষা দান করা হইয়া থাকে, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া অনেকের জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই মধ্যম শ্রেণীকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করিতে না পারিলে, অন্ততঃ তাহার সুবিধা প্রদান করিতে না পারিলে অশান্তির উদয় হইবে। যাহারা উচ্চশিক্ষিত হইবে, তাহাদের পক্ষেও এই স্কুলে পড়ার কালে কেবলমাত্র প্রাণহীন শিক্ষাদান না করিয়া প্রকৃত মানুষ গঠন করিবার চেষ্টা না করিলে ভবিষ্যতের অনেক শিক্ষাই অশিক্ষা বা কুশিক্ষায় পরিণত হইবে।

এই শিক্ষা কার্য্যকরী করিতে হইলে, প্রথম প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষকের। স্কুল সম্বন্ধে মনোযোগ একটু পড়িলেও মনে হয়, এই সহিষ্ণু, পরিশ্রমী, অর্থাভাবাপন্ন শ্রেণীর প্রতি জনসাধারণ প্রকৃত বিচার করিয়াছে কি না সন্দেহ। জনসাধারণের ও বিদ্যালয়ের হিতার্থে যাহারা শিক্ষকতা জীবনের কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, এরূপ লোক ছাড়া শিক্ষক শ্রেণীভুক্ত করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কার্য্য আপনার বলিয়া চিনিতে না পারিলে তাহা বিশেষ ফলপ্রসূ হইতে পারে না। অথচ আমাদের দেশে শিক্ষকতা দাঁড়াইয়াছে যেন অগতির গতি। যখন দেখা গেল, ওকালতিতে বিশেষ সুবিধা হইল না, গবর্ণমেণ্টের একটা সামান্য চাকুরীও কপালে জুটিল না, আফিস কিম্বা রেলওয়েতেও একটা বিশেষ সুবিধা হইল না, তখন আমাদের দৃষ্টি পড়ে—এই মাষ্টারীর প্রতি। কেবলমাত্র আমাদের দেশে কেন, ইংলণ্ডেও এইরূপ হইয়া থাকে—তবে সেখানে ইহার একটা ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করা হইতেছে—আর আমাদের দেশে এখনও যেরূপ চলিতেছে, তাহা বিশেষ প্রশংসার কথা নহে। বিশেষভাবে বঙ্গদেশের Aided School গুলির অবস্থা, শিক্ষকগণের পারদর্শিতা প্রভৃতি বিচার করিলে এক শোচনীয় অবস্থার কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই অবস্থার প্রধান কারণ উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। শিক্ষকতা কার্য্যে আমাদের দেশের লোকও একটু বেশ তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। পুরাতন গ্রীসের শিক্ষা সম্বন্ধীয় উন্নতির বিষয় আলোচনা করিতে করিতে একস্থানে পাওয়া গেল—এক জন অপর এক জনের নিকট নালিশ করিতেছে, "মহাশয় অমুক ব্যক্তি আমাকে স্কুলের মাষ্টার বলিয়াছে।" স্কুলের মাষ্টার হওয়া তখন যেন একটা হীনতা কিম্বা নীচতা বলিয়া পরিগণিত হইত। তাৎকালীন সামাজিক আচার ব্যবহারের

প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার দিনে শিক্ষকতা অক্ষমতার পরিচায়ক কিম্বা অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হওয়া একটু কেমন কেমন বোধ হয়। M. A. পাশ করিয়া Deputy কিম্বা Professor না হইয়া স্কুলের কাজ করা যেন একটা লজ্জার বিষয়। এই প্রকার অসন্তুষ্ট শিক্ষকের দ্বারা কাজ হওয়াতে শিক্ষকতা প্রাণহীন হইতেছে। Laudon সাহেব তাঁহার Class Management নামক পুস্তকে যথার্থই লিখিয়াছেন, এরূপ শিক্ষক নিজেদের জীবন ' flat, Stale and unprofitable" ও শিক্ষকতা "a wearisome monotonous business" বলিয়া মনে করেন। শিক্ষকতার প্রতি দেশের লোকের সম্মান বৃদ্ধি না হইলে, স্কুল সমূহে প্রাণহীন শিক্ষাই হইয়া থাকে। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার "A few Thoughts on Education" পুস্তকেও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

আজকালকার মত হইয়া বসবাস করিতে না পারিলেই লোকে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া থাকে। শিক্ষকতা কার্য্যে অর্থোন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সচ্ছল অবস্থা হওয়া কষ্টকর, কাজেই উপযুক্ত ব্যক্তিগণ যে এই কার্য্যে অনাস্থা প্রকাশ করিবে, তাহাতে কি আর আশ্চর্য্য? স্বার্থত্যাগী ও অর্থকে অনর্থ ভাবিবার লোক জগতে বিরল।

শিক্ষকগণের কষ্ট ঃ—শিক্ষকগণের বেতন বৃদ্ধি ও কর্ম্মে বিশেষ উন্নতির আশা এক প্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। B. A. পাশ থাকিলে Headmaster পর্য্যন্ত হওয়ার আশা করা যায়, কিন্তু তাহা না হইলে এই কার্য্যে ৪০৲ টাকাই চরম। কাজেই প্রথমে যে উৎসাহটুকু লইয়া তাহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, স্কুলের বাহিরে ছেলে পড়াইয়াই তাহা শেষ হইয়া যায়।

ছেলেদিগকে প্রকৃত মানুষ গঠন করিবার যে যত্ন ও পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন, তাহা কয়জন শিক্ষক করিয়া থাকেন? আমাদের স্কুল সমূহের কমিটীগুলিও বিদ্যালয়ের প্রকৃত উন্নতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র শিক্ষকগণের প্রতি প্রভুত্ব দেখাইবার চেষ্টাই বেশী করিয়া থাকেন। শুনিতে একটু খারাপ হইলেও কথাটী সত্য। সে দিন বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বঙ্গের ডিরেক্টার মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন, ইহারা স্কুলের উপকারিতা কিম্বা শিক্ষার কার্য্যকারিতার উপর বিচার করেন না, প্রথা অনুসারে শিক্ষকগণকে বেতন প্রদান করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। সাধারণ অর্থনীতির নিয়ম অনুসারেও এরূপ স্থলে যে কার্য্যসম্পাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয় না, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কথা নাই। Aided School এ বেশী দিন কাজ করিলে শিক্ষকগণের কার্য্য করিবার শক্তি কি ভাবে সীমাবদ্ধ হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই বুঝিতে পারেন

কার্য্যক্ষেত্র ঃ—যাহা হউক, শিক্ষকের কার্য্যক্ষেত্র অতি বিস্তৃত। শিক্ষকের উদ্দেশ্য অতীতে যাহাই হউক, বর্ত্তমানে তাহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ছাত্রদিগকে রচনা শিখাইবার সময় বুঝান হইয়া থাকে, "শিক্ষা কেবলমাত্র পরীক্ষায় পাশ করা নহে," কিন্তু কার্য্যতঃ ইহার বৎসামান্যই পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

পরীক্ষায় পাশ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় শিক্ষাদান না করিয়া, অন্য আদর্শ লইয়া শিক্ষকদিগকে চলিতে হইবে। কোনও বিখ্যাত শিক্ষার ব্যবস্থাপক বলিয়াছেন, শিক্ষকের কার্য্য "To stimulate and foster all right and noble instincts in the student, that he may grow in strength both morally and intellectually and be ready and able to do his duty in any position in which he may be placed." এই আদর্শ লইয়া কাজ করিলে শিক্ষকের দায়িত্ব যে কতদূর, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। আমাদের ছাত্রদের উপর একটী দোষ অনেকেই দিয়া থাকেন যে, তাহাদের manual labor-এর প্রতি অনিচ্ছা জন্মিয়া থাকে। এই দোষারোপ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এই অনিচ্ছার জন্যও শিক্ষকগণ অনেকটা দায়ী। কতকগুলি বিষয় দ্বারা ছেলেদের মস্তিষ্ক পূর্ণ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার উপযুক্ত করিবার চেষ্টা এই অনিচ্ছার পরিপোষক। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের গবর্ণমেণ্টের Educational policy ঘোষণা প্রসঙ্গে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, "It is pursued with too exclusive a view to entering Govt. service, that excessive prominence is given to examinations, that the courses of study are too purely literary in character and that the schools, colleges train the intelligence too little". ছাত্রগণ যাহাতে সর্ব্বত্র প্রশংসা পাইবার উপযুক্ত হয়, কর্ম্মনিষ্ঠা, নিয়মবর্ত্তিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিভূষিত হইয়া ভবিষ্যতে কাজের লোক হইতে পারে, এরূপ চেষ্টা করা শিক্ষকের কর্ত্তব্য। বিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে শিক্ষা অনেক স্থলেই অবহেলা করা হইয়া থাকে। "The curriculum of the school being meant for the general must be constructed on a pattern that has a recognisable bearing on everyday life". বিদ্যালয় সাধারণের জন্য বলিয়া ইহার পাঠ্যাদি বিষয় যাহাতে সাধারণের দৈনিক জীবনের উপযোগী হয়, তদনুরূপ করাই উচিত। বাঙ্গালাদেশের শিক্ষাবিভাগীয় Rules and Orders পুস্তকেও এরূপ মন্তব্য আছে।

কোনও বিশেষ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হওয়া অপেক্ষা আত্মত্যাগ, দয়া প্রভৃতি দ্বারা সুনাম অর্জ্জন করিলে শিক্ষক যে অধিকতর সুখী হইবেন, এই ভাবটী ছাত্রকে সর্ব্বদা বুঝিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

শিক্ষা প্রদান।—জাতীয় শিক্ষা লইয়া যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহার অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে ছেলেরা যাহাতে স্বদেশের প্রতি আস্থাহীন না হইয়া দেশকে সম্মান ও ভক্তি করিতে শিখে, দেশীয় আচার ও প্রথার প্রতি অকারণ বিদ্বেষভাবাপন্ন না হয়, ইহা একটী প্রধান উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলি যে এ অভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণেও পূর্ণ করিতে পারে না, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে জাতীয় শিক্ষাসমিতি প্রভৃতি অনুষ্ঠান এ দেশে বিশেষ কৃতকার্য্য হয় না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, মনে হয়, এই জাতীয় ভাব তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্রে রক্ষা করিতে সমর্থ। শিক্ষা দিবার সময়ে এই ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে কোনও বিশেষ বাধা আছে বলিয়া মনে হয় না।

জাতীয়তা রক্ষা করিতে হইলেই পাশ্চাত্য রীতিনীতি কিম্বা ইংরাজ শাসন প্রণালীর দোষারোপ করিতে হইবে, এরূপ মনে করা উচিত নহে। প্রকৃত মানুষ গঠন করাই শিক্ষকের কাজ।

রাজনৈতিক প্রভাবের সম্পূর্ণ বাহিরে ছেলেদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা অষ্ট্রিচ পক্ষীর ন্যায় বালুকারাশির ভিতর, চঞ্চু ও চক্ষু প্রবেশ করাইয়া নিরাপদ ভাবিবার প্রয়াসের ন্যায়। বাহিরের যুগান্তকারী আন্দোলনের দূরাগত উর্দ্মিমালার কল্লোল শ্রবণেন্দ্রিয়ের বাহিরে রক্ষা করিবার চেষ্টা বাতুলের উদ্যম। তবে রাজনীতির উন্মাদকারী প্রভাব যাহাতে স্কুলের ছাত্রগণকে গ্রাস না করে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। শিক্ষকের আদর্শ সময়ের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, কাজেই শিক্ষকগণ উৎসাহী ও বর্ত্তমানজ্ঞ (up to date) না হইলে চলিবে না। অবশ্য এই আদর্শ লইয়া কাজ করিতে হইলে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কিছু আশার কথা আমাদের রাজপ্রতিনিধি বলিয়াছিলেন, কিন্তু তারপর এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

অপর একটী প্রয়োজন, শিক্ষাদানের উপযুক্ত বন্দোবস্ত। শৃঙ্খলার সহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইলে, শিক্ষা কেন, কোনও কাজই সুসম্পন্ন হয় না—বর্ত্তমান যুগের সমবায় কার্য্যপদ্ধতি (Co-operation) যৌথকারবার প্রভৃতি সকল ব্যাপারের মূল এই Organisation. বিদ্যালয় গৃহও সুশৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা, কর্ম্মোপযোগিতা প্রভৃতি বিষয়ে আদর্শস্থানীয় না হইলে ছাত্রদের মনে বিংশ শতাব্দীর অনেকগুলি প্রয়োজনীয় উৎকর্ষের উন্মেষ হয় না। অনেকে ছেলেদিগকে সাহেবী স্কুল কলেজে পড়াইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহার কারণ দেশীয় বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলার অভাব—এই শৃঙ্খলার জন্য প্রাসাদোপম গৃহ কিম্বা বৈদ্যুতিক পাথার বন্দোবস্ত করিতে হয় না—সময়ের ব্যয় যথাসাধ্য হ্রাস করিয়া কার্য্যক্ষমতা ও সচ্ছন্দতার বৃদ্ধি করিতে পারিলে অনেক উপকার হয়। বাঙ্গালাদেশে অনেক সময় গ্রামে গ্রামে প্রতিযোগিতার ফলে উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়া থাকে—এই সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, দৃষ্টি কেবল ছাত্র সংখ্যার উপর; শিক্ষকগণ উপযুক্ত কিম্বা অনুপযুক্ত, তাঁহাদের কার্য্য প্রাণহীন কিম্বা অন্যপ্রকার, সে দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে কত অল্প বেতনে কার্য্য করিতে পারেন ও শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারিগণের চোখে ধূলা দিতে পারেন, তাহারই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। অনেক স্থলে বিদ্যালয় ব্যবসা বা কারবাররূপে বিবেচনা করিয়া লাভের প্রতিই লক্ষ্য রাখা হয়, এরূপভাবে শিক্ষামন্দির লাভ ক্ষতির হিসাবে পরিচালনা করা এক প্রকার স্বদেশদ্রোহিতা বলিয়া মনে হয়। প্রথমেই যেখানে ফাঁকির চেষ্টা, ভিত্তিমূলে যেখানে জুয়াচুরি, সেখানে মানুষ গড়ার চেষ্টা হরিতকীর দ্বারা সর্ব্বরোগ দূর করিবার চেষ্টার সমান।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন যত বেশী বিস্তৃত হয়, ততই ভাল, কিন্তু সাধারণ উচ্চশিক্ষা (General high education) কেবলমাত্র ছাত্রসংখ্যার দ্বারা মূল্যনিরূপণ করিলে চলিবে না। ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকসংখ্যা সমস্ত জনসংখ্যার

অনুপাতে মাত্র শতকরা দুইয়ের কিঞ্চিৎ অধিক, কিন্তু বঙ্গদেশে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে এরূপ লোকসংখ্যার সহিত সমস্ত জনসংখ্যার তুলনা করিলে, ইংলণ্ড ও ওয়েলসের ঐ অনুপাত অপেক্ষা বেশী হয়। ইহাতে এই বুঝা যায় যে, আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর অবশ্য-প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি অবহেলা প্রকাশ করিয়া কেবল মাত্র Secondary শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়া থাকে। ফলে উভয় প্রকার শিক্ষারই অবনতি ঘটিয়াছে। Census Report হইতে জানা যায়, প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শতকরা ৩৯ জন ৫ বৎসরের মধ্যেই সমস্ত ভুলিয়া যায়—আর আজকালকার উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কাজের লোকের হিসাব করিতে গেলে Secondary Education এর পক্ষেও বড় বিশেষ গৌরবজনক হইবে না। এই শিক্ষা কেবলমাত্র ব্যাপক (Extensive) করিবার চেষ্টা না করিয়া প্রকৃত মানুষ গঠনের চেষ্টা শিক্ষকগণের করা উচিত, ও জনসাধারণের দৃষ্টি এ বিষয়ে না পড়িলে বিশেষ সফল হইবে না।

শ্রীবিনয়ভূষণ মজুমদার, এম্‌, এ।

গীতোক্ত ত্রিগুণতত্ত্ব। (শেষ)

ত্রিগুণভেদে শরীরভেদ ও বন্ধনভেদ।—এক্ষণে এই ত্রিগুণ দ্বারা আমাদের বন্ধন ও মুক্তির কথা পুনর্ব্বার আলোচনা করিব। প্রকৃতি হইতে ত্রিগুণদ্বারা আমাদের ক্ষেত্র বা সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর এই উভয়রূপ শরীর গঠিত হয়, তাহা আমরা বিবৃত করিয়াছি। এস্থলে সে সম্বন্ধে আমাদের আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। মূল প্রকৃতি, সাংখ্যমতে যেমন ত্রিগুণাত্মিকা, সেইরূপ প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত সমুদায় কার্য্যই ত্রিগুণাত্মক, ত্রিগুণজভাবের দ্বারা ভাবিত। সুতরাং আমাদের ক্ষেত্র বা সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর যেরূপ ত্রিগুণ হইতে অভিব্যক্ত প্রকৃতির উপাদান হইতে রচিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক উপাদানও এই ত্রিগুণদ্বারা ভাবিত হইয়া বিভিন্ন প্রকার হয়। প্রকৃতির সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন যে বুদ্ধিতত্ত্ব—যাহা আমাদের ক্ষেত্রের মূল উপাদান, তাহাও এইজন্য ত্রিগুণভেদে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হয়। (গীতা ১৮।২৯-৩১)। সাত্ত্বিকবুদ্ধি ভাব যে ধর্ম্ম, জ্ঞান, সুখ প্রভৃতি, তাহা এই ত্রিগুণভেদে ত্রিবিধ হয়। তাহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে যে অহঙ্কারতত্ত্ব অভিব্যক্ত হয়, তাহাও এই গুণভেদে ত্রিবিধ হয়। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন, রাজসিক অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয় ও তামসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়। তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহারাও গুণভেদে ত্রিবিধ হয়। সাত্ত্বিক মন শুদ্ধ নির্ম্মল, রাজসিক মন চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত এবং তামসিক মন মূঢ়। ইন্দ্রিয়গণও সেইরূপ সাত্ত্বিক অবস্থায় প্রকাশ-স্বভাব, রাজসিক অবস্থায় চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত এবং তামসিক অবস্থায় অশক্ত হয়। তন্মাত্র ও স্থূলভূত সম্বন্ধে গুণভেদে ভিন্ন হয় বলা যায়। যেমন আকাশ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, বায়ু ও অগ্নি রজোগুণ-বিশিষ্ট, অপ্‌ ও অন্ন তমোগুণ-বিশিষ্ট।

ইহাদের কথা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। সাংখ্যমতে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন ইহারা অন্তঃকরণ বা চিত্ত; গুণভেদে এই চিত্তের পাঁচ প্রকার অবস্থা হয়। পাতঞ্জল দর্শন হইতে জানা যায় যে, সাত্ত্বিক চিত্ত একাগ্র, সত্ত্ব-নিরুদ্ধ, রাজসিকচিত্ত রজো বিক্ষিপ্ত, তামসিকচিত্ত ক্ষিপ্ত ও মূঢ়। এইরূপে গুণভেদে আমাদের সূক্ষ্ম শরীর ভিন্ন হয়। এজন্য যে ক্ষেত্রজ্ঞ সম্পূর্ণ তামসিক ভাবে বদ্ধ ও যাহার রাজসিক ও সাত্ত্বিক ভাব সম্পূর্ণ অভিভূত, সে জড়। তাহার সূক্ষ্ম শরীর অবিকাশিত, সম্পূর্ণরূপে তমঃ দ্বারা অভিভূত ও তাহার স্থূল শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি কিছুই অভিব্যক্ত থাকে না। ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর জীবভাবের কিঞ্চিৎ বিকাশ হওয়ায় তাহাদের শরীর অপেক্ষাকৃত পরিণত, তাহাও বলিয়াছি। কেবল মানুষের শরীরই এই লোকে পূর্ণ পরিণত; তাহার সূক্ষ্ম স্থূল উভয় শরীরই রজোগুণ প্রভাবে বিশেষ বিকশিত হইয়া সত্ত্বগুণ প্রভাবে পরিণত হয়। কিন্তু ত্রিগুণের ভেদ হেতু আমাদের সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয় শরীর অসংখ্য প্রকারে ভিন্ন হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, জড়ের শরীর হইতে উদ্ভিদের শরীর ভিন্ন; উদ্ভিদের শরীর হইতে নিম্ন শ্রেণীর জীবের শরীর ভিন্ন আর নিম্নশ্রেণী জীবের নানাবিধ শরীর হইতে আমাদের শরীর ভিন্ন। আমাদের মধ্যেও প্রত্যেকের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ভিন্ন। তোমার শরীর ও আমার শরীর ঠিক একরূপ নহে। আমাদের প্রত্যেকের প্রকৃতিভেদে ও বাহ্য অবস্থাভেদে শরীর ভিন্ন হয়। এইরূপে ত্রিগুণভেদে জগতের সর্ব্বত্র বৈচিত্র্য হয়। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, আমরা প্রত্যেকে ত্রিগুণের দ্বারা স্বতন্ত্র ভাবে বদ্ধ হই। তুমি যে ভাবে বদ্ধ—আমি ঠিক সেই ভাবে বদ্ধ নহি। তোমার শরীরে ত্রিগুণের ভাব যেরূপ অভিব্যক্ত, আমার শরীরে সেই-রূপ নহে। এজন্য ত্রিগুণ দ্বারা তুমি যেরূপ বদ্ধ, আমি ঠিক সেরূপে বদ্ধ নহি। আর সেই জন্য তোমার বা আমার ত্রিগুণ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার উপায়ও ঠিক একরূপ হইতে পারে না। আমাদের উভয়ের এই ত্রিগুণ বন্ধনের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যও সামান্য বিশেষ বিচার পূর্ব্বক এই মুক্তির জন্য সাধন পথ নির্দ্ধারিত করিতে হয়। সে কথা এস্থলে আলোচ্য নহে।

ত্রিগুণ-বন্ধন।—এক্ষণে ত্রিগুণের দ্বারা আমাদের বন্ধন ও ত্রিগুণ হইতে আমাদের মুক্তির কথা সামান্যভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমাদের বন্ধন ও মুক্তির কথা বুঝিতে হইলে, প্রথমে আমাদের এই বন্ধনের স্বরূপ কি, তাহাও বুঝিতে হইবে। আমাদের স্বরূপ ব্রহ্ম এবং বন্ধন বা মুক্তি সমুদায়ই মায়িক—ভ্রম বা অজ্ঞানপ্রসূত; এ সিদ্ধান্ত করিলে, এই বন্ধন-মুক্তি-তত্ত্ব বুঝিবার তত আবশ্যক হয় না। কিন্তু গীতা অনুসারে এ বন্ধন মায়িক বা কাল্পনিক নহে। গীতা হইতে জানা যায় যে, জীব আমরা ভগবানের অংশ; তাঁহারই পরিচ্ছিন্ন ভাব—কিন্তু আমরা তাহা হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহি। তাঁহারই প্রকৃতিগর্ভে তাঁহারই নিহিত আত্মা বা পুরুষরূপ বীজ হইতে আমরা উদ্ভূত হইয়াছি। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, একই 'সৎ' বহু ভাবে অভিব্যক্ত হন। তাঁহার পরম অক্ষর ভাব নিত্য, অব্যয়; আর তাঁহার অপর ক্ষরভাব অসংখ্য, বিনাশী, পরিচ্ছিন্ন ও পরিবর্ত্তনশীল; এই ক্ষর ভাবই জীবভাব

বা ভূতভাব। আমাদের জীবভাবে যে পরিচ্ছেদ—যে সঙ্কীর্ণতা, তাহাই আমাদের বন্ধন; সে বন্ধন সত্য—অলীক নহে। এক অর্থে তাহা মায়িক বটে। ব্রহ্মের এইরূপ পরিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ দেশ-কাল-নিমিত্ত উপাধি-যুক্ত হইয়া অভিব্যক্ত হইবার শক্তিই মায়া; মায়ার এক অর্থ Limitation। "মীয়স্তে—পরিমীয়স্তে—পরিচ্ছিদ্যন্তে অনয়া ইতি মায়া।" যাহা দ্বারা অপরিমেয় পরিমেয় হয়, অপরিচ্ছিন্ন পরিচ্ছিন্ন হয়, অনন্ত সান্ত হয়, অখণ্ড খণ্ডিত হয়, অবিভক্ত বিভক্তের ন্যায় হয়, নিরংশ অংশের ন্যায় হয়, এক বহু হয়—তাহাই মায়া। তাহাই ব্রহ্মের অচিন্ত্য স্বরূপ শক্তি। ব্রহ্ম, যে "এক—আমি বহু হইব" এই কল্পনা করিয়া বহু হন, ইহাই তাঁহার মায়াশক্তি। ব্রহ্ম বহু হইবার জন্য যে দেশ-কাল নিমিত্ত উপাধিকে কল্পনা করেন, ইহা তাঁহারই মায়াশক্তি। ব্রহ্ম যে সৃষ্টিপ্রসঙ্গে পুরুষ-প্রকৃতিরূপে নিত্য অভিব্যক্ত থাকেন, ইহাই তাঁহার মূল মায়া; তাঁহার দৈবীগুণ-ময়ী মায়া * এই মূল অনাদি প্রকৃতিপুরুষ ভাব হইতে কিরূপে বহু প্রজার উদ্ভব হয়, বহু ভূতভাবের বা জীবভাবের উৎপত্তি হয়, তাহা পূর্ব্বে চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে। পরমপুরুষ যে বহু হইবার কল্পনা বা কামনা করিয়া সেই বহু ভাববীজ (Ideas) তাঁহারই পরমা প্রকৃতি গর্ভে স্থাপন করেন এবং তাহাতে আপনি অনুপ্রবিষ্ট হন, তাহা হইতেই জীব আমাদের উৎপত্তি হয়, ইহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। প্রকৃতিগর্ভে প্রকৃতি হইতে শরীর গ্রহণ করিয়া আমাদের অভি-ব্যক্তি ও পরিণতি হয়। প্রকৃতিজ ত্রিগুণ দ্বারা আমাদের সেই শরীর বর্দ্ধিত, বিধৃত ও পরিণত হয়। সেই ত্রিগুণজ শরীরের ক্রম-আপূরণে আমাদের জীব ভাবের ক্রমআপূরণ হয়, প্রত্যেক জীব পশু মনুষ্য দেবাদি ভাবের মধ্য দিয়া ক্রমে ব্রহ্মভাব লাভ করিতে পারে। সাংখ্যমতে আমাদের ভোগমোক্ষার্থ প্রকৃতির প্রবৃত্তি এই পরিণামের কারণ। প্রকৃতিজ ত্রিগুণের পরিণাম-বিশেষ দ্বারা আমাদের শরীরের বা ক্ষেত্রের এই পরিণাম হয়, এবং গুণসঙ্গ হেতু সেই পরিণাম যে আমাদের, ইহা জ্ঞান হয়। যতদিন আমরা ব্রহ্মভাব লাভ করিতে না পারি, ততদিন আমাদের এই জ্ঞানের দ্বারা এই ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারা বদ্ধ থাকিতে হয়। এই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানই অজ্ঞান; অতএব এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের এই ত্রিগুণ-বন্ধন সত্য, তাহা মিথ্যা বা কাল্পনিক নহে।

এক্ষণে এই বন্ধন কিরূপ—তাহার উল্লেখ করিব। বন্ধনের অর্থ—দেহবদ্ধ হইয়া পরি-চ্ছিন্ন থাকা। সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর দ্বারা আমরা আমোক্ষ বদ্ধ থাকি। স্থূল শরীর আমাদের বার বার গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে হয়। স্থূল শরীর গ্রহণের জন্য আমাদের বার বার সদসদ্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। গীতা অনুসারে গুণসঙ্গই সৎ অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ। শঙ্করাচার্য্য বলেন যে,* অজ্ঞান বা অবিদ্যা হেতু যে দেহে

* শুদ্ধ মায়াশক্তি যোগে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় হন, পরম পুরুষ পরমা প্রকৃতিরূপা হন। আর তিনি যে বহু ক্ষয় বিনাশী ক্ষুদ্র খণ্ডিত ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে আপনাকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া পরিচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দ রূপ হন ও তাহাতে সৎ স্বরূপে আমি আছি, চিৎ স্বরূপ আমাকে নিত্য জ্ঞাতা ভাবে অনুভব করিতেছি ও সেই ভাবে আনন্দ স্বরূপ আমার অস্তিত্ব ও প্রকাশ সুখ অনুভব করিতেছি, এই ভাব উপভোগ করেন। ইহা মায়ার মলিনভাব। এক অর্থে ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত।

আত্মাধ্যাস হয়, আমরা দেহী এইরূপ যে অনুভব হয়, এই দেহাত্মক জ্ঞানই সেই বন্ধনের হেতু। গীতা অনুসারে দেহে ত্রিগুণের যে ভাব যখন অভিব্যক্ত হয়, সেই ভাব আমারই ভাব, সেই ভাবে আমিই ভাবিত হই, এইরূপ যে জ্ঞান ইহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। আমাদের দেহ সূক্ষ্ম ও স্থূল ভেদে ভিন্ন। ত্রিগুণের দ্বারা এই উভয় রূপ দেহ কিরূপে অভিব্যক্ত হয় বা পরিণত হয়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই উভয় দেহ ত্রিগুণজ বলিয়া আমাদের সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহে এই ত্রিগুণজ ভাবের অভিব্যক্তি হয়। এই সকল ভাবের মধ্যে যখন যে ভাব আমাদের অন্তরে প্রকাশ পায়, আমাদের বাহিরে এ স্থূল দেহেও তখন সেই ভাবের অভিব্যক্তি হয়, বা প্রতিবিম্ব পতিত হয়। রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া যখন আমাদের অন্তরে সত্ত্বগুণজ ভাবের প্রকাশ হয়, তখন বাহিরে আমাদের শরীরেও সেইরূপ সাত্ত্বিক ভাবের অভিব্যক্তি হয়। যখন সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ হেতু আমাদের অন্তঃকরণে প্রকাশ, জ্ঞান ও সুখভাবের অনুভব হয়—একরূপ অনাবিল সুখ, স্বাস্থ্য, সচ্ছন্দতা, প্রসন্নতা, বুদ্ধির প্রখরতা, বস্তুজ্ঞান, ধর্ম্মজ্ঞান, কর্ত্তব্যজ্ঞান—এক কথায় সাত্ত্বিক বুদ্ধির বিকাশ হয়, তখন সেই সঙ্গে বাহ্য শরীরেও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব, নীরোগ ভাব, লঘুভাব, স্ফূর্ত্তিভাব প্রকাশ পায়। এই ভাবে অবস্থান করিতে পারিলে, শরীরে সৌন্দর্য্য কান্তি, সৌম্য ভাব ও নির্ম্মল জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। এইরূপে অন্তরের নানারূপ সাত্ত্বিক ভাবের প্রতিচ্ছায়া শরীরে—বিশেষতঃ মুখে ও চক্ষুতে ফুটিয়া উঠে। এইরূপে রাজসিক ও তামসিক ভাবের অথবা কোন দুইটী গুণের মিশ্র ভাবের যুগপৎ অভিব্যক্তি হইলে অন্তরে ও বাহিরের শরীরে তাহা প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বে ১১শ—১৩শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় পাদটীকায় ইহা উল্লিখিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সে যাহা হউক, এইরূপে আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরে যে সকল ত্রিগুণজ ভাবের অভিব্যক্তি হয়—গুণসঙ্গ হেতু বা দেহাত্মাধ্যাস হেতু সেই সকল ভাব যে আমাদেরই—আমরা যে সেই ভাবে ভাবিত হই—সেই ভাব যে আমাদেরই স্বরূপ, এইরূপ জ্ঞানে আমরা বদ্ধ হই। এই জ্ঞান বা অজ্ঞান হেতু আমরা ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারা মোহিত হই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পরিচ্ছিন্ন মায়া হেতু বা প্রকৃতি সংযোগ হেতু সাধারণ ভাবে আমরা দেহী হই, এবং জীব মানুষ, নর বা নারী, হিন্দু, ব্রাহ্মণ, বাঙ্গালী ইত্যাদি ভাবে ক্রমে সীমার পর সীমাবদ্ধ হইয়া শেষে কোন বিশেষ ব্যক্তি ভাব লাভ করি এবং এই বিশেষ ভাবের মধ্যেও আমি বালক, আমি অমুকের পুত্র, আমি দরিদ্র ইত্যাদি ভাবের বিশেষত্বে আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ি। অন্য দিকে নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারা বদ্ধ হইয়া আমি জ্ঞানী, পণ্ডিত, ধার্ম্মিক, বিরাগী, কর্ম্মী, ক্রোধী, অক্ষম, অলস, আমি সুখী, দুঃখী, বিষণ্ণ ইত্যাদি নানারূপ স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবের অভিমান বশে আমরা মোহিত থাকি। ইহাই ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারা আমাদের বন্ধন।

সে যাহা হউক, নানারূপ রাজসিক বা তামসিক ভাব যে আমাদিগকে বদ্ধ করে, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি। রাজসিক ভাব আমাদিগকে সাত্ত্বিক ভাব হইতে প্রচ্যুত করে—আমাদিগকে কামনাবশে,—

কাম—ক্রোধ—রাগ—দ্বেষাদি দ্বারা পরিচালিত করে, কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে ও দুঃখ দেয়। সেইরূপ তামসিক ভাব আমাদিগকে অলস করে, অকর্ম্মণ্য করে, অজ্ঞান-মোহযুক্ত করে, অবসন্ন করে—একরূপ জড়ভাব যুক্ত করে। এই রাজস ও তামস ভাব যে আমাদের বন্ধনের কারণ, আমাদের দুঃখ দৈন্যের কারণ; ইহা এজন্য বুঝিতে পারা যায়। এই ভাব আমার নহে—আমাদের প্রকৃতিজ শরীরে রজস্তমঃ ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র—প্রকৃত আমার সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই; যতদিন সাত্ত্বিকভাব লাভ করিয়া এই জ্ঞানে সিদ্ধ হওয়া না যায়, ততদিন, সেই ভাব আমাদের, এই অভিমান বশে আমরা সেই ভাবে বদ্ধ থাকি। আমরা সাত্ত্বিক জ্ঞানে স্থিত হইলে, এই সকল ভাব যে আমাদের স্বরূপ নহে, ইহা বুঝিতে পারি। কিন্তু সাত্ত্বিক ভাবের দ্বারাও আমরা যে বদ্ধ থাকি—ইহা সহজে বুঝিতে পারি না। বুদ্ধিতে আত্মাধ্যাস সহজে দূর হয় না। সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত জ্ঞান ও সুখ যে আমাদের বন্ধন করে, তাহা সহজে বুঝি না। কিন্তু আমাদের সূক্ষ্ম দেহে—বা বুদ্ধিতে প্রকাশ জ্ঞান ও সুখরূপ যে সাত্ত্বিক ভাবের অভিব্যক্তি হয়, সেই ভাব যে আমারই, এই অনুভবও আমাদের বন্ধনের কারণ, ইহা উক্ত হইয়াছে। আমাদের বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত এই জ্ঞান ও সুখাদি সাত্ত্বিক ভাব—পরিচ্ছিন্ন, সীমাবদ্ধ এবং রজঃ ও তমো ভাবের দ্বারা অল্পাধিক পরিমাণে রঞ্জিত ও আবৃত থাকে, জ্ঞান ও সুখ যে ত্রিগুণভেদে ত্রিবিধ, তাহা পরে উক্ত হইয়াছে (গীতা—১৮।২০-২২, ৩৭।৩৯)। রজঃ তমো ভাব অত্যন্ত ক্ষীণ হওয়ায় সাত্ত্বিক ভাবের বিশেষ বৃদ্ধি হইলেও এবং জ্ঞান ও সুখ সাত্ত্বিক হইলেও অর্থাৎ সাত্ত্বিক ভাব স্বচ্ছ নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হইলেও আমাদের লিঙ্গদেহের বা বুদ্ধির সাত্ত্বিক ভাব যে জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি, তাহা পরিচ্ছিন্ন দেশ—কাল—নিমিত্ত বন্ধনে বদ্ধ থাকে। এজন্য সর্ব্বাবস্থায়ই সাত্ত্বিক ভাব আমাদের বন্ধনের কারণ। আমাদের এই ভাব,—এইরূপ অনুভূতি বা অভিমান যতদিন থাকে, ততদিন মুক্তি হয় না।

যাহা হউক, সাংখ্যদর্শন অনুসারে আমাদের নির্ম্মল, শুদ্ধ, স্বচ্ছ—যথাসম্ভব রজস্তমোমলহীন যে সাত্ত্বিক ভাব,—জ্ঞান তাহাই আমাদের মুক্তির কারণ। "রূপৈঃ" সপ্তভিরেব বধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ। সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ।" (কারিকা, ৬৩)। অর্থাৎ—আমাদের প্রকৃতির বা প্রকৃতিজ বুদ্ধির যে অষ্টবিধ ভাব—জ্ঞান, ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, অজ্ঞান, অধর্ম্ম, অনৈশ্বর্য্য ও অবৈরাগ্য (কারিকা ২৩), ইহাদের মধ্যে শেষ সাতটী ভাগ দ্বারা প্রকৃতি আমাদিগকে বদ্ধ করে,—সংসার ভোগ করায়। আর সাত্ত্বিক বুদ্ধির যে প্রধান ভাব,—জ্ঞান, তাহার দ্বারা প্রকৃতি আমাদিগকে পরম পুরুষার্থ মুক্তি প্রদান করে। কিন্তু সকল জ্ঞান মুক্তির কারণ নহে। নির্ম্মল বুদ্ধিতে যে জ্ঞানের অমানিত্বাদি বিভিন্ন ভাব অভিব্যক্ত হয়, সে সমুদয় ভাবের মধ্যে যাহা উত্তম জ্ঞান ভাব—"তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন," সেই জ্ঞানেই মুক্তি হয়। সাংখ্যমতে এই জ্ঞান প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান। ভগবান্ বলিয়াছেন, ইহাই সর্ব্ব জ্ঞানের মধ্যে উত্তম জ্ঞান। শ্রীচণ্ডীতে আছে এই জ্ঞান—"অহমিতি মমেতি সঙ্গবিচ্যুতিকারকং জ্ঞানম্।" এই জ্ঞানেই যে মুক্তি হয়, ইহা আমাদের সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। এই জ্ঞান সাধনার দ্বারা সিদ্ধ হইলে, তবে

ত্রিগুণবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়—ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়। যিনি নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম ও আত্মবান (গীতা ২।৪৪) তিনিই ত্রিগুণাতীত হইয়া মুক্ত হইতে পারেন।

ত্রিগুণ-মুক্তি :—ত্রিগুণ মুক্তের লক্ষণ কি, কি রূপে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায় ও ত্রিগুণাতীতে পুরুষ কি ভাব প্রাপ্ত হন, তাহা গীতায় যেরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। জীব মধ্যে মানুষই মুক্তির অধিকারী। তাই মানুষ ভগবানের 'অনুগ্রহ স্বর্গ'। মুক্তির জন্য সাধন করিতে হইলে শ্রেষ্ঠ মানবযোনিতে জন্মলাভ করিতে হয়। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, এ জন্মে যোগভ্রষ্ট যোগী সিদ্ধিলাভ জন্য পরজন্মে শুচি ও শ্রীমানের গৃহে অথবা যোগীদের কুলে উৎপন্ন হন (গীতা ৬।৪১-৪২)। শ্রেষ্ঠ মানব উন্নত সাত্ত্বিক প্রকৃতি লাভ করিলে, তবে মুক্তির জন্য উপযুক্ত সাধনার অধিকারী হন। এই মনুষ্যলোক রজঃপ্রধান; এ পৃথিবীমধ্যে অধিকাংশ মানুষই রাজসিক প্রকৃতিসম্পন্ন, অপেক্ষাকৃত অল্প লোক তামসিক প্রকৃতিসম্পন্ন, আর অতি অল্প লোকই সাত্ত্বিক প্রকৃতিসম্পন্ন। প্রকৃতির ক্রম-আপূরণে আমাদের তামসিক বা পশু প্রকৃতি ক্রমে অভিভূত হইয়া রাজসিক প্রকৃতি হয়। আর রাজসিক (তন্ত্রমতে বীর) ভাব ক্রমে অভিভূত হইয়া সাত্ত্বিক বা দেহ ভাবের বিকাশ হয়। (ষোড়শ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে এ তত্ত্ব বিবৃত হইবে) প্রকৃতির ক্রম আপূরণে আমাদের এইরূপে তামসিক ভাব হইতে ক্রমে সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হয় বটে, কিন্তু সাধনার দ্বারা পরিণামে বা সাত্ত্বিক ভাব প্রাপ্তি আরও অপেক্ষাকৃত সত্বর লাভ হইতে পারে। সাধনা না করিলে অনেক স্থলে সাত্ত্বিক প্রকৃতিও অবনত হইয়া রাজসিক প্রকৃতিতে, এমন কি, তামসিক প্রকৃতিতে পরিণত হইতে পারে। পরন্তু শুধু সাত্ত্বিক প্রকৃতি লাভ ও তাহাতে অবস্থান যথেষ্ট নহে। সাত্ত্বিক (বা দৈব) ভাবকে পরাভূত করিয়া রাজসিক ও তামসিক (বা অসুর) ভাব প্রাধান্য লাভ করিতে চেষ্টা করে। এই রাজসিক ও তামসিক ভাবকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও বশীভূত করিতে না পারিলে, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, সাত্ত্বিক ভাবে নিত্য স্থিতি সম্ভব হয় না,—নিত্য সত্ত্বস্থ হওয়া যায় না। এজন্য এ অবস্থায়ও সর্ব্বদা উপযুক্ত সাধনার প্রয়োজন। তামসিক ভাব হইতে এই নিত্য শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব লাভ করিতে হইলে যে বিভিন্ন সাধনার প্রয়োজন, তাহা গীতায় ও অন্যান্য শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। যিনি সাধনার দ্বারা এইরূপ নিত্য-সত্ত্বস্থ হইতে পারেন, তাঁহার শুদ্ধ সাত্ত্বিক জ্ঞানের বা প্রজ্ঞার বিকাশ হয়। তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হন, প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান লাভ করেন, অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্য স্থিত হন এবং আত্মরূপ হইয়া ক্রমে ত্রিগুণাতীত হওয়ায় প্রকৃতিবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রকৃতি অন্য সব ভাব দ্বারা জীবকে বদ্ধ করেন; কেবল শুদ্ধজ্ঞান ভাব দ্বারা তাহাকে মুক্ত করেন। আমরা শ্রীচণ্ডী হইতে জানিতে পারি যে, প্রকৃতি বা মহামায়া প্রসন্না হইয়া মানুষকে এইরূপে মুক্তিপথে লইয়া যান।

অতএব মানুষ এই শুদ্ধ জ্ঞানে অবস্থিত হইলে (স্থিত প্রজ্ঞ) হইলে তবে ত্রিগুণাতীত হইয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারেন। তখন তিনি

দ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থান করেন *। তখন তিনি দৃশ্যের স্বরূপ দেখিতে পান, প্রকৃতির স্বরূপ জানিতে পারেন, প্রকৃতির গুণ ব্যতীত আর কেহ কর্ত্তা নাই—'কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বে' প্রকৃতিই হেতু, ইহা সে দেখিতে পায় এবং আপনাকে সেই প্রকৃতি গুণ হইতে পৃথক ভাবে জানিতে পারে। এই অবস্থায় যদি সেই সিদ্ধ মহাপুরুষ আপনাকে প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জানিয়া, কেবল আত্মভাবে অবস্থান করেন, তবে তিনি অক্ষর ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। আর যদি সেই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাকে নিয়মিত করিয়া লোকরক্ষার্থে প্রবর্ত্তিত হন, তবে তিনি ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন। শাস্ত্রে আছে 'স ঈশো যদ্বশেমায়া, স জীবো যস্ত-য়ার্দ্দিতঃ'। সুতরাং এই ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে প্রকৃতির ঈশ্বর বা নিয়ন্তৃ ভাব পাওয়া যায়। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, পুরুষ সে অবস্থায়—"মদ্ভাবমধিগচ্ছতি।" ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, দেহী যখন দেহসমুদ্ভব এই ত্রিগুণের ভাবকে অতিক্রম করিতে পারে, তখন সে সংসারের জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখ অতিক্রম করিয়া অমরত্ব লাভ করে। (গীতা ১৪।২০)।

* পাতঞ্জল দর্শন হইতে জানা যায় যে, চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ সিদ্ধ হইলে দ্রষ্টৃ স্বরূপে অবস্থান হয়। (পাঃ দঃ ১।২-৩) ইহার ব্যাসভাষ্য হইতে জানা যায় যে, যখন চিত্তের রাজসিক ও তামসিক ভাব নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়। তখন দ্রষ্টা দৃষ্ট হইতে আপনাকে পৃথক স্বরূপে জানিতে পারেন। আর সাত্ত্বিক ভাবও নিরুদ্ধ হইলে অসম্প্র-জ্ঞাত সমাধি অবস্থা হয়। তখন চিত্ত সম্পূর্ণ বৃত্তিহীন হয়। আর বিষয় জ্ঞান থাকে না। তখন কৈবল্য (শক্তি) অবস্থায় জ্ঞায় দ্রষ্টা নির্ধর্ম্মভাবে অবস্থান করেন। দ্রষ্টা দৃষ্টের ধর্ম্ম আর আপনাতে আরোপ করেন না।

সে যাহা হউক, এ পৃথিবীতে কদাচিৎ কোন মানুষ এই ত্রিগুণের বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন। সাধারণতঃ সাধকগণ সাধনা দ্বারা রাজসিক ও তামসিক ভাবকে সাত্ত্বিক ভাবের দ্বারা অভিভূত করিয়া সত্ত্বস্থ থাকিতে পারেন। এই সত্ত্বস্থ অবস্থায় মৃত্যু হইলে, ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন এবং পরজন্মে অপেক্ষাকৃত উন্নত সাত্ত্বিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হন। ইহা আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি। কিন্তু ইহারা সহজে এই সাত্ত্বিক প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। যিনি মুক্ত হইতে পারেন, তিনিই ত্রিগুণমুক্ত হন—তিনিই জীবন্মুক্ত। ভগবান্ বলিয়াছেন, গুণাতীতের লক্ষণ এই যে, তিনি দেহে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক ভাবের মধ্যে কোন ভাবের অভিব্যক্তি কামনা করেন না, অথবা তাহার অভিব্যক্তি হইলেও তিনি তাহাতে দ্বেষ করেন না। অর্থাৎ তিনি তাহাতে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ থাকেন,—সে সকল ভাবের দ্বারা আকৃষ্ট বা বিরক্ত হন না। তাঁহার দেহে সত্ত্ব গুণের প্রকাশ, রজো গুণের প্রবৃত্তি ও তমোগুণের মোহ অভিব্যক্ত হইলে, তিনি কোনরূপে বিচলিত হন না, সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকেন (গীতা ১৪।২২)। তিনি সর্ব্বদা উদাসীনবৎ আসীন থাকেন, গুণের দ্বারা বিচলিত হন না। তিনি সর্ব্বদা নিত্যসত্ত্বস্থ ও আত্মবান্ হইয়া আপনাতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তিনি নির্দ্বন্দ্ব ও নির্যোগক্ষেম, তাঁহার কাছে সুখ দুঃখ সমান, লোষ্ট্র কাঞ্চন সমান, প্রিয় অপ্রিয় সমান, স্তুতি নিন্দা সমান, মান অপমান সমান, মিত্র অরি সমান—তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী। তাঁহার কোন কার্য্য থাকে না—তিনি ঈশ্বরার্থ বা লোকহিতার্থ কর্ম্মে স্বপ্রকৃতিকে নিয়মিত

করিয়াও আপনার নিষ্ক্রিয় স্বরূপে অবস্থান করেন। সর্ব্বাবস্থায় তিনি অচল, স্থির ও ধীর থাকেন (গীতা ১৪।২৩-২৫)। স্থিত-প্রজ্ঞ হইতে না পারিলে, কেহ এ অবস্থা লাভ করিতে পারেন না—কাহারও এই লক্ষণ প্রকাশ পায় না। রজস্তমঃ গুণ সত্ত্বগুণের দ্বারা সম্পূর্ণ পরাজিত ও বশীভূত হইলে, তবে তখন দেহে এই রজস্তমো গুণের বিকাশের ক্ষীণ চেষ্টা হয়—কামক্রোধোদ্ভব বেগ প্রশমিত হয়—মোহ অবসাদ প্রভৃতি দূর হইয়া যায়,—তাহারা সত্ত্ব দ্বারা অভিভূত ও পরাজিত হইয়া পড়ে। তাই সে অবস্থায় সাত্ত্বিক জ্ঞানে তাহার যে নিত্যস্থিতি হয়, তাহা হইতে আর তাহাকে বিচলিত বা প্রচ্যুত হইতে হয় না। এই অবিচলিত ভাবের স্থিতিই ত্রিগুণাতীত অবস্থার লক্ষণ। ইহাই জ্ঞানের পরানিষ্ঠা, ইহাই ব্রহ্মভাবে স্থিতি (গীতা ১৮।৫০)।

ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভূত হইবার যে বিভিন্নরূপ সাধনা হইতে পারে, তাহার মধ্যে সাংখ্য জ্ঞান সাধন পূর্ব্বে ১৯শ শ্লোকে উল্লেখ করিয়া ভগবান্ পরে ২৬শ শ্লোকে ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনার কথা বলিয়াছেন। যিনি অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করেন, তিনিও ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন। কেননা ভগবান্ই অব্যয় অমৃত ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (গীতা ১৪।২৭)। ইহার অর্থ আমরা পূর্ব্বে ২৬-২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত করিয়াছি; এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ভগবান্ এ স্থলে ত্রিগুণাতীত হইবার জন্য অন্য কোনরূপ সাধনার কথা উল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় না যে, এই ত্রিগুণ মুক্তির জন্য আর অন্যরূপ সাধনা নাই। গীতায় যে বিভিন্ন সাধনার কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, সে সকল সাধনার দ্বারাই পরিণামে ত্রিগুণাতীত হইয়া সংসার মুক্ত হওয়া যায়। তবে ভগবান্ যে এস্থলে ভক্তি সাধনার কথা মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার হেতু এই মনে হয় যে, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা। গীতায় যে অক্ষর ব্রহ্মোপাসনা ও ঈশ্বরোপাসনা এই দুই উপাসনার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনা যে শ্রেষ্ঠ, তাহা পূর্ব্বে দ্বাদশ অধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধনা যে ঈশ্বরোপাসনারই অন্তর্গত, তাহা পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৪৫-৪৬ ও ৫৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। আর ধ্যানযোগের মধ্যে ঈশ্বর-ধ্যানযোগ যে শ্রেষ্ঠ ও তাহাই ঈশ্বরোপাসনার অন্তর্গত, তাহা পূর্ব্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৩০-৩১ ও ৪৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। অতএব এ স্থলে ত্রিগুণ মুক্তির জন্য কেন যে কেবল ভক্তিযোগ-সাধনার উল্লেখ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। *

---

* আমরা এস্থলে এ সম্বন্ধে কোন কোন বৈষ্ণব আচার্য্যের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিতে পারি। বল্লভ সম্প্রদায়ের মতে লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে ত্রিগুণ দুই রূপ, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। লৌকিক ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারাই আমরা বদ্ধ হই। কিন্তু অলৌকিক ত্রিগুণজ ভাব আমাদিগকে সেই বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারে। অলৌকিক সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হইলে আমাদের জ্ঞান অন্তর্মুখ হয়, সমুদয় ইন্দ্রিয়দ্বারে ভগবৎ জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়, চিত্তবৃত্তিতে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান প্রকাশিত হয় এবং সেই জ্ঞান লাভের জন্য ভগবৎ-কথার শ্রবণ, মনন ও কীর্ত্তনে রুচি হয়। অলৌকিক রাজসিক ভাবের প্রকাশ হইলে, ভগবৎসেবা ও পূজাদি কর্ম্মে আমাদের প্রবৃত্তি হয়, ঈশ্বরপ্রীতিকামনায় ঈশ্বরাত্মক কর্ম্মে আমরা প্রবর্ত্তিত হই। সেইরূপ অলৌকিক তামস ভাবের প্রকাশ হইলে, আমরা

আরও এক কথা এস্থলে মনে করিতে হইবে।—পূর্ব্বে দশম ও একাদশ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে,—তাঁহাকে যে ভক্ত সতত প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করেন,—তিনি তাঁহাকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। এই বুদ্ধিযোগ দ্বারা তাঁহারা ভগবানে উপগত হন। ভগবান্ তখন তাঁহাদিগকে অনুকম্পা করেন,—তিনি সেই সাধকের আত্মভাবস্থ হইয়া তাঁহাদের জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া, তাঁহাদের অজ্ঞানজ প্রগাঢ় অন্ধকার দূর করেন। এই অজ্ঞানান্ধকার দ্বারাই আমরা ত্রিগুণজ ভাবে বদ্ধ হই—ত্রিগুণে আমাদের সঙ্গ হয়। যখন ভগবানের কৃপায় আমাদের অজ্ঞান দূর হইয়া উত্তম জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তখন এই ত্রিগুণের বন্ধন দূর হইয়া যায়—তখনই আমরা ত্রিগুণ মুক্ত হই। গুটিপোকা যেমন প্রজাপতি হইবার জন্য আপনার 'লালা' দ্বারা কোষ (গুটি) প্রস্তুত করিয়া, তাহার মধ্যে বদ্ধ হয় এবং তাহার মধ্যেই থাকিয়া পরিণত হইয়া শেষে প্রজাপতি হইয়া কোষ ছেদন পূর্ব্বক মুক্ত হয়, সেইরূপ পুরুষ আমরা স্বপ্রকৃতি ত্রিগুণ দ্বারা কোষের পর কোষ (সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ) রচনা রচনা করাইয়া, তাহার মধ্যে বদ্ধ হই; শেষে সেই প্রকৃতিজ কোষের ক্রম-আপূরণে আমরাও আমাদের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সেই ত্রিগুণজ কোষের বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক তাহা হইতে মুক্ত হইয়া যাইতে পারি। কিন্তু এই ত্রিগুণবন্ধন হইতে যে মুক্তি, তাহা শেষ নহে। ইহার পর আমাদের পরম পদ লাভ করিতে হয়। তবে আমাদের পরমপুরুষার্থসিদ্ধ হয়। সে পরম পদ কি? এবং তাহা লাভ করিবার উপায় কি, তাহা পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

ঈশ্বরে পরানুরক্ত হইতে পারি, ভগবৎ প্রেমে মগ্ন হইতে পারি, সখ্যভাব দাস্যভাব ও মধুরভাব প্রভৃতি ভাবরসে আপ্লুত হইতে পারি। ঈশ্বরে ভক্তি বা প্রেমের অভিব্যক্তি কালে স্বেদ পুলক রোমাঞ্চাদির দ্বারা তাহা বাহ্য শরীরে প্রকাশ পায়। এই অলৌকিক তমো ভাবের অভিব্যক্তি কালে লৌকিক ত্রিগুণের ভাব ক্ষীণ হইয়া যায়, বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ বড় থাকে না, এমন কি, তখন অলৌকিক সাত্ত্বিক ও রাজসিক ভাব—ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান ও ঈশ্বরার্থ বাহ্য কর্ম্মে প্রবৃত্তিও আবৃত বা আচ্ছন্ন হয়। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরভজনা দ্বারা এই অলৌকিক ত্রিগুণজ ভাবের অভিব্যক্তি হওয়ায় লৌকিক ত্রিগুণের ভাব ক্রমে অভিভূত হয় বলিয়া ঈশ্বরভজনা আমাদের ত্রিগুণ হইতে মুক্তির এক প্রধান উপায়। সে যাহা হউক, ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা আমাদের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সমুদায় ভাব—আমাদের চিত্তের সমুদায় বৃত্তি ঈশ্বরাভিমুখী করিতে পারিলে যে আমাদের ত্রিগুণজ ভাবের বন্ধন হইতে ক্রমে মুক্তি হইতে পারে, তাহা আমরা সহজেই সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

শেষ কথা—এই ব্যাখ্যায় আমরা এই ত্রিগুণতত্ত্ব বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি,—ইহার কারণ এই যে, এই ত্রিগুণতত্ত্বের উপর গীতোক্ত সর্ব্বোত্তম জ্ঞান আমাদের বন্ধন ও মুক্তিতত্ত্ব বিশেষ ভাবে স্থাপিত আছে। এই জ্ঞানই গীতার তৃতীয় ষট্‌কে ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। এই জ্ঞান আর কোন শাস্ত্রে এইরূপ বিস্তারিত ভাবে উপদিষ্ট হয় নাই; এই জ্ঞানের মূল ত্রিগুণতত্ত্বজ্ঞান। সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের সমন্বয়পূর্ব্বক এই ত্রিগুণের স্বরূপ, তাহাদের ভাব ও ক্রিয়া গীতার ন্যায় আর কোথাও এত স্পষ্টরূপে বিবৃত হয় নাই। পরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভূতগণের বিভিন্ন ভাব এই ত্রিগুণ দ্বারা কিরূপে বিভিন্ন হইয়া অভিব্যক্ত হয়, তাহা বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন —

"বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপোদানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ।"
(১০।৪৫)

এই সকল ভূতভাব, সাত্ত্বিক ভাব, রাজসিক ভাব ও তামসিক ভাব ভেদে ও ইহাদের মধ্যে কোন ভাবের প্রাবল্যে ভিন্ন হইয়া কিরূপে সেই ভাবের অনুরূপ হয়, তাহা এই ত্রিগুণতত্ত্ব বিশেষ ভাবে না জানিলে ঠিক বুঝা যায় না। এই ত্রিগুণতত্ত্ব না জানিলে, জীবের স্বরূপতত্ত্ব, ষোড়শ অধ্যায়ে উক্ত দৈবাসুর প্রকৃতি ভেদে আমাদের বিভাগতত্ত্ব, অধিকারভেদে সাধনাভেদ তত্ত্ব এবং গীতোক্ত জ্ঞানকর্ম্মাদি বিভিন্ন সাধনার সোপান বুঝিতে পারা যায় না। এই ত্রিগুণতত্ত্ব ভালরূপে বুঝিতে না পারিলে পঞ্চদশ অধ্যায়োক্ত সংসারতত্ত্ব, সংসারাতীত পরম পদ প্রাপ্তির উপায় তত্ত্ব, ক্ষর ও অক্ষর পুরুষতত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না এবং এক কথায় সংসারে অভ্যুদয় ও পরিণামে সংসার হইতে মুক্তির বিভিন্ন উপায় বুঝিতে পারা যায় না। তাই এই ত্রিগুণতত্ত্ব এস্থলে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইল।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

পোলাও।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

রাউলেটী সুঁই বুকে বেঁধে,
নব বর্ষ আসিল,
C. I. dর পোয়াবার
দুঃখে দেশটা ভাসিল।

আশা যা তা শুকিয়ে গেল,
রাজার শিকল কসে,
মধ্য রাণীর অটুট বাঁধন
এবার বুঝি খসে ॥

তর্ষে দলি হর্ষে দলি,
এস বর্ষ নূতন,
ভাঙা কুলা মাথায় ধ'রে
তোমায় করি বরণ ॥

আকাশ জুড়ে উড়তেছে চিল
উড়ছে শতেক গৃধিনী,
শ্মশান জুড়ে অট্ট হেসে
বেড়ায় শত প্রেতিনী।

Hydra-headed অভাব গুলা
প্রলয়কারী নর্ত্তনে,
ব্যস্ত আছে দারিদ্র জনের
কোমল হৃদয় কর্ত্তনে।

আমর এসে, লুটছে পরাণ
অশান্তি দেয় খোঁচা
নেকো যিনি হারিয়ে নাসা
হ'য়ে পড়ছেন বোঁচা।

কাপড় গুলি ছিন্ন জীর্ণ,
জুতায় শত তালি,
অভাব মাথা, অন্ন খেয়ে
পেটটা থাকে খালি।

ঋণং কৃত্বা, ঘৃতং পিবেৎ,
তাতেও সাপের চর্ব্বি,
ঘেতো ভোজন করুন তাঁরা
অর্থে যাঁরা গর্ব্বী।

এস এস নূতন বর্ষ
মুখে তোমার নাইক হাসি,
চ'খে তোমার জ্বলছে অনল
গায়ে মাখান ভস্মরাশি।

*   *   *

প্রভু হে প্রভু হে তোমার চপলা
তোমার সাধের দামিনী,
খবর জোগায় Cable টানিয়া
সারাটী দিবস যামিনী,
তোমার সাধের দামিনী।

ঘোরায় ব্যজন, আলো দেয় ঢেলে
দূরেতে সরায় আঁধারে,
অবাক সবাই কীর্ত্তি দেখিয়া
দামিনী দুয়ারে বাঁধা রে।

আমাদের—
সিদ্ধ যাহারা, সাধক যাহারা,
দামিনীরে প্রাণে ধরিয়া,
দীপ্ত করেন বিশ্ব পরাণ,
আলো মাখা সুধা ঢালিয়া।

তোমরা উড়াও রঙ্গিন কেতন
দম্ভে বসাও rastrumএ
আপন কীর্ত্তি জাহির কর
গগন ভেদি সপ্তমে।

গর্ব্বে দড় তোমরা বড়
আমরা চাহি আকাশে,
উচ্চতমের কীর্ত্তি দেখি
তারার মাঝে বিকাশে,

গুঁতাটী খাইয়া জীর্ণ দেহ,
জীর্ণ বস্ত্র বর্জ্জিয়া,
পশু ভয় হ'তে দূরে যেতে চাই,
শ্যামল বিশ্বে ত্যজিয়া।

এ পারেতে Democles
খড়্গা তুলে সদাই আছে,
ও পারেতে কখন যাব
কখন যাব মায়ের কাছে।

ক্ষীণ সন্ধ্যায়, মলিন আভায়
মিশিয়ে দিয়ে প্রাণ,
কেবল ডাকি মধুসূদন!
কর পরিত্রাণ।

এম্নি ক'রে এম্নি ক'রে
মানুষ হয়ে হায়,
অক্ষোভেতে মানুষের
Vitality খায়।

দয়াল প্রভো নিদয় প্রভো
করুন প্রভো কোন খানে,
ভাসিও না, আর ডুবাও ডুবাও
অকূল সিন্ধুর মাঝখানে।

যেথা পশুবল করে না প্রভুত্ব
সেইখানে যেতে চাই,
প্রণব! অচ্যুত! হে শ্যাম সুন্দর
দেও দেও দেও ঠাঁই।

ত্রিবিংশ বসন্ত কালের বক্ষে
হইয়া গিয়াছে লীন,
আর কেন এই জীবন আহব
বিক্ষত দেহ ক্ষীণ।

ক্ষত ব্যথা যত বীণা হ'য়ে যেন
কাকলী করিয়া তোমাকে ডাকে,
প্রাণ যেন দেব আশা মূর্ত্তি ধরি
তোমার আশায় বসিয়া থাকে।

মেঘভরা নিশি না বহে পবন
নিদ্রায় জগৎ গিয়াছে ভরি,
এস এস নাথ এস হে সুন্দর
কর আলিঙ্গন ব্রজের হরি।

আমার সুমতি আশীর্ব্বাদ ছানি
ধবল দ্বীপে দেও হে ঢালি,
মানুষতার দিব্য আলোক
বিলাস গৃহে দেও হে জ্বালি।

Astolpho বিষাণ তাহার,
Bureaucratদের দেহে উপহার
গভীর নির্ঘোষে বাজিছে বিষাণ
প্রকম্পিত করি সহস্র পরাণ,
কেন গো জিন্না কাঁদিয়া আকুল
গাঁন্ধি মহাশয় কেন বা ব্যাকুল
ক্ষোভ পরিতাপ কি হবে করিয়া
দম্ভ আজিকে উঠেছে জাগিয়া
পেতে দাও বুক দর্পে বিদলিয়া
জেতায় আজিকে যাউক দলিয়া।

অসভ্য ভারতে জ্ঞানের আলোক
ঢালিয়া দিতেছে জেতা

অনুভূতি-মাখা Chelmsford আজ
তাই আমাদের নেতা।

Sinha হাউই ইথর ভেদি
শনৈশ্চরে যায় চলে,
আনন্দেতে ভারত ভূমি,
হাস্‌ছে কেমন খলখলে।

ভাইনাগিরি পীরের কাছে
ছিঁন্নি মানে গোপনে,
Et Tu Brute K. G. Gupta
বগল বাজান সঘনে।

এও তো ভাবি তাওতো ভাবি
হ'ল এটা কি যে,
ভাব্‌তে গিয়ে সুখের কথা
নয়ন আসে ভিজে।

মণ্টেগু যতন করি রামধনু খানি,
নিঙাড়িয়া মধুরিমা দিল সবে আনি
উদ্ভাসিল আর্য্যক্ষেত্র, তরুলতা শিরে
জ্বলিল সহস্র মণি ; আনন্দ মদিরে
ডুবিল প্রকৃতিবর্গ ধন্য ধন্য রবে,
পাইল নূতন কীর্ত্তি আর্য্যসুত সবে।

ফুৎকারে নেবে, আশার দেউটী
সুখের স্বপন যায় ভেঙ্গে,
দাম ফুরাইলে দারিদ জনায়
দ্বারে দ্বারে ঘোরে ভিখ্ মেঙে।

লিখছে ভাল ইতিহাসটা
আমাদের ঐ দুর্গাদাসে
জল থই থই হাঁস—চৈ চৈ
ডেঙ্গার উপর কীর্ত্তি ভাসে।

পড়িয়ে বটে লিখিয়ে বটে,
কীর্ত্তি ভাতি বিশ্বে রটে,
'নিখিল' আজিকে নীরব রয়েছে
সুহৃদ 'অক্ষয়' অবাক্ হয়েছে,
ভাবে 'যদুনাথ' ফেলে গেল মন্
রাতারাতি আজ গ'ড়ে গেল মন,
জ্ঞানের কোহল নয়নে লাগায়ে
দুর্গাদাসেরে তুলিল মাতায়ে,
তুলিল মাতায়ে তুলিল জাগায়ে
যশের ক্যানটা ঢেলে দিল গায়ে।

নাট্য প্রবীণ 'অমৃত রতন'
বলে 'লাহিড়ী'র সার্থক জীবন
গবেষণা-মাঝে স্বর্ণ রসায়ন
কিবা জল জল জলে রে।

গবেষণা বালা কোকিয়ে বেড়ায়,
'উদাম' চাপিয়ে সোণার ভেলায়
আখি বিখি করি করে অন্বেষণ,
আর্য্যের কীর্ত্তি সোণার স্বপন,
ধন্য ধন্য লোক বলে রে।

আহা মরি মরি কিবা ভাগ্যধর
গবেষণা যার হৃদয় ভিতর
বসে বসে র'চে বিবাহ-বাসর
দিবারাতি প্রতি পলে রে।

মর্ম্মবাণীর পাতে পাতে
পোকার কামড় দেখতে পাই,
ভাব সাগরের 'প্রমথ' রোহিত
এলোমেলো দিচ্ছে ঘাই।

রূপনগরের মানসী তার
ভাঙ্গা নূপুর দিয়ে পায়,
রাজার কাছে নাকি সুরে
তালকাটা গান হেসে গায়।

খ্যাতিটা তার menbus
সারারাতি বেড়ায় ঘুরে,
বিভীষিকা দেখায় এসে
বুড়ো কবির মধুপুরে।

দেখাও রশ্মি হও যশস্বী,
'জলধরে' দেখ্‌গে তুড়ী
কাঁঠাল যে সে কাঁঠাল হবে
বুকে ধরি ভুঁতুড়ী।

ভেবেছিলাম 'পদ্মা' গাঙ্গে
আস্‌বে বুঝি উদার যোয়ার,
চরের উপর চর পড়িল
করে নদীর শতেক খোয়ার।

'জয় পরাজয়' ও কিছু নয়
মলাট দেখে হাউড়ে পাঠক,
দশের সামনে পড়তে থাকে
মিষ্ট বলে দুষ্ট নাটক।

Words are like leares and where
they most abound
Much fruit of sense beneath it
really found.

পুষ্পহীন পত্রহীন
স্থাণুর মত আমড়া,
ধর্ম্মেও ফল সত্ত্বা বিহীন
শুধুই আঁটি চামড়া।

মর্ম্মবাণীর কুঞ্জে এখন
'সত্য' দোলে হিন্দোলায়,
ভাবের তামাক টান্‌ছে বসে
গিল্‌টী করা আলবোলায়।

'যমুনাতে' ভাসিয়ে গা
পদ্ম মধু পান কোরে ;
'যতীন' এখন শান্তি সুখে
বিশ্বপাতার গান ধ'রে।

'অমরনাথের' কলঙ্কটা
গঙ্গাজলে যাক ধুয়ে,
বিনয় এসে কবির অঙ্গ
স্নেহ ভরে যাক্ ছুঁয়ে।

দেমাক ছিল কণ্ঠভরা,
সাজলে শেষে রত্নাকর,
Unequal combination
নহে কো কভু ক্ষেমাকর।

হালকা লেখক 'ভারতবর্ষে'
দলিয়া যাচ্ছে ফণীর বুক,
আশা ছুঁড়ী অভিমানে
কোণে বস্‌ছে ঢেকে মুখ।

গগ্‌গে থাকে নঙ্গ কথা
চুণ্ডে চুমার রেখা,
কৌমারেতে কামের কামান,
শুধুই পাচ্ছে শেখা।

নেকীর পোলা নায়ক হ'য়ে
চাপছে বুকে 'অশোকায়'
চুম্বনেরি উৎপীড়নে
লজ্জা কেঁদে দূরে যায়।

কেবল কেবল ভোগ লালসা
বল্‌গা খোলা বাসনা,
প্রসাধিতা, প্রসাধনে
সুখের করেন কামনা।

নাগর করেন নাগরীরে
বুকে ধ'রে যতন,
স্বার্থভরা যুগল চিত্ত
বিলাস সুখে মগন।

ভাইয়ের বুকে ভাইয়ের তরে
আসে না আর বেদনা,
আত্ম সুখে মগ্ন সবে
গর্ব্বে নারী মগনা।

সমাজ সমাজ ভণ্ডে পূর্ণ
শৃঙ্খলা তার কোথাও নাই,
মিথ্যা দিয়া সত্য গড়া
আবিল সত্য সর্ব্ব ঠাঁই।

বাণীর পূজক সাধনা না হ'তে
সিদ্ধি কামনা করে,
যশের লাগিয়া কত না বিনয়ে
ঢাকীর চরণ ধরে।

আপনার গান আপনি গাহিয়া
হতেছে সমাজে বড়,
দেখে এই সব পিশাচ আচার
আঁখি ঝরে নিরন্তর।

অতিথেরে আর যতনে সেবিতে
চাহে না কাহারো মন,
বিধবার লাগি এ আর্য্য সমাজে
নহে কেহ উচাটন।

ষোড়শী কন্যা বিধবা সাজিয়া
বলয় ভাঙ্গিয়া সিঁদূর মুছিয়া
পড়ুক সাবিত্রী কথা,
পতির ধ্যায়ানে হইয়ে মগন
দেখুক বিধবা সোণার স্বপন
ঘুচাক মনের ব্যথা।

আর-

বুড়ো শালিক তৃতীয় বারের
বালিকা বধূটী ল'য়ে,
হেসে হেসে হেসে রভসে ভরষে
থাকুক মত্ত হ'য়ে।

চুলেতে কলপ মোচেতে কলপ
স্খলিত দন্তে art খেলে,
অতনু অবশ যুগল নয়ন
অলস ভাবেতে রয় মেলে।

বিধবা তনয়া খেতেছে তিক্ত
গোপন রোদনে কপোল সিক্ত
মাথার উপর ব্রহ্মচর্য্য
ভুমণ দশটী সের,
কুবির জনক তন্বী শ্যামার
ধ্যায়ানে মগন স্নিগ্ধ শোভার
পান করেন রূপসী বালার
অধর মদিরা ঢের।

শিক্ষা কোথায় দীক্ষা কোথায়
আলোকে হৃদয় ফোটে কার ?
শিক্ষিত হইয়ে কেমন করিয়ে
দ্যাখে তবে হেন ব্যভিচার ?

সমাজে শোভন সমাজে মোহন
যদি হে করিতে চাও,
আপন পরাণ আপন রক্ত
যতনে ঢালিয়া দাও।

তাকিয়ে থাকার কাজ নয় ভাই
তাকিয়ে থাকার কাজ,
পাপ দেখে যে নীরব থাকে
সেও ডুবে যায় পাপের পাকে
তার মাথাতে হয় পতিত
অমঙ্গলের বাজ,
তাকিয়ে থাকার কাজ নয় ভাই
তাকিয়ে থাকার কাজ।

ভাঙ্গা দেওয়াল ভেঙ্গে ফ্যাল
লাগাও লাথি বুকে,
সুবুদ্ধি যা করতে বলে,
প্রকাশ কর মুখে।

মনু ছিলেন, ছিলেন মনু
হাতীর দলের হোতা,
তার ব্যবস্থা চলবে না আর
তেমন শক্তি কোথা ?

সংস্কারের আবেষ্টনে
বদ্ধ আর ভাই থাকিস্ নে,
আর্য্য সুত বলে আর ভাই
অভিমানটা করিস্ নে।

সমাজ মাঝারে লাখ ব্যভিচার
(যার) রক্ত নাহিকো উথলে,
ভেড়ার ভেড়া গাধার গাধা
তিনিই ইহ ভূতলে।

সবাই মেলে কোমর বেঁধে
বিবেক বেটায় চেতিয়ে তোল,
শক্তি এসে মধুর হেসে
তখন তোদের দেবে কোল।

সারল্য মা দিন দিন দিন
জগৎ ছেড়ে যাচ্ছে সরে,
ভণ্ডামিতে নিখিল বিশ্ব
নহু নহু উঠ্‌ছে ভরে।

মিথ্যাটারে করছে সত্য
কেমন একটা রং দিয়ে,
ভণ্ড চরণ করছে পূজা
হর্ষে তারে বন্দিয়ে।

বাবার বাবা দাদা মশায়
ছিলেন যখন জীয়ে,
পুলক দিয়ে সময় তখন
রাখ্‌ত ভরে হিয়ে।

অভাব তখন বালক ছিল
ছিল না তার দাপ,
দিত না সে গরীব দেখে
রুদ্র অভিশাপ।

প্রীতি তখন হেসে হেসে
চাইত সবার দিকে,
ভুলিয়ে দিত সরলতা
আপন হৃদয়টীকে।

বহিত তখন তপোবন-
পরশ করা হাওয়া,
ভালবাসার মাঝে ছিল
ভালবাসার দাওয়া।

সখা ছিল বধূর সতীন —
সতীন ছিল বঁধু,
রসোদ্গারে প্রতি নিশা
ঢেলে দিত মধু।

কোথায় তারা, কোথায় সে দিন,
কোথায় সে সব প্রাণ,
আজকে তাদের স্মরণ করে
শরীর বেপমান।

মনে হয় না কোথায় যেন
ফেলিয়াছি পুলকে --
পূর্ব্ব কথা মনে হ'লে
চম্‌কে উঠি পলকে।

বন্ধু এখন উন্নত গ্রীম,
Power-loving হাকিম হুকীম,
বন্ধু এখন অতি চতুর,
লম্বা-কোঁচা রায়বাহাদুর,

বন্ধু এখন দু-হাজারী
আপন গর্ব্বে আপনি ভারী,
বন্ধু এখন Bar-at-law
কুটীল কথায় করেন থঃ,
বন্ধু ঘেরা আছি বটে
বন্ধু কেহ নয়,
সাধক তারা স্বার্থ মন্ত্রে,
দীক্ষিত সব ইতর তন্ত্রে,
সখিত্বেরে হত্যা কর্ত্তে
নাহিকো কারও ভয়,
বন্ধু আমার আশে পাশে
বন্ধু কেহ নয়।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

৺বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।*

জন্ম—রাগদি—ফরিদপুর, ১লা বৈশাখ, ১২৫৮।

মৃত্যু—কলিকাতা, ২৭শে চৈত্র, ১৩২৫।

(১)

এমন একজন লোক, ২৭শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার, দেহরক্ষা করিয়াছেন, বিশ্বাসে যিনি অটল, কর্ম্মে যিনি উদাসীন, নির্ভরে যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সাধনায় যিনি নিত্যসিদ্ধ। বড় বড় কথা বলা তাঁহার স্বভাব ছিল না, ঘসিয়া মাজিয়া চলা ফেরা করা অভ্যাস ছিল না, অসভ্যের ন্যায় চলিতেন, ফিরিতেন, বলিতেন; কিন্তু তাঁহার ভিতরে ছিল অহেতুকী প্রেমের একটী স্বর্গীয় চিত্র—যাহার আকর্ষণে কত কত বন্ধু মোহিত হইতেন। এই এক প্রেমের বলে ডঙ্কা মারিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন। এখন নিভৃতে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি, কি অমূল্য জিনিসই হারাইলাম !!

(২)

তিনি সুদীর্ঘ ৬৭ বৎসর সংসারে বাস করিয়াছিলেন। ফরিদপুরের অধীন রাগদি গ্রামে জন্ম; বাল্যে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে সামান্য অধ্যয়ন, বাল্যে পিতৃ মাতৃ হীন হইয়া জলপাইগুড়িতে গমন। সেখানে ট্রেনিং স্কুলে পড়েন এবং লক্ষ্মীমণিকে লইয়া সেখানেই যাইয়া পণ্ডিতী করেন। এই গেল জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, নিতম্বিনীকে লইয়া কলিকাতায় ও আগরতলায়। তৃতীয় পরিচ্ছেদ, কালীতারার সহিত আগরতলায় এবং কলিকাতায়। স্কুল পণ্ডিতীতে জীবন আরম্ভ, সাহিত্য ও ব্রাহ্মসমাজের সেবায় জীবন উদ্বুদ্ধ, শেষ জীবন অতিবাহিত, উদাসীনতার ক্রোড়ে। নিতম্বিনীর ৪টী পুত্র ও ৩টী কন্যা জন্মে। লক্ষ্মীমণি ও কালীতারার সন্তান হয় নাই। ৪টী পুত্রের মধ্যে ২টী জীবিত, ৩টী কন্যাই

---

* ৭ই বৈশাখ ১৩২৬, আদ্যশ্রাদ্ধোপলক্ষে পঠিত।

জীবিতা আছেন। জলপাইগুড়ী থাকার সময় ৺চণ্ডীচরণ সেন ও শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষ, হরেন্দ্র-দামোদর-জেলালুদ্দিন প্রভৃতি মহাশয়দের সহিত তাঁহার বিশেষ সখ্যতা জন্মে। যৌবনে অত্যুদার-চরিত্রের লোক ছিলেন। লক্ষ্মীমণিকে কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি ঢাকা নগরীতে উদ্ধার করেন। তাঁহাকে কলিকাতা আনয়ন করিলে কেহই তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই। বিষ্ণুচরণ জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। পরমদয়ালু ৺নগেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়গণ, লক্ষ্মীমণিকে, পিতৃস্থানীয় হইয়া, আশ্রয় দিয়াছিলেন। বাবু আনন্দচন্দ্র ...নের লক্ষ্মীমণি-চরিত প্রকাশিত হইয়াছে, সে এক অত্যুজ্জ্বল কাহিনী। বিষ্ণুচরণের মহানুভব চিত্তের পরিচয় এই ঘটনায় বিশেষরূপে পাওয়া যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই লক্ষ্মীমণি দেহরক্ষা করেন। বাল-বিধবা নিতম্বিনী ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আশ্রয়ে পালিতা—বিষ্ণুচরণ তাঁহাকে বিবাহ করিয়াও উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। নিতম্বিনীর জীবনচরিত লিখিত হয় নাই, কিন্তু যিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনিই তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্য এবং অকৃত্রিম ভালবাসার গুণে মোহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃভাব কন্যাদিগের মধ্যে বিশেষ ভাবে ফুটিয়াছে। বিষ্ণুচরণের বিশেষত্ব ক্ষমাময় এবং জ্যোতির্ম্ময়ে প্রকটিত। বহুপত্নীক বিষ্ণুচরণ দাম্পত্য জীবনের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা অবহেলার জিনিস নয়।

(৩)

দাম্পত্য জীবনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি নগেন্দ্র আদিনাথ-নবদ্বীপ-দেবীপ্রসন্ন-কেদারনাথ প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক হওয়ার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। সে ঘটনা তাঁহার নিভৃত বাসের আয়োজন করিয়া চলিয়া যায়। সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ নগেন্দ্রনাথকে তখনই প্রচারক বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হন, নবদ্বীপ ও দেবীপ্রসন্নকে এক বৎসর প্রোবেসনে থাকিতে বলেন, আর সকলকে শিক্ষাধীন থাকিতে আদেশ করেন! এমন যে চরিত্রের উজ্জ্বল রত্ন আদিনাথ, তাঁহাকেও শিক্ষাধীন থাকিতে আদেশ করেন। এই বন্ধু-সঙ্ঘ সে আদেশ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই। নবদ্বীপচন্দ্র ও নগেন্দ্রনাথ রহিলেন, আর সকলে নিরাশ হইয়া আপন আপন পথে চলিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। এই বন্ধু-সঙ্ঘ একত্রে উপাসনা, আলোচনা, বক্তৃতা, ও সংযম-ব্রত পালন করিতেন। এইরূপ সাধনায় বন্ধুগণ সকলেই উপকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যেন হরিহর-আত্মা ছিলেন। নবদ্বীপচন্দ্র ও আদিনাথকে শ্রদ্ধা করে না, ব্রাহ্মসমাজে এমন লোক নাই। এই নবদ্বীপচন্দ্রকেও প্রোবেসনে থাকিতে হইয়াছিল! এই বন্ধু-সঙ্ঘের ইতিহাস বিশেষরূপে লিখিত হইলে এক আশ্চর্য্য পুস্তক হইবে। নগেন্দ্র-নবদ্বীপকে বাদ দিয়া বিষ্ণুচরণ আমাদের সহিত মিলিত হইয়া আসাম ও উৎকল ভ্রমণ করেন। এবং বঙ্গেরও অনেকানেক স্থান পরিদর্শন করেন। সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার বক্তৃতা করিবার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। মৌনীবাবার পুণ্যভূমি আজুদিয়াতে যে দিন আমরা প্রহৃত হইয়াছিলাম, সে দিন তিনি সেখানে ছিলেন। তিনিও সহাস্য বদনে আমা-

দের সহিত অপমান সহ্য করেন। ধৈর্য্যের তাহা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাঙ্গালা ভাষার উপর তাঁহার খুব দখল ছিল। এই সময়ে 'জীবন-প্রদীপ' নামক সুন্দর উপন্যাস প্রকাশিত হয়। নব্যভারতে তিনি যে সকল সুচিন্তা-পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া অনেকেই তৃপ্তি লাভ করিতেন। নব্যভারত-বন্ধু-সঙ্ঘের তিনি অন্যতর অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ছিলেন। বহু বন্ধু নেব্যভারত-সঙ্ঘ হইতে উপাধি পাইয়াছিলেন,বিষ্ণুচরণ তর্কাগ্নি উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার তর্ক করিবার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। তাঁহার সহিত তর্কে কেহই পারিতেন না, সকলকেই তর্কে পরাস্ত করিতেন—যেন সকলকে ভস্ম করিয়া দিতেন; এজন্যই তর্কাগ্নি উপাধি পান। নিতম্বিনীর স্বর্গারোহণের পর আর এক পরিচ্ছেদ আরম্ভ হয়, এই সময় হইতেই বিষ্ণুচরণ নিষ্প্রভ হন। নিতম্বিনীর পুত্র কন্যাদিগকে সাধ্বী কমলকামিনী লালন পালন করিতে লাগিলেন—বিষ্ণুচরণ ঔদাসীন্যে আত্ম সমর্পণ করিলেন। তৎপর বেঙ্গল প্রেসে কিছু দিন কাজ করেন বটে, কিন্তু পূর্ব্ব-বন্ধু-সঙ্ঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। পুত্র কন্যাদিগকে বলিতেন, তোমাদের পিতা মাতা আনন্দ-আশ্রমে আছেন। বাস্তবিকও কমলকামিনী বিষ্ণুচরণের পুত্র কন্যাদিগকে যেরূপ ভাবে লালন পালন করিয়া ৩টী মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন, তাহা আদর্শ ঘটনা। সুধাময়ের আকস্মিক মৃত্যুতে কমলকামিনীর দেহ ভাঙ্গিয়া পড়ে—দুই মাসের মধ্যে তিনিও দেহত্যাগ করেন। বিষ্ণুচরণেরও হৃদয় মন ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই সময় হইতে মহা-বৈরাগ্যে তিনি আত্ম সমর্পণ করেন। সে কঠোর বৈরাগ্য সাধন দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া যাইতাম।

(৪)

শেষ স্ত্রী-গ্রহণের পর তিনি অনেক বন্ধুর অপ্রিয় হন;—বিশেষতঃ আমরা তাঁহার এ কার্য্য অনুমোদন করি নাই। শুধু অনুমোদন করি নাই, তাহা নহে; এজন্য অনেক তিরস্কার করিয়াছি, অনেক দুর্ব্ব্যবহার পর্য্যন্ত করিয়াছি। পাড়ায় আসিতে কেহ কেহ আপত্তি করিলে শঙ্কর-ঘোষের লেনস্থ নব্যভারত-প্রেসের বাড়ীতে পর্য্যন্ত ভাত পাঠাইয়া দিতাম! কিন্তু তিনি এক দিনের জন্যও তীব্র ব্যবহারে বিরক্ত হন নাই,বা ভালবাসিতে ক্ষান্ত হন নাই। কন্যাদের বিবাহের সময় রেজেষ্ট্রারের নিকট সম্মতি জ্ঞাপনের জন্য তাঁহার প্রয়োজন হইত, কিন্তু তৎপরই অন্য ঘরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতেন। শেষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে হাত করিয়া তিনি সমাজের সভ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তবু সকলের সম্মান পান নাই। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বেও নব্যভারত আফিসে বসিয়া অন্য বন্ধুদিগকে তাঁহার সম্মুখে বলিয়াছিলাম, "সংযম ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না; চরিত্র ভিন্ন সবই বৃথা।" তিনি নীরবে বসিয়া সমস্ত শুনিয়াছিলেন। তিনি ভুবনেশ্বর হইতে খণ্ডগিরি ভ্রমণ কালে দারুণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন, জ্বর আরোগ্য হইবে। হইয়াছিলও তাহাই। তিনি প্রার্থনাবাদী বিশ্বাসী ব্যক্তি ছিলেন—এরূপ জ্বলন্ত বিশ্বাস অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখা যায়। তিনি ব্রাহ্মসমাজকে এতই ভালবাসিতেন যে, নিগৃহীত হইয়াও ব্রাহ্মসমাজকে পরিত্যাগ করেন নাই। তদীয় পত্নী নিতম্বিনী নগর-

সঙ্কীর্ত্তনের সময় পতাকা-হস্তে কীর্ত্তনদলের সম্মুখে ২ চলিতেন এবং উপাসনার সময় সমাজের রেলিংয়ের বাহিরে বসিতেন, বিষ্ণুবাবু কখনও তাহার প্রতিরোধ করেন নাই। তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যে পত্নী আকৃষ্টা ছিলেন, তিনিও পত্নীর চরিত্রে মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যে জমাট অঙ্গাঙ্গিভাব দেখিয়াছিলাম, তাহা এজগতে বড় বেশী দেখা যায় নাই। তিনি দাম্পত্য প্রেমে মহা সুখী অমানুষী ব্যক্তি ছিলেন। নিতম্বিনীকে বিবাহ করার পূর্ব্বে তাঁহার পীড়িতা ভগ্নীর সেবা শুশ্রূষার জন্য যে ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা সচরাচর দেখা যায় নাই। এই সময়ে বন্ধুবর ৺কালীপ্রসন্ন দত্ত মহাশয় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ৺কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, ৺কালীপ্রসন্ন দত্ত, ৺রামগোপাল বিশ্বাস, ৺প্যারীমোহন রায়, ৺বিপিনবিহারী রায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন। ফরিদপুরের ব্রাহ্মগণ সকলেই সেই সময়ে একাত্মক হইয়াছিলেন। মাণিকদহের ইহা মহা-কীর্ত্তির সময়। এখন অনেকেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মাণিকদহের সে সময়ের জমাট ভাব আর ফিরিয়া আসিবে না। মাণিকদহের শারদীয় উৎসব বুঝি বা চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়াছে। তাঁহার বহু বন্ধু ছিল, কিন্তু আজ অনেকেই স্বর্গে। বিধাতার মহা ইচ্ছাই দিন দিন পূর্ণ হইতেছে।

(৫)

বিষ্ণুচরণের জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইবার নয়। আমাদের সহিত মিলিত হইয়া ১২৯১ সালে আসাম, ১২৯৬ সালে উৎকল এবং অন্যান্য সময়ে বঙ্গের বহু দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, সে সব কাহিনী বিবৃত করিলে এক একখানি বিস্তৃত পুস্তক হয়। ধর্ম্মপ্রচার-কল্পে ও ফরিদপুর সুহৃদ্ সভার কার্য্যোপলক্ষে বহু গ্রাম পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ফরিদপুরের অধীন রাগদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, বাল্যেই পিতৃমাতৃহীন হন, এক ভগ্নী ভিন্ন আর আত্মীয়ের কথা শুনি নাই। অবস্থা-পীড়নে জলপাইগুড়ী যান। সেখানে বাঙ্গালা অধ্যয়ন করেন। হরেন্দ্র-দামোদর-জেলাল মেঞার সাহায্যে ট্রেনিং স্কুলে পাঠ সমাপ্ত করেন। এই ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তাঁহার জীবনে যে কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল; তাহার ইতিহাস নানা হৃদয়-বিদারক ঘটনায় পূর্ণ। সে সকল দুঃখ কষ্টের ইতিহাস বিবৃত করিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হয়। সে অবসর ইহা নয়। এই মাত্র সংক্ষেপে বলিতেছি, ভাল-মন্দ-জড়িত বিষ্ণুচরণ-জীবনী এক সুখপাঠ্য অতি-আশ্চর্য্য-কাহিনী।

তাঁহার সাহিত্য-সেবাও উপেক্ষার জিনিস নয়। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার ছিল। তিনি অতি সুন্দর বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন। যাঁহারা তাঁহার পূর্ব্বকার লেখা পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বিষ্ণুচরণের বাঙ্গালা খাঁটী বাঙ্গালা ছিল। তিনি ইংরাজি জানিতেন না, তিনি লোকমুখে শুনিয়া ২ গোবিন্দচন্দ্র দাসের ন্যায়, সুন্দর ইংরাজী যোজনা করিতে পারিতেন। গোবিন্দচন্দ্র দাস ও তিনি অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। দুই জনই অত্যল্প কালের মধ্যে দেহরক্ষা করিলেন, ইহা বড়ই দুঃখের কথা।

বিষ্ণুচরণের তিরোধানে আমাদের একাঙ্গ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সুখে দুঃখে

উভয় উভয়ের সহায়, উভয় উভয়ের আশ্রয়, উভয় উভয়ের বন্ধু। একজন আজ স্বর্গে—আমরা মর্ত্ত্যে বসিয়া পড়িয়া পড়িয়া শুধু চক্ষের জল ফেলিতেছি। হায়, কি হইল !!

বিষ্ণুচরণের চরিত্র নির্দ্দোষ ছিল, এমন কথা আমরা বলি না। তাঁহার সংযম-বিচ্যুতি ঘটায় বন্ধু-সঙ্ঘের মুখে চূণকালী পড়িয়াছিল। তবে নির্ভয়ে লিখিতেছি, তিনি পত্নীপ্রেমে অদ্বিতীয়, বন্ধু প্রেমে অসাধারণ, দেশভক্তিতে অতুলনীয়, ঈশ্বর-বিশ্বাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে অনন্যসাধারণ। তাঁহার তিরোধানে বঙ্গ-দেশের যে অভাব হইল, তাহার পূরণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার জীবন-ব্যাপী তপস্যা তদীয় চরিত্রে যে বিশেষত্ব অঙ্কিত করিয়াছিল, তাহা এই যে, যিনি তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, তিনিই তাঁহার বন্ধু হইতেন। আগরতলার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর পিতার ন্যায় ভালবাসিতেন এবং ৺চণ্ডীচরণ সেনের পত্নী তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন। অসংখ্য সাধু ভক্ত তাঁহার স্বভাবের গুণে তাঁহাকে ভাল-বাসিতেন। এরূপ অমায়িক স্বভাবের লোক বড়ই বিরল। অকৃত্রিমতার তিনি নেতা ছিলেন, পরনিন্দা পরচর্চ্চা তাঁহার মনঃপূত ছিল না, তিনি নিন্দিত ও নির্য্যাতিত হইয়াও কাহারও নিন্দা করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। তিনি বন্ধু-সঙ্ঘের নিয়মাবলী বিশেষ ভাবে শেষ পর্য্যন্ত পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গুণের পক্ষপাতী অনেক বন্ধু বান্ধব আজ চক্ষের জল ফেলিতেছেন। তাঁহার নিরাড়ম্বর আত্মা বিধাতার অনন্ত ধামে সতী নিতম্বিনীর সহিত মিলিত হইয়া অক্ষয় শান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নরহরি ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অবতীর্ণ হন। তাঁহার ভক্ত ও পারিষদ দুই জন ছিলেন, প্রথম গদাধর, দ্বিতীয় নরহরি ঠাকুর। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা নরহরি ঠাকুরের জীবনী বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব। কেন নরহরি ঠাকুরের স্থান চৈতন্য ভক্ত-গণের মধ্যে এত উচ্চে, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা পাইব। নরহরি ঠাকুরের নাম নরহরি সরকার। ইনি বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী শ্রীখণ্ড গ্রামে পবিত্র ও প্রসিদ্ধ বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। নরহরি ঠাকুর ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুর বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজের দুই জন প্রসিদ্ধ লোক ও পদকর্ত্তা। নরহরি সরকার মহা-প্রভুর সমসাময়িক ভক্ত ও পারিষদ্ ছিলেন। সুতরাং ইনি ১৪৮৫ খ্রীঃ বা তাহার কিছু অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীখণ্ড সমাজ রাঢ়ীয় বৈদ্য সমাজের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই সমাজের বৈদ্যগণকে সকলেই প্রভূত সম্মান করিয়া থাকেন। শ্রীখণ্ড সমাজ যে বৈদ্যজাতির মহা গৌরবের স্থান, তাহা আমরা মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিকের চন্দ্রপ্রভা পাঠে অবগত হই। অদ্যাপিও শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকারের নামে এক মহা মেলা হইয়া থাকে। যথা :—

শ্রীখণ্ড নগরী রাঢ়ে বঙ্গেচ বিশ্রুতা
সর্ব্বেষামেব বৈদ্যানং আশ্রয়ঃ যত্র বিদ্যতে
যত্র গোষ্ঠীভূত বেদ্যাঃ যঃ খণ্ডোভূৎ ভিষক প্রিয়ঃ
বিশেষতঃ কুলীনানাং সর্ব্বেষামেব বাসতঃ
আদৌ শ্রীখণ্ড নগরী রাঢ়মধ্যে চ ভূষিতা
সর্ব্বেষামেব বেদ্যানাং কুলীনানাং সমাজভূৎ
—১১ ও ১৩ পৃঃ।

নরহরি ঠাকুরের বংশপরিচয় দিবার অগ্রে উহার বংশাবলি দেওয়া উচিত। তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

পাস্থদাশ * (বীজীপুরুষ)
|
দেবল
|
শূলপাণি
|
ডোমন
|
হরি
|
ঈশান
|
নাক বা নায়ক
|
বামন
|
কীর্ত্তিবাস
|
নারায়ণ দাশ

মুকুন্দ — মাধব — নরহরি
মুকুন্দ
|
রঘুনন্দন

বংশলতা-দৃষ্ট নরহরি সরকারই আমাদের প্রবন্ধোক্ত নরহরি ঠাকুর। ইহা দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশে ধারাবাহিক কোন ইতিহাস নাই। আমাদের দেশের লোকেরা আজীবন এ বিষয়ে লম্বকর্ণ। কাজেই আমাদিগকে এ বিষয়ে জাতীয় কুলপঞ্জিকার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। কুলপঞ্জিকা জিনিসটা যে কি বস্তু, অগ্রে তাহাই আমাকে বলিতে হইবে, ইহা আর কিছুই নহে, কেবলমাত্র দেশের লোকেরা নিজের ও তদ্দেশের বংশ-পরম্পরাগত নাম ধাম, সামাজিক পদমর্য্যাদা ও কৌলিন্যাদির বিষয় জানিবার জন্য স্ব স্ব ও ঐ সকল বংশেরই সকল কথা ধারাবাহিকরূপে লিখিয়া রাখিতেন এবং যাঁহারা সংস্কৃতের লিখন পঠনে অসমর্থ ছিলেন, তাঁহারা তৎসমর্থ ব্রাহ্মণাদি দ্বারা লিখাইয়া লইতেন, উহারই নাম কুলপঞ্জিকা। কুলপঞ্জিকাগুলি কতকটা আমাদের দেশের পুরাণগুলির মত। যদি আমাদের দুর্ঘটনা না হইত, যদি আমাদের দেশ রাষ্ট্র- * বিপ্লব ও গৃহদাহদাদি নানা কারণে কালের কুক্ষিগত না হইত, তাহা হইলে আমাদিগকে আজ ঐতিহাসিক বিষয়ে বিদেশীর নিকট এত খাট হইতে হইত না। যাহা হউক, আমাদের দেশে কোন প্রামাণ্য ইতিহাস না থাকিলেও কৌলীন্য ও তদানুষঙ্গিক জাতি

* বাঙ্গালার অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি বৈদ্যজাতি নামে অভিহিত হইবার পূর্ব্বে উহাদের বীজীপুরুষের নামানুসারে কেহ দাশ শর্ম্মা, কেহ সেন শর্ম্মা, কেহ বা গুপ্ত শর্ম্মা বলিয়া আত্ম পরিচয় দান করিতেছিল, উহা আমরা সেই সময়ের কারিকার নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে জানিতে পারিয়াছি। যথা—

কর শর্ম্মা ও রঙ্গাজ ধর্ম্মা পরাশরঃ
মৌদগল্য দাশশর্ম্মা গুপ্তশর্ম্মাচ কাশ্যপঃ
ধন্বন্তরি সেনশর্ম্মা দত্তশর্ম্মা পরাশরঃ
শাণ্ডিল্য চন্দ্রশর্ম্মাচ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণাইমে।

কালের মাহাত্ম্যে ও সমাজের অত্যাচারে বোধ হয় বৈদ্যশ্রেণীর এ শিরভূষণ খসিয়া পড়িয়া যায়।

* বর্গিকেন হৃতং সর্ব্বং
পুস্তকং বিমলং মহৎ
ততোপি বহুকালেন
কৃতা বিপ্র প্রসাদতঃ।
(গোপাল শর্ম্মা)

তথ্যাদি বিষয়ে কুলপঞ্জিকাগুলি যে অতি প্রামাণ্য ও উপাদেয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অমানিশায় অতি সূচিভেদ্য তিমিরাবৃত আমাদের দেশে কুলপঞ্জিকাগুলি এক একটী অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিরেখা। আমরা এই আলোকের সাহায্যে পরম বৈষ্ণব নরহরি ঠাকুরের জীবনী লিখিতে প্রয়াস পাইব। অবশ্য আমি এমন স্পর্দ্ধা বা আশা রাখি না যে, আমার মত দীন লেখক মহাত্মা নরহরি ঠাকুরের জীবনী যথাযথ বর্ণনা করিয়া পাঠক পাঠিকাগণের সম্পূর্ণ তৃপ্তিসাধন করিতে সমর্থ হইবে। তথাপি যেমন তাললয়বিহীন হরিনামামৃত গানে গায়ক ও শ্রোতা উভয়ে অপার আনন্দ লাভ করে, আমিও তদ্রূপ ভগবৎভক্ত নরহরি ঠাকুরের গুণ গান করিয়া নিজে ধন্য হইব ও অন্যকে ধন্য করিতে প্রয়াস পাইব।

ইতঃপূর্ব্বে উপরে আমি নরহরি ঠাকুরের যে বংশলতা দিয়াছি, উহার সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দান করা কর্ত্তব্য মনে করি। সিদ্ধ বৈদ্যকুলে সেন, দাশ ও গুপ্ত, এই তিনটী উপাধিধারী মহাশয়েরা প্রসিদ্ধ। যথা—

সেন দাশশ্চ গুপ্তশ্চতুত্তমা ঋরিকীর্ত্তিতাঃ

স্কন্দপুরাণ রেখা খণ্ড, বৈদ্যোৎপত্তি।

তথাহি ঋষি সূত্রেচঃ—

সেনে কুলীনোঽহি বিনায়কস্য
দাশে কুলীনো ইহ চায়ুপন্থো
গুপ্তেষু কায়ু ত্রিপুরৌ কুলীনৌ
পরে মতা বৈ কিল মৌলিকাস্তেঃ।

কণ্ঠহার বৈদ্যজাতির অপর কুলপঞ্জিকা। উহা ১৫৭৫ খ্রীঃ অর্থাৎ মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিকের চন্দ্রপ্রভার ২২ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হয়। উক্ত পঞ্জিকায় ৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, বীজীপুরুষ পান্থদাশ মৌদগল্য কুল-সম্ভূত। যথা—

মৌদগল্য কুলসম্ভূত পান্থ দাশ ইতি শ্রুত।

এই পান্থদাশের গুণগরিমা উক্ত চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থে এরূপ ভাবে লিখিত আছে :—

মৌদ্গল্য গোত্রে কথিতঃ দ্বিতীয়ঃ
বীজী মহাত্মা জিতি শুদ্ধ কীর্ত্তিঃ
য পান্থদাশ শ্রুতি ভূবি বংশঃ
তস্যাম্বয়ং শ্রীভরতো ব্রবীতি
সংগ্রাম দক্ষাঃ হত বৈরীপক্ষঃ
গৌড়েশ সেবাজিত পৌরুষশ্রী
দাতা বিনয় প্রতিপাল্য লোকান্
স বালিনাছ্যাং বসতং চকার। ১১৫ পৃঃ

অর্থাৎ মৌদগল্য গোত্রের দ্বিতীয় বীজীপুরুষ পান্থদাশ অতীব ধর্ম্মাত্মা, সংগ্রামদক্ষ, ও শত্রুজয়ী ছিলেন। তিনি বল্লালের সেনাপতিত্ব পদে বহু পৌরুষ ও সুখ সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি অতীব দাতা, বিনয়ী ও বহুলোক প্রতিপালক ছিলেন, তিনি গোনগর (সেনভূমি জেলা) পরিত্যাগ করিয়া বালনাছীতে আসিয়া বসবাস করেন। সেনভূমি পূর্ব্বে বৈদ্যদের সমাজ ছিল। "সেন ভূমীতি রাজ্যেন সেনরাজকৃতপ্রবাৎ"। এই সেনভূমি মানভূম জেলার অন্তর্গত, এখানে ধন্বন্তরি গোত্রীয় মহারাজ শ্রীহর্ষ সেন রাজা ছিলেন। যখন শ্রীখণ্ড সমাজের গৌরব বঙ্গে বিশ্রুত হয়, তখন নরহরি ঠাকুরের পিতামহাদিরা বালনাছি হইতে এখানেই বসবাস করেন। পরে বৈষ্ণব সাধকগণের প্রাদুর্ভাবে শ্রীখণ্ড বৈষ্ণবদিগের তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। মহাত্মা নরহরি ঠাকুর পান্থ বংশসম্ভূত হইলেও ঐ বংশ সরকার বংশ বলিয়া জনসাধারণের নিকট পরিচিত, কারণ ঠাকুরের পূর্ব্বতন পুরুষেরা মহারাজ বল্লাল সেনের সময় হইতে এ যাবৎ নবাব সরকারে কার্য্য করায় "সরকার" পদবীতে ভূষিত হন। তাই চন্দ্রপ্রভায় এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

অথস্য নারায়ণ দাশস্য
খানাগু বঙ্গস্য সুতাস্ত্রয়োমী:
মুকুন্দ দাশ শুকৃতৈক বাস:
সরাজ বৈদ্য সুজনাভিলাষ:
অস্যানুজো মাধব: মাধব দাশ নামা
বিশ্বাস ক্ষেত্রং পরমাতিথেয়:
মহাযশা: সর্ব্বগুণৈ: বরেণ্য:
সুধীর: বিনীতা খিল নীতিশাস্ত্র:
অনয়োরনুজায় নরহরি দাশ
কৃষ্ণপদার্চ্চন বিহিত বিলাস:
মুনিরিব ভিষজাং মধ্যে জাত:
সংসারে সরকার ইতি খ্যাত:।

৩৫০ পৃ:

নরহরি ঠাকুরের বাল্যজীবনের বিশেষ কোন পরিচয় পাইবার উপায় নাই, তবে তিনি আবাল্য শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত ছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতারাও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। চৈতন্যভাগবতে এইরূপ উল্লেখ আছে, যথা :—

খণ্ডবাসী মুকুন্দ দাশ শ্রীরঘুনন্দন,
নরহরি দাশ চিরঞ্জীব সুলোচন।
এই সব মহাশাখা চৈতন্য কৃপাধম,
প্রেমফুল ফল ধরে যাঁহা তাঁহা দান।

(আদিলীলা)

আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার ৮ম বর্ষের ৩১৭ পৃ: হইতে দেখিতে পাই যে, রঘুনন্দন সরকারের দুইটী পুত্র ছিল, কিন্তু চন্দ্রপ্রভায় নিম্নলিখিত বচনাবলী হইতে জানিতে পারিয়াছি, উহার তিন পুত্র ছিল।

সুতো মুকুন্দ দাশস্য রাজবৈদ্য জস্তবান্
রঘুনন্দন দাশো ব কৃষ্ণসেবেন তৎপর
বৈষ্ণব জাতিখ্যাত কৃষ্ণপারিষদোপম:
রঘুনন্দন দাসস্ত শ্রীকৃষ্ণ স্তনয়োঽপনি
বৈষ্ণব পরম ভক্ত নানাগুণ সমন্বিত:
পুত্রৌ শ্রীকৃষ্ণ দাশস্য জজ্ঞাতে বিনয়ন্বিতৌ
কামদেব স্তদীয়াদ্যো বংশী-বাদনকপর:।

৩৫১ পৃ:।

বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজে নরহরি ঠাকুরের স্থান অতি উচ্চে। উহাদের বিশ্বাস ঠাকুর নরহরি শ্রীরাধিকার প্রিয়সখী মধুমতী ঠাকুরাণী। রঘুনন্দন, পরম ভাগবত চিরঞ্জীব সেনের পুত্র প্রসিদ্ধ গোবিন্দদাস ও চৈতন্য-মঙ্গল-প্রণেতা লোচনদাস (ত্রিলোচন উহার পুরা নাম, উনি ১৪৪৫ শকে (১৫২৩ খ্রী:) বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন, লোচনদাসের নিবাস কোগ্রাম বর্দ্ধমান হইতে ১৫ ক্রোশ উত্তরে গুস্করা ষ্টেশন হইতে ৫ ক্রোশ দূরে) উহার সম্বন্ধে আমরা "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থে (১৯৮ পৃ:) হইতে যাহা দেখিতে পাইয়াছি, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি, যথা :—

বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস,
মাতা শুদ্ধমতি মহানন্দী তাঁর নাম।
যাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ নাম,
কমলার দাস মোর পিতা জন্মদাতা,
শ্রীনরহরি দাশ মোর প্রেমদাতা।
মাতৃকুল পিতৃকুল হয় এক গ্রামে,
ধন্য মাতামহী সে অভয়পদবীনামে।
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত,
সর্ব্বতীর্থ পূত তেঁই তপস্যায় তৃপ্ত।"

বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত, নরহরি ঠাকুর চিরকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন, আমরা কিন্তু কুলপঞ্জিকা পাঠে জানিতে পারিয়াছি, তিনি কৃতদার ছিলেন, তিনি শ্রীগড়রধ্বজ সেনের কন্যাকে বিবাহ করেন ও তাঁহার গর্ভে ৪টী কন্যা জন্মে।

নরহরি দাসতনুজাশ্চত্বার: এতে কুলোখলা
জাতা
খৈতরবংশ-সম্ভূতা গরুড়ধ্বজ সেনকন্যকাকুক্ষৌ

মালঞ্চ বংশজন্মুহে দর্প্তেকা সুপ্রভাতায়
অপার দেখানায়াং তয়োস্ত মল্লিকমাধবাযোগ্যা
অস্যা অপি যা চরমা দত্তা মল্লিক বিষ্ণুসেনায়
অম্বা বরাহ নগরে শ্রীরাজকান্তায় সেনায়।

১৫৫ পৃঃ।

নরহরি ঠাকুরের কোন পুত্র সন্তান হয় নাই এবং বোধ হয় তিনি একরূপ সংসারে বৈরাগ্যবান ছিলেন ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী জীবনের অধিকাংশ সময় পিত্রালয়ে থাকিতেন, একারণ বশতঃ তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণের ধারণা ছিল, তিনি বিবাহ করেন নাই। যাহাই হউক, ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনই উঁহার সর্ব্বশক্তির অধিকারী হন। বৈষ্ণবদিগের বিশ্বাস, মহাত্মা রঘুনন্দন কৃষ্ণাবতারে তৎপুত্র প্রদ্যুম্ন ছিলেন। সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আজ পর্য্যন্ত যাবতীয় বৈষ্ণব মহান্ত ও গোস্বামীগণ সর্ব্বাগ্রে রঘুনন্দনের বংশাবলীদিগকে মাল্য চন্দন দিয়া আসিতেছেন, কেন না, মহাপ্রভু হইতে রঘুনন্দন উহা প্রথম পাইয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত রঘুনন্দনের বংশাবলী ব্রাহ্মণ হইতে অন্যান্য হিন্দুদিগকে গৌর মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া আসিতেছেন। রসকল্পবল্লী-প্রণেতা রামগোপাল, গোবিন্দ-লীলামৃত রচয়িতা মদন চৌধুরীর প্রপিতামহ চক্রপাণি এবং উঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহানন্দ রঘুনন্দনের নিকট দীক্ষিত হন। কাশিমবাজারের মহারাণী ৺স্বর্ণময়ীর ও তাঁহার শ্বশুরকুলের গুরু এই রঘুনন্দনের বংশধরগণ। গৌরাঙ্গ ঘোষাল শ্রীনরহরি ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। জগৎবন্দ্য ব্রাহ্মণজাতি ভারতে কাহারও নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন না বা কাহারও পদধূলি লন না। ইহাতেই মনে হয়, বাঙ্গালায় বৈদ্য-পেশা,..অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ.. উক্ত বৃত্তি অবলম্বন করায় কালে কবিরাজ ও বৈদ্য জাতি নামের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা হউক, এই রঘুনন্দন ঠাকুরের পিতা মুকুন্দদাশ বাঙ্গালার নবাব হুসেন কুলিখাঁর গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন।

প্রাচ্যবিদ্যার্ণব বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নরহরি ঠাকুরের কৃত যে "নামামৃত সমুদ্র" নামে একখানি গ্রন্থ পাইয়াছেন, উহার পরিসমাপ্তি কালের পরিচয় এবম্বিধ।

সবে মোর প্রভু মুঁই সবাকার দাস
করুণা করিয়া পূর্ণ কর অভিলাষ,
আর কি বলিব গৌর-প্রিয় পরিবার
নরহরি অনাথের কেহ নাহি আর।

আহা! কি নম্রতা, কি ভগবৎ আশ্রয় প্রার্থনা। এমন বিনয়নম্র বচন কে প্রকৃত বৈষ্ণব না হইলে বলিতে পারে? "তৃণাদপি সুনীচেন" প্রকৃত বৈষ্ণবের কথা।

অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থেই আমরা নরহরি ঠাকুরের ভাগবতীয় ভাবের কথা অবলোকন করিতে পাই। প্রবন্ধের কলেবর আধিক্য ভয়ে ২।৪টী উহার নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের নিকট প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ভূখণ্ড শ্রীখণ্ড মাঝে　তাহাতে শ্রীখণ্ড সমাজে
মধুমতী যাতে পরকাশ
ঠাকুর গৌরাঙ্গ সনে　বিলসয়ে রাত্রি দিনে
নাম ধরি নরহরি দাস
শ্রীরাধিকার সহচরী　রূপে গুণে অগোরি
মধুর মাধুরী অনুপম
অবনীতে অবতরি　পুরুষ আকৃতি ধরি
পুন কৈলা চেতনের কাম।
মধুমতী মধু দানে　ভাসাইয়া ত্রিভুবনে
মত্ত কৈলা গোরাঙ্গ নগর
মাতিল নিত্যানন্দ　আর সব ভক্তবৃন্দ
বেদ বিধি পড়িল ফাঁপর,

যোগপথ করি নাশ ভকতির পরকাশ
করিল মুকুন্দ সহোদর।
জানিয়া শেখর রায় বিকাইল বাঙ্গালায়
শ্রীরঘুনন্দন প্রাণেশ্বর।
—পদকল্পতরু ৭১২ শ্লোকাবলী।

ভজন মালিকা—কৃষ্ণরাম দাস কৃত—
নরহরি মধুমতী গৌরাঙ্গ পীরিতি অতি
স্থিতি যার শ্রীখণ্ড গ্রাম
* * * ইত্যাদি।

রসবল্লী-গ্রন্থ-প্রণেতা রামগোপাল দাস নরহরি বসুর সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন—

বন্দ্যো আমি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গদাধর
বন্দ্যো নিত্যানন্দ আর অদ্বৈত ঈশ্বর
তবে বন্দ্যো নরহরি শ্রীরঘু নন্দন
বন্দ্যো গুরু যত বৈষ্ণব মহাজন—ইত্যাদি।

রসিকদাস শাখা বর্ণন গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—

জয় জয় প্রেমদাতা ঠাকুর নরহরি
বন্দ্যো সেই পাদপদ্ম শিরে কর জোড়ি
ভূখণ্ডে শ্রীখণ্ডে স্থান তাতে অবতরি
শাখা উপশাখায় গায় ভুবন বিস্তারি।

পদকল্পতরু গ্রন্থের ৬ শাখা ২৫ পল্লব ও ৭১৪ শ্লোকাদি হইতে জানা যায় যে, অভিরাম গোস্বামী রঘুনন্দনকে দেখিবার জন্য শ্রীখণ্ডে যাইয়া উপস্থিত হন। অভিরাম গোস্বামীর মনে মনে বড় অহঙ্কার ছিল যে, তিনি বৈদ্য গোস্বামীর নিকট ছোট হইবেন না, ইহা জানিতে পারিয়া রঘুনন্দন প্রথমতঃ উঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, কিন্তু যখন অভিরাম বসু মনে মনে অনুতপ্ত হন, তখন রঘুনন্দন কৃপাপরবশ হইয়া অভিরামের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

মহাত্মা নরহরি ঠাকুর যে সর্ব্বদা মহাপ্রভুর সহিত মহা কীর্ত্তনাদি করিতেন ও জগন্নাথ মন্দিরে কীর্ত্তনকালে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা আমরা চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা হইতে জানিতে পারি ; যথাঃ—

খণ্ড সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন
নরহরি নাচে তাহে শ্রীরঘুনন্দন।

নরহরি ঠাকুর ১৫৪০ খ্রীঃ চান্দ্র কার্ত্তিক দ্বাদশী তিথিতে দেহ ত্যাগ করেন, শ্রীখণ্ড গ্রামে প্রতি বৎসর ঐ তিথিতে তাঁহার স্মরণার্থ বৈষ্ণবদিগের এক বড় মেলা হয়।

আমরা নরহরি ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করিতে গিয়া বাঙ্গালার প্রায় ৫০০ শত বৎসরের অর্থাৎ ১০৬৬ খ্রীঃ হইতে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইতিহাস কথঞ্চিৎ ভাবে জানিতে পারিয়াছি, কারণ শ্রীমৎ বল্লাল সেন ১০৬৬ খ্রীঃ বাঙ্গালায় রাজত্ব করেন (কাহার কাহার মতে ১১৬৯খ্রীঃ) নরহরি ঠাকুরের আদি বীজীপুরুষ পান্থদাশ এই রাজা বল্লালের সেনাপতি ছিলেন এবং উঁহার পিতৃব্য মুকুন্দদাশ বাঙ্গালার নবাব হুসেন কুলীখাঁর গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন। ইহাতেই মনে হয়, যেমন আর্থিকভাবে মহৎ বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পারমার্থিকভাবে তিনি তেমনই বাঙ্গালার এক প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ! দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ।

নরহরি ঠাকুরের সমুদায় কথা লিখিয়া প্রবন্ধ লিখিতে হইলে ইহা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে পরিণত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় ভগবৎ-চরণে অসংখ্য প্রণতি করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম। আশা করি, এই মহাপুরুষের এই সামান্যভাবে লিখিত আখ্যায়িকা বঙ্গ-বৈষ্ণব-বৃন্দের কথঞ্চিৎ আনন্দ দান করিতে সমর্থ হইবে, তাহা হইলেই এই দীন প্রবাসী লেখক সার্থক পরিশ্রম মনে করিবে।

শ্রীরাজকিশোর রায়।

নানা কথা।

বাস্তব কথোপকথন। স্থান, ব্রাহ্মসমাজের উত্তর দিকের গলি। কাল, মাস দুই আগে। কথক, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু বাবু ও আমরা। তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের সহিত আলিঙ্গনের পর (তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের সহিত আমরা আগেই পরিচিত ছিলাম) কথাবার্তা আরম্ভ। দুই এক কথার পর :—

তত্ত্বভূষণ :—আপনি যদি ভাল লোকের সহিত মিশিতেন, তাহা হইলে আপনার এ অবিশ্বাস (প্রেততত্ত্বে) থাকিত না। *

আমরা :—"ভাল লোক" কাদের বল্‌ছেন?

তত্ত্বভূষণ :—যেমন শিবনাথ শাস্ত্রী।

আমরা :—ওঁর সহিত আমাদের নানা বিষয়েই কথাবার্তা হইয়াছে—দর্শন, সমাজ, ধর্ম্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে। এই বৎসর দেড়েক আগে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধেই ওঁর সঙ্গে পুরীতে এক দিন প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া খুব জীবন্ত তর্ক বিতর্ক হয়। কিন্তু ওঁর কথায় ত আমরা প্রীত হইতে পারিলাম না। দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মসমাজে প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস রূপ রোগ প্রবেশ করিতেছে। নগেন্দ্র বাবু খুবই বিশ্বাস করিতেন।

তত্ত্বভূষণ :—নগেন্দ্রবাবুর মাথা বিকৃত হইয়া গিয়াছিল * কিন্তু প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ আছে বই কি। Oliver Lodgeএর মত লোক বিশ্বাস করেন।

---

* কথাটা শক্ত মনে হইল; ভদ্রতা-বিরুদ্ধ বলিয়াও মনে হইল। মনে মনে ভাবিলাম, এ কথাটার অর্থ কি। আমাদের শত দোষ থাকুক, আর শত দোষ আছেও; কিন্তু "ভাল লোকের সহিত" মিশি না—এটা ত আমাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। চিরজীবন সত্যপ্রাণ হইয়া যথাসাধ্য সত্যান্বেষণ করিয়াছি। ঐ উদ্দেশে দেশ দেশান্তরের সমুন্নত, শ্রেষ্ঠ জগৎবিখ্যাত জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, দার্শনিক ও ধর্ম্মতত্ত্ববিদের পায়ের তলায় বসিয়া, বিজ্ঞান, চিকিৎসাতত্ত্ব, দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করিয়াছি—খুব স্বাধীন ভাবে এবং প্রাণ খুলে। আমরা বেশ বলিতে পারি ও সব লোকের পাদদেশে বসিয়া তত্ত্বভূষণ মহাশয় নিজে ও তাঁহার "ভাল" লোকেরা সকল বিষয়েই—বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে—দশ বৎসর শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিতে পারেন। ঐ সব লোক কি "ভাল" লোক নন? তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত কথাটা ব্রাহ্মসমাজে, লোকে যে বলে, অবিনয় ও অহঙ্কার ও "হামবড়া" ভাব খুবই প্রবেশ করিয়াছে, তারই পরিচয় নয় কি? যাহা হউক, খুব সংযত ভাবেই আমরা কথা কহিতে লাগিলাম।

* তত্ত্বভূষণ মহাশয় এখানে কেন বলিলেন নগেন্দ্রবাবুর (৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান প্রচারক ছিলেন) মাথা বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় এই জন্য বলিয়াছিলেন যে, নগেন্দ্রবাবু "ভূত প্রেত" সম্বন্ধে যা তা বলিতেন ও বিশ্বাস করিতেন। তত্ত্বভূষণ মহাশয় যদি ঐ জন্যই বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে নগেন্দ্রবাবু আজ বাঁচিয়া থাকিলে উহাঁকে এই উত্তর খুব সম্ভবতঃ দিতেন :—'ভূত প্রেত সম্বন্ধে আমি কি এমন বলিয়াছি বা বিশ্বাস করি, যাহা Wallace, Oliver Lodge বা Barrett বিশ্বাস করেন না বা বলেন না? যদি ঐ জন্য আমার মাথা বিকৃত হইয়া গিয়াছে বল, তাহা হইলে আমি বলিব, ঐ Wallace, Oliver Lodge ও Barrettএর মাথাও বিকৃত হইয়া গিয়াছে—প্রায় সব প্রেততত্ত্ববাদীর মাথাই কম বেশী বিকৃত হইয়াছে।' নগেন্দ্র বাবু এরূপ উত্তর দিলে তত্ত্বভূষণ মহাশয়কে চুপ করিয়া যাইতে হইত।

আমরা :—সত্য। কিন্তু একটী লজ যেমন বিশ্বাস করেন, তেমন শতটী অন্য বৈজ্ঞানিক আছেন, যাঁরা বিশ্বাস করেন না। Dr. Mercier সম্প্রতি, লজ তাঁর Raymondএ যে সব প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছেন।

ভবসিন্ধু বাবু :—(তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া) হাঁ, একথা ত ঠিক্। যদি প্রেততত্ত্বের স্বপক্ষে তেমন প্রমাণই থাকিবে ত বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণতঃ বিশ্বাস করেন না কেন ?

তত্ত্বভূষণ :—Psychical Research Society প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছে।

আমরা :—Podmore প্রভৃতি লোক সে সব প্রমাণ খণ্ডিতও করিয়াছেন।

ভবসিন্ধু বাবু :—(তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া) প্রেততত্ত্বের বিরুদ্ধে যাঁরা লিখিয়াছেন, আমাদের কর্ত্তব্য তাঁদেরও লেখা পড়া।

আমরা :—ঠিক বলেছেন ভবসিন্ধু বাবু। (মনে মনে ভবসিন্ধু বাবুর strong common senseএর খুব প্রশংসা করিলাম। তার পর তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া) আপনি যদি প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করেন ত প্রমাণ দিন না। তর্ক করিলে—আপনি ও আমরা যদি তর্ক করি ত দুদিনেও তর্কের শেষ হইবে না। তর্ক বিতর্ক, লেখালেখি ত ঢের হইয়াছে। বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিন না ? আপনাকে কি আপনার কোন লোককে দশ হাজার টাকা দিব।

তত্ত্বভূষণ :—(হাসিতে হাসিতে) আপনি লজ্‌কে লিখুন ঐ কথা।

আমরা :—আমাদের ত খেয়ে দেয়ে আর কোন কাজ নাই, ঐ করি আর কি ! আপনি লিখুন না।

তত্ত্বভূষণ :—(চলিয়া যাইবার সময়) আমি প্রেততত্ত্বে তেমন বিশ্বাস করি না। অমনি একটু আধটু বিশ্বাস আছে।

(আমরা মনে মনে করিলাম, এই কথোপকথনে "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"র একটী ক্ষুদ্র অভিনয় হইয়া গেল।)

খ্রীষ্টধর্ম্ম ও অদ্বৈতবাদ।—আমরা কিছু দিন আগে এই "নব্যভারতে"ই দুই একটী দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছিলাম, উচ্চ খ্রীষ্টধর্ম্ম কিরূপে শনৈঃ শনৈঃ বেদান্তের দিকে অগ্রসর হইতেছে। Campbellএর "New theology" এক প্রকারের বেদান্ত। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম, রিপনের বিশপের উপদেশ হইতে। উনি বলিয়াছিলেন, জড়শক্তি সমূহও (the physical forces) ঈশ্বর। আজ আরও একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। Oliver Lodgeও ধীরে ধীরে এক প্রকারের অদ্বৈতবাদের (Pantheism) অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি তাঁর *Man and Universe*এ (p. 172) স্বভাবকে—Natureকে—"an aspect of the Divine Being" বলিতেছেন।

অদ্বৈতবাদ ও Prof. D. N. Mallik D. Sc. F. R. S. E. &c. অধ্যাপক ডি, এন, মল্লিক একজন Wrangler, প্রেসিডেন্সী কলেজের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক। উনি একজন ব্রাহ্মসমাজের গৌরব। মাস দুই আগে এক দিন সন্ধ্যাবেলা জাহ্নবী বক্ষে উঁহার সহিত আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে জীবন্ত কথাবার্ত্তা হইতেছিল। উঁহার একটী কথা শুনিয়া সুখী হইলাম। উনি বলিলেন, "ঈশ্বর সম্বন্ধে কতকটা Pantheismএ বিশ্বাস না করিলে চলে না।"

Clairvoyance ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। দত্ত মহাশয় উক্ত অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন; অন্ততঃ করিতেন। National Council of Education যখন বহুবাজারে ছিল, তখন এক দিন এক সভা হইতে আমরা দুইজনে একত্রে বাহিরে আসিতেছি, কি কথায় কথায় ঐ Clairvoyanceএর কথা উঠিল। উনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা উহাতে বিশ্বাস করি কি না। আমরা বলিলাম, না। উনি বলিলেন, উনি বিশ্বাস করেন ও তাহার প্রমাণ দিবেন —প্রমাণের বন্দোবস্ত করিয়া আমাদের জানাইবেন। কিন্তু আজও ত প্রমাণ দিলেন না। উনি যদি উহাতে এখনও বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া দত্ত মহাশয় প্রতিশ্রুত প্রমাণ দিবেন কি? "সময় নাই" বলিলে শুনিব না। উনি অ্যাটর্ণি লোক, উহাঁর সময় নাই জানি। তা উহাঁর উপযুক্ত ফি দিতে আমরা কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইব না, যদি প্রমাণ দিতে পারেন। অতিরিক্ত অবিশ্বাস যেমন ক্ষতিকর, এইরূপে অন্ধ বিশ্বাসও তেমনি ক্ষতিকর। কি জানি কেন, Theosophistsদের ঐরূপ বিশ্বাসের দিকে একটু বিশেষ ঝোঁক দেখিতেছি। Col. Olcott উহাঁদের একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন, উনি এক দিন অবলীলাক্রমে মহেন্দ্র সরকারের বিজ্ঞান সভায় বলিলেন কি না যে, উনি উহাঁর হাতের সোণার অঙ্গুরীকে গোলাপ ফুলে পরিণত করিতে পারেন। আমরা তখন নেহাৎ ছেলেমানুষ। না হলে সাহেবকে চেপে ধরিতাম। Mrs. Annie Besantও নাকি তাঁর "মহাত্মা"দিগের নিকট হইতে খবর পাইতেন? জানিতে চাই ঐ "মহাত্মারা" এখনও কি ও সব] বিশ্বাস করেন? যদি করেন ত কোথায় বাস করিতেছেন? আর খবরটাই বা কিরূপে আসে? এ সকলের একটা demonstration নিতান্তই বাঞ্ছনীয়।

ঈশ্বরের ক্রমবিকাশ ও অধ্যাপক মহলানবিশ B. Sc, F. R. S. E. অধ্যাপক মহলানবিশ প্রেসিডেন্সী কলেজের শারীর-যন্ত্র-বিদ্যায় (Physiologyর) অধ্যাপক। ইনিও একজন ব্রাহ্মসমাজের গৌরব। মাস তিনেক আগে এক দিন রাত্রিবেলা উঁর সহিত এক দিন নানা বিষয়ে কথোপকথন হয়।

অধ্যাপক মহলানবিশ:—আমার বোধ হয় উপনিষদ্‌গুলির ঠিক্ ব্যাখ্যা আজ কাল হয় না।

আমরা:—উপনিষদ্‌গুলিতে নানা পরস্পর-বিরুদ্ধ মতের যথেষ্ট সমাবেশ আছে। কাজে কাজেই ব্যাখ্যাও নানা রকমের হইয়াছে।

অধ্যাপক মহলানবিশ:—আমি ঈশ্বরের ক্রম-বিকাশে (evolutionএ) বিশ্বাস করি। জড় জগতে যেমন ক্রমবিকাশ দেখিতেছি, ঈশ্বরের নিজেরও তেমনি ক্রমবিকাশ আছে। আমার এইরূপ বিশ্বাসকে ব্রাহ্মসমাজ "heresy" বলেন। ব্রাহ্মসমাজের যুবকবৃন্দের মধ্যে এসব বিষয়ে খুব আন্দোলন চলিতেছে।

আমরা:—শুনিয়া খুব সুখী হইলাম, এসব বিষয়ে খুব আন্দোলন চলিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ যদি একটী উন্নতিশীল সমাজ থাকিতে চান, তাহা হইলে উহাঁর মত ও বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ব্রহ্ম ও জগতের একত্বের দিকে যত অগ্রসর হন, ততই ভাল। সেদিন অধ্যাপক মহাশয়ের

পূর্ব্বোক্ত "heresy" সম্বন্ধে আমরা কোন মত প্রকাশ করিলাম না। বুঝিতে পারিলাম, ও মত ব্রাহ্মসমাজ কেন গ্রহণ করিবেন না। ও মতে ঈশ্বরকে সসীম-ক্ষমতাশালী ও অপূর্ণ করা হয়। আর মতটীকে কতকটা নূতন বলিয়াও মনে হইল। কিছু দিন পরে কিন্তু দেখিলাম, মতটী কেবল অধ্যাপক মহলানবিশেরই মত নয়। Oliver Lodgeএরও ঐরূপ মত। তাঁর ঈশ্বরও সসীম ক্ষমতা-বিশিষ্ট এবং বর্ত্তমান কালে অপূর্ণ। তিনি বলিতেছেন :—"the struggle and effort towards progress of which we are conscious, which is part of the noblest aspect of ourselves is not limited to us, but extends even, to the Deity." (Oliver Lodge's *Science and Religion*, 1905) আজ আমরা এ সম্বন্ধে আমাদের নিজের মতের কথা কিছু বলিলাম না। প্রশ্নটী অত্যন্ত জটিল, আর স্থানাভাব। আজ কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধে ঐ অপেক্ষাকৃত নূতন মতটার সংবাদ মাত্র দিলাম।

শ্রীশশিভূষণ মিত্র।

প্রেত তত্ত্ব (Spiritualism)

কিছু দিন আগে আমরা নব্যভারতে লিখিয়াছিলাম যে, Oliver Lodge (ইনি প্রেততত্ত্বের প্রধান পাণ্ডা—আজকালকার সর্ব্বপ্রধান পাণ্ডা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না) একজন বড় দরের বৈজ্ঞানিকও বটেন। তাঁর Raymond নামক পুস্তকে প্রেততত্ত্বের স্বপক্ষে যে সব প্রমাণ দিয়াছিলেন, তাহা Dr. Mercier (ইনি একজন বড় দরের ডাক্তার, পাগল-চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞান ও ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত) খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, Lodge-এর এ সব বিষয়ে বিচার করিবার অধিকার ও ক্ষমতা নাই। Col. Cook নামক আর একজন লেখকও Lodgeএর প্রতিবাদ করিয়া পুস্তক লিখিয়াছেন। আজকাল বিলাতে প্রেততত্ত্ব লইয়া আবার খুব আলোচনা ও লেখালেখি চলিতেছে। কারণ? কারণ পড়িয়া রহিয়াছে। এই গত যুদ্ধে অনেক লোকই আত্মীয় স্বজন হারাইয়াছেন। অনেক ত মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু কতক আবার নিরুদ্দেশ ("missing") হইয়াছে। এই সব লোকের খবর পাবার জন্য তাদের আপনার লোকেরা উন্মত্ত প্রাণে যার তার কাছে ছুটিতেছেন। প্রেততত্ত্ববাদীরা (Spiritualists) যদি কোন খবর দিতে পারেন, তার আশায় তাঁদের কাছেও ছুটিতেছেন। সে যাহা হউক, আজ আমরা আর একজন জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার (Dr. Ferrier) প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা আমাদের পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

প্রথমেই এই জগৎবিখ্যাত ডাক্তারের একটু পরিচয় দিই। ইনি একজন হেঁজি পেঁজি ডাক্তার নন। বুজরুকী বা চালাকী করে পয়সা ও নাম করা ডাক্তার নন। ইনি লণ্ডনের বায়ুরোগের (nervous diseases) একজন প্রধান ডাক্তার। ইনিই বিলাতে সর্ব্বপ্রথম বাঁদরের মগজের এক এক অংশকে বৈদ্যুতিক উত্তেজনা (electric stimulus) দ্বারা উত্তেজিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাঁদরের এবং সুতরাং মানুষের মগজের এক

এক অংশ এক একটী বিশেষ কাজ করে। কোন অংশ দেখে, কোন অংশ শোনে, কোন অংশ হাত পা নাড়ায় ইত্যাদি। এই আবিষ্কার যে কেবল মনোবিজ্ঞানের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে, তাহা নহে, শত শত মস্তিষ্ক রোগ (বিশেষতঃ মৃগী প্রভৃতি রোগ)-গ্রস্ত মানবেরও বিশেষ উপকার করিয়াছে। মস্তিষ্কের অস্ত্র চিকিৎসায় (Brain Surgeryর) মূল ঐ আবিষ্কারে। জগতে এমন সুশিক্ষিত ডাক্তার কেহ নাই, যিনি এই Dr. Ferrierএর *Functions of the Brain*, নামক পুস্তকের কথা শোনেন নাই বা পড়েন নাই। আমরা যখন বিলাতে শিক্ষার্থী —প্রায় ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে—তখন উহাঁকে প্রথম দেখি। খর্বাকৃতি, দ্বিতীয় গৌরগোবিন্দ আর কি, তবে তত ছোট নন। কিন্তু কি মনের তেজ! এই মানসিক তেজ যেন তাঁর মুখ, চোখ দিয়ে ফুঁড়ে বাহির হইয়েছে। যখনকার কথা বলিতেছি, তখন আমাদের য়ুনিভার্সিটী কলেজে মনস্তত্ত্ববিদ্‌দিগের এক সভা (Congress of Psychologists) হয়, তাতে উনি উপস্থিত ছিলেন; উনি প্লাটফর্ম হইতে অনেক দূরে বসিয়াছিলেন; যখন ওঁর একটী কথার প্রতিবাদ কেহ করেন, উনি অমনি তখন (উহাঁর বয়স ৫৫ বৎসরের কম হইবে না) তড়াক্ তড়াক্ করে সম্মুখস্থ বেঞ্চিগুলি টপকে প্লাটফর্মে উঠিয়া প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিলেন। তাহা দেখে আমি অবাক্! ঐ দৃশ্য কখন ভুলিব না। ঐ সময়ে আমার এক এদেশের বন্ধুকে যে চিঠি লিখি, তাহাতে ঐ কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি নাই। Ferrierএর বয়স এখন ৮০র কম নয়।

এখন এই অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, শুনুন। উনি Daily Express নামক এক বিলাতী সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে বলিতেছেন :—

"More than thirty years ago I saw the tricks which Sir Conan Doyle now seriously asks his readers to believe." প্রেততত্ত্ববাদীদের যে অধিবেশনে (এই অধিবেশনকে ওঁরা seance বলেন) Ferrier ঐ সব প্রতারণা ("tricks") দেখেন, তার একটু বর্ণনা করিতেছেন। দিনটা খুব ঠাণ্ডা, তবুও যে ঘরে অধিবেশন হইয়াছিল, সেই ঘরের আগুন (বিলাতে শীতকালে অনেক সময় দিনের বেলায়ও ঘরে আগুন না জ্বালিয়া থাকা যায় না) সব বিশেষ সাবধানতার সহিত প্রেততত্ত্ববাদীরা নিবাইয়া দিল, পাছে ঐটুকুও আলোক সেখান থেকে আসে; দ্বার জানালা মোটা পরদা দিয়া বন্ধ করা হইল—পাছে একটু আলোক আসে। এইরূপ সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে "ভূত" দেখা দিলেন। একটা মুখের আবছা (Dim outlines) দেখা গেল। Ferrier তাঁর এক নিকটস্থ বন্ধুকে মিছামিছি ঠাট্টা করে বলিলেন, মুখটা Mr. Taylorএর মুখের মত; চুপি চুপি বলিলেন অথচ যেন প্রেততত্ত্ববাদীরা শুনতে পায়। ইহাঁরা অর্থাৎ প্রেততত্ত্ববাদীরা ফাঁদে পড়িলেন। ইহাঁরা Ferrierএর প্রতীতি জন্মাইবার জন্য পরে বলিল যে, Ferrier যে মুখ দেখিয়াছেন তা মৃত Mr. Taylorএর প্রেতাত্মার মুখ। অথচ Ferrierএর জানা কোন Mr. Taylor ছিল না; উনি খালি মজা দেখবার জন্য, চোর ধরবার জন্য ওঁর বন্ধুকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন। তার পর

আরও মজার কথা শুনুন। দর্শকদিগের মধ্যে একজন চালাক-চূড়ামণি একটু লাল জল এক ফিট্‌কিরির মধ্যে লইয়া গিয়াছিল। যখন "ভূত" দেখা দিল, তখন ঐ ফিট্‌কিরি দিয়ে "ভূতের" জামার সম্মুখভাগ (Shirt front) ও ভূতের মুখ রঞ্জিত করিয়া দিল। তার পর যখন ঘর আলোকিত করা হইল, তখন দেখা গেল যে, একটা "জল জেয়ান্ত" মানুষেরই জামা ও মুখ রঞ্জিত হইয়াছে। ইনিই উক্ত প্রেততত্ত্ববাদীদের প্রধান পাণ্ডা, ইনিই "ভূত" হইয়াছিলেন। ধরা পড়িয়াছেন দেখিয়া উক্ত প্রেততত্ত্ববাদীরা অপ্রতিভ হইয়া শীঘ্র সরিয়া পড়িলেন। ছেলে মানুষী ও প্রবঞ্চনা এর চেয়ে আর বেশী কি হতে পারে! প্রেততত্ত্ববাদীদিগের অনেক প্রমাণ এই রকমেরই! Ferrier বলিতেছেন :—

"Spiritualism is not only a fraud but it is a repulsive idea. It would seem to be an attempt to destroy the beautiful side of death, wherein we are led to believe that we are at rest and finished with the troubles of this world"

(পাঠককে গোড়াতেই একটী কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই) পরলোকে বিশ্বাস ও প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস এক জিনিস নয়। একজন পরলোকে বিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু তা বলিয়াই যে তাঁকে "ভূত" "প্রেত" বিশ্বাস করিতে হইবে, তার কোন অর্থ নাই। প্রেততত্ত্ব বলে মৃত ব্যক্তির আত্মা ইহলোকে আসিয়া জীবন্ত লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষে (কোন মধ্যবর্ত্তী—"medium"র দ্বারা) দেখাশুনা করে, ভাব বিনিময় করে, ঘরের টেবেল চেয়ার একস্থান হইতে অন্য স্থানে সরায়, বাক্‌সের ভিতর কি আছে বলে দেয় ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমরা বলি, মৃত ব্যক্তির আত্মা যে এরূপ কোন কাজ করে, তার কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।

আমরা এই অবসরে আরও দুই একজন জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে মত লিপিবদ্ধ করিতে চাই। এই জন্য চাই যে, এ দেশের প্রেততত্ত্ববাদীরা প্রায়ই বলিয়া থাকেন :—"Oliver Lodgeএর মত বৈজ্ঞানিক প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করেন, আর আপনি করিবেন না!" শ্রদ্ধাস্পদ শিবনাথ শাস্ত্রীর মত লোক আমাদিগকে একদিন ঐ কথা বলিয়াছিলেন। আমরা দেখাইতে চাই, Oliver Lodgeএর মত বা তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অনেক বৈজ্ঞানিক প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করিতে অপারগ। Faradayর নাম সুপ্রসিদ্ধ। উনি যে একজন খুবই উচ্চদরের বৈজ্ঞানিক ছিলেন, তা সকলেই জানেন, আর খুব ঈশ্বরবিশ্বাসীও ছিলেন। ওঁর কোন বন্ধু একদিন ওঁকে বিশেষ অনুরোধ করেন, প্রেততত্ত্ববাদীর এক অধিবেশন দেখিবার জন্য। Faraday অস্বীকার করেন এই বলিয়া যে, তিনি ইতিপূর্ব্বেই "ভূত"দের (Spiritsদের) সহিত পরিচিত হইয়াছেন; তাঁহাদিগের সহিত আবার পরিচিত হইবার তাঁর ইচ্ছা নাই। অর্থ—ও ভাঁড়ামী প্রবঞ্চনা দ্বিতীয়বার দেখিবার আবশ্যকতা নাই; একবার দেখিয়াই সব বুঝিতে পারিয়াছেন। Faraday তখন Tyndallকে ঐ অধিবেশন দেখিতে পাঠাইয়া দেন। (See Science and the "Spirits" in Tyndall's *Fragments of Science.*)

Tyndallএর পরিচয় অনাবশ্যক। তিনি শিক্ষিত সমাজের সর্ব্বত্রই সুপরিচিত।

অমন সত্যপ্রাণ, স্পষ্টবক্তা, বিশুদ্ধ-চরিত্র, উচ্চদরের বৈজ্ঞানিক জগতে কমই জন্মিয়াছেন। উনি ঐ অধিবেশনে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা ঐ উপরিউক্ত প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাহা দেখিলেন, তাহা আর কহতব্য নয়, ঘৃণা ধরে। নব্যভারতের সম্পাদক মহাশয় ঐ সব ছাইভস্ম লিখিবার স্থান আমাদিগকে নিশ্চয়ই দিবেন না। আমাদেরও সময় নাই। আর পাঠক মহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবারও ভয় আছে। কিরূপ সব প্রবঞ্চনা Tyndall দেখিয়াছিলেন, তাহা দেখাইবার জন্য কেবল একটী দৃষ্টান্তের কথা সংক্ষেপে বলিব। প্রেততত্ত্ববাদীরা উক্ত অধিবেশনটীকে একটী ভোজনের (dinnerএর) অধিবেশনেও পরিণত করিলেন। dinnerও চলিল, প্রেততত্ত্বের ব্যাপারও চলিল। মাঝে মাঝে খানা-টেবেলের নীচে কে আঘাত (knock) করিতে লাগিল। প্রেততত্ত্ববাদীরা বলিলেন, "ভূতে" আঘাত করিতেছে। Tyndall টেবেলের নীচে প্রবেশ করিলেন। তখন আঘাত বন্ধ হইয়া গেল। যতক্ষণ নীচে ছিলেন, ততক্ষণ আঘাত বন্ধ ছিল। Tyndall আবার যখন টেবেলের নীচে হইতে চেয়ারে আসিয়া বসিলেন, তখন আবার আঘাত হইতে লাগিল। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, প্রেততত্ত্ববাদীদিগের মধ্যেই এক জন আঘাত করিতেছিলেন। Tyndall যখন টেবিলের নীচে ছিলেন, তখন ধরা পড়বার ভয়ে "ওঝা" মহাশয় আঘাত বন্ধ রাখিয়াছিলেন। প্রেততত্ত্ববাদীরা "ভূত"-দিগকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন তখন আঘাত করিতে, কিন্তু "ভূত" মহাশয়েরা কোন মতেই সাহস করিতে পারিলেন না। এইরূপ সব ঘৃণিত ব্যাপার! Tyndall আরও কয়বার ঐরূপ অধিবেশনে গিয়াছিলেন। ঐ একই ধাঁচের প্রবঞ্চনা! ঐ সব দেখিয়াই Tyndall প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন:—"Surely no baser delusion ever obtained dominance over the weak mind of man". (Ibid.)

Prof. Ray Lankester একজন খুব উচ্চদরের জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত (biologist)। আমরা উহাঁর সহিত সুপরিচিত। বিলাতে আমাদের একজন গুরু ছিলেন। উনিও প্রেততত্ত্ববাদীদিগের ব্যাপার পরীক্ষা করিয়া দেখেন; দুই একটা জুয়াচোরকে ধরিয়া আদালতে দণ্ডিতও করেন। ওঁর মতেও প্রেততত্ত্ববাদীদের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। "ভূত" দেখান ও দেখা ব্যাপারটী তাঁর মতে কেবল প্রবঞ্চনা ("fraud") যাদুকরের ভেল্কী ("conjurer's trick") ও আত্ম প্রবঞ্চনায় ("self-deception") পূর্ণ। See Lankester's Diversions of a Naturalist, P. 364.

ডারউইনের পরিচয় দেওয়া বাহুল্য। সকলেই জানেন, তিনি সমগ্র মানবজাতির চিন্তাস্রোতকে এক বিভিন্ন পথে চালাইয়াছেন। যেমনি খুব উচ্চদরের বৈজ্ঞানিক, তেমনি চরিত্রবান। উহাঁর পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতাও যে অসাধারণ রকমের ছিল, তাহাও কেহ অস্বীকার করিবেন না। তিনি প্রেততত্ত্ববাদীদিগের এক অধিবেশনে অন্ধকার ঘরে তাহাদের প্রবঞ্চনা-ক্রীড়া (fun) ও টেবিল, চেয়ার ছোঁড়া দেখিয়া বলিতেছেন:—যদি এই সব ছাই ভস্ম আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হয়, ত ভগবান আমাদিগকে রক্ষা করুন। ("The Lord have mercy on us, if we have to be-

lieve such rubbish.") See Darwin's *Life and Letters.* Vol III. P. 187.

Lord Kelvin ইংলণ্ডের এক অদ্বিতীয় প্রাকৃতিক-তত্ত্ববিৎ (physicist) ছিলেন। আর তাঁর শিক্ষা, দীক্ষাও এরূপ ছিল যে, তিনি যদি প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করিতে পারিতেন ত আগ্রহের সহিত করিতেন। তিনি বলেন, "fraud or bad observation explained belief in Spiritualism". (*See Clodd's The Question,* P. 279.)

হক্স্‌লির পরিচয় অনাবশ্যক। সকলেই বলিবেন, উনি একজন অসাধারণ রকমের জীবনতত্ত্ববিৎ (Biologist) ছিলেন। আর সকলেই জানেন, তাঁর প্রতিভা কিরূপ সর্ব্বগ্রাসী ছিল। আর ওরূপ সত্যপ্রাণ লোক খুব কমই দেখা যায়। তিনি প্রেত-তত্ত্ববাদীদিগের অনেক অধিবেশনে তাদের ছলনা ও প্রবঞ্চনা দেখিয়া ও তাদের "ভূত"-দিগের আবোল তাবোল বকা শুনিয়া জ্বালাতন হইয়া যা লিখিয়াছেন, পাঠক তাহা শুনিলে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। তিনি বলিতেছেন :—"The only good that I can see in the demonstration of the truth of Spiritualism is to furnish an additional argument against suicide. Better live a crossing-sweeper than die and be made to talk twaddle by a medium hired at a guinea a seance" (see Huxley's *Life and Letters.* Vol II. p. 425.)
(পাঠক এখানে স্মরণ রাখিবেন, বিলাতে যদি কেহ আত্মহত্যা করে, আর সেটী প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তার মৃত দেহকে খ্রীষ্টধর্ম্মের নিয়মানুসারে পাদরিরা গোর—Christian burial—দিতে পারেন না। কাজেকাজেই সে লোককে "ভূত" হয়ে এই পৃথিবীতে ঘুরতে হয়। হক্স্‌লি সাধারণের এই বিশ্বাসটী মনে রাখিয়া প্রেততত্ত্ববাদ সম্বন্ধে উক্ত বিদ্রূপ করিতেছেন।)

আরও শুনুন। St. George Mivart একজন বড়দরের শারীরতত্ত্ববিদ্ (Anatomist) ছিলেন। তিনিও অনেক দিন ধরিয়া প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করেন। তিনিও বলিয়া গিয়াছেন প্রেততত্ত্বের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ জ্যোতির্ব্বিৎ G. Darwin (ইনি কেম্ব্রিজে জ্যোতির্ব্বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন) প্রেততত্ত্ববাদিদিগের "ভূতে"র ব্যাপার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিতেছেন, "I remain wholly unconvinced either of any remarkable powers or of thought transference" (Dr. Tuckett's, *Evidence for the Supernatural.* P. 365) জগদ্বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিৎ ও দার্শনিক Prof. Clifford এরও ঐ মত ছিল (Clodd's *The Question* P. 279)

অনেক বড় বড় ফরাসি জীবনতত্ত্ববিৎ ও ডাক্তার এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। তাঁদেরও ঐ মত। এ কথা বলিলে বড় অত্যুক্তি হইবে না যে, আজকাল বৈজ্ঞানিক-দিগের মধ্যে Oliver Lodge ও আর দুই একটী ছাড়া কেহ প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করেন না।

Crookes একজন বড় দরের প্রাকৃতিক তত্ত্ববিৎ (Physicist)। ইহাঁকে অনেকেই প্রেততত্ত্ববাদী বলিয়া জানেন। কিন্তু এমন বিশেষজ্ঞ কেহ কেহ আছেন, যাঁরা ওঁকে প্রেততত্ত্ববাদী বলিতে চাহেন না। তাঁরা বলেন যে,যে Crookes তাঁর প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে শেষ উক্তির স্বরূপ বলিলেন "There is no bridge between the material and

the spiritual world," এবং "that he (Crookes) had come to a brick-wall" (Begbie's *Master Workers* 1905, P. 215);—যে Crookes ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে যখন খুব পরীক্ষা করিতেছিলেন তখন বলিয়াছিলেন, "I have never once had satisfactory proof that the dead can return and communicate" (see *Light*, May 12, 1900);—যে Crookes এই সব কথা বলিয়াছেন, সে Crookesকে কিরূপে প্রেততত্ত্ববাদী বলা যায়? পাঠক, আমরা এই দুই পরস্পর-বিরুদ্ধ মতের মধ্যে কোন্‌টী সত্য, তাহা বলিতে পারিলাম না। Crookes এর সহিত কথাবার্ত্তা বা চিঠি লেখালিখি না করিয়া বলাও অসম্ভব। এই নিমিত্ত এ সম্বন্ধে এখানে বৃথা বাক্যব্যয় না করাই

Wallace অবশ্য একজন খুব বড়দরেরই Naturalist ছিলেন। খুব খ্রীষ্টানও ছিলেন। ইনি যে একজন প্রেততত্ত্ববাদী ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে কি না যে Wallace অক্লেশে বিশ্বাস করিতে পারিলেন যে "Dr" Monck নামক একটী পুরুষ "মধ্যবর্ত্তী", তাঁর বামপার্শ্ব হইতে একটী শুভ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত শরীরী স্ত্রীলোক প্রসব করিলেন (Daily Chronicle, 27 April, 1907). যদিও Wallace জানিতেন যে, ঐ "মধ্যবর্ত্তী"টী একটী প্রতারক, ঐরূপ প্রতারণা মিথ্যার জন্য অল্প দিন পূর্ব্বেই শ্রীঘর দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, আর তার সং-গ্রামের (apparatusএর) মধ্যে মুখোস (masks), ভরাট করা দস্তানা (stuffed gloves), সূক্ষ্ম, শুভ্র বস্ত্র (muslin) ও কব্জাবিশিষ্ট দণ্ড (jointed rod) পাওয়া গিয়াছিল। (ঐ সব জিনিস দিয়ে অন্ধকার ঘরে একটী স্ত্রীলোকের মত একটী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাকে প্রকৃত স্ত্রীলোক বলিয়া দেখান বড় কঠিন ব্যাপার নহে,)—তাই বলিতেছিলাম যে, Wallace এত সহজে এরূপ একটা গুরুতর বিষয়ে—একটা পুরুষ তার গা থেকে একটা স্ত্রীলোক প্রসব করিলে, এরূপ বিষয়ে বিশ্বাস করিতে পারিলেন, প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার কথার মূল্য কি? Barett এর মত প্রেততত্ত্ববাদীও "ভূতের" ঐরূপ কীর্ত্তিতে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। আর বলা বাহুল্য, আষাঢ়ে গল্প ছাড়া এ বিষয়ে অন্য প্রমাণ কিছুই নাই।

এখন দেখা যাউক, প্রেততত্ত্বের প্রধান পাণ্ডা—Oliver Lodge নিজে ঐ তত্ত্বের প্রমাণ সম্বন্ধে কি বলেন। তিনি প্রেততত্ত্বে খুব বিশ্বাস করেন বটে, কিন্তু নিজেই প্রমাণ সম্বন্ধে তেমন দৃঢ়তা দেখাইতে পারেন নাই। দেখাইতে পারিবেনই বা কোথা হইতে? "এঁড়ে গরু না টেনে দোা"। ওঁর প্রাণের ইচ্ছা প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করা। যিনি যা বলুন, ওঁর এই ইচ্ছার জন্য আমরা উহাঁর প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু ঐ প্রবল ইচ্ছার জন্যেই অনেক স্থলে প্রেততত্ত্বে তাঁর বিশ্বাস প্রমাণের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত Mr. Begbie অলিভার লজের একজন প্রধান ভক্ত। ঐ Begbieকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রেততত্ত্বের প্রমাণ সম্বন্ধে Oliver Lodge যা বলিয়াছিলেন, তাহা এই:—"I know of nothing which satisfies my own mind that I would take before the Royal Society." (Vide Begbie's *Master Workers.* P. 198) আজ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দেও যা, আজ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দেও তাই। Oliver Lodge

আজ পর্য্যন্ত প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে এমন কোন প্রমাণ পান নাই, যাহা Royal Societyর সম্মুখে ধরিতে পারেন। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে প্রমাণ বলেন, সে প্রমাণ প্রেততত্ত্বের স্বপক্ষে নাই। আমরা এখানে আমাদের পাঠকবর্গকে এই অনুরোধটী না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে,তাঁহারা যেন Oliver Lodgeএর পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বেশ করে হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করেন। একজন বৈজ্ঞানিক কোন মতে বিশ্বাস করেন বলিলেই তাঁরা যেন মনে না করেন যে, ঐ মতের স্বপক্ষে তবে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে। Oliver Lodge প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করেন বটে,কিন্তু তিনি নিজেই বলিতেছেন ও তত্ত্বের স্বপক্ষে এরূপ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, যাহা Royal Societyর সম্মুখে ধরিতে পারেন। তবে এখানে এ কথাও বলিয়া রাখা উচিত যে, Oliver Lodge ওজন করিয়া সব সময় কথা কন না। অনেক সময় নিজের কথা নিজেই খণ্ডন করেন।

লজ্ (Oliver Lodge) একজন পাকাদরের উকীলও বটেন। স্বপক্ষ সমর্থন সব সময় যে সরল বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই করেন, তাহা আমরা বলিতে পারিলাম না। কথাটা খুব গুরুতর কথা। গুরুতর ত বটেই। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইলাম। প্রমাণ? প্রমাণ আছে। খুব সংক্ষেপে বলিব। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ক্যাণ্ট (Kant)কে স্বদলে আনিবার জন্য লজ্ বিশেষ আগ্রহান্বিত—অতিরিক্ত ভাবে আগ্রহান্বিত। লজ্ বলেন যে, ক্যাণ্ট Clairvoyance * প্রভৃতি ক্ষমতা যে সত্য, সে সম্বন্ধে তাঁহার (ক্যাণ্টের) "ভূত-দর্শকের স্বপ্ন" নামক পুস্তিকাতে সাক্ষ্য (testimony) দিয়াছেন। প্রিয় পাঠক, ক্যাণ্টের ঐ পুস্তিকা যে কজন লোক পড়িবেন, তাহা বুঝিতেই পারিতেছেন। সে যাহা হউক, ক্যাণ্ট প্রকৃতপক্ষে ঐ পুস্তিকাতে ঐ সব ক্ষমতার ঠাট্টাই করিয়াছেন, আর ঐ সব আষাঢ়ে গল্পের কথা লেখাকে একটী ঘৃণিত কাজ ("contemptible business") বলিয়াছেন, যদিও নিজেই তাহা করিয়াছেন। তবুও লজ্ বলিতে চান, Kant Clairvoyanceএ বিশ্বাস করিতেন। বলিহারি, নব খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারকের উৎসাহকে! লজের এইরূপ অতিরিক্ত উৎসাহের আরও প্রমাণ আছে; স্থানাভাবে বলিতে পারিলাম না। যাহা লিখিলাম, তাহা হইতেই প্রিয় পাঠক বুঝিতে পারিবেন, লজ্ কিরূপ এক দিকে ঝোঁকা লোক, আর কিরূপ সতর্কতার সহিত তাঁর তথা-কথিত "প্রমাণ" গ্রহণ করা উচিত।

প্রিয় পাঠক, আপনার আর একটু ধৈর্য্য ভিক্ষা করিতেছি। একবার আসুন, দেখা যাউক, লজ্ যাকে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে "প্রমাণ" বলেন, সেটা কিরূপ সামগ্রী। এই সে দিন বলিয়াছেন:—দুইটী বালক; ওরা পরস্পরের বন্ধু ছিল। প্রথমটীর মারা যাবার দশদিন পরে দ্বিতীয়টী মারা যায়। ঐ সময়ে ঐ দুইটী বন্ধু পরস্পরের নিকট হইতে অনেক দূরে ছিল। প্রথমটীর নাম হার্বার্ট। প্রথমটীর মৃত্যুর কথা দ্বিতীয়টীর কাছে গোপন রাখা হয়। তথাচ দ্বিতীয়টীর আপনার লোকেরা বলেন যে, সে যখন মরে, তখন নাকি সে বলিয়াছিল, "কি, হার্বার্ট, তোমাকে দেখে আমি সুখী হলাম।" (১৯১৯, ২৯শে মার্চ্চের অমৃতবাজার পত্রিকা দেখুন। পত্রিকা লজের সহিত কোন দর্শকের যে কথোপকথন হয়, তাহা কোন ইংরাজী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।) হা অদৃষ্ট! এটা হইল আবার একটা "প্রমাণ"। ধরুন, সত্য সত্যই যেন দ্বিতীয় বালক মৃত্যুর সময় ঐ কথাগুলি বলিয়াছিল। ইহাতেই কি প্রমাণ হইল যে, প্রথম বালকের প্রেত আত্মা পরলোক হইতে আসিয়া দ্বিতীয় বালককে দেখা দিল! এ ব্যাপারের সহজ ও সম্ভবপর ব্যাখ্যা ত পড়িয়া রহিয়াছে। দ্বিতীয় বালক

* তুমি, আমি অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যাহা দেখিতে শুনিতে পাই না, তাহা দেখিবার শুনিবার ক্ষমতা বা তদ্রূপ তথা-কথিত ক্ষমতা Clairvoyance নামে পরিচিত। যেমন একটা বাক্সর মধ্যে কি আছে, তাহা পূর্ব্বে না জানিয়া শুনিয়া বলিতে পারিবার ক্ষমতা।

হয় ত স্বপ্ন দেখিতেছিল, তার বন্ধুর সম্বন্ধে। আর ওরূপ স্বপ্ন দেখাও স্বাভাবিক। রোগ-শয্যায় অনেকেই বন্ধুবান্ধবের কথা মনে করে ও তাহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করে। মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যে বিষয় খুব ভাবে এবং যা খুব দেখিতে বা পাইতে ইচ্ছা করে, অনেক সময় সেই বিষয়ে স্বপ্ন দেখে। এখানে স্বপ্নে হয় ত দ্বিতীয় বালক প্রথম বালককে দেখিয়া ঐ কথাগুলি বলিয়াছিল। স্বপ্নে অনেকে কথাও কয়। আরও এক ব্যাখ্যা আছে। মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে মানুষ তার সম্মুখে এমন সব জিনিস দেখে, যা আদবেই তার সম্মুখে নাই। পাগলেরা এরূপ প্রায়ই দেখে। পাগলের মনোবিজ্ঞান যাঁরা ভাল রকম জানেন, তাঁরা সকলেই ইহা বিশেষরূপে জানেন। পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় বালকটী মরিতে বসিয়াছে—তার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ থাকা সম্ভব নয়। সে যে মনে করিবে যে, তার প্রিয় বন্ধুকে সম্মুখে দেখিতেছে, এতে বিচিত্রতা কিছুই নাই। একটী হিন্দু বিধবার কথা এখানে মনে পড়িয়া গেল। তিনি কোথাও পাচিকা ছিলেন। রাঁধিয়া রাঁধিয়া আগুনতাতে কাজ করিয়া তাঁর শরীর জীর্ণ শীর্ণ হয়। পরে তিনি পাগল হইয়া যান। এই পাগল অবস্থায় তিনি একদিন আমাদের বাটীতে আসেন। তাঁকে হিন্দু বিধবার উপযুক্ত খাদ্য দেওয়া হইল, (ভাত, ডাল, নিরামিষ তরকারি ইত্যাদি।) তিনি সজোরে বলিলেন, "আমাকে হাঁসের ডিম্ খেতে দিয়েছিস্, আমি উহা খাব না।" এই বলিয়া যে পাথরে ভাত দেওয়া হইয়াছিল, তার উপর এক পা ঘুরাইয়া চলিয়া গেলেন। অথচ তখন বাটীতে হাঁসের ডিমের নাম গন্ধও ছিল না। ঐ হিন্দুবিধবা সুস্পষ্টভাবে হাঁসের ডিম দেখিলেন সেখানে, যেখানে হাঁসের ডিম আদবেই নাই। পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় বালকের দশা যে কতকটা এরূপ হয় নাই, তাহা কে বলিল? আর এ সব সহজ, স্বাভাবিক, সম্ভবপর ব্যাখ্যা থাকিতে এক অলৌকিক ব্যাপার আনিয়া—ভূত, প্রেত আনিয়া ব্যাখ্যা করিবার কি প্রয়োজন? লজ্ এখানে জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, নিজের নিয়ম নিজে ভঙ্গ করিতেছেন। তিনি মুখে বলেন, "Every known agency must be worked to the utmost before one is willing to admit an unknown one." (See Oliver Lodge's *Survival of Man* P. 220.) কিন্তু এখানে নিজে এ কাজে ত তাহা করিলেন না! লজের প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে সব "প্রমাণ" কম বেশী এই রকমেরই!

লজের নিজের এক পরীক্ষার কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। এ পরীক্ষা যদি সফল হইত, তাহা হইলে সকলকেই বলিতে হইত, প্রেততত্ত্বের স্বপক্ষে প্রমাণ আছে। পরীক্ষাটী এই। ইংরাজী বর্ণমালার (Alphabet এর) সব অক্ষরগুলি একটু একটু ভিন্ন ভিন্ন কাগজে লেখা হইল। না দেখিয়া কেহ উহার কতকগুলি লইয়া একটী ছোট বাক্সের ভিতর পুরিলেন। সুপ্রসিদ্ধ "মধ্যবর্ত্তী" (medium) Mrs. Piperকে বলা হইল, তিনি বলুন, বাক্সের ভিতর কি কি অক্ষর পোরা হইয়াছে। Mrs. Piper বাক্সটী নাড়িলেন, কপালে ছোঁয়াইলেন, তারপর দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, এই এই অক্ষর আছে। বাক্স খুলে যখন মেলান গেল, তখন দেখা গেল যে, "ভূত"গ্রস্ত Mrs. Piper বাক্সের ভিতর কি কি অক্ষর পোরা হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারিলেন না। যেখানেই এইরূপ পরীক্ষা করা হইয়াছে—অর্থাৎ যে স্থলে কোনরূপ ভুল ভ্রান্তি, প্রেততত্ত্ববাদীদিগের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত জুয়াচুরি, মিথ্যা, প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা নাই, সেই খানেই প্রেততত্ত্ববাদীরা নিষ্ফল হইয়াছেন। আর যেখানে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ভুল, ভ্রান্তি, প্রবঞ্চনা, ছলনার স্থান আছে, সেইখানেই উহাঁরা কৃতকার্য্য হন। নিরপেক্ষ পাঠক, এটা কি ভাবিবার বিষয় নয়? এরূপ দেখিয়া কোন্ নিরপেক্ষ লোক প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করিতে পারেন? (পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষাটী লজ তাঁহার *Survival of Man*এ বর্ণনা করিয়াছেন।)

"ভূতে" সংবাদ (message) দেয় কোন

"মধ্যবর্ত্তী"র দ্বারা, এ কথায় লজ বিশ্বাস করেন। কেন বিশ্বাস করেন, তার উত্তরে বলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন for "Reasons which I should find it hard to formulate in any, strict fashion." (Oliver Lodge's *Survival of Man.* P. 321.) কেন? "Reasons" দিতে অপারগ কেন? বিশ্বাস করেন, আর reasons স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন না? কথাটা নিশ্চয়ই সন্দেহজনক। এক জন শাদাসিদে মানুষ সহজেই মনে করিবেন যে reasons নাই, তা reasons দিবেন কি! আমাদেরও তাই বিশ্বাস।

আর, প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিষয়ে লজের নিরপেক্ষ ভাবে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা আছে কি না, তাহাতেই আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। মানুষ যখন যে বিষয়ে বিশ্বাস করিতে খুব ইচ্ছা করে, তখন সে বিষয়ের স্বপক্ষে প্রমাণ চতুর্দ্দিকেই দেখিতে পায়, কিন্তু বিরুদ্ধ প্রমাণ দেখিতে পায় না; একেবারে অন্ধ হইয়া পড়ে—বিচার-শক্তি-বিহীন হইয়া পড়ে। লজের দশা তাই হইয়াছে। প্রমাণ? প্রমাণ আছে। খুব সংক্ষেপে কেবল একটী প্রমাণের কথা বলিব। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে লজ Eusapia নামক একটী অশিক্ষিত ইটালি-দেশীয় স্ত্রীলোক "মধ্যবর্ত্তী"র কথায় বিশ্বাস করিয়া "ভূত" দেখিলেন। দেখিলেন—"ভূতে" ভারি ভারি জিনিস ঘরের একদিক হইতে আর এক দিকে লইয়া যাওয়া রূপ সব অলৌকিক ক্রিয়া করিতেছে, আর ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে—অর্থাৎ এক বৎসর পরেই—নিজেই বলিলেন যে, ঐ স্ত্রীলোকটী প্রতারক, আর কেম্ব্রিজের একটী অধিবেশনে (১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) ঐ স্ত্রীলোক যে সব "ভূতের" ব্যাপার দেখাইয়াছে, সবই মিথ্যা। (Clodd's *The Question.* P. 118) এইরূপ আরও প্রমাণ আছে। স্থানাভাবে বলিতে পারিলাম না। অতিরিক্ত বিশ্বাস-প্রবণতা আর কাহাকে বলে? লজ পূর্ব্বোক্ত রূপে বার বার প্রবঞ্চিত হইয়াছেন, তবুও বিশ্বাস করিতেই হইবে—এই দিকেই তাঁর ঝোঁক ও ইচ্ছা। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে এরূপ লোকের কথায় বিশ্বাস করায় সমূহ বিপদ আছে! বাস্তবিকই লজের অবস্থা শোচনীয়। বৃদ্ধ বয়সে ছোট পুত্রটী (Raymond) হারাইয়া অধীর হইয়াছেন—ইহার জন্য অবশ্য কার প্রাণের সহানুভূতি না ঐ শোকার্ত্ত বৃদ্ধের দিকে ছুটিবে? কিন্তু আর এক অর্থেও শোচনীয়। তিনি বিশ্বাস করেন, তাঁর ঐ মৃত পুত্রের প্রেত-আত্মা "মধ্যবর্ত্তী"দিগের দ্বারা তাঁর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে—বিশ্বাস করিতেছেন, ঐ প্রেত আত্মা বলিতেছে, স্বর্গে ইট্ পাথর আছে; চুরোট (cigar) প্রস্তুত করিবার কারখানা আছে, তবে কি না চুরোটগুলা তত ভাল নয়; "ওপুরী"তে প্রেতদের মধ্যে কেহ কেহ চুরোটও খায়; সোডাওয়াটারের কারখানাও আছে; হুইস্কির (whiskyর) ভাটিও আছে, তবে কি না এ সব বায়বীয় অর্থাৎ কোন গ্যাসের দ্বারা প্রস্তুত; আর রেমণ্ডের প্রেতের কাপড় পৃথিবীর পচা পশমে ("rotting wool"এ) প্রস্তুত হইয়াছে; ইত্যাদি ইত্যাদি। (*Raymond*, P. 189, 198.) হা অদৃষ্ট! সত্তর, বাহাত্তর বৎসর বয়সে লজ ঐসব ছাই ভস্ম তাঁর পুস্তকে লিখিতেছেন, আর পৃথিবীময় ছড়াইতেছেন! এ ব্যাপারকেও 'শোচনীয়' বলিব না ত আর কি বলিব? তবে একটা সান্ত্বনা আছে, স্বর্গেও যদি whiskyর ব্যাপার থাকে, তাহা হইলে বোধ হয় অনেক ভাল লোকই স্বর্গে যাইতে চাহিবেন না!

ভূত প্রেতের অস্তিত্বের প্রমাণ সম্বন্ধে লজের নিজেরই একটী কথা পাঠক মহাশয়কে বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। লজ মনে করেন, প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে দুই রকম "প্রমাণ" আছে। এক হইল সাধারণ "প্রমাণ", যাকে লজ "Popularly speaking" proof বলেন। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি;—মুমূর্ষু বালকের মৃতবন্ধুর আত্মাকে দেখা। আর দ্বিতীয় প্রকারের "প্রমাণ"কে লজ বৈজ্ঞানিক ধরণের প্রমাণ "Scientifically speaking" Proof বলেন। লজ

অবশ্য তাঁর এই বৈজ্ঞানিক ধরণের "প্রমাণে"ও বিশ্বাস করেন। কিন্তু লজ নিজেই বলিতেছেন, প্রেততত্ত্বের এই শ্রেষ্ঠতর প্রমাণকেও আর একজন লোক ন্যায়তঃই প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত না করিতে পারেন। লজ বলিতেছেন:—"But it is a matter of opinion on which students who devote sufficient time and attention may legitimately differ. ..." (Vide id Amrita Bazar Patrika) প্রিয় পাঠক, উক্ত উক্তির "legitimately" (ন্যায়তঃ) এই শব্দের উপর বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন। ইহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, লজের সেই বৈজ্ঞানিক ধরণের প্রমাণ কি প্রকার সামগ্রী, যে প্রমাণ সম্বন্ধে এক জন legitimately 'হাঁ ঠিক' বলিতে পারেন, আর একজন 'না, ঠিক নয়' বলিতেও পারেন, তাও "legitimately" 'হাঁ', 'না',—এখানে এই দুয়েরই মূল্য সমান। ধন্য লজের বৈজ্ঞানিক ধরণের প্রমাণকে !!

লজের এই বৈজ্ঞানিক ধরণের প্রমাণের দশা যখন তাঁহার নিজের মতেই এইরূপ, তখন লজ কাহাকে তাঁর বৈজ্ঞানিক ধরণের প্রমাণ বলেন, সে বিষয়ের বর্ণনা ও সমালোচনা করা অনাবশ্যক। আর স্থানাভাবও বটে। তবে পাঠকের ব্যাপারটা কি জানিবার ইচ্ছা উদ্রিক্ত হইতে পারে। এই ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য ঐ "প্রমাণটী" কি জিনিস, তাহা সংক্ষেপে, অতি সংক্ষেপে বলিব—সাত কথায় সাতকাণ্ড রামায়ণ শেষ করিব। প্রেততত্ত্ববাদীরা যাহাকে "Cross Correspondence" বলেন, লজের উক্ত "বৈজ্ঞানিক প্রমাণ" তাহাই। "Cross Correspondence" ব্যাপারটা এইরূপ:—মনে করুন ক—নামক একটী "মধ্যবর্ত্তী" (medium) বিলাতে আছেন, আর খ—নামক আর একটী মধ্যবর্ত্তী ভারতবর্ষে আছেন। ক আর খ পরস্পরের অপরিচিত। আরও মনে করুন ক যেন গ্রীস্ দেশের পুরাকালের কোন সাধারণতঃ অজ্ঞাত ব্যাপারের একটু অংশ আপনা আপনি, ইচ্ছার অবর্ত্তমানে ("automatically") লিখিলেন। আর সেই সময়ে বা তার কিছুদিন পরে খও ঐরূপ আপনা-আপনি, ইচ্ছায় অবর্ত্তমানে বাকী অংশটুকু লিখিলেন—ক কি লিখিয়াছেন তাহা না জানিয়াই। এখন, কেবলমাত্র ক'র লিখিত অংশ হইতে গ্রীসের ঐ ব্যাপারটা কি বোঝা গেল না, সেইরূপ কেবলমাত্র খ'র লিখিত অংশ হইতেও ঐ ব্যাপারটা কি বোঝা গেল না। তারপর একজন গ্রীসের পুরাতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ঐ দুইটী অংশকে একত্রিত করিয়া, অনেক মাথা ঘামাইয়া দেখাইলেন যে, ঐ দুইটী অংশ গ্রীসের পুরাকালের একটী ব্যাপারের কথাই বলিতেছে। ইহাকেই "Cross Correspondence" বলে। প্রেততত্ত্ববাদীরা বলেন যে, যদি "ভূতে" ঐ মধ্যবর্ত্তীদের না লেখাইবে ত কে লেখাইবে? আর যদি একটী "ভূত"ই মতলব আঁটিয়া ঐ দুই মধ্যবর্ত্তীরই হস্ত না চালাইবে, তাহা হইলে ঐ দুইটী স্বতন্ত্রভাবে লিখিত লিপির এরূপ অর্থ-সামঞ্জস্য কিরূপে হইবে? এই ছাই ভস্মই এই "ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ"টি লজের পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিক ধরণের প্রমাণ। এখানে আমাদের মতে অনেক আপত্তি ও গোলযোগ (fallacies) আছে। প্রথমতঃ—ভূতের সাহায্য ব্যতীত আপনাআপনি হাত চলা (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ Automatic writing) অসম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ—মধ্যবর্ত্তীরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক, পরোক্ষভাবে পরস্পরের সহিত পরিচিত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ—এক মধ্যবর্ত্তী কি বিষয়ে লিখিয়াছেন, দ্বিতীয় মধ্যবর্ত্তীর কিছুদিন বাদে তাহা জানা অসম্ভব নয়। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বিলাতের Psychical Research Society নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। অনেক প্রেততত্ত্ববাদী ঐ সমিতির দোহাই দেন। ঐ সমিতি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত। আজ ৩৬ বৎসর ধরিয়া "ভূতের" অস্তিত্ব সম্বন্ধে "প্রমাণ" সংগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু যাকে প্রমাণ বলে, এমন প্রমাণ ত আমরা একটীও দেখিলাম না। আমরা ত ছার। Prof.

Henry Sidgwick (ইনি কেম্ব্রিজের Moral Philosophyর অধ্যাপক ছিলেন)—যাঁর নিরপেক্ষতার, সাহসের ও সত্যপ্রাণতার প্রশংসা প্রেততত্ত্ববাদীরাও না করিয়া থাকিতে পারেন না; যিনি অনেক বৎসর ধরিয়া উক্ত সমিতির সভাপতি ছিলেন—তিনিও কোন প্রমাণ দেখিতে পান নাই। "Sidgwick was never persuaded into belief." (See Prof. Armstrong Ph. D., L. L.D., D. Sc, F. R. S.এর Postscript in Clodd's *Question* P. 30[?].) এটা কি কম কথা! প্রেততত্ত্ববাদীদিগের ইংলণ্ডস্থ প্রধান সমিতির সভাপতিই প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধানের পর বলিতেছেন যে, প্রমাণ নাই! জগৎবিখ্যাত মার্কিন (American) জ্যোতির্বিৎ—Simon Newcomb—যিনি অনেক বৎসর ধরিয়া উক্ত সমিতির মার্কিন শাখার সভাপতি ছিলেন—তিনিও ঐ কথাই বলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"Nothing has been brought out by the research of that Society and its able collaborators except what we should expect to find in the ordinary course of nature." (Nineteenth Century, Jan. 1909 P. 139.) এই কথাগুলিও কি ভাবিবার বিষয় নয়? আরও শুনুন। Frank Podmore একজন অতি স্থিরবুদ্ধি সুলেখক। তিনি সমিতির তথা-কথিত প্রমাণসমূহ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি "ভূতে"র অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পান নাই; কিন্তু রাশীকৃত প্রবঞ্চনার প্রমাণ পাইয়াছেন। যাঁরা প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁদের উচিত Podmoreএর পুস্তকগুলি (*Modern Spiritualism* ইত্যাদি) দেখা। Joseph Mc. Cabeও একজন সুলেখক। এ সম্বন্ধে তাঁহার *The Religion of Sir Oliver Lodge* নামক পুস্তকও দ্রষ্টব্য। আর Cloddএর *The Question* নামক সুলিখিত পুস্তকখানিও পঠিতব্য। (আমরা এই সুযোগে বলিয়া রাখিতে চাই যে, এই প্রবন্ধটী লিখিবার সময় আমরা ঐ সকল পুস্তক হইতে নানা বিষয়ে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি)

যাহা সংক্ষেপে লেখা হইল, তাহা হইতেই পাঠক মহাশয় বিচার করিবেন, প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করা যায় কি না। শেষে আমাদের নিজের সম্বন্ধে একটী কথা বলিয়া রাখিতে চাই। কেহ যদি এই প্রবন্ধের উত্তর দেন, তাহা হইলে আমরা প্রত্যুত্তর দিতে পারিব না। গরিব ডাক্তারের সে সময় নাই। এই প্রবন্ধটী লিখিতেই যথেষ্ট সময় ও পরিশ্রম ব্যয় হইয়াছে। কর্ত্তব্যানুরোধে ও দেশের উপকারের জন্যই এ ক্ষতি স্বীকার। আরও, কথা কাটাকাটি যথেষ্ট হইয়াছে। আমরা স্বীকার করিয়া লইতেছি, প্রেততত্ত্ববাদীরা তাঁদের স্বপক্ষের "প্রমাণ"স্বরূপ স্তুপাকার গল্প লিখিয়া আমাদের চাপা দিতে পারেন। কিন্তু তাতে ত ফল কিছু হবে না। আমরা সাদাসিদে লোক; আমরা প্রমাণ চাই,—অনেক দিন পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি। প্রমাণ দাও, এখনি বিশ্বাস করিব। কিন্তু বুজরুকী-শূন্য প্রমাণ চাই; জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ছলনা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা-শূন্য প্রমাণ চাই;—যে প্রমাণ সকলে বুঝিতে পারে;—যে প্রমাণকে সকলেই প্রমাণ বলিবে। যেমন আমরা একটী ঘরের উত্তর দিকে একটী টেবেল রাখিব, তার পর দরজা জানালা বন্ধ করিব, তার পর "ভূত" আসিয়া টেবেলটীকে দক্ষিণ দিকে সরাইয়া রাখিবেন; বা এইরূপ কোন প্রমাণ। কেহ যদি এইরূপ প্রমাণ দিতে পারেন, আমরা তাঁকে দশহাজার টাকা দিব। আর তিনি যদি না পারেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে দশ হাজার দিবেন। এটী কথার কথা নয়। সত্য সত্যই আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি। যদি কেহ থাকেন, আহ্বান করিতেছি আসুন। কিন্তু কথার পুঁটুলি চাই না। উক্ত আহ্বানটী একটু "চোয়াড়ে" গোছের বটে, কিন্তু উপায় নাই।

শ্রীশশিভূষণ মিত্র।

অমরত্ব

ইহ জগতে জীবমাত্রেই মৃত্যুর অধীন। জীব মধ্যে মানবই স্রষ্টার চরম সৃষ্টি, যে হেতু, ভগবান মানব অন্তরে যে সকল উৎকৃষ্ট গুণাবলী—জ্ঞান বুদ্ধি চৈতন্য ও বিবেক বিচার প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন, তৎসমুদয় অপর কোন প্রাণী মধ্যে প্রদত্ত হয় নাই, সুতরাং মানবই জীব-জগতে সকল প্রাণী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; পরন্তু তাহারাও এই মৃত্যুর অধীন। অনাদি কাল হইতে জীবের এই জন্ম-মৃত্যু প্রবাহ-প্রণালী চলিয়া আসিতেছে—সকলেই তাহা দেখিতেছেন, জানিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, প্রকৃত প্রবুদ্ধ ব্যতীত, ইহার এই তত্ত্ব মীমাংসা করিতে অথবা এই প্রণালী অতিক্রম করিতে কেহই কখন কোন প্রয়াস পান নাই; ফলতঃ তাঁহারা অপর সাধারণ জীবের ন্যায় কাম ক্রোধাদি বিষয় বিভবে আকৃষ্যমান হইয়া পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি নানা যোনীতে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও মূহ্যমান হইতেছেন। এই সকল অবগত হইয়াও তাঁহারা কদাচিৎ তৎপ্রতীকার সাধনে যত্নবান হন; বেদান্ত প্রতিপাদ্য বিষয়ে তাঁহারা একবারে উদাসীন। তাঁহারা বিষয়বিষে এতই বিমোহিত যে, ভোগ লালসায় অন্ধের ন্যায় তাহাতেই পরিভ্রমণ করিতেছে এবং তৎফলে গর্ভ, জন্ম, জরা মরণাদিরূপ সংসারের রচনা করিয়া তাহাতেই পরিবর্ত্তিত এবং তাহাতেই পুনঃ পুনঃ মরণাদি ক্লেশ অনুভব করিতেছে; অজ্ঞান প্রভাবে যাহা বরিষ্ঠ, তদ্বিষয়ে তাহাদিগের আদৌ অভিনন্দন নাই।

এক্ষণে মৃত্যু কি এবং কি উপায়ে তাহা অতিক্রম করা যায়, তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে ঋষিগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এস্থলে তাহাই সংক্ষেপে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

ইহ সংসারে জ্ঞানী লোকের নিকট মৃত্যু বলিয়া কোন পদার্থ নাই। যাহারা অবিদ্যাভিভূত, যাহাদের আত্মবুদ্ধি দেহাদিতে আরোপিত, তাহারাই মৃত্যুর কল্পনা করিয়া থাকে; ব্রহ্মাত্মতত্ত্ববিদ্‌গণ মৃত্যুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কারণ মৃত্যু বলিয়া যদি কোন মারক পদার্থ থাকিত বা তাহার কোনও অধিপতি থাকিত, তাহা হইলে তাহার আকৃতি ও বাসস্থান সকলের প্রত্যক্ষীভূত হইত। অনেকে হয় ত বলিতে পারেন যে, সাবিত্রী মৃত্যুর আকৃতি দেখিয়াছিলেন—ইহা সত্য, পরন্তু, বর্ণিত বিষয় সত্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা মুখ্য মৃত্যু নহে—তাহা মোহ অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান অথবা প্রমাদ হেতু অনাত্ম দেহাদিতে আত্মাভিমান। শাস্ত্রে

"যো মোহমিথ্যাজ্ঞানমনাত্মনি
আত্মাভিমানঃ স মৃত্যুঃ।"

বৃহদারণ্যকে "প্রমাদাখ্যৎজ্ঞানস্য সাক্ষান্মৃত্যুত্বং দর্শিতম্।" সুতরাং সাবিত্রীর মৃত্যুরূপ দর্শন হইলেও তাহা প্রমাদাখ্য অজ্ঞান বা মোহ ব্যতীত আর কিছুই নহে; "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ" জীবগণ অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন হেতু মোহ প্রাপ্তবশতঃ প্রকৃত বিষয় উপলব্ধি করিতে অসমর্থ, ফলতঃ, তাহারা এইরূপে মৃত্যু আছে বলিয়া মনে করিয়া থাকে। পরন্তু ইহাই সিদ্ধান্ত যে, প্রমাদ বা অজ্ঞানই মানবের প্রকৃত মৃত্যু। এক্ষণে দেখিতে হইবে, ইহা কোন্ কোন্ রূপে অবস্থিত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মানবগণ অনাত্মায় আত্মজ্ঞান আরোপ হেতু দেহাভিমানী হইয়া থাকে; এতদ্দ্বারা মানবগণের মনে তমভাবের (অহঙ্কারের) আবির্ভাব হয় এবং তৎপ্রভাবে আমি ব্রাহ্মণ, আমি শ্রেষ্ঠ, আমি সুন্দর, আমি জ্ঞানী ইত্যাদি নানাবিধ ভাব মনে মনে পোষণ করে, রাগদ্বেষাদি সমন্বিত হইয়া প্রকৃত পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। কারণ অহঙ্কার হইতে কামের উৎপত্তি হয়, কাম কাম্য বস্তুতে বিচরণ করে এবং প্রতিহত হইলে তাহা হইতে ক্রোধ, চিত্তের বৈলক্ষণ্য ও মোহ উপস্থিত হয়। এবম্বিধ ব্যাপারে অর্থাৎ এইরূপ পর্য্যায়ক্রম ভাবে মানবগণ প্রবল রিপুর প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গীতাদিগ্রন্থে—"সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে। ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।" ইত্যাদি প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এবম্বিধ প্রকারে দেহাভিমানী মানবগণ মোহের বশবর্ত্তী হইয়া প্রমাদরূপ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতঃপর, ইহলোক হইতে পিতৃযান-পথ অবলম্বন করিয়া লোকান্তরিত হয় এবং তথায় কর্ম্মানুযায়ী ভোগকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া পুনরায় যোনিজন্ম গ্রহণের জন্য প্রত্যাক্পথে ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ইন্দ্রিয়গণ তাহার দেহধারণের সঙ্গে তখন তাহার অনুগামী হয় এবং পূর্ব্বসংস্কারানুযায়ী তাহারা সেই দেহধারীকে ভোগবাসনানুরূপ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। ফলতঃ তৎপ্রভাবে পুনঃ পুনঃ মোহগ্রস্ত হয়, স্ত্র্যাদি কমনীয় কাম্য বিষয়ে সমাসক্ত ও তাহাতেই মুহ্যমান হয়, ভোগে তাহার উপশম না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে, সুতরাং তাহারা স্বায় ব্রহ্মজ্ঞানে বঞ্চিত হয়, ফলতঃ এবম্বিধ প্রকারে "জন্মমরণপ্রবন্ধং আরূঢ়ো ন কদাচিৎ মুচ্যতে" জন্ম মরণ প্রণালী হইতে কখন মুক্ত হইতে পারে না। অতএব আপন অজ্ঞানই আপনার মৃত্যুর কারণ। ধীর ও বিবেকীগণ ধীরতার দ্বারা বিষয় (কাম্য পদার্থ) সকল বর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় এবং অমরত্ব লাভ করিয়া থাকে। এই সকল বুধ আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভেদ জানিয়া ব্রহ্মজ্ঞ হন এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।

অনশ্বর মানবগণ, যে দেহের জন্য এতাধিক মমতা, এত অভিমান, এত গর্ব্ব করিয়া থাকে, স্ত্রী, পুত্রাদি রমণীয় বিষয়াভিমুখে অন্ধের ন্যায় ধাবিত হয়, তাহাও তমঃ মাত্র—অজ্ঞানেরই কল্পনা বা বিকার ব্যতীত আর কিছুই নহে, জড় পদার্থ অপিচ মূত্র পুরীষাদি পরিপূর্ণ নরক সদৃশ। মন্বাদি ঋষিগণ বলিয়াছেন :—

"অস্থি স্থূণং স্নায়ুবদ্ধং মাংস ক্ষতজলেপনম্।
চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধি পূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ॥
জরাশোক সমাবিষ্টং রোগায়তন মাতুরম্।
রজস্বলমনিত্যঞ্চ ভূতবাস মিমং ত্যজেৎ॥"

এই অস্থির খুঁটি স্নায়ুর দ্বারা আবদ্ধ মাংস ও রক্ত প্রলিপ্ত চর্ম্মাবৃত, মল-মূত্রাদির আধার—জরা, শোক প্রভৃতির আগার এই যে ভূতাবাস, ইহা অনিত্য, ক্ষণবিধ্বংসী; সুতরাং জ্ঞানীগণ ইহা জানিয়া তাহার প্রতি মমতা রাখেন না। অজ্ঞান ব্যক্তিবর্গ মোহ প্রযুক্ত তদ্দেহ কমনীয় জ্ঞান করিয়া তদভিলাষী হয় এবং অন্ধের ন্যায় তদনুগমন করে; সুতরাং তাহারা ভোগ-বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে পায় না। তাহাদিগের আত্মা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হেতু স্বায় ব্রহ্মভাব

তাহাদের অন্তরে আদৌ উদিত হয় না। ফলতঃ তাহাদের এই নিরর্থক দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদি বিষয়-প্রবৃত্ত অজিত আত্মাই আপনার মৃত্যুর হেতু,—"আত্মৈব হ্যাত্মনো-বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।"

এক্ষণে দেখা যাউক, কি উপায়ে মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মানব অজ্ঞানতা প্রযুক্ত মৃত্যুর বশতাপন্ন হয়, এবং এই অজ্ঞানতা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-বিষ-সমদ্ভূত মোহ বা প্রমাদ হইতে অন্য কিছুই নহে। এই প্রমাদ কাম ক্রোধাদি-রূপে উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় (রূপাদি) এই প্রমাদের হেতু, ইহারা আপনাপন স্বভাবে চক্ষু প্রভৃতি স্থান হইতে নির্গত হইয়া রূপাদি জ্ঞান জন্মাইয়া মানব-গণকে মোহিত করে, অর্থাৎ মোহ প্রাপ্ত করায়, তদ্দ্বারা মানবের বিষয় ধ্যান ব্যতীত অন্য জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায় এবং "ইদং বিষয়ৈর্বিমোহনং তৎ ভবায় গর্ভ জন্ম জরা মরণ সংসারায় ভবতি"। এই বিষয় বিমো-হনই গর্ভ জন্ম জরা মরণাদিরূপ সংসা-রের কারণ, এবং "বিষয়াভিধ্যানেন কামা-নম্বুবিনশ্যতি—মৃত্যুং ন তরন্তি কদাচনঃ।"

অতএব যাহাতে মানব এই সকল অতি-ক্রম করে তদ্বিষয়ে প্রযত্ন করা বিধেয়। এ জন্য শাস্ত্রকারগণ "জ্ঞানে তিষ্ঠন" জ্ঞানে অবস্থান করিবে, অর্থাৎ চিৎ সদানন্দ আত্ম-চৈতন্যে অবস্থান করিবে, এইরূপ উপদেশ প্রদান করেন। প্রমাদাখ্য মৃত্যু ক্রোধাদি রূপে জায়মান; "এবং বিদিত্বা তত্তদ্দোষান্ পরিত্যজ্য অক্রোধাদীন্ সম্পাদ্য জ্ঞানেন চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মাবস্থা না অবতিষ্ঠন্।" এ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা এই যে, ভগবান, মানবগণকে যে সকল জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণাবলী প্রদান করিয়াছেন, তাদৃশ অপর কোন প্রাণী মধ্যে প্রদান করেন নাই, সুতরাং তাহারা বিবেক বুদ্ধি দ্বারা সদসৎ বিচার করিয়া দেখে তাহা হইলে অনায়াসে এই সকল দোষ উন্মূলিত করিতে সমর্থ হয় এবং ধীরে ধীরে তাহার অন্তরে আত্মচৈতন্যের বিকাশ হয় এবং প্রাতিভ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে; এই জ্ঞানে দৃঢ়রূপে অবস্থিত থাকিতে পারিলে, এবং তাহার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে মানব তখনই জ্ঞানে তিষ্ঠন্ অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানে অবস্থান করিয়া থাকে।

প্রকৃত জ্ঞানের উন্নতি সাধন করিতে হইলে, মানবের বেদান্ত-প্রতিপাদ্য বিশুদ্ধ কর্ম্মে সমাসক্ত হওয়া প্রয়োজন, কারণ তদ্দ্বারা চিত্তের পরিশুদ্ধি হইয়া থাকে। চিত্তের শুদ্ধতা ব্যতীত বিমল জ্ঞান উদয় হয় না। অতএব মানব চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত প্রথমে সচ্চিদানন্দ সর্ব্বেশ্বরের উদ্দেশে যথা-সাধ্য কায়মনোবাক হইয়া বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, এবং যাবৎ না চিত্তের বিশুদ্ধতা সম্পন্ন হয়, ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ ও বিলাসে বৈরাগ্য উদয় হয়, তাবৎ কামনা-শূন্য হইয়া মানবের কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। এইরূপে বিশুদ্ধসত্ত্ব হইলে মানবের জ্ঞানের উদয় হয়।

এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, যাঁহারা ব্রহ্মদর্শী, জ্ঞানমার্গ যাঁহারা অবলম্বন করেন, যাঁহারা মোক্ষপথের যাত্রী, তাঁহারা কর্ম্ম করিবেন কেন? কর্ম্ম যখন মুক্তি পথের পরিপন্থী এবং বন্ধনের কারণ, তখন "জ্ঞানা-মৃতেন তৃপ্তস্য কর্ম্মণা প্রজয়া চ কিম্" তাদৃশ জ্ঞানামৃত পরিতৃপ্ত পুরুষের কর্ম্মের প্রয়োজন কি?

সত্য বটে, কর্ম্ম যখন বন্ধনের কারণ,

তখন তাহার অনুষ্ঠান বিফল, কিন্তু ইহা একেবারে বিফল নহে, কারণ বিশুদ্ধ কর্ম্ম ক্রম-মুক্তির কারণ, তদ্ব্যতীত কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইয়া থাকে এবং জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার অনুষ্ঠান আবশ্যক। পরন্তু "ঈশ্বরার্থতয়া ফল নিরপেক্ষ মনুষ্ঠীয়মানানি ন বন্ধন হেতুনি"। বিশুদ্ধভাবে কামনারহিত হইয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম করিলে তাহা বন্ধনের হেতু নহে, কর্ম্মীরা নিষ্কাম কর্ম্ম* করিয়া দেবযান পথে ব্রহ্মলোকগামী হয়, এবং তথা হইতেই মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। আরও ঈশ্বরাজ্ঞা বোধে কর্ম্ম করিলে তদ্দ্বারা মনের অমর্ষ মল বিদূরীত হয় এবং জ্ঞানের সহায়তা করে।

"কষায়পক্তিঃ কর্ম্মানি জ্ঞানন্ত পরমা গতিঃ।
কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্কে ততোজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে॥
—(গীতা)

অনন্তর প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভ হইলে তখন তাহার আর কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না;—

"নাবার্থী হি ভবেত্তাবৎযাবৎ পারং ন গচ্ছতি।
উর্ত্তীনে তু সরিৎপারে নাবা বা কিং
প্রয়োজনম্"॥

এইরূপে মানব "জ্ঞানে তিষ্ঠন" অর্থাৎ প্রমাদ বা মোহ বিনষ্ট হইয়া, আপন ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করিতে পারগ হয় এবং জ্ঞানে অবস্থিত হয়। এবম্বিধ পুরুষই মহান ও বীতমৎসর।

জ্ঞান কি, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা আবশ্যক। মনুষ্যের যে জ্ঞান তাহা সাধারণতঃ দুই প্রকার—স্বাভাবিক ও সম্পাদ্য; যাহা অভ্যাস ব্যতিরেকে জন্মে, (যেমন আহার, নিদ্রা, ভয়) তাহা স্বাভাবিক, আর যাহা শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা লাভ করা হয়, তাহা সম্পাদ্য। এই সম্পাদ্য জ্ঞানকে পূর্ব্বাচার্য্যগণ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন—জ্ঞান ও বিজ্ঞান; তন্মধ্যে যাহা কর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত—মোক্ষমূলক আত্মতত্ত্বজ্ঞান, তাহাই শ্রেষ্ঠ বা প্রমা জ্ঞান এবং যদ্দ্বারা বা যে শিল্প দ্বারা ঐ জ্ঞানের নির্ণয় হয়, তাহাই বিজ্ঞান। "মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্প"। এই জ্ঞান মনুষ্য মাত্রেরই অভ্যন্তরে অবস্থিত, পরন্তু তাহা ইন্দ্রিয়াধিকৃত মিথ্যা আবরণ ও মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন, তদ্ধেতু তাহা সংশয়িত ও বিপর্য্যস্ত। পুনঃ পুনঃ পরিমার্জ্জন দ্বারা এই অজ্ঞানাবরণ তিরোহিত হইলে, চিত্তে প্রমাজ্ঞানের উন্মেষ হয়—ইহাই অভ্যাস, শিল্প বা বিজ্ঞান সাপেক্ষ, এতদ্দ্বারা সহজেই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে।

আত্মতত্ত্ব কি? বা আত্মা কি তাহা জানা। এই আত্মা সর্ব্বভূতে কুটস্থ রূপে অবস্থিত,—"গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে প্রবচনেন ন লভ্য" ইহা বাক্যের দ্বারা লাভ হয় না, অথবা চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট হয় না, কেন না "দেহাদিব্যতিরিক্তোঽসৌ" ইন্দ্রিয়াদি মন বুদ্ধি প্রভৃতি অবয়বের কোনটীই আত্মা নহে। ইহা মহান চিৎস্বরূপ নিত্য শুদ্ধ স্বভাব এবং স্বপ্রকাশ; মননশীল জ্ঞানীগণের অনুভবসিদ্ধ। আত্মবিৎ গুরুর উপদেশানুসারে ইন্দ্রিয়াদি বিষয় হইতে পৃথক থাকিয়া ধ্যাননিষ্ঠ হইলে প্রাতিভ জ্ঞান দ্বারা আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে।

বেদান্তবিদ্‌গণের মতে আকাশের ন্যায় মহান্ আত্মা অসংখ্য অন্তঃকরণে অসংখ্য

---

* কর্ম্ম নিষ্কাম কি প্রকারে হইতে পারে? মানব ফলের প্রতি অনুরাগী হইয়াই কর্ম্ম করিয়া থাকে, সুতরাং কামনারহিত কর্ম্ম কিরূপে সম্ভবে? উত্তর, "অকামোবিষ্ণু কামো বা" ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম করা নিষ্কাম কর্ম্মরূপে পরিগণিত ও প্রসিদ্ধ।

প্রতিবিম্ব অর্পণ করিয়াছেন, সেই সেই প্রতিবিম্ব যুক্ত অন্তঃকরণগুলি জীব নামে অভিহিত। "একং সন্তং বহুধা" "অহং বহুস্যাম প্রজায়তে" প্রভৃতি বচন দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, তিনি এক হইয়া কার্য্য ও কারণরূপে বহু; পরন্তু তিনি অজ এক নিত্য ও চিৎস্বরূপ। যাহা নিত্য, তাহা অবশ্যই অমর, চিৎস্বরূপ অর্থাৎ চৈতন্যরূপী তাহাও অজর ও অমর; সুতরাং তাহা,—
"অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এবচ"।
ইহা "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ"।

ঋষি মাত্রেই বলিয়া থাকেন, "নায়ং হন্তি ন হন্যতে" আত্মা কাহাকে মারেন না, নিজেও মরেন না, যেহেতু মরণ নামক কোন পদার্থ নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি মৃত্যু বলিয়া কোন পদার্থ নাই, আত্মার বিনাশ বা ধ্বংস নাই, তবে 'জন্ম মৃত্যু' শব্দের অর্থ কি? সাংখ্যাচার্য্যেরা বলিয়া থাকেন, "অপূর্ব্ব দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাত বিশেষণ সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ" অবয়বাদির অপূর্ব্ব সংযোগ ও বিয়োগ বিশেষের নাম জন্ম বা মৃত্যু, সুতরাং ঐ সকলের অর্থ ঔপচারিক। মৃত্যু বা ধ্বংস সাবয়বেরই হইয়া থাকে, নিরাবয়বের (আত্মার) মৃত্যু বা ধ্বংস নাই। আত্মা যখন দেহেন্দ্রিয়ের সহিত একত্র হয়, তখন শরীরের প্রতি দেহীর লক্ষ্য হওয়ায় মনে করে, আমি জীর্ণ বা বৃদ্ধ হইয়াছি, দেহীর এবম্বিধ অনুভব অধ্যাসমূলক অর্থাৎ দেহাদির সহিত নিরবচ্ছিন্ন অবস্থান হেতু এই অনুভব অভ্যাস বশতঃ স্বভাবস্থ হইয়া যায়। সাধনার দ্বারা এই স্বভাব বিনষ্ট হয়, শুদ্ধ আত্মার এরূপ মনে হয় না, ইহাই অজর অমর আত্মার স্বাতন্ত্র্য লক্ষণ। তবে আত্মা যখন দেখে যে, শরীর জীর্ণ ও শক্তিহীন হইয়াছে, তখনই তাহা সে শরীর ত্যাগ করতঃ নূতন শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী"॥

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দেহেরই ধ্বংস (মৃত্যু) হয়, আত্মার হয় না, দেহের সহিত তাহার বিশ্লেষণ হয় মাত্র, যেহেতু আত্মা চির নিত্য অজ ও অব্যয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং এস্থলে পুনরায় বলা হইতেছে যে, এই নিষ্কল আত্মাকে আগ্রহ ও সাধন ব্যতীত পাওয়া সুদুর্লভ। ইহা একমাত্র বিজ্ঞান—জ্ঞান-লভ্য, অর্থাৎ বুদ্ধিতে মনোবৃত্তি লয়ের দ্বারা লাভ হইয়া থাকে; ইহার অপর নাম সমাধি। ধীমান শিষ্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সদ্গুরুর অনুগত হওতঃ বিধি বিধান ক্রমে তাহা লাভ করিয়া থাকে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, সদ্গুরু সংযোগে মানবের প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত হইলে মানব অন্তরে পূর্ণানন্দ পরমাত্মারূপ পরমজ্যোতিঃ অবলোকন করিয়া থাকে এবং আত্মতত্ত্ববিৎ হওতঃ অজ্ঞান পরিমুক্ত হয় ও অবলীলাক্রমে মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া পরম পূর্ণানন্দ লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

শান্তিশতক।

(কবিবর-শিহ্লন-প্রণীত)

গভীর অনলময় চুল্লী এ সংসার,
দুঃখের অঙ্গার তীব্র রাজে অবিরত,—
—বিষয়-আমিষলুব্ধ মানস-মার্জ্জার,
সাবধান,এ'তে যেন হোয়োনা পতিত। ৭৩

উদিত হইয়া রবি অস্তাচলে যায়,
সঙ্গে সঙ্গে মানবের আয়ুঃ হয় ক্ষীণ,
সম্পাদন করি' বৃথা কর্ম্ম সমুদায়
ভাবিনাকো জীবনের গেল কতদিন!—
দেখিতেছি জন্ম জরা বিয়োগ মরণ,
হৃদয়ে হয় না তবু ভয়ের উদয়!—
হায়রে উন্মত্ত কিরে হয়েছে ভুবন,
প্রমোদ-আসব পান করি' মোহময়? ৭৪

রতি সূত্রে যেই জাল হয়েছে নির্ম্মিত,
স্তনদ্বয় গাঁথা যথা তুম্বী ফল প্রায়—
দেখ না কি হেন জাল করে বিস্তারিত
কন্দর্প কৈবর্ত্ত সদা নারীনদে হায়!
তাই বলি চিত্তমীন ধররে বচন
স্বচ্ছন্দে যৌবন জলে কোরো না ভ্রমণ! ৭৫

যৌবন মোহেতে মজি' নারীদেহ-সরে
কেনরে মানস-হংস যাও বারবার,—
দেখনা কি বিধি তব বাঁধনের তরে
রমণী-ভ্রূরূপে পাশ করেছে বিস্তার? ৭৬

জানিও বিষয় হয় ঘোর বিষধর,
বিষম বিষেতে সদা করে জর্জ্জরিত,
দোষ-দংষ্ট্রা হের এর কিবা ভয়ঙ্কর,
—না থাক, না থাক, মন, ইহার সহিত!
কণামাত্র সুখমণি করিতে অর্জ্জন
এমন সাহস-কর্ম্ম কোরো না কখন। ৭৭

ক্ষিতি-আদি পঞ্চভূত একত্র মিলিয়া
গঠি' দেহ করে কত অনিষ্ট সাধন,
—তাই, মন, ইহাদের সংসর্গ ত্যজিয়া,
আপন কর্ত্তব্য সদা কররে চিন্তন!
প্রতারিত করিতেছে ইহারা তোমায়—
জেনে শুনে থাক তবু কেন মূঢ় প্রায়? ৭৮

হায়রে মানস, কেন হইয়া চঞ্চল
সকল দিকেতে সদা কর বিচরণ?
কখনো ডুবিয়া যাও যথা রসাতল,
আকাশ লঙ্ঘিয়া কভু করিছ গমন!—
ভ্রমেও পরম ব্রহ্মে করনাকো ধ্যান
সংসার হইতে যা'তে পাবে পরিত্রাণ। ৭৯

স্বয়ং বিষয়ামিষ ভুঞ্জিবার তরে
'ইন্দ্রিয়' নামেতে দুষ্ট ধূর্ত্ত কয়জনে
প্রায় জানায়ে সবে যুগ্ম আগে করে,
সুখেতে বঞ্চিত শেষে করে নরগণে।
বিষয় করিয়া ভোগ ইন্দ্রিয় সকল
পরিতৃপ্ত হয়ে শেষে হয় উদাসীন,
বিধির বিধানে, কৃত-করমের ফল
ভুঞ্জিতে ভুঞ্জিতে নর হয় হেথা ক্ষীণ। ৮০

চিরদিন যেই মোহে আছরে মোহিত,
আজি তা'রে দৈবপরে করি' সমর্পণ
সুস্থ হ'য়ে ব'স দেখি আনন্দিত চিত;—
কি ফল হইবে তব করিয়া যাচন?
মেরু চারিপাশে রবি ঘুরি' ঘুরি' যায়
সপ্ত ভিন্ন অষ্ট অশ্ব তবু নাহি পায়। ৮১

আকাশে লুকাও কিম্বা ধাও দিগন্তেতে
যথা ইচ্ছা থাক—হও সাগরে মগন,
যে কর্ম্ম করেছ কিন্তু পূর্ব্ব জনমেতে
সে কর্ম্মের ফল নাহি ছাড়িবে কখন।

শুভাশুভ করমের ফল সমুদায়
সঙ্গে সঙ্গে মানবের চলে ছায়াপ্রায়। ৮২

যে বিদ্যা বীজের হয় উপশম ফল
তা' হতে যেমন ইচ্ছা করে অর্থধন
অবশ্য তাহার আশা হইবে বিফল,
যা'র যে স্বভাব, তাহা যায় না কখন ;
বিদ্যার স্বভাব নহে ধন উৎপাদন
শালিবীজ হ'তে যব না হয় কখন। ৮৩

সাধুগণে অনাদর করে ধনিগণ
অর্থব্যয় ভয়ে সদা হইয়া কাতর!—
অবজ্ঞা বলিয়া তাহা না মানি কখন
বরঞ্চ করুণা হয় তাদের উপর!—
স্ব-মাংসের ভয়ে মৃগ করে পলায়ন,
অপমান বলি' তাহা মানে কোন্ জন! ৮৪

ভুবনাধিপত্য-আদি ভোগ সমুদায়
সম্ভোগ করয়ে দেখ যেই সব জনে,
সেই সব লোকগণে, লভিলে যাঁহায়
দীনহীন জন্তু বলি' জ্ঞান হয় মনে,—
—চেতনা যদ্যপি থাকে শুন বুধগণ,
ভজ সে অজর, সত্য, ব্রহ্ম সনাতন। ৮৫

ইতি—তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য।

"অংশী"র আবেদন

বহু বৎসর অপেক্ষা করিলাম, অনেক সহ্য করিলাম, ধৈর্য্য ধরিলাম, আশা ছিল বাঙ্গালা-সাহিত্যের এমন আচার বিচারের দিনে, আমার সত্বাধিকার সম্বন্ধে একটা সুবিচার হইবে, কিন্তু তাহা হইল না। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার অভিধান গ'ড়িতেছেন, ভাষার অঙ্গ মাজিয়া ঘসিয়া মলিনতা দূরীভূত করিতেছেন, শব্দরাজ্যে যাহার যে ন্যায়সঙ্গত অধিকার, তাহাকে তাহা দিতেছেন, কিন্তু আমার উপর তাঁদের কাহারও দৃষ্টি পড়িতেছে না। ভাষার চরিত্র বিশুদ্ধ করার জন্য, নির্ম্মল করার জন্য, উহার সুখকর উচ্চারণকে পরিত্যাগ করিতেছেন, "ইতিপূর্ব্ব"কে "ইতঃপূর্ব্ব" করিতেছেন, কিন্তু আমার বেলায় বিচার ভিন্ন রূপ। আমার শরীর সুন্দর এবং চরিত্র বিশুদ্ধ—কিন্তু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার আসনে একজন বিকৃতকে বসান হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য অবিচার!

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় বাঙ্গালা-সাহিত্যের শব্দবিভাগে একজন সুপ্রসিদ্ধ বিচারক, যেমন সূক্ষ্ম-দর্শী, তেমনি সুরসিক। তাঁহার তলোয়ারের ধারে মাছি মশাও কাটিয়া যায়, অথচ খুব বেদনা লাগে না, কিন্তু আমার বেলায় তিনি তাঁহার তলোয়ার খাপে ভরিয়াছেন। তাই আজ অনন্যোপায় হইয়া মাসিকের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমি অনেক লেখককে, কবিকে, বাগ্মীকে গোপনে আমার দুঃখ জানাইয়াছি, কেহই ন্যায়বিচার করিলেন না। ইহাতে বোধ হয় আমার প্রতিপক্ষের সঙ্গে তাঁহাদের এতই ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে যে, তাহার বদলে আমার নাম লইতে মোটেই কর্ত্তাদের প্রবৃত্তি হয় না, কাজেই আমাকে প্রকাশ্যে নালিস করিতে হইল।

আমার নাম "অংশী" ইহার আকৃতি প্রকৃতিতে কিছু দোষ আছে কি? তবে,

আমাকে পরিত্যাগ করিয়া "অংশীদার"কে আমার স্থানে কেন বসান হইল? ঐ নামটা কি আমার নাম অপেক্ষা মিষ্ট? "অংশীদার" কথাটা কি আমার অপেক্ষা বেশী শুদ্ধ? "অংশীদার" যদি ভাল কথা হয়, তবে "ভাগীদার" মন্দ কিসে? যদি বলেন "সরিকদার" শব্দ ত অনেকে ব্যবহার করে? আমি বলি, সেটাই বা ভাল কাজ কি? একটা অবিচার কি আর একটা অবিচারের নজীর হইবে?

আশ্চর্য্য এই যে, আমার সত্ব লোপ করার জন্য কোন কোন নব্য অভিধান-লেখক একটা কৌশল করিয়াছেন। অভিধানকে শব্দরাজ্যের দলীল বলা যাইতে পারে, সেই দলীলে লিখিত হইয়াছে—"অংশী অর্থ অংশীদার, ভাগীদার"। যদিও আমাকে একেবারে অস্বীকার করা হয় নাই, তথাপি অগ্রাহ্য করার জন্য দলীল প্রস্তুত হইয়াছে। খাঁটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ৺রামকমল শর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাঁহার "প্রকৃতিবাদ" নামক বিশুদ্ধ দলীলে কিন্তু আমাকে এরূপ লাঞ্ছিত করেন নাই। তিনি আমাকেই আমার আসনে বসাইয়া তাহার অর্থ দিয়াছেন "ভাগী এবং ভাগার্হ।" কিন্তু সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথা গ্রহণ করিবে কে?

যদি অনর্থক এই "অংশীদার" আমার "ভাগীদার" হইয়া আমাকে "দাগীদার" করে, তবে আমার মতন "পাপীদার" তাহাতে "রাগীদার" না হইবে কেন? আমি ত এমন "ত্যাগীদার" নহি যে, "বাদীদার" না হইয়া অংশীদারকে পৈত্রিক বিষয় ছাড়িয়া দিব।

মহাশয় বলিব কি? যে কোনও মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক খুলিব, অমনি দেখিব আমার আসন "অংশীদার" অধিকার করিয়া বসিয়া আছে; যেখানে বক্তৃতা শুনিব, দেখিব বক্তা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এমন কি, প্রবন্ধের এবং গল্পের শিরোনামায় পর্য্যন্ত "অংশীদার", এ ত আর ভুল ভ্রান্তি কিম্বা মুদ্রাযন্ত্রের ত্রুটী নয়, এটী পরিষ্কার মতলবী কাজ, সুধু আমার অনিষ্ট করা। এখন দেখা যাউক, এই অনিষ্ট করিয়া আপনাদের লাভ কি?

দেখুন "অংশী" এবং "অংশীদারে" আপনাদের লাভ ক্ষতি কিরূপ?

আজকাল কাগজ কালির দাম জানেন ত? আমার আসন পাতিতে যতটুকু স্থান লাগে, "অংশীদার"কে তাহার দ্বিগুণ স্থান দিতে হয়। সুতরাং কাগজ কালি দুইটীরই দ্বিগুণ খরচ। আজকালকার দিনে সময়ের যে মূল্য নাই, তাহা বলা যায় না, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া "অংশীদার"কে বসাইতে আপনাদের অর্দ্ধেক সময়ের অপব্যয় হয়।

আমার আর অধিক কিছু বলিবার নাই। আমার আকৃতি প্রকৃতিই প্রমাণ দিতেছে যে, আমি অতিরিক্ত কিছু বলি না, এবং সেই অতিরিক্ত "দার"টুকুকে পরিত্যাগ করার জন্যই আমার এত প্রয়াস। এখন আপনারা আমার অধিকার যাহাতে আমি পাইতে পারি, সে জন্য সুবিচার করিলে বাধিত হইব। ভাষার কর্ত্তৃপক্ষ, লেখকগণ, "সাহিত্য-পরিষৎ" ও "সাহিত্য-সভা"বৃন্দ সকলের নিকট আমার সানুনয় এই প্রার্থনা জানিবেন। হুজুর মালিক, বাদীপক্ষে উকীল।—পাহাড়ীয়া পাখী।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

চাঁদসীর চিকিৎসা। (২)

চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

কর্ম্মক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হইতে হইলে বাক্যের শীলতার জন্য, পদার্থ জ্ঞানের জন্য, এবং অহঙ্কার ত্যাগের জন্য ও কার্য্যে নিপুণ হওয়ার জন্য চিকিৎসকের যত্ন করা বিশেষ কর্ত্তব্য। কেবল অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্র অভ্যস্থ হইলেও যদি মর্ম্ম বোধ না হয়, তবে শাস্ত্র অধ্যয়ন করা বৃথামাত্র। অতএব, শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বর্ণন ও শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু দ্রব্য, রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক, দোষ ধাতু, আশয়, মর্ম্ম, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি, গর্ভসম্ভূত দ্রব্য সমূহের বিভাগ, অদৃশ্য শল্যের উদ্ধার, ব্রণ নিরূপণ, বিভিন্ন ব্রণদোষ, সাধ্য, অসাধ্য, যাপ্য রোগের বিষয় ইত্যাদি অনেক সূক্ষ্ম বিষয় সকল আছে, সেই সকল চিন্তা করিতে গেলে নির্ম্মল এবং বিপুল বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির বুদ্ধিও অভিভূত হইয়া থাকে। একমাত্র চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসকের সকল যোগ্যতা অর্জ্জন করা যায় না, কাজেই চিকিৎসকের বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইলেও হাতে কলমে শিক্ষা না করিলে কদাপি কর্ম্ম করার যোগ্যতা অর্জ্জন করা যায় না। সেই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত উপায় সকল অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। চর্ম্মের থলিতে অথবা পশ্বাদি জীবের মূত্র থলিতে জল পূর্ণ করিয়া ভেদন ক্রিয়া অভ্যাস করিতে হয়। লোমবিশিষ্ট চর্ম্ম খণ্ডে লেখন (আচরণ বা ছাল তোলা) মৃত পশুর শিরাতে অথবা পদ্মনালে বেধন, সূক্ষ্ম অলাবুর মুখে বা ঘুণ কর্ত্তিত জীর্ণ কাষ্ঠ খণ্ডে বা বংশনালে এশন (অনুসন্ধান) পনস বা বিল্বফলের শস্তে মৃত পশুর দন্তে আহরণ (শরীরের মধ্য হইতে কোন পদার্থ টানিয়া বাহির করণ) শিমুল কাষ্ঠখণ্ডে মোম লিপ্ত করিয়া ব্রণ হইতে স্রাব করিবার প্রণালী। দুই খণ্ড চর্ম্মে অথবা বস্ত্র খণ্ডের প্রান্তভাগ একত্র করিয়া সিবন (সেলাই) কাষ্ঠ বা মৃন্ময় মানব মূর্ত্তিতে স্থান ভেদে বন্ধন, কোমল মাংস খণ্ডে ক্ষার ও অগ্নি ক্রিয়া, নলদ্বারা বস্তি ক্রিয়া অথবা ব্রণ মধ্য হইতে ব্রণ বস্তু বাহির করিতে হইলে জলপূর্ণ ঘটের পার্শ্বে অথবা অলাবুর গাত্রে শিক্ষা করিতে হইবে। এই প্রকার শাস্ত্র ক্রিয়া অভ্যাস করিলে মেধাবী বৈদ্য চিকিৎসাকালে অবসন্ন হইয়া পড়ে না। শালা ও সাকল্য তন্ত্র বিধিপূর্ব্বক অধ্যয়ন ও অভ্যাস করিলে, লোকের প্রাণদাতা হইতে পারে। শাস্ত্রে ও কর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ হইলে, বৈদ্য চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হইবে। এই সময়ে পবিত্র দেহে শুক্ল বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বিশুদ্ধ মনে অকপট হৃদয়ে বৈষয়িক চিন্তা যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিয়া কাম ক্রোধাদির বেগ ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিবে। বিষয় চিন্তা, হিংসা দ্বেষ ও কাম ক্রোধাদির প্রকোপ থাকিলে বুদ্ধি স্বতঃই সঙ্কীর্ণ ও মলিন থাকে। এই প্রকার চঞ্চল, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিতে চিকিৎসা বিদ্যা স্থান লাভ করিতে পারে না। চিকিৎসা অনেক স্থানেই অনুমান সাপেক্ষ, প্রত্যক্ষ প্রমাণ বড়

পাওয়া যায় না। অনুমান যাহার যতদূর প্রখর, চিকিৎসায় তাহার ততদূর কৃতিত্ব লাভ হইয়া থাকে। মন শান্ত ও নির্লিপ্ত না থাকিলে, অনুমান সত্য হয় না। শান্ত ও প্রশস্ত মনে যে বিষয় চিন্তা করা যায়, তাহারই প্রকৃত সত্য বাহির হইয়া পড়ে। অতএব বৈদ্য সর্ব্বদা সংসারের কোলাহল হইতে আত্ম রক্ষা করিয়া চলিবে। সকলকে সমান ভাবে সম্ভাষণ করিবে, ও সকল প্রাণীর মিত্র স্বরূপ হইয়া অবস্থান করিবে। দ্বিজ, গুরু, দরিদ্র, মিত্র, আশ্রিত, সন্ন্যাসী, সাধু, অনাথ, দেশান্তর হইতে আগত, এই সকল ব্যক্তিকে আপন বান্ধবের ন্যায় স্বীকারে চিকিৎসা করাই সাধুর কার্য্য। পশু পক্ষিঘাতী পাষণ্ড, পাপীদিগকে চিকিৎসা করিবে না। স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ পরিহাস করিবে না, এবং তাহাদের হস্ত হইতে আহার্য্য ব্যতীত অপর কিছু গ্রহণ করিবে না।

চিকিৎসক সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকিবে কিন্তু প্রকৃতি স্থির থাকিবে এবং বিশেষ মনোযোগী ও যত্নবান হইবে। রোগীর বেদনার কতক অংশ অনুভব ও গ্রহণ করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হইলে চিকিৎসার কতক অংশ সাধিত হইয়া যায়। রোগী ধনী কি দরিদ্র, বড় লোক কি ছোট লোক, এই বিষয়ে ইতরবিশেষ ধারণা পোষণ করা নিতান্তই দুষণীয়, এই প্রকার চিকিৎসক চিকিৎসক নামের অযোগ্য। নিতান্ত বিপদ-গ্রস্ত হইয়াই রোগী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইয়া থাকে। এমত অবস্থায় ইতরবিশেষ জ্ঞান প্রকৃতই অধর্ম্ম। যন্ত্রণা ও বেদনার নিকট ধনী দরিদ্র প্রভেদ নাই! যে চিকিৎসার পাত্র, সে প্রকৃতই দয়ার পাত্র, পাশব ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। যিনি ইহাদের প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করেন, তিনি প্রকৃতই পশু অপেক্ষা অধম। আর একটী কর্ত্তব্য চিকিৎসকের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা দরকার যে, রোগীকে ন্যায়সঙ্গত আশা ভরসা প্রদান করিতে হইবে। কোন কোন চিকিৎসক এরূপ আছেন যে, অমঙ্গলকর ভাবীফল পটু করিয়া রোগীর মুখের উপর প্রকাশ করিয়া দেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহাতে অনেক স্থলেই রোগীর অপকার দর্শে। চিকিৎসক রোগীকে সর্ব্বদাই আশ্বাস প্রদান করিয়া রাখিবে। একান্ত দরকার বা আবশ্যক হইলে, রোগীকে অমঙ্গলকর ভাবীফল সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান করিয়া দিবেন। যে স্থলে ব্যারাম অসাধ্য, সে স্থলে রোগীর নিকট তাহা প্রকাশ না করিয়া তাহার বন্ধুবর্গের নিকট প্রকাশ করিবে। অপর কেহ রোগী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে আপন মত প্রকৃত ভাবে ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য। চিকিৎসককে নানা প্রকার লোকের সংশ্রবে আসিতে হয়। কোথায় কাহার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা তাহার বিবেচনা ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। অনেক স্থলে রোগী যন্ত্রণায়, বা অজ্ঞানতাবশতঃ বা স্বভাব-দোষে চিকিৎসককে অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। সেখানে চিকিৎসকের ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক মৌন থাকিতে হইবে। তবে অবমাননারও ইতর বিশেষ আছে, সহিষ্ণুতারও চরম আছে, আত্মসম্মানেরও সীমা আছে। যদি রোগী বা তাহার আত্মীয়-গণ চিকিৎসকের প্রতি অভক্তি বা অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে বা ব্যবস্থা অনুরূপ কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই রোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

রোগীর গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক, রোগীর

শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিবে। পরে আত্ম-পুরুষকে স্মরণ পূর্ব্বক মনে মনে দৃঢ় ধারণা করিতে হইবে যে, আমি রোগীকে নিরাময় করিবই করিব। মন শুদ্ধ শান্ত ও চঞ্চলতা-হীন হইলে মানবের ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয়, কাজেই প্রবল ইচ্ছাশক্তি লাভ করিতে পারিলে, তেলে জলে, ঝাড়া জলপড়া দ্বারাই পীড়িতের পীড়া আরাম করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আর্য্য ঋষিগণের উদ্ভাবিত চিকিৎসা-বিজ্ঞান মধ্যে এই অংশই শ্রেষ্ঠ। অপর আড়ম্বরপূর্ণ চিকিৎসা সব বহিঃরঙ্গ মাত্র। তাহা অজ্ঞানী অথবা অল্প জ্ঞানী চিকিৎসক-দিগের জন্য। যাহা হউক, রোগীকে চিকিৎসা করণ মানসে, প্রথম রোগ ও তাহার প্রকৃতি এবং দোষ দূষ্য ভাল রকম বিচার করিয়া ব্যারামের বর্ত্তমান অবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া লইবে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চিকিৎসা করিতে হইলে রোগ নির্ণয়ই সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে প্রথম দর্শন, পরে স্পর্শ, এবং পরে প্রশ্ন করিতে হইবে। অনেক স্থলে আস্বাদন ও ঘ্রাণ আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ রোগীর আপাদমস্তক বেশ করিয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বর্ত্তমান স্বাস্থ্য, মুখের শ্রী, রোগের লক্ষণাবলী, ও উপসর্গাদি এবং চক্ষের ও জিহ্বার অবস্থা, মল, মূত্র, রজঃ, ইন্দ্র, ক্লেদ দেখিয়া লইবে। পরে স্পর্শ করিয়া প্রথম হাতের শিরা দেখিবে। পরে শ্বাস প্রশ্বাস বিধান, রক্তসঞ্চালন, আমাশায়, পাকাশায়, মূত্রযন্ত্র, জননেন্দ্রিয়, স্নায়ুবিধান, সঞ্চালন বিধান, চর্ম্মের অবস্থা স্পর্শ দ্বারা জ্ঞাত হইবে। পরে প্রশ্ন দ্বারা রোগীর বয়স, ব্যবসা, জাতি, পূর্ব্ব-ইতিহাস, বর্ত্তমান পীড়ার পূর্ব্ব-ইতিহাস, রোগ আক্রমণের পূর্ব্বে রোগীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ইতিহাস, অভ্যাস, সামাজিক অবস্থা, কৌলিক ইতিহাস, রোগীর যন্ত্রণাদিতে যে সকল অপ্রকৃত অনুভূতি থাকে ইত্যাদি প্রশ্ন দ্বারা জ্ঞাত হইবে।

বৈদ্যের নিকট রোগীর প্রকৃত অবস্থা কিছু গোপন থাকিলে, রোগ নির্ণয়ে অন্যথা হয়, তাহা হইলে চিকিৎসা কালে বৈদ্য মুগ্ধ হইয়া পড়ে। রোগী পরীক্ষা করিয়া সাধ্য হইলে আরোগ্য পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিবে। আরোগ্য না হবার হইলে যাপ্য রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে। এবং অসাধ্য হইলে পরিত্যাগ করিবে। সাধ্য অসাধ্য যাপ্য নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও যশঃ লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীকেশবচন্দ্র দাস।

ঢাকা-সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ। *

এই প্রাচীন ইতিহাসপূজ্য নগরীর অভ্য-র্থনা সমিতি অযোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি পদে আহ্বান করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। এইরূপ সাহিত্য সভার নেতৃত্ব করিবার উপ-

* এই সুচিন্তিত অভিভাষণের অংশবিশেষ ইতি-পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু সুদীর্ঘ হওয়ার অজুহাতে সমগ্র অভি-ভাষণ কেহ মুদ্রিত করেন নাই। কলিকাতার কোনও পত্রিকায় ইহার উল্লেখ পর্য্যন্ত হয় নাই। ইহাতে সাহিত্য, সাহিত্যধর্ম্ম এবং সাহিত্য-সাধনার বিষয়ে এত জ্ঞাতব্য এবং বিচার্য্য কথা আছে যে, সমগ্র অভিভাষণটী বঙ্গীয় সাহিত্যসেবীর সমক্ষে উপস্থিত করাই কর্ত্তব্যবোধে আমরা ইহা আনুপূর্ব্বিক মুদ্রিত করিতেছি। নঃ সঃ

যুক্ত কোন প্রতিষ্ঠা আমার নাই। তবে আমি আশৈশব বাগ্মীর সেবক, এবং আমার জীবনের সমস্ত উচ্চাভিলাষ বাণীচরণেই নিবদ্ধ করিয়াছি। উহাতেই আমার প্রতি এই পক্ষপাতিতা দেখাইয়াছেন, মনে করিয়া তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

সাহিত্যের অধ্যাত্ম রাজ্য ও উহার প্রসার।

কিছুকাল হইতে বাঙ্গালীর দৃষ্টি তাহার সাহিত্যের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার ফলে বাঙ্গালী যদি কোন মহার্য জিনিষ লাভ করিয়া থাকে, উহা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহার সচেতন কর্ম্মপ্রবণতা এবং আত্মাদরের বৃদ্ধি। ইহার পশ্চাতে অবশ্য দেশের বর্ত্তমান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার অবলম্বন আছে। তবে, বর্ত্তমানে আমাদের জীবনের কর্ম্মভূমি নানাদিকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার দ্বারাই এত সীমাবদ্ধ যে, জগতের অপরাপর সভ্য সমাজের অন্তর্গত মনুষ্যের ন্যায় আমরা জীবনকে আত্মার স্বাভাবিক আবেগ অনুসরণ পূর্ব্বক উহার প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়তির দিকে অবাধে চালাইতে পারিতেছি না। বিংশ শতাব্দীর মনুষ্যজীবনের ক্ষেত্রে আমরা নানাদিকে ক্ষুদ্র; আমরা কে কোন দিকে, কি পরিমাণে যোগ্য এবং কি হইতে পারিতাম, তদ্বিষয়ে পরীক্ষার অবসরও পাওয়া যায় নাই। তবে কি না নিমেষের মধ্যেই দেশকালের সীমাবিলঙ্ঘী চিত্ত-বিহঙ্গীকে আমরা মানবজন্ম স্বত্বেই লাভ করিয়াছি! উহা মনুষ্যমাত্রের দুর্লভ পিতৃধন এবং পিতৃকরুণার নিদর্শন! উহাকে পঞ্জরবদ্ধ করিতে পারে, এমন সাধ্য কাহারও নাই। বিশ্ব-প্রকৃতির কারাবদ্ধ মনুষ্য জড়তার উৎপীড়নে এবং বন্ধনবিঘ্নে উদ্বিগ্ন হইয়া নিজের অন্তঃপুরে একবার প্রবেশ করিলেই বুঝিতে পারে, সে কত বড়! সে ত দুর্ব্বল দরিদ্র কাঙ্গাল নহে! সে যে আপনাতেই সম্পূর্ণ! সে যে অনন্তের আত্মজ পুত্র! মনুষ্যমাত্রের সাধারণ আত্মস্ফুরিতার মধ্যে এই মহাত্মতার লক্ষণই গুপ্ত রহিয়াছে।

ইহা প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তর রাজ্যের কথা এবং এই অন্তর রাজ্যই সাহিত্যের রাজ্য। বিশ্বজগৎ মনুষ্যের মনের ভিতর আসিয়া যেই ভাবরূপ ধারণ করে, সাহিত্য উহা লইয়াই ব্যাপৃত আছে। তাই সাহিত্যের ভূমিও মনুষ্যের ভাবনাশক্তি এবং চিত্ত প্রসারের সহিত সমব্যাপী। তাই সাহিত্য 'মনোময়' এবং 'মনোময়' হইয়া এবং মনুষ্যের অন্তরাত্মার সমান ধর্ম্মে তেজস্বী হইয়াই দেশকালের সীমাবন্ধন স্বীকার করিতে চাহে না। সুতরাং, সাহিত্য আধ্যাত্মিক সৃষ্টি; এবং আত্মাবান্ জীবমাত্রেই এই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া স্বয়ং কর্ত্তা অথবা ভোক্তা হইবার অধিকার রাখে।

উহাতে মানবাত্মার কর্ত্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্বাধিকার।

এই সাহিত্যের ক্ষেত্রে আসিয়াই মানুষ প্রকৃত প্রস্তাবে আপনার কর্ত্তৃত্ব-শক্তির বিষয়ে আত্মবোধ লাভ করে; আপনাকে একরূপ দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা জানিয়া অন্তরঙ্গ ভাবে নিজকে পরমকর্ত্তার প্রেরিত এবং ছায়াবহ বলিয়াই অনুভব করে। এ রাজ্যে আসিয়াই মনুষ্যের অন্তরাত্মা অনুভব করে—"আমি ত সংসারের নহি! এই লোকে ঘটনা এবং অবস্থা যে আমার দাসী! আমার ইঙ্গিতেই যে জীবনের দুরধিগম্য রহস্যময়ী দৃষ্ট নিয়তি এই জগতে

পরিচালিত হইতেছে! আমি যে এক নিমেষে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তোলপাড় করিতে পারি! এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আমারই করায়ত্ত! আমি যে কটাক্ষেই নব নব সংসার সৃষ্টিপূর্ব্বক উহার মধ্যে জীবনের নব নব অদৃষ্টতন্তু বয়ন করিতে পারি।" সাহিত্যের ভোক্তার সমক্ষেও দেশকালের সীমাবন্ধন সরিয়া যায়! ফিনলণ্ডের কবি নবজীলণ্ডের পাঠকের জন্য আনন্দের ডালি সাজাইয়া আহ্বান করিতেছেন! কলম্বিয়ার মানুষ সাকার মনুষ্য হৃদয়ের স্পর্শ অনুভব করিয়া পুলকিত হইতেছে! একই 'মানবহৃদয়ের' স্বর্ণপাত্রে সদানন্দময় হৃদয়রস অকপটভাবে বিতরণ করিয়া সাহিত্যের সদাব্রত বসিয়া গিয়াছে! আর আনন্দ! সাহিত্যরাজ্যে প্রবেশ করিয়া দুঃখও ত আনন্দের রূপ ধারণ করে—আনন্দরূপং অমৃতং যদ্বিভাতি!

উহাতে মানবাত্মার স্বাধীনতা ও স্বরাজ।

সাহিত্যের এই আত্মাধীন এবং জড়তার বাধাবিহীন লীলারাজ্যে প্রবেশ করিয়া মানবাত্মা "ব্রহ্মানন্দ সহোদর" রসভাবে রমিত হইতেছে। এই স্বত্ব এবং কর্ত্তৃত্ব আমাদের প্রত্যেকের ভোগায়তনের মধ্যেই পৈত্রিক ধনরূপে নিহিত আছে। সাহিত্যের মধ্যে মানুষ এই আত্মাধীনতা—এই স্বাধীনতা লাভ করে বলিয়াই সাহিত্য মানবাত্মার এত প্রিয়! মহাকাশবিহারী আত্মাপক্ষী দেশকালের কারাগৃহে, প্রকৃতির প্রপঞ্চপঞ্জরে ধরা পড়িয়াছে! একটুকু নড়িতে-চড়িতেই চারিদিক হইতে জড়তার রুক্ষকঠোর কারাপ্রাচীর তাহার গায়ে লাগিয়া জানাইয়া দিতেছে যে, সে বদ্ধ মাত্র! সৃষ্টির অদৃষ্ট নিয়তি প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার পদতলে কণ্টকবিদ্ধ করিয়া বলিয়া দিতেছে—আপনাকে উদ্ধার করিতে তাহার কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই! অগ্রপশ্চাতে, ঊর্দ্ধে কিম্বা অধে দৃষ্টি পরিচালিত করিতে গিয়াই সে অন্ধকার দেখিতেছে! মহাজীবনের পূর্ব্বস্মৃতি, পূর্ব্বপরিচিত সুধাসমুদ্রের অতর্কিত সংস্কার তাহার প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিল! এমতাবস্থায় যাহা-কিছু যে-কোন-প্রকারে তাহার হৃদয়তটে অনন্তের, চূড়ান্তের, স্বাধীনতার বা নির্জ্জড়তার বার্ত্তা আনিয়া দিতে পারে, যেই দীপ প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্র তৈলসেক করিতে পারে, আভাসে অথবা ঈষারায় যেরূপেই হোক, তাহার পিতৃগৃহের ম্রিয়মাণ স্মৃতিটুকু জাগাইয়া তুলিতে পারে, মানুষের অন্তরাত্মা পরমানন্দে উহাকেই পরমপ্রাপ্তিরূপে বরণ করে! যে মরণমহাসিন্ধুর তরঙ্গতলে হাবুডুবু খাইয়াই ডুবিতেছে সে ভাসমান খড়কুটা টুকু পর্য্যন্ত পরমস্বন্ধু জানিয়া আঁকড়িয়া ধরিবে, তাহা বিচিত্র কি! সংসারে মানবাত্মারও সেই দশা! এই কারণে, যাহাতে জড়তা অতিক্রম করিতে অথবা ক্ষুদ্রতাকে ভুলাইতে পারে, যে কোনরূপ কল্পনা জল্পনা বা বিড়ম্বনা, বৃহতের মহতের অর্হতের যে কোনরূপ প্রসঙ্গমাত্রই মানবাত্মার এত প্রিয় আহার! জড়তার বন্ধন হইতে, ক্ষণকালের জন্য হইলেও, মনুষ্যমনের মুক্তি-দাতা বলিয়াই সাহিত্য মানবাত্মার এত প্রিয়! অনাবিলভাবে এবং স্বার্থজড়তার নিঃসম্পর্ক ভাবে এই স্বাধীনতার রসানুভূতি উদ্দীপ্ত করে বলিয়াই, সকল সাহিত্যের মধ্যে আবার নিরবচ্ছিন্ন কাল্পনিকতার সাহিত্যই মানুষের নিকট এত মধুর! এই জন্য কাল্পনিক সাহিত্য-কর্ত্তা কবিগণ মানব সমাজে এত আদর এবং গৌরবের আসন লাভ

করিয়া আসিতেছেন; মনুষ্য সমাজের অপর সমস্ত বিভাগের কৃতিগণ হইতেই সমধিক পূজ্যতর পদবী অধিকার পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া আছেন! উহা উচিত হইতেছে কি না, এস্থলে বিচার্য্য নহে। কিন্তু উহা যে সত্য, সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বকালের মানবহৃদয় অনবচ্ছিন্নভাবে তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। সংসারের শক্তিবীর ঐশ্বর্য্যবীর দানবীর বা কর্ম্মবীরগণ অপেক্ষাও, সহজদৃষ্টিতে একেবারে শূন্যগর্ভ বচনবাগীশগণেই যেন অধিক সম্মান আদায় করিতেছেন। কেবল তাহাই কি? পৃথিবীর মনুষ্য মহল বাছাই করিয়া সাহিত্য যাঁহাদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন মহলে স্থান দেন, সর্ব্বধ্বংসী কালের প্রবাহে কেবল তাঁহাদের নামটাই যেন কোনমতে রক্ষা পায়। রামযুধিষ্ঠিরের ব্যাসবাল্মীকি মিলিয়াছিলেন, ওডিসিয়সের এবং হেকটর অকিলিসের জন্য হোমার ছিলেন বলিয়াই, তাঁহাদের সমতুল্য হয়ত কোটি কোটি রাজামহারাজ কিম্বা ধর্ম্মকর্ম্মবীর কালস্রোতে মুছিয়া গিয়াছে, কেবল তাঁহারাই অমরতা লাভ করিয়াছেন। নিজের মহোদাত্ত বিক্রমকাহিনীকে বাণীমন্দিরে রক্ষা ও অমরত্ব দান করিবার জন্য হোমার মিলিল না বলিয়া পৃথ্বীবিজয়ী এলেকজান্দরকেও একদিন মনোদুঃখে অশ্রুপাত করিতে হইয়াছে।

ভাবুকতার পুণ্যফল।

এই সাহিত্য অধ্যাত্মরাজ্য এবং উহা মানবাত্মার স্বরাজ। এই রাজ্যের কর্ত্তা এবং ভোক্তা উভয়েই অধ্যাত্মক্ষেত্রে স্থায়ী পুণ্যফল উপার্জ্জন করেন। বঙ্গদেশের এই স্মৃতি-গরিষ্ঠ ঐতিহ্যপীঠে বসিয়া আপনারা সমস্ত বঙ্গের সাহিত্যকর্ম্মী এবং সাহিত্যপ্রেমীকে বঙ্গবাণীর পূজামণ্ডপে জ্ঞাতিত্বসূত্রে আহ্বান করিয়াছেন। এই সারস্বতমণ্ডপে দাঁড়াইয়া আমরা এই শুভদিনে বাণীপন্থীর স্বরূপ, তাঁহার জীবনের লক্ষ্য, উহার স্বত্ব এবং দায়িত্ব চিন্তা করাই বর্ত্তমানকালে এতদ্দেশীয় পূজারিমাত্রের আসন্ন এবং প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। চিন্তা করুন, অদ্যকার এই সমাগম আমাদের প্রত্যেকের অধ্যাত্মলোকে অনপনেয় পুণ্যরেখা অঙ্কন করিয়া যাইতেছে! আমরা অদ্য এই স্থানে দাঁড়াইয়া, পুণ্যক্ষেত্রেই উপার্জ্জনশীল হইয়া, বিশাল মনুষ্যজগতের নির্জ্জর অন্তরাত্মার লোকেই নিজের হৃদয়স্পন্দন সঞ্চারিত করিয়া দাঁড়াইয়াছি! অতীতযুগের শতলক্ষ মহাপ্রাণ মনুষ্যের উপার্জ্জন ফলে আমরা অংশভাগী এবং ভোক্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছি! কোন সাহিত্যসেবী নিজকে স্বল্পপ্রাণী অথবা নগণ্য মনে করার কারণ নাই। ক্ষুদ্রতাজ্ঞান আমাদের পিতার দান নহে। উহা জড়তার ধর্ম্ম; এবং জড়তার কারাগর্ভ মধ্যেই এই আগন্তুক মর্ত্ত্যজীবনে আমাদের সঙ্গ লইয়াছে। সাহিত্যসেবীকে মনে রাখিতে হয়, তাঁহার সাহিত্যসেবা আত্মজীবনের পরমার্থ সাধনা হইতে অভিন্ন! উহা তাঁহার চূড়ান্ত পুণ্যসাধনা এবং তপস্যার কার্য্য! ভাব মাত্রেই দেবতার ভোগ; অন্তরাত্মার ক্ষেত্রে, ভাবের ঘরে যিনি যাহা করিবেন, উহার কোন অংশেরই ধ্বংস নাই। সৃষ্টিতন্ত্রে জড়তা মানবত্বের উদ্দেশ্যে, এবং মানবত্ব পুনর্ব্বার এই ভাব-তত্ত্বজীবী অধ্যাত্মতা এবঞ্চ দেবত্বের লক্ষ্যেই পরিচালিত বলিয়া আমাদের অন্তর্দ্দেহে ভাবের যেই রেজেষ্টারী আছে, যেই গুপ্ত চিত্রফলক আছে, উহাতে কোন ভাবই বাদ পড়ে না। সৃষ্টিতন্ত্রে ভাব অমর; ভাবনার

মূর্ত্তি অন্তর্লোকের চিরস্থায়ী পদার্থ। যেমনই হোক, সাহিত্যসেবী মাত্রেই অন্তর্দৃষ্টি পরিচালিত করিয়া এই আত্মতুষ্টি লাভ করিতে পারেন যে, তিনি জীবন পথে জড়তান্ত্রিক হইতে উন্নততর অধ্যাত্মসোপানে দাঁড়াইয়াছেন। অজ্ঞাতনামা অথবা অকৃতী সেবক বলিয়া নিজকে অকিঞ্চন মনে করাও ঠিক নহে। ভাবের ঘরে এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেশী কম বা যৎকিঞ্চিৎ যিনি যাহাই করিবেন, এইটুকু নিশ্চিত জানিবেন যে মানব জীবনের পুণ্যকর্ম্মের চরম হিসাব নিকাশের সময়ে উহা জমার ঘরেই দাঁড়াইয়া যাইবে; ক্ষতির অঙ্ক কোন মতেই বৃদ্ধি করিবে না।

মানব সমাজের সাহিত্যের মাহাত্ম্য।

আমাদের এই সাহিত্যকে মনুষ্য তাহার জ্ঞান বা কর্ম্মক্ষেত্রের সমস্ত ক্রিয়াচেষ্টার মধ্যেই অগ্রগণ্য পূজাপদবী ছাড়িয়া দিয়াছে। বর্ত্তমান কালের মনুষ্য-সমাজে সাহিত্যের মাহাত্ম্য আর প্রমাণ করিতে হয় না। শুনিতে পাওয়া যায়, মিলটনের প্যারাডাইস লষ্ট কাব্যের অধ্যয়ন শেষ করিয়া কোন প্রত্যক্ষবাদী নাকি ব্যঙ্গ স্বরে প্রশ্ন করিয়াছিলেন "what does it prove?" মনুষ্য সমাজের স্বতঃসিদ্ধ সত্যানুভব এখন উহার উত্তরের অপেক্ষা করে না। সাহিত্যের সাধকগণ জানেন, সাহিত্যকে সর্ব্বউন্নতির নিদান জানিয়াই মানবজাতির হৃদয় চিরকাল অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছে। কতকগুলি কথাই কি করিয়া এত বড় পদবী লাভ করিতে পারে, সাধারণের দৃষ্টিবিভ্রম জন্মাইবার পক্ষে এস্থলেই হয়ত প্রধান হেতু। মুদ্রাযন্ত্র রেলোয়ে টেলিগ্রাফ বা বারুদ ডিনেমাইটের দৃষ্টিবিক্রম সমক্ষে সাহিত্য কোন প্রচণ্ডপরাক্রমী প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারে না। কিন্তু, চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান গুলিই মানুষ সাহিত্য হইতে পাইতেছে। মনুষ্যচিত্তের জ্ঞানভাব-ইচ্ছার অন্তর্গত সকল ক্ষেত্রের সকল শস্যই বাণীচরণাশ্রিত ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত হইলেই তবে প্রকৃত উপার্জ্জন বলিয়া গণ্য হয়। সরস্বতীর গোলাজাত করিতে না পারিলে কিছুই প্রকৃত প্রাপ্তিরূপে, বর্ত্তমান-ভবিষ্যতের পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ভোগদখল যোগ্য সম্পত্তিরূপে গণনার যোগ্য হয় না। পুনশ্চ, ওই উপার্জ্জনকে সাহিত্যের ভাবরসে রসাল এবং হৃদয়গ্রাহী করিয়া উপস্থিত করিতে পারিলেই উহা মনুষ্যের অন্তরাত্মার উপাদেয় ভোজ্য হইয়া তাহার একাংশ হইতে, এবং জীবনপথে তাহার সারাংশ বৃদ্ধি করিতে পারে। সকল প্রাপ্তিকে রসের পথে প্রাপ্তিই স্থির প্রাপ্তি। সাহিত্য এইরূপে রসের পথেই মনুষ্যের জ্ঞানকর্ম্মকে "হৃদ্যমেধ্য এবং বৃষ্য" করিয়া, মনুষ্যজীবনের নিত্য নূতন রসায়ন করিয়া, মনুষ্যের গতি এবং স্থিতির মধ্য being এবং becoming এর মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটন করিতেছে। সাহিত্যের কবিরাজগণ অকারণে জগতের অর্ঘ্যলাভ করিতেছেন না।

মনুষ্যত্ব এবং জাতীয়জীবনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের মাহাত্ম্য।

আবার সাহিত্য জাতিগঠনের এবং জাতীয় জীবনেরও প্রধান অবলম্বন; জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা, রক্ষণ ধারণ এবং পরিপোষণের মূল শক্তি সাহিত্যের হস্তেই আছে। উহার হেতু খুঁজিতে হইলেও আমাদিগকে মনুষ্যের প্রধান মাহাত্ম্যটী—সৃষ্টিতন্ত্রে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতার মূল কারণটীর দিকেই দৃষ্টিগত করিতে হয়।

সৃষ্টিতন্ত্রে মানব-মাহাত্ম্যের প্রধান কারণ তাহার বাক্‌শক্তির মধ্যেই আছে। মানুষ বাগ্‌দেবীর অমৃতপ্রসাদ লাভ করিয়াছে, সৃষ্টি-মধ্যে বাণীর বরপুত্র হইয়া বেদের জন্মদান পূর্ব্বক উহাকে রক্ষা করিতে, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অর্জ্জন-বর্দ্ধনে ওই প্রসাদ ভোগ করিতে পারিতেছে! বেদ বলিতে, শ্রুতি বলিতে মনুষ্যের প্রাচীন বাঙ্ময়ভাণ্ডার, মনুষ্যকর্তৃক লিপি আবিষ্কারের পূর্ববর্ত্তী জ্ঞান ভাণ্ডারকেই বুঝিব! 'বাঙ্ময়' বলিতেও প্রাচীনকালে ব্যাপক অর্থে সাহিত্যকেই বুঝাইত। সরস্বতী এই বেদ মাতা। সুতরাং মনুষ্যত্বের—সমস্ত জীবজগতে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্বের মূলেই রহিয়াছেন বেদ-জননী সরস্বতী! অপর জীব-জন্তুগণ সারস্বতী কৃপা লাভ করে নাই বলিয়া, পূর্ব্বপুরুষীয় কিম্বা স্বোপার্জ্জিত বেদ বস্তুর গ্রহণ রক্ষণ কিম্বা পরিপোষণ করিতে পারিতেছে না বলিয়াই মনুষ্য আজ জীবজগতের সম্রাট্। এই হেতুবাদ অনুসরণ করিয়া আমরা সহজেই দেখিবেন যে, একের উপর অপর ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিকারের শক্তি তারতম্যের মধ্যেই যেমন নিহিত আছে, তেমনি জাতিতে জাতিতে শক্তির তারতম্য ও—এক জাতির উপরে অপর জাতির শ্রেষ্ঠতার কারণটীও—সারস্বত শক্তির পার্থক্যের উপরেই নির্ভর করিতেছে। নরসমাজে 'উন্নত জাতি' বলিতে, একরূপ সাক্ষাৎভাবে, সমুন্নত সাহিত্যকর্ম্মী এবং সাহিত্যসেবী জাতিই বুঝাইতেছে।

সুতরাং সাহিত্যসেবককে মনে রাখিতে হইবে, তিনি নিজের পরমার্থের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সমাজের, সমগ্র জাতির চরমার্থের সাধক। তাঁহার একটীমাত্র কথাই অবলম্ব দণ্ডে পরিণত হইয়া সমস্ত সমাজের স্থিতিগতির কেন্দ্র বিচলিত করিতে পারে; সমগ্র জাতির পুণ্য-পাপের মুখ্য কারণ হইতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রনৈতিক ভাব দার্শনিক-গণের 'সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতা' রূপ তিনটী কথাই মহাশক্তির ত্রিশূল হইয়া নরসমাজের প্রাচীন আদর্শপ্রতিমা ধ্বংস করিয়াছে। সমগ্র ইয়ুরোপে অভিনব নরতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের প্রচলন পূর্ব্বক 'নব্য ইয়ুরোপের' জন্মদান করিয়া, তাহাকে পৃথিবী-জয়ে উৎসাহিত করিতেছে! পৌরাণিক ঋষি কবিগণের "অবতার" এবং "জন্মান্তর" এবং 'জাতি' রূপ তিনটী কথাই পশ্চাতে বিপুল পরিচালিত সারস্বত শক্তির অনুবল সংগ্রহ পূর্ব্বক ভারতবর্ষকে পৃথিবীর যাবতীয় নরসংঘ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া উহার তিনকালের অদৃষ্টকে শাসন করিতেছে। এইরূপে খ্রীষ্টধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম বা ইসলাম ইহুদী ধর্ম্ম প্রভৃতি এক দিকে এক একটী কথা; অন্য দিকে মনুষ্য অদৃষ্টের প্রবলপরিচালনী সারস্বত শক্তির সূচী-মুখ ব্যতীত আর কি? মহাশক্তি এই পথে সূচীমুখে প্রবেশ পূর্ব্বক সমগ্র মানুষটীর—জাতিটীর হৃদয়জীবন এবং ইহপরকালের অদৃষ্টকে আপন বশে পরিপাক করিয়াই, পরিশেষে 'কাল' মুখে বাহির হইতেছেন! খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ প্রভৃতিও প্রকারান্তরে বাণীসাধক! সারস্বত পথে প্রবল জীবন সাধনার পুণ্য মহারথ পরিচালিত হইতে পারিয়াছে বলিয়াই, তাঁহারা জগতে মহাশক্তি রূপে দিগ্বিজয়ী হইয়া কোটি কোটি মনুষ্যকে স্বকীয় ধর্ম্মরসে রসিত এবং বর্ণিত করিতে পারিতেছেন।

ইতিহাসে সাহিত্যকর্ম্মী জাতীয়সমূহ।

মিশর, অসুরিয়া, বাবিলন ও কার্থেজ এবং মধ্য এশিয়ার ঐশ্বর্য্যশালী ও প্রবল

জড়তাপরাক্রমী জাতিগুলি কালস্রোতে ধ্বংস হইতে গিয়া, ইতিহাসের এবং পৃথিবীর বক্ষ হইতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল কেন? উহারা সাহিত্যকর্ম্মী এবং সাহিত্য-সেবী জাতি ছিল না বলিয়া। অন্যদিকে প্রাচীন ভারত,চীন এবং গ্রীস, রোম, সারস্বতী কৃপার অমৃতটুকুর গতিকেই অতীতের উন্নত সমুজ্জ্বল আলোকস্তম্ভরূপে কালসমুদ্রের সকল যাত্রীকের নয়নানন্দ হইয়া রহিয়াছে।

কালস্রোতের সর্ব্বনাশ ক্ষেত্রে বাণীপন্থীগণ।

বাণীসাধকগণেই মনুষ্যকে কালগ্রাসের সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং নিজকে 'কেবল কথার বেপারী' বলিয়া, জীবনে, সমাজে বা জগৎতন্ত্রে কোন-রূপে অকর্ম্মা বা অপরের তুলনায় হীন বলিয়া কোনপ্রকার লাঘববুদ্ধি সাহিত্যসেবীকে যেন কদাচিৎ ভ্রমেও স্পর্শ না করে। আমি জীবনের অধ্যাত্মপথে, কিম্বা বিশ্বসেবায়, কোন ব্যবসায়ী হইতে কোন অংশেই লঘু নহি, আত্মমাহাত্ম্য বুদ্ধির এইরূপ স্থিরসমুন্নত শিখরে দাঁড়াইয়াই তাঁহাকে প্রতিনিয়ত সুরনদী সরস্বতীর অপূর্ব্ব-অধিকৃত অমেয় অতলে জাল ফেলিতে হইবে; মনুষ্যহৃদয়ের অগম্য গুহায় রত্নপিপাসায় বিগাহী হইতে হইবে; অজ্ঞাততত্ত্বের মহাকাশ-বক্ষে অজানিত সুধা-পিপাসায় পক্ষী হইয়া উড়িতে হইবে! সকলেই সুধালাভ করিবেন বলিয়া এমন মিথ্যা আশ্বাস দিতে পারিব না। সকল দেশের জীবনযাত্রীগণের স্থির সিদ্ধান্তিত চরম লক্ষ্য যাহা, সেই লক্ষ্যের নিকটবর্ত্তী হইবেন, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

সাহিত্য উন্নতক্ষেত্র হইলেও উহাতে অনন্ত জাতিভেদ।

তবে, তামসিকতা এবং জড়তাধর্ম্মের তুলনায় সাহিত্য উন্নততর সত্ত্বের ক্ষেত্র হইলেও,উহার মধ্যে আবার অনন্ত জাতিভেদ আছে। সাহিত্যজগতে গুণ এবং কর্ম্মগতিকে মুনি ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া পাষণ্ড, গুণ্ডা এবং চণ্ডাল পর্য্যন্ত যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। এই ভেদ কোথাও জন্ম প্রকৃতিগত, কোথাও বা সংসর্গজাত। আমরা অদ্য সাহিত্যসেবীর এই জাতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে দাঁড়াই নাই। নিরপেক্ষ দৃষ্টি এবং সূক্ষ্ম প্রত্যগনুভব অভ্যস্ত হইলে পাঠকমাত্রেই উহার দৃষ্টান্ত লাভে কুতূহল চরিতার্থ করিতে পারিবেন। আমরা এই সাহিত্য সভায় বাণীপন্থীর প্রকৃত স্বরূপ কি, এবং কি ভাবে তাঁহার ব্রত-উদ্‌যাপন করিতে হয়, উহা দর্শন করিয়াই চরিতার্থ হইতে চেষ্টা করিতেছি। কেবল কৃতকার্য্য-তার সুফল বা সফলতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও চলিব না।

সাহিত্যিক জীবনের সমস্যা।

কেননা, সাহিত্যে সফলতা কাহাকে বলা যাইতে পারে, উহা একটা অত্যন্ত বাদ বিসম্বাদের ক্ষেত্র। সফলতা সকলের ভাগ্যেও ঘটে না—বিশেষতঃ, সফলতা বলিতে সাধা-রণে যাহা বুঝে, অবস্থাগতিকে তাহা নানা অবান্তর কারণে বিলম্বিত বা একেবারে নিবারিত হইতে পারে। আমরা বলিয়াছি, সাহিত্য মাত্রেই তপস্যার কার্য্য বলিয়া সাহিত্য সাধনা অধ্যাত্মক্ষেত্রে একেবারে বিফলে যায় না। কিন্তু মানুষের পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট নহে। আমরা জানি, ভাবুকতার চাষ করিতে গেলে সংসারবুদ্ধি এবং বাণিজ্যবুদ্ধি শিথিল হইয়া যায়; উহার দরুণ দুনিয়াদারীর ক্ষেত্রে ভাবুক ব্যক্তির কদাচিৎ হার বই জিৎ হয় না। সরস্বতীর সেবকগণ সংসার-লক্ষ্মীর কৃপালাভে বঞ্চিত হ'ন, ইহা আবহমান কালের কিংব-

দম্ভী এবং তাহার পোনের আনা সত্য। তাঁহাদের প্রকৃতি এবং চালচরিত্র হইতেই এইরূপ নিয়তি অপরিহার্য্য হয়। সুতরাং, সংসারে হারত হইয়াই আছে, এমতাবস্থায় সাহিত্যেও হার হইয়া—এবং ইহাও পোনের আনা লোকের পক্ষেই সত্য—সাহিত্যসেবীকে একেবারে ' ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট' হইতে হয়। জগতের অধিকাংশ সাহিত্যসেবকের জীবনে উহাই ঘটিয়া আসিতেছে, এবং দেশবিদেশের সাহিত্য-ইতিহাসে ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আছে। এমনও ঘটিয়াছে যে, অনেকে শত শত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং হয়ত সমসাময়িক করতালিও যথেষ্ট পাইয়াছেন, অথচ সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাদের নামটী উল্লেখ করিবার জন্যও উপায় অবকাশ নাই। ইঁহাদের সকলেরই যে সারস্বতী নিষ্ঠা বা ঐকান্তিকতার অভাব ছিল, অথবা সকলেই যে কেবল দৃষ্টতঃ সরস্বতীর পদচ্ছায়ায় বসিয়া লক্ষ্মীর অনুগ্রহই উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন, সুতরাং উভয় কূলে নগণ্য হইয়াছেন, তাহাও নহে। অনেকে হয়ত সমুচিত শক্তি এবং প্রতিভার অভাবে, কেহ বা প্রতিভা সত্বেও সমুচিত নিযুক্তির অভাবে, কেহ বা সাধারণের সাময়িক রুচি পরিচর্য্যার গতিকে স্থায়ী সাহিত্য ইতিহাসের স্মরণীয় কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। হাজার হাজার সাহিত্যসেবীর ভিতর হইতে, এক একটী শতাব্দীর মধ্যে কেবল যে দুই চারি জন মাত্র উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের [illegible] এখন আবার বাছাই কার্য্য আরম্ভ [illegible]। কাব্য-সাহিত্যের বিষয়ে ত কথাই [illegible], কেন না কাব্যের ক্ষেত্রে "মন্দ নহে" বলিয়া এমন কোন আদর্শই নাই। কাব্যকে "ভাল" হইতে হইবে। নচেৎ উহা অকিঞ্চিৎকর এবং উল্লেখযোগ্য বলিয়াও বিবেচিত হয় না। সুতরাং, কবি-জীবনের বিফলতা আরও ভয়াবহ। সমস্ত জীবন সাহিত্যসেবা করিয়াও জীবনের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে বিস্মৃতির অতলস্পর্শে তলাইয়া যাওয়া ইহা সাহিত্যক্ষেত্রের নিত্যনৈমিত্তিক দুর্ঘটনা। যাঁহারা সাহিত্যিক নহেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্য-বণিক, মাতৃসেবার অছিলা ধরিয়া কেবল বিমাতার উপাসক, সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাদের অদৃষ্টের কথা ধরিতেছি না—তাঁহারাও অধিক আশা রাখেন না। কিন্তু যাঁহারা খাঁটি সাহিত্যসেবী, অন্তরের অহেতুকী প্রেরণার বশেই সরল জ্ঞানে সরস্বতীর পূজারী, কোন সাধ্যাতীত বিপাকে তাঁহাদের মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তির সাধনাও যেন সাহিত্য সংসারে ব্যর্থ হইয়া যায়; মন্দির প্রাঙ্গণে অনেকের ডাক পড়িলেও, দুই একজন মাত্র অভ্যন্তরে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করিয়া পূজার অধিকারী হইতে পারেন। তবুত বাণীমন্দির-যাত্রীর বিরাম নাই! অনির্ব্বাণ আন্তরিক কাকুতির বাধ্য হইয়া, 'আমারই আহ্বান পড়িয়াছে' এইরূপ জলন্ত বিশ্বাসে, সাংসারিক দুঃখদৈন্যবাধাবিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া, অগ্নিশিখাপ্রেমিক পতঙ্গের মতই শত শত সাহিত্যিক বাণীচরণের উদ্দেশে আত্ম বিসর্জ্জন করিতেছেন! এই দুর্ঘটনা, মানুষিক শক্তির এই দুর্ব্যয় কোন মতে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিহার করা চলে না। পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদিগকে কোনরূপ পরামর্শ দিয়া নিবৃত্ত করা কাহারও সাধ্য নহে; তাঁহাদের নিজের পক্ষেও আপনার ক্ষমতাবোধ সাধ্যায়ত্ত নহে—কেন না শক্তির পরিচালনা এবং পরীক্ষার পূর্ব্বে স্বয়ং অধিকারী কিনা অনেকেই বুঝিতে পারে না। 'অনেকেই প্রাণের টানে অপরি-

হার্য্য বলিয়াই সাহিত্যসেবক। সংসারের লোক ইহাদিগকে প্রায়ই বাতুল, গোঁয়ার, বেকুব বলে, তবে, সফল হইতে দেখিলে বাহবা দিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। সুতরাং মানবজাতির মধ্যে এই একটা দল—যাঁহারা নিরাশ্রয় অথচ একান্ত, অকিঞ্চন অথচ অপরূপ গোয়ার্ত্তমীর বশে আপনাদের মেজাজী ভাবেই খুসী। দুনিয়াদারীর ক্ষেত্রে নানাদিকে বিকল অথচ মনানন্দে বিভোর! সংসার তাহাদের এই আনন্দ কখনও সম্পূর্ণ কাড়িয়া লইতে পারিল না! ইহাদের চরিত্র মধ্যে ইতর স্বার্থসংশ্রবের বহির্ভূত একটা অসাধারণ পদার্থ যে আছে, তাহা সকলেই সন্দেহ করেন! এই সমস্ত গোঁয়ারগোবিন্দ এবং বাক্যবাগীশকে সংসার কখনও পথে আনিয়া নিয়মশৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিতে পারিল না। কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক, সন্দর্ভকার—যাহাদের মধ্যে প্রতিভার আগুন কিঞ্চিৎমাত্রও আছে, তাহাদের সকলেই ন্যূনাধিক একশ্রেণীর জীব! ইহাদের নিকট সোণামোহর অপেক্ষা কথাই বরং অধিক মূল্যবান্। ইহাদিগকে যদি পছন্দ করিতে দেওয়া হয় "ব্রিটিশসাম্রাজ্যের মহামান্য সম্রাট হইতে চাও, না অপমানী সেকস্পীয়র হইতে চাও"—ইহারা প্রাণপণে শেষোক্তের দিকেই ঝুঁকিবে। এস্থলেই উহাদের সনাক্ত করার পক্ষে প্রধান পরিচিহ্ন। স্বয়ং প্রকৃত সারস্বত কিনা তাহার নিরূপণ এবং আত্মবিচারের পক্ষেও উহাই মাপকাঠি।

অধ্যাত্মকেন্দ্রের অভাব।

সংসারে এই একটা দল আছে, যাঁহারা অপর সমস্তের কথাই ভাবেন, মানবজাতির জীবন গঠনে এবং পরিচালনেও সাহায্য করেন, কেবল নিজের কথাই অনেক সময় চিন্তা করেন না। নিজের বিষয়ে কোন জ্ঞানকৃত পদ্ধতি বা শাস্ত্র নাই, ইহারা 'স্বভাবে'র দ্বারাই পরিচালিত। ইহাদের জীবনতত্ত্ব এবং জীবনের সাধনাই যখন হইতেছে 'স্বাতন্ত্র্য', তখন আত্মপ্রত্যয়ের দিক হইতে ব্যতীত ইহাদের সমক্ষে কোন নিয়ম শৃঙ্খলার কথাই বল দেখাইতে পারে না। সুতরাং সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে, এবং স্থূলভাবে বলিতে গেলে ইহাদের কোন ধর্ম্ম নাই—ধর্ম্ম বলিতে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এবং সাম্প্রদায়িক আদর্শের কোন ধর্ম্ম নাই। যাহাতে দলভুক্ত হইয়া এবং একটা মত-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জাগ্রতভাবে ঐহিক বা পারলৌকিক মঙ্গল উদ্দেশ্যে উপাসনা কিম্বা জীবন পরিচালনা করিতে হয়, ইঁহারা তেমন কোন আদর্শের বশীভূত নহেন। অনেকেই গতানুগতিকভাবে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান বা বৌদ্ধ। ইহার দরুণ কেহ কেহ যে একটা অভাব বোধ করেন না, এমন কথা বলিব না। কিন্তু হাজার বৎসর পূর্ব্বকার সামাজিক অবস্থাজনিত মতবাদের সঙ্গে অনেকেই নিজের সামঞ্জস্য করিতে পারেন না—এই কারণে আধুনিক কালে সকল দেশের বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিগণের মধ্যে আপন ধর্ম্মের প্রাচীন আদর্শ ন্যূনাধিক বিপ্রতিষ্ঠ হইতেছে। যা হোক, এক্ষেত্রেই যে সাহিত্যিক এবং শিল্পী জীবনের প্রধান সমস্যা এবং পরম সঙ্কটের স্থল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। হৃদয়ের এবং সমগ্র জীবনের সকল ক্রিয়াচিন্তার গৌণ বা মুখ্য লক্ষ্য স্বরূপে জীবনাতীত কোন কেন্দ্রবিন্দুর দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করিতে না পারিলে, সংসারের সকল কর্ম্মে সুখ দুঃখের সকল অবস্থায় ঐ কেন্দ্রবিন্দুর অভিমুখেই চালতেছি, এইরূপ জাগ্রত জ্ঞান না থাকিলে মনুষ্য-

জীবনের প্রধান অবলম্বনটুকুই থাকে না। ছনিয়ার ক্ষেত্রে নিরালম্ব এবং হৃতমান সাহিত্যসেবীর পক্ষে ত কথাই নাই।

অথচ সাহিত্যসেবী কখনও জড়বাদী হইতে পারেন না।

অথচ সাহিত্যসেবী যে কখনও প্রকৃত প্রস্তাবে জড়বাদী হইতে পারেন না! তিনি ভাবজগতের অধ্যাত্মজগতের অধিবাসী! বিশ্বজগৎ ভাব হইতে সৃষ্ট; ভাবই জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান পদার্থ; তিনি স্বয়ং বিশ্বভাবুকের অংশ এবং তাঁহার দয়া-নিযুক্ত হইয়াই সংসারের ভাবকেন্দ্রে নিজের শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন! প্রয়োগ যথাযথ না হইয়া বিফল হইতে পারে, কিন্তু ভাবই যে জগতের Fulcrum এবং পরিচালন কেন্দ্র, ইহা বিশ্বাস না থাকিলে তিনি প্রকৃত সাহিত্য-সেবী নহেন, তাঁহার সাহিত্যসেবার ভেক গ্রহণ করাও আত্মবঞ্চনা। স্বয়ং প্রকৃত প্রস্তাবে অধ্যাত্মবাদী এবং অধ্যাত্মক্ষেত্রে ক্রিয়ান্বিত হইয়াও, এবং এইরূপে শ্রেষ্ঠশ্রেণীর মনুসন্তান হইয়াও, আত্মধর্ম্মের প্রধান স্বত্ব এবং সুফল হইতে সাহিত্যসেবী কেন বঞ্চিত হন? তাঁহার সাহিত্যসেবা এই জগতের হিসাবে নিষ্ফল হয় হউক, কি করিয়া উহা হইতে পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম ফল চয়ন করা যায়? কি করিয়া সমস্ত সাহিত্যকার্য্য এবং সাহিত্য-সাধনাকে মহর্লোকের কেন্দ্রানুযায়ী এবং ফলভোগী করিয়া পরিচালিত করা যায়? সমস্ত ভাবক্রিয়া এবং শক্তির প্রবাহ ধারা কি করিয়া জীবনাতীত চরমবিন্দুর অভিমুখী করা যায়? এই প্রশ্নের কার্য্যকরী মীমাংসায় উপনীত না হইতে পারিলে এইকালে অধি-কাংশ সাহিত্যসেবীর জীবন কখনও নিদারুণ নিরাশ্বাস এবং চরমের দেউলিয়া দশা হইতে রক্ষা পাইবে না।

বাণী পন্থীর জীবনে অধ্যাত্মকেন্দ্র।

মনে রাখিবেন, আমরা কোনরূপ নীতি-শাস্ত্র বা ধর্ম্ম উপদেশের উপস্থাপন করিতেছি না। যাহা প্রকৃত সাহিত্যজীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য, ইহা তাহারই নির্দ্দেশ। প্রকৃত সাহিত্যসেবী হইতে হইলে, অন্ততঃ ষোলের আনা সাহিত্যসেবীকে চূড়ান্ত নিষ্ফলতা এবং অবশ্যম্ভাবী দীর্ঘনিশ্বাস হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, এই অধ্যাত্মকেন্দ্র স্থির রাখা অপরি-হার্য্য। আত্মবিকাশ এবং আত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই কার্য্যপর হইয়াছি, সাংসারিক ফলা-ফলের দ্বারা কিছুই আসে যায় না, এইরূপ অন্তর্বুদ্ধির ভিত্তিমূলে স্থির হইতে না পারিলে সাহিত্যিকের জীবন যেমন জগৎতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গত হইতে পারে না, তেমনই হৃদয়ের সুখ-তৃপ্তি এবং আভ্যন্তরীণ পরিতুষ্টির বিষয়েও যথেষ্ট হয়না। যিনি সাহিত্যক্ষেত্রে কোন উচ্চ আশা পোষণ করেন, তাঁহাকে সাং-সারিক স্বার্থ এবং টাকা কড়ির বিষয়ে যেমন নিস্পৃহ হওয়া চাই, তেমনি খ্যাতি প্রতি-পত্তির বিষয়েও নিরাশ হওয়া চাই। অন্যথা তাঁহার পক্ষে চরমের দীর্ঘনিশ্বাস অনিবার্য্য। তাঁহার জীবনও নিষ্কলঙ্ক হইয়া আত্মতন্ত্রের একটা স্বাধীন সাধনারূপে কখনও পরিণত হইতে পারিবে না। ক্বচিৎ কোন কোন সাহিত্যিককে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, মনুষ্যদ্বেষী, নিদারুণ অহঙ্কার বিষে জর্জ্জর এবং খলকর্ম্মা হইতেও দেখা যায়; ইতর সাধারণের ন্যায় নানান চরিত্র দোষও তাঁহাকে স্পর্শ করে। এই ঘটনা কেবল সংসারের বিষস্পর্শের বিরুদ্ধে আপন আত্মার রক্ষা-কবচের অভাব হইতেই ঘটিয়া থাকে।

যিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে আত্ম-

বিচার করিয়া স্থির করিতে হইবে, তিনি উপযোক্তরূপে নিস্পৃহ এবং নিরাশ কিনা? তাঁহার অন্তঃকরণ নিজের সাংসারিক অদৃষ্টে এবং যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট থাকিতে না জানিলে তিনি যে সাহিত্যসেবা গ্রহণ করিয়া খুব সম্ভব 'ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট' হইবার পথেই চলিয়াছেন! সরস্বতী সাহিত্যের দেবতা, তিনি শুভ্রমূর্ত্তি এবং সাধক হৃদয়ের শুভ্রশতদলবাসিনী। সরস্বতীর অধিষ্ঠান কমলের এই অপম্পশা শুভ্রতার লক্ষণ প্রত্যেক বাণিসেবাকেই আদৌ ধারণা করিতে হইবে। হৃদয়ের কদর্য্যতা বা জড়-লিপ্সার বাতাসে সারস্বতী প্রতিভার প্রফুল্ল শুভ্রকমল শুকাইতে আরম্ভ করে; দেবতার অধিষ্ঠানপদবী লাভ করিবার যোগ্যতা হারাইয়া ফেলে। সাহিত্যসেবকের জীবনের আবহাওয়া এবং অবস্থা গতিকে তাহার বিভুদত্ত সারস্বত শক্তি এবং প্রতিভার যে হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সময় সময় প্রতিভার একেবারে বিলোপ ঘটে; অনেককে জন্মলব্ধ শক্তি হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়া শুষ্ককাষ্ঠে পরিণত হইতেও দেখা যায়। এমনও দেখা যায় যে, কবি ভগবানের অমৃত প্রসাদ লাভ করিয়াও, স্বকীয় জীবনের আন্তরিক হলাহলে উহাকে দিন দিন বিষাক্ত করিয়াই চলিয়াছেন; তাঁহার অগাধ অমৃতের উৎস একেবারে শুষ্ক হইতেও বিলম্ব নাই; আগে যে সুধারস অযাচিত ধারাপ্রবাহে উৎসারিত হইত, কবির হৃদয় মন এবং জীবনকে অপার্থিব মাহাত্ম্যে উদ্ভাসিত এবং ধন্য করিয়া বিশ্বের জন্য উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে উছলিয়া পড়িত, এখন তিনি স্বয়ং উহার কাঙ্গালী হইয়া কাঁদিতে থাকিলেও একটী বিন্দুও মিলে না! কোন অবিজ্ঞাত কারণে এবং নিদারুণ অভিশাপে যেন জীবন-পরিব্যাপী আনন্দের উৎসমুখ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে! ইহা ভাবুকজীবনের অনুভূত সত্য। বিধাতার অনুগ্রহ জন্মসত্বে লাভ করিয়াও অনেকে যে যাবজ্জীবন উহাকে রক্ষা করিতে পারেন না, তাহা কেবল আধ্যাত্মিক অধঃপাত এবং হৃদয় কমলের প্রসন্নতার অভাব হইতেই ঘটিয়া থাকে। উহার তারতম্যে সাধকের পক্ষে সিদ্ধিরও তারতম্য হয়।

সাহিত্যসাধক হৃদয়কে নিয়ত অনাবিল এবং একনিষ্ঠ রাখিতে অতন্দ্রিত হইবেন। গুহাযাত্রীর জীবনে দিনেকের জন্যও নিশ্চিন্ত নিদ্রার অবসর নাই—দিবারাত্রি তাঁহাকে জড়তা-স্রোতের বিপরীত মুখে হাল ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইবে! তাঁহার অন্য কোন স্বতন্ত্রধর্ম্ম—সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নাই; তিনি বাণীপন্থী। আত্মজীবনের জ্ঞানকাণ্ড এবং কর্ম্মকাণ্ড একতারায় সঙ্গত করিয়া, ভাবের সাধনাকে এবং বাগর্থের প্রতিপত্তি সাধনকেই নিজের পরমার্থ জানিয়া, তাঁহাকে সমস্তজীবন জাগ্রতভাবে একাভিমুখে চলিতে হইবে। সরস্বতীই তাঁহার ইষ্টদেবতা; সারস্বতীকৃপা এবং সারস্বত আনন্দই তাঁহার ইহপরকালের ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম; তাঁহার ভগবান তাঁহাকে এই পথেই অমৃত দান করিবেন! আমাদের দেশে ধর্ম্মসাধকের যাহা মূল সূত্র, সাহিত্যসেবকের পক্ষেও তাহাই "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। এই সূত্র মনুষ্যের সকল সাধন বিভাগেই খাটে। এইরূপে জীবনে সাহিত্যসাধনাকে ধর্ম্মসাধনার নামান্তর করিতে না পারিলে, জ্ঞান ও কর্ম্ম, আশা এবং অনুভব একাগ্র না হইলে, সাধক নির্ব্বিকল্প হইতে না পারিলে যেমন আত্মশক্তির বিভ্রান্ত অপব্যয় নিবারণ করা যায় না, তেমন সাহিত্যে আত্মপ্রাপ্তি বা সিদ্ধি লাভও

ঘটে না। যে সাধক ইহা মানিতে পারেন না বা বিশ্বাস করেন না, তাঁহার পক্ষে সাহিত্যিক হইতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

সাহিত্যে প্রতিভা-তত্ত্ব।

সাহিত্যে প্রতিভা কি, তাহা সংজ্ঞাবদ্ধ করা কঠিন। তবে প্রতিভা বলিতে যে অনির্ব্বচনীয় পদার্থের সঙ্কেত হয়, তাহাকে বিভক্তভাবে দর্শন করিতে গেলে বলা যায় যে, প্রতিভা অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা, জ্ঞাননেত্রের সুবিশদ অথচ দূরদূরান্তগামী দৃষ্টি, আপনাকে প্রসারিত করিবার জন্য আনন্দশীল সহানুভূতি শক্তির এবং আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য সৃষ্টিশীল বিভাবনা শক্তির অসাধারণ আবেগ এবং তীক্ষ্ণতার অনির্ব্বচনীয় সমষ্টি। মনুষ্যবিশেষে অকারণ দৃষ্ট এই অপরূপ দীপনী, রসনী এবং প্রকাশনী শক্তির অপরিজ্ঞাত কারণটীকেই সাহিত্য-দার্শনিক মোটামুটি 'প্রতিভা' সংজ্ঞা দিয়াছে। কি কারণে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে এই অপরূপার সংঘটনা হয়, তাহার খোঁজ করিতে গিয়া মনুষ্যের দর্শন বিজ্ঞান হয়রান হইয়া গিয়াছে। তবে ইহা নিশ্চিত যে, অনাদিকাল হইতে মনুষ্যসমাজে এবং মনুষ্যের অদৃষ্টে এ যাবৎ যখন যাহা উন্নতি, পূর্ব্বাবস্থার ব্যতিক্রমমূলক উদ্গতি, পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার সমস্ত এই অপরূপাকর্ত্তৃক আবিষ্টগণ হইতেই ঘটিয়াছে।

উহার প্রধান গুণোপাদান ও প্রধান ক্রিয়া সাধন "সরলতা"।

প্রতিভাবান্ ব্যক্তির অন্তঃকরণ বা অন্তশ্চক্ষুর এই নির্ম্মলতাকেই উহার বহিঃক্রিয়া বিবেচনায় আমরা বাহিরের দিক হইতে বলি —সরলতা। সাহিত্যের সাধক বা যে কোন বিভাগের প্রতিভাশালী শিল্পীর প্রধান-গুণোপাদান যেমন সরলতা, তেমন তাঁহার প্রধান ক্রিয়াসাধনটীই হইতেছে—সরলতা।

কল্পনায়, বিবেচনায়, আচারে, ব্যবহারে, সৃষ্টি কিম্বা দর্শনের কার্য্যে ঋজুতা, অকৈতব এবং অবৈক্লব্যই প্রতিভার প্রধান সাধন। যেমন সাহিত্যসেবকের, তেমন পাঠক বা সাহিত্য-প্রেমিকের পক্ষেও উহাই প্রধান সাধন। সকল দেশের সকল প্রতিভাশালী বাণীপন্থীর মধ্যে এই একটা বিশেষ গুণ লক্ষ্য করিবেন যে, তাঁহারা আর যাহাই হউন, তাঁহারা সরল—দোষে, গুণে, পুণ্যে এবং পাপেও সরল। উহারা যেন সাহিত্য সেবায় যোগ্যতা লাভ করিবার পূর্ব্বেই এই গুণটী আয়ত্ত করিয়াছিলেন, অথবা জন্মসূত্রেই লাভ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ইহা নিশ্চিত জানিবেন যে, জীবনে সরলতার সাধনা ব্যতীত যেমন অন্তস্তত্ত্ব নির্ম্মল হয় না, তেমন সারস্বত সাধনার ক্ষেত্র এবং সরস্বতীর পাদ-পীঠ টুকুও পরিষ্কৃত হয় না। নিরেট দুনিয়াদার এবং কুটীল হৃদয়ের জন্য সাহিত্য ক্ষেত্র নহে—উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতালের অসামঞ্জস্য আছে।

সাহিত্যে সরল দৃষ্টি ও আনন্দ দৃষ্টি।

সুতরাং এই সরলতার উপরেই সাহিত্য-সাধককে সর্ব্বপ্রথম অধিকারী হইয়া দাঁড়াইতে হয়। উহার পরেই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কথা—জগতের সম্বন্ধে, পদার্থমাত্রের সম্পর্কে আনন্দদৃষ্টি এবং আনন্দযোগ। হৃদয়কে আনন্দধর্ম্মী এবং জীবনকে আনন্দকর্ম্মী করিতে না পারিলে এই আনন্দযোগ সিদ্ধি হয় না। উহা ব্যতীত দর্শনে কিম্বা সৃজনে, গ্রহণে কিম্বা প্রকাশে প্রাণে উৎসাহ কিম্বা উচ্ছ্বাসও জন্মে না; বিশ্বজগৎ কেবল শুষ্ক জ্ঞানকর্ম্ম-ভাবের বিবশ প্রবাহ সমষ্টি বলিয়া প্রতীতি

হইতে থাকে। দুনিয়ার সাড়ে পোনের আনা লোক সংসারকে এ'ভাবেই অনুভব করিয়া যাইতেছে! এস্থলেই প্রতিভাতত্ত্বে ঈশ্বরানুগ্রহের লক্ষণ! অরসিক ব্যক্তিকে উহার যাত্রাপথ কথার দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারি না। কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, সর্ব্বাগ্রে 'সরলতা' সিদ্ধি করিতে না পারিলে, জড় লিপ্সা, জড়াভিমান বা তামসিকতার কবলমুক্ত হইয়া হৃদয়কমলের প্রসাদ সিদ্ধ না হইলে, জীবনের অধিকাংশ সময় মন উন্নততর ক্ষেত্রে রতি এবং আরতিশীল হইতে না পারিলে, ওই অনুগ্রহ লাভ অসম্ভব। সুতরাং আমাদের সাধ্যের মধ্যে কেবল এই 'সরলতা'।

হৃদয় সরলতা সিদ্ধি করিতে পারিলে উহা ক্রমে সজ্জিত বীণাতারের ন্যায় ভাবের স্পর্শে অথবা বহির্জ্জগতের সংস্রবেই স্পন্দিত এবং ঝঙ্কারিত হইতে থাকে; সমস্তকে রসের দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়া আনন্দময় বিগ্রহরূপে উপভোগ করে। কবি বা সাহিত্যসেবকের হৃদয় উহা হইতেই নিরেট জগৎবস্তু এবং বিজ্ঞানদর্শনের তত্ত্বগুলি পর্য্যন্ত প্রাণের আনন্দপুরীতে গ্রহণপূর্ব্বক বাক্যার্থের আনন্দময় বিগ্রহে অবতারিত করিতে সক্ষম হয়। উহা হইতেই রচনার মধ্যে আন্তরিকতা এবং অধ্যাত্মশক্তি অনুস্যূত হইতে পারে। মনুষ্যের জীবন মধ্যে এই সরলতা নিজেই আত্মপুরস্কার বহন করে। উহাতে অন্তরবাহির মধুর এবং মধুময় করিয়া, হ্লাদিনী বৃত্তিকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্বগামী করিয়া, চিত্তকে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর তত্ত্বগামী করিয়া পরিশেষে অনন্তের সংস্পর্শে সমাহিত করে! উহা স্বয়ং একটা পুণ্য আচারে পরিণত হইয়া সাধকের সমস্ত জীবনে এবং তাঁহার দেহ-দর্পণেও অলৌকিক ছটা বিস্তার করে। তাঁহার দৃষ্টি হইতে সমস্ত বক্রতা এবং দৃষ্টি-সমক্ষে নিত্যবিলম্বিত অপবিদ্যার যবনিকা অপসারিত করিয়া উহার প্রত্যক্ষ দর্শনের শক্তি বিকশিত করিতে পারে! তাঁহার হৃদয় বিশ্বতালে নাচিতে থাকে! অনন্তের 'অবাঙ্মনসো গোচর' নিত্যসঙ্গীত শ্রুতিগম্য হইয়া অনন্ত ভাবময় এবং অনন্তছন্দমুখর রাগিণী-লয়ে বাজিতে থাকে। তিনি প্রকৃত কবিহৃদয় এবং কবি-দৃষ্টি লাভ করিতে পারেন। এই-রূপেই সাহিত্যিকের বাণীসাধনা সহজস্রোতে পরমার্থ সাধনায় পরিণতি লাভ করিয়া বিশ্বজীবনের সঙ্গে সমতা এবং আপন জীবনের চরম সার্থকতায় উপনীত হইতে পারে!

ভারতীয় 'ধর্ম্ম' আদর্শের সহিত উহার সামঞ্জস্য।

চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া আত্মাকে সমুন্নত ভাবযোগী এবং আনন্দযোগী করিতে পারিলে উহা কেন ধর্ম্ম সাধনার নামান্তর হইবে, তাহা অন্ততঃ ভারতবর্ষে বিশদ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে না। আমাদের জাতিগত স্বানুভূতির সমক্ষে ধর্ম্মসাধনা নিদানতঃ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সমুন্নতভাবের আন্তরিক সাধনা ব্যতীত আর কিছুই নহে—বিশ্বজগতের চরমভাবুকের আত্মতালের সঙ্গে সঙ্গতি এবং সম্মিলন লাভের জন্য সাধনা। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু ধর্ম্ম বলিতে চিত্তবৃত্তির নিরোধমূলক এবং মানবাত্মার স্বধর্ম্মাভিমুখী গতিসাধক কেবল দশসংখ্যক ভাবের সাধনাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের যোগশাস্ত্র চিত্তবৃত্তির পূর্ণ নিরোধকেই বিশ্বাত্মার সহিত যোগ বলিয়া অভিন্নভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছে। মনুষ্যের অন্তরে যে দ্রষ্টা আছেন, তিনি বিশ্বদ্রষ্টার অংশভূত অথবা তাহা হইতে অভিন্ন বলিয়া ভারতের সকল আস্তিক্যবাদী

দার্শনিক, দেশদেশান্তরের সকল অধ্যাত্ম-সাধক ফকির যোগী 'মিষ্টিক' বা পথিক মাত্রেই কোন না কোন প্রকারে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আপনার ভিতর দিয়া ব্যতীত ধর্ম্মের দ্বিতীয় যাত্রাপথ নাই। জড়তার অতিবর্ত্তনপথে উন্নত এবং উন্নততর ভাবযোগ সাধন পূর্ব্বক, ক্রমে চিত্তবৃত্তির নিরোধ সমাধা করিতে পারিলেই যে দ্রষ্টা আপন স্বরূপে প্রয়াণ এবং অবস্থান করিতে পারেন, এই বিষয়ে অশেষবিশেষ প্রণালীভেদের মধ্যেও সকল অধ্যাত্মসাধক একমত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

সারস্বতের 'যোগ' আদর্শ।

সুতরাং, বিচারের সাহায্যে বুঝিতে হইলে, বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, সাহিত্যিক ভাবের সাধক বলিয়া স্বভাবেই নিরোধপথে এবং জড়তাসেবী হইতে ন্যূনাধিক উচ্চতর অধ্যাত্ম-লোকে যাতায়াত করিতে বাধ্য। চিত্তের প্রাথমিক নিরোধ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই তিনি সারস্বত। বলিতে হইবে না যে, এই কারণে আমাদের যোগশাস্ত্র ঋষি বা যোগীর অবস্থাকে কবিত্বলাভের পরবর্ত্তী অবস্থা বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। ভাবুক সাহিত্যিক শিল্পী বা কবিমাত্রেই স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বানুরোধে জড়তা-অতিরেকী অধ্যাত্মপথে চলিতেছেন। তিনিও যে—হয়ত সম্পূর্ণ অজানিতে এবং অতর্কিতে—একজন পথিক, উন্নত ভাবুকতা মাত্রেই যে একটা যোগের কার্য্য, তাহা অন্তর্দৃষ্টিশালী সাহিত্যিক মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। সুতরাং এইস্থানে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশেই বলিতে পারি যে, সাহিত্যিক এই স্বতঃসিদ্ধ ভাবুকতা এবং ভাবানন্দের বীজকে উন্নততর জীবনভূমিতে একাগ্রতায় প্রতিরোপিত করিতে পারিলেই, উহা পরিপূর্ণ অধ্যাত্মমহীরুহে পরিণত হইয়া সমুন্নত ধর্ম্মফল প্রসব করিতে পারে।

সাহিত্যের 'অমৃতস্য পুত্রাঃ।'

সাহিত্যজগতের অনেক কবি এই চূড়ান্ত অমৃতের আস্বাদন করিয়া গিয়াছেন। মানব-প্রেম এবং অতি সাধারণ রূপতৃষ্ণা হইতে এই পরমার্থ ফল চয়ন করিয়াছিলেন, আমাদের বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস—বিশেষতঃ চণ্ডীদাস! শিহ্লনের কথা বিল্বমঙ্গল উপাখ্যানের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত। হাফেজ জামী ও রুমী প্রভৃতি সুফী কবিগণ সখ্যপ্রেম হইতেই এই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণের পঞ্চপ্রেম সাধনাও বিশেষভাবে ভাবুকতা এবং কবিত্ব সাধনা ব্যতীত আর কিছুই নহে! ইংলণ্ডের রসেটি ও কীট্‌স রূপের পিপাসা হইতেই অনন্ত-সুন্দরের তত্ত্বে, শেলী ব্রাউনীং এবং কভেন্ট্রি প্যাটমোর প্রেম হইতেই অনন্ত প্রেমময়ের তত্ত্বে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আমাদের ঘরের মধ্যেও উহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই! নিসর্গের সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা হইতে এবং মনুষ্য-হৃদয়ের ভাবুকতাকে সংগীতকবির নেত্রে উপভোগ করিতে করিতে রবীন্দ্রনাথ যে তত্ত্বে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা হইতে ইতি-মধ্যেই অনেকে তাঁহাকে 'ঋষিকবি' বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্লেটো বা প্লোটিনস হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালের ফিক্‌টে এবং হেগেল, বা নারদবাদরায়ণ শাণ্ডিল্য হইতে জীব গোস্বামী প্রভৃতির নাম করিব না—তাঁহারা সতর্ক মতবাদী দার্শনিক, অনেকে গোঁড়া আদর্শের সাধক। ব্রাউনীং কেবল মনুষ্যত্বে প্রীতিমান্ হইয়া, সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের অন্তশ্চরিত্রে কেবল সহানুভূতি পথে ধ্যানী এবং ধারণাশীল হইয়াই পরিশেষে

অখণ্ড চিদানন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন! ব্রাউনীং-হৃদয়ের পৌরুষ-বলিষ্ঠ এবং অধ্যাত্মনিষ্ঠ শান্তরস তাঁহার লেখনীমুখে সংক্রামিত হইয়া পাঠকের হৃদয়কে আবিষ্ট করিতেছে! মনুষ্য-চরিত্রে অনন্যপরায়ণ প্রেম-সহানুভূতি হইতে যে চূড়ান্ত অধ্যাত্মফল চয়ন করিতে পারা যায়, উহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যেমন ব্রাউনীং, তেমনি, নিসর্গ প্রকৃতির অন্তর্যোগ সাধনা হইতে—নিসর্গের ভিন্ন ভিন্ন রূপ এবং অবস্থার সঙ্গে আন্তরিক সহানুভূতি এবং ধ্যান সাধনার পথেই—যে পরাস্ত অধ্যাত্মরসের তত্ত্বসাগরে আত্মহারা হইতে পারা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত ওয়ার্ডসোয়ার্থ! জগতের সকল কবিগণের মধ্যে কেবল এই একজন কবিই জোর করিয়া বলিতে পারেন—

"I love not man the less but
Nature more."

এইদিকে ছুইরকমের কবিসাধক আছেন :—

মানুষেরে কেহ অতি ভালবাসি'
মজে অবিরল মানুষ-রসে;
প্রকৃতির হিয়া গন্ধ-পিয়াসী
চিত্তে তাহার কেহ বা পশে—
নরের হৃদয়-কোলাহল-পুরে
আকুলচিত্ত, ডুবায়ে কাণে
নিসর্গহিয়া শুদ্ধ পাথারে
শোনে নিখিলের জীবন গানে।

'অমৃত' পথের আনুষ্ঠানিক।

প্রকৃতির শান্ত-নিস্তব্ধ চিত্তসাগরে অন্তর্যোগী হইয়া ডুব দিতে জানিলেই বুঝিতে পারা যায়, যেন ওই নিস্তব্ধতা হইতেই সৃষ্টি-তরঙ্গ উপজাত হইয়া বিশ্বজগতে নানামুখে নানারূপে প্রকটিত হইয়া চলিয়াছে! জীব জগৎ জ্ঞানভাব এবং ইচ্ছাশক্তির নানামুখী তরঙ্গ ঝঙ্কার কোলাহলেই মুখরিত! এই কোলাহলের মধ্যে যাঁহাদের চিত্ত ধ্যানস্থির হইতে পারে, তাঁহারা নিসর্গের মধ্যেই আদিম জীবনোচ্ছ্বাসের আত্মশক্তির পরিচয় লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন। ধন্য হইবেন বলিব, কারণ উহার যাহা ফল তাহা পাকিলেই, মনুষ্যের চূড়ান্ত নৈতিক অভ্যুন্নতি এবং ধর্মক্ষেত্রীয় অধ্যাত্মতার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া যায়। এই পথের যাত্রী হইতে হইলে কিরূপে আনুষ্ঠানিক হইতে হয়, ওয়ার্ডসোয়ার্থ স্বয়ং জগতের উপকারার্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—

Never did I, in quest of right
and wrong
Tamper with conscience from a
private aim;
Nor was in any Public hope the
dupe
Of selfish Passion; nor did ever
yield
Wilfully to mean cares or low
pursuits.

বলাবাহুল্য, ইহা কার্য্যতঃ এবং ফলতঃ কেবল সাহিত্য-সাধনা নহে—জীবন সাধনা! এবং, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার অর্থ ও হিন্দু-দর্শনের চতুর্বর্গফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। ওয়ার্ডসোয়ার্থ না হইলে, অন্যের পক্ষে কথাগুলি অহঙ্কারের মতই ঠেকিত! এই সাধক ক্রমে কোথায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার আভাসও রাখিয়া গিয়াছেন; কথাগুলি ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যের সর্ব্বোচ্চশিখর রূপেই ভারতীয় পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে—

That serene and blessed mood
In which the breath of this
corporeal frame,
And even the motion of our blood

Almost suspended, we are
laid asleep
In body, and become a living
soul;
While with an eye made quiet
by the Power
Of harmony and the deep
power of joy
We see into the life of things
Tintern Abbey.

কবি এই পথে পরিশেষে ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধকের—সর্ব্বকালের অধ্যাত্ম সাধকের চরমক্ষেত্রে।

শান্তেঽনন্তমহিম্নি নির্ম্মলচিদানন্দে তরঙ্গাবলি
নির্ম্মুক্তেঽমৃত সাগরাম্ভসি।
—প্রবোধ-চন্দ্রোদয়।

নিমগ্ন হইয়াছিলেন! তিনি যে রসের আস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের সাহিত্য-দার্শনিক সে রসকেই লক্ষ্য করিয়া কি বলেন নাই—

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ড-স্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ॥

সাহিত্যসাধক লক্ষ্য করিয়া এই ওয়ার্ডসোয়ার্থ পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন—

Excite no morbid passions, no
disquietitude
No vengeance and no hatred.

ওই অনুষ্ঠান পথেই 'মৌলিকতা' সিদ্ধি।

ওয়ার্ডসোয়ার্থের ন্যায় চলিতে জানিলেই সাহিত্যসাধক ক্রমে, আপনার সর্ব্বোচ্চতত্ত্বকে, আপনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিজত্বকে, আপনার সর্ব্বোন্নত প্রকাশকে লাভ করিতে পারেন; এবং, বলিতে পারি, সাহিত্যক্ষেত্রে উহাই প্রকৃত originality বা 'মৌলিকত্ব' সাধনার পথ। নিজের মূলতত্ত্বে স্থির প্রতিষ্ঠা লাভ না করিতে পারিলে, সাহিত্য-সংসারে নিত্যঋণী এবং পরবশ হওয়া ব্যতীত যেমন উপায়ান্তর নাই, তেমন পরিশেষে মহাকালের দরবারে একেবারে দেউলিয়া হইয়া পড়াও অবশ্যম্ভাবী। সাহিত্যে জীবিতেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রকেই ইহা স্থির জানিতে হইবে যে, ওয়ার্ডসোয়ার্থের প্রদর্শিত পথে চলিতে পারিলেই প্রকৃত আত্মদৃষ্টি, উপরন্তু অনন্যসাধারণ নবদৃষ্টি লাভ করিয়া স্বতন্ত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারা যায়। উহার দৃষ্টান্তও অন্যত্র খুঁজিতে হয় না—স্বয়ং ওয়ার্ডসোয়ার্থ। ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিদৃষ্টি কিম্বা সৃষ্টির শক্তি বিপুলবিস্তারিত অথবা অনন্যসামান্যভাবে প্রবল ছিল বলিয়া কোনমতেই ধারণা করিতে পারি না। তবু দেখিতেছি, এই কবি আপনপথে চলিয়াই সাহিত্যক্ষেত্রে নিসর্গ-কবিতার যে নূতনতন্ত্র এবং নবসুর আনিয়াছিলেন, তাহাই সাহিত্য-জগতে অনন্যসাধারণ এবং অপূর্ব্ব হইয়া আছে। তিনি উহাতেই শ্রেষ্ঠকবি শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া আছেন।

সাহিত্যক্ষেত্রের যম-নিয়ম প্রভৃতি।

সারস্বতী প্রতিভা সাধারণ জীবনের জড়তাক্ষেত্র এবং মনুষ্যের অন্নময় ভূমির নিম্নগা বৃত্তি ছাড়াইয়াই, মনোময় লোকে সমুন্নত ভাবুকতা, সত্যদৃষ্টি অথবা মহাপ্রাণ উচ্ছ্বাসের উপর স্বানুভব স্থির করত (রেখার-পর-রেখাক্রমে অথবা বৃহৎ তুলিকাসঞ্চালনে) মনুষ্যের চিত্তপটে সুস্থির রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করিতেছে! সকল শ্রেষ্ঠ রচনাই কেবল এইরূপে সারস্বতক্ষেত্রীয় যমনিয়ম আসন-প্রাণায়াম এবং ধ্যান-ধারণা-সমাধির প্রণালীতেই রচিত হইতে পারে। সকল শ্রেষ্ঠ কবিই কোন না কোনমতে আত্মতত্ত্বে স্থিরনিষ্ঠ সাধক। কেবল ব্যক্তিগত রুচি এবং প্রকৃতিভেদে, এবং সাধনার প্রকারভেদেই এস্থলে সাহিত্যক্ষেত্রে অনন্তছন্দমুখরে প্রকাশ

ঘটিয়া যাইতেছে! যেইরূপে একই আদ্যা-শক্তির লীলা হইতে অনন্তছন্দবাহিনী বিশ্বধারা ছুটিয়া চলিয়াছে!

সারস্বতক্ষেত্রে মনঃসংযমের দৃষ্টান্ত ফল।

দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিব। যেমন, প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র ভাববস্তু অথবা অবস্থাবিশেষ ধরিয়া, অধ্যাত্মতত্ত্বের সঙ্কেত এবং অপরূপ রূপাভাস প্রদান করা মৈতরলিঙ্কের এবং পরিণতবয়সের রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। পাঠকের চিত্তকে ভাবনিবিষ্ট করিয়া অব্যাকুল-ভাবে সমাহিত রাখিবার 'ধাত্' তাঁহাদের নহে; অন্তরাত্মাকে কিছু ধরাইয়া দিবার কোন ঝোঁক তাঁহাদের নাই। ভাবের জগতে মধুলুব্ধ ভৃঙ্গের মত এই যে নিত্যচঞ্চল অথচ অচল দৃষ্টি, উহা সহজে সিদ্ধ হয় নাই। বাহির হইতে যাহাই প্রতিভাত হউক, মনোদৃষ্টির সমাহিত নিষ্ঠা ব্যতীত, বাহ্যিক জীবনের অন্তরালে অপরূপ যমনিয়ম এবং বিবিক্তসেবী মনোজীবন ব্যতীত, কাহারও পক্ষে এই সুপ্রতিষ্ঠা ঘটিতে পারে নাই। এই সিদ্ধির পশ্চাতে, আপনার অন্তঃপুরীতে অসামান্য বিবিক্ত সেবা, হৃদয়ের অসামান্য আবেগ, ক্ষণতন্ময়তা এবং অসাধারণ মধুস্পৃহা নিঃসন্দেহে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। অন্তর-দৃষ্টির দ্রুতি এবং লঘুতা হইতে যে কবিতার জন্ম হয়, উহাতে হৃদয় দ্রুতসঞ্চারশীল ভাব-ছন্দের ব্যায়ামানন্দে মুগ্ধ হইতে থাকে। আমাদের রবীন্দ্রনাথের কবিতা হইতে এইরূপ আনন্দই লাভ করি। শেলীর মধ্যে ওই দ্রুতিই দিব্যোন্মাদবশে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে স্বর্গ-পাতাল পারাপার করিয়া উড্ডীয়মান এবং লীলায়িত হইতেছে! অন্যদিকে, অন্তর্দৃষ্টির দীপ্তি এবং স্থিরসংবেশ হইতে যে কবিতা জন্মে, উহাতে হৃদয় ভাবে তদ্‌গত হইয়া অতলের শান্তরসে সন্নিবেশ লাভ পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইতে থাকে। ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতায় এ রস লাভ করি। ম্যাথু আর্ণল্ড কবির এ শক্তিকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—নির্ব্বিশেষ এবং নিরাভরণ প্রবেশশক্তি—bare sheer penetrative power. আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মী এ সকল কবির কোন বিশেষত্বই নিঃসঙ্গজীবনের দীর্ঘবিবিক্ত এবং জড়তাবিমুক্ত সাধনা ব্যতীত স্থিরতা লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহাদের কাব্যকৃতিত্বের সমস্ত গুণ বা দোষ এইরূপে অন্তর্জীবনের মহত্তত্ত্ব হইতে, অধ্যাত্মলোকের ভাবজীবন এবং বুদ্ধিজীবনের স্বধর্ম্ম হইতে, সংক্রামিত হইয়াই কবিতায় উপজাত হইতেছে! এমার্শন এক স্থলে বলিয়াছেন, প্রতিভার অর্থ, অসমান তপঃখেদ বরণ করিবার অপরিসীম শক্তি। সাহিত্যিকের পক্ষে এ কথার যদি কোন অর্থ থাকে, তবে উহা সাহিত্য-চর্য্যায় পূর্ব্বোক্ত যমনিয়মাদি ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে।

সারস্বতী প্রতিভার স্বত্ব এবং দায়িত্ব।

প্রসঙ্গক্রমে এমন একটী বিষয়ের সম্মুখীন হইয়াছি, এস্থলে যাহার আলোচনা অসম্ভব; অথচ না করিলেই সারস্বত ধর্ম্মের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে। যিনি সারস্বতী প্রতিভা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে সর্ব্বসময় মনে রাখিতে হয় যে, তিনি সৌভাগ্যক্রমে মানব-জগতের জয়োত্তমা জননী এবং পরিচালনী শক্তির অধিকারী হইয়াছেন! মনুসন্ততির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৌলিন্যে এবং বন্দ্যবংশে জন্মলাভ করিয়াছেন! তিনি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, জগতের আর্য্যসমাজে তাহার যেমন স্বত্ব, তেমন দায়িত্বও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তিনি Arch-angel বলিয়াই কর্ম্মদোষে অনন্ত নিরয়গামী হইবার অধিক সম্ভাবনা। তিনি কর্ম্মগুণে যেমন

সামাজিকগণের উত্তমাঙ্গে হয়ত অবিসম্বাদিত-ভাবে পদরজঃ স্থাপন করিতে পারেন, তেমন কর্ম্মফলেই এমন কঠোর দণ্ডযোগ্য হইতে পারেন যে, মনুষ্যের দণ্ডবিধির সংহিতা যাহা কোনকালে কল্পনাও করিতে পারে না। সুতরাং, মানব সমাজের দিকে এই সম্বন্ধ-বুদ্ধি এবং দায়িত্ব-বুদ্ধিতে প্রত্যেক প্রতিভাশালী ব্যক্তিকেই নিয়ত সচেতন থাকা আবশ্যক—যেমন পরের, তেমন নিজের মঙ্গলের জন্যও আবশ্যক। সরস্বতীর প্রিয়-পুত্রকেই মনে রাখিতে হয় যে, তিনি জন্মস্বত্বে দেবযোনি হইলেও, মাটীর শরীর পরিগ্রহ করিয়া মর্ত্তালোকে এবং মনুষ্য মধ্যে বিচরণ করিতেছেন। কিঞ্চিৎ বিমনস্ক হইলে, এই দেহটীই তাঁহাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া, সাহিত্যের ক্ষেত্রেই অতর্কিত খানাখন্দকে এবং জঘন্য কূপগহ্বরে নিপাতিত করিতে পারে। হস্তের সুধাভাণ্ড পলকেই বিষভাণ্ডে পরিণত হইয়া নিজের এবং পরের মহামৃত্যু সংঘটন করিতে পারে। তাঁহার প্রতিভা 'মোহিনী' বলিয়াই বিপদ। এই মোহিনীকে লক্ষ্য করিয়াই জগতের দ্রষ্টাগণ বলিতে পারেন—

"আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে
ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বামকরে।"

সুতরাং, সাহিত্যসেবীকে সকল সময়েই ধারণা রাখিতে হয় যে, তিনি সামাজিক জীব। নিজের অন্তরে যাহাই পোষণ করুন—ভাবনার দায়িত্বও কিন্তু কম নহে—লিপিবদ্ধ করিয়া সমাজে প্রকাশ করিতে গেলেই, উহা পরমুহূর্ত্ত হইতে আপন দোষে-গুণে, স্বত্বে এবং দায়িত্বে মানব সমাজের অদৃষ্টে বসিয়া, হয়ত অনন্তকালের জন্য উহার জীবনপাত্রে আপনার সুধাবিষ পরিবেশন করিয়াই চলিবে! তাঁহাকে প্রত্যাহার করিবার কোন ক্ষমতাও যে তাঁহার থাকিবে না! ভাবনার শক্তি এবং দায়িত্বও এত অধিক হইতে পারে যে, মনুষ্যের একটী গুপ্ত চিন্তাই—হয়ত তাঁহার মৃত্যুর শত বৎসর পরে—অধ্যাত্মজগতে নিদারুণ ভাবে ক্রিয়ামুখী হইয়া মানবসমাজ তোলপাড় করিতে পারে। 'মানুষকে কেয়ার করি না' এমন কোন ভাব ভ্রমেও মনে আসিলে, কিম্বা কাহারও মুখে শুনিলে, উহা একটা দারুণ অবিনয়াপরাধী আত্মম্ভরিতা এবং সয়তানী কথা বলিয়াই স্থির করিবেন। উহার অন্তরালে কোথাও না কোথাও—খ্রীষ্টানী আদর্শে—মানুষের নিত্যজীবন এবং পুণ্য-নিয়ন্তার কুশ্রী "বাঁকা শিং এবং পুচ্ছ" লুকাইয়া আছে বলিয়াই বিশ্বাস করিবেন; সকল অবিনয় এবং আত্মম্ভরিতার মধ্যেই থাকে।

৩। সাহিত্যে 'সৌন্দর্য্য'বাদিগণের সাধারণ ভ্রম।

সাহিত্যিক কোন সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রবন্ধনের বাধ্য নহেন; তিনি High priest of Beauty; তাঁহার আদর্শ, Art for Art's sake ইত্যাদি কথা গোটে-শীলারের যুগ হইতে ইয়োরোপীয় শিল্পশাস্ত্রে বহুসম্মতি লাভ করিয়া প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কথাগুলির মর্ম্মগত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সাধারণকে চিরকাল ভ্রান্ত হইতে দেখা যায়। অনেক সত্যদর্শীর দৃষ্টিও অতর্কিত পাপবুদ্ধির খেয়াল-খোর অথবা খেয়ালের বশেই 'ঝাপ্সা' হইয়া যায়। 'সত্যসুন্দর' সর্ব্বপ্রকার শিল্পের অবিসংবাদিত প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেই সামাজিক জীব বলিয়া, তাহার সকল কর্ম্ম-ক্ষেত্রের বহির্ভাগে একটী নিত্যদায়িত্বের অতর্কিত অবিসংবাদিত বৃহৎ বন্ধনী আছে। উহার নামই শিব, যা শিল্পের আসরে শ্রেয় এবং প্রেয়ের সামঞ্জস্য। যে কবি এই

সামঞ্জস্যপথে প্রতিভাকে সর্ব্বমঙ্গলার পূজা-পাত্রে নিবেদন করিতে পারেন না, তিনি যতই শক্তিশালী বা মিষ্টরসাল রচনা করুন না কেন, মহাকালের পরীকক্ষে, নিত্যমনুষ্যের শুদ্ধানন্দপিপাসী অন্তরাত্মার সমক্ষে, উহা কোনমতেই স্থায়ী মাহাত্ম্যপদবী রক্ষা করিতে পারিবে না। পুণ্যদ্রোহী বা অসুরধর্ম্মী রচনা আপাতত অমরাপুরী অধিকার পূর্ব্বক ইন্দ্রাণীকে দাস্যে নিযুক্ত করিতে দেখা গেলেও উহা একদিন, না একদিন হয়ত নির্ব্বিরোধে, আত্মপ্রকৃতির পক্ষাঘাতেই ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। অতর্কিত অবস্থায় এই বৃহৎবন্ধনীর দায়িত্ব সাহিত্যসেবীর মনে জাগরূক না থাকিতে পারে জড়ধর্ম্ম এবং দেহধর্ম্মের গতিকে তন্দ্রাগ্রস্ত হইয়া মনুষ্যমাত্রেই শীলবন্ধনীর অত্যাচারী হইয়া পড়িতে পারে। সাহিত্যে কত কত মহাপ্রতাপশালী প্রতিভার কর্ম্মকৃতি কেবল এই অত্যাচার গতিকে শ্রীহীন হইয়া, কোথাও বা একেবারে হেয় হইয়াই গণনীয় পদবী হারাইতেছে! কত কত মহাশক্তিধর জোলা এবং রেনল্ড্‌কে—কত অনামিক সাহিত্যসেবীকে, উহার গতিকেই ন্যূনাধিক তিরস্কার এবং বহিষ্কার ভোগ করিতে হইতেছে! সত্যসুন্দরের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও সাহিত্যের সোণাকে পুনর্ব্বার এই শীলভদ্রের তুলাদণ্ডে পরিমাপিত হইয়াই গৌরব প্রমাণ করিতে হয়। বলিতে কি, সাধক পূর্ব্বোক্তরূপে স্বধর্ম্মে স্থিতধী হইতে পারিলেই, তাঁহার প্রতিভা অমরযোনি কিনা বুঝিতে পারা যায়। স্বয়ং সুধাধর্ম্মী হইলেই তাঁহার ক্রিয়াকর্ম্ম এবং তাঁহার মতিগতি জগতের শিবতন্ত্রের ব্যভিচারী হইতে, কিম্বা বিশ্বযন্ত্রের সহিত বেতালা হইতে পারে না। অসাধারণ নির্ম্মাণকৌশল, সূক্ষ্মদর্শন এবং হৃদয়গ্রাহিতা দেখাইয়াও, কত কত গ্রন্থ, চরমের বিচারস্থলে, কেবল দুঃশীলতার গতিকেই সহৃদয় ব্যক্তির এবং ইতিহাসের অনুল্লেখ্য হইয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে কাহাকেও 'চোখে আঙ্গুল দিয়াও' দেখাইয়া দিতে হয় না, প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিমাত্রের হৃদয়টাই যেন অতর্কিতে জগদ্‌যন্ত্রের সহিত 'তাল কাণা' রচনার প্রতি অশ্রদ্ধ এবং বিরূপ হইয়া যায়। মনুষ্যমাত্রেই যে অমৃত পুত্র, তাহার সুধাশ্রদ্ধা যে কোন অবস্থাতেই একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে না, এই ঘটনা তাহারও একটী প্রমাণ।

সাহিত্য জীবনে 'শীলভদ্র' এবং 'পূজারী'।

জর্ম্মণ দার্শনিকগণের পর হইতে বিশ্ব-সাহিত্যের হৃদয় উত্তরোত্তর এই সর্ব্বমঙ্গলা-মঙ্গল্য অমৃতের লক্ষ্যেই জাগ্রত থাকিয়া, এবং উহার জন্য নিত্য পিপাসায় লালায়িত হইয়াই চলিতেছে। কবি শীলার স্বয়ং কথায় এবং কার্য্যে, প্রকারান্তরে, সাহিত্যের এই 'শীল-ভদ্র' এবং 'জয়মঙ্গলা মন্দিরের পূজারী' আদর্শকেই সাধন করিয়া গিয়াছেন।

সাহিত্যসেবী কথার সাধক বলিয়া 'কথার দায়িত্ব' জ্ঞান।

আমরা সাহিত্যসেবিগণ কথার সাধক; সুতরাং কথার মাহাত্ম্যটী, উহার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং দায়িত্বটী আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিয়াই সাহিত্যসেবী হইব। কথা এক-একটা মহা-ভাবের—মহাশক্তির বিগ্রহ! কথার মতন কথা হইলে বিশ্বজগৎ তোলপাড় করিতে পারে। এক একটা কথাই শতসহস্র বৎসর নবসমাজে ক্রিয়ান্বিত হইয়া যেমন তাহাকে আনন্দের এবং পুণ্যের পথে প্রেরণা দান করিতে পারে, জগতের "আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখ প্রীতি বিবর্দ্ধন" হইতে পারে, অন্যদিকে জগতের 'দুঃখশোকাময়প্রদ' হইয়া, তাহাকে নরকপথে প্রলুব্ধ করিয়া, বক্তাকেও সহস্র

সহস্র বৎসর কুপ্রবৃত্তির সাহায্যকারী এবং অধ্যাত্মক্ষেত্রে নরহত্যাকারীর অপরাধে অভি-যুক্ত রাখিতে পারে। কথা মনুষ্যের বিজ্ঞা-নাত্মার আহার। যেই কথার সূত্রে সমাজের এবং ইহপরকালের সকল সম্বন্ধবন্ধন ঘটিয়াছে, আমরা সেই কথার সাধক। নিজের দায়িত্ব-জ্ঞানে সম্যক জাগরিত থাকিয়া, নিজকে শতসহস্র বৎসরের চিরজীবী জানিয়াই সাহি ত্যসেবীকে লেখনী ধারণ করিতে হয়। গোটে একস্থলে বলিয়াছিলেন, অন্ততঃ ৫০ লক্ষ মনুষ্যের মাতৃভাষা না হইলে কোন ভাষায় লেখনী ধারণ করাও কর্ত্তব্য নহে। গোঠের সময় হইতে সাহিত্যের আদর্শ এখন আরও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এখন সাহিত্য-সেবীকে মনে রাখিতে হয় "আমি জগতের অধিবাসী—সমগ্র ধরণী আমার কথায় কর্ণ-পাত করিতেছে"! এইরূপ দৃষ্টিস্থান এবং সঙ্কল্পস্থানের ধারণা জাগরূক রাখিলেই বর্ত্ত-মান কালে প্রকৃত সাহিত্যসেবী হইতে পারা যায়। উহা হইতেই রচনার মধ্যে বর্ত্তমান-সম্মত মাহাত্ম্য সঞ্চারিত হইতে, উহার ভাব-বস্তু এবং ভঙ্গীর মধ্যে অসঙ্কীর্ণতা এবং সার্ব্ব-জনীন প্রকৃতি সুসিদ্ধ হইতে পারে। সাহিত্য কখনও লেখকের চরিত্র এবং দৃষ্টিস্থানের প্রভাব এড়াইতে পারে না; অধিকন্তু, অনেক স্থলে রচনার প্রকৃতি হইতে লেখকের প্রকৃতি এবং উহার ব্যপ্তি সীমাও পরিমাপিত হয়।

তাঁহার পক্ষে শব্দশক্তি জ্ঞানলাভ অপরিহার্য্য।

এইরূপ কথা কহিতে যেমন জীবন সাধনার, যেমন ভাব সাধনার আবশ্যক, তেমন শব্দশক্তি জ্ঞানের আবশ্যকতা তদপেক্ষা বেশী ব্যতীত কম নহে। কারণ শব্দ লইয়াই সাহিত্য। রঘুবংশের প্রথম শ্লোকটী সকল সাহিত্যসেবীর আদি সঙ্কল্প এবং কাকুতিটাই জানাইয়া গিয়াছে। "হে ভগবান, আমার কথা যেন নিরর্থক না হয়, অথবা কদর্থক হইবার সম্ভাবনাও যেন তাহার মধ্যে না থাকে।" শব্দার্থের সম্বন্ধজ্ঞান সিদ্ধিই সাহি-ত্যের মূলভিত্তি—উহা হইতে সাহিত্যের সামাজিক সম্বন্ধেরও সূত্রপাত। অথচ অনু-সন্ধান করিলেই কি দেখিব, অনেক স্থলে অন্য সহস্র দিকে যথাসম্ভব যোগ্যতালাভ করি-য়াও কত কত সাহিত্যসেবী এই প্রাথমিক সম্বন্ধেই ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে! চমৎকারী বা অন্যের মনোযোগযোগ্য কথা বলা দূরে থাকুক, ভাবরাজ্যে অধিকার দূরে থাকুক, তাঁহাদের কথা যেন পদে পদে নিজের অর্থহত্যা এবং আত্মহত্যা করিয়াই চলিয়াছে! যাহাকে বলে, একেবারে গোড়াতেই গলদ! সাহিত্যের বিপত্তিস্থানগুলি পরীক্ষা করিতে কুতূহলী হইয়া মৃত অথবা বিস্মৃত সাহিত্য রচনাগুলি ঘাঁটিতে বসিলেই দেখিবেন, নিষ্ফলতার কারণ অনেকস্থলে আদৌ লেখকের পরিপূর্ণ শব্দার্থ-জ্ঞানের অভাব! উহার পর আবার দ্বিতীয় সঙ্কটস্থান—অনেক লেখক নিজের কথাটী, নিজের প্রতি অনুগত থাকিয়াই যেন বলিতে পারেন নাই! ইংরাজীতে যাহার নাম want of style.

আপনারই অনুগত এবং অকপট ভাবের বাক্যভঙ্গী অপরিহার্য্য।

এক্ষেত্রে কপটতাই সাহিত্যসেবীর মহা-পাতক! আবার কাহারও পক্ষে যেন অল-ঙ্কারই মহা ভার! স্থানে অস্থানে সোজা কথার উপর অলঙ্কার চড়াইতে গিয়াই কেহ নিদারুণ ভাবে ক্লিষ্ট হইয়া তলাইয়া গিয়াছেন, কেহবা পরের সোণা কাণে পরিতে গিয়াই সর্ব্বস্ব হারাইয়া বসিয়াছেন! শব্দশক্তি বা নিজস্ব বাক্যভঙ্গীর মতন এত প্রাথমিক

বিষয়ে বাহুল্য করার জন্য ইহা স্থান নহে। লেখক উহার সাহায্যেই আত্মপরিচয় করেন বলিয়া, কথার আকাঙ্ক্ষা, ভঙ্গী এবং যোগ্যতার ধারণা হইতেই পাঠকের চিত্তপটে লেখকের ছবি মুদ্রিত এবং বর্ণিত হইয়া যায়। ঐ ছবিটাই লেখকের ব্যক্তিত্ব। এইজন্য বাফন (Buffon) বলিয়াছিলেন, The Style is the man। সুতরাং এই ধ্বনি-ছবির বিশেষত্বের মধ্যেই প্রকারান্তরে লেখকের সর্ব্বস্ব নির্ভর করিতেছে।

শব্দ-প্রেম সাধনা।

কথা এবং ভাব নিত্যসহযোগী বলিয়া, জীবনে স্বানুভব এবং ভাবে অধিকার না থাকিলে যেমন নিজস্ব কথা যোগায় না, তেমন শব্দশক্তিতে সজাগ অধিকার না থাকিলেও নিজস্ব ভাব আসে না! শব্দের দুইটী শক্তি—অভিধাশক্তির পরিচয় 'অভিধান' যোগাইতেছে বটে; কিন্তু, ব্যঞ্জনা সাহিত্যিকের অন্তর্দেবতার প্রসাদের উপরেই অহরহ নির্ভর করিয়া থাকে। রীতির ক্ষেত্রে এই ব্যঞ্জনার মাহাত্ম্য ধরিয়াই নিত্যকাল প্রতিভার পরিমাপ হইয়া আসিতেছে। তবে আদৌ অভিধা সুসিদ্ধ না হইলে, ব্যঞ্জনার ভিত্তি কুত্রাপি সম্ভবপর নহে বলিয়া, সাহিত্যপ্রবেশক মাত্রকেই সর্ব্বপ্রথম অভিধানের ভজনা করিতে হয়! অভিধানের ভজনা! কথাটা আপাততঃ অনেকের হাস্য বিকাশ করিতে পারে! কিন্তু, উৎসাহিত হউন, সম্মুখে আরও হাসির কথা আছে। আমরা অভিধান গ্রন্থকে সরস্বতীর একটা ছন্দোবিহীন মহাকাব্যরূপেই উপভোগ করি। লোকে যেমন কেবল আমোদের উদ্দেশ্যে নাটক নভেল পাঠ করে, ঐরূপ আমোদের কাছাকাছি একটা 'রস' প্রকৃত সাহিত্যসেবী মাত্রেই অভিধান গ্রন্থ হইতে প্রায়ই আদায় করিয়া থাকেন। প্রথম দর্শনে, অভিধান গ্রন্থ দূর হইতে দুষমনী চেহারা দেখাইয়াই বিদায় করিতে চায়। চোখের সম্মুখে 'মটর কড়াই মিশিয়া কাঁকড়ে' স্তূপে স্তূপে সারি সারি দাঁড়াইয়া! কতগুলি সূত্রসম্বন্ধবিহীন শব্দের হিজিবিজি ভাণ্ডার! কিন্তু কাছাকাছি ঘেঁষিয়া দৃষ্টিপাত কর, উহার প্রত্যেক অণু-কণাই দৃষ্টিভাষী! চোখে পড়া মাত্র হাসিয়া-ভাসিয়া নাচিয়া-কাঁদিয়া মনে কি চিত্রবিচিত্র ছবি আঁকিতে থাকে! কত রূপ, কত রস, কত গন্ধ! কত নব নব ভঙ্গী, ইঙ্গিত এবং কটাক্ষের ছন্দ! এক একটা শব্দের পশ্চাতে কত কালের, কত অবস্থার, কত দেশ দেশান্তরের যুগযুগান্তরের ইতিহাস! সম্মুখীন হওয়ামাত্র উহারা কি অপরূপ ভাবে কর্ত্তৃত্ব এবং ক্রিয়াকর্ম্ম যোগাইয়া মনে ভাব-মূর্ত্তির সৃষ্টি করিতে থাকে! কোন্ কবি কোন্ শব্দের ভিতর হইতে কি ভাবে রস বাহির করিয়াছেন—কে কোন্ দিক হইতে শব্দের অমৃতমৃত পান করিয়াছেন! কোনও শব্দের মধ্যে মনুষ্যের সর্ব্বপ্রাচীন ইতিবৃত্ত, একেবারে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মনুষ্যহৃদয়ের বর্ণগন্ধ এবং ছবিটাই মুদ্রিত আছে! ভাষাবিজ্ঞান উহা হইতে অযুত বৎসর পূর্ব্বকার মনুষ্যসমাজের রেখাচিত্র উদ্ভাবিত করিয়া ফেলিয়াছে! বাঙ্গালা অভিধানের কয়েকটী শব্দের মধ্যে কিরূপে প্রাক্‌বৈদিক যুগের সমাজ পরিবার এবং দাম্পত্য আদর্শের প্রোথিত কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে! এক একটী বিন্দুর মধ্যেই কত বৃহৎ বিপুল বিচিত্র মূর্ত্তি এবং প্রকাণ্ড শক্তি অনবধানে সুপ্ত আছে! সামান্য ক্রিয়াযোগে উহা একেবারে শূন্যের মধ্যেই 'সোনার কাঠি' চাপাইয়া নব নব

জগতের সৃষ্টি করিতে পারে! শব্দমাত্রেই কি একটা ম্যাজিক নহে?—চিত্তজগতের সোণার কাঠি? স্পর্শমাত্রেই হৃদয়মন্দিরের অজ্ঞাত-ভাবিনী রাজকন্যাকে জাগাইয়া তুলিয়া, সমস্ত উলট পালট করিয়া দিতেছে। সাহিত্য-লোকের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কি ঐ সোণার কাঠির দ্বারাই সমাধা হইতেছে না! মানুষের কত বড় অধিকার! পূর্ব্বপুরুষ হইতে সমুন্নত ভাষারূপে কি অনিঃশেষ্য অপরিমেয় অমূল্য-সুধা আমরা লাভ করিয়াছি! বলিতে কি সাহিত্যসেবী হইতে চাও, আদৌ শব্দপ্রেমিক এবং শব্দযোগী হও; উহা ব্যতীত ভাবকে কখনও 'শ্রেষ্ঠ প্রকাশ' দিতে পারিবে না! কীট্‌স্ বলিয়া গিয়াছেন, I looked upon fine phrases with the eye of a lover.—কীট্‌স একজন প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন।

বাঙ্গালায় শব্দ সমস্যা।

সাহিত্যে সকল নিষ্ফলতার নিম্নতলে শব্দ-ক্ষেত্রের ন্যূনাধিক অনুর্ব্বরতা এবং ভাবকর্ষণার বর্ব্বরতাই প্রত্যক্ষ করিবেন। শব্দপ্রেম প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের ঘরের দিকে বঙ্গসাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপূর্ব্বক কয়েকটা কথা না বলিয়া পারা যায় না। সাহিত্য শাখার সভাপতিরূপে এই বিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করিতে আমরা বাধ্য আছি, এমনতর অনুষ্ঠানকারী করিতেও অনেকে কুণ্ঠিত হন নাই। দেশে দুইটী দল—কেহ আর্য্যশব্দের, কেহবা দেশীশব্দের গোঁড়া। বাঙ্গালী সংস্কৃত ভাষা এবং আর্য্যরীতি প্রেমিক হিন্দু, উর্দ্দু-প্রেমিক মুসলমান, পালি প্রেমিক বৌদ্ধ এবং য়ুনানী প্রেমিক খ্রীষ্টান বলিয়া, সর্ব্বোপরি একটী চলনশীল আধুনিক জাতি হইতে চাহিতেছে বলিয়া এই বিবাদ সম্ভবপর এবং স্বাভাবিক হইয়াছে। বাঙ্গালাভাষার শব্দভাণ্ডার এখনো সম্পূর্ণ সংগৃহীত হয় নাই, উহা ঘটিতে আরও অর্দ্ধশতাব্দীর আবশ্যক হইবে। আবার তন্মধ্যে বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ, বাগ্দেবীর প্রধান শক্তিটাই এত দুর্ব্বল যে, বাহির হইতে কিছু একটা "হওয়া করার" সাহায্য ব্যতীত উহাকে কোনমতেই কাজে লাগাইতে পারা যাইতেছে না। আমাদের লিখিত ও কথিত-ভাষার ক্রিয়াসমস্যাও বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদন প্রভৃতির মধ্য দিয়া উত্তরোত্তর নিদারুণ আকারেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত! পূর্ব্ববর্ত্তী বাণীপুত্রগণের হীরার ধার এই সমস্যা-শৃঙ্গে পড়িয়াই 'খান খান' হইয়া ভাঙ্গিয়াছে। আধুনিক বঙ্গের পূর্ণ সচেতন মধুসূদনের বুদ্ধি-চেষ্টা 'মাইকেলী ক্রিয়া' রূপে গঞ্জনা লাভ করিয়া করিয়া তলাইয়া যাইতেছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহার কোন কূল কিনারা দেখিতে-ছেন না। সংস্কৃতের প্রকৃতি হইতেই এই দুর্ব্বলতা বঙ্গভাষাকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়া বসিয়াছে; তাহার গতিকেই বাঙ্গালা ক্রিয়া একেবারে পদের পশ্চাতে পুচ্ছের ন্যায় নিযুক্ত হইতে বাধ্য হয়। তবে সংস্কৃত ক্রিয়া মাত্রের দুইটী ইচ্ছামুখী জিহ্বা আছে; পদের মধ্যেও অনতিক্রম্য গুরু লঘু ভেদ আছে; এই সমস্ত কারণে সংস্কৃত ক্রিয়া বিভক্তিবলে পরিচালিত হইতে এবং অপরূপ 'নিষ্ঠা' সাহায্যে মহাশক্তিরূপে পরিণত হইতে পারে। বাঙ্গালার ক্রিয়াকে সে স্বাধীনতা বা সে শক্তি কোন মতেই দিতে পারা গেল না। ক্রিয়া বিভক্তির দৈর্ঘ্য লইয়াও লেখা এবং কথার মধ্যে হুলস্থূল বিবাদ! অনেকে ক্রিয়া-বিভক্তিকে ছাঁটিয়াই গোল মিটাইবার জন্য পরামর্শ দিতেছেন; চীনাদের টিকি কাটার

দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই এই 'আপদ' চুকাইতে চাহেন। কেহ কেহ দল বাঁধিয়াই বাঙ্গালা ক্রিয়ার পুচ্ছশাতন আরম্ভ করিয়াছেন। উহা পারা গেলে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বাঁচিতাম। কিন্তু, যাঁহার একটু কাণ আছে, গদ্য-ছন্দের শক্তিজ্ঞান আছে, তিনিই বুঝিতেছেন যে উহা 'আটপৌরে' ব্যবহারে চলিলেও, মৃদুদ্রুত-গতিতে অথবা আশচরণে আধ চলনিতে মানাইলেও, 'পোষাকীর' বেলায় একেবারে তালকাণা এবং অচল হইয়া যাইতেছে। সভা মজলিসে যাতায়াত করিতে হইলে, প্লুত গতিতে, তরঙ্গগতিতে, কদমচালে কিম্বা লস্করীচালে চলিতে হইলে ওই আপদটাই যে বাঙ্গালা পদের প্রধান শক্তি! কোনরূপ জবরদস্তি দলাদলি বা যোগসাজোসি করিয়া বাঙ্গালা ক্রিয়ার এই অদৃষ্ট হইতে মুক্তি পাইব বলিয়া কোনমতেই আশ্বস্ত হইতে পারি না! এই অদৃষ্ট নতশিরে মানিয়া লইয়া, পোষাকী এবং আটপৌরে প্রকৃতির এই দোমুখী গতি বজায় রাখিয়া চলাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। মোটের উপর, বাদী প্রতিবাদীর অনেকেই যে প্রকৃত সাহিত্যসেবীর আদর্শে সচেতন থাকিয়া এই বিবাদ করিতেছেন, তাহা কোনও মতে মনে করিতে পারি না। কেহ কেবল আর্য্যামি হিন্দুয়ানী বা 'বামনাই'র আদর্শে, কেহ বা প্রচণ্ড সাহেবিয়ানা, কেহ কেহ বা মুসলমানী অহিন্দু, প্রতিহিন্দু বা ব্রাহ্মের মেজাজেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামিয়া কসরৎ আরম্ভ করিয়াছেন। তবে এ সমস্তই খুব স্বাভাবিক; সকলে আর খাঁটি সাহিত্যের আদর্শে চলিতে পারেন না; অনেকে স্পষ্ট উচ্চারিত সাম্প্রদায়িক উদ্দীপনার বশেই লেখনী ব্যবহার করিতেছেন। সম্প্রদায়-সম্পর্কের গুপ্তভাল হইতে সরস্বতীর চাল-চলনকে পৃথক করিয়া দৃষ্টি করাও অনেকের পক্ষেই কঠিন। সাহিত্যের ইতিহাসে এইরূপ বিবাদ নূতন নহে। ইংলণ্ডে স্পেন্সার, সেক্সপীয়র এবং লে'হাণ্টের সময়ে, ফরাসীদেশে যেমন রন্সাদের (Ronsard), তেমন ভিক্টর হুগোর যুগেও এই জাতীয় হুজুগ দেখা গিয়াছে; এবং বলিতে হয়, প্রতিবারেই ইতিহাসের চক্ষে উন্নতি পক্ষের দলই ন্যূনাধিক জয় লাভ করিয়াছে। সাহিত্যজগতে শব্দের জন্মগত কোন জাতিভেদ কিম্বা মাহাত্ম্যভেদ নাই; উপস্থিত ক্ষেত্রে যোগ্যতা লইয়াই পদবী, এবং ফলের দ্বারাই যোগ্যতার পরিচয়। এই ফল দেখাইবে কবিগণের আবিষ্কার-পটীয়সী প্রতিভা। মনে রাখিতে হইবে, শব্দশক্তির ক্ষেত্রে সৃজন বলিয়া কোন ব্যাপার নাই—আবিষ্কার! কেবল পরিবর্ত্তনবাদী অথবা রক্ষাবাদীর গোঁড়ামিতে যেমন কুলাইবে না, তেমনি কেবল অহম্মুখ প্রমাণকর্ত্তৃত্ব অথবা 'হাম বড়া' ভাবের প্রভুত্বও কাজ দেখিবে না। বঙ্গভারতীর শক্তিপ্রকৃতির বিপরীত পথে এই সাহিত্যের মধ্যে একটীমাত্র শব্দকে চালাইয়া দিবার জন্য আমাদের রাজরাজেশ্বর সম্রাটেরও ক্ষমতা নাই। প্রকৃত সাহিত্যসেবী জাতীয় বাক্‌প্রকৃতির নির্দ্দেশনা অনুসরণ করিয়াই চলিবেন। তবে, যিনিই কোন অপরিচিত বা অভিনব ভাবের প্রদেশে ভাষার সাক্ষাৎশক্তিকে প্রসারিত করিতে যান, অথবা শব্দাভিধানের নব নব ভাব-দীপ্তি আবিষ্কার করিয়া যিনি জাতীয় ভাষার মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত করেন, তাঁহার অনেক ভুল হওয়া এবং উহার জন্য তিরস্কার ভোগ করাও সম্ভবপর। পরবর্ত্তিগণ স্পেন্সর বা সেক্সপীয়রের সকল অভিনবতাই অনুমোদন করে নাই; পূর্ব্বকালের ইংরাজী ভাষা তাঁহাদের অনেক-

কিছুই গ্রহণ করে নাই। তবু ইহারাই ইংরাজী ভাষা এবং সাহিত্যতরণীর কলম্বস। তাঁহারাই ইংরেজের জন্য সারস্বত শক্তির নব নব মহাদেশ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষার্থী অথবা শিক্ষানবীশের পক্ষে সকল বিবাদের ক্ষেত্র পরিহার পূর্ব্বক চলাই যুক্তি হইতে পারে। গতানুগত ভাবে চলিবার জন্যই ধাত্ হইলে, অথবা প্রতিভাবহ্নির মধ্যে কোনরূপ উদ্দীপ্ততা বা দুর্দ্দান্ততা না থাকিলে যেমন মাহাত্ম্যলাভের সম্ভাবনা হইতে নিস্তার ঘটে, তেমনি কেলেঙ্কারের হস্ত হইতেও মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু কলম্বসধর্ম্মিগণকে কোনমতেই ভাল ছেলে করিয়া ঘরের সীমায় আবদ্ধ রাখা গেল না! ইতিহাস সাক্ষী, ঐ দুর্ঘটনাটার মধ্যেই দেশের সৌভাগ্য! এই ক্ষেত্রে সামান্যমাত্র কাজ আরম্ভ হইয়াছে বই নহে। যেমন বলিয়াছি, বঙ্গীয় সাধু ভাষার শব্দকোষের বিস্তার এখন যাবৎ বাঙ্গালীজীবনের সহিত সমব্যাপক হয় নাই। প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে আছে, হৃদয়ঙ্গম ভাবরূপে বর্ত্তমান আছে, অথচ প্রচলিত 'সাধু' আদর্শের ভাষায় তাহার কোন স্বীকারিত সংজ্ঞা শব্দ নাই—এমনতর ব্যাপার আমাদের অদৃষ্টে এখনও বিরল নহে। কোনরূপ শুচিবায়ুর গতিকে আমাদের ভাষায় এই কার্পণ্য ঘটিয়া থাকিলে তবে, সময় আসিয়াছে, উহা অচিরেই নিরস্ত হইবে। কিন্তু কেবল শুচিবায়ু এই দৈন্যের কারণ নহে—বঙ্গভাষার কায়া-কাঠামের গঠন মধ্যেই অনেকদিকে দুর্ব্বলতা আছে; উহার দরুণ বঙ্গভাষা সেক্সপীয়র জাতীয় প্রতিভার প্রতীক্ষা করিতেছে। এই ভাষার সমস্ত Idiom—ইহার প্রসিদ্ধ প্রয়োগ বা রূঢ়ি প্রয়োগ গুলিও—এখন পর্যন্ত পরিমাপিত এবং সংগৃহীত হয় নাই; এ সমস্ত রূঢ়ির মধ্যেই বাঙ্গালীর মাতৃভাষার প্রধান বিশেষত্ব এবং শক্তি। সংস্কৃত শব্দাভিধানে উহা মিলিবে না। বলিতে কি, সংস্কৃতভাষা স্বয়ং, বোধ করি উহা 'সংস্কৃত' হইয়াছিল বলিয়া এবং কেবল মজ্জিলিশি ভাষা ছিল বলিয়াই ঐ idiom বিষয়ে খুব প্রতিপত্তিশালী বলিয়া মনে হয় না; হয়ত সংস্কৃতের উপসর্গ ও প্রত্যয় বা অব্যয় গুলিতে অনেক অভাব পূরণ করিয়াছে। যেরূপেই হোক, ভারতীয় ভাষা সমস্তের মধ্যে বাঙ্গালীর ভাষার যাহা চিহ্নিত বিশেষত্ব, বাঙ্গালীজীবনের যাহা পরিচিহ্ন-লক্ষণ, তাহাকে প্রকাশ করিতে গেলে সংস্কৃত অভিধান গ্রন্থ হইতে কোন সাহায্য মিলিবে না। বাঙ্গালীকে 'জাতীয় সাহিত্য' গঠন করিতে হইলে জাতীয় ভাষার উপর নির্ভর ব্যতীত অন্য উপায় নাই; উহা স্থির জানিয়াই চলা আবশ্যক। বঙ্গের সাহিত্যভাষা যাহাতে একেবারে গ্রাম্য অথবা প্রাদেশিক না হয়, অথচ উহার সাহায্যে সর্ব্বশ্রেণীর বাঙ্গালীর সমস্ত ভাবচেষ্টা যাহাতে সোজাসুজি প্রকাশ পাইতে পারে; উহার সাহিত্যও যাহাতে একেবারে কথাকওয়াজের লিপি চেষ্টা না হইয়া ভদ্রশ্রেণীস্থ হইতে পারে, সকল সাহিত্যসেবী এইদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই চলিবেন। ইহা বলা একেবারে বাহুল্য যে, সকল জীবনীশীল ভাষার সচেতন লেখক মাত্রেই উক্ত আদর্শে চলিয়া থাকেন।

৫। সাহিত্যে ভাব এবং বস্তুর আদর্শ-সমস্যা।

প্রসঙ্গাধীন আমরা সাহিত্যের আর একটী সমস্যার সম্মুখীন হইলাম। সাহিত্যসেবীর আদর্শ কি? সাহিত্যের বিষয়বস্তু কি হইবে? এ সকল প্রশ্ন বর্ত্তমান কালে বঙ্গদেশেও মুখর হইয়া উঠিয়াছে। বলিতে

কি, এ সম্বন্ধে কোন সর্ব্বসম্মত পাকাপাকি আদর্শ বা বাঁধাগৎ নির্দ্দেশ করা কাহারও সাধ্য নহে। তবে স্থায়ী সাহিত্যের উৎকর্ষ-লক্ষণ বিষয়ে সকলের মধ্যে এই একটা কথা দাঁড়াইয়াছে যে—উৎকৃষ্ট ভাবকে শ্রেষ্ঠতম আকার দান। অপূর্ব্ব অদ্ভুত বা অপরিজ্ঞাত সত্যকে দর্শন পূর্ব্বক, ভাষাপথে উহাকে অনবদ্য এবং সমুৎকৃষ্টরূপে সামাজিকের রসানুভবগণ্য করিয়াই সকল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কৃতি সমূহ অমরত্ব অর্জ্জন করিয়াছে।

২ প্রাচীন সমুৎকর্ষ আদর্শ।

এই আদর্শের সমীপবর্ত্তী হইতে হইলে লেখকমাত্রকে নিয়তভাবে সজাগ থাকিতে হয়, যে মনোভাবকে এই সমুৎকর্ষ আদর্শের সহিত সঙ্গত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি কি? নচেৎ সমস্ত চেষ্টাই স্থায়ী সাহিত্যের হিসাবে এক বারে পণ্ড হইয়া যাইবে; ঐ সমস্ত কালস্রোতে রক্ষা পাইবে না; ভবিষ্যবংশীয়েরাও উহাকে আদর করিয়া বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য অগ্রসর হইবে না। এইরূপে উৎকর্ষ বিষয়ে মোটামোটি কথা বলিয়া কোনমতে অব্যাহতি পাওয়া গেলেও, সাহিত্যের বস্তু কিম্বা আকারের বিষয়ে কিছুতেই নির্ভাবনা হওয়া যায় না। কেবল কি উচ্চভূমি, মহৎ বস্তু, উন্নতভাব, এবং শাস্ত্র-নির্দ্ধারিত কাঠাম বা আকৃতি অবলম্বন করিয়াই চলিব? সাধারণ জীবন, প্রাকৃতভাব, সমাজস্থ নিম্নশ্রেণীর সংস্রব পরিহার করিব? প্রাচীন সাহিত্যে, বিশেষতঃ এ দেশে অলঙ্কার-শাস্ত্রিগণ সাহিত্যের বস্তু এবং আকৃতি বিষয়ে অনতিক্রম্য 'বাঁধাগৎ' প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কাব্যের নায়ক "প্রখ্যাত-বংশো" রাজর্ষি ধীরোদাত্ত প্রতাপবান্ হইবে; কাব্যকে এইরূপে গঠিত হওয়া চাই, ইত্যাদি। সাহিত্যজগতে এখন আর এ সকল শাস্ত্র পদবী রক্ষা করিতে পারিতেছে না।

৩ আধুনিক ইয়ুরোপীয় সমাজ ও সাহিত্যে আধুনিক আদর্শ।

রিনেশাঁসের (Renaisance) বিশেষতঃ ফরাসী বিপ্লবের পর হইতে ইয়োরোপে জনসাধারণের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর কৌলিন্য আদর্শকে নানা দিকে নিগ্রহ করিয়াই প্রকৃতবাদের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। উহার গতিকে সাহিত্যের পূর্ব্ব রীতি, আকৃতি এবং আদর্শ যেন দিগ্‌বাজী খাইয়া একেবারে উল্টিয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষের ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতিকে পশ্চাৎ করিয়া, এমন কি, প্রকাশ্যভাবে একেবারে পদদলিত করিয়াই, সে দেশের সাহিত্যিক "মস্তকরীসম" চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন!

৪ উহার বিশ্বব্যাপী প্রসার।

কতদিক হইতে কতভাব ঘোষণা হইতেছে, সাহিত্যের আদর্শ কেবল 'ভাল লাগা।' নীতিনিয়মকে, এমন কি ব্যাকরণ এবং ন্যায়যুক্তিকে তাচ্ছিল্য করিয়া উড়াইয়া দিয়াও 'মিষ্টি' লাগিলেই হইল। অন্যদিকে, কবিপ্রতিভার পক্ষীরাজ ঘোড়াকে একেবারে মাটিতে নামাইয়া আনিয়া মাঠে ময়দানে চরান যাইতেছে! গৃহ প্রাঙ্গণের অহরহ জনপদ-নিষ্পিষ্ট খড়কুটায় এবং খাঁচের কানাচের আবর্জ্জনায় আনন্দিত হইবার জন্য তাহাকে অভ্যস্ত করান হইতেছে। এ প্রণালীতে আধুনিক সাহিত্যে একটী নব পদ্ধতির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে—প্রকৃত প্রস্তাবে উহার নামই 'নবেল।' মানুষকে একেবারে অনাবৃত এবং উলঙ্গ করিয়া, অণুবীক্ষণ সাহায্যে তাহার নগ্নদেহ এবং জঘন্য স্থলগুলি পর্য্যন্ত

চুনিয়া চুনিয়া পরখ পূর্ব্বক আনন্দ লাভ করিতে, তাহার শক্তিস্থান বা হৃদয়ের সুগুপ্ত ক্ষতস্থানগুলিতে পর্যন্ত ফিরিয়া ঘুরিয়া মাক্ষিকবৃত্তি করিতে অসাধারণ শক্তি, অভাবনীয় ধৈর্য্য, অপরিসীম উল্লাস! সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'প্রাকৃত' বলিয়া কোন ঘৃণাবাচক কথা নাই! এ সমস্ত আধুনিক সাহিত্যের বলবান্ লক্ষণ। সমাজে সাধারণ শক্তি, এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের অভ্যুদয় হইতে সাধারণ শিক্ষার বিস্তার, এবং মুদ্রাযন্ত্র রেলোয়ে প্রভৃতি যুগশক্তির প্রসার হইতেই সাহিত্যের এই আধুনিক আদর্শ দিগ্‌বিজয়ী হইতেছে। সুধীগণের পূর্ব্বপূজিত শালীন্য এবং কৌলিন্যের গৌরবময় আদর্শ নানাদিকে বিপ্রতিষ্ঠ হইয়া এবং বিগড়িয়া যাইতেছে। এই অভিযানকে এখন অস্বীকার করার যো নাই, এবং অস্বীকার করিয়াও ফল নাই।

গ। বঙ্গ-সাহিত্যে উহার প্রভাব।

আমাদের ঘরের দিকে দৃষ্টি করিলেই দেখিব, এই বঙ্গদেশের এবং বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যেই গত দশবৎসরে মস্ত পরিবর্ত্তন আসিয়াছে! বঙ্গভাষার ন্যায় বঙ্গসাহিত্যও এখন আর কেবল হিন্দু কিম্বা ব্রাহ্মণ্য লক্ষণাক্রান্ত নহে। নানা সমাজের, নানা ধর্ম্মের, নানা সাহিত্যের রীতিপদ্ধতি নানা উদ্দেশ্যে এবং অভিসন্ধিতে পরিচালিত হইয়া ইহার মধ্যে স্রোতোমুখে প্রবেশ করিতেছে। সাহিত্যসেবিগণের স্বাধীন সাধনাপথে, অনুকরণের বিকারে অথবা মৌলিকতার অহংকারে প্রচণ্ডরূপে প্রেরিত হইয়া অনেক নীতি-ধর্ম্ম-সমাজদ্রোহী, আত্মদ্রোহী এবং বিশ্বদ্রোহী রচনাও আত্মপ্রকাশ করিতেছে। নীতিধর্ম্মের কিম্বা সাহিত্যের বা সমাজের তরফ হইতে কোনরূপ অনুরোধ উপরোধে, গঞ্জনা কিম্বা লাঞ্ছনায় এখন কোন কাজ দেখিবে না। কেন না, ইহা যুগধর্ম্ম, এবং এই বঙ্গদেশে—এই ভারতবর্ষে নানা কারণে এখন ইহার যেমন উপযোগিতা, তেমনি আবশ্যকতা এবং অপরিহার্য্যতা আছে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে বরং ইহাকে এতদ্দেশের অদৃষ্টবিধাতার দয়াপ্রেরিত বলিয়াই ধারণা হইতে থাকে! দেশের হৃদয় এইদিকে নিজের শেষ পর্য্যন্ত না গিয়া ক্ষান্ত হইবে না। সাহিত্যের দিব্যালোকবাহিনী গঙ্গানদী এখন মর্ত্ত্যলোকে—নিম্নবঙ্গের সমতল ভূমে নামিয়া আসিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালীর দ্বারদেশে আপনাকে বিলাইয়া চলিয়াছেন; একহস্তে জীবন দান করিয়া, অন্যহস্তে জীবন গ্রহণ করিতেছেন; একহস্তে দেশদেশান্তরের আবর্জ্জনা বহিয়া আনিয়া, অন্যহস্তে এ দেশের আবর্জ্জনাও বহিয়া চলিয়াছেন।

ঘ। সাহিত্যসেবীর একমাত্র কর্ত্তব্য স্বপ্রবৃত্তির অনুসরণ।

ইহার বিরুদ্ধবাদী হইয়া ফল নাই; সাহিত্যের সমুন্নত আদর্শ খর্ব্ব হইতেছে বলিয়াও দুঃখিত হইবার কারণ নাই। চির-নীরব মহাকাল স্বয়ং সাহিত্যের রক্ষক এবং চিকিৎসক; যুগশেষে সমস্ত অমঙ্গল-আবর্জ্জনার অতর্কিত সম্মার্জ্জনী বিধান করিয়া দুগ্ধমান সমাধা পূর্ব্বক সরস্বতীর অমরমূর্ত্তিকে তিনি খালাস করিয়া লইবেন। শিবাকাঙ্খীর পক্ষে এখন কেবল সম্যকদৃষ্টি সাহায্যে আপন তত্ত্বে স্থির থাকিয়া চলিতে পারাই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। পাঠককেও উপস্থিত মতে সম্যক্‌দর্শী হইয়া এবং সমুদ্ধভাবেই চলিতে হইবে। তবে এই অবস্থায় লেখকের, স্বয়ং সাহিত্যসেবকের কর্ত্তব্য কি? আমাদের কথাগুলির দিকে এতক্ষণ মনোযোগ দিয়া থাকিলে ইহার উত্তর করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। সাহিত্যসেবী চিরকাল আপন হৃদয়ে

অনুভূত এবং আপন জীবনে অনুজীবিত পদার্থই বিষয়রূপে অবলম্বন করিবেন! বাহির হইতে তাঁহার অন্য কোন শাস্ত্র শাসন নাই। তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে অকপট হইয়া আপন অন্তরাত্মারূপী প্রভুর ইঙ্গিতের দিকে কাণ রাখিয়াই চলিতে হইবে; অন্তর্দ্দর্শী হইয়া, আপন চরিত্রের আন্তরিক প্রবৃত্তি অনুসরণ করিয়াই তাঁহাকে অবশ্য অবশ্য চলিতে হইবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আত্মপ্রবৃত্তি ভালমন্দ শিব অশিব যাহাই হউক, তাঁহাকে উহার বাধ্য থাকিয়াই বিষয় নির্ব্বাচন পূর্ব্বক, ওই নির্ব্বাচনের সমস্ত অদৃষ্টই মানিয়া লইতে হইবে। উহার ফলে হয়ত, সংসারের হেয় অথবা অবজ্ঞেয় কিম্বা উপাদেয় হইবেন, অন্য কাহাকেও দায়ী না করিয়া সকল বিকল্পই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই হইল সাহিত্যজীবনের পরিচালন তত্ত্ব—সারস্বতের ধর্ম্ম।

৭ নিজের সত্যরূপী ধর্ম্মকে এবং তাহার ফলাফলকে অপরিহার্য্য বলিয়া গ্রহণ।

সুতরাং, খোলাখুলি নির্দ্দেশ করিতে হয় যে, আমি যদি অন্তরে পাপিষ্ঠ প্রকৃতির মানুষই হই, তবেও প্রকৃত সারস্বত হইতে হইলে, আমাকে আপন তত্ত্বের অনুগত থাকিয়া পাপিষ্ঠ শিল্পরচনারই সৃষ্টি করিতে হইবে; এবং উহার গতিকে সমাজের শাস্তি পাইতে হইলে তাহাও বরণ করিতে হইবে। তথাপি কপটাচার বা মিথ্যাচার হইতে হইবে না—জোর করিয়া 'সাধুবুলি' গ্রহণ করিলে সরস্বতী সে ক্ষণেই বিদায় লইবেন। ইহারই নাম, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

আসল কথা, সাহিত্যে মহৎভাবের ভাবুক হইয়া মহৎ বিষয় বস্তু অবলম্বন করা, কিম্বা তাহাকে মনুষ্যের মহনীয় ভাষায় প্রকাশ করা—কিছুই জোর করিয়া কিম্বা অভিসন্ধি করিয়া সিদ্ধ হয় না। দান্তে, মিলটন সেক্সপীয়র, গোঠে, হুগো, শীলার, হেবেল-ঘ্যা স্কট প্রভৃতি—যাঁহারাই সাহিত্যে ভাববস্তুর মাহাত্ম্যে অমর হইবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, সে রূপ সৌভাগ্য নিজের আত্মাপুরুষ অনুকূল না হইলে কদাপি ঘটিতে পারে না। সাহিত্যে ১ম শ্রেণীর প্রতিভা লাভ করিয়াও অনেকে তৃতীয় শ্রেণীর রচনা রাখিয়া যান। আমরা যাহাকে সাহিত্যে 'মঙ্গল্য আদর্শের চূড়ান্ত মাহাত্ম্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, বলিতে কি, আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের অনেক প্রতিভাশালী শিল্পীর তাহা নাই; মনুষ্যের অধ্যাত্মকৌলিন্য, ধর্ম্মনীতি বা সমাজনীতি বলিয়া কোন কথা তাঁহাদের নিকট বিশেষ আমল পায় নাই। তাঁহারা খুঁজিয়াছিলেন কেবল 'সৌন্দর্য্য' বা 'ভাল লাগা'—উহাতেই তাঁহাদিগকে চূড়ান্তস্থান হইতে নামাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া পদে পদে প্রতীতি হইতে থাকে! তবু, তাঁহারা মিথ্যাচারী ছিলেন না, তাই সরস্বতীর প্রচুর দয়ামৃত লাভে বঞ্চিত হন নাই। নীতি অথবা ধর্ম্মমন্দিরের দিকে তাঁহাদের অচৈতন্য অথবা বৈরভাব দেখিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে গেলে, আজ পৃথিবীর সাহিত্য অনেক দিকেই দরিদ্র হইয়া পড়ে।

সুতরাং, সাহিত্যসেবীর পক্ষে, যেমন আপনার সরলতাকে বরণ, তেমনি আপনার সত্যানুসরণ, দেশের-কালের সকল অবস্থায়, পরের হুজুগে মত্ত না হইয়া সাহিত্যিকের ইহাই সাধন। উহাতে যে স্থানে লইয়া যায়, তাহাই তোমার জীবনদেবতার বিধান বলিয়া মানিয়া লও। Be faithful

to yourself. আত্মদ্রোহী ব্যক্তি সাহিত্যের outlaw—বিচার-সীমা হইতে নির্ব্বাসিত। সাহিত্যে ব্যবস্থাপত্র ধরিয়া, কি কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া কোন মহৎ কার্য্য সমাধা হয় নাই। সাহিত্যসেবীর পক্ষে আপনার জীবন-তত্ত্বের গতিকেই বিষয়বস্তুর আবিষ্কার, বরণ এবং সমাধান অপরিহার্য্য হওয়া চাই। উহারই নাম স্বাধীনতা "বিদ্বাংস্তত্র ন শোচতে" "ধীরস্তত্র ন ।" এইরূপ বিদ্বান এবং ধীর ব্যক্তির—স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তির কার্য্যই সাহিত্যে উপেক্ষা লাভ করেনা। 'আত্মানং বিদ্ধি' 'আত্মানমনুসর'! উহাতে তোমার শিল্পরচনা যদি আপন চরিত্রধর্ম্মে বিগর্হিত হইয়া যায়, তবুও প্রাণহীন অথবা ফাঁকা হইবে না! জোলা ও রেনল্ড-বৃক্ষ হইতে যে ফল পাওয়া গিয়াছে, উহার আস্বাদ অন্তরাত্মার রসনায় তিক্ত, মিষ্ট, কষায়, বিদাহী কিম্বা সর্ব্বনাশী যাহা বলিতে হয়, বল—তবু তাঁহারা সাহিত্যের outlaw নহেন; তাঁহারা আপন জীবনের অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা-তত্ত্বে স্থির থাকিয়াই অকপটভাবে শিল্প রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সাহিত্যে অকপট শিল্প রচনার স্থান।

এই আদর্শে অকপট শিল্পরচনা মাত্রই সাহিত্যে আহ্বান লাভ করে; সকল প্রকার সত্যদর্শনের জন্যই সাহিত্যে স্থান আছে, যদিও আকাঙ্ক্ষা এবং 'প্রতিফল' দেখিয়াই চরম বিচার নিষ্পন্ন হয়। মনুষ্যজীবনের চিত্রশিল্পী হইয়া, মানবচরিত্রকে ভূয়োদর্শন এবং অধ্যয়ন করিয়া, ভাষায় তাহার অবিকল প্রতিকৃতি তুলিতে পার—সাহিত্য তোমাকেও সাদরে আহ্বান করিবে! জীবনের কেবল ফটোগ্রাফ, প্রকৃত জীবনের পাপতাপ জবন্যতা অথবা দুঃখের ছবিও সাহিত্য তুচ্ছ করেনা! সারস্বত পুরীর রাজকীয় মাহাত্ম্যে চিন্ময়ীর অধিকারে আসিয়া অত্যন্ত সাধারণ জীবনবস্তু পর্য্যন্ত অপরূপ মহিমা এবং ভাবাত্মিকতা লাভ করে; সুতরাং সাহিত্য একেবারে নিরেট, নিরাভরণ,নীরস সত্যকেও অবহেলা না করিয়া পারে। 'অশ্বারোহী ছুটিয়া চলিয়াছে' বা 'কর্ণফুলী বরকলের জলপ্রপাতে নিম্নভূমে ঝরিয়া পড়িতেছে'—শব্দশক্তির সাহায্যে কোনমতে উহার ফটোগ্রাফ লইতে পারিলে, কথার আকারে-ইঙ্গিতে-ভঙ্গীতে ভাবুকের মনে কোনমতে উহার সংবিৎ জাগাইয়া তুলিতে পারিলে, তুমিও একজন কারিকর! সাহিত্য তোমাকেও সম্মানের আসন উঠাইয়া দিবে। বলিতে কি, ইংরাজী সাহিত্যের দুইজন কবি, ব্রাউনীং ও সাউদে, দুইটী কবিতায় এই সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন। বাণীর রাজ্যে আনিয়া বিশ্বজগতের পদার্থ ছবি যে-কোনমতে ধরিয়া রাখিতে পার—অন্ত মনুষ্যের মননসই করিয়া বিভাষিত করিতে পার, তবেই সাহিত্যের গণনীয় কিছু উপার্জ্জন করিলে! সূক্ষ্ম সত্যদর্শনের সহিত প্রবল পরিকল্পনা অথবা প্রচণ্ড ভাবুকতার সংযোগকে সাহিত্য চিরকাল মহার্ঘ আসন দিয়া থাকে সত্য, কিন্তু নক্‌সার শক্তিকেও উপেক্ষা করে না। এই কারণে, আধুনিক কালের অনেক ভাবদরিদ্র এবং চিন্তা-দুর্ব্বল নাটক-নবেল-গল্পও কেবল নক্‌সার দরুণেই সাহিত্যে আসন পাইতেছে। আমরা মহার্ঘতার ক্ষেত্রে, বিস্তারিতভাবে সবিশেষ গণনীয় কিছু করিতেছি মনে হয় না। কিন্তু বঙ্গসাহিত্য কাব্য ও কবিতা ব্যতীত অন্ততঃ এই নক্‌সার ক্ষেত্রেই ইদানীং কিঞ্চিৎ স্বাধীন উপার্জ্জন করিতেছে বলিয়া বিচারক মাত্র-

কেই স্বীকার করিতে হইবে। সাহিত্যের প্রথম প্রবেশ-দ্বারটীর নামই 'সত্য' বলিয়া, ওই সদর দরজা দিয়াই প্রবেশ পূর্ব্বক, শিল্প পদার্থকে সুন্দর এবং শিবঙ্কর বা শিবের অশক্রুরূপে আকার দান করিয়াই মাহাত্ম্য অর্জ্জন করিতে হয়। সারস্বততন্ত্রের "উচ্চ-আদর্শ'-বাদীরা সকলের জানা কথায় এইরূপ অনুরোধ করিতে পারেন :—

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ
ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রূয়াৎ
এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

যুগে যুগে এই উচ্চ-আদর্শে সনাতন সাহিত্যের বাছাই হইয়া আসিতেছে! সনাতন-ধর্ম্মীর সংখ্যা নিতান্ত কম হইলেও, জগতের সাহিত্যহৃদয় অভ্রান্তভাবে মহত্ত্বের মাহাত্ম্য এবং মহার্ঘতা বুঝিতে পারে বলিয়াই বলে যে—হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।

আধুনিক সাহিত্যে পাঠকের নূতন দাবী।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই দুর্ল্লভ লক্ষণ এবং উহার সর্ব্বাতিরেকী মাহাত্ম্যের দিকে সাহিত্য সেবিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক অদ্যকার স্বস্তিবাচন কার্য্যের উপসংহার করিতেছি। বঙ্গসাহিত্যে আমরা কি করিয়াছি এবং করিতেছি, এই আদর্শে তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেও বিলম্ব হইবে না। আপনারা আমাকে আদর করিয়া বক্তার পদবী দিয়াছেন বলিয়াই, অন্যদিকে গতানুগত ভাবের বাক্যব্যয় সংযত করিয়া, বর্ত্তমানক্ষেত্রে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা আসন্ন এবং অপরিহার্য্য বলিয়া আমার ধারণা, সারস্বত জীবনের শাশ্বতধর্ম্ম এবং উহার দাবী এবং কর্ত্তব্য বিষয়ে এই আলোচনার উপস্থাপন করিলাম। ফলতঃ সাহিত্যসেবীর দায়িত্ব এত বেশী যে আধুনিক জগৎ সাহিত্য এবং উহার সেবকের দিকে এক নূতন দাবি রাখিয়া দৃষ্টি করিতেছে বলিয়াই মনে হয়। কাব্য, কবিতা, নাটক, গল্প, সন্দর্ভ কিম্বা ইতিবৃত্ত—নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানের কথা ছাড়াইয়া, যে ক্ষেত্রেই লেখকের নিজের হৃদয়ের সহিত পাঠকের সংস্পর্শ ঘটিয়া থাকে, সে ক্ষেত্রেই পাঠকের এই নূতন দাবী অনুভবগম্য হইতেছে। পাঠক গ্রন্থচরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে কবির হৃদয় এবং জীবনচরিত্রের সহবাসও উপভোগ করে; সুতরাং সত্যকার কবিজীবনের দিকে তাহার দৃষ্টি জিজ্ঞাসু হইয়া এবং অনুভববুদ্ধি সজাগ হইয়া উঠে।

কবিজীবনের ছায়ায় কাব্য-রস ভোগ।

এই জন্য আধুনিক সাহিত্যে কবির জীবনীগ্রন্থ এবং জীবন পর্য্যালোচনাও সাহিত্যরসানুভবের পক্ষে একটা অপরিহার্য্য এবং প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইতেছে। কবিজীবনীর প্রাদুর্ভাব বাড়িয়াছে। পাঠক কেবল কাব্যকে জানিয়াই তৃপ্ত হয় না, কবিকেও জানিতে চায়। এই ব্যাপার সাহিত্যজগতে অনেকানেক কবির মাহাত্ম্যবিষয়ে, এবং তাঁহাদের কাব্যের রসবোধ ও প্রতিষ্ঠার বিষয়েও নিদারুণ হইয়া গিয়াছে। যেমন, বায়রণের পরাক্রমশালী প্রতিভা এবং তাঁহার সমুজ্জ্বল রচনাবলীর অন্তরস্থ যে সকল দোষ অসতর্ক পাঠককে কোন মতেই ক্লিষ্ট করে না, সমালোচক তাঁহার জীবনীগ্রন্থের অভিজ্ঞতা সাহায্যে সজাগ হইয়া, তাঁহার কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে ঐ সমস্ত দোষ-কল তন্ন তন্ন করিয়া বাহিরে আনিয়া দেখাইতেছেন! বায়রণকে জানি বলিয়া, তাঁহার ছন্দের ধ্বনি, কথার ভঙ্গী, তাঁহার অবলম্বিত কাব্যের বস্তু বিষয়, উহার গতি এবং আবহাওয়ার মধ্যেও প্রতি পত্রেই যেন স্বয়ং বায়রণ আপন দোষে ও

স্তূপে বসিয়া আছেন বলিয়াই মনে হইতে থাকে। এবং এই অনুভবও যথার্থ বলিয়াই বিশ্বাস করি। সাহিত্যে—বিশেষতঃ কাব্য সাহিত্যে—যে স্থলে কবির হৃদয় পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া উহাকে অনুরণিত করা আবশ্যক, সে স্থলেই ঐরূপে নানাপথে কবির আত্মপ্রকাশ না ঘটিয়া পারে না—অন্ততঃ সে মুহূর্ত্তের চরিত্র প্রকাশ। কিন্তু মূল জীবনের দীর্ঘ তন্তুর সঙ্গে উহার নৈকট্য সম্বন্ধ এবং সামঞ্জস্য না থাকিলে সেই মুহূর্ত্তটীও সম্ভবপর হয় কি? সুতরাং, এস্থলেই বর্ত্তমানকালের—সকল কালের কবিসমক্ষে এবং সাহিত্যসেবীর সমক্ষে যুগধর্ম্মোচিত নূতন দাবী! কবি কেবল কাব্য লিখিলে চলিবে না!—জীবনটীকেও কাব্যের অনুকূলে রচনা করিতে হইবে; অথবা, আদৌ জীবন রচনা করিয়া তদনুসরণেই কাব্য লিখিতে হইবে। অন্যথা, দুটীতে কাটাকাটি করিয়া নিদারুণ ভাবে রসভঙ্গ করিবে। এই দাবী অস্বীকার করার যো নাই; এবং ভবিষ্যতের সাহিত্যে উহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া চলিবে বলিয়াই মনে করিতেছি।

+ জীবনের জ্ঞান কর্ম্মকাণ্ড এবং রসকাণ্ডের মধ্যে আন্তরিক সামঞ্জস্য ব্যতীত সাহিত্যে স্থায়ী মাহাত্ম্য লাভ অসম্ভব।

এই আলোচনার মূল সূত্রে যদি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, ভিত্তিমূলে প্রকৃত সারস্বত জীবন গঠন করিতে না পারিলে জীবনের জ্ঞানকর্ম্মকাণ্ড এবং রসকাণ্ডের মধ্যে সমযোগী সূত্রবন্ধন এবং সামঞ্জস্য না ঘটিলে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রকৃত প্রস্তাবে কোনরূপ উৎকর্ষের বা স্থায়ী মাহাত্ম্য লাভের সম্ভাবনা নাই। ফল কথা এই যে, সাহিত্য রচনার মূলেই লেখকের প্রবৃত্তি; এবং প্রবৃত্তির মূলেই লেখকের চরিত্র। তুমি যাহাই চিন্তা কর, কল্পনার অতীন্দ্রিয়ক্ষেত্রে বা সাধারণ জীবনের সমতল ভূমে বুদ্ধিকে সমাহিত করিয়া যাহাই অনুধাবন বা উপার্জ্জন কর, সমস্তকে ভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে। এই ভাষা তোমার হৃদয় হইতে নিঃসারিত না হইলে, উহার কিছুমাত্র জীবনীশক্তি থাকিবে না, উহা বরং মরা মানুষের স্পর্শের মতই ভীতিবিরক্তির সঞ্চার করিবে।

+ মহৎ সাহিত্যের মূলে মহতী প্রবৃত্তি এবং মহৎ চরিত্র ভিত্তি।

ভ যাকে হৃদয়স্তূপে অনুপ্রাণিত করিতে হইলে তোমার কবি হৃদয় এবং কবি চরিত্রের মধ্যে মৌলিক সামঞ্জস্য এবং সমতান সংঘটিত হওয়া আবশ্যক। অন্তশ্চরিত্রের সৌষ্ঠব সম্পাদন না করিয়া, চরিত্রে প্রীতি, পবিত্রতা, মধুরতা, ঔদার্য্য এবং অভ্যুন্নতি সাধন না করিয়া তুমি উপরি উপরি ভাবে ঐ সমস্তে অভিসন্ধি পূর্ব্বক রস-সৃষ্টি করিতে গেলে—তুমি যতই কেন সতর্ক সাবধান ব্যক্তি হও না—আড়েঠারে তোমার হৃদয়ের অসারতা এবং কলুষছায়া আপতিত হইয়াই সমস্তকে অতর্কিতে কলুষিত করিয়া দিবে। ইহা নীতি-বিজ্ঞানের বা ধর্ম্মগোঁড়ামির ধামাধরা 'কচকচি' মাত্র নহে। দুর্হৃদয় ব্যক্তি যতই বুদ্ধিজীবী এবং প্রতিভার অধিকারী হউক না কেন, অন্তর্দর্শী ব্যক্তির প্রত্যাগমুভব সমক্ষে, যাহার প্রকৃত অন্তরঙ্গীয় কাণ আছে তাহার নিকটে, কখনও মাহাত্ম্য রক্ষা করিতে পারিবে না। সহৃদয় পাঠক মাত্রের অন্তরাত্মা এইরূপ শিল্পরচনার স্পর্শলাভ করিয়াই উদ্বেজিত হইয়া উঠিবে; উহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে

বলিয়া অনুভব করিবে। রচনা মাত্রেই যেমন শিল্পীর বুদ্ধির দ্বারাই গঠিত হয়, তেমনি তাহার অন্তশ্চরিত্র হইতেই সূক্ষ্ম বর্ণধর্ম্ম এবং অধ্যাত্ম প্রকৃতিটাও পাইয়া থাকে। ফল মাত্রেই বৃক্ষটীর অন্তর্ধর্ম্ম লাভ না করিয়া পারে না; প্রকৃত রসিকব্যক্তির রন্ধন-সমক্ষেও ঐ ধর্ম্মকে কোনমতে গোপন করিতে পারে না।

কবির আত্মমূল্য এবং স্বধর্ম্মমূল্য সৃষ্টি।

এই 'ধর্ম্মের' এমন মাহাত্ম্য যে, উহা অপরিহার্য্য হইয়া, লেখকের সকল বুদ্ধি-চেষ্টা এবং সতর্কতাকেও অতিক্রম করিয়া তাঁহার রচনার মধ্যে সংক্রামিত হয়; তাঁহার styleকেও পরিচালিত করে। রচনামাত্রেই লেখকের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সূক্ষ্ম confession স্বাধীনভাবে দৃষ্টি পরিচালনা করিয়া এই সূক্ষ্ম পদার্থকে হয়ত অনেকেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না; কিন্তু কবির একটী উত্তম জীবনী পাঠপূর্ব্বক তাঁহার রচনার দিকে চক্ষু ফিরাইলেই, অধ্যাত্মতত্ত্বের এক অবিজ্ঞাত, অভিনব প্রকোষ্ঠে যেন প্রতিপদে আলোকপাত হইতেছে বলিয়া অনুভব হইতে থাকিবে। কবি যদি স্বয়ং শিথিল-চরিত্র, জড়তা-বিলাসী অথবা মাংস-বিলাসী হন, তাহা হইলে—তিনি যতই সাবধানী মনুষ্য হউন না কেন, তাঁহার ধর্ম্মভাবের গ্রন্থমধ্যেই তাঁহার পরমার্থচিন্তার বস্তুবিষয়, প্রণালী এবং রচনারীতির মধ্যেই ঐ দোষ নানা ছিদ্রপথে গলিয়া পড়িবেই পড়িবে। সূক্ষ্মদৃষ্টি কোনমতেই এড়াইতে পারিবে না। কবিত্ব শক্তি হৃদয়ের ব্যাপার বলিয়া এবং প্রকৃত কাব্যরচনায় ব্যাপারে সরলতা নামক পদার্থটী ন্যূনাধিক অপরিহার্য্য বলিয়াই এ তত্ত্ব অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। কবি যদি দুর্দ্দম অহংভাবুক, আত্মাভিমানী এবং অহংমদমত্ত হন, তাঁহার চৈতন্যমধ্যে যদি কেবল সংসারে নিজের শ্রেষ্ঠতা, পরের দোষদর্শিতা এবং অসহিষ্ণুতার ভাবই প্রবল থাকে, তাহা হইলে তাঁহার আকারে-ইঙ্গিতে-ভাষিতে উহার ছায়া যেমন কোনমতে সামাজিকের অনুভব এড়াইতে পারিবে না, তাঁহার ভাবুকতা-বরিষ্ঠ শিল্প চেষ্টার মধ্যেও উহার বিষ-জন্য রেখা জীবাড়া এবং আভাস প্রকাশিত না হইয়া পারিবে না। সাংসারিক এবং সামাজিক ব্যবহারেও, ঠিক যে মুহূর্ত্তে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সাবধান হওয়া আবশ্যক আছে, যাহা হইতে সামাজিকগণ বিনয়নম্রতা অথবা সৌজন্য আশা করিতেছে, সেই মুহূর্ত্তেই উহা নিদারুণভাবে ভদ্রতার বস্ত্রান্তরাল হইতে বিকট শৃঙ্গ উদ্যত করিয়া সকলকে হাঁকাইয়া দিবে। ধর্ম্মের অকপট শুদ্ধান্ত রচনা করিয়া যখন তিনি স্বয়ং—শুদ্ধসাঙ্গ হইয়া পরমার্থ আলোচনা করিতে-ছেন, তখনি হয়ত উহা তাঁহার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে এবং হাবভাবে নানাদিকে উঁকি মারিয়া শ্রোতৃবর্গকে কণ্টকবিদ্ধ করিতেছে, আন্তরিক বেদনা জন্মাইয়া তাহার উদ্দেশ্য বিফল করিয়া দিতেছে। তিনি কবি বলিয়াই, সাধারণ লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব এই ব্যাপার তাঁহার অদৃষ্টে সম্ভব হইবে। অন্যায়ের প্রতি, পাপের প্রতি তাঁহার আক্রোশ এবং ধিক্কারের মধ্যে, তাঁহার হৃদয় রসিকতার মধ্যেও জানিতে বাকী থাকিবে না যে, তিনি ন্যায়ধর্ম্মের বা সত্যের মমতায় উত্তেজিত হইয়াছেন, না কেবল আপন হৃদয়ের অপরিপাচ্য বিষ উদ্গার পূর্ব্বক আপনাকে খালাস করিতে-ছেন। কবির পক্ষে অন্তরাত্মাকে ঢাকিবার,

ভাবের ঘরে চুরি করিবার উপায় নাই! লোভ, মোহ, পাপাভিমানের এবং পাপচরিত্র উদ্‌ঘাটনের পুণ্যসংকল্পিত মহাসঙ্গীতের মর্ম্মতল হইতে কবির আপন পাপানন্দই উচ্ছ্বসিত হইয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে পাঠকের দৃষ্টিবদ্ধ হইয়া যাইবে, এবং লেখকের পাপিষ্ঠতার ছবিটাই অতর্কিতে মুখ্য হইয়া সমস্ত মহাভারত অশুদ্ধ করিয়া দিবে।

৭ সাহিত্যসেবীর ঐক্যতান সাধনা।

কবির জীবন সাধনা এবং ভাবসাধনা সমযোগী হইতে না পারিলে এ সঙ্কট এড়াইবার অন্য উপায় নাই। ইহা সাহিত্য-সেবক মাত্রের সঙ্কট স্থান—সাহিত্যসেবা সংসারে বিফল হইবার মূলেও ইহাই প্রধান কারণ। আমরা সকলেই ন্যূনাধিক দুর্ব্বল; প্রকৃত জীবন এবং ভাবুকজীবনের মধ্যে বেশী কম বিরোধ লইয়াই জীবনপথে চলিয়াছি। সাহিত্যিকগণের সম্মিলন সভায় এই সর্ব্ববিধ্বংসী এবং সর্ব্বসাধারণ সমস্যার দিকে সকলের আত্মবুদ্ধি সচেতন করাই কর্ত্তব্যবোধে, সাহিত্যসেবার গোড়ার দাবীটাকে এইভাবে উপস্থিত করিলাম। যেমন উপক্রমে তেমন উপসংহারেও বুঝিতেছি যে, সাহিত্যসেবীর জীবনচরিত্র এবং কবিত্ব পরস্পর ঐক্যতান হইয়া তাললয়বদ্ধ চরমার্থ চেষ্টার আকারে পরিণত না হইলে, সকল চেষ্টাই সকল দিকে—যেমন ইহকালে তেমন পরকাল পক্ষে—বিফল হইয়া পড়া অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং নিয়তভাবে মনে রাখিতে হইবে, আমরা সকলে অতর্কিতে 'মহতী বিনষ্টি'র অতল গুহাসম্মুখেই দাঁড়াইয়াছি। সাহিত্যসেবক মাত্রেই আপনাকে অনন্তের সন্তান এবং অনন্তজীবী বলিয়া ধারণা জাগরূক রাখিয়াই কায়মনে সাহিত্য জীবন নির্ব্বাহ করিতে হইবে। কেবল এই প্রণালীতে সচেতনভাবে ক্রিয়াপর হইয়া চলিতে পারিলেই এই মৃত্যুসঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তাঁহাকে সাহিত্যসেবা পথে স্বভাবের অনুসরণ পূর্ব্বক যুগপৎ সারস্বত ক্ষেত্রের শাশ্বতী ঋদ্ধি এবং অনন্ত জীবনের আহার্য্য সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়াই সংসারে অগ্রসর হইতে হইবে। এই স্বল্প জীবনের সাংসারিক ফলাফল অনন্তের তুলনায় তুচ্ছ করিয়া প্রতিপদে চলিতে না পারিলে তিনি কখনও অমৃত লাভ করিতে পারিবেন না। বিশ্বভুবনের সাহিত্যরঙ্গভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই দেখিতেছি, সকল অমর সাহিত্য-শিল্পীর হৃদয় সজ্ঞানে বা অতর্কিতভাবে, সকল ভুলভ্রান্তির মধ্যে, কেবল একই সুরতানলয়ে নিত্যপুরীর অভিমুখে উত্থিত হইতেছে—

ওই শোন উঠে ছন্দে নানান
অনন্ত তান কবি হিয়া সুর!
লক্ষ ধারাণ ঐক্যের তান—
দয়ালের কাণ শুনিছে মধুর!
সুখ দুঃখের জাল উত্তরিয়া
নিত্যপুরীর পন্থা ধরি,
মর্ত্ত্যজীবন সীমা লঙ্ঘিয়া
দুগ্ধ ধূপের আরতি ধরি,
উঠে সঙ্গীত অযুত বর্ণে
অনন্ত পদে উধাও পথে
চরণে কাহার হাজার পর্ণে
ধবল কমল হেন বিকশে!

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

শোকে সান্ত্বনা।

সাংসারিক শোকে দুঃখে কে গো তুমি করিছ ক্রন্দন
রোধ' অশ্রু, মোছ' অক্ষি, নত শির কর উত্তোলন।
কার্য্যচ্যুত অশ্রুপাতে শোকানল জ্বলে প্রোজ্জ্বলিয়া;
সবে মিলে কাঁদি যদি তবে চিত্ত উঠিবে ফুটিয়া।
নিবিড় নির্ব্বিঘ্ন শান্তি কেবা কবে পেয়েছে কোথায়?
কেন তবে শোক-দুঃখে শেলাঘাত পাইবে হিয়ায়?
নর নারী চিরদিন এ জগতে রহিবে না আর;
সুখ দুঃখ, দুঃখ সুখ আসে যায়—আসিবে আবার!
চিরস্থায়ী কিছু নহে, পুষ্প ফুটি' ঝরিবে নিশ্চয়;
প্রকৃতির কোন কার্য্যে বিন্দুমাত্র নাহি বিপর্য্যয়।
ষড়ঋতু যায় আসে, আসিবে যাইবে চিরদিন;
আজি যাহা আসিয়াছে, কালি তাহা হইবে বিলীন।
আবার তা অন্যরূপে আসিবে না, কে বলিতে পারে?
কেন তবে কেঁদে মর অনিবার্য্য দুঃখ-শোকভারে!

২

স্বার্থহীন অশ্রুপাতে শুভ্রতর হউক ভারত!
ত্যজ' ব্যর্থ অশ্রুপাত, এস পূর্ণ করি মনোরথ।
কাঁদিতেই হয় যদি কাঁদি তবে মহত্ত্বের লাগি';
মানুষ হইবে তবে, তুচ্ছ ভীতি সত্য যাবে ত্যাগি'।
হাড় ও মাংসের জন্য বৃথা কেন অশ্রু বরিষণ!
মৃতের মহত্ত্ব চিন্তা, গুণ-পূজা কর অনুক্ষণ।
ধর্ম্মবলে আত্মবলে পাপ নিত্য কর পরাজয়;
নতুবা এ অশ্রুপাত রসাতলে শোভিবে নিশ্চয়।

৩

বলিতে প্রকৃত কথা বড় ব্যথা জাগিছে হিয়ায়!
মনে হয় মোরা সবে করিতেছি নাট্য ব্যবসায়।
লক্ষ্য নাই, বোধ নাই, পশুবৎ করি আচরণ;
আহার পাইলে খুসী, বেদনায় গভীর ক্রন্দন।
যে মরেছে তার মত নিশিদিন হ'তে চেষ্টা কর;
জীবনের অসমাপ্ত পুণ্য কাজ সদা তুমি ধর'।
তার কার্য্য বেছে লও, কর জন্ম সার্থক সফল;
মানুষের মত হয়ে হাস' কাঁদ' ফেল' আঁখিজল।

৪

বিলাস-ব্যসনাসক্ত, বীর্য্যহীন,—তুমি না যুবক!
ব্রহ্মচর্য্যে মজ' সবে, বীর্য্য পাবে, বাড়িবে পুলক।
মেঘ-মন্দ্রে নৃত্য করে মৃত-অস্থি শ্মশান মাঝার;
কাঁপে গিরি, তরু লতা, জনপ্রাণী হাজার হাজার।
দুর্ব্বল মানব-চিত্ত সেই রবে ওঠে উদ্বোধিয়া;—
সংসার-সংগ্রাম ক্ষেত্রে চল হর্ষে নাচিয়া নাচিয়া।
বিক্রয়ার্থে বিপণীতে সুকোমল কার্পাস উপরে,
রসাল আঙুর যথা রহে কাষ্ঠ কৌটার ভিতরে;
এ দেশের ধনপতি সেইরূপ ইষ্টক প্রাসাদে,
কয়াসে তাকিয়া সম শোভা পায়, পড়ে না ক্যাসাদে!
এঁদেরে আদর্শ করি' যে চলিবে মৃত্যু শ্রেয়ঃ তার;
ইহাঁরা দয়ার পাত্র—কাঁদে প্রাণ পিণ্ডের মাঝার!

৫

পাপের বিরুদ্ধে এস সবে মিলে করি অভিযান!
এস গাহি বজ্রগীতি উড়াইয়া ধর্ম্মের নিশান!
যে গানে জগৎ জাগে এস ভাই সেই গান গাই!
তরল সঙ্গীত শুনি' নিরাশার মর্ম্মে মরে যাই!
গগন ব্যাপিয়া যবে গর্জ্জি' মেঘ কাঁপায় ভুবন,
তখনি সে রুদ্র রবে দেহে পাই নবীন জীবন!
উড়ায়ে রাজ্যের ধূলি ঝঞ্চা যবে আসে হুহুঙ্কারিয়া,
সে রূপ নেহারি' আমি তালি দেই হাসিয়া হাসিয়া!
আদিত্যের তীব্র তেজ মর্ম্মে মর্ম্মে করি অনুভব;
শ্রান্ত ক্লান্ত হই তবু প্রাণে পাই প্রাণের বিভব!
গভীর আঁধার রাত্রে বিশ্ব যবে ঘুমে অচেতন,
তখন ভয়ালরূপে করালিনী করি নিরীক্ষণ!
তারা হাসে, চন্দ্র হাসে, তরঙ্গিণী হাসে কুলুকুল;
ভালবাসি হাসি তবু রুদ্ররূপে হৃদয় আকুল!
কি এক অস্ফুট জ্যোতিঃ হেরি' আমি উঠেছি জাগিয়া;
সেই জ্যোতিঃ পুঞ্জ যিখে ধীরে ধীরে উঠিছে ফুটিয়া!
ঝলসিয়া যায় আঁখি, তবু হেরি—এমন মধুর!
শিরায় শিরায় ছোটে তাজা রক্ত প্রচুর প্রচুর!

হীনতার সেবা করি' মনুষ্যত্ব বিকায়োনা আর
পুরুষত্ব মনুষ্যত্ব এ জগতে করহ প্রচার।
পুরুষ পৌরুষ চাহে, মানবতা চাহিবে মানব;
ক্লীব অশ্রুপাতে কেন নাশিতেছ প্রাণের বিভব!
মৃত্যুঞ্জয় হও সবে করি' দুঃখ-হলাহল পান;
রোধ' অশ্রু, মোছ' অক্ষি, বীর্য্যহীন,—হও বীর্য্যবান্।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

আমার নিবেদন

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনাকে যেরূপ শ্রদ্ধা করি, তাহা আপনিও জানেন, অনেকেই জানে। আপনার গুণরাশির উপর বাঙ্গালীর ভক্তি অত্যন্ত অধিক। এ কথা স্তুতিবাক্য নহে, স্বরূপ বাক্য। সেই নিমিত্তই গত বৈশাখ সংখ্যার নব্যভারতে আপনার উক্তি পড়িয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। আপনি হাওড়া-সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষ করিয়া যে কয়েকটী ভাবপূর্ণ কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে আপনার সহৃদয়তার প্রমাণ দেয়, কিন্তু বিচার-শক্তির প্রমাণ দেয় কি না, বুঝিতে পারি নাই। আপনি সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য কি বুঝিয়াছেন? আমি ইহাকে জন্ম হইতে ভালবাসি, ইহাকে নিজহাতে "মানুষ" করিয়াছি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য অন্যের যাহাই থাকুক, আমার উদ্দেশ্য চিরদিনই এক। সে উদ্দেশ্য এতদিন পূর্ণ করিতে পারি নাই। বাঁকিপুর অধিবেশন হইতে পূর্ণ করিবার আশা করিতেছি। কলিকাতা-সাহিত্য-পরিষদ, সাহিত্য-সভা, উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-পরিষদ, ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদ ইত্যাদি থাকিতে বর্ষে বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয় কেন? আমি ইহার এই অর্থ বুঝি:— পরিষদগুলির কর্ম্মক্ষেত্র শিক্ষিত সমাজ লইয়া; সুতরাং সহরেই সীমাবদ্ধ। সম্মিলনকে জেলায় জেলায়, (হয়ত অদূর ভবিষ্যতে) গ্রামে গ্রামে যাইয়া লোক শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে। পরিষদের শাখা স্বরূপেই হউক, আর স্বতন্ত্র ভাবেই হউক, জনসাধারণের মধ্যে বর্ত্তমান যুগের চিন্তা, অনুপ্রাণনা, চেষ্টা জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই সম্মিলনের প্রকৃত সফলতা হয়; নচেৎ আমার মতে ইহা যে বার্ষিক তামাসা স্বরূপ এতদিন আছে, তাই থাকিবে। গ্রামে গ্রামে নিরক্ষর জনসাধারণ অসংখ্য। ইহাদিগকে স্কুলস্থাপন করিয়া ঐ সকল শিক্ষা বিতরণ করা অসম্ভব। এত স্কুল স্থাপন করিবার ব্যয় কে দিবে? এ দেশে কোনকালেই টোলে অথবা গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় লক্ষ লক্ষ লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হইত না। হওয়াও সম্ভব নহে। যাত্রা, কথকতা, পাঁচালি, পূজা পর্ব্ব, পঞ্চায়তী ইত্যাদি অনুষ্ঠানের দ্বারাই এ দেশের জনসাধারণ চিরকাল শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। নিরক্ষর অর্থে—এ দেশে অশিক্ষিত বুঝায় না। এ দেশের জনসাধারণ চরিত্র-বলে, কর্ম্ম-সাধনে, পরার্থপরতায় জগতের আদর্শ স্বরূপ ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। কিন্তু সম্প্রতি যে হাওয়া ছুটিয়াছে, তাহাতে সে আদর্শ আর টিকিতে পারিতেছে না। তাই বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন নানা স্থানে করিয়া সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান—সকল দিক দিয়াই এক হাওয়া বহাইয়া দিতে হইবে। এ যুগের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত জনসাধারণকে গড়িয়া তুলিতে এই ভাবে সম্মিলনকে পরিচালিত করিতে চাই। নচেৎ সমস্ত বৎসর ঘুমাইয়া থাকিয়া দুই দিনের জন্য জাগিয়া আবার নিদ্রিত হইয়া পড়িবার কোন আবশ্যকতা নাই।

আমি সম্মিলনকে এই ভাবে দেখিতে চাই। তন্নিমিত্তই বাঁকীপুরে প্রস্তাব করিয়া-

ছিলাম, সম্মিলন রেজেষ্ট্রী হউক'। তাহা হইলে ইহা একটী স্থায়ী অনুষ্ঠান হইবে। ভগবদিচ্ছায় সে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এবৎসরও তৎসম্বন্ধে কিছু অগ্রসর হইয়াছি। যদি আমার উপরের প্রকাশিত আশা ফলবতী হইবার নিমিত্ত কোন (কর্ম্মী) পরিচালক প্রয়োজন হয়, তবে স্থায়ী পরিচালক নিযুক্ত করা অসঙ্গত হয় না। অন্ততঃ এক-বৎসরের অপেক্ষা অধিক কালের নিমিত্ত স্থায়ী পরিচালক মনোনীত করা আমার মতে অত্যাবশ্যক হইতেছে। গ্রামে গ্রামে গ্রাম্য সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের শাখা স্বরূপে বর্ষব্যাপী * কর্ম্ম করা আবশ্যক হইয়াছে। আপনি ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "* * * স্থায়ী সভাপতি করার কি † হইল?" কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা ব্যঙ্গের কথা নহে; ভবিষ্যৎ দর্শনের কথা।

জানিবেন, আমি কাহারও পক্ষ সমর্থন নিমিত্ত এই সকল বলিতেছি না। আমার ইহাই প্রকৃত মত। আরও কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক বন্ধুরও এই মত। সরল ভাবে এ মত পোষণ করা অসম্ভব বোধ করিবেন না, এই অনুরোধ। আমি নিশ্চয় জানি, আপনি কখনই আমার কথার কদর্থ গ্রহণ করিবেন না। শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে স্যর আশুতোষ ব্যতীত আর একজন কর্ম্মী, অক্লান্ত কর্ম্মী, আমাকে বাঙ্গালীর মধ্য হইতে দিতে পারেন?' আমি স্থায়ী সভাপতি মনোনীত করিবার নিমিত্ত আগামী বর্ষের সম্মিলনে তাঁহার নাম গৃহীত হইবার জন্য প্রস্তাব করিতে চাই। এ পর্য্যন্ত কাহারেও এই গুরুতর দায়ীত্বপূর্ণ কর্ম্মভার লইতে স্বীকার করাইতে পারি নাই। তাই প্রস্তাব করাও হয় নাই। বিবেচক, বহুদর্শী, প্রাচীন, কিন্তু যুবার ন্যায় উদ্যোগী, অধ্যবসায়ী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি চাই। আপনি যদি সম্মত হন, সত্য সত্যই দেশের কল্যাণ স্মরণ করিয়া কৃতার্থ হইব। হইবেন কি? স্যর আশুতোষের রঙ্গপুরের, বাঁকিপুরের এবং হাওড়ার অভিভাষণ পাঠ করুন, ভিতরে প্রবেশ করিয়া মর্ম্ম অনুভব করুন; তাহা হইলে বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, আমি যে ভাবে বর্ত্তমান যুগের সাধনায় জনসাধারণকে শিক্ষিত করিতে চাই, স্যর আশুতোষ তাহার অযোগ্য নহে। বরং (ক্ষমা করিবেন, আপনার নিকট প্রকৃত মনোভাব গোপন করিব না) তিনিই যেন একমাত্র ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। তিনি নানা দেশীয় শিক্ষা-বিস্তারের; নানা জাতির ভাবোন্মেষের, নানা মহাদেশের জনসাধারণের চিত্ত বিকাশের ইতিহাস যেরূপ অবগত আছেন, আমি তদ্রূপ নহি। [আমাকে উল্লেখ করিয়া বলাই ভাল; নচেৎ অন্যের বিরাগভাজন হইতে পারি।] অন্য কেহ থাকিলে আপত্তি ছিল না; কিন্তু বিশ্বাস করুন, সত্যই কাহাকেও দেখিতেছি না। এতদ্দেশে ভদ্র শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সহিত তিনি অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। সে শিক্ষা আপনারও সন্তোষ-জনক হয় নাই, আমারও নহে, তাঁহারও বোধ হয় নহে, ইহা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু তাহার অন্য কারণ আছে। বিশ্ববিদ্যালয় এতদিন যে আপনা-দিগের আরও অপ্রীতিভাজন হয় নাই, সে কেবল তাঁহারই চেষ্টায়। ইহা আমি জানি; বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পৃষ্ট আরও অনেকে জানে।

* দুই দিনের জন্য নহে।

† নব্যভারত বৈশাখ ১৩২৬। ৭ পৃষ্ঠা।

কিন্তু ইহার পূর্ণ ইতিহাস বোধ হয় তাঁহার জীবিতকালে কেহই জানিতে পারিবেন না। তাঁহার কনভোকেশন সভায় ভাইস্ চ্যান্সেলার পদের শেষ অভিভাষণটী মুদ্রিত হই য়াছে; তাহার শেষাংশ পাঠ করিলে কিঞ্চিৎ বুঝা যাইবে যে, এতদ্দেশে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে কত বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। আপনি আক্ষেপ করিয়াছেন, "বিশ্ববিদ্যালয় শুধু হাকিম ও উকিলই সৃজন করিলেন।" যদি ইহাই হইত, তাহা হইলেও দুঃখ করিবার কিছু ছিল না। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যখন রাষ্ট্র পরিচালকগণের নিকট হইতে জনসাধারণের অধিকার ছিনাইয়া লইতে চাহিয়াছিল, তখন উকিলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল; এখনও তাহাই করিতেছে। ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের ইতিহাস জনসাধারণের অনুকূলে রাষ্ট্রীয় অধিকার ছিনাইয়া লইবার চেষ্টায় পরিপূর্ণ; ঐ সকল দেশও উকিলে পরিপূর্ণ। জ্ঞানযোগী বন্ধুবর ডাক্তার পি, সি, রায় এবং আপনি ল' কলেজ উড়াইয়া দিতে চাহেন; এবং "শিল্প-বিজ্ঞান-বাণিজ্য" জাগাইয়া তুলিতে ইচ্ছা করেন। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে শিল্প-বিজ্ঞান-বাণিজ্য জাগাইয়া তুলিবার অনুষ্ঠান কম নাই, বরং অনেক বেশী আছে। কিন্তু তত্তদ্দেশবাসীরা আইন বিদ্যালয় ভাঙ্গিয়া ফেলে নাই। পার্লামেণ্টের কমনস সভায় এটর্ণী ব্যারিষ্টারের সংখ্যাধিক্য আমাদের বিরাগ উৎপাদন করিলে ... বড় পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ হইয়া গেল; এটর্ণী ব্যারিষ্টারের নামই অগ্রগণ্য। ... কি? লয়েড্ জর্জ্জ কি? পয়েঙ্কার ... ? ক্লেমেন্স কি? ইহারা সকলেই উকিল। মানব সমাজ দিন দিন যেমন জটিল হইয়া উঠিতেছে এবং সর্ব্বত্রই রাষ্ট্রপরিচালকগণের সহিত জনসাধারণের যেরূপ স্বার্থ-বিরোধ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে ল-কলেজ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে অত্যাচারের হস্ত হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার বিঘ্ন হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। ভাবের উচ্ছ্বাসে ভাসিয়া যাইবেন না। বাস্তব সমাজটাকে দেখিয়া লইয়া উকিলদিগকে ফাঁসি দিতে হয়, দেন; দায়মাল দ্বীপান্তর করিতে হয় করুন। আমি বুড়া উকিল, আমার বড় অমত হইবে না। কিন্তু ব্যোমকেশ, চিত্তরঞ্জন, রাসবিহারী না থাকিলে দেশ বাঁচিবে তো?

বাস্তব মানব সমাজটাকে দেখিতে অনুরোধ করিলাম কেন? তাহার কারণ ত আপনি নিজেই লিখিয়াছেন।* "ঐ দেখ, সত্যরক্ষার জন্য মানব শিশু ক্রুসে দেহপাত করিতেছেন; দেখ, দেখ ঐ দেখ, সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রেমিক নিমাই সকল জ্বালার উপশম করিতেছেন।" ইহা উচ্ছ্বাস হইতে পারে, কাব্যও হইতে পারে। কিন্তু আপনি বাস্তব মানব সমাজের যে সকল দুরাচার উল্লেখ করিয়া বহু আক্ষেপ করিয়াছেন, তাহার লাঘব ঐ সকল উপায়ে হয় নাই, হইবে না। "ক্রুসে দেহপাত" সত্ত্বেও, "সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া" সত্ত্বেও, মানব সমাজ যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রহিয়াছে। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালেই রহিয়াছে। প্রাচীন কালের শিক্ষা দীক্ষা, ভাব ও সংস্কার বশতঃ যাহাই বলা হউক, মানবকে বিদ্যাবলে, বুদ্ধিবলে, চরিত্রবলে, নীতি ও ধর্ম্মবলে উন্নত করিতে হইলে, ধনে জনে, স্বাস্থ্যে ও সম্পদে গরীয়ান্ করিতে হইলে, মানুষকে (আপনার ভাষায়) মানুষ করিতে হইলে, "ক্রুস" ও "সমুদ্র" বিশেষ কিছু সাহায্য করিবে বলিয়া

* নব্যভারত ১৩২৬, বৈশাখ ৫ পৃষ্ঠা।

বোধ হয় না। মানুষ গড়িবার উপায় আপনার উল্লেখিত নেপোলিয়ান্ জানিতেন না। রসায়ন শাস্ত্রও মানুষ গড়া শিক্ষা দেয় না। সে এক স্বতন্ত্র কথা। আমি সে কথা আমার ক্ষুদ্র শক্তির মত করিয়া নানা স্থানে, নানা উপলক্ষে বহুবার বলিবার চেষ্টা করিয়াছি; নব্যভারতের পাঠকগণও এ বিষয়ে আমার চেষ্টা অজ্ঞাত নহেন। যাহা হউক, সে কথা বলিবার এখন প্রয়োজন নাই।

তা'র পর আপনার কয়েকটী আক্ষেপের উল্লেখ করিয়া যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিব। আপনার একটী প্রধান ক্ষোভের বিষয় এই যে, গত সম্মিলনের সভাপতি বলিলেন, "জাতীয় সাহিত্য ইউনিভার্সিটীর মধ্য দিয়া জাগিবে।" ইহাতে যদি আপনি বর্ত্তমান ইউনিভার্সিটী বুঝিয়া থাকেন, তবে প্রকৃতপক্ষেই আপনার ক্ষোভের কারণ আছে। কিন্তু আমি তাহা বুঝি নাই আমি বুঝিয়াছি, এই ইউনিভার্সিটী অদূর ভবিষ্যতে যেরূপ হইবে, তাহারই কথা। জাতীয় সাহিত্য পদার্থটী অতি বৃহৎ পদার্থ। ইহা "ন্যাসন্যাল স্কুল" হইতে পাইবার আশা করেন কি? কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে নানা জেলায় "ন্যাসন্যাল স্কুল" স্থাপিত হইয়াছিল কলিকাতাতেও মহা সমারোহে ন্যাসন্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজসাহী স্কুলটীর সহিত আমার সংস্রব ছিল। জানি না আপনার ঐরূপ কোন স্কুলের সহিত সংস্রব ছিল কি না? এদেশের আব্‌হাওয়ার গুণে ঐ সকল ন্যাসন্যাল স্কুল স্থায়ী হইল না, হইতে পারেও না? তবে, টেক্‌নিক্যাল অর্থে যদি কিঞ্চিৎ ছুতারের কাজ হয়, এবং জরিপ আমিনী বুঝায়, তবে দুই একটী জেলা এখনও দুই একটী ন্যাসন্যাল স্কুল আধমরা হইয়া আছে, বলা যায়। কিন্তু তাহার সহিত জাতীয় সাহিত্য গঠনের কোন সংস্রব নাই। এদেশে জাতীয় সাহিত্য গড়িবার কি অনুষ্ঠান হইতে পারে? একটু চিন্তা করিলে অকূল সমুদ্রে পড়িতে হইবে। যদি সেকালের বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্কিম ও হেমচন্দ্রকে গড়িয়া থাকে, তবে নব গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সাহিত্যের জন্মদাতাগণকে কেন গড়িতে পারিবে না, বলা কঠিন। বিশ্ববিদ্যালয় কি এরূপ ভাবে গঠন করা যায়ই না, যাহাতে জাতীয় সাহিত্য পুষ্টিলাভ করে? এত বড় বাঙ্গালা সাহিত্য এত অল্প দিনের মধ্যে কে গড়িয়া তুলিল? যাহারা গড়িয়া তুলিল তাহারা কি "গোলামের" ভাবাপন্ন! আমি জানি, বিদ্যাসাগর প্রমুখ বাঙ্গালা সাহিত্যের নির্ম্মাতাগণ সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংসৃষ্ট নহে; কিন্তু অপরে তাহারই ফল।

যাঁহারা "অসার কবিতা" ও [illegible] নবেল লিখেন, যাঁহারা গ্রাম্য ইতর ভাষা এবং লিখিত ভাষার ক[illegible] সাহিত্যেও চালাইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে সংশোধন করিতে হইলে গালি দেওয়া অথবা কঠিন কর্কশ ভাষায় তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করা ভিন্ন, কি অন্য পন্থা নাই? তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ কর্ম্মী আছেন, মাতৃভাষার প্রকৃত সেবক আছেন, এরূপ দেশবৎসল ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদিগকে একটু ভিন্ন পথে আনিতে পারিলে তাঁহারাই জাতীয় সাহিত্য গঠন করিতে প্রচুর সাহায্য করিতে পারেন। যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহারা প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগকে রুষ্ট করিয়া বিদূরিত করেন না; প্রতিভা যদি নিন্দনীয় পথে যাইয়া থাকে, তাহাই কোমল করস্পর্শে বুঝাইয়া দিয়া সুপথে আনয়ন করেন। তখন সেই সকল

ব্যক্তিই কর্ম্মের প্রধান সহায় হন। সে সকল কর্ম্মী যন্ত্রের সহিত কলহ করে, তাহাদিগের নিন্দাবাদ চিরপ্রচলিত প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। হাওড়া-সম্মিলনের সভাপতি যদি যন্ত্রের সহিত কলহ না করিয়া থাকেন, তবে বিশেষ দোষ হয় নাই। আপনি এ নিমিত্ত আক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু শিল্প, বাণিজ্য বিজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত তিনি এতদ্দেশে কতিপয় বৎসর হইল, নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া যে সকল অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাতেই সেই নীরব কর্ম্মীর কর্ম্ম ও চেষ্টা বুঝিতে আর বাকী থাকে না। এত বড় বিজ্ঞান-মন্দির কাহার নীরব চেষ্টার ফল? যিনি দেশে বিদেশে * এই সুর জাগাইতে দেহপাত করিতেছেন, তাঁহাকে এ বিষয় নীরব থাকা অপবাদ দিলে বড়ই মর্ম্মপীড়া দেওয়া হয়। যাঁহার জীবনের মহা ব্রতই হইয়াছে জাতিগঠন, ভবিষ্যৎ জাতি-গঠন, তাঁহার প্রত্যেক কর্ম্ম বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে হয়। আজি পাঞ্জাবে ছাত্র সমাজের প্রতি কিরূপ ব্যবহার হইতেছে? স্বদেশী আন্দোলনের সময় এবং তৎপরেও বঙ্গদেশে ইহার শতাংশের একাংশও হয় নাই কেন? তাহা কি কেহ জানেন? সে মৌন ইতিহাস লোকলোচনের অন্তরালেই থাকিয়া যাইবে। যাহা হউক, বিশ্ববিদ্যালয় শিল্প বাণিজ্য কৃষি এবং অন্য ব্যবসা শিক্ষা দিবার উপায় অবলম্বন করেন নাই বলিলে বিষম ভ্রম করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নব বিকাশ যে এই দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে উৎকট কল্পনা-শক্তির আবশ্যক হয় না। স্যর আশুতোষ যখন জাতীয় সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি বঙ্গসাহিত্যের নির্ম্মাতাদিগের উপর দৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন তিনি আরও বিশেষভাবে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ভবিষ্যৎ অনুষ্ঠানের দিকে দৃষ্টি করিয়া-ছিলেন। ইহা একান্তই দুরাশা নহে; বরং তাঁহার জীবন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এ সুফল বঙ্গবাসী বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া দেখিয়া কৃতার্থ হইবে।

নব্যভারতের আলোচ্য সংখ্যার ৩ পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে, "সাহিত্যের বাজার দলাদলিতে ছারখার হইয়া যাইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে তিনি (সভাপতি) কোন কথা বলিলেন না।" একথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তিনি বলিয়াছিলেন, "বঙ্গের সাহিত্যসেবিগণ! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ, দলাদলি, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভুলিয়া আপনারা এক মনে, এক প্রাণে একই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হউন।" এই স্থান হইতে অভিভাষণের শেষ পর্য্যন্ত আর একবার পড়িয়া দেখুন। সমস্ত অভিভাষণে, ভারতীয় ভাবের একতা কেমন করিয়া সাধিত হইবার পথ পরিষ্কৃত হইতেছে, তাহা মানস-চক্ষে অবলোকন করুন; তাহা হইলেই বোধ হয় অভিভাষণের সকল দোষ আপনা-দিগের চক্ষেই গুণে পরিণত হইবে। বঙ্গের ভবিষ্যৎ গঠনে, ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ম্মাণে, সভাপতির মহাপ্রাণতা ও দূরদৃষ্টি কত দূর প্রসারিত হইয়াছে, [শুধু কথায় নহে, কর্ম্মেও] কত দূর নীরবে বিস্তৃত হইতেছে, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুধাবন করিলে স্বদেশবৎসল কোন ব্যক্তিই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পারি-বেন না, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আপনি ও পারিবেনই না। স্যর আশুতোষের তিনটী অভিভাষণেই (এবং মহীশূরের অভি-ভাষণেও) তিনি নীতি ও চরিত্রের দিকে

* সেদিনও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

যত দৃষ্টি রাখিয়াছেন, অন্য দিকে বরং তত নহে। ইহা আপনি লক্ষ্য করেন নাই। আমি ঐ গুলিকে একত্র পাঠ করিতে সকলকেই অনুরোধ করি। তাঁহার বলিবার প্রণালী ভিন্ন; হয়ত বা সকল কর্ম্মীরা ঐরূপেই বলিয়া থাকেন। তিনি সাহিত্য-সেবা রূপ "ব্রতানুষ্ঠানের পূর্ব্বে সংযম" অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন; বাগ্দেবীর "মন্দির প্রবেশের পূর্ব্বে কেবল হস্ত পদাদি নহে, হৃদয়ও প্রক্ষালিত করিতে সবিনয় নিবেদন" করেন। তিনি বাগ্দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "পাতু বাগ্দেবতা নঃ"। তিনি "ভক্তপতি" "কমলাপতি"কে "হৃদি-বৃন্দাবনে বাস করিতে" বলেন। নীতি নীতি, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া অন্য ভাবেও বলা যাইত। কিন্তু কে বলিতে পারে, তাঁহার এই ভাবের উক্তি কম কার্য্যকর? কলহ করিয়া কিম্বা গায় পড়িয়া কর্কশ নিন্দা অথবা কশাঘাত করিয়া, তিনি ভাল মন্দ কাহাকেও দূরে সরাইয়া রাখেন নাই। ইহা যে কর্ম্মসাধকের দোষ অথবা ভ্রম, একথা অনেকেই স্বীকার করিতে অসম্মত হইবেন। তিনি নব্যভারতের প্রদর্শিত সৎকথাগুলি বলেন নাই, তাহা নহে। তাঁহার বলিবার প্রণালী অন্যরূপ, এই মাত্র প্রভেদ। সাধকে সাধকে ভাবগত অধিক প্রভেদ হয় না; তাই আপনার সহিত তাঁহার সে দিকের কোন প্রভেদ দেখিতেছি না। তবে ভাব প্রকাশের প্রণালী বিভিন্ন হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

এক্ষণে আর একটী কথা উল্লেখ না করিয়া পারি না। সে সম্বন্ধে আপনার সহিত আমার মতের সম্পূর্ণ একতা আছে। বুরোক্রাট্ সংযোগে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা শুধু নিষ্ফল নহে, সর্ব্বপ্রকারেই গর্হিত, ইহার কোন সন্দেহ নাই।

অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু আর বলিব না। উপসংহারে এই মাত্র বলিতে চাই যে, দীর্ঘকালব্যাপী বন্ধুতা সূত্রে আমি আপনার সহিত যে ভাবে সম্বদ্ধ আছি, তাহাতে আমি আপনার কোন মতের ভ্রান্তি দেখাইতে সাহস করিলেও আপনি তাহার কদর্থ গ্রহণ করিবেন না, ইহা নিশ্চিত জানি।

যাহা হউক, এই বিষয়ে আমি আর বাদ প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছুক নহি। সুতরাং ভবিষ্যতে নীরব রহিব।

শ্রীশশধর রায়।

"আমার নিবেদনের" সংক্ষিপ্ত উত্তর।

আমরা এই নিবেদন পাঠে যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছি; তাহার কারণ এই, শশধর বাবু আমাদের বন্ধু, তাঁহার সহিত মতগত বা ভাবগত কোন পার্থক্য নাই। তবে কেন এ সব স্তাবকতার কথা লিখিলেন? সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য এই—

(১) স্যর আশুতোষের আমরা গুণমুগ্ধ,—নব্যভারতের বহু প্রবন্ধে তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছি; তবে আমরা তাঁহার স্তাবক নহি। তাঁহার কোন স্তাবকের সহিত আমাদের বিবাদ করিয়া কোন লাভ নাই।

(২) আমরা তাঁহার অভিভাষণ পড়ি-

য়াছি, উপসংহারে যে অত্যল্প স্থানে, দুটী একটী শব্দে তিনি নীতি ধর্ম্মের পক্ষপাতিত্ব বা দলাদলির বিরোধিতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট নই। বিশেষতঃ চুটকী সাহিত্য ও অসার গল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। ৮ পেজি ডবল ক্রাউনের ১০ পৃষ্ঠাব্যাপী অভিভাষণে ½ পৃষ্ঠাও তিনি এই সব বিষয়ে দিতে পারেন নাই? শশধর বাবু অনেক চেষ্টা করিয়াও বিশেষ কিছুই বাহির করিতে পারেন নাই।

(৩) তিনি উপযুক্ত লোকাভাব বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, একথা কি সত্য? এদেশে আশুতোষ ভিন্ন আর লোক নাই কি? কর্ত্তাভজার রাজত্ব যেখানে, সে স্থান হইতে দূরে অনুসন্ধান করিয়াছেন কি? এখনও বলি, অনুসন্ধান করুন, এদেশে উপযুক্ত লোকের অভাব নাই,—লোকের অভাব হইবে না। উত্তর দিন—নিম্নের এই সকল মহানুভব সাহিত্য-সেবিদিগকে উপেক্ষা করা হইয়াছিল কিনা? প্রথম সাহিত্য-সম্মিলনীর কথা উঠে ১৩১০ সালে, কিন্তু নানা কারণে অধিবেশন হয় না। ১৩১১, ১৩১২ ও ১৩১৩ সালেও হয় না। বরিশাল সাহিত্য-সম্মিলনের কথা সকলেই জানেন। ১৩১৪ সালের ১৭ই ও ১৮ই কার্ত্তিক বহরমপুরে প্রথম সভা হয়। কিন্তু যখন প্রথম কথা উঠে, তখনও হেমচন্দ্র হইতে উমেশচন্দ্র দত্ত পর্য্যন্ত ব্যক্তিগণকে সভাপতি করার কথা উঠে না। * এদেশে আশুতোষের ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তি আর নাই, একথা বলা বড়ই অসঙ্গত। আমরা কোন্ ছার, কত কত মহাত্মা আছেন, আমরা যাঁহাদের পাদুকা বহনেরও অযোগ্য। (হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১১, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু ৬ই মাঘ ১৩১১, প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু ২৭শে মে ১৯০৫, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু ৬ই ফেব্রু ১৯০৭, আনন্দমোহন বসুর মৃত্যু ৪ঠা ভাদ্র ১৩১৩, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের মৃত্যু ২০শে আষাঢ় ১৩১৪, উমেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যু আষাঢ় ১৩১৪) কবিরাজ দ্বারকানাথ সেনের মৃত্যু ২৯শে মাঘ ১৩১৫, নবীনচন্দ্র সেনের মৃত্যু ১০ই মাঘ ১৩১৫, নগেন্দ্রনাথ ঘোষের মৃত্যু ৫ই এপ্রেল ১৯০৯, রমেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যু ২৯শে নবেম্বর ১৯০৯, চন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যু ৬ই আষাঢ় ১৩১৭, শিশিরকুমার ঘোষের মৃত্যু ২৬শে পৌষ ১৩১৭, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু ৯ই চৈত্র ১৩১৭, কালীপ্রসন্ন ঘোষের মৃত্যু ১১ই শ্রাবণ ১৩১৭, গিরিশচন্দ্র সেনের মৃত্যু ৩০শে শ্রাবণ ১৩১৭, গৌরগোবিন্দ রায়ের মৃত্যু ১০ই ফাল্গুন ১৩১৮, কালীবর বেদান্তবাগীশের মৃত্যু আশ্বিন ১৩১৮, মনোমোহন বসুর মৃত্যু ২১শে মাঘ ১৩১৮, গিরিশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু ২৫শে মাঘ ১৩১৮, বিনয়কৃষ্ণ দেবের মৃত্যু ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩১৯, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যু ৩০শে বৈশাখ ১৩২০, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২০, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর মৃত্যু ৩০শে আষাঢ় ১৩২৩, বরদাচরণ মিত্রের মৃত্যু ২৮শে জুন ১৯১৭, চন্দ্রমাধব ঘোষের মৃত্যু ৬ই মাঘ ১৩২৩, জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যু ১১ই বৈশাখ ১৩২৪, গোবিন্দচন্দ্র রায়ের মৃত্যু ১৬ই আষাঢ় ১৩২৪, গোবিন্দচন্দ্র দাসের মৃত্যু ১৩ই আশ্বিন ১৩২৪, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু ১৬ই অগ্র ১৩২৫, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রীর * মৃত্যু

* নব্যভারত—কার্ত্তিক, ১৩১৪। ৩৮৬ পৃষ্ঠা।

* এবার তাঁহাকে শাখা-[illegible] সভাপতি করা হইয়াছিল, কিন্তু সে অপমান তাঁহাকে সহ্য করিতে হয় নাই!

২৬শে চৈত্র ১৩২৫, ৺মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতার মৃত্যু ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬। এই ত স্বর্গত প্রসিদ্ধ লোকদের তালিকা দিলাম। ইঁহাদের মধ্যে উপযুক্ত লোক মোটেই ছিলেন নাকি? গণিত ও আইনে আশুতোষ বড় হইতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের তিনি কি ধার ধারেন? রামশূন্য রামায়ণ যেমন, সাহিত্যিকশূন্য সাহিত্য-সম্মিলনও কয় বৎসর সেইরূপ হইতেছে নাকি? দুই দশ জন সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ না করিলেই বা কি আসে যায়? যাঁহারা সাহিত্য সেবার জন্য, দারিদ্র্য-পীড়িত হইয়াও, রক্ত জল করিয়াছেন, তাঁহারা চির-উপেক্ষিত। শিক্ষক অধ্যাপক, হাকিম হুকীম, উকীল ব্যারিষ্টার লইয়া সাহিত্য-সম্মিলন করিতেছেন, তাহাই চলিবে। ১৩২৬—জ্যৈষ্ঠ মাসের নন্দিনী খানি একবার পড়িয়া দেখিবেন, তবেই একথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। অতি দুঃখে আমরা এ সব লিখিলাম।

(৪) সাহিত্য-সম্মিলনের প্রবর্ত্তক, দক্ষিণা-রঞ্জন মজুমদার ও ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী। নব্যভারত আফিসে বসিয়া মহাভারতী মহাশয় সাহিত্য-সম্মিলনের পরামর্শ করেন। "সুধা" ঐ বাণী প্রথম ঘোষণা করেন। পরে দেব-কুমার ও মণীন্দ্রচন্দ্র বিশেষ সাহায্য করেন। তাঁহারা যে উদ্দেশ্য ঘোষণা করিয়াছিলেন, শশধর বাবুর উদ্দেশ্য তাহা হইতে বিভিন্ন। সে সম্বন্ধে কে সত্যগ্রাহী, কে তাহার বিচার করিবে?

(৫) অন্যান্য দেশে সব শ্রেণীর লোকই আছে, তন্মধ্যে হাকিম উকীলও আছেন। রাজা থাকিলেই আইন থাকিবে, আইন থাকিলেই হাকিম ও উকীল থাকিবেন, কে তাহা অস্বীকার করে? কিন্তু কেবল হাকিম উকীলই দেশের লক্ষ্য নয়। অন্যান্য দেশে, লোকানুপাতে কত উকীল ও হাকিম, তৎসহ এদেশের তুলনা করিয়া দেখুন ত? বিশেষতঃ বাঙ্গালীর কথা বলিতেছি—ভারতের মাড়োয়ারী প্রভৃতির তুলনায় বাঙ্গালী কত দরিদ্র হইয়া পড়িতেছেন, সকলেরই চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। শিল্প বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন ভিন্ন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন আশা আছে কি? ম্যাট্‌সিনিও উকীল ছিলেন, কিন্তু ওকালতি করেন নাই। বিষমার্ক, গ্লাডোষ্টোন, ব্রাইট, ডিস্‌রেলি প্রভৃতি উকীল ছিলেন কি? শান্তিবৈঠকের কর্ণধার উইলসন ও স্মাটস্ উকীল ছিলেন? যে সকল উকীলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, নীতি, ধর্ম, চরিত্রের উৎকর্ষের কথা যেখানে, সেখানে তাঁহাদের নাম না করিলেই শশধর বাবু ভাল করিতেন নাকি? কেশবচন্দ্র, প্রতাপ-চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রভৃতিকে কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় সৃজন করিয়াছে? সব অপ্রিয় কথা বলিতে চাহি না, সুতরাং নীরব থাকাই ভাল।

(৬) শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ, খ্রীষ্টের কথা-প্রসঙ্গেও বলিয়াছেন যে, 'ক্রুসে দেহপাত সত্ত্বেও, সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া সত্ত্বেও—মানব সমাজ যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রহিয়াছে।' একথা কিরূপে শশধর বাবু বলিলেন, বুঝি না। এই সব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদের দ্বারা জগতের উন্নতি হয় নাই, এপর্য্যন্ত কে তাহা বলিতে সাহসী হইয়াছে? খ্রীষ্টীয় সাহিত্য, বৈষ্ণব-সাহিত্য, বৌদ্ধ সাহিত্য যদি জগতের উপকার করিয়া না থাকে, তবে আর কোন্ সাহিত্য করিয়াছে? তার্কিক হইলেই কি অন্ধ হইতে হয়? বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক, অধ্যাপক, গ্রন্থপ্রণেতা ও সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি-দিগের একরূপ অন্ধতা ভাল নয়—তাহাতে

নানা লোকে নানা কদর্থ ঘোষণা করিতে পারে। আমরা কখনও কাব্য লিখি নাই, কখনও কল্পনা বা শূন্যের পূজা করি নাই, আজীবন সত্য-সাধনা করিয়াই আসিয়াছি। শশধর বাবুই অগ্রণী কাব্যকার, ভাবোচ্ছ্বাসোল্লেখে ঠাট্টা করিবার সময় সে কথা স্মরণ করা তাঁহার উচিত ছিল। বৈষ্ণব-সাহিত্য, খ্রীষ্টীয়-সাহিত্য ও বৌদ্ধ-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার কিছুই জানা নাই কি?

(৭) সাহিত্য-সম্মিলনীতে স্থায়ী সভাপতির জন্য তিনি চেষ্টা করিবেন লিখিয়াছেন, সে ত ভালই। আমরা এ সম্বন্ধে ঠাট্টা করি নাই। কাজের সৌকর্য্যার্থে তাহা প্রয়োজন। তবে জিজ্ঞাস্য, সাহিত্য-সম্মিলন ও স্যর আশুতোষ সম্বন্ধে ২রা, ৯ই ও ২৩শে জ্যৈষ্ঠের হিতবাদীতে যে তিনটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা শশধর বাবু পড়িয়াছেন কি? আশুতোষ কৃতী লোক, তবে সাহিত্য-সম্মিলনের উন্নতি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত তিনি কি করিয়াছেন? সাহিত্য সম্বন্ধেই বা কি করিয়াছেন? পত্রিকার মূল্য দিয়া জাতীয় সম্পাদকগণকে সাহায্য করেন কি? তিনি বাঙ্গালা পুস্তক ক্রয় করিয়া পড়েন কি?

(৮) জাতীয় শিক্ষা-পরিষদকে নষ্ট করার মূলে যাঁহারা ছিলেন, তন্মধ্যে আশুতোষও কি ছিলেন? মহাত্মা ৺ পালিতের, ও শ্রীযুক্ত ঘোষের টাকা অন্য খাতে চালিত করা সম্বন্ধে তাঁহারও কি যোগাযোগ ছিল? তেলা মাথায় তৈল সকলেই দিতে পারে, তৈলশূন্য মস্তকে কে তৈল দেয়? যেরূপে সপ্তরথীর আবেষ্টনে জাতীয়-সাহিত্য-পরিষদ-অভিমন্যু মৃত্যু-দশায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা স্মরণে লজ্জিত হওয়ার পরিবর্ত্তে আনন্দের কোন কারণ নাই। বুরোক্রাটের যোগ না থাকিলেই যদি এদেশের সব জাতীয় সৎ অনুষ্ঠান পণ্ড হয়, তবে তাহা কি গভীর ক্ষোভের পরিচায়ক নহে? হায়, জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ!

(৯) কথায় কথায় অনেক কথা বাড়িয়া গেল—স্যর আশুতোষের নিকটে স্তাবকগণ ভিন্ন আদর আপ্যায়ন পায় না, একথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। যে সকল লোককে পিট চাপড়াইয়া তিনি বড় করিয়া দিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন কৃতী লোক আছে? একে একে সকলের নাম বলিতে পারিতাম, কিন্তু অপ্রিয় সত্য প্রচারে সংযমই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হইল। তিনি যদি প্রশংসালোলুপ না হইতেন এবং যশ-নিন্দার অতীত হইতেন, আমরা তাঁহার স্বর্ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতাম এবং তিনি যদি বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থকার বা সাহায্যকারী হইতেন, তবে তাঁহার চরণে নিত্য পূজা অর্পণ করিতাম। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে সাহিত্য-সেবায় পাইলে বাঙ্গালা সাহিত্য কৃতকৃতার্থ হইত। তাহা হয় নাই বলিয়া আমরা দুঃখিত এবং আরো দুঃখিত, তিনি নিয়োগ ইত্যাদিতে আগাছারই প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছেন। ১০ পৃষ্ঠাব্যাপী অভিভাষণের কোথায় আগাছার প্রতিবাদ আছে? তিনি নীরবে যদি আগাছার স্রোতের প্রতিরোধ করিতে পারেন, ভালই। তাহা দেখিবার জন্য আমরা আশান্বিত হইয়া রহিলাম। কিন্তু মনে রাখিবেন, "যাহা হয় না ৯ বৎসরে, তাহা হয় না ৯০ বৎসরে।" তবে একথা আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিব, বাঙ্গালা মাসিককে পল্লীচিত্রের মোকদ্দমার রায় দ্বারা রক্ষা না করিলে, বাঙ্গালা সাহিত্য রাহুগ্রাসে কবলিত হইত!! সেজন্য তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি। *

* শশধর বাবুর ন্যায় আমরাও বলিতেছি, এ সম্বন্ধে আর বার প্রতিবাদ ছাপা হইবে না। প্রতিবাদের প্রতিবাদে অনেক অপ্রিয় সত্য উঠিবে। —ন, স।

পৃথ্বীরাজ

(ঐতিহাসিক মহাকাব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্তের চরিত-লেখক কবিভূষণ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি-এ বিরচিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য আড়াই টাকা। ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী হইতে প্রকাশিত)।

আমরা বিস্ময়ের সহিতই এই মহাকাব্যপাঠ সমাপ্ত করিয়াছি। কৈলাস হইতে এক খানা শ্বেতহস্ত বাহির হইয়া ত্রিশূলটা আকর্ষণ করিয়া লইল না, স্বর্গ হইতে বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া নরাস্থিতে অব্যর্থ মহাস্ত্র প্রস্তুত করিলেন না, মায়াদেবী অন্তরালে থাকিয়া নায়কের শরীর হইতে বিপক্ষ-বিক্ষিপ্ত শরগুলি মশা মাছির মত তাড়াইলেন না, কিম্বা পবনদেব ভক্তহৃদয়ের প্রার্থনাকে গম্যস্থলে পৌঁছাইতে না দিয়া সরাইয়া দিলেন না, তবুও একখানা শ্রেষ্ঠ অঙ্গের Epic প্রস্তুত হইল। দৈবশক্তির আশ্রয় লইলে কবির যে সব সুযোগ লাভ হয়, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াও 'পৃথ্বীরাজে'র কবি আমাদিগকে বীর করুণ বীভৎস সকল রসই বিতরণ করিয়াছেন। দৈব অস্ত্র ও দৈবগণের সাহায্য না লইলেও যে যুদ্ধবর্ণনা বিস্ময়োৎপাদক ও চিত্তাকর্ষক হয়, তাহা তরায়ণের যুদ্ধদ্বয় পাঠ করিলেই বুঝা যায়। কবি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছেন—

সুদর্শন পাশুপত নাহি পাবে আর,
রণস্থলে দেখা নাহি পাবে দেবতার।

(৬৯ পৃঃ)

কেবল সত্য অবলম্বন করিয়া কাব্য হয় না, ইহাই মানুষের বিশ্বাস। তাই এই বৈজ্ঞানিক যুগে চিত্তাকর্ষক কাব্য রচিত হইতে পারে না, লোকের এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় ঐতিহাসিক কাব্য আরও হইয়াছে; কিন্তু তাহা যে খাঁটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ কথা বলা চলে না। 'পলাসীর যুদ্ধ'এর কবি—"কবির পথ নিষ্কণ্টক" বলিয়া অনৈতিহাসিকতার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথম বাস্তবিক সত্য লইয়া কাব্য লিখিবার উদ্যম করিয়াছিলেন 'ভারত মঙ্গল'এর কবি স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র মিত্র। দেশের দুর্গতি দেখিয়া তাঁহার প্রাণও কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। পৃথ্বীরাজের ন্যায় ভারতমঙ্গলেরও উদ্দেশ্য ছিল, ভারতমাতার দুর্গতি হইতে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন। তিনি দুঃখ দৈন্য ও দুর্ম্মতি পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল,

স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হইবে কিরূপে
পৃথিবীতে, পুণ্যকথা কহিব হে আমি,
গাইব সে মহাগীত, অবনী মণ্ডলে
অভিনব, ক্ষুদ্র আমি রুদ্রতালে মাতি।

সে বাসনা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছেন। পৃথ্বীরাজের কবি, আমাদের দুঃখ দৈন্য পাপ কি, আমাদের পতনের মূল কোথায়, তাহা উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। এই চিত্রণে তিনি কল্পনাকে আপনার মুষ্টির বাহিরে যাইতে দেন নাই, তবুও কল্পনাদেবী তাঁহাকে মহাকবির আসন হইতে বঞ্চিত করেন নাই, পৃথ্বীরাজ পাঠ করিয়া আমাদের এই ধারণা জন্মিয়াছে। সত্যকে অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিক যুগে উচ্চ অঙ্গের কাব্য প্রস্তুত হইতে পারে কি না, পৃথ্বীরাজে আমরা তাহার উত্তর পাইয়াছি।

পৃথ্বীরাজ ঐতিহাসিক কাব্য অর্থাৎ কাব্য ও ইতিহাস দুই-ই। কবি জানাইয়াছেন,তিনি যে ইতিহাস অবলম্বনে কাব্য লিখিয়াছেন, তাহা তিনি ভুলেন নাই। সেই জন্য, বোধ হয়, ভয়ে ভয়ে বলিয়াছেন যে, কবিতা-রস বিতরণ এই কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, সত্য মিথ্যা না মিশাইলে কবিত্বরস জমে না। এই ধারণার মূলে কতটুকু সত্য আছে, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া আমরা ইহাই বলিতেছি যে, খাঁটি বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও পক্ষপাতশূন্য কাব্য-রস রসিক পাঠকও পৃথ্বীরাজ পাঠ করিয়া বঞ্চিত হইবেন না। ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধারে কবি যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে আর কেহ করিয়াছেন কি না, তাহা জানি না। যাঁহাদের কাব্য পাঠে আস্থা নাই, যাঁহাদের মনের গড়ন "What does Milton prove by writing Paradise Lost ?" তাঁহারাও এই পুস্তকের পাদটীকাগুলি পাঠ করিয়া নূতন ঐতিহাসিকতত্ত্ব লাভ করিবেন—অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নূতন আলোক-সম্পাত দর্শন করিয়া কবি-ঐতিহাসিককে ধন্যবাদ না দিয়া পারিবেন না।

পৃথ্বীরাজ ঐতিহাসিক কাব্য হইলেও,ইহা কবিতায় নিবদ্ধ ইতিহাস নহে। কল্পনার খেলাও ইহার মধ্যে যথেষ্ট আছে, তবে সে কল্পনা বিজ্ঞানকে কখনও অতিক্রম করে নাই। ভীমা ভৈরবী ও তুঙ্গাচার্য্য কবির নিছক্ কল্পনা অর্থাৎ ইহারা ঐতিহাসিক মানুষ নহেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অতিমানুষিক কিছুই নাই। লেডি ম্যাকবেথের মধ্যে যেমন দেখি, মানবী দানবী হইয়াও মানবোচিত স্নেহমমতা একেবারে হারায় নাই, আমাদের কবিও দেখাইয়াছেন, মানবী পিশাচী হইয়াও নারীত্ব হারায় নাই। মেঘা শ্মশানে পৃথ্বীরাজের শব আগলাইয়া বসিয়া রহিয়াছে। সংযুক্তা অসি নিষ্কোষিত করিয়া তাহাকে পতিদেহ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। মেঘা প্রজ্বলিত চিতাকাষ্ঠ লইয়া আক্রমণ করিল, আঘাত করিতে পারিল না; বলিল—

না না, থাক্ থাক্
পেয়েছিস্ বড় ব্যথা বলিব না কিছু।
(৩৩৯ পৃঃ)

নারীর প্রতি নারীর সহানুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছে। রাজ-অতিথিকে হত্যা করিতে যাইয়াও পিতৃমুখ সাদৃশ্যে লেডি ম্যাকবেথের ফিরিয়া আসার ন্যায় ইহা অতীব স্বাভাবিক হইয়াছে। পৌরাণিক কাব্য হইলে মেঘার হস্ত হইতে সংযুক্তার প্রাণ রক্ষার জন্য ত্রিশূল হস্তে মহাদেবকে শ্মশানে অবতীর্ণ হইতে হইত। মেঘার মধ্যে মানবী ও দানবীর ক্রীড়া—অমর মাতৃস্নেহ ও দুর্জ্জয় প্রতিহিংসা পাশাপাশি বাস করিতেছে। সেই জন্যই মেঘা করুণামিশ্রিত ঘৃণার সঙ্গে স্মৃতিতে জড়িত হইয়া থাকে। জাতীয় অনাচারগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করাই যখন গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন ধর্ম্মের নামে বীভৎস নর মাংসাহারের এই বাস্তব (Concrete) দৃষ্টান্ত সুতরাং অপ্রাসঙ্গিক নহে।

তুঙ্গাচার্য্য কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। কিন্তু এ চিত্র দেশের হৃদয়ে মুদ্রিত হইবার পক্ষে অনেক বিঘ্ন। প্রথম বিঘ্ন এই নাম। ব্যাস বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র হইলে এক কথায়ই যেমন পরিচয় পাইতাম, তুঙ্গাচার্য্যের সঙ্গে তেমন সহজে পরিচিত হইতে পারা যায় না। নবীন

চন্দ্রের ব্যাস যেমন চিরপরিচিতের মত আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ান, তুঙ্গাচার্য্য যেন তেমন করিয়া কাছে আসিতে পারেন না। সে জন্য যে কবির কৃতিত্বের কিছু ত্রুটি আছে, তাহা নহে। ব্যাস আমাদের রক্তমাংসের সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছেন—কবির ত্রুটির পোণের আনা ঐ এক নামের গুণেই পাঠক পূরণ করিয়া লইতে পারেন। এখানে কিন্তু আমাদিগকে অপরিচিতের সঙ্গে পরিচয় করিয়া লইতে হইতেছে। কেবল আকৃতিতেই যে অপরিচিত, তাহা নহে, প্রকৃতি ও ভাষাও যে অপরিচিত। তুঙ্গাচার্য্য কর্ম্মযোগী। কর্ম্মযোগের কথা আমরা শুনি, ভালও যে না লাগে তাও নয়—নতুবা এতকাল ধরিয়া গীতা পাঠ, শ্রবণ ও ব্যাখ্যা করিতে পারিতাম না। কিন্তু কর্ম্মযোগ আমাদের জাতীয় বা ব্যক্তিগত জীবনে কখনও আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন লাভ করিতে পারে নাই—কর্ম্ম সন্ন্যাসই যুগ যুগান্তর ধরিয়া সেস্থান জুড়িয়া বসিয়া রহিয়াছে। কর্ম্ম মাত্রই বন্ধন, তাহা যে কর্ম্মই কেন হউক না—কর্ম্মের প্রতি যে অবজ্ঞা মিশ্রিত সন্দেহ, ইহা আমরা জীবনের কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। শাস্ত্রের কথা বলিতেছি না—সকল শাস্ত্রেই সব কথা আছে—জীবনের গতির কথাই বলিতেছি। জীবনের আদর্শ কর্ম্ম নয়, কর্ম্মত্যাগ স্মৃতিকর্ত্তা বিষ্ণু বলিয়াছেন—

বাস্যৈকং তক্ষতো বাহুং চন্দনেনৈব মুক্ষতঃ।
নাকল্যাণং ন কল্যাণং তয়োরেব চ চিন্তয়েৎ॥

কল্যাণ ও অকল্যাণ এই দ্রুয়ের প্রতি সন্ন্যাসী সমান উদাসীন হইবেন, ইহাই জীবনের আদর্শ। আজ যদি প্রচারিত হয়, এক সাধু আসিয়াছেন, যিনি ২৪ ঘণ্টা নেত্র মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকেন। কেহ তাঁহাকে খাইতে দেখে নাই—যদিও বা খান, দিনে না, রাত্রিতে; তেল খান না, ঘি খান—তা হলে দেখিবেন, তাঁর চারি দিকে কি ভীড়। এই যখন আদর্শ, তখন তুঙ্গাচার্য্যের কথা কে শুনিবে—তিনি যে গৃহী সন্ন্যাসী নির্ব্বিশেষে সকলকেই ভারতমাতার সেবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। তাই তো আচার্য্যের শিষ্য ভারতময় ঘুরিয়া আসিলেন, কথার সায় কোথাও পাইলেন না। এই আদর্শ রামমোহনের পূর্ব্বে কোন ধর্ম্মাচার্য্য অধ্যাত্মজীবনের আদর্শরূপে গ্রহণও করেন নাই, প্রচারও করেন নাই। কিন্তু এ আদর্শ ছাড়াও ভারতের উত্থান নাই। এই আদর্শই তুঙ্গাচার্য্যের জীবনে প্রকাশিত। তুঙ্গাচার্য্যের কথা কবির নিজের কথা। সেক্সপিয়রের নাটকে দেখা যায় যে, এক একটা চরিত্র কবির নিজস্ব—কবির নিজের মত ব্যক্ত করিবার জন্যই তাহাদের অবতারণা। তুঙ্গাচার্য্যের দ্বারা কবি সেই কার্য্য সাধন করিয়াছেন।

তুঙ্গাচার্য্য দেশভক্ত সাধক। তিনি ভারতমাতার উপাসক, সমগ্র ভারত তাঁহার দেশ। খণ্ড ভারতে মহাভারত স্থাপনই তাঁর জীবনের সঙ্কল্প। দেশে দেশবুদ্ধি জাগাইতে না পারিলে যে দেশের উদ্ধার হইবে না, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু উপায়টী সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কবি দেশমাতৃকার যে মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর।

ভারতভূমির মূর্ত্তি নিরখিয়া ধ্যানে।
স্থাপন করিলা গুরু ক্ষোদিয়া পাষাণে

(৫৮ পৃঃ)

মূর্ত্তি স্বর্ণনির্ম্মিত হইয়া ঘরে ঘরে বিরাজ করুক। কিন্তু ধূপ দীপ নৈবেদ্যে এই

মূর্ত্তির পূজায় কি দেশে দেশভক্তি জাগিবে? দু'চার জন দু'চার দিনের জন্য এ মূর্ত্তি লইয়া মাতিতে পারে, এক নূতন cult-এর সৃষ্টি হইয়া ৩৩ কোটীর উপর আর একটীর যোগ হইতে পারে, তাহাতে প্রকৃত স্বদেশ-প্রেম জাগিবে না। তুঙ্গাচার্য্য পৃথ্বীরাজ জয়চন্দ্র উভয়েরই গুরু। জয়চন্দ্রের দেশভক্তি কম। তাই কি তাঁর বাড়ীর কাছে মাতৃ-মূর্ত্তির অধিষ্ঠান? কিন্তু মূর্ত্তির সন্নিকর্ষে জয়চন্দ্রের দেশভক্তি একটুও বাড়ে নাই। যে জয়চন্দ্র ভারতমাতার গলায় অধীনতার নিগড় পরাইয়া দিবার জন্য স্বীয় রক্তে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁরও জামাই মেয়ে নিয়ে শুভঙ্করী মায়ের পূজা দিতে পারিলেন না বলিয়া রাত্রিতে ঘুম হয় না।

ভক্ষ্য, ভোজ্য কতরূপ বসন, ভূষণ
রেখেছিনু, গুরুদেব! করি আহরণ।
ছিল সাধ, লয়ে সাথে সুতা, জামাতায়,
সমারোহে দিব পূজা শুভঙ্করী মায়।
(২৫৩ পৃঃ)

ইহা পৌত্তলিকতা। ইহা সার (spirit) ছাড়িয়া খোসার (letter) আদর, ভস্মে ঘৃতাহুতি—স্বর্ণ ফেলিয়া শুধু আঁচলে গেরো। ইহা প্রকৃষ্ট পন্থা নহে। যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভারতের ধর্ম্মজীবনকে এমন এক উচ্চতর নব আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে যেখান হইতে স্বদেশ-প্রেমটা মায়া বিজৃম্ভিত অসার সংসারের অংশ বলিয়া অগ্রাহ্য না হইয়া সহজ স্বাভাবিক হয়। আমি বলিতেছি না, যে অন্য উপায়ে, যাহাকে বলে ভারতের উদ্ধার, তাহা হইতে পারে না। আমরা পাশ্চাত্য জাতি সকলের স্বদেশ-প্রেম অনুকরণ করিয়া (যাহা করিতেছি) উঠিতে যে না পারি তা নয়। কিন্তু ধর্ম্মকে ঠাকুর ঘরে আবদ্ধ রাখিয়া জাতীয়তার আমদরবার গড়িলে তাহা ভারতের আবহমান কাল প্রসিদ্ধ (traditional) ধর্ম্মপ্রাণতার সঙ্গে সুসঙ্গত হইবে না।

কবি শুভঙ্করী মায়ের মূর্ত্তিপূজা প্রচার করিতে যাইয়াই দেশ-প্রচলিত মূর্ত্তিপূজার সম্বন্ধে ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন। দশম সর্গে মহম্মদ ঘোরীর দূতগণ পৃথ্বীরাজের সভায় কোরাণ ও কৃপাণ লইয়া হাজির। সত্যধর্ম্ম প্রচারই তাহাদের সঙ্কল্পিত ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য; কেন না,

ধর্ম্মমাত্র অবনী মণ্ডলে
নিত্য, সত্য; রাজ্য, ধন যাহা কিছু আর
অনিত্য, অসত্য, শূন্য মরীচিকা সম।
হজরত মহম্মদ চলেছেন, তাই
পৃথিবীতে সত্যধর্ম্ম করিতে প্রচার,
নরের উদ্ধার তরে। (১৪৮ পৃঃ)

কেবল এক হিন্দুস্থান-বাসীরাই সত্য ধর্ম্ম ভুলে মৃত্তিকা পাষাণের পূজা নিয়ে রয়েছে, তাহাদিগকে সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করাতে হবে—

সত্য ধর্ম্ম সেবী বীর প্রভু আমাদের
বলেছেন, তাই, এই শ্রম করি দূর,
লইবারে সত্যধর্ম্ম। (১৪৯ পৃঃ)

মুসলমানের উপাস্য—
তিনি এক অদ্বিতীয় মহান্ ঈশ্বর (১৪৯ পৃঃ)
স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, সর্ব্বস্থানে বিরাজিত তিনি।
(১৫০ পৃঃ)

তখন রাজগুরু তুঙ্গাচার্য্য বলিলেন—

শিখেছ তোমরা যাহা বর্ষ পঞ্চশত,
যুগযুগান্তর হতে শাস্ত্র আমাদের
প্রচার করিছে তাহা। কহিতেছি, শুন,
যা কিছু জগতে এই হের স্পন্দমান
উদ্ভূত তা ব্রহ্ম হ'তে, তিনি বিশ্বপ্রাণ।

অশব্দ অস্পর্শ তিনি অরূপ অব্যয় ;
রসহীন গন্ধহীন অনাদি অক্ষয়।
(১৫০ পৃঃ)

শেষে গুরু মন্তব্য করিলেন—

তিনি সর্ব্বময়, তাই সর্ব্বভূতে মোরা
হেরি তাঁর অধিষ্ঠান, সাকারের মাঝে
পূজি সেই নিরাকারে। হিন্দু পৌত্তলিক
যে কহে, সে ভ্রান্ত, নাহি বুঝে ধর্ম্ম তার।
(১৫১ পৃঃ)

বাস্তবিকই কি মূর্ত্তিপূজা সাকারে নিরাকারের পূজা? যেখানে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য থাকে, সেখানে নিরাকারের পূজা তো নয়ই, Symbolismএর ওজরও খাটে না। আসল কথা কি এই নয় যে, যেরূপ মূর্ত্তিপূজা, সেই মূর্ত্তি অনুযায়ী সাকার দেবতারই আবাহন হয়, নিরাকারের নহে। তার পর, শাস্ত্রে থাকিলেই যে আচরণে আছে, তাহা প্রমাণিত হইল না। শাস্ত্রে তো আছে বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও শ্বপাকে সমান দৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু হিন্দু যুগযুগান্ত ধরিয়া কোটী কোটী মানুষকে কুকুর অপেক্ষাও অধিকতর ঘৃণনীয় বলিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। ইহা তো কবি নিজেই চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞান থাকিলেও হিন্দু মৃৎপাষাণের পূজা করিবে, ইহাতে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই। আচার্য্য এখানে ভুলিয়া গিয়াছেন যে, অধিকারী ভেদের ধূয়া তুলিয়া উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানকে এ দেশ বহুদিনই নাপোচ্ করিয়াছে। উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান আর গীতার নিষ্কাম কর্ম্ম আছে কেবল বিদেশীর সঙ্গে বিতণ্ডার আশ্রয়ে, কাজের বেলায় ষষ্ঠী মাকাল আর "ধনং দেহি জনং দেহি"। যাহা জীবনে নাই, তাহা শাস্ত্রে থাকিলেই তাহাতে অধিকার হয় না। যাহা জীবনে প্রতিফলিত, তাহাই কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা। যখন দেশে বায়ান্নখানাও ঢাল মিলে না, তখন প্রতাপাদিত্যের বায়ান্ন হাজার ঢালীর দৃষ্টান্তে বীর বলিয়া পরিচয় দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা নয় কি? আমি বীর হইলে ঐ বায়ান্ন হাজারের অর্থ আছে, নতুবা নহে। সত্য একাই নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে। বায়ান্ন হাজার সাক্ষীর জোরেও কিন্তু মিথ্যা সত্য হইতে পারে না। আর, এই মৃৎপাষাণ পূজার অপবাদ কি মদিনা হইতে হালে আমদানি হইল, না আমাদের শাস্ত্রেই গোটা গোটা সংস্কৃত অক্ষরে ঐ অপবাদের কথা বহুদিনই লেখা আছে। 'মৃচ্ছিলা দার্ব্বাদি' অপবাদ আমাদের শাস্ত্রেও যে আছে। সুতরাং যখন ঘোরীর দূতগণ, সব পৌত্তলিক আচরণ যাহা তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিল, তখন রাজগুরু হালে পানি না পাইয়া বাদ ছাড়িয়া বিতণ্ডা ধরিলেন। তিনি দেখাইলেন, মুসলমানদের মধ্যেও এরূপ বহু আচরণ আছে, যাহা এক অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের পূজার বিরোধী। ইহাই বিতণ্ডা। অর্থাৎ চোর দাঁড়াইয়া যদি বলে যে,তার প্রতিবাদীও চোর, তবেই সে চুরীর দায় হইতে রেহাই পাইল, কিন্তু ইহা যদি প্রমাণিত হয় যে, খ্রীষ্টান বা মুসলমানদের মধ্যেও পৌত্তলিক আচরণ আছে, তাহা হইলে শাস্ত্র কি যুক্তি অনুসারে হিন্দুর পৌত্তলিকতা উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হইবে না? আমাদের বিশ্বাস এই যে, কবি হিন্দুর মূর্ত্তিপূজা সমর্থন করিতে যাইয়া এক মহা ভুল করিয়াছেন।

হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষ বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধে যে নিরপেক্ষতা দেখাইয়াছেন, এরূপ ইতিপূর্ব্বে আর

কেহ দেখাইতে পারেন নাই—অপক্ষপাতে সকলেরই দোষগুণ বর্ণনা করিয়াছেন। এক-রকম ভ্রান্ত স্বাদেশিকতা আছে, যাহা মানুষকে স্বজাতির ও স্বদেশের দোষের প্রতি অন্ধ করে বা দেখিয়াও গোপন করিতে উৎসাহিত করে। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, শারীরিক রোগের ন্যায় সামাজিক রোগও চিকিৎসার অভাবে মারাত্মক হইয়া উঠে। কবি সে দোষ হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত। তাহা তাঁহার উদ্দেশ্যের বিরোধী। দোষ না দেখাইলে তাহার সংশোধন হইবে কিরূপে ?

'না চিনিলে রোগ বল কি দিবে ঔষধ'
মর্ম্মদেশ বেদনয়ে যদি
স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব তবু উপযুক্ত নয়। (২৭৮ পৃঃ)

দোষ দেখাইতে যাইয়া কবির হৃদয় ভাজিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তাঁহাকে স্বস্থান-ভ্রষ্ট হইতে দেয় নাই।

স্বজাতিবৎসল তুমি ; হৃদয় তোমার
হতেছে ব্যথিত শুনি নিন্দা স্বজাতির।
কিন্তু যদি নিরপেক্ষ না কর বিচার
জাতিগত দোষ হবে শোধিত কেমনে ?
(২৮৩ পৃঃ)

অনেকের বিশ্বাস, মুসলমানের আগমনই ভারতের পতনের কারণ। ঐতিহাসিক দেখাইয়াছেন যে, হিন্দুর পতন হওয়াতেই মুসলমানের আগমন সম্ভব হইয়াছিল। বৃথা জাত্যভিমানে তিনি সত্যকে চাপা দেন নাই। আমরাই যে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি, এই মিথ্যা গর্ব্ব তিনি হৃদয়ে পোষণ করেন না,—

কূপবাসী মণ্ডূকনিচয়
ভাবে বিশ্ব কূপটুকু, আর কিছু নয়।
তেমতি আমরা যত ভারত সন্তান,
ভাবি এ ভারত বিনা নাহি অন্য স্থান।
সভ্যতা, ভব্যতা, নীতি, ধর্ম্ম, ব্যবহারে,
কহি 'আমরাই' শ্রেষ্ঠ ধরণী মাঝারে।'

অন্য দেশ, অন্য জাতি আছে কত শত,
কেহ শ্রেষ্ঠ, কেহ গুণে আমাদেরই মত।
তা সবার গুণ মোরা দেখিতে না পাই,
নিজেদের দোষ যাহা খুঁজিতে না চাই।
(৬৮ পৃঃ)

তুলনায় যেখানে মুসলমানের শ্রেষ্ঠতা পাইয়াছেন, তা তিনি অকপটে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা সকলকে অনুকরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। হিন্দু মুসলমানের একতা ছাড়া দেশের কল্যাণ নাই। প্রত্যেক স্বদেশ-প্রেমিককে এই দিকেই মনোযোগ দিতে হইবে। পৃথ্বীরাজের কবি এই পথ অনেকটা সুগম করিয়াছেন। আমাদের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার পক্ষে তাঁহার এই কার্য্য সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়—

দেখ বৎস! কি পার্থক্য হিন্দু মুসলমানে।
পরাজিত জয়পাল, অভিমান ভরে,
পশিলা অনলে ; আর পরাজিত ঘোরী
করিয়াছে প্রাণপণ জিনিতে হিন্দুরে।
(২২৯ পৃঃ)

তাই তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,—

শিরোদেশে যা'র
দাঁড়াইয়া হিমাচল মহারুদ্র রূপী,
পদপ্রান্তে গর্জ্জে সিন্ধু তাণ্ডব লীলায়,'
যে দেশে জনমে সিংহ, শার্দ্দুল, গণ্ডার,
যে দেশে জনমে শাল, তাল বজ্রবপু,
সে দেশে জনম লভি' কেন আর্য্যসুত
হেন লঘুচেতা, স্থৈর্য্য দৃঢ়তা-বিহীন।
(২২৯ পৃঃ)

আমার মনে হয়, প্রকৃতির এই বিশালতা ও ভীষণতাই ভারতবাসীর নির্ব্বীর্য্যতার অন্যতম কারণ। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইয়ে জয়ের সম্ভাবনা না দেখিয়া সে সংগ্রামই ছাড়িয়া দিয়াছে। সুতরাং প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে যে শক্তি লাভ হয়, তা হয় নাই। প্রাণীবিশেষ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মাটিতে মুখ

লুকাইয়াই যেমন মনে করে, শত্রুর আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম, আমরাও 'মায়া' বলিয়া প্রকৃতিকে উড়াইয়া দিয়াই ভাবিয়াছি যে, মস্ত একটা বিজয় লাভ করিলাম। আমাদের ঠিকই 'আত্মহত্যা আচরিয়া নিষ্কৃতি প্রয়াস' হইয়াছে,—পুনশ্চ,

নানা দেশে যুদ্ধরীতি নিরখি যখন
লভেছে যে জ্ঞান, তাহা না আছে মোদের ;
চির দেশাবদ্ধ মোরা। (২৩১ পৃঃ)
জয়ের আশা কোথায় ?

ক্রমশঃ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

হাবড়া সাহিত্য-সম্মিলন।

বাঁকীপুর সাহিত্য-সম্মিলনে স্থির হয় যে, ১৩২৪ অব্দে ঢাকায় এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসর মুঙ্গেরে সাহিত্য-সম্মিলন হইবে। গত বর্ষে কথমপি ঢাকায় সম্মিলনের কার্য্য হইয়া গেলে ভাবিয়াছিলাম যে, অতঃপর পূর্ব্বের কথামতে মুঙ্গেরেই সম্মিলন হইবে। কিন্তু মুঙ্গেরের কোনওরূপ সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না ; হঠাৎ শোনা গেল, হাবড়ায় সাহিত্য-সম্মিলন হইবে।

হাবড়ায় একটা সাহিত্যানুশীলনী সমিতি আছে, তাহার নামও "সাহিত্য-সম্মিলন"। বর্ষীয়ান্ সাহিত্যসেবী বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহোদয় তাহার প্রাণস্বরূপ। তিনি বঙ্গীয় দ্বাদশ-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক হইয়াছেন শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে সম্মিলন কার্য্য সুষ্ঠু নির্ব্বাহিত হইবে, কোনও রূপ গোলযোগ হইবে না, ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। যখন তিনি অনুগ্রহ করিয়া প্রবন্ধাদির জন্ম আহ্বান করিলেন, তখন সোৎসাহে তাঁহাকে যথোচিত এবং যথাসাধ্য সহায়তা করিতে বদ্ধপরিকর হইলাম। যে যে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া আবশ্যক মনে করিলাম, তাহা একাধিক পত্রদ্বারা বিজ্ঞাপিত করিলাম। এবং যথাসময়ে দু-একজন বন্ধু-সহ সম্মিলনে উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিব, ইহাও জ্ঞাপন করিলাম।

শ্রীযুক্ত লাহিড়ী মহাশয় কর্ম্মকুশল ব্যক্তি ; সম্মিলনের "সাপ্তাহিক বিবরণী" প্রকাশ তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক। এইরূপ ভাবে কার্য্যপরিচালন আরব্ধ হইয়াছে দেখিয়া উৎসাহ সমধিক বর্দ্ধিত হইল ; হাবড়ায় উপস্থিত হইবার জন্য আয়োজন আরম্ভ করিলাম।

অকস্মাৎ একদিন খবরের কাগজে সম্মিলনের সভাপতি এবং শাখা সভাপতিগণের নাম বাহির হইয়া পড়িল ;—দেখিলাম, সম্মিলন-সভাপতি হইয়াছেন বিচারপতি মাননীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ; সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস শাখায় যথাক্রমে রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু ও ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। স্যর আশুতোষের নাম দেখিয়া হতাশ হইলাম, কিন্তু বিস্মিত হইলাম না। গতবর্ষের সম্মিলনেরও সভাপতি যাহাতে তিনিই হন, সেই নিমিত্ত কেহ কেহ প্রকাশ্যভাবে প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং

ইহা এই নব্যভারত পত্রে সমালোচিত হইয়াছিল। * এবার তাঁহার অনুগত ভক্তবৃন্দ বোধ হয় অধিকতর সুযোগ পাইয়াছিলেন; তাই তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। এতদুপলক্ষে বহু পত্র পত্রিকায় যথেষ্ট সমালোচনা হইয়াছে, অতএব তদ্বিষয়ে এস্থলে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু "হিতবাদী" পত্রে বিগত ১৯শে বৈশাখ তারিখে সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইবার যোগ্য :—

"স্যর আশুতোষ সরস্বতী মহাশয়কে এবারে সাধারণ সভার সভাপতি পদে মনোনীত করা হইয়াছিল; কিন্তু জনরবে প্রকাশ যে, যাঁহারা সভাপতি নির্ব্বাচন করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নাকি শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সভাপতির আসন প্রদান করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। অথচ অধিকাংশের মত উপেক্ষা করিয়া আশুবাবুকে সভাপতির আসন প্রদান করা হইয়াছিল।" এতাবৎ লিখিয়া সাবধান সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"সম্মিলনের সম্পাদক রায় সাহেব † দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় এই জনরব অমূলক কি সমূলক, তাহা প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের সন্দেহ দূর করিবেন কি?" কিন্তু এই জনরবের এযাবৎ কোনও প্রতিবাদ "হিতবাদী"তে দেখি নাই। অতএব আমরা স্যর আশুতোষের ব্যাপার দেখিয়া দুঃখিত না হইয়া পারিতেছি না। শুনিয়াছি, ১৩২৩ সালে যখন যশোহর সম্মিলনে তাঁহাকে সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করা হয়, তখন তিনি তথায় দলাদলি, মতদ্বৈধ ইত্যাদির কথা শুনিয়া সেইখানে যাইতে অস্বীকৃত হন,—বরং রঙ্গপুরের ক্ষুদ্রতর সম্মিলনে সাদরে সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই তো তাঁহার যোগ্য কাজ হইয়াছিল। এবার সেই উদারতা কোথায় গেল? আমরা তাঁহার "স্তাবক" নহি, কিন্তু তাঁহাকে পুরুষসিংহ বলিয়াই মনে করি, কিন্তু এটা কি "সিংহোচিত" কাজ হইল?

যাহা হউক, স্যর আশুতোষ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি হইবার অনুপযুক্ত, এ কথা বলিতেছি না। বরং রঙ্গপুরে ও বাঁকীপুরে তাঁহার অধিনায়কত্বে সাহিত্য-সম্মিলনে সাগ্রহে যোগদান করিয়াছি। কিন্তু দ্বিতীয়বার তাঁহাকে এত সত্বর সভাপতি পদে বৃত করা কোনও মতেই সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না; স্পষ্টতঃ দেখিলাম, একদিকে তোষামোদ, অপর দিকে সংযমাভাব। * অতএব এরূপ সম্মিলনে না যাওয়াই উচিত মনে করিলাম।

সাহিত্য-সম্মিলন জিনিষটা বড় প্রিয় ছিল। কায়ক্লেশ ও অর্থব্যয় করিয়া তাই পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যেক সম্মিলনে গিয়াছি; বহুসাহিত্যসেবকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে ধন্য হইয়াছি, সাহিত্য চর্চ্চায় ইহাতে একটা উদ্দীপনাও হইত। সেই সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইতে না পারা বাস্তবিক ক্ষোভের বিষয়। বিশেষতঃ কর্ম্ম-জীবনের মেয়াদ প্রায় ফুরাইয়া আসিল; এ দিকে সম্মিলন ব্যাপারটীও

* নব্যভারত ১৩২৫ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় "ঢাকা সাহিত্য সম্মিলন", প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† এই উপাধি কি বাস্তবিকই তিনি পাইয়াছেন? না ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ "হিতবাদী" সম্পাদক মহাশয় ইহার প্রয়োগ করিলেন?

* স্যর আশুতোষের ইহা মহা দোষ যে, তিনি চাটুতার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন; তোষামোদে গলিয়া যাওয়াই সংযমের অভাব—দুর্ব্বলতার চিহ্ন। প্রকৃতই ইহা তাঁহাকে মাটি করিয়াছে।

যেন তেমন আর উৎসাহের বিষয় রহে নাই। এই হাবড়ারই কথা ধরুন। সম্মিলনের মাসেক পূর্ব্বে যে ৬ষ্ঠ সাপ্তাহিক বিবরণী প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে

মোট আদায় নগদ— ২১০৲
পূর্ব্বে দেনা করা হয় (Loan a/c) ১৭৭৸৶৫

মোট জমা ৩৮৬৸৶৫

ব্যয় (গত ৮ই চৈত্র পর্য্যন্ত) ... ৩৫০।৫
মজুদ তহবিল ... ৩৬৸৶০ *

এতদ্ভিন্ন বিল পরিশোধ করিতে হইবে ৩০৲ টাকার। অগত্যা দেনা পরিশোধ করিতে হইবে ১৭৭৸৶৫। এই তো অবস্থা। অথচ অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণের তালিকা আট-পৃষ্ঠা-ব্যাপী—প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দুই কলম।

অনেকে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়কে সম্মিলন-ব্যাপারে ম্যাজিষ্ট্রেট ডাকিয়া আনার জন্ম দোষ দেন। কিন্তু তাঁহার এ বিষয়ে অপরাধ কি? দেশশুদ্ধ লোক নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনাদি করিবার যে গুরুভার তিনি স্কন্ধে নিয়াছিলেন, তাহা সম্পাদন করিতেন কিরূপে?

ফলকথা, সাহিত্য-সম্মিলনের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নহে, ইহার উপর আবার—। যাক্ সে কথার আর দরকার নাই।

এবার সম্মিলনের দৈনন্দিন বিবরণ কোনও পত্র-পত্রিকায় বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইতে দেখা গেল না। সম্মিলনের মূল সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পরে আলোচনা হইবে। দর্শন শাখার সভাপতি মহোদয় অতীব পণ্ডিত ও প্রাচীন লোক; তাঁহার বক্তৃতাটি সারগর্ভ হইয়াছিল। "অদ্বৈত তত্ত্ব"—চিৎ ও অচিতের অভেদ, ইহাই তদীয় অভিভাষণের বিষয় ছিল। রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর সাহিত্যাকাশের এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক; বড় আশা করিয়াছিলাম, তাঁহার বক্তৃতা পাঠে আনন্দ ও উপকার লাভ করিব। নিয়তি বশতঃ তিনি পরলোক-প্রাপ্ত হইলেন। তৎপদে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই পদ তাঁহাকে কিসের জন্য দেওয়া হইল, তিনিই বা কেন ইহা গ্রহণ করিলেন, বুঝিলাম না। যশোহর সাহিত্য-সম্মিলনে তিনি সভাপতি ছিলেন, সাধারণ সভার এবং সাহিত্য-শাখার। এক অভিভাষণেই কাজ সারিয়াছিলেন, এবং তাহার সমালোচনাও ইতঃপূর্ব্বে (১৩২৩ সালে) করা হইয়াছে। এবার পুনশ্চ তাঁহাকে নিম্নতরপদে নামাইয়া দেওয়া হইল কেন, বুঝিলাম না, এবং তিনি ভিন্ন সাহিত্য শাখার আর সভাপতি হইবার লোকও পাওয়া গেল না, ইহাও বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজের দৈন্যসূচক। তাঁহার অভিভাষণ এ যাবৎ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই; অনেক বন্ধু সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার প্রমুখাৎ জানা গেল যে, উহা নাকি তেমন চিত্তাকর্ষক হয় নাই। ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় খুবই পণ্ডিত ব্যক্তি, বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার হইয়াও পোষাকে ও চিঠি-পত্রে যেরূপ দেশপ্রীতি ও মাতৃভাষানুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন বলিয়া শুনিতেছি, তাহাতে তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার ভাবে-বই উদ্রেক হইয়া থাকে। তবে "ইতিহাস" বিষয়ে তাঁহার সাধনার কোনও পরিচয় এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল "ইতিহাস ও অর্থনীতি"। তৎসম্বন্ধে পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে।

* এই হিসাব পূর্ব্বের ৯ম বিবরণীতে মোট আয় ৬৮৪০৲, মোট ব্যয় ১৬৪৭।/১৫ তাহা ফাল্গুন চৈত্রের সাহিত্য সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছিল।—ন, স।

তৎপূর্ব্বে সাহিত্য ও ইতিহাস-শাখার সভাপতি নিয়োগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের কি এই সভাপতি নিয়োগকার্য্যে কোনও হাত ছিল না? বর্দ্ধমান সম্মিলনের সভাপতিগণের নিয়োগ সম্বন্ধে তদীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত "সাহিত্য সংবাদ" ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩২১) ৪৮ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত হইয়াছিল :—

"যাঁহারা বঙ্গ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক এমন দুই একজন সুশিক্ষিত সুধী এবার যদি সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, বড়ই শোভনীয় হয়। বঙ্গীয় সংবাদ পত্র সম্পাদকগণের মধ্যে যদি কাহাকেও কোন বিভাগের সভাপতি মনোনয়ন করা হয় সে পক্ষে কি প্রবীণত্বে, কি সাহিত্যে "সঞ্জীবনী"র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের এবং বঙ্গবাসীর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের দাবী অগ্রগণ্য। সাহিত্য বিভাগে বা ইতিহাস বিভাগে ইঁহাদের একজনকে এবার সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হউক। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় অসাধারণ শক্তিশালী লোক, * * * তিনি কি সাহিত্য সংসারেও সম্মান পাইতে পারেন না?"

এই সূত্রে শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায়, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর নামও উল্লেখ করা হইয়াছিল।—এবার তো লাহিড়ী মহাশয় ঐ সকল ব্যক্তির খোঁজ-খবরও নিলেন না! ফলতঃ ৺রাজেন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তির পর সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়দিগের মধ্য হইতে কাহাকেও সাহিত্য শাখার সভাপতি করিলে বাস্তবিক শোভন হইত। 'নব্যভারত', 'প্রবাসী', 'সাহিত্য', 'বসুমতী', 'হিতবাদী' প্রভৃতিরও সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়দের কাহাকেও লাহিড়ী মহাশয়ের "সম্মানিত" করা উচিত ছিল। ডাক্তার প্রমথনাথের পরিবর্ত্তে, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কাহাকে নিযুক্ত হইতে দেখিলে লাহিড়ী মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতাম। হায়! কবে আমরা কথায় ও কাজে ঐক্য প্রদর্শনে কৃতকার্য্যতা লাভ করিব?

শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতায় ইতিহাসের সঙ্গে অর্থনীতি আনিয়াছেন ক্ষতি নাই; বিশেষতঃ শুনিয়াছি, তিনি অর্থ নীতিতেই বিশেষজ্ঞ। কিন্তু অভিভাষণ পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম না। বি. এ. ক্লাসের একজন ছেলেকে এবিষয়ে রচনা লিখিতে দিলে বোধ হয় ইহা অপেক্ষা মন্দ লিখিত না। চিন্তাশীলতা বা গবেষণার কোনও লক্ষণ ইহাতে দেখা গেল না। তাঁহার দু' একটী কথার সমালোচনা এস্থানে করিব। তিনি বলেন :—

"প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ অশেষ গৌরবমণ্ডিত ছিল। কি বৈদিক যুগ, কি দার্শনিক যুগ, কি বৌদ্ধ যুগ, সকল যুগেই ভারতীয় আর্য্যগণ নানা ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রতিভা বিস্তার করিয়াছিলেন। দর্শন বিজ্ঞান, শৌর্য্য বীর্য্য, ধর্ম্ম কর্ম্ম, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, সকল বিষয়েই তাঁহারা উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন। * * * এই অতীত গৌরব কাহিনী আমাদের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করে, এবং আমাদিগকে আত্মনির্ভরশীলতা প্রদান করে।" তার পর তিনি এই অতীত চর্চ্চার দোষ দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন :—

"আরও এক বিপদের সম্ভাবনা আছে, কেহ কেহ হয়তঃ অতীত গৌরবের স্মরণ করিয়া অতীতের অবস্থাতে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু অতীতে প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব; সম্ভব হইলেও উহা বাঞ্ছনীয় নহে।"

অর্থাৎ খবরদার, তোমার পূর্ব্ব পুরুষেরা সর্ব্ব বিষয়েই উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়া থাকিলেও উহাদের মত হইতে আর চেষ্টা করিও না। দেখিও, ব্যাস বশিষ্ঠের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন "ব্রাহ্মণ"—রাম যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ক্ষত্রিয়, ভীষ্মার্জ্জুনের ন্যায় বীর, সীতা সাবিত্রীর ন্যায় সাধ্বী, ইত্যাদি ইত্যাদি হইও না, অথবা সুশৃঙ্খলাবদ্ধ চাতুর্ব্বণ্য চতুরাশ্রম-সমন্বিত সমাজ, নিরাতঙ্ক নিরীতি জনপদ, ইত্যাদিও আর পাইতে চাহিও না, জৃম্ভক বা পাশুপতাস্ত্র অথবা পুষ্পকাদির কল্পনাও করিও না। যদি কোনও দেবতা আজ আবির্ভূত হইয়া বর দেন, "তোমরা শৌর্য্য বীর্য্যে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, কলা কৌশলে, নীতি ধর্ম্মে সত্য ত্রেতায় যেমনটী ছিলে, তেমনটী হইয়া যাও" তাহা হইলে চিৎকার করিয়া বলিও, "হে ঠাকুর; আমরা যদিও দু এক-দিন প্রবন্ধাদিতে ঐ সকলের প্রশংসা করিয়া থাকি, জানিও তাহা আন্তরিক নহে, আমরা সেই তোমার নীতিধর্ম্ম তপোবীর্য্য-সমন্বিত সত্য ত্রেতা চাই না, চাই কলির সভ্যতা, যাহাতে নীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি সমস্তই খুব বড় বড় কথায় পরিপূর্ণ, কিন্তু কাজের বেলায় "কিরূপে কাহাকে মারিয়া নিজে বড় হইব" এই প্রচেষ্টা।" অলমতি বিস্তরেণ।

প্রমথবাবু বলিতেছেন, "সমস্ত জগৎ অগ্রসর হইতেছে; আমাদিগকেও অগ্রসর হইতে হইবে।" কোনও চিন্তা নাই; জর্ম্মণ সমর আমাদিগকে খুব শিখাইয়াছে, জগৎ কোন্ দিকে "অগ্রসর" হইতেছে; * আমরাও যুদ্ধাদি দ্বারা না হইলেও মহামারি প্রভৃতি দ্বারা সেই দিকেই অগ্রসর হইতেছি। করাল কাল যেন বলিতেছেঃ—

"মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ ইহ সর্ব্বশঃ।" ফল কথা, ডাঃ প্রমথনাথ পোষাক ইত্যাদি কয়েকটী বাহ্য বিষয়ে স্বাদেশিকতা প্রদর্শন করিলেও বিজাতীয় শিক্ষা প্রভাবে আত্ম-হারা হইয়াছেন; তবে ভরসা ভগবদ্বাক্য—"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি।" †

অর্থ-নীতিতেও কতগুলি মামুলি কথা দেখিলাম। এই বিষয়টী সতত পরি-বর্ত্তনশীল; এই মহা সমরের ফলেও বহু পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তিনি তাদৃশ কিছু নূতন কথার অবতারণা করিলেই ইতিহাসের সঙ্গে ইহার সন্নিবেশের সার্থকতা হইত। যাহা হউক, এতদ্বিষয়ক তাঁহার একটী কথার এখানে আলোচনা করিব। তিনি বলেনঃ—"এখন বাঙ্গালীর শতকরা ৭৫ জন লোকের কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। শ্রম শিল্প মাত্র ৭ জনকে অন্ন দিতেছে। ইংলণ্ডের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ঐ দেশে শতকরা ৫৮ জন লোক শ্রমশিল্প দ্বারা এবং শতকরা মাত্র ৮ জন লোক কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বাঙ্গালার এই অবস্থা নিতান্ত অস্বাভাবিক।"

* জর্ম্মণ যুদ্ধের আনুষঙ্গিক ভাবে সমাজ-বিধ্বংসী যে বোলশেভিকম্ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাও চিন্তনীয়।

† ডাঃ প্রমথনাথ ৺ভূদেববাবুর "সামাজিক প্রবন্ধ" গ্রন্থখানি পাঠ করিতে পারেন।

কিন্তু ইংলণ্ডের অবস্থাটাই কি "স্বাভাবিক"! বাঙ্গালার অবস্থা খুবই শোচনীয়, শতবার স্বীকার্য্য। কিন্তু "কৃষি" শতকরা ৭৫ হইলে বিশেষ কোনও অন্যায় হয় না, অন্যায় বাকী ২৫ জনের মধ্যে যে ৭ মাত্র শিল্পে নিরত, এই স্থানে। এ দিকে ইংলণ্ডের অবস্থা ভাবিয়া দেখুন। জর্ম্মাণ অত্যাচারে যখন ঐ দেশে শস্যাগম ব্যাহত হইয়াছিল, বাণিজ্য-তরীর চলাচল বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখনকার কথা স্মরণ করুন। বিষয় অতি জটিল এবং ইহার সঙ্গে বহু কথা ও নানা তত্ত্ব জড়িত। তাই সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে চাই যে, একটা দেশ আত্ম-প্রতিষ্ঠ ও পরের উপর অ-নির্ভরশীল হইতে হইলে, ইহাতে কৃষির প্রাধান্য দিতেই হইবে। শিল্পেরও (যথা বস্ত্রশিল্পে তূলা ইত্যাদি) ভূরিভাগ কৃষি সাপেক্ষ। ইহার উপর আমরা পরাধীন জাতি, বাণিজ্যের পথ কোথায়?

অতঃপর বিজ্ঞান শাখা সভাপতির অভিভাষণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় প্রবীণ, চিন্তাশীল এবং দেশ-বৎসল ব্যক্তি। অভিভাষণে তিনি বিজ্ঞানের অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আলোচনা করিয়াছেন, এবং অতীতের আলোচনাচ্ছলে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি তৎ প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা ডাক্তার প্রমথনাথের জবাব হইবে মনে করিয়া আমরাও এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"ভারতবর্ষকে আপনার অতীত আদর্শ আবিষ্কার করিতে হইবে ও আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য সেই আদর্শকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে। আমরা যদি সেই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, তাহা হইলেই অনুকরণের হীনতা ও পরগাছা হইবার কলঙ্ক হইতে আমরা রক্ষা পাইতে পারিব।"

তাঁহার অভিভাষণটী বাস্তবিক অতি মধুর —অতি-উপাদেয় হইয়াছে; নীরস বিজ্ঞানের মধ্যে সরস দেশপ্রেম অনুস্যূত হইয়া ইহা এক আশ্চর্য্য জিনিস হইয়াছে। মনে হয়, আগাগোড়া উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করি। পাঠক মহোদয়গণ ইহা অবশ্যই একবার পড়িবেন, পড়িলে সুখী এবং উপকৃত হইবেন।

তবে একটু অবান্তর কথার সামান্য উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষা প্রদানের প্রচেষ্টার প্রশংসা করিয়াছেন, আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাতে যোগদান করি। ফলতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি কোনও বিষয়ের অনবদ্য চর্চ্চা হইয়া থাকে, সুসংযত ভাবে পরিচালনা হইয়া থাকে এবং প্রভূত উন্নতি বিধানও হইয়া থাকে, তবে তাহা বিজ্ঞান বিষয়াবলী—সায়েন্স্ ডিপার্টমেন্ট্। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসায় আবেগে ধীর-প্রকৃতিক বসু মহাশয় একটী বাক্য বলিয়াছেন, তাহা একটু বেসুরা বোধ হইল। তিনি বলেন:—

"বিশ্ববিদ্যালয় 'প্রতিভাবধের কসাইখানা' ও 'গোলদিঘির গোলামখানা' বলিয়া যাহারা ঘোষণা করেন ও করিয়াছেন, স্বদেশীই হউন অথবা বিদেশীই হউন, তাঁহারা মানব প্রকৃতির দুষ্টব্রণ, ক্ষতকীট।" কথাটা কিছু 'শক্ত' হইয়াছে। অনেক সময় লোকে এক একটা ভাবের অধীন হইয়া কথা বলে। বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বসাধারণের জন্য একই শিক্ষার ব্যবস্থা করে, পাত্রভেদে শিক্ষা দেয় না;

তাই মাদ্রাজের রামানুজ ফেইল মারিয়া ৩০্ বেতনের কেরাণীগিরিতে ঢুকিয়া ছিলেন; পরে শুভগ্রহ যোগে বিলাত গিয়া F. R. S. হইতে পারিলেন। এরূপ বহু 'রামানুজের' কথা আমরা বিদিত আছি। বক্তৃবিশেষ ঐরূপ বিষয় লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় "প্রতিভার কসাইখানা" (এটাও অবশ্য একটা 'শক্ত' কথা সন্দেহ নাই) বলিয়াছিলেন। আর ৺উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের "গোলদিঘির গোলামখানা" সম্বন্ধেও আমাদের সেই কথা, উক্তিটা খুবই 'শক্ত' বটে, কিন্তু একবারেই অসার নহে। বিশেষতঃ আজকাল যেভাবে ইহার কার্য্য পরিচালন হইতেছে, তাহাতে একটা 'গোলামখানা' না হউক, একটা 'খানা' যে হইয়া উঠিতেছে, একথা অনেকেই মনে করিতেছেন। শ্রীযুক্ত গিরীশবাবু সে দিন সিণ্ডিকেটে প্রবেশার্থী হইয়া যে টুকুর আমেজ পাইয়াছেন, আশা করি, তিনিও তাহা মনে রাখিয়া ভবিষ্যতে এত বড় "গালাগালিটা" ঐ সকল উক্তিকারিগণের প্রতি প্রদান করিবেন না।

এখন মূল সভাপতির অভিভাষণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আর একটী বক্তৃতার মর্য্যাদা বিধান করিতে হইবে। সর্ব্বমান্য স্যর ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এই সাহিত্য সম্মিলনের প্রদর্শনী বিভাগ খুলিবার সময়ে বক্তৃতায় নাকি বলিয়াছেন, যদি তিনি চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের জন্য সর্ব্বময় কর্ত্তা—ডিক্টেটার হইতেন, তবে সর্ব্বাদৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষাটা বন্ধ করিয়া ল-কলেজের অট্টালিকা বিধ্বস্ত করিয়া দিতেন।* কথাটাতে একটু দুঃখ হইল। ডাঃ রায়ের ন্যায় জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের ২৪ ঘণ্টার জন্য (আবুহোসেনের ন্যায়) "ডিক্টেটার" না হইতে পারিলেও ২৪ মাসের জন্য অন্ততঃ একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের "ভাইস-চ্যান্সেলার" হওয়াটা তো উচিত ছিল! কিন্তু সেটা হইবার নহে, কেন না, এ দেশ বিলাত নহে। এ দেশে শিক্ষাবিভাগেও শিক্ষক অবহেলিত। ভাগ্যবান্ এটর্ণি বা ডাক্তারও ভাইস্ চ্যান্সেলার হইতে পারেন, কিন্তু প্রফুল্ল, জগদীশ, হরপ্রসাদ প্রভৃতি বিশ্ব-বিখ্যাত হইলেও সেই আশা করিতে পারেন না। শিক্ষাবিভাগের এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে একবারমাত্র বম্বের ডাঃ ভাণ্ডারকর ভাইস্-চ্যান্সেলারির সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। অথচ বিলাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিক্ষকবর্গ দ্বারাই পরিচালিত; ডাক্তার, উকীল, জজ প্রভৃতির, সেখানে আসর নাই। ডাক্তারী শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় না, এবং আইনের বিজ্ঞানাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিত হইলেও নাকি আইন-ব্যবসায়ী হইতে হইলে অন্যত্র শিক্ষা লাভ করিতে হয়। এখানে সুতরাং 'আইনের' জয়, এই জন্যও আইন পড়িবার এত ঝোঁক! যতদূর স্মরণ হয়, স্যর আশুতোষ একবার এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "যদি হাইকোর্টের জজ না হইতাম, তবে কলেজের প্রফেসার হইতাম।"* তবেই

* তাহা হইলে ঐ কলেজের তিনকুড়ি অধ্যাপকের কর্ম্ম যাইত। তন্মধ্যে বহু ব্যক্তির যে ইহাই জীবিকার প্রধান সম্বল, এবং অনেকেই যে কর্ত্তার দলভুক্ত! ডাঃ রায়ের কিন্তু এটাও ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল।

* এ যে 'Were I not Alexandar, I would have been Diogenes"এর ন্যায়! স্যর আশুতোষ দিগ্বিজয়ী "সিকান্দর" না হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের "জুলিয়স্ সীজার্" তো বটেই। তবে সীজরের পরে রোমের যে দশা হইয়া-

দেখুন, দেশের লোকের নিকটে কোন্‌টা আদর্শ হইয়াছে। এই স্যর আশুতোষের যেরূপ প্রতিভা, যাদৃশী উদ্ভাবনী শক্তি ছিল, তিনি অধ্যাপকরূপে জীবন উৎসর্গ করিলে গণিত ও বিজ্ঞানের কত নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া বরেণ্য বিদ্বৎসমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া যাইতেন। আর এখন? অনুগ্রাহের গ্রন্থের 'উৎসর্গ পত্র', স্তাবক ও বান্ধবগণের নির্ম্মিত মর্ম্মর দেহার্দ্ধের পাদলিপি প্রশস্তি ইত্যাদি দ্বারা স্বল্পস্থায়ী নাম কুড়াইতেছেন মাত্র। *

যাহা হউক, ল-কলেজের সার্থকতা যে না আছে, এমন নহে। সকলেই তো সায়েন্স পড়িতে পারে না, আবার ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বিভাগের প্রবেশ পথও সঙ্কীর্ণ; শিল্প বাণিজ্যাদি শিক্ষার প্রকৃষ্ট স্কুলও বড় নাই। অথচ আইন-ব্যবসায়ী এক সম্প্রদায়ও থাকা আবশ্যক, যাঁহারা স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিয়া দেশের রাজনীতিক চর্চ্চাদি করিতে পারেন। অপিচ ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতের নানাপ্রদেশে আজ যে বাঙ্গালী বেশ সমৃদ্ধ ভাবে অবস্থান করিতেছে, প্রধানতঃ এই ব্যবসায়ই তাহার কারণ। তবে "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্"; তাহাতে সন্দেহ কি?

অতঃপর সম্মিলনের সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতার আলোচনা করিব। তাঁহার সম্পূর্ণ বক্তৃতাটী এবার একখানি মাত্র পত্রিকায়

ছিল, তাহার পরে বিশ্ববিদ্যালয়েরও যে সেই অবস্থা হইতে পারে, ইহাও একটা চিন্তনীয় বিষয়।

* জজিয়তী অথবা ভাইস্-চ্যান্সেলারগিরিতেও নামযশ আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার ন্যায় মেধাবী পণ্ডিতের পক্ষে ঐরূপ সাময়িক যশ অপেক্ষা মৌলিক উদ্ভাবকের স্থায়ী কীর্ত্তিই স্পৃহনীয় হওয়া উচিত ছিল।

দেখিতে পাইলাম, দুই একখানি সংবাদ পত্রে আংশিক মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বাঁকীপুরের বক্তৃতা ছাপা হইয়া বিতরিত হইয়াছিল, এবার ইহা বোধ হয় হয় নাই। যাহা হউক, তাঁহার এবারকার বক্তৃতার বিষয় ছিল, "ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ"। সম্মিলন হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিগণের মুখে শুনিয়াছি, অভিভাষণ বেশ সুন্দর ও পরিস্ফুট ভাবে পঠিত হইয়াছিল। সভাসদবর্গ মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিয়াছিলেন। তবে বক্তৃতার বিষয় সম্বন্ধে যে সকলেই একমত হইবে, তাহা অপ্রত্যাশিত। তিনিই বলিয়াছেন, "সুদুর্ল্লভাঃ সর্ব্ব-মনোরথা গিরঃ।" আমরাও সমালোচনার প্রারম্ভে সেই মহাকবিরই অপরস্থলে কথিত শ্লোকাংশ স্মরণ করিয়া বলিব, "হিতং মনোহারি চ দুর্ল্লভং বচঃ।" অপিচ, তিনি বক্তৃতায় একাধিকবার বলিয়াছেন যে, তিনি আত্মগোপন করিতে জানেন না। আমরাও সুতরাং 'সারল্যং সরলে কুর্য্যাৎ' এই নীতির অনুসরণ পূর্ব্বক, তদীয় অপ্রীতিকর হইলেও, স্বকীয় মনের ভাব গোপন না করিয়া স্পষ্ট ভাবেই এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করিতেছি।

স্যর আশুতোষের অভিভাষণ (তথা সম্মিলন সভাপতিত্বে এবার তাঁহার পুনর্নিয়োগ) বুঝিতে হইলে, গত বর্ষে তিনি যে কাজ করিয়াছেন, তাহার খবর লওয়া আবশ্যক। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভার্ণাকুলার (দেশভাষা) বিষয়ে এম, এ, পরীক্ষার প্রচলনার্থ গত বৎসর সিনেট সভায় প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবিত "স্কিম" টার প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণের অনুরাগ জন্মাইবার জন্যই, বোধ হয়; যোগাড়-যন্ত্রের ফলে সম্মিলন সভাপতিত্বে বৃত হইয়া অভিভাষণে তাঁহারই ভাবিফল জ্ঞাপন করি-

আছেন। তবে আমাদের বোধ হয়, তিনি স্বয়ং সেটা না করিলেই ভাল ছিল। তাঁহার স্তাবকের তো অভাব নাই। বিশেষতঃ তদীয় অনুগ্রহ-লোলুপ ব্যক্তি-বিশেষ-সম্পাদিত কোনও পত্রিকায় এতৎসম্বন্ধে ঢক্কা নিনাদও হইয়াছে; তবে তাহা সাহিত্য-সেবি সাধারণের তেমন চিত্তাকর্ষক হয় নাই। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, ভার্ণাকুলার্‌এ এম-এ পরীক্ষাটা বুঝি স্যর আশুতোষের নূতন উদ্ভাবন। প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। লর্ড কার্জনের আমলে যে ইণ্ডিয়ান্ ইউনিভার্সিটি কমিশন হয় (যাহাতে স্যর আশুতোষ ছিলেন না) * তাহার রিপোর্টে ছিল :—

"The Vernacular languages should be introduced (as at Bombay) in combination with English as a subject for M.A. Examination. The M. A. Examination in the Vernacular should be of such a character as to ensure a thorough and Scholastic study of the subject. The encouragement of such study by graduates who have completed their general course, should be of great advantage for the cultivation and development of Vernacular languages. * * We hope that the inclusion of Vernacular languages in the M.A. course will give an impetus to their scholarly study. * * * We also think that the Vernacular composition should be made compulsory in every stage of the B. A. course although there need be no teaching of the subject."

* বঙ্গদেশে যে সকল অধিবেশন হয়, সেই সকলে মাত্র তিনি ঐ কমিশনের লোকেল মেম্বর স্বরূপ ছিলেন, কিন্তু রিপোর্টে তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না।

ঐ রিপোর্টের অনুসারে প্রায় ১০ বৎসর যাবৎ মেট্রিকুলেশন, আই.এ., বি. এ. তে দেশীয় ভাষায় রচনা পরীক্ষা চলিতেছে; দশ বৎসর পরে আজ দেশীয় ভাষায় এম. এ. প্রস্তাবিত ও প্রবর্ত্তিত হইতে চলিল।*

কি ভাবে এম্-এ পরীক্ষায় বঙ্গভাষা প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা পাঠ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিলে বোঝা যাইবে না। তাই নিম্নে তাহা বিস্তারিত প্রদত্ত হইল।

(ক) পরীক্ষার্থ গৃহীত ভাষা (অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষা)।

(খ) আসামী, উড়িয়া, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, উর্দ্দূ, তামিল, তেলুগু, কানাড়ী, মালয়লম্, সিংহলী, এই কয়টী দেশীয় ভাষার মধ্যে যে কোনও একটী।

(গ) পালি, প্রাকৃত, পারস্য, পুস্ত এই চারিটী বনিয়াদি (basic) ভাষার মধ্যে যে কোনও দুইটীর প্রাথমিক জ্ঞান (elements)।

(ঘ) ইণ্ডোএরিয়ান্ অথবা তাদৃশ কোনও শাখার ভাষা বিজ্ঞান বিষয়ক মূলতত্ত্ব (Elements of Philology &c)

বঙ্গ ভাষায় নিম্নলিখিত পাঠ্য গ্রন্থাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(১) বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস—কোনও বিশেষ যুগ (period) সম্প্রতি বৈষ্ণব যুগ।

(২) "বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়" (বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত) ৭৫ পৃষ্ঠা আন্দাজ; ময়নামতীর গান (ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত)।

* গত ১৯১৮ সালের ২৮শে জুন তারিখে স্যর আশুতোষ সংস্কৃত, পালি ইত্যাদি সংক্রান্ত বোর্ডে দেশীয় ভাষায় উচ্চশিক্ষা বিষয়ে যে মেমোরেণ্ডম্ দাখিল করেন, তাহাতে কমিশনের এই মন্তব্য সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই। এটা লক্ষ্যের বিষয় বটে।

(৩) কবিকঙ্কন 'চণ্ডী' ও মাইকেল কৃত 'মেঘনাদবধ কাব্য।'

(৪) (ক) ১৮০০ হইতে ১৮৫৭ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ (development)

(খ) ১৮৫৭ হইতে ১৮৮০ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব।

এই (৪) সংখ্যক বিষয়ে দুইটী রচনা লিখিতে হইবে। অপিচ (৩) ও (৪) এই দুই বিষয়ের পরিবর্ত্তে ছাত্র বিশেষে একটা গবেষণামূলক রচনা (Thesis) দাখিল করিতে পারিবে।

অতএব দেখা গেল যে (১) যে সংস্কৃতের প্রভাব বাঙ্গালা প্রভৃতি সমস্ত দেশীয় ভাষার উপর পূর্ণভাবে বিরাজমান। তাহার স্থান এই পাঠ্যে নাই, * অথচ পারস্য (এবং পুস্তও) আছে। (২) 'পালি' প্রাকৃতেরই একটা প্রকার ভেদ; 'প্রাকৃত' থাকিলেই চলিত। অথচ উভয়টাই রাখিয়া পাঠ্য জটিল করা হইয়াছে। (৩) বাঙ্গালা সাহিত্যের গ্রন্থ মধ্যে "বঙ্গ সাহিত্য-পরিচয়ের † কতক অংশ—বৌদ্ধযুগের কয়েকটী গান মাত্র—ও ময়নামতীর গান; এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও মেঘনাদবধ, এইমাত্র পাঠ্য। (৪) আবার ইহার মধ্যেও বিশিষ্ট ছাত্রেরা একটা থেসিস্ দিলেই কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও মেঘনাদবধ পড়া হইতে অব্যাহতি পাইবে। অর্থাৎ ভাষার উৎপত্তি-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ইতিহাস (Philology and History of Literature), ইহার উপরেই অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। হেম, নবীন, বঙ্কিম, ভূদেব, কালীপ্রসন্ন, দীনবন্ধু, গিরীশচন্দ্র প্রভৃতি গদ্য-পদ্য-নাটক রচয়িতৃগণের গ্রন্থ বিশেষ পঠন-পাঠন চলিবে না। অথচ তাঁহাদের রচনা-রীতি, বিষয়-নির্ব্বাচন ইত্যাদি সম্বন্ধে লেকচার্ চলিবে।

এই পাঠ্য ইদানীন্তন ইংরেজী সাহিত্যের এম-এ পরীক্ষার পাঠ্যের 'বি' গ্রুপের অনেকটা অনুরূপ। পরন্তু ঐ গ্রুপের প্রথম চারি কাগজের মধ্যে ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসের কাগজে কোনও নির্দ্দিষ্ট পুস্তক পাঠ্য না থাকিলেও, অন্য তিন কাগজে রীতিমত নাটক-গদ্য-পদ্য পাঠ্য আছে। তার পর তাহাতে প্রাচীন সাহিত্যের যুগ (period) বিশেষের নির্দ্দেশ থাকিলেও কোন কোন্ পুস্তক পাঠ করিতে হইবে, তাহার নির্দ্দেশ করা রহিয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত লাটিন গ্রীক প্রভৃতি ক্লাসিক্ ভাষাগুলিতে যেমন সুনির্দ্দিষ্ট পাঠ্য গ্রন্থ নির্দ্ধারিত আছে; এবং ইংরেজীতেও যেমন পূর্ব্বে ছিল, এই নূতন প্রবর্ত্তনের সময়ে বাঙ্গালা এম-এ তেও সেইরূপই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ তাহা হইতে পারে নাই, এবং ইহা সমধিক আক্ষেপের বিষয়; কেন না মেট্রিকুলেশন, আই-এ, বি-এতে রীতিমত কোনও সাহিত্য গ্রন্থ পড়ান হয় না; কেবল রচনার রীতি মাত্র শিক্ষার বিষয়।

দশ বৎসর হইল নূতন রেগুলেশন প্রবর্ত্তিত

* বি-এ অথবা অগত্যা আই-এ পর্য্যন্ত সংস্কৃত না পড়িলে কেহ দেশীয় ভাষায় এম-এ দিতে পারিবে না, এই নিয়মটী করিলেও সংস্কৃত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কতকটা স্বীকৃত হইত। মুসলমান কি অপর সংস্কৃতানভিজ্ঞ ছাত্রগণের জন্য সংস্কৃতে একটা প্রিলিমিনারী বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেই চলিত।

† "বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়ের" উদ্ভাবকের বা সঙ্কলয়িতার প্রজ্ঞা-প্রতিভার বিশেষ কোনও পরিচয় এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে পাওয়া যায় না! -যাউক, সে অবান্তর কথা।

করা হইয়াছে। ইউনিভার্সিটি-কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে বাঙ্গালা রচনা বি-এ পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দশ বৎসর পরে এখন মেট্রিকুলেশন, আই এ, ও বি-এতে রীতিমত পাঠ্য নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক প্রতি স্কুল কলেজে যাহাতে বঙ্গভাষা শিক্ষাদানের নিমিত্তে শিক্ষক ও লেকচারার নিযুক্ত হন, এবং ছাত্রগণ বঙ্গ-সাহিত্যে সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। সেইটী করিলে স্যর আশুতোষ প্রকৃতই ভাষার একটা হিত-সাধন করিয়া স্মরণীয় হইতেন। মেট্রিকুলেশনে তো কাজ খুবই সোজা যে, একখানি প্রশ্নপত্র বাঙ্গালায় দেওয়া হয়, তাহা স্ত্রী পরীক্ষার্থিনীদের কাগজের ন্যায় করিলেই বেশ হয়। আই এ তে ইংরেজীর একখানি কাগজ (এবং পাঠ্য গ্রন্থ ১২ খানি) কমাইয়া বঙ্গভাষার দুই খানি কাগজ করিয়া গদ্য-পদ্য সাহিত্যের এবং ব্যাকরণের পরীক্ষা গ্রহণ করিলেই হয়। বি এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা অবশ্যপাঠ্য না রাখিয়া পাঠ্যের একতর বিষয় রাখিলেই চলে। সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে ছাত্রগণ বাঙ্গালা নিতে পারিবে; তবে আই-এ তে সংস্কৃত পড়িয়া না থাকিলে বাঙ্গালা নেওয়া উচিত নয়, এই বিধি হওয়া আবশ্যক। বি-এ তে বাঙ্গালা অবশ্য-পাঠ্য করার অন্তরায় এই যে, তাহা হইলে পাঠ্য পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। কেন না, বি-এর বাঙ্গালা পাঠ্য গদ্য-পদ্য-নাটক-সমন্বিত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ অসমীয়া প্রভৃতিতে হয়তো উচ্চতর পাঠ্য হইবার পুস্তকের অসদ্ভাব হইতে পারে। বি-এ বাঙ্গালায় অনার্স্‌ও হওয়া উচিত। ইহাতে বঙ্গসাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস এবং প্রাকৃত ব্যাকরণ, অলঙ্কার ইত্যাদি পাঠ্য হইতে পারে। তার পর এম-এ পরীক্ষায় ইংরেজী 'এ' বা 'বি' গ্রুপের মত পাঠ্য হওয়া উচিত। সংস্কৃত ও প্রাকৃত জড়াইয়া বঙ্গ-ভাষা-বিজ্ঞান বিষয়ক এক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করাইয়া পাঠ্য করা উচিত। এই গ্রন্থে মোসলমানি শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ ও বানান শিক্ষার্থে কতকটা পারসীও অন্তর্ভুক্ত করিলে মন্দ হয় না। তবে ইংরেজীতে বহু লাটিন ও গ্রীক শব্দ আছে, তথাপি লাটিনের বা গ্রীকের আলোচনা ইংরেজী এম্-এতে আবশ্যক বোধ হয় নাই—তাই পারসীর চর্চ্চা না হইলেও ক্ষতি নাই।

স্যর আশুতোষ এইরূপ ভাবে বাঙ্গালা প্রবর্ত্তিত করিলে প্রকৃত কাজ হইত। সংস্কৃতে কিছুটা প্রবেশ না থাকিলে কেবল পালি প্রাকৃত পড়িয়া বঙ্গভাষায় এম্-এ পাশ করিলেও পাকা বাঙ্গালা সাহিত্যিক হইতে পারিবে না। তবে "'বড়' লোক মহায়ো যঃ স এব 'বড়' পণ্ডিতঃ।" আজ কাল, বিশেষতঃ।

সে যাহা হউক, এখন প্রকৃত ব্যাপারে আসা যাউক, দেশীয় ভাষায় এম্-এ দিতে হইলে যে আর একটী সহায়ক (subsidiary) ভাষা নিতে হইবে, ইহার সার্থকতা কি? সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে তো বড় বড় কথা শুনিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাতে তৃপ্ত হইতে পারিলাম না।

বঙ্গভাষায় এম্-এ দিতে গিয়া ধরুন আর একটী ভাষা নিতে হইলে, কোন্ ভাষা নেওয়া স্বাভাবিক? মেদিনীপুর ইত্যাদি অঞ্চলের লোক নিবে উড়িয়া; রঙ্গপুর ইত্যাদির লোক নিবে আসামী; বর্দ্ধমান ইত্যাদি জেলার লোক নিবে হিন্দী; মোসলমান ছাত্র উর্দ্দু নিবে। তামিল, তেলেগু নেওয়া আর

ডিক্রি নেওয়া প্রায় সমান কথা। কেননা, তামিল প্রভৃতি ভাষা অনার্য্য, সংস্কৃতমূলক ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, অক্ষরও অভিনব। অনায়াসে ভাল পাস্ করা সমস্ত বিদ্যার্থীরই লক্ষ্য থাকিবে, তাই প্রায় সকলেই আসামী, উড়িয়া, হিন্দী এই নিকট পার্শ্বের ভাষাই নিবে। আসামী (এবং বোধ হয় উড়িয়াও) তো এত দিন বাঙ্গালা ভাষার উপভাষ বলিয়াই খ্যাপিত হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অথরিটি' দীনেশবাবু বলেন—(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য তৃতীয় সংস্করণ ১৭৩ পৃঃ ফুটনোট্ দ্রষ্টব্য) "আসামের ভাষাকে আমরা বঙ্গভাষার প্রাদেশিক ভেদ ভিন্ন স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।" কথাটা এক হিসাবে মিথ্যা নহে। খ্রীষ্টান্ মিশনারী এবং পশ্চাৎ সরকার বাহাদুর পৃষ্ঠপোষকতা না করিলে আসামী ভাষার নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইত। এখনও আসামে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই বাঙ্গালা পড়া ও বলা ভালই পারেন। এমন কি, আসামী ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা অপেক্ষা বাঙ্গালা পত্র-পত্রিকার চল্তি আসামীয় সমাজে অনেক অধিক, প্রতিযোগীতায় আসামী দাঁড়াইতে পারিতেছে না। উড়িয়ার খবর জানি না, তবে উড়িয়া যে আসামী ভাষা অপেক্ষাও বাঙ্গালার অধিকতর সদৃশ হইবে, তাহা অনুমানতঃ বলিতে পারি। কেন না, উড়িষ্যায় সম্ভবতঃ কোনও অনার্য্য জাতি (আসামের কোচ, আহম, কাছাড়ী ইত্যাদির ন্যায়) দীর্ঘকাল আধিপত্য করে নাই এবং উড়িষ্যা আসামের বহু পূর্ব্বেই বঙ্গের সামিল হইয়া পড়িয়াছিল।

যাহা হউক, বাঙ্গালীর ছেলেকে আসামী, উড়িয়া শিখাইয়া বিশেষ লাভই বা কি? আসামী ভাষায়তো এমন বেশী কিছু নাই, যাহা দ্বারা বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে। বরং প্রাচীন কিছু কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তাহা যাঁহারা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য বুঝিতে পারেন, তাঁহারা অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারেন। ফলতঃ চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস পড়িয়া শঙ্করদেব, মাধবদেব বুঝিতে কোন অসুবিধাই হইবে না। আধুনিক আসামী সাহিত্য, যাহা গ্রাম্য-ভাষা-বহুল হইয়া ক্রমশঃ দুর্ব্বোধ হইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালীর নূতন শিখিবার বড় কিছু নাই। অধুনাতন আসামী লেখক-গণ বাঙ্গালা সাহিত্যসেবিগণের যত পারেন অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া থাকেন।

আবার দেখুন, বাঙ্গালা এম্-এ তে আসামী প্রভৃতির প্রবর্ত্তন হওয়াতে কয়জনই বা ঐগুলি শিখিবে, আর কতই বা শিখিবে? পালি, প্রাকৃত পারসাদির মধ্যে দুইটা ভাষার সাধারণ জ্ঞান এবং প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিতেই দুই বৎসরের ভূরিভাগ সময় ব্যয়িত হইয়া যাইবে। অবশিষ্ট অত্যল্প সময়ে একটা ভাষায় পল্লবগ্রাহী মাত্র হওয়া যায়। এইরূপে শিক্ষিত দুএক জন মাত্র বৎসর বৎসর হইতে পারে। এদিকে শত শত উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালী বহু বৎসর হইতে আসাম, উড়িষ্যা, বিহার ইত্যাদি প্রদেশের বক্ষঃস্থলে থাকিয়া হাকিমী, মাষ্টারী, ওকালতী, ডাক্তারি ইত্যাদি করিতেছেন, তত্তৎ প্রদেশের সমাজে মিশিয়া খুব ভালরূপে ঐ সকল প্রদেশের ভাষায় কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, অনেকে তত্তৎ ভাষায় পাঠ্য পুস্তক পর্য্যন্তও লিখিয়াছেন। তাঁহারা যেরূপ ঐ সকল প্রাদেশিক ভাষা শিখিয়াছেন, দুই

বৎসর অন্যান্য নানা বিষয়ের সঙ্গে অধ্যয়ন করিয়া এম্ এ পরীক্ষার্থীরা কি সেরূপ শিক্ষা করিতে পারিবে? স্থানস্থিত প্রবাসী বাঙ্গালী আসামী উড়িয়া হিন্দী মারাঠী ইত্যাদি শিখিয়া যদি তেমন কিছু না করিয়া থাকেন,* তবে এই পল্লবগ্রাহী ব্যক্তিদের দ্বারা বিশেষ কিছু হইবার আশা করা যায় কি?

তবে বিশ্ববিদ্যালয় যদি প্রকৃত কাজ এ বিষয়ে করিতে চান, তাহা হইলে, সর্ব্বাগ্রে সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষায় এম্-এ পাশ কতিপয় ছাত্রকে পোষ্ট্ গ্রেজুয়েট্ স্কলারশিপ্ প্রদান করিয়া এলাহাবাদ, পঞ্জাব, বম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইয়া ঐ সকল দেশের মুখ্য ভাষাগুলির যে সাহিত্য আছে, তাহা অধ্যয়ন করাইয়া আনিতে পারেন। এই ভাবে সুশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা প্রকৃত কাজ হইতে পারে। আসামী বা উড়িয়ার ন্যায় অল্লায়াসে শিক্ষণীয় সাহিত্য চর্চ্চার জন্য রিসার্চ্চ প্রাইজ দু একটার ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট হইবে। এইরূপে কৃতী ব্যক্তিদিগকে "ডক্টর্ অব্ লিটারেচর্" উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়া বড় বড় প্রাদেশিক ভাষার "ইউনিভার্সিটি লেক্‌চারার" করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বৎসর বৎসর দু চারি জন নানা প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্যে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক তৈয়ার করাইতে পারিলে স্থায়ী ফল হইবার সম্ভাবনা। যদি এইরূপ ব্যবস্থা করিতেন, তবে বুঝিতাম, বিশ্ববিদ্যালয় যোগে প্রকৃত একটা কাজ হইল। নচেৎ যে ভাবে প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে মারাঠী, গুজরাটী, তামিল, তেলুগু ইত্যাদি খুব কম ছাত্রই নিবে এবং নিলেও শিক্ষা সামান্য হইবে, তাহাতে কোন কাজও হইবে না। বরং এইরূপ পল্লবগ্রাহী অপেক্ষা ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অধিকতর সুশিক্ষিত বাঙ্গালী অনেকেই আছেন। অতএব এ ব্যবস্থায় উন্নতিবিষয়ক কোনও কিছু দেখা যাইতেছে না।

এদিকে মাতৃভাষার সঙ্গে সহায়ক আর একটী ভাষা* যুড়িয়া দিয়া স্যর আশুতোষ মাতার অগৌরবই করিলেন, যেন আমাদের জননী বঙ্গভাষা এম্-এর উচ্চস্তরে স্বয়ং উঠিতে অসমর্থা, তাই মাতৃস্বসার হস্তাবলম্ব আবশ্যক হইয়াছে। হায়! "বিমাতার আলয়ে" কি আমাদের "মাতাকে" এ ভাবেই স্থানলাভ করিতে হইল! +

মাতৃস্বসাদের প্রতি স্যর আশুতোষের প্রীতির আর এক খবর পাওয়া গেল। সম্প্রতি তিনি নাকি ব্যবস্থা করিতেছেন, যে কোনও ছাত্র ইচ্ছা করিলে অবশ্য-পাঠ্য সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে, মেট্রিকুলেশনে নিজ মাতৃভাষা ছাড়া অপর একটী প্রাদেশিক ভাষা নিতে পারিবে। এই ব্যবস্থায় ফলে ঘোরতর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এখন বাধ্য

* তাঁহারা কিছু করেন নাই, এ কথা আমি বলিতে পারি না; অনেকে প্রদেশান্তরের কথা বাঙ্গালায় প্রচার করিয়াছেন। পত্রিকা বিশেষে অন্যান্য প্রদেশের সাময়িক সমালোচনাও দেখা গিয়াছে—যথা 'ভারতবর্ষে' 'বীণার তান'।

* বাঙ্গালা এম্-এ পরীক্ষায় মোট ৮ খানি প্রশ্নপত্র, মধ্যে ২ খানিই ঐ সহায়ক (Subsidiary) ভাষার বিষয়ে হইবে; অথচ দুইটী বনিয়াদি (Basic) ভাষাতে প্রশ্নপত্র হইবে একখানি মাত্র।

\+ দেশীয় ভাষায় এম্-এ উপলক্ষে নানা ভাষায় শিক্ষাদানের নিমিত্ত এত প্রয়াস অনাবশ্যক মনে করি। যে সকল ছাত্র অশেষ ভাষা-বিলাসিনী ভুজঙ্গ হইতে সমুৎসুক, তাহারা কম্পারেটিভ ফিললজি বিষয়ে এম্-এ পড়িলেই পারে।

হইয়া ছেলেরা সংস্কৃত পড়ে। ইহাতে মাতৃভাষার জ্ঞানেরও প্রভূত সহায়তা হয়। কেন না, বাঙ্গালার অধিকাংশ শব্দই খাঁটি সংস্কৃত; ব্যাকরণে সন্ধি, সমাস, কৃৎ, তদ্ধিত সমস্তই প্রায় সংস্কৃতের অনুযায়ী। প্রান্তবাসী বাঙ্গালী অথবা প্রবাসী বাঙ্গালী, যাহারা আসামী, উড়িয়া, হিন্দী ইত্যাদি আবাল্য শিখিয়াছে, তাহারা কষ্ট করিয়া আর সংস্কৃত শিখিতে চাহিবে না। এ দিনে আই-এ ও বি-এ তে সংস্কৃত ইচ্ছাধীন গ্রহণীয় বিষয়। বাঙ্গালা এম্-এতেও সংস্কৃত শিক্ষার আবশ্যকতা ব্যবস্থিত হয় নাই। অতএব সংস্কৃতের মান কমিল। আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্ববিধ প্রাদেশিক ভাষার উপজীব্য সংস্কৃত ভাষার এই খর্ব্বীকরণে স্যর আশুতোষ স্মরণীয় হইবেন!

হঠাৎ সংস্কৃতের প্রতি স্যর আশুতোষের এই অনাদরের ভাব কোথা হইতে আসিল? সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি ইত্যাদি উপাধি-বিশিষ্ট স্যর আশুতোষ, যিনি সংস্কৃত টোল পরীক্ষা-বোর্ডের সভাপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের তথা সংস্কৃতজ ভাষাগুলির ফেকাল্টির প্রেসিডেন্ট, তাঁহার সংস্কৃতের প্রতি পক্ষপাতিত্বই প্রত্যাশিত; অকস্মাৎ এই নিরনুগ্রহ কেন? এবার-কার অভিভাষণেও তো তিনি সংস্কৃত শ্লোক আবশ্যক ও অনাবশ্যকভাবে খুব "কোট" করিয়া সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। * পরন্তু বাহ্যতঃ যাহাই দেখা যায় না কেন, আমার দৃঢ় ধারণা অভ্যন্তর অন্যরূপ। বাঁকিপুর সম্মিলন উপলক্ষে তাঁহার বাঙ্গালা ভাষানুরাগাদি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, সংস্কৃতেও তথৈবচ।

সমগ্র ভারতবর্ষে আজ কাল পরস্পর ভাব বিনিময়ে ইংরেজী ভাষাই মধ্যস্থতা করিতেছে। তাই কংগ্রেস্ কনফারেন্স ইত্যাদির সাধারণ ভাষা ইংরেজী। তবে ইংরেজী রাজভাষা বলিয়া শিরোধার্য্য হইলেও ইহা আমাদের নিজস্ব জিনিস নহে, তাই একটী নিজস্ব জিনিস দাঁড় করাইতে হইবে। হিন্দু আমোলে সংস্কৃত ছিল ভারতের জাতীয় ভাষা, এখন আপাততঃ সংস্কৃত সেইরূপ চলিতে পারে না। কিন্তু সংস্কৃত চর্চ্চার বহুল প্রয়োজন, কেননা প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাকে যথাসম্ভব সংস্কৃতের অধিকতর নিকটবর্ত্তী করিতে হইবে, যেন অনায়াসে মারাঠী কথা বাঙ্গালীরা বুঝিতে পারে, বাঙ্গালীর কথা মারাঠীরা শিখিতে পারে। ইহাতে আরো একটী বিষয়ের প্রয়োজন, সমস্ত ভাষার লিপি একবিধ করা; তাহাতেও ইংরেজী হরফ চলিবেনা, দেবনাগর চালাইতে হইবে। দেশহিতৈষী ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এ বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে—হওয়া প্রত্যাশিতও বটে। এখানেও বাধ্যতা দ্বারা সংস্কৃত শিক্ষাদান একান্ত আবশ্যক। সংস্কৃত শিক্ষায় দেবনাগর অক্ষরও শিক্ষা হয়। মোসলমান

* একটা স্থলে পাণ্ডিত্য বিশেষভাবেই প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে; 'বঙ্গের ধোয়ী, উমাপতি, জয়দেব, শরণ, গোবর্দ্ধন আর বাঙ্গালা ভাষাতেই অন্তরীণ থাকিবেন না, ভারতে বিভিন্ন দেশের ভাষাতেও তাঁহাদের মধুর বংশীরব শ্রুত হইবে।' অর্থাৎ উমাপতি, গোবর্দ্ধন, জয়দেব প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, সেগুলি হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতিতে তরজমা হইবে!!

এটা কি কোনও 'ধাবকের' কারসাজি? বাঁকিপুরের অভিভাষণেও এরূপ ছিদ্র ছিল, সেখানেও নিউটনের অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কারে 'ইংরেজী ভাষা' সমলঙ্কৃত হইবার কথা ছিল। হায় স্যর আশুতোষ!!

আমলে উর্দ্দু চলিয়াছিল, এখনও উর্দ্দু ভারতের মোসলমানগণের সার্ব্বজনীন ভাষা। উর্দ্দু হিন্দী ভাষারই মোসলমানী সংস্করণ। তাই হিন্দী যদি হিন্দুদের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়, তবে হিন্দীউর্দ্দু এই একই ভাষার দুই সংস্করণ দ্বারা ভারতবর্ষের সার্ব্বজনিক সভা সমিতির কার্য্য পরিচালিত হইতে পারে। এইজন্য কেহ কেহ হিন্দীকে সাধারণ শিক্ষার একটা অঙ্গ করিতে চান। হিন্দী ভাষা ও দেবনাগর বর্ণমালা সমগ্র ভারতের অত্যাবশ্যক শিক্ষার বিষয় হওয়া উচিত। কিন্তু স্যর আশুতোষ হিন্দী ভাষার বিরোধী, কেননা তিনি মনে করেন, হিন্দী শিখিলে মাতৃভাষার ক্ষতি হইবে। পরন্তু আমরাও মাতৃভাষার পরিবর্ত্তে হিন্দীর প্রচলন চাই না। আমরা বলি যে, যদি আর একটা দেশীয় ভাষা শিখিতেই হয়, তবে সেইটা হিন্দী হওয়াই উচিত। তৎসঙ্গে সঙ্গে দেবনাগর অক্ষরও শিখা হইবে। তবে সংস্কৃতের স্থলে উহা প্রবর্ত্তিত হউক, এই অভিপ্রায় কখনই পোষণ করা উচিত নহে। অধীত হউক আর না হউক, হিন্দীর প্রসার হইতেছে ও হইবেই। আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সর্ব্বত্রই হিন্দী ভাষা প্রচলিত। তীর্থযাত্রায় ঐ প্রদেশে গিয়া সকলেরই হিন্দী কিছুটা অভ্যাস করিতে হয়। মাড়ওয়ারী মহাজন, তীর্থের পাণ্ডা, দরওয়ান, কুলি মজুর ইত্যাদি দ্বারাও বঙ্গ, আসাম প্রভৃতি প্রদেশের সর্ব্বত্র হিন্দী চলিতেছে। আমরা কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আগত বলিয়া গৌরব করিতে পারি, কান্যকুব্জের ভাষা হিন্দী শিক্ষা করিতে আগ্রহাভাবের কারণ কি?

যাউক সে কথা। এখন উপসংহার করিবার পূর্ব্বে দুঃস্থ সাহিত্যসেবিগণের নিমিত্তে যে উদ্যম হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক মনে করি। এই প্রস্তাব নূতন নহে। সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে কাশিমবাজারে (১৩১৪ সালে) এই প্রস্তাবটী উত্থাপিত হয়। তদবধি ইহার অল্পবিস্তর আলোচনা আরো দু এক সম্মিলনে হইয়াছে। হাবড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহোদয় এ বিষয়ে সর্ব্বদাই যত্নবান্। এবারও এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। কিন্তু প্রথমেই গোল বাধিল যে, দুঃস্থ সাহিত্যসেবিগণের সাহায্যার্থ তহবিলটা কলিকাতার সাহিত্য-পরিষদের সংশ্রবে থাকিবে, না হাবড়ায় থাকিবে? এতদুপলক্ষে তর্ক বিতর্কের যে বিবরণ জানা গেল, তাহাতে কোনও কোনও ব্যক্তির সাহিত্য-পরিষদের প্রতি কুটিল কটাক্ষপাত দর্শনে ব্যথিত হইলাম। কোনও কোনও বিষয়ে মতান্তর উপস্থিত হইলে, কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অসাধ্য হইলে, তাহা পরিত্যাগ করা অন্যায় নহে, কিন্তু তাহার বিদ্রোহাচরণ করাটা ঠিক নহে। কেননা, একটা জিনিষ গড়িয়া তোলা বড় কঠিন, কিন্তু ভাঙ্গা বড় সোজা কথা। আজকাল যাঁহারা স্যর আশুতোষের প্রীতিভাজন, এমন কয়েকজনকে এই বিদ্রোহী দলে দেখিয়া মনে হয়, স্যর আশুতোষও বুঝি তেমন প্রীতির চক্ষে পরিষৎকে দেখেন না। * ইদানীং সাহিত্য-সভায়

* বাঙ্গালা ভাষার এম্-এর পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারণেও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রতি নিরনুগ্রহের ভাব দেখিতে পাইতেছি। ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থবিশেষ পাঠ্য হইল; কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত সুবহু প্রাচীন গ্রন্থের একটীও, এমন কি, হাজার বছরের পুরাতন 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' ও পাঠ্য হইল না।

অন্ততঃ একবার তিনি উপস্থিত হইয়া সভাপতিত্ব করিয়াছেন, জানি; কিন্তু পরিষদে তাঁহাকে উপস্থিত হইতে শুনিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। যাহা হউক, শেষে তর্ক বিতর্ক হইয়া এক কমিটির হাতে বিষয়টার ভারার্পণ করা হইয়াছে। ঐ কমিটি প্রায় কলিকাতার লোকদের দ্বারাই গঠিত। কমিটির সভাপতি স্বয়ং স্যর আশুতোষ হইয়াছেন, সভ্যগণের অনেকেই তাঁহার অনুগত ব্যক্তি। দেখা যাউক, কতদূর কি হয়। দুঃস্থ হইলেও প্রকৃত সাহিত্যসেবক প্রায়শঃ আত্মমর্য্যাদাশালী। মোসাহেব সাজিয়া তোষামদ করিয়া অর্থোপার্জ্জনে স্বতঃই পরাঙ্মুখ; যথা, ৺গোবিন্দচন্দ্র দাস। স্যর আশুতোষের দলের যেখানে আধিপত্য, সেখানে আত্মমর্য্যাদা বজায় রাখিয়া প্রকৃত সাহিত্যসেবী সাহায্য লাভে কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন, জানি না।

পরিশেষে জননী "দশভুজা"র সমীপে প্রার্থনা করি যে,যে ত্যাগের কথা,যে সংযমের কথা, যে দলাদলি ভুলিয়া যাওয়ার কথা, স্যর আশুতোষের বক্তৃতায় শোনা গিয়াছে, তাঁহার কার্য্যেও যেন ভবিষ্যতে তাহা দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হই। "মায়ের বরাভয়দায়ী করস্পর্শে" তাঁহার সর্ব্বপ্রকারের "মোহ কাটিয়া যাক্"।

শ্রী—নাথ দেবশর্ম্মা।

শ্রীমান্ জ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুমনা দেবীর বিবাহের উপদেশ।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩২৬।

বাবা জ্যোতির্ম্ময়, মা সুমনা, কাহার আদেশে তোমরা আজ পবিত্র উদ্বাহ ব্রত গ্রহণ করিলে, একবার ক্ষণকাল চিন্তা কর। যাঁহার অনাহত ভেরী অনন্তকাল মানব-হৃদয়ে ধ্বনিত হইতেছে, তাঁহার স্বরূপ-সান্নিধ্য-সাধনের প্রতিজ্ঞা, সামান্য প্রতিজ্ঞা নয়। পুরুষ হইয়া প্রকৃতিতে নিমজ্জন, প্রকৃতি হইয়া পুরুষে আত্ম-বিসর্জ্জন সোজা কথা নয়। এ ব্রত বাহিরের কোন খেলা নয়, এ ব্রত সংসারের কোন জটিল প্রশ্নের মীমাংসা নয়। ভেদে অভেদ-জ্ঞান সম্যকরূপে প্রস্ফুট না হইলে কেহই নিগূঢ় লীলাতত্ত্বের সমীকরণে উপনীত হইতে পারে না। ইহা জীব-রক্ষা বা সংসার-রক্ষার শুধু সোপান নয়, ইহা আধ্যাত্মিক মঞ্চারোহণের অহেতুকী কারণ। ক্ষণকাল চিন্তা কর—ক্ষণকাল জীবনের ভাবী অঙ্কের দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ কর।

এত দিন তোমরা একাকিত্ব সাধন করিতেছিলে—একাকিত্বের মধ্যে বিশ্বেশ্বরের যে চিন্ময় মূর্ত্তি প্রকট, তাহা, সম্যকরূপে না হইলেও, আংশিক রূপে তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছ, মনে হয়। শুধু একাকিত্ব সাধনে বিশ্বেশ্বরের পূর্ণত্ব সাধিত হয় না, তাই গণতন্ত্রের ভিন্নত্ব-বোধ-সাধনও যেন তাঁহার লীলার অন্তরঙ্গ। তিনি প্রতিনিয়ত তাই যেন কবির ভাষায় ডাকিতেছেন—"এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে ব'স,নয়ন ভরিয়া তোমাকে দেখি।" সংসার-ক্ষেত্রে বঁধুর সহিত বঁধুর মিলন ঘটাইবার জন্য তিনি সৌন্দর্য্য-প্রজাপতি রূপে

পুরুষ ও প্রকৃতিতে অবতীর্ণ। অবতীর্ণ তিনি পিতৃরূপে, মাতৃরূপে, সখারূপে, সখী রূপে। যদি তাহা না হইত, কেহ এই স্বার্থময় জগতে, আপন স্বার্থের আঁচরে বঁধুকে ডাকিয়া বসাইতে পারিত না। ইহা ত বাহিরের আঁচর নয়, ইহা অন্তরের নিগূঢ়তম অঞ্চল। অন্তরের অন্তরতম অঞ্চলে উভয়ে উভয়কে আজ যে স্থান দিলে—এখানে মহা স্বার্থ-অসুরের বলিদান হইয়া গিয়াছে—এখন জ্যোতি আর শুধু জ্যোতিতে নিমগ্ন নয়, এখন আর সুমনা নিজ মনে আবদ্ধ নয়। জ্যোতিতে সুমনার স্থান হইয়াছে, সুমনায় জ্যোতির স্থান হইয়াছে। এই মিলন দেখিবার জন্য আমরা বন্ধুবর্গ আজ সম্মিলিত হইয়াছি,তাই আজ মঙ্গলশঙ্খ ধ্বনিত হইতেছে,—তাই সকলে আজ মহানন্দে পূর্ণ। আজ উভয়ে উভয়ের মধ্যে সৌন্দর্য্য-প্রজাপতি রূপে যিনি প্রকট হইয়াছেন, আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহাকে ভাল করিয়া প্রাণ ভরিয়া তোমরা দেখ।

এই ব্রাহ্মসমাজে, শুধু ব্রাহ্মসমাজে কেন, এই বঙ্গপ্রদেশে নবকান্তকে না জানে এমন লোক বিরল। একাধারে এমন নিষ্কাম সংস্কারক,সাহিত্যিক,ধার্ম্মিক ও কর্ম্মী বাঙ্গালায় আর দেখা যায় নাই। সাধনায় তিনি নিত্য-সিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। কিবা কর্ম্ম, কিবা জ্ঞান, কিবা প্রেম, কিবা ভক্তি—সব মিলিয়া ঢাকা প্রদেশে, এক যুগে, এক মহামহিমান্বিত মূর্ত্তি গঠিত করিয়াছিল, সে নবকান্ত মূর্ত্তি। নিশিকান্ত এবং শীতলাকান্ত তাঁহার পার্শ্বচর ছিলেন—যেন সোণায় সোহাগার মিলন, যেন ত্রিমূর্ত্তিতে বিশ্বেশ্বরের মহা অঙ্কন। প্রতিভার সে উজ্জ্বল মূর্ত্তি, একদা, আমরা দেখিয়া সম্মোহিত হইয়াছিলাম। এখনও তাহা মনে হইলে প্রাণ আকুল হয়, বিরলে বসিয়া ভাবি,—কি অপরূপ মূর্ত্তিই না দেখিয়াছিলাম। এই ত্রিমূর্ত্তিতে মিলিয়াছিলেন, বরদানাথ। অহেতুকী প্রেমের এমন জমাট ভাব আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। নবকান্তের জীবনী লিখিত হয় নাই—নিশিকান্তেরও না, শীতলাকান্তেরও না, বরদানাথেরও না। লিখিত হইলে জগৎ বুঝিত, কি অহেতুকী প্রেমের চিত্র, সে যুগে, ঢাকায় প্রকটিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সব কথা আজ থাকুক। নবকান্ত মহা তপস্যায় নিরত হইয়া সংস্কারকরূপে লক্ষ্মীমণিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই লক্ষ্মীমণিকে যখন বিষ্ণুচরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন এই বঙ্গে নিঃস্বার্থ প্রেমের জয় ঘোষিত হইয়াছিল। নবকান্ত এবং বিষ্ণুচরণের মিলন এ বঙ্গে সে যুগের এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা। নবকান্তের মহা তপস্যার ফলে যে সকল কুমার কুমারী এদেশে আবির্ভূত হইয়াছেন, সে সকলের মধ্যেই অল্লাধিক পরিমাণে নবকান্তের সাধনার বীজাঙ্কুর নিহিত আছে। নবকান্ত অসময়ে জীবন লীলা শেষ করিলেন, কিন্তু রাখিয়া গেলেন কি? ঐশ্বর্য্য, সম্পদ কিছুই রাখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু তাঁহার দেবদুর্লভ চরিত্র-রত্ন তাঁহার পুত্র-কন্যাগণ উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়া আজ গৌরবান্বিত। তাঁহার সময়ে ঢাকায় এমন কোন সৎকাজ ছিল না, যাহার সহিত তাঁহার যোগ ছিল না। ঢাকা এবং তিনি তখন একাত্মক ছিলেন। শুধু ঢাকা নয়,সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ ও তিনি তখন অঙ্গাঙ্গী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সকল সৎকাজের, সকল সংস্কারের মূলে তিনি ছিলেন। যেমন বরিশালে গিরিশচন্দ্র-সর্ব্বানন্দ, মৈমনসিংহে শ্রীনাথ-অমরচন্দ্র, যেমন উত্তর-বাঙ্গালায় হরনাথ-ভুবনমোহন,

যেমন কটকে মধুসূদন-রাধানাথ, যেমন ফরিদপুরে গোবিন্দচন্দ্র-ভুবনমোহন, যেমন কলিকাতায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও দুর্গামোহন-আনন্দমোহন, তেমনি, ঢাকায় ছিলেন, নবকান্ত এবং কালীনারায়ণ। নবকান্ত অর্থোপার্জ্জন করিতেন যেন কেবল পরের সেবার জন্য—তিনি চির-দরিদ্র ছিলেন এই জন্য যে, যখন যাহা পাইতেন, তাহাই অন্যের সেবা ও উপকারের জন্য ব্যয় করিতেন। দিতে, দিতে, দিতে, ফকীর হইয়া তিনি চলিয়া গেলেন! হায়, সে যুগের সে পুণ্য কাহিনী আজ বিবৃত করিতে আসিলাম কেন? সময় সংক্ষেপ, সুতরাং আমাকে সংক্ষিপ্ত হইতে হইবে। নবকান্তের পুণ্যপূত ফকীরি সীতাকান্তে, নিখিল প্রভৃতিতে প্রস্ফুট। সীতাকান্ত, সেই সোণার সীতাকান্ত অসময়ে যখন চলিয়া গেলেন, কোন্ পাষাণ-বক্ষর তখন অশ্রুপাত হয় নাই? সীতাকান্ত নবকান্তের উত্তরাধিকারী, আর এই সুমনা, সীতাকান্তের উত্তরাধিকারিণী,—বংশ-পরম্পরায় এই সুমনার ভিতর দিয়া মহানুভবতা, উদারতা, সততা, সংস্কার-স্পৃহা, সুচরিত্র, পুণ্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রেম, ভক্তিধারা এই বঙ্গে যেন প্রবাহিত হইতেছে। আর বিষ্ণুচরণ? যে বিষ্ণুচরণ জীবনকে ব্রহ্মার্পণ করিয়া প্রচার-ব্রত গ্রহণে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সে জীবনও তুচ্ছ জীবন নয়। তিনিও সংস্কারক, জ্ঞানী, কর্ম্মী, প্রেমিক ও সাহিত্যিক ছিলেন। বিষ্ণুচরণের সাত্ত্বিকতা সুধাময় এবং জ্যোতির্ম্ময় উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়া ধন্য। আজ এই সম্ভ্রান্ত দুই পরিবারের মহা মিলন হইল;—আকাশ হইতে আজ দেব-আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতেছে এবং পৃথিবী হাসিতেছে। আদান প্রদানে এই দুই পরিবারের বিশেষত্ব আরো ফুটিবে, আরো প্রকট হইবে। দেখ বাবা জ্যোতির্ম্ময়, চাহিয়া দেখ; দেখ মা সুমনা, আজ স্বর্গের অপরূপ রূপ দেখিয়া নয়নকে সার্থক কর। উভয়ে উভয়ের মধ্যে ঘনীভূত প্রকট প্রেম-মূর্ত্তি দেখিয়া আজ জীবনকে ধন্য কর।

নবকান্ত আজ স্বর্গে, নিশিকান্ত, শীতলাকান্ত এবং বরদানাথ আজ স্বর্গে—আর নিতম্বিনী, সীতাকান্ত এবং বিষ্ণুচরণও স্বর্গে। নিতম্বিনীর স্বর্গারোহণের পর তাঁহার ছেলে মেয়েদিগকে পালন করিলেন যে সাধ্বী কমলকামিনী, তিনিও আজ স্বর্গে। এই আনন্দের দিনে কেবল শোকের কথাই প্রাণে জাগিতেছে। উঁহারা থাকিলে এবং সুধাময় থাকিলে কত আনন্দই আজ হইত! কিন্তু বিধাতার লীলা কে বুঝিবে? হতভাগ্য আমি, শোকাশ্রু মুছিতে মুছিতে, আজ তোমাদিগের দুই হস্ত প্রেম-রজ্জুতে বাঁধিয়া দিলাম,—দুই মহিমান্বিত কুল—মহা-অকুলের পথে মহা-আশা লইয়া আজ ধাবিত হইল!!

তোমরা আজ উভয় কুলের বিশেষত্ব, মহত্ব, গৌরব—স্মরণ কর। স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা কর—তোমাদের মিলিত-জীবনে যেন উভয় কুলের মহত্ব চির অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রতিজ্ঞা কর—দুইয়ে মিলিয়া একাত্মক হইবে, ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলাইয়া এক ধর্ম্মের পথে চলিবে, এক ধর্ম্মের কথা বলিবে,—সাধনার পথে কেহ কাহারও অন্তরায় হইবে না। প্রতিজ্ঞা কর—না খাইয়া অন্যকে খাওয়াইবে, না পরিয়া অন্যকে পরাইবে—অন্যের অশ্রু মুছাইতে কখনও কার্পণ্য করিবে না। যদি দরিদ্রনারায়ণদের সেবা করিতে পার, তবে অহেতুকী প্রেমের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। প্রেমে ব্যবসাদারী চলে না, সর্ব্বদা স্মরণ

রাখিবে। প্রতিজ্ঞা কর—দুইজনে নববলে বলীয়ান হইয়া দেশের সেবা, সাহিত্যের আদর ও সেবা করিয়া বংশের গৌরব বাড়াইবে। প্রতিজ্ঞা কর—দুইজন মিলিয়া প্রতি দিন ঈশ্বরোপাসনা করিবে এবং প্রেম-পুণ্য, বিশ্বাস-ভক্তির সাধনা করিয়া বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। দেখিও, প্রতি দিন অন্যের জন্য প্রার্থনা করিতে ভুলিও না। প্রার্থনা করিবে, এ জগতে কীট পতঙ্গ, পশু পক্ষী, নরনারী কাহারও যেন কোন অভাব না থাকে। যদি তাহা করিতে পার, তোমাদের প্রেম-ব্রত গ্রহণ সার্থক হইবে। তোমাদের জীবনে ব্রহ্মার্পণ ও বিশ্বাস ভক্তির জয় নিত্য যেন ঘোষিত হয়।

এই ব্রতপালনের সহায় কি, জান কি? সহায় কেবল ব্রহ্মকৃপা। নিত্যোপাসনা তোমাদের সম্বল হইলে ব্রহ্মকৃপা নিত্য তোমাদের মস্তকে বর্ষিত হইবে।

বাবা জ্যোতির্ম্ময়, সুদাময় নাই, নিতম্বিনী নাই, বিষ্ণুচরণ নাই, কমলকামিনী নাই—কে তোমাকে আজ আশীর্ব্বাদ করিবে? তাঁহাদের মহা চরিত্র-রত্ন ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেই রত্নে যদি তুমি ভূষিত হও, তবে বুঝিতে পারিবে, স্বর্গ হইতে তাঁহারা তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। তোমার উপর কত মহত্তের কত মহত্ত্ব-ঘোষণার ভার পড়িয়াছে, তাহা বুঝিতেছ কি? সাবধান, সাবধান, তোমার জীবন দেখিয়া উঁহাদের প্রতি যেন কাহারও ঘৃণার উদ্রেক না হয়। যে পবিত্র বংশের এই সুমনাকে বিশ্বপতি আজ তোমাকে দিলেন, এই সুমনাকে কখনও অনাদর করিও না, ইহাকে আদর করিতে পারিলে তোমার জীবনে নবকান্ত এবং সীতাকান্তের তপস্যার ফল ফলিবে এবং স্বর্গ হইতে দেব-আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইবে,—এই সুমনার ভিতরে মহামননা পাইবে। তোমার পিতার বড় ইচ্ছা ছিল, তোমার পরিণয় তিনি দেখিয়া যাইবেন, সে সাধ তাঁহার পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু বিশ্বাস করিও, তিনি সর্ব্বদা তোমার কাছে কাছে আছেন। পিতামাতাকে দেখিতে চাও যদি, বিধাতাকে প্রত্যহ ডাকিবে। বিশ্বপিতার ভিতরেই তাঁহারা নিমগ্ন, জানিবে। পিতা-মাতার গুণ-স্মরণে, মহত্ত্বানুপ্রাণনে পিতা-মাতাকে কাছে পাইবে। প্রার্থনা করি, তোমার পিতামাতার অহেতুকী বিশ্বাস ভক্তি তোমার জীবনের উজ্জ্বল আলোক হউক। তোমার বিশ্বাসের ঔজ্জ্বল্যে তোমাদের বংশ আরো আলোকিত হইবে। বিধাতার মহা ইচ্ছা তোমার জীবনে পূর্ণ হউক।

মা সুমনা, তোমাকে অধিক আর আমি কি বলিব? তুমি যে বংশের মেয়ে, আজীবন সেই বংশের আদর্শ অন্তরে ধারণ করিলে আমি কৃতকৃতার্থ হইতে পারি। সেই বংশের পবিত্রতা, সেবা, মায়া, দয়া, পরদুঃখকাতরতা, বিশ্বাস, ভক্তি লইয়া আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিতে তুমি প্রস্তুত হও। তোমার জীবনে নবকান্ত, নিশিকান্ত, শীতলাকান্ত ও সীতাকান্তের অলিখিত জীবন যেন প্রস্ফুট হয়, তোমাকে পাইয়া এই চট্টোপাধ্যায় বংশের মুখ যেন আরো উজ্জ্বল, আরো গরীয়ান হয়। আজ জ্যোতির ভিতরে মহা জ্যোতিঃ দেখিয়া আত্মহারা হও। তোমাদের আদর্শ-জীবন দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজ এবং তৎসহ বঙ্গপ্রদেশ যেন ধন্য হয়। বিধাতার মহা ইচ্ছা তোমাদের যুগল-জীবনে পূর্ণ হউক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুরাতন লেখা। (৩)—প্রেম।

(১)

মাতাল না হইয়া যে মদ খাইতে পারে, সে-ই মদ খাইতে জানে। নেশায় প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটে। অনুরাগের সহিত যার আসক্তি নাই, সে-ই ভালবাসিতে জানে। দর্পণে প্রতিকৃতি প্রতিভাত হয়, দর্পণের স্বচ্ছতাগুণে। যদি প্রতিকৃতি দর্পণে লাগিয়া যাইত, দর্পণের স্বচ্ছতা থাকিত না, প্রতিকৃতি আর প্রতিফলিত হইত না।

আসক্তি অনুরাগকে সীমাবদ্ধ করে; স্থান, কাল, পাত্রের গণ্ডীতে ঘেরিয়া ফেলে। আসক্তি অনুরাগের কলঙ্ক। আসক্তি কর্ম্মের প্রাণ, কিন্তু জ্ঞানের বিষ। গৃহস্থ কর্ম্মী, সন্ন্যাসী জ্ঞানী। কর্ম্মেও অনুরাগ, জ্ঞানেও অনুরাগ, কর্ম্মে আসক্তি কলঙ্কিত অনুরাগ, জ্ঞানের অনুরাগে আসক্তি নাই।

আসক্তি-শূন্য অনুরাগ ব্যভিচারী নহে। ব্যভিচার আসক্তির অতিমাত্রাজনিত, অভাব-জনিত নহে। দর্পণে অনেক প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হয়, তজ্জন্য কেহ দর্পণকে ব্যভিচারী বলে না। ব্যভিচারী সে, যে একটীকে হাতে ধরিয়া আর একটীর জন্য হাত বাড়ায়। যে কাহারই জন্য হাত বাড়ায় না—যাহার গৃহে অতিথি অনেক, কুটুম্ব কেহ নাই, সে ব্যভিচারী নহে, সে গৃহস্থ নহে, সে সন্ন্যাসী।

নেশা না হইলে মদ খাইয়া সুখ কি? আসক্তিহীন অনুরাগ নপুংসক। যে অনুরাগে অনুরাগীর সুখ নাই, অনুরক্তিতেরও সুখ নাই।

সুখ সুখ—এই কষ্টিপাথরে সকলই পরীক্ষিত—অসার কল্পনা, শূন্যে শূন্যের পরীক্ষা, প্রলাপে জগত মন্ত্রমুগ্ধ ক্ষণিকের তরে—সুখ নাই, অসীম ভ্রম।

যখন অহঙ্কারে আপনাকে জগতের কেন্দ্র করি, তখন আমার সুখ দ্বারা জগৎকে পরিমাণ করি। যখন আমার সুখ জগতের মানদণ্ড হয়, তখন অসুখে সুখ ভ্রম হইলেও তাহারই দ্বারা পরিমাণ পরিসমাপ্ত হয়। আবার সেই অহঙ্কারে নীতি উচ্ছৃঙ্খল হইলে অকর্ত্তব্য কর্ত্তব্যে পরিগণিত হয়। নেশার সার অহঙ্কার—স্থল জল, আকাশ পাতাল, ধর্ম্ম অধর্ম্মের পার্থক্য অপনোদনে ইহার তুল্য আর কিছু নাই।

তোমার সুখকেও মানদণ্ড করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। যখন বালক ছিলে, পুতুল দিয়া ভুলাইয়াছি। দর্পণে চাঁদ দেখাইয়া চাঁদের অভাব মিটাইয়াছি। যৌবনে দুটা ফুল দিয়া, একটু হাসি দিয়া, নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া লইয়াছি, তোমার অহঙ্কার সন্তুষ্ট করিলেই তোমার সুখ হয়। অহঙ্কার প্রমত্ত, সার অসার বুঝে না। সুখের মানদণ্ড ভাঙ্গিয়াছে। অন্য তুলায় ভাল মন্দ বিচার করিতে হইবে।

আর এক অসার কল্পনা বিবেক। গোবরে পদ্মফুল ফুটে, লোকে যখন জানিত, হাতীর মাথায় গজমুক্তা সম্ভবে, লোকে যখন বিশ্বাস করিত, তখন বিবেকের জন্ম। প্রাক্তনলব্ধ বহুদর্শিতা, জন্মগত জ্ঞানরাশী বিবেক নহে। বিবেক ভগবানের আদেশ—কথা—ইঙ্গিত। পূতিগন্ধজাত কীটের হৃদয়েও নাকি সে পরশমণির জ্যোতিঃ প্রতিভাত হয়। কেহ দেখে নাই, শুনে নাই, তবুও নাকি হয়। যাহা দেখি নাই তাহা আছেও বলিতে পারি না, নাইও বলিতে পারি না।

কে বলিবে, ভূত প্রেত আছে কি না? কিন্তু এই বলিতে পারি, প্রতি মুহূর্ত্ত যাহার প্রয়োজন, সে এমন অস্পৃশ্য হইলে, আমার তাহাতে কাজ চলে না।

তোমার সুখ হইবে বলিয়া তোমাকে ভালবাসি নাই। যখন ভালবাসিয়াছিলাম, তখন জ্যামিতির স্বীকার্য্য ও স্বতঃসিদ্ধ স্মরণ হয় নাই। যেহেতু, অতএব, ভাবিবার অবসর পাই নাই। বলিও না, স্বার্থপরতা। নিজে সুখী হইব, এ কথাও ভাবিবার সময় পাই নাই। অন্য পদার্থের কেনা বেচায় লাভ লোকসানের হিসাব করিবার সময় হয়। ভালবাসিবার সময় তাহার সময় হয় নাই, সময় হইলেও তাহা ভাবিবার ক্ষমতা ছিল না, ইচ্ছা ছিল না। তোমার সুখও ভাবি নাই, আমার সুখও ভাবি নাই। ইচ্ছা করিয়াও ভালবাসি নাই, অনিচ্ছা করিয়াও ভালবাসি নাই। ও কাজটা যেন আর কেহ করিয়া দিয়াছে।

প্রেমে পবিত্র করে। অনুরক্তিকে মনুষ্যত্বের অতীত করিয়া দেবত্বে পরিণত করে, অনুরাগী ব্রহ্মচারী হয়। আসক্তি মনুষ্যোচিত, পশুত্বের অনেক উপরে—কিন্তু আসক্তি মনুষ্যকে উপরে উঠিতে দেয় না।

আসক্তি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। যে উপরে উঠিবে, তাহা তাহাকে টানিয়া নীচে ফেলিবে। গার্হস্থ্য জীবন, অতিমানুষিকতার প্রশ্রয় দেয় না। সকলই নিয়মিত। অনিয়মিত অতিমানুষী প্রশস্ততা শান্ত সলিলরাশী উদ্বেলিত করে। চাঞ্চল্য যে স্থির জীবনের বিসম্বাদী। এ জন্য সে গণ্ডীর বাহিরে কাহাকে যাইতে দেয় না। উপরেও উঠিতে দেয় না, আবার নীচেও পড়িতে দেয় না। মাধ্যাকর্ষণে সকলকে বাঁধিয়া রাখে। আসক্তি গার্হস্থ্য জীবনের উপযোগী। সে গৃহস্থকে কর্ম্মে প্রণোদিত করে; দুঃখে, বিপদে, বিসম্বাদে, ঝটিকায় গৃহস্থকে রক্ষা করে। আসক্তি না থাকিলে মনুষ্য মনুষ্যত্ব হারাইত।

আসক্তি মনুষ্যকে দুর্ব্বল করে—অনুরাগে বল বৃদ্ধি হয়। তাঁহার অনুরাগ সার্থক, শুভ ও সবল, যাঁহার অনুরাগ কুজ্ঝটিকার উপরেও অনাহত দৃষ্টি—তিনি অনুরক্তিতের প্রকৃত উপযোগী। তিনি উপরে থাকিয়া দূর হইতে বিপদের সমাগম অনুভব করেন, এবং অসীম বলে তাহা পর্য্যুদস্ত করেন। আসক্তি চোখের জ্যোতি বসাইয়া দেয়, হাত কাঁপাইয়া দেয়। আত্মীয়কে বুকে তুলিয়া যুদ্ধ করিতে গৃহীর সামর্থ্য সুবিধা হয় না। সে সকলকে বুকে জড়াইয়া কাদার উপর গড়াইতে থাকে। এইরূপে মনুষ্য-জীবন অতীত হয়।

প্রকৃত অনুরাগী সংসারের উপরে, স্বর্গের দুয়ারে, দৈববলে বলীয়ান। ইন্দ্রিয় সীমার অতীত। মাধ্যাকর্ষণ অতিক্রম করিলেই উপরে উঠা যায়। নীচেও নামিবার ক্ষমতা আসে।

হাসি-কান্না জীবনের বৈচিত্র্য মূল। হাসি কান্না আসক্তি হেতু। প্রকৃত অনুরাগী এই বৈচিত্র্যময়ী কুয়াসার বাহিরে। নিরনুরাগ জীবন মৃত্যু। অনাসক্ত অনুরাগ মোহের অতীত, শক্তির মূল, মোক্ষের নিদান।

জীবন অতি ক্ষুদ্র, পৃথিবী পঙ্কপূর্ণ। পৃথিবীর পাখী যতই উড়ুক না কেন, আকাশের উপরে উঠিতে পারে না। বিশ্রামের জন্য, খাইয়া বাঁচিবার জন্য তাহাকে আবার নীচে নামিয়া আসিতে হয়। স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি কলঙ্কিত; যাহাকে ভালবাসে, তাহার মঙ্গলের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে না।

কে কবে বলিয়াছে, আমি ইহাকে ভালবাসি, এ আমাকে ভালবাসে, কিন্তু ইহার মঙ্গল অপরকে ভালবাসিলে—তারই দিকে ইহাকে ঘুরাইয়া দি। প্রণয়িনী আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতেছে তুমি আমাকে ছাড়িও না, কে তাহাকে ভুলাইয়া অন্যের হাতে দিতে পারিয়াছে? স্বার্থ—স্বার্থ, পৃথিবীর ভিত্তিই গরলে গঠিত। ধন জন মান অকিঞ্চিৎকর, আপাতমনোরম। অসীম সমুদ্রে একটী বুদ্‌বুদে মানব প্রতারিত—আশা, ভরসা, সুখ, সম্পদ—আপাতচিত্তহর। যে ছাড়াইতে পারিয়াছে,সে-ই অমৃতের অধিকারী হইয়াছে। সে-ই এ সকল অধিকার করিয়াছে। যে হৃদয়কে বিসর্জ্জন দিতে পারে, সে-ই হৃদয় লইতে জানে। আসক্তি অক্ষতা কুমারী—অতি অপূর্ব্ব কল্পনা, অনাবিল সত্য। অন্ধকারে উষার জন্ম, মেঘে তড়িতের অভ্যুদয়। আসক্তি অক্ষম, অনুরাগরঞ্জিত জ্ঞান—এই ত প্রেম।

মানে লজ্জা, স্নেহে ভয়, ভাবে দুঃখ। পুত্রকন্যার জন্য লোকে অমরত্ব পরিহার করে। যখন ছেলেটী পাইয়াছিলাম, বুকে তুলিয়া হাসিয়াছিলাম। যাহার ছেলে তাহাকে ফিরাইয়া দিতে কাঁদিলাম কেন? আসক্তি মানবকে স্বার্থপরায়ণ করে। ধন্য সে, যে সংসারে থাকিয়াও সংসারে জড়ায় নাই। তাহার অটুট রাজত্ব। জ্ঞান ও অনুরাগ উভয়কে পৃথিবীর ধূলী কুয়াসার উর্দ্ধে পাঠাইতে হইবে। ১-১-৯১

(২)

অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। এখন দুজনে একা একা, সেই যমুনা তীরে ছাড়াছাড়ি। কে বলিবে সে মধু যামিনী?

বিকচ নলিনে যমুনা পুলিনে
বহুত পিয়াসা রে,
চন্দ্রমাশালিনী যা মধুযামিনী
না মিটল আশা রে।

আমার শ্মশান সেই যমুনা পুলিনে, বিজয়া সেই সেই দিন। সে কি মধু যামিনী?

সন্ন্যাসী হইয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিলাম। কোথাও প্রাণের হু হু রব নিবৃত্ত হইল না। মরু সাগর কানন প্রান্তর কোথায়ও দেবদর্শন ঘটিল না। শান্তি মিলিল না। বিফল তীর্থ পর্য্যটন, চিন্তামণির চিন্তা দূর না হইলে বিল্বমঙ্গলের চিন্তামণি লাভ কোথায় ঘটে? যেখানে যখন গিয়াছি, কালিন্দী কূলে নীপমূলে সেই কামকলা প্রাণের ভিতর জাগিয়া উঠিয়াছে। গরলে কি অমৃতে কোথাও স্মৃতি ভুলাইতে পারি নাই।

শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। যাইতে যাইতে ফিরিয়া এক একবার চাহিতেছেন,যদি আর একবার চারি চোখের মিলন হয়। কিন্তু বারবার চাহিতেও ভয় হয়, পাছে অনুসূয়া বুঝিয়া ফেলে। না চাহিলেও নয়, তাই মাঝে মাঝে পায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল, সে দিন বুঝি পথে কাঁটা কিছু বেশী হইয়াছিল; আবার চাহিল, আবার চাহিল, কিন্তু কটাক্ষ মিলনে সমুদ্র পানের পিয়াসা মিটে না। "তড়িৎ আলোকে আঁখির পলকে পাই যদি তোমায় দেখিতে" এ অভাগিনীর কাতর কামনা। শকুন্তলার তাহাতে তৃপ্তি হয় না। তাই এবার কাঁটা বনে ভাল করিয়া আঁচলখানা জড়াইয়া গেল। আঁচল সহজে খুলে না।

মেণ্টর অনেক করিয়া টেলিমেকসকে বুঝাইলেন। গৃহে জননী উচ্ছৃঙ্খল, রাজকুমার প্রপীড়িত, বিদেশে পিতা পথ হারাইয়া

কত যাতনা ভোগ করিতেছেন। টেলিমেকস পিতার অন্বেষণে গৃহপরিবার পরিত্যাগ করিয়া সহচর শূন্য হইয়া পয়োনিধির করাল কবলে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এখন আপনার ও মাতা পিতার দুঃখ যাতনা বিস্মৃত হইয়া মায়াবিনীর আলিঙ্গনে দিনপাত করা কি তাঁহার উচিত হইতেছে? মিনর্ভার মধুর যুক্তিযুক্ত বচনে টেলিমেকসের পিতৃবৎসলতা উছলিয়া উঠিল। কালিপ্সোর গবলালিঙ্গন পরিহার করিয়া সমুদ্রপারে পলায়ন করিতে মনস্থ করিলেন। তরণী প্রস্তুত, পতাকা উড়িতেছে—তখন টেলিমেকস বলিলেন,—মেণ্টর, কালিপ্সো মায়াবিনী রাক্ষসী আমাকে ভুলাইয়া সত্যপথ বিচ্যুত করিয়াছে—কিন্তু জন্মের মত যাইতেছি, আর একবার দেখা করিয়া আসি—নতুবা অকৃতজ্ঞতা হয়।

এ কিসের আকর্ষণ? পিতামাতা পুত্র কন্যা ভগিনী বা দয়িতা সকলি তোমার জন্য বিসর্জ্জন করিতে সাধ হয় কেন? তোমার কিসের আকর্ষণ? কবে যে সোহাগ করিয়াছ, মনে পড়ে না, কিন্তু সে কঠোর ভ্রূভঙ্গী, সে ঘৃণার হাসি, সে নিঃশব্দ উপেক্ষা এখনও হৃদয়ে জাগিয়া আছে—তবুও

এখনও এখনও কেন সে নামে শিহরে প্রাণ।
এখনও হেরিতে তারে কেনরে উছলে প্রাণ॥

আর দেখিব না ভাবিয়াছিলাম। দেখিলেও যাতনা, না দেখিলেও যাতনা। প্রেমে সুখ কোথায়? মিলনে অভিমান ও বিরহের আশঙ্কা। বিরহে কেবল বিরহ। তাই ছুটিয়া ছুটিয়া দেশ বিদেশে গিয়াছিলাম। কিন্তু পারিলাম না। আবার তোমাকে দেখিব—আর একবার দেখিব বলিয়া ছুটিয়া ওদিকে গিয়াছিলাম—কিন্তু আর যাওয়া হইল না।

আমার মত যাতনা আর কি কেহ পাইয়াছে? আমার মত সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া কি কেহ প্রাণের ভিখারী হইয়াছে? লোকের যাতনায় চোখের জল পড়ে, আমার চোখের জল পড়ে না—লোকে হাহুতাস করে, আমার তাহাও নাই। লোকে বিষ খায়, আত্মহত্যা করে, আমি তাও পারি না। কারণ আমার আশা যায় নাই। তুমি সকলই লইয়াছ সত্য, কিন্তু একটী লইতে পার নাই। আমার প্রাণের ভিতর তোমার যে ছবি আছে, তুমি তাহাত লইতে পার নাই।

হস্তং নিক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতং
হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামিতে॥

আমি অন্ধ—আমার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে এ আর একটা বাহাদুরী কি? যদি হৃদয় হতে যেতে পার, তবে তোমার পৌরুষ বুঝিব।

যদি সকলই লইলে, তবে ঐটী লইলে না কেন? অবলম্বনহীন হইলে আমি মরিয়া যাইব সত্য, কিন্তু তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? আশা যখন মিটাইবে না, আমার যখন হইবে না, কেবল স্মৃতি পূজা করিতে দিবে, তবে এ আশা হৃদয়ে রাখিতে দিলে কেন? আমাকে কেবল যাতনা দিতে?

বাসনা অবিদ্যা হইতে, শুনিয়াছি। তোমাকে দেখিবার বাসনা কি অজ্ঞানতামূলক? বাসনা হইতে পুনর্জ্জন্ম—জন্ম হইতে জরামৃত্যু—তবে জন্মে জন্মে বাসনা কি কেবল বাসনাই থাকিবে?

এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ
ফুরাইবে
কিম্বা জন্ম জন্মান্তরে এ সাধ মোর পুরাইবে?

আমার বাসনা অবিদ্যাজনিত নহে। আমি যে তোমাকে দেখিয়াছি—

রূপ দেখি ভুলিনু, হৃদে ধৈনু চরণ যুগল।

তুমিও শূন্য নহ, আমিও বাতুল নহি। রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয় নাই। আমার বাসনা অহেতুকী নহে সত্য, অজ্ঞানতামূলকও নহে। স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহা কি অসত্য হয়? বলিবে, রূপ দেখিলেই ভুলিতে হয়? সে কথা বলিতে পার, কিন্তু ভুলগুলিত আমার হাতধরা নহে। আমি যেমন স্বেচ্ছায় দেখি নাই, তেমনি স্বেচ্ছায়ও ভুলি নাই। তুমিই দেখা দিয়াছ, তুমিই ভুলাইয়াছ। লোকে স্বপ্ন দেখিয়া ভুলে, স্বপ্নে উষা অনিরুদ্ধে মজিয়াছিল, আমি তোমাকে দেখিলাম, দেখিয়া চাহিয়া রহিলাম। আমি অজ্ঞান? না। বৌদ্ধ আচার্য্য ভুলিয়াছিলেন, সকল বাসনার প্রসূতি অবিদ্যা নহে। প্রেমের শিক্ষা সিদ্ধার্থের লাভ হয় নাই। নিদ্রিত কুশাংগরাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতে যে পারে, সদ্যজাত রাহুলের রাতুল মুখচ্ছবি দেখিয়া যে বলিতে পারে, "স্বর্গের বিহঙ্গ তুমি স্বর্গে যাও চলিয়ে" সে আর সব শিখিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু প্রেম শিখে নাই।

তবে বাসনা মিটে না কেন? এখনও প্রেমের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। যে বাসনা মিটাইতে চায়, সে ভালবাসিয়াই সুখী নহে। যে ভালবাসিয়াই সুখ পায়, সে কেবল প্রিয়তমের সুখ কামনা করে। আপনার সুখ চাহে না। নব প্রেমিকা আদান প্রদানের অভিলাষিণী।

ওথেলো বিষম ক্রোধে দেস্‌দিমোনার প্রাণবধ করিলেন। মৃত্যুকালে সখী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সখি, কে এমন করিল? মিথ্যা কহিয়া নরকে প্রবেশ করিবেন, তাও স্বীকার, তথাপি যুবতী স্বামীর, নারীহন্তা স্বামীর কেশাগ্র কলঙ্কিত না হয়, এ জন্য বলিলেন—এমিলি, আমি নিজেই করিয়াছি।

রাধিকা কৃষ্ণ বিরহে পাগলিনী—তাঁহার দুঃখে শুক শারী, ময়ূর ময়ূরী, গোপ গোপিনী সকলেই কাতর। অভিমানিনী বৃন্দা সখীর যাতনায় কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিষ্ঠুর, অপ্রেমিক, স্বার্থপরায়ণ, * কত কি বলিয়া গালাগালি দিলেন। রাধিকা চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন তাঁহার প্রিয়তমের নিন্দা তাঁহার সহিল না—সে নিন্দার কাছে তাঁহার দুঃখ অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল। তিনি দুঃখ ভুলিয়া সখীকে বুঝাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন সত্য, তাহাতে রাধিকার কষ্ট হইতেছে, সে রাধিকার দোষ। কৃষ্ণের তাহাতে দোষ নাই। রাধিকা যদি যথার্থ প্রেমিকা হইত, তাহা হইলে কি তাঁহার বিরহ থাকিত? হৃদয়ে কৃষ্ণ, বাহিরে কৃষ্ণ,—রাধা প্রেম শিখে নাই, তাই তাহার কষ্ট। রাধা কৃষ্ণপ্রেমের উপযুক্ত নহে—কুব্জার সঙ্গে যোগ্য মিলন হইয়াছে—

কুব্জা—রাজকুলসম্ভবা, সরসীরুহ সৌরভা
যোগ্যজন মিলল যোগো,
রাধা—গ্রাম্য গোপবালিকা, তুহুঁ পহু পালিকা
হাম কিয়ে শ্যাম সম ভোগো।
তাবত অলি গুঞ্জরে যাই ফুল ধুতুরায়ে
যাবত ফুল মালতী নাহি ফুটে।

রাধা সপত্নী নির্য্যাতন বিস্মৃত হইলেন—কুব্জা মালতী ফুল, রাধা ধুতুরা—মালতী ফুটিলে অলি কেন ধুতুরাকে আদর করিবে। ধুতুরার ধৃষ্টতা, সে যদি মালতীর সোহাগ আকাঙ্ক্ষা করে।

এখনও প্রেম শিখি নাই—তাই তোমাকে দেখিতে চাই, কাছে পাইতে চাই। জন্ম-জন্মান্তরে যখন শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে, তখন এ পিপাসা মিটিবে—এ জন্মে আর হইল না!—২১-১-৯৭।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

অর্ঘ্য।

সুকবি শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-
করকমলে।

নহ তুমি মহাপ্রাণ, শুধু নামে কবি,
আঁকনি দেখাতে শুধু মহত্বের ছবি!
সার্থক গো কবি শব্দ তোমাতে মহৎ,
কি সুন্দর সামঞ্জস্য সঙ্গতি শাশ্বৎ
তব প্রতি বাক্যে কার্য্যে, অন্তরে বাহিরে—
মহত্ব রাখনি বদ্ধ শব্দের প্রাচীরে।
হে সৌম্য, তোমার স্নিগ্ধ সরস মধুর
বিশ্রব্ধ আলাপে—চিত্ত ক্ষোভ হয় দূর।
বিনয়ের অবতার—বালক-সুলভ
সারল্যে বর্দ্ধিত তব কবিত্ব-গৌরব!
দরিদ্রের দুঃখে দ্রব তব চিত্ত-ভূমি—
কবিত্ব পূর্ণত্ব যাহে লভিয়াছে গুণি!
তাই তব গুণমুগ্ধ দীন নিরাশ্রয়—
কবি সঁপিতেছে অর্ঘ্য—ধর সহৃদয়!

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

"মনোরমা।"

কানাড়া মিশ্র—ঠুংরী।

রূপ উজলি' উছলি' খেলে রে—
চারু-অঙ্গে, রঙ্গভঙ্গে, তরঙ্গে তরঙ্গিত রে।
(কভু) দলমল ঢলমল কমলের দল,
(কভু) হরিণীর চঞ্চলতা—মধুর কোমল;
(কভু) বালিকা-রূপিণী, (কভু) যুবতী
কামিনী
(যেন) প্রফুল্ল কুসুমভরে লতার দোলনি;
(কভু) গম্ভীরা প্রৌঢ়া সীমন্তিনী রে,
(কভু) পাগলের বেশধরা—পাগলিনী রে।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সঙ্কলিকা।

(৮)

দ্বিতন্ত্রী-শাসন প্রতিষ্ঠার যে আয়োজন হইতেছে, আমরা তাঁহার পক্ষপাতী নহি। এবার রাউলাট-বিলের আন্দোলনে প্রতিপন্ন হইয়াছে, এ দেশবাসীর কোন কথা খাটিবে না। তদুপরি, শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে সকলেই জানেন, যে কোন ব্যবস্থা লাট সাহেব পণ্ড করিয়া দিতে পারিবেন,—তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা থাকিবেন। ইহাতে দেশের যে কি মঙ্গল হইবে আমরা বুঝিতে পারি না। তদপেক্ষা এখন যেমন আছে, তাহাই চলুক, আমরা আইন মানিয়া, শাসন-নিরপেক্ষ হইয়া, আত্মোন্নতি করিতে থাকি। সময়ে যাহা হয় হইবে। বন্ধু, তুমি কি বল?

(৯)

স্বদেশবাসীই বল, বিদেশবাসীই বল, সুষুপ্ত গণতন্ত্রের অভ্যুত্থান না হইলে, কেহই অত্যাচারের মাত্রা কমাইতে পারিবেন না। এখন দেখ না, মিউনিসিপালিটীতে, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডে বা আমলা-মহলে কি হইতেছে? দেখ না কি, দেশীয় পুলিস এবং দেশীয় ডিটেকটিভগণ কি করিতেছেন? দেখ না কি, আমাদের অনিষ্ট আমরাই করিয়া থাকি? যাঁহারা পা-চাটায় সিদ্ধ, তাঁহারা গোয়েন্দাগিরিতেও পটু। তাঁহাদের প্রধান কাজই তুষ্টিকরণ। তুষ্টিকরণের অর্থই—খোসামোদ ও ঘরের কথা প্রকাশ করা। আমাদের দোষ বলিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হন। সুতরাং অধিক

পরিমাণে, যাহারা এই কার্য্যে ব্যাপৃত, তাহারাই তুষ্টিকরণে সিদ্ধ। তোমরা বল, দেশের গতি ফিরিয়েছে, কিন্তু আমরা বলি, ভারত আরো তিমিরে ডুবিতেছে।

(১০)

এক হাত কাণে, এক হাত পায়ে, একই সময়ে এই দুমুখী নীতি চলিতেছে। ইহার দৃষ্টান্ত—মার্শাল-ল-প্রচলন এবং শাসন-সংস্কারের আয়োজন; এরোপ্লেন হইতে বোমা-নিক্ষেপণ এবং নানাবিধ ঘোষণা-প্রসারণ; অস্তরীণ এবং উপাধি-বর্ষণ; সাহিত্য-বাজেয়াপ্তকরণ ও আশা-বাণী-প্রচারণ; জেলে প্রেরণ এবং সদস্য-গ্রহণ; নানা উপায়ে অর্থ-সংগ্রহণ ও সহাস্য-বদনে করমর্দ্দন ও ধন্যবাদ অর্পণ এবং অনাহারে পীড়ন ও দুর্ভিক্ষে সাহায্য-প্রক্ষেপণ! আমরা দেখিয়া শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছি। তাঁহারা চেষ্টা করিলে সকলেরই প্রতিবিধান করিতে পারিতেন। এই যে মূলধনের অভাবে ব্যবসা বাণিজ্য অন্যের হাতে যাইতেছে, তাহা রক্ষা করিতে পারিতেন এবং শস্য রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেশ বাঁচাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা করা যেন ধর্ম্ম নয়! ইহারই নাম নাকি রাজনীতি? হায় রে হায়!!

(১১)

শ্রীযুক্ত মালব্য-মহোদয় সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া আবার মনোনীত হইয়াছেন! শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র আর নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী নন্। তাঁহার মত এই, যাহা গিয়াছে, তাহা যাক্, যখন কিছু করার উপায় নাই, তখন আর সদস্যগিরিতে কি হইবে? শ্রীযুক্ত শঙ্করণ নায়ারের মন্তব্যে এ দেশের অবস্থা বেশ ঘোষিত হইয়াছে। লর্ড সিংহ মন্ত্রী সভায় থাকিতেই ত পাঞ্জাবের এইরূপ অবস্থা হইল! তোমরা বল, আশা আছে, আমরা দেখি, শুধু নিরাশা চতুর্দ্দিকে খেলিতেছে! সত্য কেবল ইহাই যে, সিংহ-মহোদয় লর্ড হইয়াছেন এবং পনর লক্ষ টাকা জমা দিয়া বংশানুক্রমিক লর্ডের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন! তিনি ভারতের কি করিলেন? মিঃ বসুই বা কি করিলেন? তাঁহার নব-উপাধি প্রাপ্তির বিলম্ব কত? উপাধিটা পাইলেই ঘুমাইয়া পড়িতে পারেন, বৃথা হৈ-চৈ কচকচিতে আর প্রয়োজন কি? জলে জল, তেলে তেল মিশিলেই হইল। অবস্থা-বিপর্য্যয় দেখিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বড় সাধের উপাধি পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পদ-ত্যাগের পত্রখানি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, তাঁহাকে উপাধি গ্রহণ করিতে কে বলিয়াছিল? শুনি-য়াছি, উপাধি প্রাপ্তির সময় আগরতলার শ্রীযুক্ত কর্ণেল মহিম ঠাকুর শোক-সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং উপাধিত্যাগের সময় আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। "যে আপনি আসে, তাহাকে আসিতে দাও"—মাংসাশী বৈরাগীর এই নীতি-পথে রবীন্দ্রনাথ না চলিলেই ভাল করিতেন। উপাধি দিয়া তাঁহারা দলভুক্ত করিয়া মুখবন্ধ করিতে চাহেন, এ কথা তিনি জানিতেন নাকি? উপাধির জন্য শত সহস্র লোক লালায়িত বলিয়াই ত ইংলিশম্যান গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন, নচেৎ কি কিছু বলিতে পারিতেন? যে আকর্ষণে মৎস্যেরা এবং পক্ষীরা ভোলে, সেই আকর্ষণেই মানব-সন্তানেরা ভুলিয়া মরণের পথে ধায়। হায়, ইহার প্রতিকার কোথায়! যাহা হউক, অবশেষেও যে রবীন্দ্রনাথ সতর্ক হইয়া স্বদেশের দলে ফিরিয়া আসিতে পারিলেন, ইহাতে আমরা যারপরনাই সুখী হইয়াছি।

আবার মত পরিবর্ত্তন না হইলে হয়! স্যর পি. সি. রায় কি করিবেন? আমরা রবীন্দ্রনাথকে আমাদের হৃদয়ের দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। বিধাতা তাঁহার মঙ্গল করুন।

(১২)

শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায় এবং অন্যান্য স্বদেশ-সেবকদের জন্য আমরা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। ইহা যেন পারিবারিক দুর্ঘটনা— আমরা মর্ম্মে মরিয়া রহিয়াছি,—নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতেছি এবং বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। এ দেশে কাহারও অবস্থা নিরাপদ নয়। হায় বিধাতা, কি দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিল!

(১৩)

দেশের চতুর্দ্দিকে হাহাকার—দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী করাল বদন বিস্তার করিয়া নর-নারীকে গ্রাস করিতেছে!! প্রায় কোটী লোক মহামারীতে গিয়াছে—অবশিষ্ট অনা-হারে প্রাণ দিতে বসিয়াছে! সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজ, রামকৃষ্ণ-মিসন, বাঁকুড়া-সম্মিলন, ব্রাহ্মণবেড়িয়া সমিতি, বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলী, বামা-মিসন—যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। এই সকল সভা-সমিতির কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। সাধারণ-ব্রাহ্ম সমাজ সেবকের জন্য তত্ত্বকৌমুদীতে ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। লোক পাইলে তাঁহারা গ্রহণ করেন কি? বর্দ্ধমান-প্লাবনের সময় বেঙ্গলি-আফিসে যে সভা হইয়াছিল, সেখানে অনুরুদ্ধ, আহূত এবং সৎকার্য্যে আকর্ষিত ব্যক্তিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়, সকলের অগ্রতে, অপমান ও অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন কেন? অগ্রাহ্য ও অপমানিত হইবার জন্য লোক আসিবে কেন? প্রচারক-পদপ্রার্থী-দিগকে অগ্রাহ্য করার পর যেমন আর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উপযুক্ত প্রচারক আসি-তেছে না, এ কাজেও, তেমনি, আর কর্ম্মদক্ষ ও পরিপক্ক লোক আসিতে পারে না। তবে সখের সুখ-সেবক লোকের, স্বেচ্ছা-ভোজপ্রার্থী সেবকের অভাব কখনও হয় নাই, কখনও হইবে না। বহু গ্রাম হইতে প্রকৃত অন্নক্লিষ্টদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সাহায্য করা বড়ই শক্ত কাজ। নগেন্দ্রনাথ-নবদ্বীপচন্দ্র-আদিনাথ-প্রমুখ প্রচারকগণের চেয়ে ভাল প্রচারক আর সমাজ পাইয়াছেন কি? তবে কেন তখন বিমুখ হইয়াছিলেন? এখনও, তাই, উপযুক্ত কর্ম্মঠ সেবার লোক পাইতেছেন না! ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসু, শ্রীযুক্ত রাজমোহন দাসের ন্যায় কর্ম্মদক্ষ লোক স্বাধীন ভাবে কত সৎকাজ করিতেছেন। কেন তাঁহারা সমাজের অধীন হইয়া চলেন না? প্রতিভার তাপ সমাজের লোকদের সহ্য হয় না। নচেৎ, গণেশচন্দ্র, রামকুমার, বিজয়-কৃষ্ণ, শিবনারায়ণ, মনোরঞ্জন, চণ্ডীকিশোর, বিপিনচন্দ্র, লছমনপ্রসাদ প্রভৃতি তাড়িত হই-তেন না। সকলের এ সম্বন্ধে চিন্তার প্রয়ো-জন। অভাবগ্রস্ত সুখ-সেবকদিগের দ্বারা কখনও কোন মহৎ কাজ হয় নাই, কখনও হইবে না। রামকৃষ্ণ-মিসন ও বামা-মিসনের সেবকদিগকে দেখ—চক্ষু জুড়াইবে। বিধাতা তাঁহাদের সহায় হউন।

(১৪)

আমরা সমাজ-সংস্কার-সমিতির অনুষ্ঠান-পত্র পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। উদ্দেশ্য—হিন্দু জাতির সংরক্ষণার্থ হিন্দু-সমাজের সংস্কার সাধন। এত দিনে এদেশে অতি মহৎ কাজের

অনুষ্ঠান হইল। এরূপ অনুষ্ঠান এ দেশে আর হয় নাই। বিধাতা আশীর্ব্বাদ করুন।

(১৫)

রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর—জন্ম শোভাবাজার,১৮৫০ খ্রীঃ ১৭ই ফেব্রু ; মৃত্যু—৯ই এপ্রেল, ১৯১৯। পিতার নাম নসিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রথমত আহিরীটোলা বাঙ্গালা পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। তৎপর সংস্কৃত কলেজে জুনিয়ার ও সিনিয়ার পরীক্ষায় বৃত্তি পান। তৎপর প্রবেশিকা পরীক্ষায় ২য় স্থান, এফ-এ পরীক্ষায় ৪র্থ স্থান ও বি-এ পরীক্ষায় ৩য় স্থান অধিকার করেন। সকল পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পান। ১৮৮৩ খ্রীঃ এম-এ পরীক্ষায় সুবর্ণপদক ও পারিতোষিক পান। ১৮৮৫ খ্রীঃ রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় ৮০০০৲ পান। তাঁহার ন্যায় ইংরাজি-শিক্ষিত সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি এ দেশে বিরল। এম্-এ উত্তীর্ণ হইয়া বেঙ্গল-গবর্ণমেণ্ট-অনুবাদক-আফিসে অস্থায়ী ভাবে কাজ করেন। তৎপর সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত সাহিত্য ও অলঙ্কারের অধ্যাপক হন। তৎপর ৪০০৲ টাকায় লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজের অধ্যক্ষ হন। তৎপর পুনরায় সংস্কৃত কলেজে আসেন। তৎপর বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক আফিসে সহকারী অনুবাদক ও কিছুদিন লাইব্রেরিয়েনের কাজ করেন। তৎপর প্রধান অনুবাদকের কাজ ও রায় বাহাদুর উপাধি পান। তৎপর অবসর গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক হন। তিনি ভারতের সমাজ স্থিতি, প্রাচীন ভারতের কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন। ন্যায়দর্শনের "ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থের" সুন্দর অনুবাদ করেন। একখানি আদর্শ বাঙ্গালা অভিধানের আয়োজন করিতেছিলেন, কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। সাহিত্য-পরিষদের ৪ বৎসর সম্পাদক ছিলেন। সাহিত্য সভার অন্যতম স্রষ্টা—এবং শেষ পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন। তিনি বিশ বৎসর টেক্স্ট-বুক-কমিটির সভ্য ও পণ্ডিত সভার সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি পরোক্ষভাবে সংস্কৃত বোর্ডের স্রষ্টা এবং বোর্ডের কলিকাতাস্থ প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি নির্ভীক, স্বাধীন-চেতা, দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একজন আদর্শ হিন্দু ছিলেন। তিনি স্বীয় প্রতিভা-বলে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইয়াছিলেন। তাঁহার তিরোধানে বাঙ্গালার যে অভাব হইয়াছে, তাহার পূরণ হইবে বলিয়া আশা নাই। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারে শোক-সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

(১৬)

অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—জন্ম—৫ই ভাদ্র ১২৭১ ; মৃত্যু ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী এই—

"১২৭১ সালে ৫ই ভাদ্র তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী। রামেন্দ্রসুন্দর প্রথমে গ্রাম্য পাঠ-শালায় ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়া কান্দি ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। এই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁহার ছাত্র-জীবনের তুল্য গৌরব-মণ্ডিত ছাত্র-জীবন বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। একমাত্র এফ-এ পরীক্ষা ছাড়া আর কোনও পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নাই। এফ-এ পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে ;—এ পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধি-

কার করিয়াছিলেন। তারপর বি-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানের অনারে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে এম-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞান-বিষয়েও তিনি প্রথম হইয়াছিলেন। তারপর ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা-সমূহের কণ্ট্রোলার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসুর সহিত তিনি একত্রে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তাঁহার সতীর্থদিগের মধ্যে শুধু অবিনাশচন্দ্র নহেন, —অধ্যাপক জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য এবং পরলোকগত ই. এম. হুইলারের নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা কয়জনই রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-বৃত্তিধারী হইয়াছিলেন।

গৌরবপূর্ণ সমুজ্জ্বল ছাত্র-জীবন শেষ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর ঠিক ২৭ বৎসর পূর্ব্বে রিপণ কলেজের অধ্যাপক হন। পরে এ কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। রিপণ কলেজ তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। বহুস্থান হইতে বহুবার তাঁহাকে লোভনীয় পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল, তথাপি রিপণ কলেজকে তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ভুলিবার নহে। পরিষদের জন্মকাল হইতে তিনি বরাবর তাহার সেবা করিয়া আসিয়াছেন। সেবক হইতে তিনি পরিষদের সভাপতি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। অল্প দিন পূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে পুনরায় নির্ব্বাচন হইয়াছিল।

তিনি বেশী লিখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা মূল্যবান। তাঁহার ভাষার তুল্য সুমিষ্ট ভাষা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। জন ষ্টুয়ার্ট মিল যেমন স্যর উইলিয়ম হামিল্টনের ভাষা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, এ রকম লেখা লিখিতে সুখ হয় বটে, কিন্তু আশা-ভঙ্গের মনস্তাপই ভোগ করিতে হয়। আমাদেরও তেমনই রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষা-ভঙ্গী দেখিয়া সেই কথা মনে পড়ে।

দর্শন সম্বন্ধে মৌলিক আলোচনা বাঙ্গালায় অল্পই দেখা যায়, রামেন্দ্র বাবুর রচনা সেই 'অতি অল্পে'রই অন্তর্ভুক্ত। তিনি অতি কঠিন বিষয়ও অতি সহজ ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া লিখিতে পারিতেন

চরিত্রের মাধুর্য্যে, হৃদয়ের ঔদার্য্যে, পাণ্ডিত্যে ও বুদ্ধিমত্তায় তিনি আদর্শস্থানীয় ছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু ঘটে। তিনি পত্নী ও একমাত্র কন্যা রাখিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা এই শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।"

ত্রিবেদী মহাশয় ঋষিতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। যিনি তাঁহার সংসর্গে আসিতেন, তিনিই মোহিত হইতেন। আমরা তাঁহার বিয়োগে গভীর শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়াছি। বাঙ্গালা-সাহিত্য নেতা-শূন্য হইলেন। বিধাতার মহা ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

(১৭)

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা—জন্ম—লতা, বরিশাল, শ্রাবণ, ১২৬৭; মৃত্যু, গিরিধি ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬।

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা এই দেশের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি যে কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, তাঁহার তুলনা কেবল তাঁহার গুরু ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়। তাঁহার পত্নী তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। তাঁহার তিরোধানের পর তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। পত্নী মনোরমার জীবন-কাহিনী শেষ করিবার জন্যই যেন তিনি জীবন ধারণ করিতেছিলেন। অল্প-দিন পূর্ব্বে তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে—তিনিও প্রস্থান করিলেন। তাঁহার কুম্ভমেলা ও

মনোরঞ্জনের জীবন-চিত্র বাঙ্গালা ভাষার অপূর্ব্ব গ্রন্থ। তিনি কিছু দিন দৈনিক "নবশক্তি" ও মাসিক "বিজয়া"র সম্পাদক ছিলেন। সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখিতেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মিণ্টোর সময়ে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। পত্নীর জীবন-চিত্রে তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। তাহা এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভক্তি বিশ্বাসের জলন্ত চিত্র।

বরিশালের প্রধান ব্যক্তি অশ্বিনীকুমার দত্ত, দ্বিতীয় ব্যক্তি মনোরঞ্জন। মনোরঞ্জন মিষ্টভাষী, সুবক্তা, সুলেখক ছিলেন। তাঁহার নির্ব্বাসন প্রকাশ করিয়াছে, তাঁহার ন্যায় দেশভক্ত এদেশে অধিক নাই। নির্ব্বাসন হইতে আসার পর অনেকের মত-পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু জীবনের শেষ পর্য্যন্ত মনোরঞ্জনের তাহা হয় নাই। আমরা জানি, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া অনেকে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিলেন! তিনি কঠোর সংযমী পুরুষ ছিলেন। হিংসা বিদ্বেষ তাঁহার হৃদয়ের ত্রিসীমায় পৌঁছিতে পারিত না। বোধ হয়, শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পর মনোরঞ্জনের ন্যায় অকৃত্রিম বিস্ময়-ভক্ত এদেশে আর নাই। গুরুভক্তি ও দেশানুরাগে তিনি যেন বিবেকানন্দ ছিলেন। সেদিনও তাঁহার প্রবন্ধ ও পত্র পাইয়াছি। তখন ভাবি নাই যে, তাঁহাকে এত অল্প দিনের মধ্যে হারাইব। তাঁহার বিয়োগে আমাদের হৃদয় প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এমন প্রিয়দর্শন সহৃদয় বন্ধু এ জগতে প্রকৃতই হৃদয়ের বল ও বৃদ্ধি।

মনোরঞ্জন একজন প্রকৃত ভক্ত ছিলেন। তাঁহার জীবনের এমন অনেক নিগূঢ় কথা আমরা জানি, তাহা ব্যক্ত করিলে অতি সুন্দর আলেখ্য হয়। আজ আর তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কথা লিখিতে পারিলাম না—কেননা প্রাণ বড় অস্থির। বিধাতা যদি সময় দেন, তবে বাসনা পূর্ণ করিব। বিধাতা তাঁহার ভক্ত পুত্র কন্যাদিগকে সান্ত্বনা দিন।

(১৮)

উড়িষ্যার আটমল্লিক এবং বোধের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান মহাত্মা জগন্নাথ রাও ৩০শে মে, শুক্রবার, ১৯১৯, কটকে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। জগন্নাথ ঋষিপ্রতিম মধুসূদন রাওয়ের সহোদর, পুণ্যশ্লোক রঘুনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। জগন্নাথ একজন দেশানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। মধুসূদনের অনেক সৎগুণ তদীয় চরিত্রে প্রস্ফুট হইয়াছিল। তাঁহার অমায়িকতা, বন্ধু-বাৎসল্য, ধর্ম্মানুরাগ, পরদুঃখকাতরতা, দেশানুরাগ আমাদের আদর্শ। তাঁহার তিরোধানে আমরা যারপর নাই বেদনা পাইয়াছি। বিধাতা তাঁহার পরিবার ও আমাদের সহায় হউন।

(১৯)

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা-নিবাসী ও ভাগলপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর সরকার এম-এ, বি-এল মহাশয়, গত ২রা জুন, (১৯১৯) সোমবার, রাত্রি ৪॥০ ঘটিকার সময় ৬২ বৎসর বয়সে, পরলোক গমন করিয়াছেন। ভাগলপুরে ৩৬ বৎসর ওকালতী করিয়া বেহারের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীব হইয়াছিলেন। মেদিনীপুর স্কুল যে বৎসর প্রথম কলেজে পরিণত হয়, তিনি সেই বৎসর মেদিনীপুর কলেজ হইতে এল-এ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া কলেজের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বি-এ, এম-এ, ও বি-এল, পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর কলেজ-হলের মেড্যাললিষ্টে আজ পর্য্যন্ত তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। তিনি বেহার-নিবাসী বাঙ্গালীগণের নেতা ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির কার্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মিষ্টভাষিতা, সরলতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির গুণে তিনি বেহারের জনসাধারণের আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার সম্মানার্থ স্কুল, কাছারী বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবান তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে শান্তি দান করুন।

তোমরা আর আমরা।

গালি দেওয়া ফ্যাসান।—আজকাল কি বিলেতে, কি ভারতবর্ষে, আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অকথ্য কুকথ্য ভাষায় গালাগাল দেওয়া তোমাদের মধ্যে—কতকগুলো ইংরেজের মধ্যে—একটা ফ্যাসন দাঁড়িয়ে গেছে। তোমরা কোন উপকার করিতে পারও না, আর করতে চাও-ও না। তোমাদের মন্ত্র হচ্ছে—ভাল করতে পারব না, মন্দ করব, কি দিবি তা দে। তোমরা ভোমরার মতো খুব জোরে বোঁ বোঁ আওয়াজ করে ভীরু লোকদের ভয় দেখাতে পার, আর আমাদের দেশের প্রাণে বড় বড় ছেঁদা করে বাসা বাঁধতে পার।

সহজে বড়লোক হতে চাওয়া।—সহজে বিনা আয়োজনে বড়লোক হোতে চাওয়া অর্থাৎ cheap notoriety কেনবার চেষ্টা ছাড়া আমাদের উপর তোমাদের এ রকম গালাগাল দেওয়া অভ্যাস করবার অন্য কোন কারণ তো আমরা খুঁজে পাইনে। আজকাল নানা কারণে আমাদের দেশের উপর তোমাদের দেশের একটু নজর পড়েছে—তা সে নজর ভালই হোক আর মন্দই হোক, বেশীই হোক আর কমই হোক। সেই কারণে যদি তোমরা কেউ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা কথাও বল্লে, তো অমনি তোমাদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল—শোন—শোন, India সম্বন্ধে কি বলছে শোন। তার উপর যদি আমাদের ছবি তোমরা বিদ্রোহী বা বিপ্লববাদীর আকারে এঁকে দেখাও, তা হলে তো কথাই নেই—বিলেতশুদ্ধ লোক ভয়ে তটস্থ হোয়ে তোমাদের কথাগুলো gospel truth মনে করে গিলতে থাকেন। সেপাই বিদ্রোহের কথা তাঁরা আজও ভুলতে পারেন নি কিনা, তাই তাঁরা কথায় কথায় চমকে উঠেন, ভাবেন—বুঝি সেপাই-বিদ্রোহ, মিউটিনি আবার জেগে উঠল। তাঁরা ভাবেন—'তাই ত, ভারতবর্ষের লোকেরা যে এত দুষ্টু তা ত আমরা আগে জানতুম না; আমরা ভেবেছিলুম, সেপাই মিউটিনির পর India একেবারে জল—ঠাণ্ডা হোয়ে গিয়েছিল; এখন দেখছি তা নয়। ভাগ্যিস, এই সমস্ত সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতলোক জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তো তাঁরা অশিষ্ট ভারতবাসীদের সমস্ত দুষ্টুমি ধরতে পেরেছেন, নইলে তো আমাদের কামধেনু ভারতবর্ষ একেবারেই আমাদের হাতছাড়া হোয়ে গিয়েছিল আর কি!' তোমরা তোমাদের দেশের লোকগুলোকে এই রকম মিথ্যা ভয় দেখিয়ে জীববিশেষে পরিণত করাতে কাজেই তোমাদের উপর তোমাদের দেশের নজরটা কিছু বেশী পড়ে যায়, আর তোমরা তোমাদের নিজেদেরও দৃষ্টিতে হঠাৎ মস্তলোক হোয়ে যাও; তখন আবার আমাদের উপর ডবল করে গাল দেবার জন্য তোমরা আস্তিন গুটিয়ে বসো।

আমাদের অধৈর্য্য।—তোমাদের বড় লোক করে তোলবার পক্ষে আমরাও বড় কম সাহায্য করিনে। তোমাদের চিমটিকাটা গালাগাল খেয়ে আমরা অধীর হোয়ে উঠি, আর সেই অধৈর্য্য প্রকাশ করে তোমাদের উপর আমাদের দেশেরও নজর টেনে আনি। তখন আমরা চিমটী খেয়ে লাফাতে থাকি দেখে

তোমরা আরও বেশী করে গালাগাল দিতে থাক, আর আমাদের লাফানি দেখে আমোদ পেতে থাক। বিলিতি ধরণের শিক্ষার ফলে আমরা একটু বেশী রকমের রাজনীতি-ঘাঁটা লোক হোয়ে পড়েছি, তাই আমরা বিলিতি রাজনীতির দস্তুরে তোমাদের ঐ সমস্ত অকথা কুকথা শুনলেই খুবই অধীর হোয়ে উঠি—আর অধৈর্য্য প্রকাশ করি। আমরা বিলিতি ধরণে ভাবি যে, আমাদের দুচারটী বক্তৃতার বলে বা প্রবন্ধের জোরে তোমাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিতে পারলেই রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমাদের একটা আসল কাজ হোয়ে গেল। হায়! আমরা এখনও বুঝলুম না যে, ভোমরার কালো রং সাদা করা যায় না, আর তাদের বোঁ বোঁ আওয়াজও বন্ধ করা যায় না।

দাস জাতি ও রাজনীতি।—রাজনীতি-ক্ষেত্রে কাজের কথা আমরা বলে এলুম বটে। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে কাজের কথা বল্লেই আমাদের বুকের ভিতর সুবিজ্ঞ আশুতোষের একটী সত্যবাণী চড়াং করে বেজে ওঠে। একবার একটা বক্তৃতায় (বর্ত্তমানে মাননীয় জষ্টিস) শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের মুখ থেকে এই ভাবের একটী অমূল্য সত্যবাণী বেরিয়ে পড়েছিল যে, দাস জাতির রাজনীতি বলে কোন পদার্থ থাকতে পারে না—A subject nation has no politics—কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে আমার মনে নেই। এই সত্যবাণী ভাবের ঘরে ঘরে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা উচিত। এই সত্যবাণী হৃদয়ে রেখে আমাদের জ্ঞানধর্ম্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু এই সত্যবাণী আমরা খুব অল্পদিনের ভিতরেই ভুলে গিয়ে রাজনৈতিক দু'একটা হাড়ের লোভে আমরা আপনারাই কামড়াকামড়ি করে মরতে প্রস্তুত হয়েছি। এই সত্যবাণী আমরা যে এত শীঘ্র ভুলে বসব তা তো মনেই করতে পারি নি। না—না—এ রকম মনে না করাই যে আমাদের ভুল। এই কথাটী মনে রেখে কাজ করলে আমাদের যে আসল খাঁটি ভাল হবে, মুক্তি হবে, কাজেই আমাদের মতো দুর্ভাগা জাতি সে কথা ভুলবে না তো কি করবে? বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ভাষায় বলতে ইচ্ছা হয় যে, যখন দেখি যে, আমরা এই সত্যবাণী ভুলে গিয়ে নিষ্ফল রাজনীতির শুষ্ক মরুভূমিতে হৈ চৈ করছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি; যখন দেখি যে, আমরা পরস্পরে মিলেমিশে আসল উন্নতির দিকে না এগিয়ে গিয়ে, শুষ্ক বা রসালো দু'একটা হাড়ের জন্য পরস্পরকে কামড়ে ছিঁড়ে খেতেও প্রস্তুত হয়েছি; আর যখন দেখি যে, চারদিকে শত্রুপক্ষ আমাদের ঘিরে সেই বিবাদে ঝগড়ায় নানা রকমে উৎসাহ দিচ্ছে, আর আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে মুচকে মুচকে হাসছে, অথচ সেই উপহাসের হাসি আমাদের নজরেই পড়ছে না, তখন আর আমাদের জয়াশা কোথায়?

অধৈর্য্য অনাবশ্যক।—যাই হোক, এখন তো আমরা রাজনৈতিক বিকারগ্রস্ত হোয়েই পড়েছি; আর সেই জন্যই তোমাদের কথাগুলো যে নিছক গালাগাল আর মিথ্যা কথায় ভরা, সেই কথা খবরের কাগজে এতে-তাতে প্রমাণ করবার জন্য ছুটে ছুটে বেড়াই, আর তার জন্য কালী কলম কাগজ অর্থ ও শক্তির অনেক অপব্যয় করি। আমার নিজের বিশ্বাস, এতে আমাদের উদ্দেশ্য সত্যিসত্যি সিদ্ধ হয় না, বরঞ্চ এ রকমে হিতে বিপরীত হয়। আমাদের মধ্যে

হয়তো কেউ কেউ বলবেন যে, আমরা চুপ করে থাকলে সমস্ত ইংরেজ জাতি যে ধরে নেবে যে, ঐ নিন্দুক ইংরেজদেরই সমস্ত কথা ঠিক, আর ভারতবাসী আমরা বড়ই বদমায়েস। যদি ইংরেজ জাতি অন্যায় করে আমাদের বদমায়েস বলে ঠাওরায়—ঠাওরা-লেই বা। আমরা যদি সত্যিসত্যি বদমায়েস না হই, তা হলে তাঁদের অভিশাপ আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না; তারা আপনারাই ক্রমে বুঝতে পারবে যে, আমরা বদমায়েস নই। তখন তারা নিজেদের দেশের লোক-দেরই বদমায়েসী বুঝে নিজেরাই লজ্জিত হবে।

এই রকম মিথ্যা নিন্দাবান্দার প্রতিবাদ করতে দৌড়নো, গালাগালিতে অধৈর্য্য প্রকাশ করা, আমাদের দেশের প্রাণ বা genius এর বিপরীত। শত শত বৎসর ধরে ইউরোপে যেমন বহির্বিজ্ঞানের উপর খুবই ঝোঁক দেওয়া হয়েছে, বাহিরের আইন কানুনের উপরই বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়েছে, সেই সমস্ত নিয়েই অনেক আলোচনা মারা-মারি কাটাকাটি হয়ে গেছে; আমাদের দেশে তেমনি হাজার হাজার বৎসর ধরে ধর্ম্মবিজ্ঞানের উপরই বলতে গেলে সমস্ত ঝোঁকটাই দেওয়া হয়েছে, তাই নিয়ে অনেক —অনেক আলোচনা মারামারি কাটাকাটি হোয়ে গিয়ে, আমাদের আহার-বিহার থেকে নিদ্রা পর্য্যন্ত সমস্তই ধর্ম্মের উপরেই দাঁড় করানো হয়েছে। তার ফলে আমাদের সমাজের উঁচু থেকে নীচু পর্য্যন্ত সমস্ত স্তরেই ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের মোটামুটি কথাগুলো সকলেই একরকম জানে—তারই উপর আমাদের সমাজের প্রাণটা গড়ে উঠেছে বল্লেও চলে। সেই সমস্ত কথার মধ্যে একটী প্রধান কথা হচ্ছে এই যে, মিথ্যা নিন্দাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখবে, গ্রাহ্যের মধ্যেই আনবে না। আমাদের দেশের আপামর সাধারণের মনের ভাব এই যে, সত্যের নিশ্চয়ই জয় হয়, সুতরাং মিথ্যা নিন্দার প্রতিবাদ করবার বিশেষ কোন দরকার নেই—মিথ্যা নিন্দা আপনার আগুনে আপনিই জলে পুড়ে ভস্ম পাবে। দেশের এই প্রাণগত মূল সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের মনে হয় যে, চুপ করে থাকার বদলে হৈ চৈ করে নিন্দার প্রতিবাদ করতে ছুটলে আমাদের দেশের লোকেরাই ভুল ভাবতে পারেন যে, বোধ হয় দেশের মধ্যে নিন্দার উপযুক্ত কোন ভাব ঢুকেছে। আজকাল যে বিলিতি ধরণে সকল বিষয় শেখবার সঙ্গে কেউ কোন একটা মিথ্যা কথা রটা-লেই তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবাদ করবার জন্য অধীর হোতেও শিখেছি, এ দেশের জন-সাধারণ সেটা এখনো বোঝেনি।

একটু ভেবে দেখলেই আমাদের রাজ-নৈতিক লম্ফ ঝম্ফ কেবল যে অদরকারী তা নয়, কিন্তু সেটা যে অমঙ্গলের কারণ, আর সম্পূর্ণ নিষ্ফল, তা বেশ বোঝা যাবে। বেশ করে ভেবে বল দিকিন, আমরা সত্যি-সত্যি মনে করি কি যে, হৈ চৈ করে কতক-গুলো বক্তৃতা করলে কিম্বা কতকগুলো প্রবন্ধ লিখে ভারতনিন্দুক ইংরেজদের প্রত্যেক কথা উল্টিয়ে দিলেও ইংরেজ জাতি মনে করবে যে, আমাদের কথা বেদবাক্য, আর তাদের দেশের লোকদের কথাগুলো সমস্ত মিথ্যা সয়তানী? তা মনেও করো না। বরঞ্চ সম্ভাবনা এই যে, ইংরেজ জাতি ভাববে যে, তাঁদের দেশের লোকদের কথার ভিতর নিশ্চয় কিছু-না-কিছু সত্যের ভিত্তি আছে, substratum of truth আছে,

যেটাকে ঢাকা দেবার জন্য আমাদের এতটা রাজনৈতিক লম্ফঝম্ফ দরকার হোয়ে পড়েছে। তার পর, এই রকম হৈ চৈ করবার কারণেই ভেবে দেখ, আমাদের দেশের সাহিত্যের স্বাধীনতা কতটা নষ্ট হয়েছে। যে সমস্ত কাগজে লোকজনকে মারামারি করতে উত্তেজিত করা হয়, সেগুলোকে বন্ধ করে না হয় ভালই হয়েছে ধরতে পারা যায়; কিন্তু "দেশের কথা", "মীরকাসিম" প্রভৃতি সত্যিকার সাহিত্যমূলক বহিগুলিরও প্রকাশের স্বাধীনতা যে বন্ধ হয়েছে, এই হৈ চৈ, এই রাজনৈতিক লম্ফ-ঝম্ফ কি তার জন্য দায়ী নয়? এই রকমে সাহিত্যের স্বাধীনতা নষ্ট করে দেওয়াতে আমাদের দেশের যে ক্ষতি হয়েছে, আর হচ্ছে, সে ক্ষতি কবে যে পূরণ হবে তা জানি নে।

সেদিন ৭ই মার্চ্চে বিলেতে লর্ড সিংহকে একটা প্রীতিভোজ দেওয়া হয়েছিল। এদেশে খাওয়াবার জন্যই বন্ধুবান্ধবকে ভোজের নিমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু বিলেতে সে রকম কেবল খাওয়াবার জন্যই যে অনেক সময়ে প্রীতিভোজ দেওয়া হয় না, সেটা বোধ হয় সকলেই জানেন। সেখানকার বড় বড় প্রীতিভোজের খাওয়াটা হোল গৌণ উদ্দেশ্য; মুখ্য উদ্দেশ্য হোল বড় বড় লোকদের বক্তৃতা শোনা, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা ইত্যাদি। এই ৭ই মার্চ্চের প্রীতিভোজে মহারাজা বিকানীর, মিষ্টার মণ্টেগু প্রভৃতি অনেক বড় বড় লোক ভারতের রাজনৈতিক সংস্কার-সাধনের সপক্ষে খুব জোরের বক্তৃতা করেছিলেন। তার মধ্যে নাকি লর্ড সিংহের বক্তৃতা খুব জবড় রকমের হয়েছিল। সেই বক্তৃতাতে ঐ সমস্ত ভারতনিন্দুক ইংরেজদের মিথ্যা নিন্দা ও গালাগালি সম্বন্ধে লর্ড সিংহ ভারতের প্রাণের কথার প্রতিধ্বনি করে ভারতবাসীর পক্ষে খুব স্বাভাবিক কথা বলেছিলেন যে, "ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে যে গালাগালি দেওয়া হয়, তার বিরুদ্ধে আমি বিশেষ কিছু বলতে চাইনে, কেন না গালাগালি নিজেই নিজের উত্তর।" *

ভারতনিন্দুক ইংরেজ ভারতের বন্ধু।—ভারতনিন্দুক তোমরা আমাদের উপর অন্যায় গালিগালাজ বর্ষণ করে আমাদের তো বন্ধুর কাজ কর। ভগবান চান না যে, আমরা বাহিরের খেলা নিয়ে হৈ চৈ করে লম্ফঝম্ফ করে সময়টা কাটিয়ে দিই। যিনি যাই বলুন, আমাদের তো স্থির বিশ্বাস, পঞ্জাবিদলে অন্তর্দৃষ্টি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়াই specialist হওয়াই, আর সেই অন্তর্দৃষ্টিলব্ধ সত্য জগতে বিলিয়ে দেওয়াই ভারতের সর্ব্বপ্রধান নির্দ্দিষ্ট কাজ। লম্ফঝম্ফ সেই কাজের ব্যাঘাত হয়। কিন্তু গালাগালি মিথ্যা নিন্দা আমাদের দৃষ্টিকে বাহিরের বৃথা কাজ থেকে, বৃথা লম্ফঝম্ফ থেকে সরিয়ে এনে ভিতরের দিকে খুব এগিয়ে দেয়। গালাগালি সহ্য করলে, নিন্দাকে উপেক্ষার চোখে দেখতে অভ্যাস করলে তো কথাই নেই। এই রকম অন্তর্দৃষ্টি থেকে অমৃত ফল উৎপন্ন হয়। যে কংগ্রেস নিয়ে আমরা আজ এত বড়াই করতে পারছি, সেই কংগ্রেসের জন্ম হোল কোত্থেকে? সেই সময়ে দেশের সৌভাগ্য বশতঃ এমন কতকগুলি

* "I should like to take this opportunity to enter a solid protest, not so much against scornful sneers of offensive epithets, for these may be left to be their own answer * * *."

দেশহিতৈষী লোকের আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁরা বৃথা হল্লাতে মেতে যেতেন না, বৃথা হৈ চৈ করতে ভালবাসতেন না। সেই সকল দূরদর্শী মহাপুরুষদের নীরবে অন্তর্দৃষ্টি সাধনের দ্বারা দেশের মিলিতভাবে উন্নতি করবার চেষ্টার ফলেই কংগ্রেসের জন্ম সম্ভব হয়েছিল। আজ আবার তার বিপরীতে দেখি যে, আমরা খুব হৈ চৈ করতে শিখেছি, হল্লাতে মেতে গিয়ে নিষ্ফল হাত পা ছুড়তে শিখেছি। তার ফলে আমাদের দেশে বিচ্ছেদের মন্ত্র জেগে উঠেছে, আমরা পরস্পরকে গালাগাল দিয়ে আমোদ অনুভব করতে শিখেছি, আর আমাদের মিলনের কেন্দ্র কংগ্রেসকে বিরোধের কেন্দ্র তৈরি করে তুলেছি। আমাদের খুব আশা আছে যে, আমরা তোমাদের কাছে কসে গালাগাল পেতে খেতে মিলনের মন্ত্রে আবার জেগে উঠতে পারব, অন্তর্দৃষ্টিতে আমরা নিজেদের স্পষ্ট করে দেখতে পাব, বুঝতে পারব। তাই বলি যে, তোমরা আমাদের গালাগাল দিয়ে ভগবানেরই কাজে সহায়তা করছ, আমাদের বন্ধুর কাজ করছ।

ভারতনিন্দুক ইংরেজ স্বদেশের শত্রু।— কিন্তু তোমরা যে স্বদেশের মন যোগাবার জন্য আমাদের নিন্দা কর, গাল দাও, তোমরা আসলে তোমাদের সেই নিজের দেশের শত্রু। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে বটে যে, মিথ্যা নিন্দা উপেক্ষার চোখে দেখবে; আমাদের শাস্ত্রে বলেছে বটে যে, "সুখং শেতে হ্যবমতঃ অবমন্তা বিনশ্যতি," যাকে অপমান করা হয়, সে সুখেই ঘুমোতে পারে, কিন্তু যে অপমান করে সে-ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এ কথাতো ভুললে চলবে না যে, আমাদের শরীর রক্তমাংসেরই শরীর। কাজেই এ কথা বল্লে মিথ্যা কথা হবে যে, তোমাদের গালাগাল পেয়ে আমাদের মনপ্রাণ একটুও গরম হয়ে ওঠে না। তার পর, তোমাদের কাছ থেকে এই রকম গালাগাল ক্রমাগত পেতে খেতে আমরা যদি ধারণা করে বসি যে, আমাদের সম্বন্ধে সমস্ত ইংরেজ জাতিরই ধারণা তোমাদের মতো, আমাদের পক্ষে সে রকম ধারণা করা কি অসঙ্গত হয়? আবার যখন দেখি যে, ব্রিটিষ শাসনও সেই ইংরেজ জাতিরই হাতে গড়া, তখন ঐ ধারণার উপর নিজেদের জীবন গড়তে গড়তে শেষে যদি ব্রিটিষ শাসনেরও উপর বিরক্ত হোয়ে পড়ি তাতে কি আমাদের উপর অন্যায় অবিচারের দোষ দেওয়া যেতে পারে? তখন যদি তোমরা আমাদের বোঝাতে চাও যে— ব্রিটিষ শাসন আর ব্রিটিষ জাত ঢের তফাৎ, সেটা কি আমরা চট্ করে বুঝতে পারব, না বুঝতে চাইব? আমরা যে জলজ্যান্ত দেখছি, আজ যে ইংরেজ তুমি আমাদের কসে অন্যায় গাল দিচ্ছ, কাল হয়-তো সে-ই তুমি ব্রিটিষ শাসনের একজন অন্তরঙ্গ হোয়েই বসলে। হোতে পারে যে, আমাদের দেশের জনকয়েক লোক রাজনীতির চচারটী গৎ অভ্যাস করেছেন, কিন্তু আসলে ভারতবাসী আমরা রাজনৈতিক-বুদ্ধিহীন পাড়াগেঁয়ে জীব; আমরা ব্রিটিশ শাসন থেকে তোমাদের তফাৎটা কেমন করে সহজে বুঝি বল? এখন, তোমাদের গালাগালের ফলে ব্রিটিষ শাসনের উপর আমাদের এই রকম মনের ভাব হোতে থাকলে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কি আমাদের কাছে মনখোলা সাহায্য পাবার প্রত্যাশা করতে পারবেন? সম্ভব বলে মনে হয় না। তাই বলি, তোমরা আমাদের বন্ধু হোলেও আসলে নিজের দেশের শত্রু।

কতকগুলো ইংরেজ মিথ্যা-ঐতিহাসিক ইতিহাসের কোন ধার না ধেরেও ইতিহাসের নামে আমাদের—বাঙ্গালীদের—সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা কথা লিখে গেছেন। দেশের দুর্ভাগ্য যে, সেই সমস্ত মিথ্যা কথা ইতিহাস বলে স্কুল কলেজে পাঠ্য বলে নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। ছেলেবেলায় আমরাও সেই সমস্ত কুপাঠ্য ইতিহাস পড়েই মানুষ হয়েছিলুম, তার ফলে হোল কি? আমরা সেই সমস্ত মিথ্যা কথা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পড়তে পড়তে সত্য বলে মনে করতে লাগলুম, আর সেই সঙ্গে আমাদের প্রাণের ভিতর যে সাহস, বীরত্ব, ধর্ম্মভয়, এককথায় মনুষ্যত্ব বলে একটা জিনিস থাকতে পারে, সেটাও উত্তরাধিকার-ক্রমে ভুলতে লাগলুম। এই সব ভুলতে ভুলতে আমরা একটা কলমপেশা ক্রীতদাসের জাতি হোয়ে দাঁড়ালুম। অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত ক্রমে চলে যেতে লাগল। এই রকম ক্রীতদাসের জাতি হোয়ে দাঁড়াবার ফলে আমাদের যা অনিষ্ট হবার, তাতো হোতেই লাগল; সেই সঙ্গে গবর্ণমেণ্টেরও যে খুবই অনিষ্ট হয়, সেটা ভগবান এই ইউরোপীয় মহাসমর উপলক্ষে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিলেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যখন বাঙ্গালী সৈন্য বাড়াবার জন্য হা-হুতাশ করছিলেন, তখন কি তাঁরা আশানুরূপ বাঙ্গালী সৈন্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন?

সেই রকম, এখন আমাদের উপর গালি-গালাজ ঝাড়তে তোমাদের বেশ মিষ্টি লাগতে পারে; আমাদের চিমটি কেটে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা দিয়ে তোমাদের পশুভাব আনন্দে নৃত্য করতে পারে, কিন্তু এই রকম করে আমাদের মন খিঁচড়ে দিলে, যখন সময় আসবে, যখন দরকার পড়বে, তখন কি গবর্ণমেণ্ট আমাদের কাছ থেকে মন-খোলা সাহায্য পাবেন? কখনই নয়—এ যে মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এই যে যুদ্ধের সময় গবর্ণমেণ্ট আমাদের কাছ থেকে প্রাণখোলা, মনখোলা যেটুকু সাহায্য পেয়েছিলেন, ভেবে দেখেছ যে এটুকু সাহায্যও কেন পেয়েছিলেন? তখন যে তোমরা শত্রুপক্ষের ভয়ে আঁৎকে উঠে আমাদের গালাগাল দেবার বদলে প্রতিপদে স্নেহের সুরে, প্রেমের সুরে আমাদের ডেকে ডেকে বলেছিলে—"তোমরা একই সাম্রাজ্যের প্রজা, আর তোমাদের অধিকার আমাদের সঙ্গে সমান"। ইংরেজ জাতির উপর আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অগাধ কিনা, তাই যেমন তোমরা ঐ কথা বল্লে, অমনি আমরা ভাবলুম, যুদ্ধের আগে না হয় তোমরা আমাদের নিন্দা করে, গালাগাল দিয়ে চৌদ্দপুরুষের প্রায় শেষ করে এনে-ছিলে, তাতে এলো গেলো কি? এখন তো তোমরা অনুতপ্ত হোয়ে তোমাদের সঙ্গে আমাদের সমান করে নিচ্ছ, সমান অধিকার দিতে চাচ্ছ, তাহলেই হোল। তোমাদের দুচারটে মিষ্টি কথায় আমরা আমাদের অন্নকষ্ট, বস্ত্রকষ্ট সব একেবারে ভুলে গেলুম—আর ভুলে গিয়ে ভাবলুম, তোমরা যখন তোমাদের সঙ্গে আমাদের সমান বলছ, তখন আর আমাদের ভাবনা কি? তোমা-দের সঙ্গে আমরা সমান হয়েছি, অন্তত হোতে চলেছি, এই ভেবে আহ্লাদে আটখানা হোয়ে গবর্ণমেণ্টকে আমাদের সাধ্যমত লোক দিয়ে, অর্থ দিয়ে সাহায্য করে এসেছি। কিন্তু তখন যদি তোমরা আমাদের বুঝিয়ে দিতে যে, তোমাদের ও-রকম পিঠ চাপড়ানো মনের নয়, মুখের; তখন যদি তোমাদের সমকক্ষ হবার স্পর্দ্ধা রাখি বলে তোমরা

ক্ষণে গালাগাল দিতে; আর আমাদের ভেড়া না বানিয়ে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে যে আমরা সত্যিসত্যি তোমাদের সমান নই, আর হোতেও পারব না, তা হলে অবশ্য গবর্ণমেণ্ট যেটুকু সাহায্য পেয়েছেন, সেটুকু পেতেন কি না সন্দেহ—অবশ্য সে জন্য গবর্ণমেণ্টেরও বিশেষ কিছু এসে যেত না, আর তোমাদের তো নয়ই।

ভারতবাসী রাজদ্রোহী নহে—তোমাদের নিন্দেবান্দা আলোচনা করে বুঝেছি যে, তোমাদের চরম উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, ভারতবাসী আমরা ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী। এ কথা শুনলেও যে আমাদের কানে হাত দিতে হয়। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র যে রাজাকে দেবগণের—এক আধটা নয়, দশদশটা দিকপালের—অংশ বলে বলেছেন, আমরা কি তাঁর বিরুদ্ধে যেতে পারি? ভারতবাসী ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী অথবা রাজার বিদ্রোহী, একথা ঘোর অন্ধ মূর্খতার কথা। ভারতবাসী রাজবিদ্রোহী, এ কথাটাই যেন পরস্পরবিরুদ্ধ। এই যে সমস্ত দেশটাকে রেলগাড়ী ছেয়ে ফেলে', সমস্ত পৃথিবীটাকে জাহাজে ছেয়ে ফেলে' দেশবিদেশে চলাচলের এমন সুবিধা করে দিয়েছে; চাল ডাল, কাপড়-চোপড় দেশবিদেশে আমদানী রপ্তানীর এমন সুবিধে করে দিয়েছে,—এতেও যদি আমরা ব্রিটিশ শাসনের মহিমা কীর্ত্তন না করি, তবে আর আমাদের পরিত্রাণ কোথায়? যুদ্ধের আগেকার সময়ের কথা ভেবে দেখ দিকিন, যে কোন জিনিসের দরকার হোল, অমনি সেই জিনিস তোমার হাতের গোড়ায় জলের দরে এসে উপস্থিত—বেশী হাত পা নাড়িয়ে খেটেখুটে কোন জিনিস সংগ্রহ করবার দরকারই হোত না। এতেও যদি আমরা কৃতজ্ঞ না হই, তবে আমাদের নিষ্কৃতি কোথায়? ভারতের এক সীমা থেকে আর এক সীমা পর্য্যন্ত পুলিসের কখনো এমন সুবন্দোবস্ত ছিল কি? এখন কিন্তু এমন বন্দোবস্ত যে, পুলিসের ভয়ে সমস্ত ভারতবর্ষে টুঁ শব্দটী করবার যো নেই—সমস্ত ভারতবর্ষ একেবারে পুলিসের ভয়ে জড়োসড়ো; এক জায়গায় দোষ করে অন্য যায়গায় পালাবার পথটী নেই। ব্রিটিশ শাসনে বিচারেরই বা কি সুবন্দোবস্ত! স্তরে স্তরে বিচার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হোতে থাকে। সর্ব্বশেষে হাইকোর্টে সূক্ষ্মতম বিচার হবে, তারও পরে প্রিভিকৌন্সিলে অতি সূক্ষ্ম বিচার হবে। এখানে আর আগেকার সরাসরি কাজির বিচার হবার যো নেই। এই বিচারের সূক্ষ্মতা আছে বলেই তো আমরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছে, ইংরেজ জাতির দুয়োরে পাগলের মতো সূক্ষ্ম বিচারের প্রার্থী হোয়ে দাঁড়াই। ব্রিটিশ শাসনের এটা কি কম গৌরবের কথা? বিচারের, পুলিসের, রেলগাড়ীর, জাহাজের, সকল বিষয়ের এমন বন্দোবস্ত থাকতেও আমরা কি ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী হোতে পারি? মূর্খ যারা, তারাই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে বিরোধ ঘোষণা করতে পারে।

ভারতের রাজবিদ্রোহীদল ও তাদের বক্তব্য।—ভারতের অধিবাসী প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ কোটী লোক। ভারতের জনসাধারণ ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী না হোলেও দুচারটে ছোটখাটো বিরোধী দল যে নেই, সে কথা বলতে পারি নে। তোমাদের কড়াকড়া গালিগালাজ যে এই সমস্ত দল ওঠবার অন্তত একটা কারণ, তাতে সন্দেহ নেই।

তোমাদের গালাগালি খেতে খেতে তাদের মন এমন খিঁচড়ে গেছে যে, তারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ছেড়ে ইংরেজ জাতেরই কোন-কিছুতে ভাল দেখতে পারে না। আমরা যেটাতে ভাল দেখব, তারা সেইটাতেই মন্দ দেখবে। দেশ বিদেশে যাওয়া আসা হচ্ছে, জিনিসের আমদানি রপ্তানি হচ্ছে—কেমন একটা বিশাল বিরাট উদার ছবি আমরা প্রাণের ভিতর জাগিয়ে তুলতে শিখেছি। এ বিষয়ে তারা বলে যে, ঐ ছবি আমাদের একটা কল্পনা মাত্র, ওতে আমাদের অনিষ্টই হচ্ছে; যত আসল সাচ্চা মাল সব বিদেশে চলে যাচ্ছে, আর যত ভুয়ো মালে আমাদের দেশ ঢেকে যাচ্ছে। অবাধ বাণিজ্যের উপকারে তারা বিশ্বাস করতে চায় না। তারা তাদের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিতে স্বীকার করতেই চায় না যে, ভারতবাসীকে সত্যি সত্যি অবাধ বাণিজ্যের বিশেষ কোন সুবিধা দেওয়া হয়েছে। তারা স্পষ্টই তো বলে যে, ইংরেজদের সুবিধের বেলাতেই অবাধ বাণিজ্যের কথা ওঠে। বিলেত থেকে নুন এলে তবে আমরা খেতে পেতুম; কৈ, আমাদের এখান থেকে নুন তৈরী করে বিলেতে পাঠাবার তো হুকুম ছিল না? এই রকম তারা আরও কত কি দৃষ্টান্ত দেখায়। অবাধ বাণিজ্যের ফলে আমাদের সুখের কথা বল্লে তো তারা হেসেই উড়িয়ে দেয়। তারা বলে, ওতে তো আমাদের হাত পা ঠুঁটো করে ফেলেছে, আমরা জড়পদার্থ হোয়ে যাচ্ছি; আর বিলাসিতায় ডুবে আমরা নকল জিনিসে আফ্রিকার অসভ্যদের মতো মেতে যাচ্ছি। তাদের কাছে পুলিসের বন্দোবস্তের কথা বল্লে তারা শুনতেই চায় না। পুলিসের ভাল দিকটাতো তারা দেখে না; তাদের মতে পুলিসের অত্যাচারে দেশ জরজর; এ দেশের মনুষ্যত্ব চলে যাচ্ছে। তাদের মন এতই সঙ্কীর্ণ যে, তারা হাইকোর্টেরও বিচারকে একটা টাকার খেলা মনে করে। তারা বলে—হাজার হাজার টাকা না ফেল্লে যদি সুবিচার না পাওয়া যায়, তবে সে বিচারে আমার দরকার নেই; তা ছাড়া অনেক সময়ে দেখা যায় যে, দোষী ব্যক্তি যদি ধনী হয়, তবে সে বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টার লাগিয়ে অবশ্য খুব সূক্ষ্ম বিচারের গুণে আইনের কথার মারপেঁচে ছাড়ান পেয়ে যায়, আর নির্ধনী গরীবলোক দোষী না হোলেও সে রকম উকীল ব্যারিষ্টার লাগাতে না পেরে, অনেক সময়ে সাজাও পেয়ে যায়—তখন এরকম বিচারের এত মাহাত্ম্য কিসের? তারা আর একটা বড়ই সঙ্গীন কথা বলে যে, বিচারকেরা কেবল পার্থিব শাসনের অধীন না থেকে তার উপরে থাকা উচিত, তাঁদের একমাত্র ধর্ম্মশাসনেরই অধীনে থাকা উচিত; তাই আমাদের দেশে ব্রাহ্মণেরাই বিচারক হোতেন, আর তাঁরা ক্ষত্রিয় রাজাদের শাসনের অতীত থাকতেন; কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের বিচারকেরা পাকেচক্রে ব্রিটিশ শাসনেরই অধীন, তাই কত সময়ে ইম্পি নন্দকুমারের অভিনয় হোয়ে যাচ্ছে। কি রকম ভাব নিয়ে তারা যে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী হয়, সেইটে বোঝাবার জন্য তাদের দু একটা মত বল্লুম। ব্রিটিশ-বিরোধী দুচারটে ছোটখাটো দল আছে বলেই যে সমস্ত ভারতবাসীকে বিপ্লববাদীর চেহারা দিতে হবে, এমন কোন কথা নেই। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর মধ্যে ইংরেজ ও ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী ছোটখাটো দুচারটে দল থাকা কি কিছু অস্বাভাবিক? কখনই নয়। ব্রিটিশ শাসন তো বিদেশী শাসন, দেশী শাসন থাক-

তেও তো কত বিদ্রোহী দল উঠত পড়ত; ইতিহাসে তো দেখা যায় যে, কত বিদ্রোহী দল রাজার পর রাজাকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেছে। কেবল কি এখানেই? কেন, বিলেতেই এত অল্প লোকের মধ্যেও কত রাজবিদ্রোহী দল আছে দেখা যায়, পড়া যায়।

প্রকাশ্য প্রতিবাদ ও ব্রিটিশ শাসন।— এটাও যেমন ঠিক যে, এই সুবিশাল ভারতবর্ষের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী ছোটখাটো দুচারটে দল থাকা সম্ভব; এটাও তেমনি ঠিক যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বা ইংরেজ জাতির অনেক কাজ আমাদের মনে সায় পায় না। সায় না পেলেই আমরা তার প্রতিবাদ করতে উদ্যত হই। অদরকারে প্রতিবাদ করতে না যাওয়াই হোল দেবধর্ম্ম; কিন্তু যে কাজে যে সায় দিতে না পারে, সে কাজে তার প্রতিবাদ করতে যাওয়া তো মানুষমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আমরাও যখন মানুষ, তখন শুধু আমাদের বেলায় উল্টো গৎ গাইলে চলবে কেন? আমরা তোমাদের কোন কাজের প্রতিবাদ করলেই সেটা ভিতরকার বিদ্রোহের ভাব থেকে করছি, এ কথা আসবে কেন? আসল কথা এই যে, মনের ভিতর কোন কিছুর সায় না পেলে তার প্রতিবাদ করাও যেমন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, তেমনি তেজী লোকের পক্ষে সেই প্রতিবাদ অসহ্য বোধ হওয়াও স্বাভাবিক। জ্ঞানচর্চ্চা, দেশ জয়, বাণিজ্য বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা কারণে তোমাদের এখন তেজ বৃদ্ধি হয়েছে, তাই তোমরা আমাদের মতো গরীব ভিখারীর প্রতিবাদ সইবে কি করে? প্রতিবাদ তোমাদের অসহ্য বোধ হয় বলেই তোমরা কথায় কথায় আমাদের প্রতিবাদে বিপ্লব ও বিদ্রোহের গন্ধ পাও। বলা বাহুল্য যে, ইংরেজদের ভিতরেও এমন অনেক মহাশয় লোক আছেন, যাঁরা প্রতিবাদমাত্রেই বিদ্রোহের গন্ধ পাবার বদলে নিজেদের কাজের বা কথার প্রতিবাদ ও সমালোচনা প্রতীক্ষা করেন।

আজ তোমরা অবশ্য তোমাদের কাজের বিরুদ্ধে আমাদের প্রকাশ্য প্রতিবাদ পছন্দ করছ না। কিন্তু মনে রেখো, ইংরেজ জাতিই, আর বলতে গেলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও আমাদের এই বিদ্যা শিখিয়েছেন। তোমাদের আগে, মুসলমান বল আর হিন্দুই বল, দুই রাজত্বেরই ইতিহাস পড়ে যা বুঝেছি, তাতে মনে হয় যে, সেই সত্যযুগে সভাসমিতি ডেকে খবরের কাগজে রাজার অন্যায় কাজের প্রকাশ্য প্রতিবাদ করা হোত না। হয় তো পঞ্চায়েৎ ডেকে, অথবা গোপনে পরস্পর মিলেজুলে প্রতিবাদ করে সদ্য সদ্য স্থির করা হোত যে, অত্যাচারী রাজাকে কি করে রাজ্যচ্যুত করা যেতে পারে, আর তারপর সেই সিদ্ধান্তকে কাজে পরিণত করবার জন্য গোপনে গোপনে ব্যবস্থাপত্র চলত। ইচ্ছা থাকলেও এখন ভারতবাসীর পক্ষে এভাবে কাজ করা সম্ভব নয়, কেননা আমাদের রাজা আর তাঁর আসল খাস গবর্ণমেণ্ট থাকেন সাত সমুদ্র তের নদী পার। সম্ভব না হোলেও এ ভাবে কাজের ইচ্ছাটাও ভাল নয়; এতে যে বিপদের সম্ভাবনা। এই রকম প্রণালীতে প্রতিবাদ করতে থাকলেই যে বিপ্লব বিদ্রোহ সমস্তই আসতে পারে, সেটা তোমরা বেশ জান। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বুদ্ধিমান, ইতিহাসে সুপণ্ডিত, তাই না তাঁরা ঐ ধরণের প্রতিবাদপ্রণালীর বিপদ বুঝে আমাদের প্রকাশ্য প্রতিবাদ করতে শিখিয়েওছেন, আর অনেককাল ধরে

সে বিষয়ে স্বাধীনতা, উৎসাহ-আস্কারা দিয়েও এসেছেন। এখন যেন মনে হয়, তোমাদের গালাগাল শুনে শুনে তোমাদের স্বজাতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেরও মনের এক কোণে একটু সন্দেহ জেগে উঠেছে যে, আমরা ঠিক রাজভক্ত জাত নই। তোমরা যে রকম আমাদের পিছনে ফেউ ডাকতে সুরু করেছ, তোমাদের স্বজাতি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের তোমাদের সঙ্গে যোগ দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারাই আশ্চর্য্য।

প্রতিবাদ প্রতিরোধের কুফল।—ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কাজকর্ম্ম কথাবার্ত্তার ভাবে মনে হয় যে, তাঁদের কাছে আমাদের প্রকাশ্য প্রতিবাদ করবার অধিকার দেওয়া তাঁদের বড় ভাল লাগছে না; তাই মনে হয় যেন, তাঁরা এ সম্বন্ধে স্বাধীনতা দেবার বিষয়ে একটু পিছতে চান। আমরা গবর্ণমেণ্টের হিতৈষী; তাই আমাদের সরল, সবল ও স্পষ্ট কথা তাঁদের অপ্রিয় হোলেও খুলে বলতে কুণ্ঠিত হবার কোনই কারণ দেখিনে। আমরা খোলা মনে তাঁদের বলছি যে, আমাদের মনে হয় যে, প্রাণমন খুলে প্রকাশ্য প্রতিবাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিলে বিপদ ডেকে আনা হবে। বিদ্রোহী দলের হাতে একটা খেলাবার জিনিষ দেওয়া হবে। মানুষকে খোলা প্রাণে থাকতে দিলে, ইচ্ছামত হাসতে কাঁদতে দিলে অনেক বিপদ কেটে যায়; কিন্তু তার বদলে মানুষকে গোমরাতে দিলে কোন্ দিক দিয়ে যে তার প্রাণ ফেটে বেরোবে, তার কি কোন ঠিকানা আছে? সোজা কথা এই যে, মানুষের প্রাণটাকে সহজভাবে খেলতে দেবার জন্য একটা safety valve দরকার—তার ভিতর দিয়ে প্রাণের অনেক গলদ বেরিয়ে যায়। আর যদি কথায় কথায় সত্যবিষয়ে পূর্ণ সাহিত্যও বন্ধ করে দিয়ে, নানা উপায়ে আমাদের মুখ বন্ধ করে সেই safety valve ভেঙ্গে ফেলতে চাও, তাহলে তো বুঝতেই পারছ যে, প্রকৃতির নিয়মেই, আমরা যে শক্তি সাহিত্য রচনায়, প্রতিবাদের লাফানি ঝাঁপানিতে খরচ করতুম, সেটা সঞ্চিত হোতে থাকবে, আর সংহত হোতে থাকবে। সেই সঙ্গে তোমাদের এটাও মনে রাখা দরকার যে, মানুষের স্বাধীনভাবে প্রতিবাদ করবার ইচ্ছাশক্তি জড়শক্তি নয়, মস্ত শক্তিশালী আত্মশক্তি। বাতাসের মতো একটা জড়শক্তিকেই সংহত করলে তার শক্তি যে টপটপ করে কত গুণ বেড়ে যায়, বিজ্ঞানের ক-খ-পোড়ো ছেলেদেরও সেটা জানা আছে। এই সংহত বাতাসের জোর তখন এত বেড়ে যায় যে, একটা সীমার পর লোহার মতো জিনিসকেও ফাটিয়ে ফুটিয়ে একেবারে তছনছ করে দিতে পারে। তখন, যে আত্মশক্তির বল জড়শক্তির চেয়ে অনেক বেশী, সেই আত্মশক্তিকে গুমরে সংহত হবার অবসর দিলে সময়ে যে সে কি কাণ্ড বাধিয়ে বসবে, তা কে বলতে পারে? তখন সে শক্তিকে আটকে রাখে, সাধ্য কার? এই সব ভেবে চিন্তে, ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা চাই নে যে, গবর্ণমেণ্ট আমাদের প্রাণ খুলে একটু লম্ফঝম্ফ করবার পথ, দুটো প্রবন্ধ লিখে বা বক্তৃতা করে হৈ চৈ করবার পথ বন্ধ করেন। এই জন্য আমরা চাইনে, কারো দু-একটু সামান্য বিদ্রোহীভাব দেখলেই তাকে অন্তর্হরণে বন্ধ করে দাও; কথায় কথায় ছাপাখানাগুলোর কাছ থেকে রাশ রাশ টাকা ডিপজিট নাও, আর একটা কিছু ছুতো পেলেই সেই টাকা

বাজেয়াপ্ত করে রাজকোষ ভরাও। আমাদের এই কথাগুলো তোমাদেরও খুব খারাপ লাগতে পারে, আর গবর্ণমেণ্টেরও খুব খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু এই সব যে প্রকৃতির নিয়ম। সেই সব নিয়মের দিকে আমিই চোখ বন্ধ রাখি বা তুমিই চোখ বন্ধ রাখ, নিয়ম আপনার কাজ আপনি করে যাবেই যাবে, আর তোমার আমার সকলেরই সেই নিয়ম একদিন না একদিন বুঝতেই হবে, জানতেই হবে। একটা কথা ভেবে দেখেছ কি যে, এভাবে আমাদের মুখ বন্ধ করবার চেষ্টা করলে এই বড় দেশের প্রাণের কথা তোমরা কিছুই জানতে পাবে না? সুশাসন যাঁরা করতে চান, তাঁদের পক্ষে সেইটেই যে একটা ভয়ানক কথা।

ভারতবাসী স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিরোধী।—আমরা খুব জোরের সঙ্গে বলতে পারি, আর গবর্ণমেণ্টেরও এটা জেনে রাখা দরকার যে, শিক্ষিত ভারতবাসী আমরা ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী নই, কিন্তু তার ভিতর যে স্বেচ্ছাতন্ত্র আর প্রভুত্বের অহঙ্কার লুকিয়ে আছে, আমরা তারই বিরোধী। আমরা অনেক দিন থেকে শুনে এসেছি যে, ব্রিটিশ শাসন-প্রণালীর একটী প্রধান লক্ষণ—কাগজ দুরস্ত রাখা। তোমার কাগজ দুরস্ত রইল—বস, তোমার উপর আর কেউ চোখ রাঙ্গাতে পারবে না, তা হলেই তোমার কাজ শেষ হোল। এ ভাব আসবার কারণও আছে। এখানে তো রাজা নিজে নেই যে, আমরা দুঃখের কথা নিজে হাজির হোয়ে তাঁকে জানাতে পারব। রাজা, তাঁর আসল মন্ত্রী, সব রইলেন সুদূর সমুদ্র-পারে। কাজেই তাঁর এখানকার কাজকর্ম্ম সমস্তই কাগজ কলমে চালাতে হয়। লাটবেলাট আইন-কানুনের দ্বারা কাজ চালাতে লাগলেন, আর তার রিপোর্ট রাশ-রাশ রাজসিংহাসনে পৌঁছতে লাগল। রাজার নিয়মে এখানকার লাট বেলাট চিরস্থায়ী নন, বছর কয় থেকেই বদলী হোয়ে যান। কাজেই তাঁদের মূল লক্ষ্য থাকে, যাতে কাগজ পত্রে তাঁরা খাঁটি থাকেন, তাঁদের শাসন-সময়ের কোন খুঁৎ না বেরোয়। এখন, সব লাটবেলাটের মনের ভাব তো আর সমান নয়। কোন লাট হয় তো ন্যায়ধর্ম্মের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের দুঃখের দশা দেখে দয়াপরবশ হোয়ে আমাদের ভাল করবার চেষ্টা করলেন। অবশ্য তিনি সেই ভাল করবার জন্য বিলেতে রাজা ও রাজমন্ত্রীর কাছে কাগজ কলমে যুক্তি দেখাতে বাধ্য হলেন। কিন্তু আবার হয়তো এমন কোন লাট এলেন, যিনি ঐ সব ভারত-নিন্দুক ইংরেজদের সঙ্গে বেশী মেশামেশি করে আমাদের অনাহারে, অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থাতে থাকাটাও মিথ্যা ব্যবহার, একটা বাজে কথা মনে করলেন। মেয়ের বিয়েতে এ দেশের বো বাপগুলো সাধারণত এক-রাশ রূপোর গয়না দেয় শুনেই তিনি ভাবলেন যে, ভারতবর্ষ রূপোর সাগরে অতিরিক্ত রকম ভেসে বেড়াচ্ছে। তিনি ভাবলেন না যে, বাপ মানের দায়ে প্রাণের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হোয়েও এই গয়না দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। কাজেই তিনি হয়তো মনে করলেন যে, ভারতবর্ষটাকে রূপোর সাগরে এতটা অতিরিক্ত ভাসতে দিলে উল্টে যেতে পারে; আর সেই ভেবে খানিকটা রূপো কেটে নেবার ব্যবস্থা করলেন। তিনিও অবশ্য Statistics নামক একটা ভীষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে দেশের আশ্চর্য্য স্বচ্ছলতা এবং এই রূপো কেটে নেবার সপক্ষে রাশ রাশ

যুক্তিতর্ক দাঁড় করালেন। কাগজ দুরন্ত রইল, কারো কিছু বলবার রইল না; কিন্তু রূপো কেটে নেবার সময় মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা অদৃষ্টের দোষ বলে আমরা ভোগ করেও চুপ করে রইলুম। এই কাগজ দুরন্তের কথা অসম্ভব নয়। একটা বড় সহরে ম্যাজিষ্ট্রেটদের ভিতর রেষারেষি, আর তার ফলে কাগজ দুরস্তের সঙ্গে সহরবাসীর বিস্তর ক্ষতি আমার নিজের চোখে পড়েছিল। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাকড়ার প্রাণ যায়। ব্রিটিশ শাসনের প্রণালীই এই রকম বলে বেশ বোঝা যায় যে, সুশাসনের নামে অনেক সময়ে কুশাসনও এসে পড়তে পারে। সুনিবদ্ধ শাসন প্রণালীর ভিতরেও স্বেচ্ছাতন্ত্র ও প্রভুত্বের অহঙ্কার জেগে উঠে আমাদের সর্ব্বনাশ করবেই যে, এমন কোন কথা নেই, কিন্তু—করলেও করতে পারে, সময়ে সময়ে যে সর্ব্বনাশ হয় নি, তাও বোধ হয় বলতে পারি নে।

আমরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যেতে পারি নে। আবার আমরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যই ব্রিটিশ শাসনের ভিতর যে স্বেচ্ছাতন্ত্র ও প্রভুত্বের অহঙ্কার লুকিয়ে আছে, আমরা তারও বিরোধী। রাজা বল, মন্ত্রী বল, লাট বেলাট বল, আর এ দেশের সিবিলিয়ানপুঙ্গবই বল, সকলেই তো মানুষ বটে; সকলেরই ভুলচুক আছে, রাগদ্বেষ আছে। সেই জন্য আমরা তোমাদের মিনতি করে বলি যে, তোমরা উপর থেকে আমাদের ঘাড়ে যা-তা শাসনের জোয়াল চাপিও না—তাতে আমাদের যে কি লাগছে তা তোমরা বুঝতে পারছ না; আমরাও তোমাদেরই মতো মানুষ, আমরা আপনাদের শাসন আপনারা করতে চাই। তোমরা হাজার বল যে, আমাদের কোথায় ব্যথা, তা তোমরা খুব বুঝছ; আমাদের সুশাসনের জন্য তোমরা এমন এমন ব্যবস্থা করেছ,—আর, আমাদের হাতে শাসনের ব্যবস্থা পড়লেই সমস্ত সুশাসন উল্টে যাবে—সে কথা আমরা মানতেই পারি নে। প্রায়ই দেখা যায় যে, দাবাবড়ি যাঁরা খেলতে বসেন, অনেক সময়ে তাঁরা ভাল চাল দেখতে পান না, কিন্তু যাঁরা খেলা দেখেন, তাঁরা অনেক সময়ে ভাল চাল বলে দিতে পারেন। তোমাদের এই শাসন-প্রণালীটা তোমরা নিজেরা গড়ে তুলেছ কি-না, তাই এর ভিতরকার লুকোনো দোষটুকু তোমাদের চোখে পড়ছে না। আমরা কিন্তু বেশ দেখতে পাচ্চি যে, তোমাদের এই শাসনব্যবস্থা নামে প্রতিনিধিমূলক হোলেও এর ভিতর স্বেচ্ছাতন্ত্র ও প্রভুত্বের অহঙ্কার খুবই লুকিয়ে আছে। সেই জন্যই সুশাসনের ভিতরে কুশাসন আসবার খুবই সম্ভাবনা আছে। সেই সম্ভাবনাটুকু দূর করবার জন্যই আমরা তোমাদের কাছে মিনতি করে বলছি যে, তোমরা আমাদের পুরো স্বায়ত্তশাসন দাও, তোমাদের স্বদেশবাসীর সঙ্গে আমাদের সমান অধিকার দাও—দিয়ে দেখ যে, আমরা তার উপযুক্ত কি না। উপযুক্ত না হই, সে অধিকার কেড়ে নেবার সুন্দর যন্ত্রও তো তোমাদেরই হাতে আছে—গেজেটে এক নোটিশ বের করে বল্লেই হোল যে, "Whereas ভারতবাসীরা স্বায়ত্তশাসনের অনুপযুক্ত, অতএব তাদের হাত থেকে শাসনভার কেড়ে নিয়ে আমরা নিজেদের হাতেই সেটা রাখলুম।" আর এমনতর ঘটনার যে নজীরও নেই তা নয়। এই তো কত মিউনিসিপালিটি গবর্ণমেণ্টের মনের

মতো কাজ না করাতে গবর্ণমেণ্ট তাদের অধিকার পটাপট কেড়ে নিতে বাধ্য হলেন। তোমাদের সুশাসনের ভিতর কুশাসন আসবার সম্ভাবনা আছে বলেই আমরা বলি যে, তোমাদের সুশাসনও আমরা চাই নে, আর তোমাদের স্বেচ্ছাতন্ত্র আর প্রভুত্বের অহঙ্কারও আমরা চাই নে। আমরা দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়েও, বিপদ আপদের মধ্য দিয়েও নিজেদের শাসন করা শিখতে চাই। আমরা চাই, তোমাদেরই চোখের নীচে পুরোমাত্রায় স্বায়ত্তশাসন, তোমাদেরই মতো তোমাদের দেশবাসীর সঙ্গে সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের সমান অধিকার।

স্বায়ত্তশাসনেই আমাদের মঙ্গল।—আমাদের এই প্রাণের কথা মুখ ফুটে ভাল করে জোর করে বলবার যো নেই, তাহলেই তো তোমরা বিরক্ত হোয়ে উঠবে? কিন্তু কি করি বল? প্রাণের কথা প্রাণের মধ্যে চেপে রাখবার অনেক চেষ্টা করলেও যে সময়ে সময়ে বুক ফেটে সে কথা বেরিয়ে আসে। আর তা ছাড়া, এই রকম স্পষ্ট করে মনের কথা বলতে তো তোমরাই শিখিয়েছ। তোমরা যে শিক্ষাযন্ত্র সৃষ্টি করে এ দেশে বসিয়েছ, তাতে ধর্ম্মের 'ধ' রাখতে চাও না। বেশ করে ভেবে দেখলে দেখবে যে, আমাদের দেশের প্রাণের বিপরীতে তোমাদের শিক্ষাপ্রণালীর মূল কেন্দ্র করেছ রাজনীতি। তোমরা ইস্তনাগাদ ঘোষণা করে এসেছ যে, তোমরা আমাদের উন্নত করে স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলবার জন্যই এই আশ্চর্য্য শিক্ষাযন্ত্রের সৃষ্টি করেছ। তোমরা ইস্তনাগাদ আমাদের শিখিয়ে এসেছ যে, তোমরা যেমন করে বড় হয়েছ, তেমনি করে আমাদের বড় হবার চেষ্টা করা উচিত; তোমরা যেমন করে দেশের জন্য ভাবো, তেমনি করে আমাদেরও দেশের জন্য, দশের জন্য ভাবতে শেখা উচিত। তোমাদেরই দেওয়া সেই শিক্ষার ফলে আমরাও আর ধর্ম্মের শাসন মানতে চাই নে। আমরা এখন আইনকানুনের উপর দাঁড়িয়ে রাজামারা, উজীরমারা রাজনীতি-চর্চ্চাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য স্থির করে বসেছি। রাজনীতি-চর্চ্চার ফলে স্বায়ত্তশাসনেরও দুচারটে মোটা কথা আমরা আয়ত্ত করতে পেরেছি। সেই সঙ্গে বুঝেছি যে, তোমাদের স্বেচ্ছাতন্ত্র ও প্রভুত্বের ফলে চূড়ান্ত সুশাসন হোলেও সেটা মূলমন্ত্রে Principleএ অনেকটা স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধে যায়; আর—বুঝেছি যে, সাধ্য মন্ত্র হিসাবে স্বায়ত্তশাসনই আমাদের চাওয়া উচিত, পাওয়া উচিত। কিন্তু এই কথাটা যেই প্রাণ খুলে বলতে যাব,—প্রাণ খুলে কথা বলতে গেলেই একটুকটু দুচারটে কথাও বেরিয়ে পড়ে—অমনি তোমরা চোটে লাল হোয়ে যাবে। তোমরা তখনই বলে উঠবে—'দেখেছ, ভারতবাসীগুলো কত বড় নেমকহারাম; আমরাই ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে তুললুম, তাদের সুশাসনে কেমন বেঁধে রাখলুম, আজ কি-না ওরা বলে যে, ওরা আমাদের প্রভুত্ব চায় না; আজ কি না ওরা আমাদের ইচ্ছামত কাজ করবে না বলে আমাদের ভয় দেখাতে চায়। ওদের স্বায়ত্তশাসন কেড়ে নেওয়া উচিত।'

তোমরা যাই বল না কেন, স্বায়ত্তশাসন আমরা চাই। তাতে তোমরা বিরক্ত হোলে কি করি বল? তোমাদের দেওয়া শিক্ষার গুণে স্বায়ত্তশাসনের যেটুকু আস্বাদ পেয়েছি, তাতে বুঝেছি—স্বায়ত্তশাসনেই আমাদের

মঙ্গল; সে লক্ষ্য থেকে এখন আর আমরা পিছতে পারব না। আমরা এখন বুঝতে শুরু করেছি, আমাদের শাস্ত্রও সংক্ষেপে স্বায়ত্তশাসনেরই সমর্থন করে বলেছেন—সর্ব্বং পরবশং দুঃখং, সর্ব্বমাত্মবশং সুখং—পরের অধীনতাই দুঃখের কারণ, আপনার অধীনতাই সুখের কারণ। তোমাদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ এইটুকু—তোমরা বল যে, আমরা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারগুলো নেবার যেমন যেমন উপযুক্ত হব, তেমনি তেমনি অল্প অল্প করে তোমরা সেই অধিকারগুলো দিতে থাকবে। কিন্তু আমাদের কথা এই যে, আমরা তো আর জড়পদার্থ বা অজ্ঞান জীব নই—আমরা যে মানুষ। মানুষের ঘাড়ে ভার পড়লেই বুদ্ধি খুলে যায়। তোমরা আমাদের স্বায়ত্তশাসন একবার দিয়ে দেখো দিকিন—দেখবে আমরা তার উপযুক্ত হয়েছি। না হই—কেড়ে নিতে কতক্ষণ? আর এ-ই বা কি রকম—তোমরা ইউরোপের ছোটখাটো জাতগুলোকেও স্বায়ত্তশাসন দিতে প্রস্তুত, আর যত ওজর আপত্তি, যত বাধা এই প্রাচীনতম দেশ ভারতবর্ষের বেলা? আজ কয়েক বৎসর হোল আমেরিকার যুক্তরাজ্য ফিলিপাইন দ্বীপগুলো অধিকার করলে, আর এই কয় বৎসরের মধ্যে তারা স্বায়ত্তশাসন পাবার উপযুক্ত স্থির হোয়ে গেল; আর তোমরা শতাব্দীরও বেশী আমাদের প্রাচীন শিক্ষার উপর নূতন শিক্ষার ভাব ঢুকিয়েছ, তাতেও তোমরা আমাদের স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত মনে করতে পারলে না! আমাদের বেলাতেই তোমরা যে কথায় কথায় বল, 'আগে স্বাধীনতার উপযুক্ত হও, তবে স্বাধীনতা পাবে'—ঐ কথার কোনই মূল্য নেই। আগে সাঁতার শেখো, তার পরে পুকুরে স্নান কোরো—এ কথার কি কোন মূল্য আছে?

আমরা উপরে যে সমস্ত কথা বলে এলুম, সেই সমস্ত কথারই সমর্থন করে প্রীতি-ভোজের বক্তৃতায় লর্ড সিংহও বলেছেন—"ভারতের শিক্ষিত সমাজ ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী, আমি সে কথার সজোরে প্রতিবাদ করি। যদি ব্রিটিশ শাসনের অর্থে সুশাসনের নামে স্বেচ্ছাতন্ত্র ও প্রভুত্ব বজায় রাখা হয়, তা হলে আমি স্বীকার করি যে, শিক্ষিত সম্প্রদায় তার বিরোধী। যদি তাঁরা এই স্বেচ্ছাতন্ত্র ও প্রভুত্বের বিরুদ্ধে না দাঁড়াতেন, তা হলে নিশ্চয়ই জানতুম যে, তাঁরা ইংলণ্ডের সঙ্গে সুদীর্ঘ সহবাসের, আর তাঁরা যে শিক্ষা পেয়েছেন, সেই শিক্ষার অনুপযুক্ত।" * লর্ড সিংহ উদার রাজনীতির উপর দাঁড়িয়ে যে জ্ঞানগর্ভ কথাগুলি বলেছেন, আমরাও ধর্ম্মের ভিত্তির উপর ভগবৎনিহিত মনুষ্যত্বের উপর দাঁড়িয়ে সেই কথাই বলব।

গালাগালের কারণ ও সার রিচার্ড গার্থ।—লর্ড সিংহ এ কথা বল্লেন বটে, কিন্তু তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে? মনে তো হয় না। তোমাদের ধারণা, তোমাদের জাতের সঙ্গে আমাদের প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ।

* "I should * * enter a solid protest * * against the idea that appears still to prevail in certain quarters that the educated classes of India are unfriendly to British rule. If by British rule is meant autocracy and domination in the name and under the garb of efficiency, the educated classes of India are, I venture to affirm, opposed to it. We should not be worthy of our long connection with Great Britain and of our education, if we were not."

আমাদেরই চাকর যদি আমাদের উপর বুদ্ধি খাটিয়ে আমাদের সঙ্গে টক্কর দিতে চায়, সেটা আমাদের কেমন লাগে? ঠিক তেমনই তোমাদেরও মনে প্রভু-ভৃত্যের ভাব থাকাতে এটা মনে করা স্বাভাবিক যে, আমরা স্বায়ত্তশাসনই পাই আর যা-ই পাই, তোমাদের সঙ্গে টক্কর দেবার আমাদের অধিকার কি? আমরা যে একটা প্রাচীনতম সভ্য জাতি, অনেক বিষয়ে তোমাদের চেয়ে আমরা অনেক উঁচু আছি; আর সত্য-ইতিহাসের এই কথা যে, তোমরা সত্যিসত্যি লড়াই করে আমাদের জয় করবার জাঁক করতে পার না, এগুলো তোমরা মনে করতে চাও না। তোমাদের দেশে স্বায়ত্তশাসন পাবার জন্য কত মারামারি কাটাকাটি হোয়ে গেছে। আমরা কিন্তু সেই অতি পুরাকাল থেকে যে ধর্ম্মশাসন পেয়ে এসেছি, তার ফলে স্বায়ত্তশাসন পাবার জন্য মারামারি করতে আমাদের প্রবৃত্তিই হয় নি। কিন্তু তোমাদের দেওয়া স্বায়ত্তশাসনের এক টুকরো আর আমাদের ধর্ম্মশাসন, দুটোয় মিলে খুব শীঘ্র শীঘ্র আমাদের অন্তর্দৃষ্টি ফুটিয়ে তুলছে; আমরাও নিজেদের উন্নতির জন্য আর দেশের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করতে, শক্তি প্রয়োগ করতে খুব শীঘ্র শীঘ্র তৈরী হোয়ে উঠছি;—এত শীঘ্র যে তৈরি হোয়ে উঠব, সেটা তোমরা ভাবতেই পার নি। ভাবতে পার নি বলে, আমাদের নিজের যাতে ভাল হয়, দেশের ও দশের যাতে ভাল হয়, সেই সমস্ত ভেবে আমরা স্বাধীনভাবে প্রাণের কথা বলছি দেখলেই তোমরা বিরক্ত হোয়ে ওঠ আর আক্রোশের বশে গালাগাল দিতে থাক।

তোমরা যে এই জন্য গালাগাল দাও, তা তো আমরা আগে থাকতেই জানতুম। কিন্তু আজকালকার কাণ্ডকারখানা দেখে এসব কথা মুখ ফুটে বলতে সাহসে কুলোত না—কি জানি হঠাৎ একদিন প্রভাতের অরুণ কিরণের সঙ্গে চক্ষু খুলেই এক নোটিশ দেখতে পাব যে, অমুক স্থানে অন্তর্দ্ধান হবার হুকুম হয়েছে। ভাগ্যিস আজ লর্ড সিংহ প্রকাশ্য ভোজসভাতে নিজের কথা বলে নয়, কিন্তু খুব বড়দরের এক ইংরেজের কথা তুলে আমাদের কথা অক্ষরে অক্ষরে সমর্থন করেছেন, তাই আমার মতো ক্ষুদ্রপ্রাণ এক গরীব ভারতবাসী মুখ ফুটে সে কথা বলতে সাহস পেয়েছে। বেশী দিনের কথা নয়—১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কি জানি কেন, আমাদের উপর তোমাদের আক্রোশ ও আক্রমণটা কিছু বেশী রকমের হয়েছিল। সেই সময়ে পার্লামেণ্টের একজন রক্ষণশীল Tory সভ্য ও কলিকাতার হাইকোর্টের সেই সময়কার চীফ জষ্টিস সদাশয় সার রিচার্ড গার্থ ভারতবাসীদের উপর তোমাদের অন্যায় নিন্দা দেখে প্রাণে আঘাত পেয়ে খুব স্পষ্টভাষায় তোমাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন—"ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই আক্রোশের উপযুক্ত কি কাজ করেছেন জান? আমিই বলে দিচ্ছি, তাঁরা কি করেছেন। তাঁদের এ বড় স্পর্দ্ধার কথা যে, তাঁরা কেবল নিজেদের জন্য নয়, কিন্তু ভারত সাম্রাজ্যের লক্ষ লক্ষ গরীব ও মূর্খ লোকদেরও ভালর জন্য চিন্তা করেন! তাঁরা স্বার্থত্যাগ করতে পেলে খুসী হন, আর গবর্ণমেণ্ট অসন্তুষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকলেও তাঁরা গরীব স্বদেশীয়দের সাহায্য করতে প্রস্তুত।" *

"I cannot do better than quote one sentence from an article published

ভারতে ইংরেজের মিশন কি?—তবে কি ইংরেজ আর ভারতবাসীর মধ্যে—তোমাদের আর আমাদের মধ্যে এই রকম হিংসাদ্বেষ ঝগড়াঝাঁটি চিরকাল চলতেই থাকবে? তা হলে ছাই এ দেশে তোমাদের আসবার দরকার কি ছিল? তোমাদের এ দেশে আসবার কি কোনই mission ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। আমরা সামাজিকতার দোহাই দিতে দিতে অথচ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পথে চলতে চলতে ক্রমে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতাকেই বলতে গেলে জীবনের সম্বল করে তুলছিলুম। একান্নবর্ত্তী পরিবার ক্রমে নামেমাত্র দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। নিজেদের অহঙ্কার অভিমানের গণ্ডী, নেহাৎ-পক্ষে পরিবারের গণ্ডী ছাড়িয়ে সমস্ত দেশটাকে, সমস্ত সমাজকে, সমস্ত জাতিকে আপনার বলে দেখা ভুলে যাচ্ছিলুম। ওদিকে তোমরা মনে কর বটে যে, তোমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খুব আছে, কিন্তু আসলে তা খুব কম আছে। তাই যেই একদল পার্লামেণ্টে প্রভুত্ব পায়, অমনি অপর দলের কর্ম্মচারী হাজার কৃতকর্ম্মা হোলেও সুরসুর করে সরে যেতে বাধ্য হন। কেবল ইংলণ্ডে কেন, আমেরিকাতেও ঐ একই ধরণ। সেখানে আবার ট্যামানি প্রভৃতি এমন এক এক দল আছে, যাদের কথায় সেই সেই দলের লোক ওঠে বসে নাচে গায়।

as long ago as 1895 by the late Sir Richard Garth, K C., a Tory member of Parliament, and a former Chief Justice of Calcutta, nobly defending the classes whom he knew so well against similar attacks, which were then being made:—"What have they done to deserve this choice invective? I will tell you what they have done. They have dared to think for themselves and not only for themselves, but for the millions of poor ignorant people who compose their Indian Empire. They have been content to sacrifice their own interests and to brave the Government in order to lend a helping hand to these poor people."

দুই রকম ভাবের দুই বিপরীত গতি হোল কেন? আমার মনে হয় যে, আমাদের ভিতরকার ধর্ম্মের শাসন আসলে আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দিকে ক্রমাগত নিয়ে যেতে চায়। আর, তোমাদের বাহ্যিক আইনকানুনের রাজনৈতিক শাসন তোমাদের দলের অধীনতা, সমাজের অধীনতা, দেশের অধীনতার দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু প্রকৃতিতে সমস্ত শক্তিরই গতি সামঞ্জস্যের দিকে। প্রকৃতির প্রাণের সঙ্গে যোগযুক্ত হোতে চাইলে—আর তা হোতেই হবে—সামঞ্জস্য অবলম্বন করতে হবে। এই সামঞ্জস্য আনবার জন্যই ভগবান তোমাদের এ দেশে পাঠিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস। জগতের দুই প্রান্তে যখন ঐ দুই শক্তি দুই মুখে কাজ করে চলতে লাগল, তখন ভগবানের বিধানে ঐ দুই শক্তি পরস্পরকে টানতে লাগল, আর সময়ে শক্তিরাজ্যে সামঞ্জস্য আনবার জন্য মিলে গেল। এই সামঞ্জস্য সাধনের সুর ধরিয়ে দিয়েছেন—এক দিকে আমাদের দেশের রাজা রামমোহন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ভাই প্রতাপচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, কবি রবীন্দ্রনাথ, স্যর জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীগণ, অপর দিকে তোমাদের দেশের মোক্ষমূলর প্রভৃতি জর্ম্মন ইংরেজ পণ্ডিত। এখন সেই সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ করাবার সময় এসেছে। জগতের সমস্ত শক্তি এই সামঞ্জস্য সাধনের পথে এগিয়ে আসছে, তাই জগতে এত আন্দোলন আলোড়ন

চলেছে, তাই এই মহাসমর হোয়ে গেল, তাই এ দেশে সে দেশে সকল দেশে ভূমিকম্পের মতো ভাবকম্প উপস্থিত হয়েছে। শক্তিসমূহের ঘাত-প্রতিঘাতে যেন পৃথিবী কেঁপে উঠছে। এক মেঘ থেকে যখন ঘন তড়িৎ আর এক মেঘে ঢুকে সামঞ্জস্য বিধান করতে যায়, তখন কি-রকম বিদ্যুৎ চমকায়, আর কি-রকম বাজ পড়ে। আমরাও পৃথিবীময় যে বিপ্লবের ভাব দেখছি, সেটাও ঐ শক্তিগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টার একটা নিদর্শন মাত্র। এ দেশও তো পৃথিবীর এক অংশ, কাজেই এ দেশেও যে ঐ বিবাদ-বিপ্লবের ভাব অল্পবিস্তর জেগে উঠবে, সেটা কিছু আশ্চর্য্য নয়।

সামঞ্জস্য সাধনের উপায়।—সামঞ্জস্য সাধনের উপায় কি? বিবাদবিপ্লব, ঝগড়া-ঝাঁটি, হিংসাদ্বেষ দূর করবার উপায় কি? এদেশে যে বিবাদবিপ্লবের ভাব জেগে উঠেছে, যে আগুন জ্বলে উঠেছে, সেটা এখনও অল্পসংখ্যক ভারতবাসীর মধ্যে চাপা থাকলেও ক্রমে যে ছড়িয়ে পড়ছে, তাতো অস্বীকার করা যায় না। সে আগুন সহজে নিভবে বলে তো মনে হয় না। বরঞ্চ দেখতে পাচ্ছি, তোমরা যতই তাকে চেপে মারবার চেষ্টা করছ, ততই সে ফেঁপে উঠে এদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে ফেটে বেরোবার চেষ্টা করছে। এক, যদি এদেশের লোক মরে-হেজে একেবারে উজাড় হোয়ে যায়, তাহলে সমস্ত গোলমালই চুকে যায়—বিপ্লবের ভাবও সেই সঙ্গে মরে-হেজে উধাও হোয়ে যাবে। আর, তা যদি না হয়—খুব সম্ভব যে এত বড় একটা প্রাচীন দেশের এত কোটী লোক মরে না গিয়ে বেঁচেই থাকবে, আর বাড়তেও থাকবে—তাহলে বিপ্লবের ভাব দূর করবার জন্য অন্য উপায় ধরতে হবে।

সে উপায় কি? মেঘ থেকে ঘন তড়িৎ শক্তি যখন পৃথিবীতে নামতে চায়, তখন যদি লোহার শিক খাড়া করে তাকে নামবার পথ দেওয়া যায়, তা হলে সেই তড়িৎ খুব আওয়াজই করুক আর চোখই ঝলসে দিক, কোন অনিষ্ট না করে সেই শিকের পথ ধরে নেমে মাটীর ভিতর লুকিয়ে পড়ে। তেমনি আমাদের দেখতে হবে, এই বিপ্লবের ভাব কি চায়? আমরা দেখছি, এ স্বাধীনতা চায়। কাজেই বুঝতে পারছি যে, স্বাধীনতার পথটা একটু ফসাও করে দিলেই বিপ্লবের ভাব বিশেষ কোন গোলযোগ করতে পারবে না। স্বায়ত্তশাসন ভাল করে প্রাণখুলে দিলেই, সত্যিকারি আমাদের মনুষ্যত্বের উপর দৃষ্টি রেখে শাসন-সংস্কারে হাত দিলেই স্বাধীনতার পথ আপনিই প্রশস্ত হোয়ে যাবে। সে সব ভাল কাজ করবার বদলে তোমাদের দণ্ড দেবার রঙ্গ দেখে, আমাদের স্বাধীন ভাবকে চেপে মারবার অনর্থক চেষ্টা দেখে মনে হয়, তোমরা সময়ে সময়ে ভুলে যাও যে আমরা মানুষ। মানুষ হোলেই তো সে চাবেই স্বাধীনতা। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে অমন যে ক্রীতদাসেরা ছিল, তারাও কি স্বাধীনতা চাইত না? তারাও তো স্বাধীনতা চাইত। তখন আমাদের মতো শিক্ষিত ও সভ্য প্রাচীন জাত যে স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হোয়ে উঠবে, সেটা কি কিছু আশ্চর্য্য? মানুষের ভিতর স্বাধীন আত্মা বলে একটা আশ্চর্য্য জিনিস যতদিন থাকবে, ততদিন তার প্রাণের ভিতর থেকে স্বাধীনতার ইচ্ছা কখনই নির্মূল হবে না। ঘাত-প্রতিঘাতেই তো আগুন জ্বলে ওঠে। ঘাত-প্রতিঘাতের সম্ভাবনাটা যত দূর করবে, আগুন জ্বলে ওঠবার সম্ভাবনাও

ততই কম হবে। বিপ্লবের ভাব যেটা এ দেশে জেগেছে, সেটা দূর করতে গেলে একদিকে স্বাধীনতা যতটা পারা যায় দিতে হবে, আর একদিকে স্বাধীনতার বাধক যে সমস্ত আইনকানুনের জন্য তোমাদের সঙ্গে আমাদের অযথা সংঘর্ষ এসে পড়ে, যে সমস্ত আইনকানুনে কাজকর্ম্মে জন-সাধারণের কাছ থেকে বিষম বাধা পেতে হয়, সেই সমস্ত আইনকানুন কাজকর্ম্ম কৌশলে আস্তে আস্তে উঠিয়ে নিতে হবে, বন্ধ করে দিতে হবে। তোমরা যদি এই পথে না চল, যদি আমাদের স্বাধীনতার ইচ্ছা চেপে মারবার চেষ্টা কর, তা হলে হয়তো সে বিষয়ে কিছুকালের জন্য তোমরা কৃতকার্য্য হোতে পার, কিছুকালের জন্য হয়তো আমাদের স্বাধীনতাকে ফুটে বেরোবার অবসর না দিতে পার; কিন্তু সে ফুটে বেরোবেই। এ যে প্রকৃতির নিয়ম—ফুটে বেরোবে না বল্লেই কি সে ফুটে বেরোবে না? কিন্তু—সেই সময়—চারদিকে ঘোর ঝঞ্ঝাবাতের ভিতর দিয়ে, বজ্রবিদ্যুতের মহাপ্রলয়ের ভিতর দিয়ে, মৃত্যুর হাহাকার ছড়াতে ছড়াতে সেটা ফুটে বেরোবে। তখন হয়তো তোমরা নিজের ভুল বড়ই বিলম্বে দেখতে পাবে, যেটা তোমরাও চাও না, আমরাও চাইনে। আমরা বরঞ্চ চাই যে, তোমাদের আর আমাদের মধ্যে মানুষের মতো একটা সদ্ভাবে সৌহার্দ্দ্য, প্রেম, ভ্রাতৃভাব ফুটে উঠুক—যেটা তোমাদের এক দলের ফেউ ডাকার জন্য হোতে পারছে না।

রেভারেণ্ড হল্যাণ্ডের মত।—কথাগুলো তোমাদের কাছে তিতো লাগলেও বড়ই সত্যি। তোমাদেরই এক প্রবীণ জাতভাই রেভারেণ্ড হল্যাণ্ড ভারতে অনেকদিন থেকে ভারতবাসীর প্রাণের কথা ঠিক বুঝে, ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের সদ্ভাবের চিরন্তন যোগ কিসে থাকতে পারে, সেটা আলোচনা করে তোমাদেরই কাগজে তোমাদেরই উপ-দেশ দিয়েছেন যে, ভারতবাসীকে প্রাণ খুলে পুরো স্বায়ত্তশাসন দিতে এক মুহূর্ত্তও দেরী করা উচিত নয়। তিনি Overseas Journalএ লিখেছেন—"আর একটা উপায় হচ্ছে আমাদের ক্রমাগত প্রভুত্ব বজায় রাখা; ভারতবর্ষকে নিজের শাসনপ্রণালী ঠিক করবার অধিকার দেওয়া হবে না, সেখানে বিদেশী শাসন চেপে থাকবে; এই বিদেশী শাসন অবশ্য আগেকার মতো তার ভালই করতে থাকবে; কিন্তু ঠিক এই কথা বলেই তো জার্ম্মানরাও সমস্ত পৃথিবীতে তাদের প্রভুত্ব বিস্তার করবার অধিকার দাবী করেছিল। ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্বাধীনভাবে নিজের নিজের শাসনপ্রণালী স্থির করবার অধিকার আছে, আর সেই অধিকার আমরা বজায় রাখব বলে যে বড়াই করেছিলুম, সেটা কি জর্ম্মনির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের অন্যতম উপায়স্বরূপ একটা রাজনৈতিক ঠকামি মাত্র? তা নয়। সার হেনরি ক্যাম্বেল ব্যানারম্যান ঠিকই বলেছেন—'সুশাসন স্বায়ত্তশাসনের বদলী ধরা যেতে পারে না।' আমাদের যদি কেউ অপরের অধীনে টাকাকড়ি ও আরাম, আর যে দুঃখ কষ্ট আমাদের উঁচু করে তুলবে, মানুষ গড়ে তুলবে সেই দুঃখ কষ্ট, এই দুয়ের মধ্যে একটা বেছে নিতে বলে, তবে নিশ্চয়ই আমরা স্বাধীনতার কণ্টকময় পথই প্রত্যেক-বার বেছে নেব। যখন আমরা জানি যে স্বাধীনতাই কল্যাণতম, তখন আমরা আমাদের নিজের জন্য, আর সাধ্যমত পরের

অন্তত সেই স্বাধীনতাই বেছে নেব। অবশ্য, স্বাধীনতার সঙ্গে অনেক ঝুঁকি নিতে হয়, কিন্তু সেই ঝুঁকি সেই দায়িত্ব নিলেই তো মানুষ গড়ে ওঠে। এই সমস্ত দায়িত্ব বা ঝুঁকি আমরা না নিয়ে ভারতবর্ষের যে নিতে হবে, তাই ভেবেই আমরা থমকে দাঁড়াই। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা পুরোণো কিনতে পাওয়া যায় না, আর স্বাধীনতার বদলে আরাম ও নিরাপদ দিতে গেলেও ভারতবাসী সন্তুষ্ট হবে না। সমস্ত জগত আজ সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালীর পক্ষে দাঁড়িয়েছে, এখন তার বিপরীত কোন কথা বলা সাজে না; আর যে চিন্তার ধারা সমস্ত জগতকে এই সিদ্ধান্তে এনে ফেলেছে, সেই চিন্তার ঢেউ ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ওলটপালট খাচ্ছে। যুগযুগান্তর থেকে আগত ভারতের প্রাচীন সভ্যতার কাছে আমাদের নিজেকে সেদিনকার ভুঁইফোঁড় বলে মনে হয়। সেই ভারতের বাসিন্দা সমস্ত পৃথিবীর লোকের পাঁচভাগের একভাগ। এতগুলো লোককে স্বাধীনতার পথে চলতে শিক্ষা দেওয়াই তো ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞদের সুখের কাজ। এ কাজ থেকে আমরা কিছুতেই পিছব না।" Overseas Journalএর সম্পাদকও এর উপর মন্তব্যে লিখেছেন—"ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রেখে আপনার শাসনকার্য্য আপনি চালাবার অধিকার দেবার বিষয়ে আমাদের সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করা উচিত।" *

তোমাদের আর আমাদের মধ্যে একটা মানুষের মতো সৌহার্দ্য ফুটে উঠুক, চাই বলেই তোমাদের বলতে চাই যে, তোমরা আমাদের পিছনে ফেউ ডাকো, মিথ্যা

* "These words are not my own, but those of Rev. W. E. S. Holland, a well-known and universally respected missionary educationist, who has lived many years in India. They were published in the Indian number of the Overseas Journal, not many months ago :—

"Yet the alternative is our own continued domination; not self-determination in India, but foreign rule: beneficent no doubt as heretofore; but that is the very claim the Germans advance as their right to dominate the world. Or is our championship of the right of nations to free self-determination only political camouflage for war propaganda against Germany? No. As Sir Henry Campbell Bannerman once so well said 'Good government is no substitute for self-government' If we have to choose between the loaves and fishes of fat and soft security under domination and all the ennobling pain that makes us men, we will choose the arduous path of freedom everytime. And because we know it is the highest good, we must choose that for others as well as for ourselves, so far as they are in our hands. Of course, it means taking risks, but that way men are made. What makes us pause is this, that the risks have to be run by India, not by us. Political experience cannot be bought secondhand, nor will India any longer be content with the offer of security and comfort in place of freedom. It is too late to go back upon the world's pronouncement in favour of popular government: and the thoughtnerves of the world that have so decided now run through India from end to end. This is the exhilarting task that now confronts British statesmanship, the training for freedom of one-fifth of the entire world's population, of peoples besides whose hoary civilisation milleniums old we seem to be but a mushroom growth of yesterday, and we shall not shirk it."

নিন্দা করা, গালাগাল দেওয়া, এ সমস্ত ছেড়ে দাও। কথায় কথায় দণ্ডের ভয় দেখানো ছেড়ে দাও। ন্যায়ের উপর, প্রেমের উপর ধর্ম্মের উপর দাঁড়িয়ে শাসনের ব্যবস্থা কর, মনুষ্যত্বের উপর আমাদের দাঁড়াতে দাও। তোমরা কি জান না যে, ভাল লোককেও চোর বলতে বলতে ভাল লোকও অনেক সময় চোর তৈরি হয়, আবার চোরকেও সাধু বলতে বলতে চোরও সাধু হোয়ে যায়, দেখা গিয়েছে? তোমরা যদি ক্রমাগত বল যে আমরা দুষ্ট, বিপ্লব ঘটানোই আমাদের কাজ, আমাদের অন্তরূত (interned) না করলে তোমাদের ভারতসাম্রাজ্য দাঁড়াতে পারছে না, গোলাগুলি চালিয়ে আমাদের শত শত লোককে খুন না করলে আমরা সায়েস্তা হব না, তা হলে তো আমরা ভাবব যে, আমাদের তো বদনাম যা হবার তা হয়েইছে, তখন আর আমাদের ভালমানুষ হোয়ে ফল কি? তার পর বিপ্লবের ভাব মনের ভিতর পুষতে থাকলে স্বভাবতই আমাদের ছেলেপিলেরাও সেই ভাবে মানুষ হোতে থাকবে। তোমাদের এই ত্রিশ পঁয়ত্রিশ কোটী প্রজা বিদ্রোহের বীজ প্রাণের ভিতর পুষে রাখবে, সেটা কখনই ভাল বলতে পার না। তার চেয়ে, আমাদের ঐ সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রেখে পুরো স্বায়ত্তশাসন দিয়ে একবার দেখো, আমরা সত্যিসত্যি কত ভাল মানুষ, কত কৃতজ্ঞ।

Thus speaks a freeborn Englishman, and may I add with respect a faithful follower of Christ's teachings. In the editorial notes of the same journal, we read as follows: "Our task must be to render every assistance in our power towards the development of an autonomous India within the Empire; * * *,

নীরব সাধনা কর্ত্তব্য।—তোমাদের গালাগাল দেওয়াটা কেবল থামলে চলবে না, আমরা চাই যে আমাদের পাল্টা জবাব দেবার নেশাটাও তেমনি কেটে যাক। এই নেশাটা না কাটলে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি ফুটতে পারবে না; রাজনৈতিক হল্লার মধ্যে, লম্ফঝম্ফের মধ্যে বিচরণ করতে থাকলে আমরা কিছুতেই নিজেদের উন্নতি সাধন করতে পারব না। আমরা বলে এসেছি যে, মিথ্যা নিন্দা গালাগালকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখাই হোল আমাদের দেশের প্রাণের কথা। কোন কিছুতে অধীর না হোয়ে আপনার কর্ত্তব্য করে যাওয়াই আমাদের কাজ—আমরা ছেলেবেলা থেকে এই শিক্ষাই পেয়ে আসি। তোমাদের নেলসন দৈবাৎ বলেছিলেন, England expects every man to do his duty। আমাদের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল কথা এই যে, কোন কিছুতে অধীর না হোয়ে নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে যেতে হবে। অধৈর্য্য প্রকাশ করে গালাগালের জবাব দিলে, যাঁদের উদ্দেশে সেই জবাব দেওয়া হয়, তাঁদের গায়ে বিশেষ লাগে কি না সন্দেহ, সুতরাং সেদিক দিয়ে দেখলে জবাব দেওয়াটা নিষ্ফল। বরঞ্চ মনে হয় যে, তাঁরা দূর থেকে মজা দেখেন আর হাসেন যে তাঁদের গালাগালটা আমাদের গায়ে লেগেছে। আবার আমাদের দিক থেকে দেখলে জবাব দেওয়াটা বৃথা সময় নষ্ট করা মনে হয়। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এক মুহূর্ত্তও অনর্থক নষ্ট করা পাপ। আমাদের এখন, যাতে আমাদের সত্যিসত্যি উন্নতি হোতে পারে, সেই সমস্ত কাজ সিদ্ধ করবার জন্য কঠোর নীরব সাধনা দরকার। আমরা যদি মনে করি, একটু

হল্লা না করলে, হৈচৈ না করলে, পাঁচজন লোকে জানবে কি করে যে, আমরা কি মহান কাজ করছি, কাজেই পাঁচজন লোক আমাদের দলে আসবে কি করে, তবে সেটা বড় ভুল, সেটা ভারতবাসীর অনুপযুক্ত কথা। আমরা চোখের সামনে দেখছি, যাঁরা দেশের নেতা হোয়ে খুব হৈচৈ করেন, কয়জন লোক প্রাণের সঙ্গে অবিচলিত ভাবে তাঁদের অনুসরণ করেন; আর যাঁরা ভাস্করানন্দ স্বামী প্রভৃতির ন্যায় নীরব সাধনায় যোগসিদ্ধ হয়েছেন, কত হাজার হাজার লোক তাঁদের কথায় ওঠেন বসেন, বাঁচেন মরেন। রাজনীতিক্ষেত্রেও জলজ্যান্ত দেখছি যে, সমস্ত দেশবাসী নীরব সাধক মহাত্মা গান্ধিকে কি রকম পূজা করেন। এই সমস্ত আলোচনা করে আমরাও আমাদের প্রত্যেক দেশবাসীকে নীরব সাধনায় সিদ্ধ হোতে বলি।

Proscription ভুল।—আমরা তো অনেক কাল ধরে ইতিহাসের নামে অনেক মিথ্যা কথা পড়ে মনুষ্যত্বহীন জীববিশেষ তৈরি হচ্ছিলুম। কিন্তু তারপর ক্রমে ক্রমে যখন দেশের যথার্থ ইতিহাস বেরোতে লাগল, তখন আমাদের চোখ ফুটল যে আমরা, অন্তত আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তো মিথ্যা ইতিহাস-বর্ণিত কাপুরুষ স্বদেশদ্রোহী অধম জীব ছিলেন না; তখন আমাদের প্রাণের ভিতরে উৎসাহ ও আশা প্রদীপ্ত হোয়ে উঠল এই সম্ভাবনা দেখে যে, ইচ্ছা করলে আমরাও তাঁদের মতো উন্নতির শিখরে উঠতে পারি। এই যে যথার্থ ইতিহাস বেরোল—এগুলো কি করে বেরোল? হল্লার ফলে নিশ্চয় বেরোয় নি। দেশগতপ্রাণ অনেক মহাত্মা হল্লায় মেতে নিজেদের ক্ষণিক যশ পাবার লোভ ফেলে দিয়ে নীরব সাধনাকে জীবনসর্ব্বস্ব করে তবে সেই সব যথার্থ ইতিহাস উদ্ধার করতে পেরেছেন। সেই সত্য ইতিহাসের ফলে আমাদের অল্পস্বল্প মনুষ্যত্ব ফুটতে আরম্ভ করেছিল বলেই আমরা যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য প্রাণ দিতেও অগ্রসর হোতে পেরেছিলুম। রাজনৈতিক বৃথা চীৎকার ও হল্লা করবার ফলে আমাদের একটা গুরুতর অনিষ্ট হয়েছে এই যে, দেশের বিষয়ে সত্য কথা লেখা বা বলা অনেক পরিমাণে বন্ধ হোয়ে গেছে। ধর যে গবর্ণমেণ্ট ভুলক্রমে একটা গুরুতর অন্যায় করেছেন। সে বিষয়ে আমরা লিখলুম। গবর্ণমেণ্ট একটা communique বের করলেন যে, যেহেতু ঐ লেখার ফলে দেশবাসীদের গবর্ণমেণ্টের প্রতি অটল ভক্তি চলে যাবার সম্ভাবনা, অতএব ঐ লেখা আর প্রকাশ করতে পারবে না। এতে আমাদের তো খুবই অনিষ্ট হোল—আমরা দেশের বিষয়ে সত্যকথা জানতে পারলুম না। গবর্ণমেণ্টেরও এতে অনিষ্ট হয়—তাঁরা আপাতত সেটা ধরতে পারেন না। সত্য কথার উপর ভিত্তি করে সত্য ইতিহাস যদি বেরোয়, গবর্ণমেণ্টের যাঁরা হাল ধরবেন, তাঁরা সেই সব সত্য ইতিহাস পড়তে পেলে তবে না তাঁদের কর্ত্তব্য ঠিক কি তা স্থির করতে পারেন। দেশের বিষয়ে সত্যকথা গবর্ণমেণ্টের রেকর্ডে থাকলেও তা না প্রকাশ হোলে, বলা বাহুল্য যে, রাশি রাশি মিথ্যা ইতিহাসেরই সৃষ্টি হবে; আর সেই সব মিথ্যা ইতিহাসের উপর গবর্ণমেণ্ট, অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা নিজেদের কর্ত্তব্য স্থির করলে মিথ্যার ফল তাঁদের পেতেই হবে। তাঁরা সত্যকথা না শুনলে আমাদের প্রাণের কথা বুঝবেন কি করে, আর সুশা-

মনের দ্বারা আমাদের প্রাণকে শীতলই বা করবেন কি করে? এই জন্য আমরা নিজেদেরও বলি যে, বৃথা হৈচৈ কোরো না, কেন না a subject nation has no politics; আর তোমাদেরও বলি যে, সাহিত্যের কোন কিছু সত্যিসত্যি নিতান্ত রাজবিদ্রোহ প্রচার না করলে কথায় কথায় proscribe করতে যেও না—করাটা বড়ই ভুল।

ভিক্ষার ফল।—আমাদের দেশে একটী শ্লোক প্রচলিত আছে, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি, তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং, ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ" বাণিজ্যেই লক্ষ্মী নিত্য বিরাজ করেন, কৃষিকর্ম্মে অর্দ্ধেক ধন, রাজসেবাতে সিকি ধন; ভিক্ষার ফল নির্ধনতা। এ থেকে আমরা এইটী পাচ্ছি যে, যেটি-তে যতটা উদ্যম প্রয়োগ করা দরকার হয়, সেইটা থেকে তত বেশী লক্ষ্মীলাভ হয়—ভিক্ষাতে লক্ষ্মীলাভের চেষ্টা বৃথা। আমাদের দেশে এই প্রবাদ খুব প্রচলিত থাকলেও আমরা কাজের বেলায় শেষের দিক থেকেই ধরে চলি। কোন কিছু পেতে ইচ্ছা করলে প্রথমেই দেখি যে, ভিক্ষে করে সেটা পাওয়া যায় কি না; তার পর গবর্ণমেণ্টের চাকরীকে ভরসাস্থল করি; তারপর দুচার বিঘা জমীজিরাত করি, আর সর্ব্বশেষে যার অন্য কোন কিছুতে আশা নেই, সে-ই ব্যবসায়ে লেগে যায়। কাজেই আমাদের দেশে বিশেষত বঙ্গদেশে এত অবনতি—ব্যবসায়ে এত পতন। রাজনৈতিক অধিকার নেবার চেষ্টাতেও আমরা এই নীতিই প্রয়োগ করি। বর্ত্তমানে আমাদের ভিক্ষার পালাই চলছে। আমরা ভিক্ষার জোরে মনে করছি, স্বায়ত্তশাসন অধিকার কোরে বসব! ভিক্ষার চেঁচানির চোটে আমরা আমাদের প্রার্থিত অধিকারের কিছু কিছু আদায় করেছি বটে। কিন্তু তার ফল কি? লক্ষপতি যেমন দ্বারস্থ ভিখারীকে একটী পয়সা দিয়ে বিদায় দেন, এ ও তেমনি। আমরা চাই পুরো স্বায়ত্তশাসন, তার স্থলে স্বায়ত্তশাসনের 'স' যদি পেয়ে থাকি তো যথেষ্ট। এই রেটে চলতে পারলে ভিক্ষার ফলে কবে যে স্বায়ত্তশাসন পুরোমাত্রায় পাব তা বলতে পারি নে। তার পর, খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যখন মনের মতো জিনিস না পাই, তখন দুর্বিনীত ভিখারীর মতো ভিক্ষাদাতাকে অভিশাপ দিতে উঠি, গালাগাল দিতে থাকি, এক কথায় তাঁকে উত্যক্ত করে তুলি। তখন আবার সেই দুর্বিনীত ভিখারীর মতো শাস্তি পেতেও বাধ্য হই—দুএকটা চড়চাপড় গলাধাক্কাও অদৃষ্টে জোটে। কিন্তু এই রকম শাস্তি দেবার পর আমাদের দয়াবান গবর্ণমণ্টের একটু দয়া হয়, তখন আবার তাঁরা আমাদের প্রার্থিত জিনিসের আর এক টুকরো দিয়ে বিদায় দেন। আমরা অনেক মনিব দেখেছি, যাঁরা চাকরদের দোষ দেখে রাগের চোটে এক চড় দিলেন, তার পরে রাগটা একটু পড়ে গেলেই এক টাকা দুটাকা বক্সিস দেন। এতে চাকর মনে করে যে, চড় খেলুম, খেলুমই বা, একটা টাকা তো পেলুম। চাকর বক্সিস পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে। আমরাও সেই রকম এক আধ টুকরা স্বায়ত্তশাসন বক্সিস পেয়ে খুবই খুসী হই; কিন্তু তার ফলে দাঁড়ায় এই যে, পুরো স্বায়ত্তশাসন পেতে গেলে যে কঠোর সাধনা দরকার, তার দিকে আর এগোতে চাইনে।

স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত হও।—আমার

বক্তব্য এই যে, স্বায়ত্তশাসনের জন্য ভিক্ষার ঝুলি পেতে একবার এখানকার দরবারে, একবার বিলাতের দরবারে না দাঁড়িয়ে কঠোর নীরব সাধনা দ্বারা পুরো স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে থাক। এ সম্বন্ধে যে কয়েকটী বাঙ্গালী বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করেছি, তাঁরা বলেন যে, আমাদের যখন কোনই ক্ষমতা নেই, তখন ভিক্ষে করেই চলতে হবে; যেটুকু স্বায়ত্তশাসন পাই, তাই নিয়েই আমাদের বড়মানষী ফলাতে হবে। এ সব কথাতে আমি আলস্যেরই ছায়া দেখতে পাই। এ কথা আমি একেবারেই বিশ্বাস করিনে। কারণ—আমি ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভগবানের মঙ্গল বিধানে পুরো মাত্রায় বিশ্বাস রাখি। তিনি প্রকৃতিরাজ্যে এমনই সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, যে বিষয়ে যে যতটুকু প্রস্তুত হবে, সেই বিষয়ে সে ততটুকু অধিকার পাবে। এই নিয়মের একটী উদাহরণ দিচ্ছি, তাতে কেহ যেন মারোয়াড়ি বন্ধুদের আমি নিন্দা করছি বলে ধরে না নেন। আমাদের চোখের সামনেই তো দেখছি যে, আমাদের মারোয়াড়ি বন্ধুরা একমনে ধনৈশ্বর্য্য পাবার জন্য নীরব সাধনা করে যথেষ্ট ফল পেয়েছেন—এমন কি, সমস্ত কলকাতা তাঁদের একচেটে হবার যোগাড় হচ্ছে। সেই রকম আমরাও যদি অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা চ পৃষ্ঠকে, অপমানকে সামনে রেখে আর মানকে পিঠে ফেলে অর্থাৎ মান বা অপমান কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করে চুপচাপ করে নিজেদের উন্নতি সাধনে যত্ন করি, সত্যিসত্যি স্বায়ত্ত-শাসনের উপযুক্ত হই, তবে কেহই আমাদের স্বায়ত্তশাসন পাওয়া বন্ধ করতে পারবে না।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারণ চাই।—উপসংহারে আমাদের একটী বক্তব্য এই যে, আমরা এ কথা যেন মনে রাখি যে, আমাদের সমস্ত উন্নতির, সমস্ত নীরব সাধনার মূল কেন্দ্র হচ্ছে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারণ। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের ভিতর সমস্ত উন্নতিই বীজরূপে নিহিত আছে। ব্রহ্মচর্য্যের কথা শুনলে হঠযোগ প্রভৃতির কথা মনে আসে আর ভয় হয়। কিন্তু এতে সে রকম ভয়ের কোন কারণ নেই। ব্রহ্মচর্য্যের মূলভাব এই যে, আমাদের সকল কাজেই ভগবানে বিচরণ করতে হবে, তাঁকে স্মরণ করে নিবেদন করে আমাদের সকল কাজই করতে হবে। এ ভাবে চল্লে আমাদের রাজনৈতিক বা অন্য কোন রকমেরই হল্লাতে যাবার অবসরই আসবে না। এ ভাবে চল্লে নীরব সাধনার ইচ্ছা আপনিই প্রাণের ভিতর জেগে উঠবে। এখন আমরা বাহিরে খুব হৈহৈ চীৎকার করতে থাকলেও সত্যিসত্যি প্রাণের ভিতর দেশের মঙ্গল ইচ্ছা করি কি না সন্দেহ। তা যদি করতুম, তবে আমরা দেখতে পেতুম যে, আমাদের দেশের নেতারা আজ একবাক্যে কাজে ও কথায় মদ খাওয়া, সিগারেট খাওয়া, এই সব দেশের অনিষ্টকর প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন, আর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতেন। এ তো জানা কথা আর সর্ব্ববাদী-সম্মত যে, মদে সিগারেটে একদিকে তো দেশের ছেলেদের সর্ব্বনাশ করছে, আর একদিকে দেশের রাশি রাশি টাকা টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমরা দেশের খুব মঙ্গল ইচ্ছা করি কি না, তাই এক মুহূর্ত্তে স্বদেশী ভাবের সপক্ষে খুব লম্বাচৌড়া বক্তৃতা করলুম, তার পরক্ষণেই ঘরে গিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে আর মদের বোতল খালি করে দেহের ও মনের শ্রান্তি

দূর করলুম। আমাদের দেশের ভাল করবার জন্য বড্ড টান, কি না, তাই আজ দেখি, শিক্ষিত বামুন কায়েতের ছেলেরাও মদ, গাঁজা প্রভৃতির দোকান খুলে নিজেদের পেট পোরাবার, আর সেই সঙ্গে দেশকে নরকে ডোবাবার ব্যবস্থা করে সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন। ভগবান বড় সূক্ষ্মদর্শী, তাঁকে কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না। তিনি স্পষ্ট দেখছেন যে, আমরা আত্মপ্রতারক, কাজেই স্বায়ত্তশাসন পাবার উপযুক্ত নই, বরঞ্চ গালাগাল খাবারই উপযুক্ত; তাই আমরা গালাগালও খাচ্ছি, আর স্বায়ত্তশাসন পাবার জন্যও হাহুতাশ করছি। যাঁরা খবরের কাগজ চালান, তাঁরা কি দেশের অনিষ্টকর মদ প্রভৃতির বিজ্ঞাপন ছেপে দুপয়সা রোজগারের লোভ সামলাতে পারেন? যতদিন আমরা তা না পারি, ততদিন যেন অন্যদের সঙ্গে ঝগড়া না করে, নিজেদের সংযত করতে, ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করতে যত্ন ও চেষ্টা করি।

জাপানের দোহাই।—আমরা কথায় কথায় জাপানের দোহাই দিই। কিন্তু জাপানের মতো কোন্ কাজটা করি? জাপানের মতো আমরা কি একদিনে আভিজাত্যের অহঙ্কার অভিমান ছাড়তে পেরেছি? জাপানের মতো দেশের মান্যগণ্য লোক হয়েও দেশবিদেশে কুলির বেশ ধরে কুলির কাজ করে কি দেশবিদেশের বিদ্যা আয়ত্ত করতে ছুটতে পেরেছি? জাপান অনেক কাল ধরে নীরব সাধনা করে নিজের শক্তি কি রকম সঞ্চিত করেছিল, সেটা আলোচনা করলে নীরব সাধনার ফল প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়ে আমাদেরও প্রাণে আশা উৎসাহ জেগে ওঠে। জাপানের সেই নীরব সাধনার অব্যক্ত ফল রুষিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যক্ত আকার ধারণ করে জগতকে চমকিয়ে দিয়েছিল। আমাদের দেশের মহাভারতেও দেখি যে, পাণ্ডবদের বহু বৎসর ধরে নীরব সাধনারই ফলে তাঁদের নেতৃত্বে সাত অক্ষৌহিণী সেনা কৌরবদের এগারো অক্ষৌহিণীকেও পরাস্ত করতে পেরেছিল।

আমাদের কর্ত্তব্য।—সংক্ষেপে আমাদের সর্ব্বশেষ উপদেশ এই যে—

(১) ভগবানের উপর কর্ম্মফল ফেলে দিয়ে নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে যেতে হবে। নীরব সাধনাকে ব্রতরূপে গ্রহণ করতে হবে।

(২) নিন্দা প্রশংসাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখে শক্তিকে সঞ্চিত ও সংহত করতে হবে।

(৩) সত্য থেকে বিচলিত হোলে চলবে না।

(৪) ব্রহ্মচর্য্যের উপর নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে।

উপনিষদের ভাষায় এক কথায় আমরা বলতে পারি—

সত্যান্ন প্রমদিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিতব্যং
ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং।

সত্য হোতে বিচ্যুত হবে না, কল্যাণের পথ হোতে বিচ্যুত হবে না, আর ধর্ম্ম থেকে বিচ্যুত হবে না।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পোলাও।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

বিদ্যাগৃহ কারাগৃহ ঔদার্য্য-বিহীন
গুরু যিনি, নৈসর্গিক হৃদয় বর্দ্ধন
সতত করিতে খর্ব্ব, আবৃত্তি করেন
সারল্য-বর্জ্জিত, রুক্ষ, পাশ্চাত্যের নীতি।
যে নীতি কর্দ্দমপূর্ণ যাহার মাঝারে
জীবন স্পন্দন নাই প্রবুদ্ধ করায়
সঞ্জীবনী শক্তি সহ নব চেতনায়।

কোথা সে সংযমী গুরু নির্ম্মল জাবালি
গোমুখী-নিঃসৃত পূত জলোচ্ছ্বাস সম
বিচ্ছুরিত বিথারিত আগম মথিত
সুধারাশি, শিশুপ্রাণ হইত প্রবুদ্ধ
হইত রসাল, ধৌত, নির্ম্মল পাবন।
লীলায়িত অনুভূতি উঠিত উদ্বেলি
বুঝিত সে অরণ্যের মর্ম্মর আকুতি
ঝরিত নয়ন তার শুনিয়া কাকলী
তরুপরে ভাবমুগ্ধ রসিকা শ্যামার।
ভাদরের বারিধারা উন্মুক্ত পুলক
কম্পিত কণ্টকায়িত কদম্ব পরাণ
অভ্রস্পর্শী নগেন্দ্রের পূর্ণ বিকশিত
নবঘন পরিবৃত দেখি অপঘন
বালকের পরানেরে করিত আয়ত।

চার্দ্দ অনুভূতি মালা চলচ্ছক্তিহীনা,
শিক্ষা আজি জাগাইছে বিলাসবালায়,
স্বার্থদষ্ট অর্দ্ধভুক্ত শ্রমলব্ধ বিত্ত,
গুরুর গুরুত্ব আজি করিছে দুর্ব্বল।
ছিল গুরু বংশীবট, গৌরব-মণ্ডিত
মহিমার শত শাখা চুম্বিত আকাশ
ছাত্র ছিল শাখাশোভা নবীন পল্লব।

অতি শীর্ণ অতি শুষ্ক খ্রীষ্টীয় যুগের,
নীতিকথা, প্রাণ যার পশি প্রেতলোকে,
নির্ব্বাণ অনলমাঝে সুখে ঝম্প দিয়া,
মহাচৈতন্যের বক্ষে হয়েছে বিলীন,—
সেই নীতি-কথা, নীতিহীন কণ্ঠহ'তে
হইয়া নির্গত, পশিছে শিশুর কর্ণে;

মর্ম্মে কভু পশে না সে স্নেহশূন্য বাণী
ক্ষীণ বারিধারা যথা পারে না কখন
অভিসিক্ত করিবারে তৃষার্ত্ত মরুরে।

বিদ্যাগৃহে বালকের জড়ত্ব বাড়ায়,
জড়ত্বে-জড়িত প্রাণ, প্রাণত্ব-বিহীন
প্রাণতার খাদ্য নিতি জোগায় মানস
মানস অফুল্ল সদা পুলক বঞ্চিত
প্রাণের প্রাণত্ব কোথা (?) অচঞ্চল জড়
খাদ্য নাই ভগ্নগৃহে বসতি তাহার।

সভ্য কে গো? কারা সভ্য? সভ্যতাই
বা কি?
সভ্যতার মানদণ্ড কোথা বল পাব?
পাশ্চাত্য সভ্যতা চায় দুর্ব্বলের পূজা,
পাশ্চাত্য সভ্যতা চায় দুর্ব্বল দলন,
প্রবঞ্চনা প্রতারণা সভ্যতা দেবীরে
নিয়ত করিছে দান নব উপায়ন।
বিলাস-মদিরা পান করি অহর্নিশ,
প্রবৃত্তির শতদ্বারে করিছে ভ্রমণ,
রমণীর প্রাণমাঝে, করিছে স্বজন
মৃগতৃষ্ণিকার তৃষা মদন অনল।

তপোবন আলোকরা, আর্য্যের সভ্যতা!
রসাপ্লুত করিত সে স্বর্গীয় স্বগণে,
বৈচিত্র্যের দীপ্তছটা করিয়া বিস্তার,
দেখাইত সর্ব্বজনে বিধাতার লীলা,
জাগাইত, মাতাইত, নাচাইত প্রাণ,
জাগরণ সনে সে যে করিত বিলাস।
এও করাইত পান অহেতুক Champagne
ভক্তির হ্লাদিনী সুধা, যতেক মদ্যপা
ভূমানন্দে মাতোয়ারা থাকিত হইয়া।
শিখাইত পরিচর্য্যা, বেদনার বোধ,
শিখাইত চিদানন্দ পরম সুন্দর,
শিখাইত অচ্যুতের আনন্দ বিভব,
শিখাইত আত্মজয় পরম পুলক।
কি শিখিছে শিশুগণ? ভবিষ্য জগৎ

বিলাস সুখের খনি, শ্রেষ্ঠ আত্মসুখ ;
পরহিত কামনার দ্রুত তীব্র গতি
রোধ করি দাঁড়ায়েছে দর্পের বিধান।
ত্যাগে সুখ ভোগে পাপ কে বল শিখায় ?
উপনিষদের সুধা কে করাবে পান ?
কে শিখাবে চিন্ময়ের ঐশ্বর্য্যনিচয় ?

বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদ্‌ব কি ভাই
কান্তে লাগে ভয়,
ধরা পাকড় চারদিকেতে
কখন কি যে হয়।
যত্ন করে রত্ন দিয়ে
কিন্‌তেছি সব কাঁচ
যাচ্ছি ভেঙ্গে উঠছে মনে,
ভাঙ্গা ছবির ছাঁচ।
কাল মেঘের ছায়া দেখি
যুবা উঠে কাঁপিয়া,
রুগ্ন শিশু মায়ের কোলে
ভয়ে ধায় ঝাঁপিয়া।
বুড়ো মনে ভাবে এখন
মরলে পরে হয় ভালো,
সাপের বাঁধন খসে যাবে
ঘুচে যাবে জঞ্জাল।
আমরা ? আমরা ? আমরা কেগো ?
আমরা যেগো পরগাছা,
পরের রসে পুষ্ট দেহ
কোনোমতে প্রাণ বাঁচা।
আমরা খাচ্ছি, ভায়ের মাংস
ভায়ের রক্ত কচ্ছি পান,
দয়া মায়া, পুঁথির কথা
মোদ্দা আনা শুধুই ভান।
ও সভ্যতা ! ও রাক্ষসি !
আর বাজাসনে বীণা তোর,
বিষ মাখান মধুর সুরে
আস্ত ভারত নেশায় ভোর।
স্বরাজেরে সরিয়ে দেরে
M. P. হ'তে চাইলে কেউ,
Political সাগর-জোড়া
শৈলনিভ ভীষণ ঢেউ।
দুগ্ধ ঘিয়ের নাহি প্রয়োজন,
কুধ-চিঁড়েতে তৃপ্ত রব

অল্প করে দিয়ো তো
ভেড়ার মত সবি সব।
সজল চোখে ডাক্‌তে দিয়ো,
Mysterious ভগবানে,
বিলাস নিয়ে তোমরা থেকো
আমরা রব হরির গানে।
আগম পুরাণ বেদের কথা
শঙ্করের সেই ধ্বংসবাদ,
এতেই যেন ভক্তি থাকে,
করুন প্রভু আশীর্ব্বাদ !
পশ্চিমেরই, জোরের হাওয়ায়
সমাজ গৃহ যাচ্ছে ভেঙে,
অভাব নেটার উৎপীড়নে
ফিরছে ধাবিদ্ ভিক্ষা মেগে।
অন্নপূর্ণার অন্ন-সত্রে,
মুখ দিয়েছে কুকুরে
অশুদ্ধাচার অভিনয়
দেখ্‌ছি হৃদয়-মুকুরে।
কাণ্ড দেখে দয়াময়ী,
পালিয়ে গেছেন দক্ষালয়
বাপের দম্ভে ডুবে আছেন
বধির তাঁহার শ্রুতিদ্বয়।
অনাচারে Mammoth সম
আমরা যাব ধ্বংসপুর,
থাক্‌বে যারা অনাচারী
জিহ্বা-bud আর্য্যচুর।
Ideaতে মানুষ বাঁচে
এদের সবি ধার করা,
Cherry-কাটা Washington
এদের কাছে শর্করা।
Hegel-পূজা Comte-পূজা
ব্যাসের বাক্যে logic নাই,
দ্বৈতবাদ ত Conundrum,
হেঁয়ালী তার সর্ব্ব ঠাঁই।
মূর্খতাতে ঢাক্‌তেছে দেশ
শিখ্‌ছি সবাই ইংরাজী,
আপন ভাষা, শিখ্‌তে কেমন
সবাই যেন নিমরাজী।
সাত বছরের বালক যাচ্ছে
শিখ্‌তে পরের ভাষা,

বুকে ধরেছে ডেপুটী হ'বার
ক'রে শতেক আশা।
পড় পড় পড় যাদু মিটাও মনের শক্
মনে রেখো booby will never
make a hawk.
Eager মানেতে দম্বল শিশু,
শিখিল যখন পাঠশালে
হর্ষভরে আঘাত ক'রে
আনন্দেরি করতালে।
ধ্রুবচরিত লুপ্ত প্রায়
ভীষ্ম ভস্মে ঢাকা,
Cherry-কাটা Williy এখন
নৈতিক নব রাকা।

যাদু,
তিনটে তিনটে পাশ ক'রেছে
না জানি কি গুণ ধরে,
লেখার মাঝে সহজ ভাবে
'Man in the moon' সরে।
(এরা) বুঝলোনারে আপন ভাষার
চন্দনের সৌরভ
শব্দগুলি " রসে ভরা
কাকলীর উৎসব।
এক একটী শব্দ যেন
এক একটী চিত্রগো,
পরের ভাষা রম্য হ'ল
অঙ্গে দেখি সিত্র গো।
প্রভাত রবির কিরণ যখন
কমল বধূর নিদ্ হ'রে
তখন যেন মায়ের ভাষায়
আপনা হ'তে ক্ষীর সরে।
সামগাথা নিঙাড়িয়া
আমার ভাষাটী রসাল
Biscuitই-ভাষা এমন ভাষারে
বঙ্গ সাগরে ভাসাল।

Politics আমাদের ছিল না কখন,
ছিল রাজা রাজস্বত্ব রাজ অধিকার,
আছিলেন রাজাপিতা রাজাই বিধাতা,
রাজার অন্তর ছিল বাৎসল্য সাগর
অনুভূতি তরঙ্গেতে সদা আবর্ত্তিত।
Bureaucrat সেদিনও ছিল বর্ত্তমান
কিন্তু রাজশাসনের গভীর পীড়নে,
সর্প কর্ম্মচারিতার তুলিত না ফণা,
ঘেউ ঘেউ করিত না কুক্কুর নশ্বর!

পশ্চিমের রাজনীতি বড়ই জটিল,
Machiavellির রক্ত শিরায় কঙ্কালে,
এই রাজনীতি গড়া; বিসর্পিত ভাব,
এর কুটিলতা দিয়া হ'য়েছে রচিত।
চাহিনাকো Autonomy স্বায়ত্বশাসন,
পশ্চিমের Politics অসাধ্য সাধন,
করিয়াছে নিজদেশে—Christএর
নীতিমালা

মদ্যে মাংসে ব্যভিচারে রূপ-পিপাসায়
হইয়াছে লুপ্ত প্রায়, ধর্ম্ম আছে নামে
শত শত Douglas প্রচারিছে নীতি
ধর্ম্মমন্দিরের শ্লাঘা করিয়া আবিল
Politics আলোচন করুক পশ্চিম
Politics জল নহে তীব্র মরীচিকা
বাড়াইয়া পিপাসায় অন্তর পুড়ায়
Politics বঞ্চনার মঞ্জুলা নন্দিনী
গুণ্ঠনে হৃদয়ের চিত্র যবনিকাতলে
আগ্নেয়গিরির অগ্নি জ্বলে অবিরাম।

পৃথিবীর শান্তিরক্ষা করিবার লাগি
League of Nation হোথা হয়েছে
সৃজিত

জগতের উপকার লভিবার তরে
শক্তি আজি শক্তিসহ হয়েছে মিলিত
লও শক্তি লও পূজা, ভারতের প্রজা
কভু নহে রাজদ্রোহী ওয়াকিফ তারা
রাজারে পূজিলে হয় ধর্ম্মের সঞ্চয়
ধর্ম্মতরে হাস্যমুখে ভারত-নিবাসী
বিসর্জ্জিতে আত্মপ্রাণ নহেক কুণ্ঠিত।

আশার যে ইন্দ্রধনু মার্কিন নেতার
রচেছিল, কবলিত নিরাশসন্ধ্যায়
সর্প—সর্প! রজ্জু নহে অধ্যাস কেবল
পশ্চিম করুক গিয়া বীরত্ব গৌরব
এশিয়ার গর্ব্ব উহা কিরীটি-মণ্ডিত
জ্যোতিষ্মান দ্যুতিমান সুধায় খচিত
এশিয়ার গর্ব্ব Christ সারল্যের খনি
এশিয়ার গর্ব্ব Macon, অটুট বিশ্বাসী

এশিয়ার গর্ব্ব বুদ্ধ জগতের আলো।
সেদিন অদ্বৈতসখা নিমাই নিতাই
শুষ্কবক্ষে ঢেলে গেছে হরিনামধন।
সাধুমুখে হরিধ্বনি করিয়া শ্রবণ
এখনও লতিকাসহ কাঁপে সহকার
কণ্টকিত হয় দেহ তেয়াগি সংসার
ইচ্ছা হয় ব্রজধামে কাটাই জীবন।

সভ্যতাস্বৈরিণী তব দেশে ল'য়ে যাও
গৃহে গৃহে শান্তি এসে করুক বিরাজ
ঐ দেখ কি হয়েছে! কি মহাপ্রলয়!
রমণীর কোমলতা রমণীতে নাই
নাহি সে মাতার স্নেহ সীতার বিকাশ
নির্দ্দোষ আদর নাই প্রাণনাথ ব'লে
চুম্বন ইন্ধনে জ্বালে কামের অনল
দ্বাদশ বর্ষের বধূ পুত্রের জননী
বধূ জানে প্রাণনাথ সর্ব্বস্ব তাঁহার
দেবর শ্বশুর শ্বশ্রূ নহেক আপন
দৈয়িত ভুলান শাড়ী করি পরিধান
ভাবিনী রসের গল্প করেন লেহন
ভাবিনী করেন মনে নিখিল জগৎ
ডোবে যদি ডুবে যাক্ আমরা দুজন
দোঁহাকার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া
প্রেমরস পান করি রব মাতোয়ারা
প্রেমের অঞ্জন চোখে না দিয়াছে যেই
তার কাছে ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত সুষমা
নাহি হয় প্রতিভাত, জড়তা গুণ্ঠনে
প্রকৃতি আপন দীপ্তি রাখেন ঢাকিয়া
প্রেম! প্রেম! কনকেরে যত্নে বিগলিয়া
সুধাসহ দ্রাক্ষাসহ করিয়া মিশ্রিত
অপূর্ব্বতা অপূর্ব্বতা করে বিরচিত।
চুম্বন স্বপনে যেন করে দেহ দান
অলকার বিচিত্রতা করিয়া নির্ম্মাণ।

স্নেহভরা মনচোরা দিদিমারা কোথা
পূর্ব্বকথা মনে হলে স্মৃতি মন্দাকিনী
উজানে বহিয়া গিয়া বুড়ীদের সনে
এখনও মিলিত হ'য়ে, ভক্তির ধারায়
শ্রমদীর্ণ শ্রীচরণ দেয় ধৌত করি,
মনে প্রেম রস নাই নাহি প্রসারতা
একদিকে উগ্র স্বার্থ কোমল হৃদয়
করিতেছে রসশূন্য; অন্যদিকে পুনঃ

ঘোর দৈন্য-বিলাস-প্লাবিত প্রাণমাঝে
পশি ধীরে, উদারতা করিছে চর্ব্বণ,—
প্রতি গৃহে অশান্তির রুদ্র অভিনয়
নিরখিয়া অশ্রুজলে ভাসে গণ্ডস্থল।

শাশুড়ী প্রেতিনীমূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্করী
পুত্র তার মাতৃভক্ত—যখন গৃহিণী
আজ্ঞা করে শ্বশুরেরে করিতে পীড়ন,
গেল দেশ গেল দেশ গেল রে সমাজ
রক্ষা কে করিবে বল কোথা কর্ণধার
ভারতের অলঙ্কার রমণী-হৃদয়
বিশ্বের আদর্শ ছিল ভারত-রমণী।

মার চেয়ে দিদিমারা ছিলেন উদার
গৃহিণী হইতে মাতা ছিলেন মহতী
মমতার মধুচক্র—ধর্ম্মময় প্রাণ;
গৃহিণী স্বার্থের ফণি করেন পোষণ
ভবিষ্যৎ চিন্তা তার উদ্বিগ্ন নয়নে
কখনো কখনো যেন, করি অধ্যয়ন।
রাজকন্যা পুত্রবধূ সেমিজ-ধারিণী
পতিগত প্রাণ বাছা দময়ন্তী ছবি!!
গৃহ ছাড়ি পতিসহ গেছেন অরণ্যে
তাঁর গুণে ভেড়াকান্ত ত্যজিয়া সংসার
ত্যজিয়া স্বজনবর্গ স্থবির জনকে
নির্ব্বাসনে স্বর্গলোক করিয়া গণনা
গলিত পশুত্ব মাঝে আছেন মগন।
কালধর্ম্ম স্রোতে বাধা কে দিতে সক্ষম
হয়ত আমার ন্যায় কতশত পিতা
পুত্রের এ ঔদাসীন্যে মর্ম্মে জর্জ্জরিত;
কোন্ শিক্ষা সমাজেরে করিল এমন?
রাজহস্তে Coercion, সমাজের কাছে
সত্যাশ্রয়ী পেয়ে থাকে ঘোর নির্য্যাতন।

রমণী করুণামূর্ত্তি মমতা নির্ঝর
পিতামহী রূপে ইনি সদাহাস্যময়ী
মাতৃস্নেহ বুকে ধ'রে লভি দেবকায়া
জগতে দিতেন ঢালি অপূর্ব্ব করুণা।

চপলার মত ক্ষণস্থায়ী রূপ তার
সরমের আচ্ছাদন নিমেষে উঘাটি
গোপনে সে প্রাণনাথে দিত উপহার
এখনো স্মরণে অঙ্গ উঠে শিহরিয়া
ব্রীড়াময়ী বিনোদার বিনোদ কৌতুকে,

জ্যোৎস্নালোকে চুপি চুপি চোরের মতন
ছাদে বসি দেখিতাম সৌন্দর্য্য প্লাবন
দেখিতাম অর্দ্ধাবৃত গুণ্ঠন-মণ্ডিত
চন্দ্রস্নাত আদরের আদৃত বদন
লুব্ধ ওষ্ঠ গণ্ড তার করিলে পরশ
ছি ছি বলি সুধামাখা করিত ভর্ৎসনা
চম্পক অঙ্গুলি দিয়া প্রবৃত্তি-উদ্যমে
দেখাইত ভয় ; পুনঃ হাসিয়া আবার
চাঁদের হাসিরে দিত বিষাদিত করি ;
প্রবৃত্তির বাঁধ আজি গিয়াছে ভাঙিয়া
বাংলার Otway "মহিলা"র কবি
"সুরেন্দ্র" জীবিত যদি থাকিত এখন
Popeএর বীণাটী ল'য়ে করিয়া ঝঙ্কার
গাহিত সে সমস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
"Man, some to business, some
to pleasure take
But every woman is at heart a
rake"

নারী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি সতত প্রফুল্ল
প্রসাদ গুণের খনি সৌন্দর্য্য আকর
তুমি না থাকিলে ধরা হইত নিরয়
মানুষেরা পশু হ'তে হইত ভীষণ
কে লুটিল রমণীর সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার
কে করিল রমণীরে সুখ-বিলাসিনী
Destructive, Damnable, deceit-
ful woman
কাঁদিয়া পাশ্চাত্য কবি তুলিয়া মূর্চ্ছনা
শ্বেতাঙ্গীর দুর্দ্দশার গেয়েছেন গান।

ক্লান্তিহরা চন্দ্রঢালা সেবাপরায়ণা
রমণীরে স্বার্থ সর্পে করেছে বেষ্টন
সাপের বন্ধন হ'তে মুক্তি দিতে ত্বরা
এস Cecilia দেবী স্বর্গ পরিহরি।

সমাজের অঙ্গে যদি বর্ম্ম দিতে চাও
বরণ্যা রমণীবর্গে শিক্ষা দিতে হ'বে
ভেঙ্গে দিতে হবে ঐ অন্তঃপুরকারা।
সাবিত্রী গড়িতে হ'লে চাই সত্যবান
সীতা চাও, রামচন্দ্র কর বিনির্ম্মাণ
ভয় হয় অন্তঃপুর পানে নিরখিলে
দেবী আর দেবী নাই বিলাস-বাসিনী।

ওই নীলাকাশ ওই সপ্তর্ষিমণ্ডলে
সদাত্মা যদি বা কেহ বিরাজিত থাক
রমণীর হিতকল্পে এস হে নামিয়া
রাবেয়ার হৃদয়ের অনন্ত বিভব
রমণীর হৃদয়ের হোক্ অলঙ্কার।

রমণী গোলাপ ফুল পেলব উজ্জ্বল
কেশরে পরাগে দলে সুরভিতে ভরা
সংসার, সৌরভ তার করিছে হরণ
নব বধূ শাশুড়ীর চিত্তহীনতায়
লুকাইয়া অশ্রুজল করে বরিষণ
নব বধূ পতিগৃহে পায় না দরদী
ব্যথা বোধ জলধারা হৃদয়-অনলে
ঢালিয়া সংসারে কেহ করে না শীতল।
বধূর পিতার তরে নির্ম্মম শাশুড়ী
কত হীনতার কথা করেন উত্থান
অপমান বহ্নিরাশি বধূর হৃদয়ে
ধিকি ধিকি লহু লহু প্রজ্বলিতে থাকে
এই বহ্নি এট্‌নার অনন্ত উচ্ছ্বাসে
মুক্ত হ'য়ে কত শত শ্রীমন্ত সংসার
ধ্বংসের করাল গ্রাসে করিছে প্রেরণ।

* * *

ভাষাত ছিল না কারো ব্যথার পেষণে
চুপি চুপি তাকাতাকি চুপি চুপি কাঁদা
নির্নিমেষে আকাশের পানে শুধু চাওয়া
নীরব কাতরে সদা দয়াময়ে ডাকা
দৈত্য নয় রক্ষঃ নয় সুসভ্য মানব
দর্প মদে মত্ত হ'য়ে আকাশের তলে
বিদলিয়া বিক্ষোভিয়া অপমানানলে
মনুষ্যত্ব-ধনে দগ্ধ করিল উল্লাসে।
রসনা লভেছে কবি বীণার ধৈবতে
জগতের শিরে শিরে ছুটায় দামিনী
ধূর্জ্জটী গরল পান করেছিল কবে
তাই তিনি নীলকণ্ঠ-নামে অভিহিত।
চেয়ে দেখ ভক্তিভাবে চেয়ে দেখ ভাই
কি অপূর্ব্ব সুষমায় লভেছেন 'রবি'
অনন্ত আকাশ তাঁর প্রাণে উদ্ভাসিত
ক্রুশ-বদ্ধ ক্রাইষ্টের হৃদয়-উচ্ছ্বাস
রবীন্দ্রের প্রাণে আজি উঠেছে উথেলি
রবি আজ নীলকণ্ঠ রবি বিশ্বশিব
পৃথিবীর গর্ব্ব রবি বঙ্গের কৌস্তুভ।

রসের কথা শুনাই তোমায়
একটু খানি থাকো
এবার সরস্বতী সরস্বতীর
কেটেছেন নাক।
Platitude Platitude
সম্মিলনের অভিভাষ
সরস্বতীর শুদ্ধ মুখে
বননীর পরকাশ।
আর্ষ প্রয়োগ ধরলাম ওটা
Peurility সর্ব্বঠাই

ফোঁষ ফোঁষানি আছ্যা উহু
মাথা মুণ্ড কিছুই নাই।
স্বভাবতঃ সবার যেন
এইটী ছিল জানা
সরস্বতীর হাতে পাবে
Sicilian খানা।
পোষ্যপুত্র বল্লে বাবা
সে বাবাকি লাগে মিঠে
ইতিহাসের দুর্গাদাসে
দিচ্ছে জগৎ যশের ছিটে।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান। (৪)

কর্ম্ম-বিভাগ।—পূর্ব্বে বলিয়াছি, স্ত্রীগণের "স্বাভাবিক ও অর্জ্জিত মনোবৃত্তির ও দৈহিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমাজে তাঁহাদিগের প্রকৃত স্থান নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য নহে; বরং ঐ রূপে নরনারীগণের কর্ম্ম-ভেদ ও ব্যবসায় নির্দ্ধারিত হওয়াই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর।" আমি ঐরূপেই স্ত্রীগণের স্থান নির্দ্দেশ ও কর্ম্ম নির্দ্ধারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু এরূপ স্পর্দ্ধা করি না যে, আমার নির্দ্ধারণই সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে। তথাপি এ সম্বন্ধে সমাজের বিচার বুদ্ধি জাগরিত হইলেই আমি কৃতার্থ হইব। মানব সমাজ চিরদিনই পুরুষগণ কর্ত্তৃক চালিত হইল, তাহাতে ফল কি হইল? দেহে ও মনে * মানব প্রায় পশুবৎ-ই রহিয়া গেল। যাহাদিগের পরিচালন ফলে ইহার অধিক আর কিছু হইল না, তাহাদিগকে আর আস্থা করা যায় কি? তাই, বলিতেছি, একবার হাত বদলাইয়া চেষ্টার ফল কি হয় দেখা উচিত।

এ চেষ্টায় প্রথমে পরিবারের, তৎপর সমাজের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। আমি সমাজের ও পরিবারের কয়েকটী গুরুতর কথা মাত্র উল্লেখ করিব, সকল কর্ম্মের উল্লেখ করা সম্ভব নহে। স্ত্রীগণের কর্ম্ম প্রধানতঃ—

১। ছ' সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সন্তান পালন। তৎপর হইতে ইহার সহিত স্ত্রীগণের সংস্রব যত কম হয়, তত মঙ্গল।

২। রন্ধন। এ কার্য্যে পুংগণও সাহায্য করিতে পারেন।

৩। বালিকা ও যুবতীগণের শিক্ষা বিধান। উচ্চশিক্ষা পর্য্যন্তও। সর্ব্ব প্রকার অনুশীলনীয় বিদ্যাই। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি।

জ্ঞানময় শিক্ষা এবং কর্ম্মময় শিক্ষা উভয়ই। লোহার কারখানায় হাতুড়ি

* জগদ্বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ ও মানবতত্ত্বজ্ঞ ওয়ালস্ (Wallace) ১৯০৮। ১লা জানুয়ারির Fortnightly Review পত্রে Education and character শীর্ষক প্রবন্ধে ইহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। তৎপর তদীয় Wonders of Life নামক বৃহৎ গ্রন্থেও বলিয়াছেন, "There is little, if any, evidence of advance in character or in intellect from the earliest times of which we have any record." p. 396.

পেটা পর্য্যন্তও। বালক ও যুবকগণের শিক্ষাবিধান পুংগণের কার্য্য।

৪। জ্ঞানানুশীলন।* জ্ঞান প্রচার। বিদেশে অথবা অপর সমাজে নহে। স্বদেশে ও স্ব-সমাজে এই কার্য্যে পুংগণও সাহায্য করিবেন।

৫। চিকিৎসা ও রোগীর পরিচর্য্যা। এই কার্য্যে পুংগণও সাহায্য করিতে পারেন।

৬। শান্তিরক্ষা। শান্তির সময়ে সর্ব্বদাই এবং অশান্তির সময়েও কখন কখন বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে।

৭। বিচার কার্য্য। এই কার্য্যে পুরুষগণ অতি অল্প ক্ষেত্রে সাহায্য করিতে পারেন। বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ।

৮। বৈজ্ঞানিক বিভাগ † পরিচালন। বন বিভাগ, খনিজ বিভাগ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিভাগ, জীব বিভাগ, উদ্ভিদ বিভাগ, জ্যোতিষ বিভাগ ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত মাদক বিভাগ, এবং রাজস্ব বিভাগও প্রধানতঃ স্ত্রীগণের হস্তে থাকিবে। পুংগণ সাহায্য করিতে পারেন। কৃষি বিভাগ, বাণিজ্য বিভাগ এবং স্বাস্থ্য বিভাগও। কিন্তু বহির্বাণিজ্য বিভাগ নহে। স্বায়ত্ত শাসন বিভাগও নহে।

৯। যুদ্ধ বিভাগ। উচ্চ পদবীতেও।

১০। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মযাজন।... বিদেশে অথবা বিভিন্ন সমাজে নহে।

এ প্রসঙ্গে একটী গুরুতর লক্ষ্য কখনই বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। স্বসমাজকে উন্নত করিতে হইলে স্ত্রীগণকে সর্ব্ব প্রকারে পুংগণের সহায় স্বরূপ করিয়া লইতে হইবে সামাজিক ও জাতীয় জীবনে এমন সময় উপস্থিত হইতে পারে, (আমি বলিতেছি, হইবেই) যখন পুরুষগণকে প্রধানতঃ দেশরক্ষার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। তখন স্ত্রীগণ পারিবারিক ও সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক সমস্ত কার্য্যের ভার লইবার উপযুক্তা না হইলে সমাজ রক্ষা ও দেশরক্ষা হইতেই পারিবেনা। এই বিবেচনায় নারীগণকে গড়িয়া তুলিতে হয়। সুতরাং পরিবারে ও সমাজে তাঁহাদিগের স্থান পুংগণের স্থান অপেক্ষা কোন অংশে হীন হওয়া উচিত নহে এবং শিক্ষা ও স্বাধীনতা কোন অংশেই ন্যূন হওয়া সঙ্গত নহে। যে সকল কারণে এতদ্দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান সমাজ হীন ও মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সেই সকল কারণ বিদূরিত করিয়া ইঁহাদিগকে উন্নত ও গৌরবান্বিত করিতে চাহিলে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। স্ত্রীগণের শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং "স্থান" সম্বন্ধে বিতর্ক করিবার সময় নাই; মরণোন্মুখ জাতির এ সকল লইয়া তর্ক করা চলেনা। তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দিতেই হইবে, অধীনতার নানা দোষ। উচ্চ শিক্ষা দিতেই হইবে। তাঁহাদিগকে সমাজে উচ্চ স্থান ও উচ্চ সম্মান দিতেই হইবে। আর তাঁহারা সেই স্থানকে অলঙ্কৃত করিবার যোগ্য হন, সেরূপ বিধি-ব্যবস্থা প্রচলন করিতেই হইবে। এ সকল ভাল কি মন্দ, তাহা শুধু পুরুষের সুবিধা অসুবিধার দিক হইতে বিবেচনা করিতে হইবে না। সমাজের মঙ্গলের দিক হইতে বিবেচনা করিতে হইবে। পদানতা স্বামী না থাকিলে পুরুষ জাতির অসুবিধা ত হইবেই; কিন্তু সে অতি তুচ্ছ কথা। সমাজের মঙ্গলকেই পুরুষগণ প্রকৃত মঙ্গলরূপে গ্রহণ করিলে তাঁহাদিগের নিজের তুচ্ছ ক্ষতি ক্ষতি বলিয়াই গণ্য হইবে না। কবি সত্যই বলিয়াছেন,—

না জাগিলে সব ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।

সমাপ্ত।

শ্রীশশধর রায়।

* Research work.

† Department.

মহারাণী সুনীতি দেবী, সি-আই। *

বিগত চৈত্র মাসের নব্যভারতে কুচবিহারাধিপতি স্বর্গীয় ঋষি-কল্প মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ জি-সি-এস্-আই মহোদয়ের পবিত্র জীবন কাহিনীর আভাস প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাজার জীবনীর সঙ্গে তাঁহার তপস্বিনী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী সি-আই মহোদয়ার জীবন কাহিনীর কিঞ্চিদাভাস বিবৃত না করিলে প্রবন্ধটী যেন অপূর্ণ থাকিয়া যায়। আজ এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য আমাদের নব্যভারতের এক পার্শ্বে কিঞ্চিৎ স্থান ভিক্ষা করিতেছি। অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় আজ বলিতে হইল যে, বর্ত্তমানে প্রায় দেশীয় রাণী মহারাণীগণ ধন-গৌরব ও বিলাসিতার মধ্যে জীবনের উচ্চ লক্ষ্য ভুলিয়া যান। মহারাণী সুনীতি দেবীর ভিতরে এক অন্যতম উচ্চ ভাবের উন্মেষ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। অবশ্য কুচবিহার যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার জীবন ও কার্য্যকলাপ অধ্যয়নের সেরূপ সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। তবে আমরা দেখিয়া আসিতেছিলাম যে, আমাদের ধর্ম্ম-পিতা ব্রহ্মানন্দের সময়ে যাঁহারা এই নূতন ধর্ম্মান্দোলন ও প্রচার প্রভৃতিতে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়াছিলেন, অথবা মহারাণী মহাশয়ার শিক্ষা-জীবনে তাঁহার সহাধ্যায়িনীরূপে তাঁহারই সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ সমভাবেই চলিতেছিল। আমি দেখিয়াছি যে, মণ্ডলীর চিরসেবক বৈরাগ্য-প্রধান কাকাবাবু (কান্তিবাবু) ও আর আর প্রাচীন প্রচারকদিগকে মহারাণী মহোদয়া সর্ব্বদাই সমাজের কল্যাণের জন্য চিঠি পত্র লিখিতেন। আমার সহধর্ম্মিণী সুমতি দেবী তাঁহার এক জন শিক্ষা-জীবনের সহাধ্যায়িনী। তাঁহাকেও এখনও সেই বাল্যভাবের সহিত চিঠি পত্র লিখিয়া থাকেন। এসব যাহা বলিতেছি, তাহা আমাদের কুচবিহার যাইবার পূর্ব্বকার কথা। তাহার পর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহার গমন করিয়া ও তথায় বহুদিন অবস্থান করিয়া যাহা দেখিয়া আসিলাম, তাহারই একটু চিত্র বর্ত্তমান প্রবন্ধে আঁকিয়া পাঠক ও পাঠিকাবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। আমরা গিয়া দেখিলাম যে, সমগ্র কুচবিহারের বিশেষতঃ কুচবিহার-বাসিনী নারীদিগের কল্যাণ তাঁহার হৃদয়ে জাগিতেছে। আমরা কুচবিহার যাইবার অব্যবহিত পরেই আমাদের ক্ষুদ্র কুটীরে তিনি উপস্থিত। নারী শিক্ষার জন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুনীতি-কলেজেও যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। বোধ হয়, মহারাণী মহাশয়ার উৎসাহ-কল্পেই স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর এই স্কুলের

* বিগত চৈত্র মাসের নব্যভারতে কুচবিহারাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের জীবন কাহিনীর একটী আভাস প্রকাশিত হইয়াছে। এক বৃন্তে বিকশিত দুইটী জীবন-কুসুমের মধ্যে একটী নশ্বর-আবরণ-মুক্ত হইয়া অদৃশ্য-লোকে চলিয়া গেলে সেই সঙ্গে বর্দ্ধিত অপর জীবন-কুসুমেরও একটু চিত্র না আঁকিলে পূর্ব্ব চিত্রের সৌন্দর্য্য অপূর্ণ থাকিয়া যায়। মহারাণী সুনীতি দেবী প্রবন্ধটী এই ভাবেই প্রকাশিত হইল। ইহা তাঁহার জীবনচরিত নহে। জীবিতাবস্থায় কাহারও জীবন চরিত প্রকাশ করা প্রচলিত-প্রথা-সম্মত নহে।

নাম "সুনীতি কলেজ" রাখিয়াছিলেন। ক্রমে এই বিদ্যালয় কলেজে পরিণত হয়, মহারাজা বাহাদুর ও মহারাণী মহাশয়ার ভিতরে এই উচ্চ সংকল্প বর্ত্তমান ছিল। তবে অনেক দিনের পশ্চাৎপদ কুচবিহারকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে অনেক সময়-সাপেক্ষ। আমাদের সময়ে কয়েকটী বালিকা হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজ হইতে মধ্যছাত্রবৃত্তি ও মধ্যইংরাজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছিল। সমাজের অবস্থানুসারে ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর পরীক্ষা আশা করা যায় নাই। বীজ উপ্ত হইয়াছে। অবশ্য ভবিষ্যৎ আরও সুফল প্রসব করিবে। এই অবসরে আরও বলিতে হইতেছে যে, কেবল অল্পবয়স্কা বালিকাদিগের শিক্ষোন্নতির উপায় বিধান করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। যাহাতে প্রাপ্ত-বয়স্কা ও বিবাহিতা মহিলাগণও কতক পরিমাণে ভাষা ও শিল্পাদি শিক্ষা করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা ভারগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারের কথঞ্চিৎ আয়ের সংস্থান হইতে পারে, তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এই সাধু-সঙ্কল্প সাধনার্থ তিনি সুনীতি কলেজের সহিত সংযুক্ত করিয়া শিল্পশিক্ষার্থিনীদিগেরও একটী শ্রেণী খুলিয়াছিলেন। মহিলাগণ শিল্প শিক্ষায় এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মহীয়সী "লেডি কারমাইকেল" যখন সুনীতি কলেজের বালিকাদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি সেই মহিলাদিগের স্বহস্তরচিত কারুকার্য্য দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের কুচবিহার যাওয়ার পর তাঁহারই উদ্যোগে ব্রাহ্মমহিলাদিগের জন্য একটী (Theological class) ধর্ম্মশিক্ষার শ্রেণীও খোলা হইয়াছিল। নারী-সমাজে বিদ্যা ও ধর্ম্মশিক্ষার বিস্তারের ইচ্ছা তাঁহার ভিতরে খুব বলবতী ছিল। এখনও তাঁহার ভিতরে এভাব খুবই প্রবল। আমি তাঁহার সম্বন্ধে যতদূর অধ্যয়ন করিবার অবসর পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহার ভিতরে নারী জাতির কল্যাণ সাধনের ভাবটা মজ্জাগত।

ভক্ত ব্রহ্মানন্দের কন্যা হইয়া তাঁহার ভিতরে ধর্ম্মনিষ্ঠার ভাবটা স্বাভাবিক ভাবে খুবই প্রবল। ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মোপাসনায় যোগদান উপলক্ষে তিনি আশৈশব শূন্যপদে উপস্থিত হইয়া থাকেন। তাই বলিতেছি, নিষ্ঠার ভাব তাঁহার ভিতরে খুবই প্রবল। রাজ্যেশ্বরী হইয়াও তিনি উপাসনাক্ষেত্রে সাধারণ উপাসিকাদিগের সঙ্গেই একত্রে যোগদান করিয়া আসিতেছেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি দার্জ্জিলিঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন এবং সেই স্থানে ভাদ্রোৎসবের জন্য যখন আমি কুচবিহার হইতে আহূত হইয়াছিলাম, দেখিলাম, সেখানে মহারাণী মহোদয়া সকল মহিলা-দিগের সঙ্গে সম্মিলিতা হইয়া উপাসনায় যোগদান করিতেছেন, এমন কি, উপাসনান্তে প্রীতিভোজনেও তিনি সকলের সঙ্গে সমান হইয়া ছিন্ন কদলী পত্রে ভোজন করিতেছেন। ইহাতেই তাঁহার ভিতরের সমভাব ও নিরহঙ্কারতা বিশেষরূপে উপলব্ধ হইবে।

মহারাজ বাহাদুরের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার ভিতরের প্রচ্ছন্ন ভাব যেরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল ও যে ভাব তাঁহার ভিতরে নিভৃত "ফল্গুর" স্রোতের মত নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে, তাহারও একটু চিত্র না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। যে কুচবিহার-ভূমি ব্রহ্মনিষ্ঠ কেশবচন্দ্রের জীবন-শোণিতে

অতিরিক্ত, সেই কুচবিহারের উচ্চ প্রাসাদের অনতিদূরে পুষ্পতরু-পরিশোভিত উদ্যানের ভিতরে স্বর্গীয় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের পবিত্র সমাধি প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর মহারাণী মহোদয়া যখন যখন কুচবিহারে অবস্থান করিয়াছেন, রবিবার ব্যতীত প্রতিদিন সন্ধ্যায় কখন একাকিনী, কখন বা চিহ্নিত ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগকে লইয়া স্বয়ং উপাসনা ও অপরেরও উপাসনায় যোগদান করিয়াছেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া আমরা এই সমাধিপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সঙ্গে উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলাম। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, তাঁহার সেই গভীর প্রার্থনা ও উপাসনা যেন আজও আমার প্রাণকে স্পর্শ করিতেছে। আজও যেন তাঁহার প্রাণের অন্তস্তল হইতে বিনিস্থত সুমধুর প্রার্থনা আমার প্রাণকে উদ্বেলিত করিতেছে! মহারাজা বাহাদুরের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার জীবনে যেন একটা নূতন অধ্যায় খুলিয়া গেল। আমি বলিতেছি, এই গভীর প্রার্থনা কুচবিহারকে রক্ষা করিবে ও ব্রহ্মানন্দের ভবিষ্যৎ বাণী পূর্ণ করিবে। আমাদের সময়ে মহারাজা বাহাদুরের সমাধিক্ষেত্রে যে সান্ধ্য উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং সেই উপাসনা-ক্ষেত্রে যখন মহারাণী [illegible]ণয়া শূন্যপদে গেরুয়া বসনে আচ্ছাদিতা হইয়া তপস্বিনী বেশে উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহার সুগভীর প্রার্থনায় আমাদের প্রাণকে এক নূতন রাজ্যে লইয়া যাইতেন, তখন আমাদের মনে স্বতঃই এই ভাব আসিত যে, এমন দিন আসিতেছে, যখন কুচবিহার সেই সুপ্রভাত দর্শন করিবে, যখন সমস্ত নরনারী এবং আদর্শ নৃপতি নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজ-প্রাসাদ ব্রহ্মের নবীনালোকে এক নূতন শ্রী-ধারণ করিবে। নূতন বাইবেল যেমন Millennium এর প্রতীক্ষা করিয়াছেন, আমরাও কেবল কুচবিহার কেন, সমগ্র পৃথিবীর জন্য সেই Millennium এর প্রতীক্ষা করিতেছি। ভগবান কখন কোন্ ভূমি, কোন্ বংশ ও কোন্ মানব প্রাণকে জাগাইয়া তুলিবেন, তাহা কে বলিতে পারে? মানুষের ব্রহ্ম-মুখিতা কখনও নিরাশার অন্ধতামসে আচ্ছন্ন হইতে পারে না। আশাই চিরদিন মানব প্রাণক জাগাইয়া রাখে। মহীয়সী মহারাণীর প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা সত্যই আমাদিগকে সেইরূপ আশ্বস্ত করিয়া থাকে। যখন তিনি পাঁচ জনকে লইয়া একাসনে বসিয়া সকলের সঙ্গে উপাসনা করেন, তখন কুচবিহার বিবাহের পর ব্রহ্মানন্দ কন্যাকে উপদেশ স্থলে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই মনে পড়ে। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের এক অংশে তিনি বলিয়াছিলেন যে "সুনীতি! তুমি মনে করিও না যে তুমি রাণী হইলে, আমি দেখিতেছি যে তুমি দাসী হইলে।" কলিকাতা ব্রহ্মমন্দিরেও যাঁহারা তাঁহাকে গেরুয়া বসনে আচ্ছাদিতা হইয়া উপাসনা করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহার সেই দাস্যভাবাপন্ন তপস্বিনী মূর্ত্তি দেখিয়াছেন। ব্রহ্মভক্ত ব্রহ্মানন্দের ব্রহ্মকন্যা এখনও শরীরে বর্ত্তমান। জানিনা তাঁহার ভিতর দিয়া কখন্ ব্রহ্মের কোন্ প্রকাশ পরিস্ফুট হইতে থাকিবে।

মহারাণী মহাশয়ার জীবনে ভাব-প্রধানতা ও অপার গুণগ্রাহিতার ভাব খুবই প্রবল। আমার মনে আছে, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে দার্জ্জিলিঙ্গে ভাদ্রোৎসবের সময় যে দিন ময়ূরভঞ্জ মহারাজা বা[illegible] ভঞ্জ মহোদয়ের বাসভবন Sligo Hall এ উপাসনা হইল,

সেই দিন উপাসনান্তে মহারাণী মহোদয়া লম্বমান গিরিশ্রেণীর দিকে তাকাইয়া আমায় বলিয়াছিলেন, "গৌরীবাবু! পাহাড়ের দিকে তাকাইলে অনন্তের ভাব কত জাগিয়া উঠে।" মহারাণী প্রকৃতিকে বড় ভালবাসেন। ভাল ভাব তাঁহার ভিতরে নানাভাবে ফুটিয়া উঠে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি তাঁহার পুরাতন সহাধ্যায়িনীদিগকে কখনই ভুলিতে পারেন নাই। এমন কি, তিনি ইংলণ্ড অবস্থান কালেও আমার স্ত্রীকে ক্রমাগত চিঠী লিখিয়াছেন। আমি "Life of Rev. Bhai Baldeonarain" ও "The Echoes from within" বলিয়া যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম, তিনি ইংলণ্ড হইতেও তাহা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যক্ষেত্রেও তাঁহার খুব উচ্চ ভাব দেখা গিয়াছে। কুচবিহারে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার "সুনীতি-কলেজের" কেবল শিক্ষয়িত্রীদিগের সম্বন্ধেই যে দৃষ্টি রাখিতেন, তাহা নহে, বিদ্যালয়ের দাসদাসীদিগের প্রতিও তাঁহার স্নেহ-দৃষ্টি সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকিত। সুনীতি-কলেজের প্রতিষ্ঠা হইতে "দাসী" নাম্নী এক দরিদ্রা নারী দাসীরূপে কাজ করিয়া আসিতেছিল। তাহাকেও তিনি এমন চিনিয়া রাখিয়াছিলেন যে, সেই দরিদ্রা প্রাচীনা দাসী তাঁহার কার্য্যে উপস্থিত হইলে তাহার সঙ্গে কত সুমিষ্ট ভাবে কথা কহিতেন। আমাদের সময়ে এই দরিদ্রা নারী বার্দ্ধক্যজনিত ভগ্নদেহ লইয়া কোনরূপে কিছু কিছু কাজ করিতে পারিত। এক দিন মহারাণী আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "গৌরীবাবু, আর উহাকে কাজ করিতে দিবেন না। উহার যাহা বেতন, তাহা অপেক্ষা আরও মাসিক এক টাকা বেশী দিয়া বসিয়া থাকিতে দিবেন।" দয়ার এরূপ পরাকাষ্ঠার দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, এই দরিদ্রা নারী যখন পরলোকে চলিয়া গেল, তখন তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয় পর্য্যন্ত মহারাণীর আদেশানুসারে স্কুল-ফণ্ড হইতে দেওয়া হইয়াছিল।

স্বর্গগত মহারাজা বাহাদুর ও মহীয়সী মহারাণী মহোদয়ার জীবন অধ্যয়ন করিবার যে সুযোগ পাইয়াছিলাম, তাহারই ক্ষুদ্রাভাসই আমার ক্ষুদ্র প্রবন্ধদ্বয়ে প্রদত্ত হইল। আমাদের দেশে যেমন প্রবাদ আছে যে, "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে" এবং পাশ্চাত্য প্রদেশেও যেমন "Like draws to like" একটী তদনুরূপ proverb প্রচলিত আছে, ইহাঁদের উভয়ের ভিতর তাহাই প্রত্যক্ষ করিলাম। দেশীয়, জাতীয় ও প্রথাগত সংস্কার যে, ধন মান ঐশ্বর্য্যের ভিতর হইতে ধর্ম্মজীবন প্রস্ফুটিত হওয়া কঠিন। প্রাচীন ভারতে কপিলাবস্তুরাজ শাক্য, মিথিলার রাজর্ষি জনক ও অযোধ্যায় প্রজাবৎসল রামচন্দ্র এবং ইয়ুরোপ প্রদেশেও সেদিন কাউণ্ট টলষ্টয় (Count Tolstoi) সে সংস্কারকে পরাহত করিয়া গিয়াছেন। বিপুল ধন মানের ভিতরেও বৈরাগ্য বাস করিতে থাকে, ইহাঁদের জীবন তাহা প্রমাণ করিয়াছে। আর বর্ত্তমানে যে আমাদিগের এই মহারাজা ও মহারাণীর ভিতরে সেই বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের আভাস ফুটিয়া উঠিতে যে আমরা দেখিতে পাইলাম, তাহা স্বীকার করিতে হইতেছে। যৌবন ও বার্দ্ধক্যে কেবল বঙ্গদেশ নয়, পশ্চিমাঞ্চলেরও অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু বর্ত্তমানে রাজ পরিবার হইতে এরূপ ধর্ম্মজীবনের যুগপৎ

বিকাশের দৃষ্টান্ত বড় দেখিতে পাই নাই। বিধাতার নিকট প্রার্থনা যে, আমাদের মহীয়সী মহারাণী মহাশয়ার ধর্ম্মজীবনের উচ্চ প্রভাব ক্রমে সম্প্রসারিত হইয়া নর সমাজ ও নারী সমাজের কল্যাণ বর্দ্ধিত হইতে থাকুক।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

প্রশস্তি।

(পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী-বিয়োগে)

১

তেজস্বী পণ্ডিত-বীর, সুধী দার্শনিক,
রাজভাষা-দেবভাষা-সাহিত্য-রসিক
ভাস্বর হীরক সম—অপার্থিব মণি
উঠেছিলে হ'তে বিশ্ব-বিদ্যালয়-খনি।
জ্ঞান-বিমণ্ডিত তব মনীষার প্রভা,
উজ্জ্বল করেছে কত বিদ্বজ্জন সভা।
আজ তুমি, দেবলোকে দিতেছ আলোক,
তোমার বিরহে হৃদে জাগিতেছে শোক।
অকালে চলিলে, তুমি বঙ্গের সম্মান
আদর্শ চরিত্র বিপ্র, হে পবিত্র, ছিলে
মহাপ্রাণ।

২

পর দুঃখে হ'ত তব হৃদয় চঞ্চল,
কত অনাথের ছিলে তুমিই সম্বল।
মাতৃ-পিতৃ-পরায়ণ, হে ভ্রাতৃবৎসল,
স্নেহার্দ্র হৃদয় সদা কঠোরে কোমল;
চির সহচর তব দেবেন্দ্র সোদর,
সহসা কাশীতে তাঁ'র হ'ল দেহান্তর;
পশে নাই সে সংবাদ শ্রবণে তোমার,
হ'লে তাঁ'র অনুগামী—রহস্য অপার।
তুমি জান, ভাই আছে—মায়ের সান্ত্বনা
তাই জানে, দাদা আছে—সে শান্তিতে
একি বিড়ম্বনা।

৩

রাজকার্য্যে ছিল তব প্রতিষ্ঠা প্রচুর,
গৌরব লাঞ্ছন তা'র "রায় বাহাদুর"।
স্পষ্ট-বাদী সত্য-প্রিয় জিতেন্দ্রিয় ধীর,
শুভ্র শ্মশ্রু, গৌর তনু, সৌম্য সুগম্ভীর,
'ভাষা পরিচ্ছেদ' আর তব 'ব্যাকরণ'
সে সমুদ্র-প্রতিভার ক্ষুদ্র নিদর্শন।
কৃতী পঞ্চপুত্র তব হে মুক্ত পুরুষ,
তোমারি পদাঙ্ক ধরি' হতেছে মানুষ
আজিকে তাহারা তব জননী জায়ার
শোকের সান্ত্বনা মাত্র—কর্ম্মক্ষেত্র বটে
এ সংসার।

৪

সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হে রাজেন্দ্র শাস্ত্রী,
অকস্মাৎ হ'লে তুমি ও পারের যাত্রী।
ঈশ্বরের লীলা কি এ? কে বুঝিতে চায়?
আমরা তোমার তরে করি হায় হায়!
সাহিত্য-সভার প্রাণ, কোথা যাবে তুমি,
বসে আছ আমাদের জুড়ি' চিত্ত-ভূমি।
রাজার হৃদয় আর জীবন তোমার,
অক্ষয় কবচ এই সাহিত্য সভার।
দাক্ষিণ্যে, ক্ষমায়, ত্যাগে, তুমিই ব্রাহ্মণ,
লহ তব স্নেহাধীন ভক্ত, দীন কবির
তর্পণ।

শ্রীরসময় লাহা।

মাণিকচন্দ্র কোথাকার রাজা ছিলেন ?

মাণিকচন্দ্র বা মাণিকচাঁদ সুপ্রসিদ্ধ রাণী ময়নামতীর স্বামী ও স্বনামধন্য রাজ-যোগী গোপীচাঁদের পিতা। এইটী ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া অবিসংবাদিতরূপেই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তিনি কোথাকার রাজা ছিলেন, তাহা অবিতর্কিত ভাবে প্রমাণিত হয় নাই। মাণিকচাঁদ, গোপীচাঁদ এবং ময়নামতী সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে যে সমস্ত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমস্তে মাণিকচন্দ্র বা তৎপুত্র গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যের কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নাই বলিয়াই এরূপ মত-বৈষম্য সৃষ্টির কারণ হইয়াছে। সম্প্রতি ত্রিপুরায় যে "ময়নামতীর গান" নামক পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদের রাজ্যের প্রকৃত সংস্থান যেন আমাদের নিকট আর তেমন রহস্যময় বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

"মাণিকচন্দ্র রাজার গান" নামক পুস্তকের সঙ্কলয়িতা ডাক্তার গ্রিয়ারসন্ মাণিকচন্দ্র রাজার সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন, আমরা প্রথমে তাহাই উদ্ধৃত করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। তিনি উত্তর বঙ্গের সামন্তরাজ ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে আলোচনার উপসংহারে লিখিয়াছেন :—

"We thus, I think, can be certain of the following facts,—that early in the 14th century a king named Darma Pal ruled over a small tract of country near the Karatoya river in the present districts of Rangpur and Jalpaiguri * * * And that close to his capital city there lived in a fortified stronghold a powerful chief named Manikchandra, who was married to a lady called Mayna. Between the king and the chief, according to local tradition, a war arose, which ended in the defeat and the disappearance of the former, and triumph of the latter, in a great battle fought on the banks of the river Hangrigosha. The battle field is still shown, a mile or so to the north of Dharmapur."

উল্লিখিত বিজয়ের পর ধর্ম্মপালের ধর্ম্মপুরে বিজয়ী মাণিকচাঁদের রাজত্ব সম্বন্ধে গ্রিয়ারসন্ লিখিয়াছেন :—"After this victory Manik chandra took up his residence at Dharmapur."

এইরূপে মাণিকচাঁদ বিজেতারূপেই যে রঙ্গপুরের রাজা হইয়াছিলেন, তাহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত রাজ্যাধিষ্ঠান কোথায় ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। গ্রিয়ারসন্‌ও তদীয় শেষ মন্তব্যে মাণিকচাঁদ, যে রঙ্গপুরে আগন্তুক রাজা ছিলেন, এরূপ মতেরই আভাস প্রদান করিয়াছেন :—"Who he was we cannot tell, we must be content with knowing that he was a neighbouring chief of Dharmapal and his conquerors." বাবু পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার যে পুরাবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি মাণিকচন্দ্র ও ধর্ম্মপাল,

এই দুই জনকে সুবর্ণচন্দ্র রাজার দুই পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; যথা "সুবর্ণচন্দ্র এই সময়ে * বঙ্গশাসন করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র মাণিকচন্দ্র এবং ধর্ম্মপাল।" সুবর্ণচন্দ্র রাজার উল্লিখিত দুই পুত্রের মধ্যে মাণিকচন্দ্র বঙ্গদেশেই রাজা হইয়াছিলেন, আর ধর্ম্মপাল রঙ্গপুর প্রদেশে রাজা হইয়াছিলেন। মাণিকচাঁদ যে বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন, তাহা "মাণিকচন্দ্রের গান" নামক তাঁহার চরিত গানেই উল্লেখ পাওয়া যায়:—

"মাণিকচাঁদ রাজা বঙ্গে বড় সতী॥"

পরেশবাবুও এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "তাঁহার † সময়ে ‡ মাণিকচন্দ্র বঙ্গে রাজত্ব করিতেন।" ইহার পর ধর্ম্মপালের রাজ্য সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন:—

"মাণিকচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মপাল রঙ্গপুর প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। 'ধর্ম্মমঙ্গলে' গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল নামে এক ধর্ম্মপালের উল্লেখ আছে। পরেশবাবু গৌরেশ্বরোপাধিক ধর্ম্মপালকে রঙ্গপুরের ধর্ম্মপালের সহিত অভিন্ন বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যথা—"ঘনরাম প্রণীত "শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে" যে গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের উল্লেখ আছে, তিনি এবং এই ধর্ম্মপাল অভিন্ন ব্যক্তি, ইহাতে সন্দেহ নাই।"

ইহা হইতে মাণিকচন্দ্র ও ধর্ম্মপালের রাজ্য যে স্বতন্ত্র ছিল—একটী গৌড়ে ও অন্যটী বঙ্গে অবস্থিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণই পাওয়া যায়। "গৌড়বঙ্গ" নামের মধ্যে উভয় দেশগত পার্থক্য বিশেষরূপেই সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। গৌড় বলিতে আধুনিক "উত্তর বঙ্গ" ও বঙ্গ বলিতে "পূর্ব্ববঙ্গ" বুঝাইত, ইহাই 'গৌড় বঙ্গ' নামের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য।

উপরি-উক্ত ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি যে, ডাক্তার গ্রিয়ারসন্-কথিত ধর্ম্মপালের উপর মাণিকচন্দ্রের বিজয় পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই হইয়াছিল। মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল পুনর্ব্বার আপনার রাজ্য হস্তগত করিয়া লইয়াছিলেন। পরেশবাবু এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার রাজ্য হস্তগত করেন।"

কিন্তু ধর্ম্মপাল বহুকাল রাজ্য অধিকারে রাখিতে সমর্থ হইলেন না। মাণিকচন্দ্রের রাণী তেজস্বিনী ময়নামতী শীঘ্রই ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার পরাজিত ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন।

পরেশবাবুর বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে ইহার এইরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে:—

"গোবিন্দচন্দ্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁহার মাতা ময়নামতী মন্ত্রীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করেন, এবং ধর্ম্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তীস্তা নদীতীরে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হইলে, ধর্ম্মপাল পরাস্ত হন, এবং ময়নামতী স্বামীর রাজ্য উদ্ধার করেন। অনুমান ১০০৫ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে।"

এই বিজয়ের পর রাজমাতা ময়নামতীই কার্য্যতঃ রঙ্গপুরে রাজত্ব করিতে থাকেন, পুত্র গোবিন্দচন্দ্র সাক্ষীগোপালমাত্র ছিলেন। পরেশবাবু লিখিয়াছেন "গোপীচন্দ্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া ময়নামতী রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন।"

ডাক্তার গ্রিয়ারসন্ রঙ্গপুরে 'ময়নামতীর কোট' নামে যে ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখিতে

* ৯৫০—৯৭০ খ্রীঃ।

† মহীপালের। ‡ ৯৭০—৯৯০ খ্রীঃ।

পাইয়াছেন, তাহা ময়নামতীর এই রাজত্ব স্মৃতিই যে বহন করিতেছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না।

মাণিকচন্দ্রকে পূর্ব্ববঙ্গের রাজা বলিয়া আমরা উপরে প্রমাণ করিয়াছি। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের কোন্ নির্দ্দিষ্ট স্থানের তিনি রাজা ছিলেন, তাহা আমরা এখনও নিরূপণ করি নাই। এক্ষণে আমরা তাঁহার প্রকৃত রাজ্যাধিষ্ঠানেরই নিরূপণে প্রবৃত্ত হইব।

ময়নামতীর গানে মাণিকচন্দ্র রাজার মৃতদেহের সৎকার সম্বন্ধে যেখানে বর্ণনা করা হইয়াছে, তথায় আমরা তদীয় রাজ্যাধিষ্ঠানের সুস্পষ্ট উল্লেখই প্রাপ্ত হই। এখানে আমরা সেই অংশটী ময়নামতীর গান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"আষাঢ় মাসেতে মৈল মাণিকচাঁদ গোশাই।
প্রিথিমিতে জল মত্র পুরিতে স্থল নাই॥
সৈত্যযুগে গঙ্গাদেবী গুমুতে আছিল।
গোমেদের কুলে বসি কান্দিতে লাগিল॥
আমার কান্দনে গঙ্গার স্নেহ উপজিল।
সমুদ্রের গঙ্গাদেবী ভাসিয়া উঠিল॥
গঙ্গা বলে ময়নামতী কান্দ কি কারণ।
যোড়হস্তে নিবেদিলাম গঙ্গার চরণ॥
মেহার কুলের রাজা ছিল মাণিকচাঁদ গোশাই।
প্রিথিমিতে জল মত্র পুরিতে স্থল নাই॥"

এস্থলে মাণিকচন্দ্রকে স্পষ্টই মেহের কুলের বলা হইয়াছে এবং এই মেহের কুল গোমতী নদীর তীর সংস্থিত বলিয়াও বলা হইয়াছে। বঙ্গদেশে একমাত্র ত্রিপুরার জিলারই মেহার কুলের নামে পরগণা আছে এবং ইহা ত্রিপুরা শৈল-নিঃসৃতা প্রাসিদ্ধা গোমতী নদীরই তীরবর্ত্তী। সুতরাং ত্রিপুরার মেহার কুলেই যে মাণিকচন্দ্রের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা নিঃসংশয়রূপেই প্রমাণিত হইতেছে।

ময়নামতীর গানের আরম্ভে আমরা রাজ্যের যে বর্ণনা প্রাপ্ত হই, তাহাতে ও ইহাকে 'মেহার কুল' নামেই আখ্যাত দেখা যায় :—

"মেহার কুল বেড়ি ছিল মুলিবাশের বেড়া॥"

"মাণিকচন্দ্রের গানে" মাণিকচন্দ্রের বিজিত রঙ্গপুর রাজ্যের রাজত্ব কালে তথায় এক বাঙ্গাল মন্ত্রীর আগমনের কথা লিখিত হইয়াছে, যথা :—

"ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি।
সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুলুকৎ কৈল্ল কড়ি।
আছিল দেড়বুড়ি খাজানা লৈল পোনর গণ্ডা॥"

এস্থলে 'ভাটি' ও 'বাঙ্গাল' দুইটী শব্দই পূর্ব্ববঙ্গের স্পষ্ট নির্দ্দেশক। ইতিহাসে ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলই ভাটিদেশ বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং পূর্ব্ববঙ্গের লোক এখনও বাঙ্গাল বলিয়াই পরিচিত।

বাঙ্গাল যে মাণিকচন্দ্রের সর্ব্বোচ্চ রাজস্ব সচিবের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে মাণিকচাঁদের নিজের দেশের লোক বলিয়া স্বতঃই মনে হয়। নিজের দেশের লোক না হইলে অন্যে এরূপ বিশ্বাসের পাত্র সহজে হইতে পারে না।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় মাণিকচন্দ্র যে 'বাঙ্গাল' দেশের রাজা ছিলেন, তাহার স্পষ্ট সন্ধানই পাইয়াছেন। তাই তিনি তাঁহার গোবিন্দচন্দ্র গীতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

"গোপীচন্দ্রের পিতা তীরভুক্তি (ত্রিহুত) বাঙ্গাল ও কামরূপের রাজা ছিলেন।"

বঙ্গদেশই যে 'বাঙ্গাল' বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। "গোবিন্দচন্দ্র গীতে" গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদ

এই বঙ্গ বা বাঙ্গাল দেশের রাজা বলিয়া একাধিকবার উল্লিখিত হইয়াছেন, যথা :—

"সোলো দণ্ডের রাজা আমি বঙ্গ অধিকারি।"
"বার দিয়া বসিল বঙ্গের মহীপাল॥"

এই বঙ্গ বা বাঙ্গাল দেশের কোন্ বিশেষ স্থানে গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যাবিষ্ঠান ছিল—'গোবিন্দচন্দ্রের গীতে' তাহারও স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে। ইহাতে লিখিত হইয়াছে যে, বঙ্গের পাটীকা নগরে গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী ছিল :—

"পাটীকা নগরে রাজা গোবিন্দচন্দ্র ভূপ॥"

কেহ কেহ এই পাটীকাকে কোচবিহারের পশ্চিমাস্থিত "পাটগাঁও" বা পাটগ্রাম বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। * আমাদের মতে ত্রিপুরার "পাটীকারার" সহিত "পাটীকার" অভিন্নতা যেরূপ সহজে প্রতিপাদিত হইতে পারে, কোচবিহারের পাটগ্রামের সহিত তত সহজে হইতে পারে না। প্রথমতঃ "পাটীকা" রাজধানী ছিল, সুতরাংই ইহা নগর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ইহার গ্রাম নাম হওয়া একরূপ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ—পাটগ্রাম কোচবিহারে, আর গোপীচাঁদের রাজ্য ছিল রঙ্গপুরে। রঙ্গপুরের রাজধানী কোচবিহারে হওয়ার কোনও ঐতিহাসিক কারণই জানা যায় না। বিশেষতঃ রঙ্গপুরে গোপীচাঁদের মাতা রাণী ময়নামতীর নামে যে 'ময়নামতী কোট' নামক স্থান বর্ত্তমান আছে, তাহাতে ইহাই যে রাজধানীরূপে কল্পিত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট সমর্থনই পাওয়া যায়। ত্রিপুরার 'পাটীকারা' যে গোবিন্দচন্দ্রের গীতের "পাটীকা", তৎসম্বন্ধে আমরা অপেক্ষাকৃত বলবত্তর পরিপোষক প্রমাণই উপস্থিত করিতে পারি। প্রথমতঃ 'পাটীকা" যে পাটীকারার সহজ রূপান্তর, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ 'পাটীকারার' ও 'পাটীকার' মূল যোগ যে পাটীর সহিত, তাহা আমরা সহজ অনুধাবনেই বুঝিতে পারি। ত্রিপুরার পাটীকারা প্রদেশ পাটীবয়নের প্রসিদ্ধি হইতেই এরূপ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। পাটীকারার সংলগ্ন কুমিল্লার পাটী এখনও ত্রিপুরায় সুপরিচিত। বিশেষতঃ, যে 'ময়নামতী কোট' রঙ্গপুরে ময়নামতী রাণীর স্মৃতির নিদর্শনরূপে বিদ্যমান আছে, ত্রিপুরায় তদপেক্ষাও ময়নামতী রাণীর অক্ষয় ও উচ্চকীর্ত্তি 'ময়নামতী' পর্ব্বতের নামে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। * এই ময়নামতী পর্ব্বতও আবার "পাটীকারা" পরগণায়ই অবস্থিত। মাণিকচাঁদ রাজার রাজ্য মেহারকুল পরগণা পাটীকারারই পার্শ্ববর্ত্তী। পূর্ব্বকালে পাটীকারা মেহারকুলের অন্তর্ভূত থাকাও অসম্ভাবিত বলিয়া মনে হয় না।

* "গোবিন্দচন্দ্রের গীত" শিবচন্দ্র শীল সম্পাদিত ৪২ পৃঃ।

* ময়নামতীর নামে যেমন সমগ্র পাহাড়টী অভিহিত হইয়াছে, তেমনই ইহার মুড়া সকলের কোনটী ময়নামতীর স্বামী রাজা মাণিকচন্দ্রের নামে এবং তদীয় পুত্রবধূ রাণী অদুনা ও পদুনার নামে অভিহিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন দাস 'গৃহস্থ' পত্রিকায় ময়নামতীর গানের আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—

"মাণিকচাঁদ ও ময়নামতীর পুত্র গোপীচাঁদের স্ত্রী 'অদুনা' ও 'পদুনার' নামানুসারে দুইটী টিলায় নামকরণ হইয়াছে এবং একটীর নাম "মাণিকচাঁদের মুড়া"। টিলা তিনটীই অদ্যাপি বিদ্যমান।"

গৃহস্থ ১৩২১ বৈশাখ ("ময়নামতীর পুঁথি" নামক প্রবন্ধ) ৬৪৮ পৃঃ।

"ময়নামতীর গানে" রাজা গোপীচাঁদ আপনার ভিন্ন ভিন্ন অধিকারের যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের অনুমানের বিশেষ দৃঢ়তাই সম্পাদিত হয় :—

"বাপের মিরাশ রাখি যাইনু গৌরর সহর।
দাদার মিরাশ থানেক কামলাক নগর ॥
তুম্মি মাত্রর যত বাড়ী কণিকা নগর।
আম্মি বাড়ী বান্দিয়াছি মেহারকুল সহর ॥"

এ স্থলের গৌরর সহর যে গৌড় দেশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। * 'কামলাক' কমলাঙ্ক বা কুমিল্লা নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। "কণিকা" আমাদের নিকট 'কনক' শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়, এবং 'কণিকা' স্বর্ণগ্রামেরই বোধক বলিয়া আমরা মনে করি। এই প্রকারে গৌড় হইতে মেহার কুল পর্য্যন্ত সমস্তই যে গোপীচাঁদের রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহাই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। গৌড় যখন গোপীচাঁদের পিতা রাজা মাণিকচাঁদের "মিরাশ" বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখন উহা যে তাঁহার সম্পত্তি মাত্র ছিল, রাজ্য ছিল না, প্রকৃত স্থায়ী রাজ্য মেহার কুলেই ছিল, তাহা পরিষ্কাররূপেই প্রতীয়মান হয়।

পরিশেষে আমরা প্রসিদ্ধ সিদ্ধদিগের জীবন-বৃত্তান্ত হইতে পরিপোষক প্রমাণের উল্লেখ করিয়াই আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি। ময়নামতী সিদ্ধ গোরক্ষনাথের শিষ্যা ছিলেন এবং গোপীচাঁদ হাড়িপা সিদ্ধের শিষ্য ছিলেন। ময়নামতীকে দেখিয়া গোরক্ষনাথ বলিতেছেন, "এক নাম রাখি যাইমু মেহার কুল সহর।" ইহাতে ময়নামতীর সহিত মেহার কুলের যোগেরই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। গোবিন্দচন্দ্রের গীতে হাড়িপা পাটীকাতে বাস করিবার জন্যই অভিশপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে।—

"গুরুশাপে হাড়িপা জান পাটীকা ভুবন ॥"

সিদ্ধদিগের গুরু মীননাথের আখ্যান 'মীন চেতন' নামক যে পুস্তক ত্রিপুরায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে হাড়িপার শাপ বৃত্তান্তের এইরূপ উল্লেখ আছে :—"হাড়িপা চলিয়া গেল মেহার কুল নগর।"

এইরূপে পাটীকা ও মেহার কুলের ঐক্য সাধন দ্বারা মাণিকচন্দ্রের মেহার কুল এবং গোবিন্দচন্দ্রের পাটীকা রাজ্য যে ত্রিপুরায় সংস্থিত ছিল, তাহাতে কোনও সংশয় থাকিতেছে না।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

* ময়নামতী গানের পুস্তকান্তরে "গৌড়র সহর" পাঠই স্পষ্ট আছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা

নীরব সাধন।

(১)

মাঝখানে থাম ওহে প্রভঞ্জন,
মলয়ে থাকহে মলয় পবন,
শবদ থাকহে অম্বরে মিশিয়া,
বিজনতা এস স্তব্ধতা লইয়া,
মুছে যাক অশ্রু থামুক রোদন,
ভারত করিবে নীরব সাধন।

(২)

বিমানে খুলিয়া জ্যোতির দুয়ার,
স্তব্ধ ঋভুগণ দেখুন আবার,
বিরাট শ্মশানে বিরাটের বুকে,
যোগিবর ব'সে সুগম্ভীর মুখে,
গভীর ধেয়ানে সদা নিমগন,
ভারত করিছে নীরব সাধন।

(৩)

দুষ্কৃতি নাশিতে সুকৃতি আনিতে,
উষরে নন্দন পুষ্প সাজাইতে,
ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদি উঠুক ওঙ্কার,
উঠুক জীবন-সঙ্গীত-ঝঙ্কার,
নব তীর্থ-ঘাটে নব বেদ-গান,
ভাসাক আবার প্রভাত বিমান,
সাজুক আবার লক্ষ তপোবন,
উজলি তটিনী পর্ব্বত কানন,
কোটি ঋষি হোক্ তপোনিমগন,
ভারত করুক নীরব সাধন।

(৪)

শুধু ফেরুপাল শকুনি গৃধিনী,
শ্মশানে করিছে অমঙ্গল ধ্বনি,
কত আঁখি জল নীরবে ঝরিয়া,
শ্মশানের ভস্মে যেতেছে মিশিয়া,
নিবিড় আঁধার সরব গরাসি,
করহে সাধন নীরব সন্ন্যাসী।

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

পল্লীবাসী।

(আজ) ছিন্ন বাস অঙ্গে কার পেটে
নাই অন্ন!
দেহ অস্থি চর্ম্ম সার মুখ দুঃখ-খিন্ন!
'মান'পত্র আতপত্র ছত্র নাই শিরে—
বরষার বরিষণে ভাসে নেত্রনীরে!
আবাসে ছাউনি নাই পড়ে বৃষ্টিজল!
দেউলে দেবতা রহি আর কিবা ফল!
চাল বস্ত্র নাহি মিলে বিপণিতে ধার!
থালা ঘটি যাহা ছিল বাঁধা ছারখার!
পাঠশালে নগ্ন ছেলে নাহি যায় পাঠে!
কচি মুখে হাহাকার দেখি বুক ফাটে!
অধীর বালকে মাঠে নাহি করে খেলা!
অনটন অবসাদে ভেঙ্গেছেরে মেলা!
স্ত্রীর অলঙ্কার ললাটে সিঁদুর
করে শঙ্খ নাহি তার সুখ-স্বপ্ন চুর!
চীর নারে আবরিতে স্ত্রীর লজ্জা মান!
প্রাণে কষ্ট কত সহে? শেষ প্রাণ দান!
এই কিরে জন্মভূমি স্বর্ণ বঙ্গদেশ!
মরু-মরু-মরুভূমি হায় পরমেশ!
কতকাল এই হাল রহিবে গো আর,
কে মুছাবে জননীর অশ্রুর পাথার!!

শ্রীযোগেশচন্দ্র লাল।

ব্যোমকেশ-চিত্র-প্রতিষ্ঠায়।

(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে)

কর্ম্মি! তোমার চিত্র নয় গো
চিত্ত তোমার আজ
প্রতিষ্ঠা হের করিতেছি মোরা
মোদের চিত্ত মাঝ!
প্রতিভা উজল দীপ্ত নয়ন,
সুস্মিত আনন খানি,
শিল্পী তোমার এঁকেছে অতুল
সাধনা সকল মানি'!
শুধু তাই লয়ে তৃপ্তি কোথায়—
মোরা চাহি হে মহান্!
তেমতি উদার সরল হৃদয়,
স্নেহ-বিগলিত প্রাণ।
জানিতে না তুমি গর্ব্ব কেমন,
কেবা ধনী, অকিঞ্চন,
বঙ্গবাণীর সেবক যাহারা,
ছিল তারা নিজ জন!
ভারতীর পূত সাধনা মাঝারে
আরতি বিশ্ব রাজে,
করিয়াছ তুমি আপনা পাশরি'
সকল জীবন মাঝে!
বঙ্গবাণীর ধন্য পূজারি!
ধন্য তোমার দান!

অযুত ভক্ত যেথা মিলি' করে
জননীর জয় গান!
ক্ষুদ্র যে মোরা, শ্রদ্ধা মোদের
কি দিয়ে জানাব আর,
"বিদুরের খুদ" এনেছি কুড়ায়ে
দিতে তোমা, উপহার!
বিশ্বনাথের মন্দির হতে
এ গৃহ তোমার বড়,
আকাশে বাতাসে মিশিয়া হেথায়
তুমি আছ নিরন্তর!
লহ লহ আজি আমাদের
এই দীন-পূজা-নিবেদন,
দীনের অর্ঘ্য লন যথা দেব!
ভাবগ্রাহী নারায়ণ!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সঙ্গণিকা

(২০)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক ও অন্যান্য পরীক্ষার ফি বৃদ্ধি হওয়ায় আমরা যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছি। মফঃস্বলের কোন্ ছাত্র থিয়েটার বা বায়স্কোপ দেখিয়া থাকে? বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৭১৯টী ম্যাট্রিক স্কুল আছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় মফঃস্বলের স্কুল হইতেই অধিক ছাত্র উপস্থিত হয়; তাঁহারা নির্দ্দোষী। কলিকাতার ম্যাট্রিক-ক্লাসের ছাত্রগণও নির্দ্দোষী, তাহাদের অনেকেই বালক, তাহারা অভিভাবকের অধীনে থাকে। তাহারা থিয়েটার দেখে না, কেহ কেহ বায়স্কোপ দেখিতে পারে। সহরের কলেজের ছাত্রগণ এখন লাইসেন্স-প্রাপ্ত হোষ্টেলে বা কলেজের বোর্ডিংয়ে থাকে, সেখানে কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিতে না পারেন, তবে সেজন্য দায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ই। এত নিয়ম-শৃঙ্খলে বাঁধিয়াও যে তাহাদিগকে উচ্ছৃঙ্খলতার হাত হইতে উদ্ধার করিয়া সুপথে চালিত করিতে পারিতেছেন না, এ হতভাগ্য দেশে সেজন্য দায়ী বিশ্ববিদ্যালয়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় সংখ্যা ঢাকার "প্রতিভা" পত্রিকায় "আমার পরীক্ষা গ্রহণ" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় বি-এ পরীক্ষার ছাত্রদের যে দুর্নীতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার জন্য দায়ী বিশ্ববিদ্যালয়। রাস্তায় ঘাটে, রেলে ও ট্রামগাড়ীতে কলেজের ছাত্রদের যে দুর্ব্বিনয় ও নীতিবিরুদ্ধ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ নিরীশ্বর শিক্ষা। স্ত্রীজাতিকে ছাত্রগণ যে মাতৃবৎ ভক্তি করিতে পারে না, যেখানে সেখানে অপমান করে ও কুচক্ষে দেখে, অহঙ্কারে গুরুজনদিগকেও উপেক্ষা ও অপমান করে, তাহার কারণ নিরীশ্বর শিক্ষা। বিবাহের সময় পণ আদায় করিতে তাহারা যে চেষ্টা করে, তাহা স্মরণ করিলেও চক্ষে জল পড়ে। এত শিক্ষাবিস্তারেও যে কন্যা-পণ নিবারিত হইতেছে না, তাহার কারণও প্রধানতঃ নিরীশ্বর শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষে ছাত্রগণ দিন দিন খারাপ হইতেছে। শুধু অভিভাবকগণের দোষ দেখিলে চলিবে না, ছাত্রগণ চেষ্টা করিলে এই কলুষিত পণপ্রথা এত দিনে নির্ম্মূল হইত। বিশ্ববিদ্যালয় আপন দোষ স্খালনের উপায় পাইলেন না, এখন "পোষ্ট গ্রাজুয়েটের" ধুয়া ধরিয়া ম্যাট্রিক-ক্লাসের দরিদ্র ছাত্রদের সর্ব্বনাশ

করিলেন !! অন্য কলেজের অধ্যাপকদিগকে অধিক বেতন দিয়া রাখায় লাভ কি? তাঁহাদের কাজ বিভক্ত করিয়া, লালসা বৃদ্ধি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দেশের ঘোরতর অনিষ্ট করিতেছেন। এ সম্বন্ধে দৈনিক হিন্দুস্থান পত্রিকায় যে সকল সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা পড়িলে বড়ই কষ্ট হয়। দেশের উন্নতির জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা যেমন প্রয়োজন, সস্তা শিক্ষাও তেমনি প্রয়োজন। কিন্তু এদেশে দিন দিনই শিক্ষার ব্যয় বাড়িতেছে! দেশের আশা কোথায়?

অভিভাবকগণের কোন অপরাধ নাই। অভিভাবকগণ রক্তমাংস জল করিয়া যে কষ্টে ছেলেদিগকে শিক্ষিত করেন, তাহা কে না জানে? শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যুক্তি দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। শ্রীযুক্ত পি, সি, রায়, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু, শ্রীযুক্ত ডি,এন মল্লিক ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত, ক্ষাত্রধর্ম্মানুপ্রাণিত এই পঞ্চপাণ্ডব বাদে সকলেই ফি-বৃদ্ধির পক্ষে মত দিয়াছেন। ইহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা কমিবে কি? গরু কেটে জুতা দানের এ ব্যবস্থায় এদেশের অনেকেই দুঃখিত। ৬১ জন আইন-অধ্যাপক ও ১৬৫ জন অধ্যাপককে অধিক বেতন রাখিয়া কাজ কি? এ ব্যয় ম্যাট্রিক ছাত্রগণই বা দিবে কেন? তাহাদের কি দ্বারা কলেজের দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইবে কেন? একাধিপত্যের ইহা চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। ঢাকের বাওয়া হইয়া যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব? তাঁহারা নিজেদের দারিদ্র্য ভুলিয়া এখন কর্ত্তাভজাগিরি করিয়া দেশকে ডুবাইতেছেন। সঞ্জীবনী বিশ্ববিদ্যালয়ের অপব্যয় হাতে কলমে দেখাইয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয় ৫৬৩০৫৲। আমরা গভীর সহানুভূতির তপ্ত অশ্রু এই শোচনীয় নির্দ্ধারণে বর্ষণ করিতেছি। বিধাতা দরিদ্র ছাত্রদিগের সহায় হউন। নীলরতন-প্রতিভা আশুতোষ-প্রতিভার সংস্পর্শে আসিয়া পরিম্লান হইল, ইহা স্মরণে আমরা মর্ম্মে মরিয়া রহিয়াছি। এখন একমাত্র ভরসা বড়লাট-সাহেব। তিনি কি এই অবৈধ ব্যবহার অনুমোদন করিবেন!

(২১)

মহামতি বড়লাট মহোদয় শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায় মহাশয়ের ২ বৎসরের সশ্রম কারাবাসকে ৩ মাসে পরিণত করিয়াছেন, এ সংবাদে ভারতবর্ষের সকলেই আনন্দিত, কিন্তু তাহার পার্শ্বেই শ্রীযুক্ত রামভুজ দত্ত চৌধুরী মহোদয় প্রভৃতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের এবং মহাম্মদ বাসীর মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রচারে সকলেই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। ঘরে, ঘরে, হৃদয়ে-হৃদয়ে আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষকে আন্তর্জাতিক বিবাহের দ্বারা এক মহান পরিবারে পরিণত করিতেছিলেন। বঙ্গের কতিপয় বিশিষ্ট পরিবারের বিশিষ্ট মহিলাগণ ভারতবর্ষকে একতা-সূত্রে গ্রথিত করিতেছিলেন। শ্রীমতী সরোজিনী দেবী, শ্রীমতী সরলা দেবী, শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী তন্মধ্যে প্রধান। ব্রহ্মানন্দ-কেশবচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং সুবিখ্যাত অঘোরনাথের আত্মজাগণের কীর্ত্তি এই ভারত কখনও ভুলিতে পারিবে না। পঞ্জাব, বোম্বে এবং মান্দ্রাজ নানা বিবাহসূত্রে বঙ্গের সহিত গ্রথিত। এ সকল কথা সকলেই জানেন। অন্যান্য দেশের অন্যান্যের ন্যায় বিশিষ্টদের মধ্যে পঞ্জাবের চামনলাল, রামভুজ প্রভৃতি বঙ্গের জামাতা-শ্রেণীভুক্ত। চামনলাল

স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, রাসভুজ বঙ্গের গৌরব ঘোষণা করিতেছিলেন। প্রতিভা-বিজলী মান্দ্রাজ এবং পঞ্জাবে চমকিয়া চমকিয়া খেলিতেছিল; সে চিত্র দেখিলে সকলেই সম্মোহিত হইতেন। অকস্মাৎ একি নিদারুণ সংবাদ ঘোষিত হইয়া ভারতের এবং বঙ্গের অন্তরে মহাত্রাস উপস্থিত করিল !! শিশু সন্তানদিগকে লইয়া মা সরলা দেবী আজ পথের ভিখারিণী সাজিয়াছেন, ঐ দেখ! ঐ দেখ, কত ঘর শ্মশান হইয়াছে! ভিটা মাটী ঐশ্বর্য্য-হারা নির্দ্দোষী অবোধ শিশুদের চক্ষের জলে ধরা আজ ভাসিতেছে। হায়, আজ কি দুর্দ্দিন উপস্থিত !!!

(২২)

ভারতীয় প্রেস-এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী বোম্বায়ের শ্রীযুক্ত মণিলাল ছগনলাল মোদী ভারতীয় প্রেস-আইনের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়া বিলাতে প্রধান মন্ত্রীর নিকট, ষ্টেট-সেক্রেটারীর নিকট এবং লর্ড সিংহের নিকট যে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই,—"১৯১০ সালের প্রেস-আইন কর্ত্তৃক ভারতীয় সংবাদপত্র সমূহের পীড়নের ফলে কি পরিমাণে ভারতীয় লোকমতের ন্যায়সঙ্গত প্রচার বন্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে প্রজা সাধারণের কিরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে, ইণ্ডিয়ান-প্রেস-এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী তৎপ্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। এই আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত ৩৫০ টী ছাপাখানার দণ্ড বিহিত হইয়াছে, ৩০০ সংবাদপত্র দণ্ডিত হইয়াছে, ৬,০০,০০০৲ ছয় লক্ষ টাকা জামিন আদায় হইয়াছে এবং ৫০০ পাঁচ শত খানার উপর পুস্তক-পুস্তিকাদির প্রচার নিষিদ্ধ হইয়াছে। জামিন দাবির জন্য ২০০ দুইশত প্রেস প্রতিষ্ঠিত এবং ১৩০ খানা সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে পারে নাই। ১৯১৭ সাল হইতে এই আইন অধিকতর কঠোরভাবে বিহিত হইতেছে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'বম্বে ক্রণিকেল', 'হিন্দু', 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট', 'ট্রিবিউন', 'পাঞ্জাবী', প্রভৃতি এদেশী ইংরেজী সংবাদপত্র এবং 'বসুমতী', 'স্বদেশী মিত্রম্', 'বিজয়', 'হিন্দীবাসী', 'ভারতমিত্র', প্রভৃতি বাঙ্গালা ও হিন্দী সংবাদপত্র এই আইনের কবলে পতিত হইয়াছে। কতিপয় এদেশী সংবাদপত্রের প্রচার প্রদেশ বিশেষে নিষিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অথচ এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রে বিলক্ষণ উত্তেজনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলেও, তাহার জন্য কোনরূপ দণ্ড বিহিত হইতেছে না। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয় সদস্যগণ বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেও, গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারত গবর্মেণ্ট প্রেস-আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে তদন্ত করিতে সম্মত হন নাই। রাউলাট-আইন সম্বন্ধে, পঞ্জাবের মার্শাল-ল সম্বন্ধে এবং অন্যান্য অনুযোগ সম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারে বন্ধ হওয়ায় ও বর্ত্তমান আইন প্রয়োগের ফলে বহু প্রতিপত্তিশালী সংবাদপত্র উঠিয়া যাইতেছে। লোকমত প্রচারিত হইতে না দিলে, তাহার ফলে নিশ্চিতই ভিতরে ভিতরে একটা অসন্তোষ ও অশান্তি প্রবল হইয়া থাকে। সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের প্রতি কিরূপ অসঙ্গত কঠোর ব্যবহার করা হইয়া থাকে, এই এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট এবং 'বম্বে ক্রণিকেল' পত্রের সম্পাদক মিঃ হর্ণিম্যানের নির্ব্বাসন ব্যাপারে তাহা পরিস্ফুট। এই এসোসিয়েশন অবিলম্বে এই আইন রহিত করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।"

এই সব কথার প্রতি অক্ষর আমরা অনুমোদন করিতেছি। ভারত-সংস্কার বিলই বল, আর যাহাই বল, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা না থাকায় এ দেশের যে সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা নিবারিত না হইলে এ দেশের কিছুতেই আর মঙ্গল নাই। সর্ব্বপ্রযত্নে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতালাভের জন্য সকলেরই প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত।

(২৩)

এদেশের একান্ত দুর্ভাগ্য যে, অসময়ে, ৪ঠা আষাঢ়, ১৩২৬, সুকবি অক্ষয়কুমার বড়াল, ৺বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীর উপযুক্ত শিষ্য, দেহ রক্ষা করিয়া অমরধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের প্রদীপ, কনকাঞ্জলি, শঙ্খ ও এষা এদেশের কাব্যজগতে অমর গ্রন্থ। অক্ষয়কুমার কাব্য-সাধনায় যে মহামহিম সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার উপাসনা করিয়া দিয়াছেন, তাহার তুলনা বহু স্থানে মিলে না। তিনি এদেশে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

১২৯১ সালে, নব্যভারত প্রকাশের এক বৎসর পূরে, অক্ষয়কুমার অনেক কবিতা আমাদের নিকট প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ঠিকানা ছিল না। সে সকলই রসের উৎস। পড়িয়া আমরা এই অজ্ঞাত গ্রন্থকারের অনেক অনুসন্ধান করি, কিন্তু সাক্ষাৎ পাই না। শেষে ১২৯২ সালে দেখা পাইয়া কৃতার্থ হই। সেই সময় হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি নব্যভারতের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন।

১২৯২ সালের কার্ত্তিক মাসে তাঁহার "৺বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী" নামক কবিতা নব্যভারতে প্রকাশিত হয়। বিহারিলালের মৃত্যু তারিখ ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১, জন্ম তারিখ ১২৪২, ৮ই জ্যৈষ্ঠ। ঐ সুবিখ্যাত কবিতাটি এই—

৺বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী।

(১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১)

১

নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্ম্মী—গর্ব্বোনত শির,
কোন মহারাজা নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি।
তবু কাঁদ কাঁদ—জনমভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।

২

এসেছিল শুধু গাইতে প্রভাতি,
না ফুটিতে উষা, না পোহাতে রাতি—
আঁধারে আলোকে প্রেমে মোহে গাঁথি
কুহরিল ধীরে ধীরে।
ঘুম-ঘোরে প্রাণী ভাবি স্বপ্ন-বাণী
ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে।

৩

দেখিল না কেহ, জানিল না কেহ
কি অতল হৃদি—কি অপার স্নেহ!
হা ধরণি, তুই কি অপরিমেয়
কি কঠোর কি কঠিন!
দেবতার আঁখি কেন তোর লাগি
জেগে থাকে নিশিদিন?

৪

উদার আকাশ।—প্রভাত বাতাস।—
চাহ গো, কাঁদ গো, ফেল গো নিশ্বাস।
আরো ফুল ফল আরো তৃষা আশ
দাও দাও ধরা বুকে।
শিখাও জীবনে করিতে বিশ্বাস,
বুঝাও মরণ-দুখে।

৫

মৃত তোর ভক্ত কাঁদ মা জাহ্নবি,
মৃত তোর শিশু কাঁদ গো অটবি,
হে বঙ্গ-সুন্দরি, তোমাদের কবি
এ জগতে নাই আর!
কোথায় সারদ শরতের ছবি,
পর বেশ বিধবার।

কাঁদ তুমি কাঁদ।—জ্বলিছে শ্মশান—
কত মুক্তাহার, কত পুণ্যগান,
কত ধ্যান জ্ঞান, আকুল আহ্বান—
অবসান চিরতরে !
পুণ্যবতী মার পুত্র পুণ্যবান
ওই যায় লোকান্তরে !

৭

যাও, গুরো, যাও, বুঝিয়াছি স্থির—
মানব হৃদয় কতই গভীর,
বুঝেছি কল্পনা কতই মদির,
কি নিষ্কাম প্রেমপথ !
কেবা বীণা পায় রাখে নিজ শির,
নিজ পায়ে পর-মত ।

৮

বুঝিয়াছি, গুরো, কত তুচ্ছ যশ,
কি রূপা কবিতা—কত সুধারস,
প্রেমে কত ত্যাগ—কত পরবশ,
নারী কত মহীয়সী !
পূত মত্ততায় মুগ্ধ দিকদশ,
ভাষা কিবা গরীয়সী ।

৯

বুঝিয়াছি, গুরো, কোথা সুখ মিলে—
আপনার হৃদে আপনি মরিলে ।
এমনি আদরে দুখেরে বরিলে
নাহি থাকে আত্মপর ।
এমনি বিস্ময়ে সৌন্দর্য্যে হেরিলে
পায়ে লোটে চরাচর ।

১০

বুঝিয়াছি, গুরো, কিবা প্রেম ভবে—
কি যোগ-মত্ততা কবিত্ব-সৌরভে !
সুখদুখাতীত কি বাঁশরী-রবে
কাঁদিলে আরাধ্যা লাগি !
ধন জন মান যার হয় হবে—
তুমি চিরস্বপ্নে জাগি !

১১

তাই হোক হোক । অনন্ত স্বপনে
জেগে রও চির বাণীর চরণে ;
রাজহংস সম প্রেম-গুঞ্জরণে
চরণ দুখানি ঘেরি ।—
করুণাময়ীর করুণা নয়নে
সকরুণ প্রেম হেরি ।

১২

তাই হোক হোক । চির কবি-সুখ
ভরিয়া রাখুক সে সরল বুক,
জগতে থাকুক জগতের দুখ
জগতের বিসম্বাদ ।
পিপাসা মরুক, ভরসা বাড়ুক,
মিটুক কল্পনা-সাধ ।

১৩

তাই হোক হোক । ও পবিত্র নামে
কাঁদুক ভাবুক নিত্য ধরাধামে ;
দেখুক প্রেমিক সুগভীর যামে
স্বপনে জগতে ঢাকি—
নামিছে অমরি ওই গীত ধরি
আঁচলে মুছিয়া আঁখি ।

১৪

তাই হোক হোক । নিবে চিতানল,
কলসে কলসে ঢাল শান্তিজল !
ধরা-দগ্ধ প্রাণ হউক শীতল—
ভব-জনমের হাহা ।
লহ লহ, গুরো, মরণ-সম্বল
জীবনে খুঁজিলে যাহা ।

এই কবিতায় অক্ষয়কুমারের কাব্য জীবনী ফুটিয়াছে । ১৩০১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা নব্যভারতে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "এক অপরিজ্ঞাত কবি" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । এই প্রবন্ধে বিহারিলালের কাব্যসাধনা এরূপ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, সকলেই পড়িয়া অবাক্ হইয়াছিলেন । বিহারিলাল সৌন্দর্য্য-জননীকে সম্বোধন করিয়া গাহিয়াছিলেন—

"তুমিই মনের তৃপ্তি
তুমি নয়নের দীপ্তি
তোমা-হারা হলে আমি প্রাণহারা হই ।"

বহুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দে মাতরং" গানে লিখিয়াছিলেন—

"বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।"

"৺বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী" মহাশয়কে অক্ষয়কুমার "গুরো" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। বিহারিলালের "সারদামঙ্গল" এবং অক্ষয়কুমারের "এষা" একভাবাত্মক কাব্য—পত্নীর উদ্দেশে লিখিত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়,৺গোবিন্দচন্দ্র দাস, ৺নিত্যকৃষ্ণ বসু, অক্ষয়কুমারের সমসাময়িক কবি—স্বর্গীয় কবি দীনেশচরণের পরে ইঁহাদের অভ্যুদয়। গোবিন্দচন্দ্র বিপত্নীক হইয়া আবার বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পত্নীবিয়োগের পর দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার আর বিবাহ করেন নাই। পুনরায় বিবাহ করিলে বোধ হয় "এষার" ন্যায় অমর গ্রন্থ বঙ্গভাষাকে উজ্জ্বল করিত না। নিত্যকৃষ্ণ অসময়ে দেহত্যাগ করেন, সুতরাং তাঁহার প্রতিভার সম্যক্ স্ফুরণ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, গোবিন্দচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার এক শ্রেণীর কবি; কে বড় কে ছোট, সে বিচারের এখনও সময় হয় নাই। কিন্তু সকলেই স্বীকার করিবেন, বিহারিলালই-বাঙ্গালার গীতি-কবিতায় সকলের গুরু। রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ সমালোচনায় বিহারিলালের যে গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন—তাঁহাতে বিহারিলালকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া "আত্মঋণ" স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—"বাল্যকালে বাল্মীকি প্রতিভা নামক একটী নীতিপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া "বিদ্বজ্জন সমাগম" নামক সম্মিলন উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য অনেক রসজ্ঞ লোকের নিকট সেই ক্ষুদ্র নাটকটী প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। সেই নাটকের মূল ভাবটী—এমন কি, স্থানে স্থানে তাঁহার ভাষা পর্য্যন্ত বিহারিলালের সারদা-মঙ্গলের আরম্ভ-ভাগ হইতে গৃহীত।"

"বর্ত্তমান সমালোচক এককালে বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গলের কবির নিকট হইতে কাব্য শিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল। কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, বলা যায় না; কিন্তু এই শিক্ষাটী স্থায়ী ভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে যে, সুন্দর ভাষা কাব্য-সৌন্দর্য্যের একটী প্রধান অঙ্গ; ছন্দে এবং ভাষায় সর্ব্বপ্রকারের শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক!!"

একথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, বিহারিলালই বঙ্গের গীতি-কবিতার নেতা, কিন্তু একথা এখনও প্রতিপন্ন হয় নাই যে, অক্ষয়কুমারই বিহারিলালের শ্রেষ্ঠ শিষ্য। এরূপ পবিত্র সৌন্দর্য্যের উপাসক এদেশে দ্বিতীয় হয় নাই। অক্ষয়কুমারের লেখা প্রাঞ্জল এবং ভাবপূর্ণ, নীতিপূর্ণ এবং সারবান, গভীর এবং সংযত, মাধুর্য্যপূর্ণ এবং পবিত্র। তাঁহার জীবনের ছায়া যেন তদীয় প্রতি কবিতায় প্রস্ফুট। এরূপ চরিত্রবান, এরূপ নিষ্ঠাবান কবি-সাধক এদেশে বড় অধিক জন্মে নাই। এখনও অক্ষয়কুমারের কাব্য-বিশ্লেষণের সময় হয় নাই—কালে তাহা হইবে। তখন সকলেই বুঝিবেন, অক্ষয়কুমারের স্থান কত উচ্চ। আমরা প্রিয় বন্ধুকে হারাইয়া চক্ষের জলে ভাসিতেছি। এ সময়ে সব কথা লেখা সম্ভব নয়। উপযুক্ত সময়ে সে তর্পণ করিব। বিধাতা শোকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

সৃষ্টি-রহস্য

বহু প্রাচীন কাল হইতে সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয় সম্প্রদায় বিশেষে নানাভাবে প্রচলিত আছে। বস্তুতঃ এই গভীর ও সূক্ষ্মচিন্তার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিতান্ত দুরাশা, সন্দেহ নাই। কিন্তু মনের আকাঙ্ক্ষা অনিবার্য্য! সুতরাং জনসমাজে বিকৃত মস্তিষ্ক বাতুল বলিয়া উপেক্ষিত হইলেও মনের বেগ সংযত করিতে অক্ষম হইয়া ঈদৃশ সাধ্যাতীত বিষয়েও চিন্তা শক্তির ঘন তাড়নায় প্রবৃত্ত হইলাম।

অনন্তব্যাপী ব্রহ্ম চৈতন্যের অনাদি কাল স্থিতি সম্ভব হইলে, তবে বিশ্বতত্ত্বেরও তৎসঙ্গে চিরজড়িত থাকা অবশ্য স্বীকার করিতে পারি। কেননা, স্থূল অস্থূল একই ভাবে নিত্যকাল অবস্থিতি করিতেছে। ব্রহ্ম যখন জরা মৃত্যুর অতীত অবিধ্বংস। স্থূল জগতেরও বিনাশ নাই, তখন একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যদি ঈশ্বর অনন্ত পূর্ণ হন, তাহা হইলে সৃষ্টি সম্ভব মনে করিলে ঈশ্বরে অপূর্ণ দোষ ঘটে। ভগবান বিশ্বপদার্থ সমূহ লইয়াই পূর্ণ। তবে জগৎ-সমূহ কখন কখন স্থূল, আবার কখন বা পরমাণুরূপে অবস্থিতি করে, কিন্তু বিশ্ব-পরমাণু মধ্যেও কি উদ্ভিজ্জ, কি জড়পদার্থ, কি জান্তব অর্থাৎ শাল, তাল, তমালাদি—স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তর—পশু পক্ষীগণ ও মানব প্রভৃতির বীজ অণু-প্রবিষ্ট বা অতি সূক্ষ্মরূপে নিহিত থাকে। জগৎ কখন সমষ্টিতে কখনও অণুতে পরিণত হয়, ইহাই বিভিন্ন মাত্র। ফলতঃ, বিশ্বপদার্থের কোন অংশেরই ধ্বংস নাই; একই ভাবে চিরস্থিতি করিতেছে। সুতরাং বিশ্ববীজাণুও বিশ্বপরমাণু মধ্যে চির নিহিত।

এই বীজাণু তত্ত্ব দুইটী ভাবে রহিয়াছে, একটী প্রকৃতি, অপরটী পুরুষ স্বভাব সঞ্জাত, উক্ত দ্বিবিধ বীজাণু হইতেই স্ত্রী পুরুষ উভয় দৈহিকভাবে বিকাশ হয়। বীজবিহীন বস্তু কি কখন সম্ভবে? প্রাণী বীজাণুরও দুইটী ভাবে বিকাশ। একটী বিশ্ববীজাণু অপরটী দেহাণুজাত বিকাশ। দেহাণুবীজে উদ্ভিজ্জাদি এবং পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, সরীসৃপ মানব প্রভৃতির জান্তব দৈহিক ভাবে স্ত্রী ও পুরুষ দুইটী ভাবের প্রকৃত জাতি। অন্যান্য বীজাণু জড় ও উদ্ভিজ্জ, ইহাদের নামানুরূপ জাতি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। জড়ীয় বীজে রজত, স্বর্ণ, হীরকাদি ও উদ্ভিজ্জাদিতে অশ্বত্থ, বটবৃক্ষাদি, জাতি সংজ্ঞা। বস্তুতঃ ইহাও ভগবদ্-প্রদত্ত জাতি চির নির্দ্দিষ্ট।

এই অকৃত্রিম অভ্রান্ত জাতি-তত্ত্ব কেহ মনে করেন না। সংসারপাশ বন্ধনে দৃঢ় ও সুরক্ষিত জন্য গুণকর্ম্ম ও ধর্ম্মের আভাস ধরিয়া হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি জাতি দেখা যায়। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে এ সকল প্রকৃত জাতি নহে। অথচ এই জাতি ভাব-জনিত সমাজের উন্নতি-কল্পে কোন্ কোন অংশে উপকার বোধ হয়, আবার বুঝিয়া দেখিলে যথেষ্ট অপকারও রহিয়াছে। পরম পিতা পরমেশ্বরের পিতৃত্ব শক্তির প্রকার ভেদে সন্তানত্ব শক্তিতে ভ্রাতৃভাবে সকলে চির আকৃষ্ট রহিয়াছে, ইহা না বুঝিয়া পরস্পরকে ভেদাগ্নিতে কেন যে দগ্ধ হইতে হয়,

জানি না। যাক্, এখানে এ সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এখন বিশ্ববীজাণুর গূঢ়-তত্ত্বেরই অন্বেষণ করা প্রয়োজন।

বিশ্ব পরমাণু ঘনীভূত হইয়া সমষ্টি প্রাপ্ত হইলে প্রত্যেক দৈহিক ভাবের বীজ হইতে অর্থাৎ উদ্ভিজ্জে শাল, তাল, তমালাদি বনস্পতি ও পশু পক্ষী কীটাদি বলিতে কি, জান্তব বীজ হইতে মানবীয় দৈহিক ভাবেরও বিকাশ পায়, এই গূঢ়-ভাবের প্রকার ভেদে ঋষিরা ইহাকেই ব্রহ্মার মানস পুত্র * বলিয়াছেন।

বস্তুতঃই এই বিশ্বনিহিত বীজ সমূহ হইতেই ত্রিবিধ প্রকারের বীজের কার্য্য চলিতেছে। স্থূল জগৎ হইতেই উদ্ভিজ্জ, ধাতু ও জান্তব—ইহা হইতেই জগতের সমষ্টি ভাবের বিকাশ। ফলতঃ ঈদৃশ অবিধ্বংস বীজশক্তির মূলে ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি নিত্য-নিহিত। অনাদি কালের জন্য অণু ও সমষ্টি ভাবের লীলাক্ষেত্র জগৎ। দাহশক্তি বিহীন অগ্নি, শৈত্য বিহীন জল, চক্ষু বিহীন সৌন্দর্য্য দেহসৌষ্ঠব যেমন গৌরবশূন্য—তেমনিই বিশ্ব-বিহীন বিধাতার লীলা মাধুর্য্যের কি অস্তিত্ব থাকিত?—কখনই নহে।

অনাদি কাল ঐশী লীলা দুইটী ভাবে বিভক্ত। একটী অণুপ্রবিষ্ট, অন্যটী সমষ্টি। আবার অনন্ত কাল-চক্রের অভ্যন্তরে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি সমুদয় অণুতে পরিণত হইলে উহাই মহালীলায় পরিসমাপ্তি বা মহা প্রলয়। তখন একমাত্র গভীর অন্ধকার মাত্র। ঐ নিবিড় তিমির মধ্যে পরব্রহ্মের শব্দ ধ্বনি "অহমস্মি" ধ্বনিত হয়, ইহাকেই শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'যখন কিছু ছিল না—কেবল ঘন অন্ধকার! তখন ঐ "অহমস্মি" শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নাই।' এই মহা লীলা, মহা প্রলয় অনন্ত কাল হইতেছে।

এখন সংসারে সম্প্রদায় বিশেষে যেরূপ অনুমান দ্বারা সৃষ্টি-রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে জানা যায়, তাহাই সংক্ষেপে কিছু বলিব। কোন সম্প্রদায়ের মনীষীগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ঈশ্বর ছয় দিবস সৃষ্টি করিয়া বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তাই রবিবার একটু বিশ্রাম করিয়াছিলেন, কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস খোদার হুকুমে সৃষ্টি হইয়া গেল। ভারতের আর্য্য সম্প্রদায় মধ্যে মহা মনস্বীদিগের সূক্ষ্ম চিন্তায় সৃষ্টিতত্ত্ব যাহা প্রচার হইয়াছে, তাহা অতি হৃদয়গ্রাহী ও প্রাণস্পর্শী। বাস্তবিক তাঁহাদের আবিষ্কৃত সৃষ্টি বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে গেলে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাঁহাদের চিন্তা শক্তি অতি সূক্ষ্ম ও গভীর ভাবপূর্ণ। যে সকল মহত্ত্বের দ্বারা সৃষ্টিতত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এখানে পুনরালোচনা অত্যুক্তি সত্বেও সৃষ্টির মূল তত্ত্বের আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন। তত্ত্ববিদ্ ঋষিগণ তত্ত্ব নিরূপণ যাহা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দুইটী মাত্র তত্ত্ব এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইল।

"জালান্তরে গতে ভানু যঃ সূক্ষ্মঃ দৃশ্যতে রজঃ
তস্য ষষ্ঠ তমো ভাগঃ পরমাণুঃ স উচ্যতে।"

অর্থ এই, একটী জানালার অভ্যন্তর হইতে যে সূর্য্যরশ্মি সূক্ষ্ম দেখা যায়, তাহার ষষ্ঠ ভাগের এক ভাগ পরমাণু। কিন্তু তাহার ঐশী শক্তির সহিত নিত্য কাল স্থিতি সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। মহা মনস্বী মহা যোগী শঙ্করাচার্য্য জগৎকে প্রপঞ্চ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ জগৎ ভ্রম। সুতরাং বিশ্বের

---

* মরিচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ।

অস্তিত্ব রাখেন নাই। ফলতঃ ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ বিশ্ব পরমাণু হইতে অনেক প্রাণস্পর্শী তত্ত্বের ক্রমবিকাশ দ্বারা জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই।

"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ
প্রকৃতের্মহান মহতোঽহঙ্কার অহংকারাৎ
পঞ্চতন্মাত্রাণি পঞ্চতন্মাত্রতঃ স্থূলভূতানি
পঞ্চেন্দ্রিয়াশ্চ।" (সাংখ্য সূত্রং)

অর্থ এই, সত্ত্ব, রজঃ ও তমের সাম্য অবস্থাকে প্রকৃতি বলে, প্রকৃতি মহান্ যে মহত্তঃ, তাহা হইতে অহঙ্কার, সেই অহঙ্কার হইতে স্থূল পঞ্চভূত। বস্তুতঃ পঞ্চভূত তত্ত্বেও পরস্পর নিত্য সংযুক্ত রহিয়াছে। কোন সময়েই কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, সুতরাং ক্রমশঃ সৃষ্টিভাবে আসিতে পারে না, যেহেতু আকাশও ভূততত্ত্বে পরিণত। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, ব্যোম এই পঞ্চভৌতিক দেহ, এখন দেখিব এই প্রবন্ধের সহিত সামঞ্জস্য আছে কি না! ত্রিগুণাশ্রিত প্রকৃতিতে চৈতন্যের সংযোগ সত্ত্বেও সৃষ্টি দেহাদি। আমরাও বলিতেছি, স্ত্রীবীজাণুতে ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি প্রতিবিম্বিত হইলে, স্বাভাবিকভাবে বস্তুরূপেও দেহরূপের প্রকাশ পায়। এ স্থলে বিকাশতত্ত্বের সামঞ্জস্য দেখা যায় বটে, কিন্তু বিশ্বপরমাণুর নিত্য স্থিতিত্বের বিষয় প্রত্যক্ষীভূত হয় না, তাহার প্রমাণ এই যে, ঋষিরা বীজাণুর সৃষ্টিবল না ধরিয়া অস্বাভাবিক সৃষ্টিরই বর্ণনা করিয়াছেন। যথা কশ্যপ-পত্নী অদিতির গর্ভে দেবতা, দিতির গর্ভে অসুর, বিনতার গর্ভে পক্ষী, কদ্রুর গর্ভে সর্প। ইহাতে কি বুঝিব না যে, দর্শন ও পুরাণে ঐক্য মীমাংসা করিতে গিয়া সৃষ্টিবিভ্রাট ঘটিয়াছে? তথাপি দর্শনতত্ত্ববিৎ ও পৌরাণিকগণের গভীর চিন্তার মূল উদ্দেশ্য অতি গভীর, ঐ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে বলিবার কথা এই যে, তাঁহারা জগৎ সমূহের ঈশ্বরে নিত্য স্থিতিত্বের বিষয় উল্লেখ করেন নাই, বরং ঈশ্বরকে অভাবে ফেলিয়া তাঁহাকে অপূর্ণ করিয়াছেন। যদি তাঁহারা তাঁহাদের মহচ্চিন্তার উত্তেজনায় একটু দেখিতেন, তাহা হইলে কি বুঝিতেন না যে, অনন্তে অভাব থাকিলে তাঁহার পূর্ণতার দোষ হয়। অসংখ্য সৌরজগৎ লইয়াই ত তিনি পূর্ণ। বস্তুতঃই অনন্তের চির পূর্ণতার প্রতি অভাব প্রদর্শন করিলে ঈশ্বরের অসীম সত্ত্বায় অবিশ্বাস আনিয়া দেয়। তাই অনুমান হয়, পুরাণংবিৎ ঋষিরা জগৎ সমূহের অদৃশ্য অবস্থা অর্থাৎ কিছু 'কিছু ছিল না' 'কেবলই অন্ধকার।' উহাই ভাবিয়া আবার বিশ্ব বিচিত্রময় সমষ্টিতে আসিলে তাহাকেই কি বিবিধ তত্ত্বের দ্বারা সৃষ্টি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন? বস্তুতঃ সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল সমস্তই অণুতে পরিণত, কালে একমাত্র মহাকাশ অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দৃষ্ট ছিল না, সুতরাং সকল সম্প্রদায় মধ্যে গভীর অন্ধকারই সিদ্ধান্ত করিয়া কিছু ছিল না ভগবান সৃষ্টি করিয়া আপনাতে পূর্ণ হইলেন, ইহাই ভাবিয়া সৃষ্টি বিশ্বাস এতই দৃঢ় করিয়াছেন যে, ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে মনীষীদিগের নিকট হাস্যাস্পদ ভিন্ন আর কি হইবে।

যাহাই কেন হউক না, যখন এই গুরুতর বিষয়ের প্রতি ক্ষুদ্র চিন্তার মধ্যে পুনঃ পুনঃ ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তখন নিরস্তই থাকিব কেন? একটু ভাবিয়া দেখিলে চিরস্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ক্ষিতি, তেজ, জল, বায়ু প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্ব একত্র জড়িত আছে, আকাশ ও পঞ্চতত্ত্ব সজ্ঞায় অভিহিত, তখন বুঝিতে

হইবে যে, অসীম মহাশূন্যও অনন্তকাল একই ভাবে স্থিতি করিতেছে; ক্ষিত্যাদি তত্ত্বময় সৌরজগৎকেও অনাদিকাল স্থিতি সম্ভব অবিশ্বাস করা যায় না। এইটী যে প্রাচ্য-মহামনস্বীগণের চিন্তাশক্তির ভিতর স্থান পায় নাই, একথাই বা কিরূপে সম্ভব হয়? তবে মনে হয় যে, নিরক্ষর ব্যক্তিদিগের সহজে ধারণা করিতে অতি জটিল হয়, তাই ভাবিয়া ঈশ্বরের অভাব বুঝিয়াছিলেন। হায়! অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি সকল তত্ত্বই যে মহাশূন্যে জড়িত, এবং জাগতীয় সমস্ত বস্তু মধ্যে অনন্তের ইচ্ছাশক্তি অনন্তকালের জন্য অনন্তে রহিয়াছে, ইহা কোন সম্প্রদায়েরই তত্ত্ববিদ্গণ চিন্তা করিয়া দেখেন নাই—ইহাই একটু বুঝিবার কথা।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, উদ্ভিজ্জাদি ও প্রাণী সকলের দেহ গঠনভাব অর্থাৎ উদ্ভিজ্জে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ইত্যাদির এবং পশু, পক্ষী, কীট, সরীসৃপাদি এবং মানবে একই ভাব সূত্রে দেহের কঙ্কালের গঠন অর্থাৎ নির্ম্মাণ কৌশল ও তৎসঙ্গে সৌন্দর্য্য-ভাব, এ সকল কি সৃষ্টির ব্যাপার বলিব?—কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বিশ্ববীজ ও দৈহিক মধ্যে অনন্তের অনন্ত ইচ্ছা নিহিত আছে। বিশ্ব-প্রবিষ্ট বীজশক্তিতেই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ভাবে শরীর ও আকারভাব বিকাশ হইয়া থাকে। উদ্ভিজ্জে নানা উপাধি বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি—প্রাণী সকলের মধ্যে দেহ সৌন্দর্য্যভাব পরি-লক্ষিত হয়। বীজশক্তির প্রভাবেই জগতের বিচিত্র চিত্র! ঐ অতি ক্ষুদ্র বীজেই প্রকাণ্ড বট বৃক্ষটী শাখা প্রশাখায় সজ্জিত হইয়া বিকাশ পায়। তাহার সমস্ত প্রত্যঙ্গ ভাবটী ঐ ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে কি ছিল না? তবেই বুঝুন যে, ঈশ্বরের অসীম ইচ্ছাশক্তি বীজের অন্তঃ প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং স্থূল ভাবের কার্য্য ঐশী শক্তিতেই নিবদ্ধ আছে। বৈজ্ঞানিকেরা এই বিশ্ববীজশক্তি বিবিধ বস্তু বা পদার্থ পরস্পর সংযোগ বিধানে অলৌকিক আশ্চর্য্য সমুদয় ব্যাপার দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু বুঝিতে হইবে যে, উহা সকলেই ঐ বিশ্ব পরমাণু প্রবিষ্ট বীজশক্তিরই প্রক্রিয়ার প্রকারভেদে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ফলতঃ জাগতিক তত্ত্বের দ্বারা চৈতন্য শক্তির কার্য্যের ছায়া প্রদর্শন করে সত্য, কিন্তু চিৎ শক্তির প্রত্যক্ষীভূত নহে। যথা গ্রামোফন যন্ত্রে বক্তৃতা সঙ্গীত ইত্যাদি ইত্যাদি, এখন কি বুঝিতে হইবে যে, ঐ যন্ত্রটী চেতন পদার্থ? জড় বিজ্ঞানেও চিচ্ছায়া প্রদর্শন করিলে তাহা বাস্তব শক্তি গ্রহণ করিতে পারে না। এই কারণে বিশ্ব পদার্থ সকল ঈশ্বরে থাকিয়াও সীমাবদ্ধ এবং পৃথক। তবে জগৎ সমূহ অনন্তকাল কখন অণুতে কখন সমষ্টিতে অবস্থিতি করিতেছে, ইহাই সত্য। সৃষ্টির বস্তু নহে। সুতরাং জগৎ যে নিত্য, ইহার আর কোন সন্দেহ নাই। কেন না, ঈশ্বরের অপূর্ণত্ব বিশ্বাস করা তত্ত্বজ্ঞানের চিন্তার বিষয় নহে, তবে পুরাণবিদ্গণ অবশ্য সৃষ্টি বিষয় বিশ্বাস করিতে পারেন, যেহেতু বিষ্ণুর নাভি হইতে ব্রহ্মার সৃষ্টি ইত্যাদি। আবার অবিশ্বাসেরও প্রমাণ পাওয়া যায়, সূক্ষ্মদর্শী যোগ চিন্তাশীল তান্ত্রিকগণ তন্ত্রশাস্ত্রে দেখাইয়াছেন, যথা—

"ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত মায়া কল্পিতো জগৎ।
সত্যমেব পরব্রহ্ম বিদিতব্য সুখী ভবেৎ॥*

* ব্রহ্মাদির কথা বলিতে চাহি না, কিন্তু জগৎ যে কল্পিত নহে, এটা অবশ্য বলিব। কেন না, জগতের পরমাণুতেই দেহীর উৎপত্তির মূল কারণ। ইহার ব্যত্যয় হইলে ত প্রাণীজগতের অস্তিত্বই থাকে না।

অতঃপর সাধারণ তত্ত্বজ্ঞানে একটু ভাবিয়া দেখিলে, জড়তত্ত্ব মধ্যে যে কোন তত্ত্ব বা পদার্থই হউক, নিত্যস্থিতি সত্ত্বেও উহাকে পূর্ণতার অভাব স্বীকার করিতে হইবে।

এখন অনেকেই বলিতে পারেন যে, সসীম স্থূলতত্ত্ব সমূহ যখন ঈশ্বরে নিত্যভাবে স্থিতি করিয়াছে, তখন বিশ্বস্থিত নদ, নদী, দারু-ধাতু, শিলা বা মৃণ্ময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা আরাধনা করিয়াও ত ঈশ্বর দর্শন হইতে পারে? তবে সংসারে সাকার নিরাকার লইয়াই বা এত তর্ক বিতর্ক হয় কেন? যখন ভগবদ্ শক্তি বিশ্বের অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে, তখন যে কোন বস্তুতেই হোক না, পূজা, আরাধনা, কোন দোষের দেখা যায় না!

একথার উত্তরে এইটী কি সম্ভব হয় না যে, সংসারে অধিকাংশ ব্যক্তিই প্রকৃত সত্যের নিমিত্ত ব্যাকুল হন না। যেমন পদ্মপত্রে বারিবিন্দু অস্পর্শ ভাবে অবস্থিতি করে, তেমনই ব্রহ্মও কোটী কোটী বিশ্বকে আবরণ করিয়া অনন্তকাল একই ভাবে স্থিতি করিতেছেন। কিন্তু বলিবার কথা এই যে, জগৎ সমূহ সীমাবদ্ধ, সুতরাং ঐশী শক্তির কার্য্য সসীম জগতে সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পায় না। আপনি মনে করুন, আপনার শরীরে একটী ক্ষুদ্র ব্রণ রহিয়াছে, আমি ঐ ব্রণটীর প্রতি সম্যক্ প্রকারে দৃষ্টি রাখিয়া কি আপনার পূর্ণ অবয়ব দেখিতে পাইলাম? আপনি একটী পাত্রে সমুদ্রের জল রাখিয়া বলিলেন ঐ যে সমুদ্র দেখুন; বাস্তবিক আমি কি সত্য সত্যই সমুদ্র দেখিলাম? আমি কখনও আঙ্গুর ফল দেখি নাই বা খাই নাই, আপনি কল্পনা দ্বারা একটী ঐ ফল নির্ম্মাণ করিয়া বলিলেন, এই আঙ্গুর ফল—ইহার আস্বাদন গ্রহণ কর। সত্যই কি আঙ্গুর ফলের রসাস্বাদন গ্রহণ করিলাম? কখনই নহে। বস্তুতঃই গাত্রব্রণ ও আঙ্গুর ফলটীর চিত্র অসার দর্শন মাত্র। পল্বল সমুদ্রকে আনিতে পারে না, সমুদ্রই পল্বলকে ডুবাইয়া আপনার মধ্যে স্থান দেয়। চিত্রিত বা নির্ম্মিত মূর্ত্ত্যাদির আশ্রয় ঐ আঙ্গুর ফল সদৃশ। মানুষ সূর্য্যমণ্ডলে সহসা চক্ষু স্থির রাখিতে পারে না, তাহার কিরণ যাহা জগতে পড়িয়াছে, তাহাকেই যথেষ্ট মনে করে।

এই পৃথিবীতে অধিকাংশ ব্যক্তিই নিত্যভাবে নিস্পৃহ। তাই বাহ্য জগতে ও অন্তর্জগতে একই ভাবে যে মহালীলা চলিতেছে, তাহা বুঝিতে সক্ষম নহেন। যোগী, ভক্ত, সাধক যখন সেই অভ্রান্ত সত্যের উজ্জ্বল পথ দর্শন করিতে সক্ষম হন, তখন কি আর তাঁহারা বহির্লীলায় তৃপ্ত হইতে পাবেন? ঐ জ্যোতির্ম্ময় মহামণ্ডলের দিকে যাইবার জন্য এতই ব্যাকুল হন যে, নিমেষ কালের জন্যও বহির্জগতের প্রতি মনশ্চক্ষুর দৃষ্টি রাখেন না, তখন মূর্ত্তি পূজাদি ও বহু দেব ভাব সমূহ অন্তর্হিত হইয়া যায়, কেবল হৃদয়াকাশে চিৎঘন মহাভাবের আবির্ভাবে নিরাকার নির্ব্বিকল্প ঐশী শক্তির আশ্রয়েই সিদ্ধ মনোরথ হইয়া যোগামৃত পানে অমরত্ব লাভ করেন। তাঁহাদের পার্থিব শরীরটী সর্প শঙ্কের ন্যায় দৃষ্ট হয় মাত্র। কিন্তু তাঁহারা যোগ শরীর লাভ করিয়া শান্তি সম্ভোগ করেন, মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্ত ভগবদ্ দর্শনের কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে না। আশার আলো জ্বলিয়া উঠে, আর কি নিরাশার ঘোর অন্ধকার তিষ্ঠিতে পারে? সে সময় নিরাকার চিন্ময় মহাজ্যোতিঃ ভিন্ন তাঁহাদের অন্তর্জগতে আর কিছুই দৃষ্ট হয় না।

আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই,

এখন সৃষ্টিতত্ত্বের কথাই কিছু বলিব। উপর্য্যুক্ত ক্ষীরোদশায়ী সহস্র-ফণা-বিশিষ্ট বাসুকী নাগ শয্যায় বিষ্ণুর নাভিপদ্ম (পদ্মনাভ) প্রসূত ব্রহ্মার মানস পুত্র ১০ জন, পুরাণে যাহা বর্ণিত আছে, আমরা উহাকেই বিশ্বস্থিত বিশ্ববীজাণু মধ্যে প্রকৃতি ও পুরুষ শরীর ভাবে বিকাশের কারণ বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ত্রিকালদর্শী ঋষিরা উহারই অনুপাতে ব্রহ্মার মানস পুত্র সিদ্ধান্ত করতঃ সৃষ্টির মূল কারণ ধরিয়া ছিলেন। সুতরাং আমরাও বিশ্ববীজে বিবিধ আকারে অনাদিকাল ব্রহ্মের অনন্ত ইচ্ছায় প্রকাশ পাইতেছে, বিশ্ব সমূহও কখন অণুতে, কখন সমষ্টিতে স্থিতি করিতেছে—ইহাই কারণ, নির্দ্দিষ্ট করিতেছি। জান্তব বীজ হইতেই দৈহিক ভাবের বিকাশ পাইয়া থাকে, মানস পুত্র * হইতে উৎপত্তির বিষয় যে কতদূর সত্য বলিতে পারি না। বীজাণুর ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে অবিশ্বাসের কথা কিছু নাই, তবে পুরাণবিদ্ মনীষীগণ, অবশ্য অনেকে নিগ্রহ প্রদর্শন করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

আর একটী কথা, বিচিত্র বিশ্বক্ষেত্রে জন্ম, মৃত্যু, বাল্য, যুবা, বৃদ্ধ ইত্যাদি সকলেই বিশ্ববীজের ভিতরে ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তিতে বিজড়িত রহিয়াছে। মানুষ বুঝিতে না পারিয়া নূতন পুরাতন হ্রাস বৃদ্ধি দেখিয়া থাকে। কোন বস্তু বা পদার্থেরই অভাব নাই। সকলই ঈশ্বরের বিশ্ব লীলার নিত্যত্বের উপাদান ব্যতীত আর কিছুই নহে। অনাদি কালই, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের মহালীলা চলিতেছে। বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থের অনুরূপেও মহা লীলার বিরাম নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব যে, জগৎ ও জাগতিক তত্ত্ব সকল সৃষ্টির বস্তু! পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অসীম মহাশূন্য ভৌতিকতত্ত্বে জড়িত, এই জন্য নিত্য স্থিতি সম্বন্ধে ভ্রান্তির কারণ নহে। তত্ত্বজ্ঞানীরা, বোধ হয়, ইহা কখনও অস্বীকার করিতে পারিবেন না, বরং নির্ম্মল চিন্তার আশ্রয়ে বিশ্ব-নিত্যত্বের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবেন। এবং পৌরাণিকগণ হৃদয়ের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের উদার ভাবের আনুগত্যে বুঝিতে সক্ষম হইবেন। পৃথিবীর অবস্থা ভেদে নিরক্ষর ব্যক্তিদিগের সহজে দেব আরাধনা ও সৃষ্টি বিশ্বাস হয়, ইহাই মূল উদ্দেশ্য বুঝিয়া ইতিবৃত্ত ও ঔপন্যাসিক ভাবে যে পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন, এটীও অবশ্য স্বীকার করিবেন। পুরাণ যখন কল্পনাপ্রসূত, তখন সুধীগণ প্রকৃত তত্ত্বান্বেষণের দ্বারা ব্রহ্মদর্শন, শাস্ত্র অর্থাৎ হৃদয় গ্রন্থে স্বাভাবিক অভ্রান্ত দর্শন শিক্ষার নিমিত্ত নিশ্চেষ্টই বা কেন হইবেন? বস্তুতঃই ধ্যানযোগ যুক্ত না হইলে হৃদয় দর্শনের মর্ম্মজ্ঞ হওয়া অতি দুরূহ। তাই বলিতেছি যে, স্বাভাবিক তত্ত্বজ্ঞান যে পর্য্যন্ত প্রাণে পরিস্ফুট না হয়, সে পর্য্যন্ত সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি জন্মে না। বিবিধ মতের গণ্ডী ভেদ না করিলে প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন—দর্শনের চক্ষু ফুটে না। "নাস মুনির্যস্য মতং ন ভিন্ন" সুতরাং অনেক মতের চিন্তার সামঞ্জস্য করিতে গেলে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি ব্যতীত আর কি বলা যায়। অতঃপর সূক্ষ্মদর্শীরা সত্য পথেরই অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। বস্তুতঃই বহু শাস্ত্রের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে অনেক কল্পনাই আসিয়া পড়ে।

* বিষ্ণুর নাভি ভেদ করিয়া ব্রহ্মার জন্ম সম্ভব হইলে বিশ্ববীজাণু হইতে প্রাণী সকলের জন্ম অসম্ভব হইবে কেন?

কিন্তু মহত্তত্ত্ববিদ্ সুধীগণ সূর্প-পরিচালন তুষ পরিহারের ন্যায় সার বস্তুই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এখন সংক্ষেপে একটু ব্রহ্ম বিজ্ঞানের বিষয় চিন্তা করিলে নিষ্ফল প্রযত্ন হইবে না। পঞ্চতত্ত্বময় বিশ্বক্ষেত্রে অসংখ্য অসংখ্য স্ত্রী ও পুরুষ উভয় ভাবে প্রাণী বীজাণু পরিস্ফুট হইয়া পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ মানবাদির দেহ বিকাশ পায়। তাহাও এক একটী শরীর জগৎ। উহাতেও বিশ্বস্থিত বীজ ব্রহ্মবিজ্ঞান বিধানে তারল্য প্রাপ্ত হইয়া শুক্র শোণিত রূপে প্রত্যেক জন্তুর শরীরে নিহিত আছে। কিন্তু ঐ সকল দেহাধারে শুক্র শোণিত মধ্যে দুই প্রকার কীট জন্মে। একটী প্রকৃত কীট, অপরটী জান্তব কীট, যাহা শরীরগত শুক্রে স্থিতি করে, উহাই মাতৃকোষে পতিত হইয়া মানবাদিতে জরায়ু, পক্ষী এবং সরীসৃপ মধ্যে অণ্ডাবরণে ঐ কীট হইতে যথানিয়মে হস্তপদাদি বিশিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে ফুটিয়া প্রকাশ পায়। চিৎশক্তি বীজাণুগত দেহীর স্থিতি কাল পর্য্যন্ত মালা প্রবিষ্ট সূত্রের ন্যায় অবস্থিতি করে। উদ্ভিদ্ জাতির ও বিশ্বনিহিত বীজাণু হইতে অতি সূক্ষ্মাকারে অঙ্গবিশিষ্ট বীজের সহিত অঙ্কুর জন্মে, উহাই ক্রমশঃ অণু হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ঐ বীজ অঙ্কুর ভেদ করতঃ দুইটী ভাগে সূক্ষ্ম বৃক্ষের আকৃতি হয়। একটী অধঃভাগে পৃথিবী গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া শিকড় রূপে পরিণত হয়, অপরটী ঊর্দ্ধ আকাশে ক্রমে ক্রমে শাখা প্রশাখা পত্রে বৃক্ষরূপ গ্রহণ করে, মধ্য বিভাগটী কাণ্ড, উহাকে রক্ষার জন্য শিকড়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাই রস সংগ্রহ করে। পত্র শিরায় ঐ সমূহ রস আকর্ষণ দ্বারা বৃক্ষকে সঞ্জীবিত রাখে, এ বিষয়ে সংশয়ের কোন কারণ নাই। যখন পৃথিবীর পরমাণু হইতে কঙ্করাদি গঠিত হয়, তখন কি বিশ্বস্থিত বীজাণুর শক্তি প্রভাবে স্থূল বীজের উৎপত্তি সম্ভব হয় না? ধাতু তত্ত্বেরও বীজ, বিশ্বের অনুরূপে স্থিতি করিতেছে; ধাতু মধ্যেও পৃথক পৃথক বীজ আছে, এখন উৎপত্তির বিষয় চিন্তা আবশ্যক। ভূগর্ভে স্থানে স্থানে স্তর জন্মে, কালে সেই সেই স্তর কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রস্তর অর্থাৎ পর্ব্বত আকারে দেখা যায়। পর্ব্বত তিনটী আকারে দেখা যায়, ভূগর্ভস্থিত, সমতলক্ষেত্র, উত্তুঙ্গ এই তিনটী পর্ব্বতেই ধাতু বীজ গঠন হয়, এবং অসংখ্য খনি উৎপত্তি হইয়া তাহাতেই স্বর্ণাদি ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং উজ্জ্বল মণি মাণিক্য দেখা যায়, এই ভাবে বিশ্বের অণু হইতে সমষ্টি ভাবে অনাদি কাল বিশ্ব বিচিত্র চিত্র চলিতেছে।

এইত গেল জড়বিজ্ঞান তত্ত্বের কথা, এখন একটু মহাবিজ্ঞানের বিষয় চিন্তা করা যাক্। ঋষিদিগের হৃদয়ে যোগাবস্থায় ঐশী-তত্ত্ব সকল ফুটিয়া উঠে, এবং মহাবিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্ব সকল বুঝিতে শক্তি জন্মে। তাঁহারা যোগ বলে মনোবৃত্তিকে ভগবদ্ চিন্তায় এমনি রাখেন যে, দীপশিখাও পরাস্ত। তাঁহাদের মনের ভাব বিশ্বের সমস্ত পদার্থ ও জান্তব জগতে প্রত্যেক প্রাণীর সহিত ঐক্যবন্ধনে এতই দৃঢ় হইয়া যায় যে, কোন তত্ত্বেরই বিষয়ে অপরিচিত থাকে না। যাঁহার যাঁহার সহিত প্রয়োজন থাকে, অনায়াসে দূরদূরান্তরে পরস্পরের সহিত কথা বার্ত্তা চলে, হৃদয়ে যেন টেলীগ্রাফের মত কথাবার্ত্তা পরিস্ফুট হইতে থাকে, তাহারা পলক কালের মধ্যে অপার্থিব শ্রুতিতে শুনিতে পাইয়া কার্য্য সিদ্ধি করিতেন, যখন যাহা জানিবার ইচ্ছা হইত, উত্তর প্রত্যুত্তরে

বিলম্ব হইত না, এই ভাবে মনোবিজ্ঞান দ্বারা কথাবার্ত্তার আদান প্রদান চলিত। হায়! দুঃখের বিষয় এই যে, এখন সেই মন-বিজ্ঞান কোথায়? প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিরা ইহারই আশ্রয়ে বহুবিধ যোগ শাস্ত্র প্রণয়ন পূর্ব্বক জগতের কত যে হিত সাধন করিয়া গিয়াছেন, এবং বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্ব পরিস্ফুরণে মানবের অন্ধতা ঘুচাইয়া দিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলেও আনন্দের সীমা থাকে না। বস্তুতঃই চিন্তাশক্তি যখনই ভগবদ্-মুখিনী হইয়া ব্রহ্ম-যোগ মধ্যে প্রবেশ করে, তখনই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ শক্তিদ্বারা গভীর তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিতে সক্ষম হওয়া যায়। এবং ব্রহ্মভাবাবিষ্ট মহাবিজ্ঞানের পরিচালনায় শুভাশুভ বৃত্তিসমূহ শরীরের সমস্ত প্রদেশে প্রবেশ করতঃ, নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিতে থাকে। মনবৃত্তি প্রভৃতিই বৃত্তি বিজ্ঞান কৌশলে মানবগণ শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হয়। শুভবৃত্তি মাত্রই মহাবিজ্ঞানের আশ্রিত অশুভবৃত্তি ইহারা জড়বিজ্ঞানের সহিত জড়িত থাকিয়া অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু শুভবৃত্তি ইহারা সাংঘাতিক কার্য্যের প্রতি সতত অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, ঈশ্বর প্রণিধান, বৈরাগ্য প্রভৃতি শরীরস্থ পরমাণু মধ্যে থাকিয়া মর্ম্মগ্রন্থির মূল, হৃদয়ের নিভৃত কক্ষ, আভ্যন্তরিক যন্ত্র এবং স্নায়ু মণ্ডলের সমস্ত প্রদেশ ভেদপূর্ব্বক জড় বিজ্ঞানের কুটীল ভাব সকল বিনষ্ট করিয়া দেয়। অশুভ বৃত্তি আর বল প্রয়োগ করিতে পারে না বটে কিন্তু আবার অবস্থান্তরে মনবৃত্তির সহিত ঐ সকল বিপদসঙ্কুল বৃত্তিই শুভ পথ প্রদর্শন করিতে শিথিল-প্রযত্ন হয় না। বিষাক্ত বস্তু, যেমন ঔষধিরূপে জীবন রক্ষা করে, তেমনিই ঘোর বিপদকারী শত্রুই মিত্রবৎ আচরণ দ্বারা যথেষ্ট উপকারে বাধ্য। ইহাই ত বিশ্ববিচিত্র চিত্র! তবেই বলিতে হয় যে, চেতন, অচেতন, এমন কোন বস্তু বা পদার্থ নাই যে, বিজ্ঞান ব্যতীত নিজ নিজ অস্তিত্ব রাখিতে পারে। সকলের ভিতরে মহাপ্রাণ প্রবাহিত হইতেছে। এমন কি, একটী উপলখণ্ডও প্রাণশূন্য নহে। তবে বদ্ধপ্রাণ ও মুক্তপ্রাণ, এই মাত্র বিভিন্ন। ফলতঃ উক্ত শুভাশুভ বৃত্তি উহারা বিজ্ঞান প্রণোদিত হইয়া বৃত্তি বিজ্ঞান নামে অভিহিত; কারণ মন যখন দেহের মূল বৃত্তি—তখন তদানুসঙ্গীরূপে কেনই বা আপন আপন অধিকারে বলবীর্য্য দেখাইবে না। মনের যে অতি সরল প্রকৃতি, সুতরাং শুভাশুভ উভয় বৃত্তিরই অনুগামী হইতে বীতশ্রদ্ধ হয় না। অগ্নি যেরূপ ইন্ধনযুক্ত হইলে ইন্ধনেরই বর্ণে মিশিয়া যায়, মনেরও শুভ প্রবৃত্তি দুষ্প্রবৃত্তির সঙ্গলাভে তদ্রূপই অবস্থা ঘটে। যাহা হউক, সকলেরই কর্ত্তব্য যে, সতত সাধু-প্রদর্শিত পথ পরিষ্কার রাখিয়া মহা বিজ্ঞানেরই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়।

পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর যখন এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বক্ষেত্রে—বিষ-সুধা, শুভ অশুভ, স্বাস্থ্য জরা, প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছেন, তখন জগৎতত্ত্বের যোগ বিয়োগ সম্বন্ধেও সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন। অগ্নিতে যেমন দাহিকাশক্তি, জলের শৈত্য গুণাধিক্যে ঐ জলই মিশিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তেমনিই কাম-ক্রোধাদি অশুভ বৃত্তিই সকলেরও দমনোপায় বিধান করিয়াছেন। কামে ধর্ম্ম, ক্রোধে ক্ষমা, লোভে দয়া, মোহে দাক্ষিণ্য, মদে ঔদার্য্য, মাৎসর্য্যে সারল্য, ইহাদিগের সাধু সদ্গুণের প্রভাবে কামাদি রিপুগণ শক্তি হীন হইয়া অভিভূত হয়। দ্বেষ দম্ভাদিও ঐরূপ

আর মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না। তবেই দেখুন, মহাবিজ্ঞান শক্তি ও ঐশী শক্তি মণি কাঞ্চনের ন্যায় একীভূত, জড়িত থাকিয়া শুভাশুভ সকল প্রকার ঘটনার মধ্যে কার্য্য করিতেছে। বস্তুতঃ সমস্ত তত্ত্ব বা পদার্থ বিজ্ঞান বহির্ভূত নহে। আবার শারীর বিজ্ঞান-তত্ত্বেও দেখুন, চিকিৎসাক্ষেত্রে ভৈষজ্য বিজ্ঞানেও মহা বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম শক্তির কার্য্য প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কি জান্তব, কি উদ্ভিজ্জ, উভয়েরই শরীর তত্ত্বের অসামঞ্জস্য-জনিত রোগের উৎপত্তি হয়। প্রাণী সকলের মধ্যেও দুইটী ভাবে ব্যাধির বিবৃতি। একটী বহির্ভাবে ত্বক অর্থাৎ মর্ম্মভেদী—অপরটী আভ্যন্তরিক রক্ত, স্নায়ু. মর্ম্মভেদী—উদ্ভিজ্জও তাই। বস্তুতঃ সকলের অন্তপ্রবিষ্ট-তত্ত্বের পরস্পর বিশ্লেষ সংঘটন হইলেই রোগের উৎপত্তি হয়। আবার ঐ সকল অভাব তত্ত্বের সম্পূরণ অবস্থার নিমিত্ত ঐ সূক্ষ্ম শক্তিই আরোগ্যের মূলে কার্য্য করে। তখন আর রোগ-গ্রস্ত শরীরের বাহ্য ও ভিতরের ভীষণতর অসহ্য যাতনা দূরীভূত হইয়া স্বাস্থ্য-সুস্থতা লাভ করতঃ পূর্ব্বশ্রী ধারণ করে। বৃক্ষাদি-তেও ঠিক ঐ ভাবে বাহ্য ভিতরের ব্যাধির উপশম বিধান আছে। উহাদের রস, শিরা, কাণ্ডের সূক্ষ্ম ছিদ্র পথ অর্থাৎ কাণ্ডাভ্যন্তরে রক্ত, স্নায়ু, মর্ম্মরূপে অবস্থিত। উহাদেরও প্রত্যেক উপাদানের অসাম্যজনিত ঐ সূক্ষ্ম শক্তিই পূর্ণতা প্রদর্শন পূর্ব্বক রোগের বলক্ষয় করিয়া দেয়। তত্ত্ব সমূহের সাম্যতার বিঘ্ন ঘটিলেই কি জান্তব কি উদ্ভিজ্জ জগতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। জড়তত্ত্ব মধ্যেও তত্ত্বের পরস্পর অনৈক্য নিবন্ধন তদ্রূপই অবস্থা হইয়া থাকে। যথা ভূমিকম্প, আগ্নেয় পর্ব্বতের সংঘাতিকী বল প্রয়োগ ইত্যাদি। সুতরাং বিশ্ব সমূহের কেন্দ্র ভেদ করিয়া একই মহা বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম শক্তি কার্য্য করিতেছে, বিরাম নাই। বাস্তবিকই একটু গভীর চিন্তা প্রদেশে প্রবেশ করিলে জানা যায় যে, প্রাণী সমূহের শরীর রক্ষায় প্রয়োজনীয় বস্তুর বিপরীত অস্পৃশ্য দ্রব্যাদি ভোজন, মদ্য সেবন, অযথা শুক্র পতন এবং ধর্ম্মের স্থলে অধর্ম্ম ব্যবহার দ্বারা তত্ত্ববস্তু সমূহের পবিত্র পোষণ কার্য্য না হইলে মৃত্যুই ত অবশ্যম্ভাবী। তবেই বুঝিবেন যে, প্রাণী সকলের আভ্যন্তরিক রক্তগত শনিরূপ রোগের দুঃসহনীয় যাতনা ঘুচিয়া না গেলে, বহির্ব্যাধি চর্ম্মরোগাদি উপশমিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। যেমন একটী অর্ক বৃক্ষের সমতল ক্ষেত্র পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিলেও আবার কিছু দিন পর উহার ভূগর্ভস্থিত শিকড় শিরা হইতে ঐ বৃক্ষটী পূর্ব্ববৎ ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ, বহির্ব্যাধিরও অবস্থা হয়। বাহ্য প্রকৃতি-সুলভ চিকিৎসকগণ ক্ষত অঙ্গে প্রলেপ দিয়া কৃতকার্য্যের আশা করেন, তাহা সুদূর-পরাহত। নিশ্চয় সত্য যে, রন্ধ্রগত অর্থাৎ মর্ম্মভেদী রোগোৎপত্তি স্থানটী অভাবতত্ত্বের সম্পূর্ণতা লাভ না করিলে, ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা নিবারণ হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অন্তরের বিকৃত অবস্থাই ব্যাধির মূল কারণ। বাস্তবিক বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম শক্তিতেই অভাব পূরণ করিয়া দিলে ব্যাধি কেন আরোগ্য হইবে না? বিজ্ঞান শক্তি যে ঐশী শক্তিতে চিরজড়িত, ঐ শক্তিই ত ব্রহ্মশক্তি,—কোটী কোটী প্রাণীপূর্ণ জগৎ সকলের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্বের মর্ম্মভেদপূর্ব্বক বিবিধ প্রকার জগৎচিত্র দেখাইতেছে। তবেই বলিতে পারা যায় যে, নিত্যকালের জন্যই বিশ্বপরমাণুর অসংখ্য অসংখ্য বীজাণু স্থিতি করিতেছে। এবং ঐ সূক্ষ্ম শক্তিরই কার্য্যের প্রকারভেদ রাসায়নিক

প্রক্রিয়ায় তত্ত্বপরম্পরের সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি-রহস্য প্রকাশ হইয়া থাকে। ঈশ্বরের ইচ্ছা-শক্তিও অসীম পূর্ণ কর্ম্ম কর্ম্মঠ, তাহার অব্যর্থ বিধানের ব্যত্যয় হয় না। অনন্ত কালই একই ভাবে জগৎ সমূহের কেন্দ্রভেদ করিয়া বিশ্ববীজাণু শক্তির বিচিত্রতা প্রদর্শনপূর্ব্বক আধারে পারদবৎ নির্লিপ্ত শক্তির ব্যাপার চলিতেছে। এই শক্তিতেই ঋষিরা ব্রহ্মশক্তি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

যাহা হউক, সুচিন্তাশীল সুধীগণের অমূল্য সময় নষ্ট করাও কষ্টের কথা! তবে অতি সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। একটী গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বাঙ্গীন প্রীতির উচ্ছ্বাসমগ্ন নির্ম্মলা চিন্তার আবির্ভাব অতীব অসম্ভব। তজ্জন্য আমরা হৃদয়ের সহিত ক্ষমা ভিক্ষার্থী। বর্ত্তমান অবস্থায় স্পষ্টই জানা যায়, ভ্রান্তির নিবিড় তিমির ভেদ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে জগৎ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। সংকীর্ণতার ঘৃণিত অসার রুচি অনেকেই পরিত্যাগ করিতেছেন, জ্ঞান, বিজ্ঞান, রসায়ন, দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনায় প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানের পবিত্র পথ পরিষ্কার দেখিতেছেন। পরস্পরের ঐক্যবন্ধন দৃঢ় হইয়া অভ্রান্ত ধর্ম্মের উজ্জ্বল মূর্ত্তি সরল প্রকৃতি-সম্পন্ন সাধু সজ্জনের হৃদয়ে দেখা দিতেছে। সৃষ্টি-রহস্যের মর্ম্ম অনুসন্ধানেৎসুদিগের প্রাণে উৎসাহের পবিত্র ছায়া পড়িবার সুযোগ আসিয়াছে। ইহা বড়ই সুখের কথা।

এক সময় পৃথিবী একদেশদর্শিতার ভীষণ শাসনে ঘোর অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন ছিল, সেই সময় মহাপুরুষ ভূতত্ত্ববিদ্ গ্যালিলিও বলিয়াছিলেন, এই বিচিত্র চারু সৌন্দর্য্যময় পৃথিবী চক্রবৎ ঘুরিতেছে, তখন সকলের বিশ্বাস ছিল, সূর্য্যই ঘুরিয়া থাকে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী গ্যালিলিওর কথায় কেহ কর্ণপাতও করিল না, বরং তিনি সকলেরই অমর্ষযুক্ত রক্ত চক্ষের কুটীল দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হইলেন। এমন কি, রাজশাসনে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। আরও দেখুন, মহাযোগী আদর্শ পুরুষ যীশু, মূর্ত্তি পূজার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম প্রচার করেন, তজ্জন্য যাজকগণের প্ররোচনায় তিনি ক্রুশবিদ্ধ হন। আবার ভারতে মোগল সম্রাটের রাজত্বকালে আরঙ্গজীবের সময় শিখকুলধুরন্ধর ধর্ম্মবীর তেগ্ বাহাদুর পরব্রহ্মের পূজা প্রচার করিয়া বহুলোকের মত ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত আরঙ্গজীব নির্ভীকচেতা তেগ্ বাহাদুরকে বলিয়াছিলেন, "তুমি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর, নতুবা তোমার শিরচ্ছেদ করা হইবে।" তেগ্ বাহাদুর নির্ভয়ে সহাস্য বদনে "আমি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না, এ ধর্ম্ম আমার শরীরের প্রতি রক্তবিন্দুর মধ্যে রহিয়াছে" উত্তর দিলেন—ঘাতক তাঁহার শিরচ্ছেদ করিল। তেগ্ বাহাদুরের গ্রীবার্দ্ধ ভাগে এক খণ্ড কাগজে লেখা ছিল, "শির দিয়া শির্ নে দিয়া" মস্তক দিলাম—বিশ্বাস দিলাম না। এই জ্বলন্ত মহা মন্ত্রে মোহ-তিমির-মগ্ন জগতে কি অভ্রান্ত সত্য জাগিবে না? হায়! একদেশদর্শিতার ভ্রান্ত ধ্বান্ত বিকৃতি কি ভয়ঙ্কর! মানবের প্রকৃতিকে এমনি অসার করিয়া ফেলে যে, পরিণাম চিন্তা যুগপৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়। এখন উপর্য্যুক্ত দেবকল্প মহাপুরুষদিগের নিমিত্ত এই পৃথিবীই আবার অসংখ্য লোকের শোকাশ্রু পতনে সিক্ত হইতেছে; তাই বলিতেছিলাম, সুশিক্ষিত জ্ঞানিগণ এখন অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে উন্নতির পথে ক্রমেই অগ্রসর হই-

তেছেন, ইহা সকলেরই আশার কথা! সূক্ষ্মদর্শী উদার ভাবগ্রাহী মনীষীগণের নিকট আমাদের প্রাণগত অনুরোধ যে, এই প্রবন্ধটীর আদ্যোপান্ত একটু সময় দানপূর্ব্বক সূক্ষ্ম চিন্তার সহিত দেখিলে বড়ই কৃতার্থ বোধ করিব। শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মদাস।

শশীবাবুর বাজী হা'র।

গত বৈশাখ মাসের "নব্যভারতে" যুক্ত শশীবাবু প্রেততত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ চাহিয়াছেন। যে তাঁহাকে ষট্‌গুণান্বিত প্রমাণ দিতে পারিবে, তাহাকে তিনি "দশ হাজার টাকা" দিবেন। প্রমাণ—

(১) "বুজরুকী-শূন্য"

(২) "জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ছলনা-শূন্য

(৩) ... ... মিথ্যা-শূন্য

(৪) ... ... প্রবঞ্চনা-শূন্য"

হওয়া চাই এবং তাহা

(৫) "সকলে বুঝিতে পারিবে"

ও তাহাকে

(৬) "সকলেই প্রমাণ বলিবে"।

প্রমাণের এই ছয়টী গুণ থাকা তিনি চান। আমার বিশ্বাস যে, এরূপ প্রমাণ আমি তাঁহাকে দিতে পারি। সুতরাং তিনি ফেরত ডাকে নিশ্চয়ই আমাকে দশ হাজার টাকার একখানি চেক্‌ পাঠাইয়া দিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার ঠিকানা নিম্নে লিখিয়া দিলাম। কিন্তু একটী গুরুতর কথা উপস্থিত হইতেছে। আমি যে "জ্ঞাত" বুজরুকী, ছলনা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা করিতেছি না, তাহা জানা যাইবে কিসে? "অজ্ঞাত" ছলনা ইত্যাদির ত কথাই নাই। যাহা হউক, আমি নব্যভারত প্রেস্‌ হইতে ১৩১৬ সালে যে প্রমাণ প্রকাশিত করিয়াছিলাম, তাহাই শশীবাবুর সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। আশা করি, ইহাকে তিনি বুজরুকী, ছলনা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা মনে করিবেন না। এ প্রমাণ সকলেই বুঝিতে পারিবে, এবং ইহাকে সকলেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবে, এমত বিশ্বাস করি।

কিন্তু আর একটী কথাও শ্রীযুক্ত শশীবাবু তুলিয়াছেন। তিনি "প্রেততত্ত্বে"র প্রমাণ চা'ন, পরলোক তত্ত্বের নহে। তিনি সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, "পরলোকে বিশ্বাস এবং প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস এক জিনিস নয়।" এ কথা আমিও স্বীকার করি। তিনি প্রেততত্ত্ব বলিতে যাহা বুঝেন এবং যাহা বুঝাইয়াছেন, আমি ঠিক তাহারই প্রমাণ দিব। তিনি লিখিয়াছেন যে, "প্রেততত্ত্ব বলে মৃত ব্যক্তির আত্মা ইহলোকে আসিয়া জীবন্ত লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষে (কোন মধ্যবর্ত্তী midiumর দ্বারা) দেখা শুনা করে, ভাব বিনিময় করে; ঘরের টেবিল চেয়ার একস্থানে হইতে অন্য স্থানে সরায়, বাক্সের ভিতর কি আছে বলে দেয়, ইত্যাদি।"

"ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিবেচিত হয় যে, টেবিল চেয়ার ও বাক্সের কথা দৃষ্টান্ত স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। আমি ৬২ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিব, তখন পল্লীগ্রামের ভদ্রলোক-দিগের বাড়ীতে টেবিল চেয়ার প্রায় দেখা যাইত না। সুতরাং সে সকল সরাইবার

প্রমাণ দিতে পারিতেছি না। বাক্যের প্রমাণও অদ্য দিব না। অদ্য কেবল মৃত ব্যক্তির আত্মা ইহলোকে আসিয়া জীবন্ত লোকের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে দেখা শুনা করার এবং ভাব বিনিময় করার ষট্গুণান্বিত প্রমাণ দিব। আশা করি, শশীবাবু চেক্ পাঠাইতে বিলম্ব করিবেন না, কারণ ঐ টাকা দুর্ভিক্ষপীড়িতের সাহায্যের নিমিত্ত অতি শীঘ্র প্রয়োজন হইতেছে।

১৩১৬ সালে নব্যভারত প্রেস হইতে মৎপ্রণীত "পরবশতা" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহার ১৭৪—১৭৫ পৃষ্ঠা হইতে কতিপয় পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহাই আমার প্রমাণ। ইহাতে দেখা যাইবে যে, আমার মৃত মাতামহের আত্মা "ইহলোকে আসিয়া" আমার "জীবন্ত" মাতৃদেবীকে দেখা দিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত "ভাব-বিনিময়" করিয়াছিলেন।

"তিনি (আমার মাতৃদেবী) একদিন শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার পরলোকগত পিতা তাঁহাকে বলিতেছেন, 'তুই আর দুঃখ করিস না, আগামী অগ্রহায়ণ মাসে আমাকে কোলে পাইবি; আমার পৃষ্ঠে যে ছিদ্রটী তুই বাল্যকালে টিপিয়া দিতিস্, সেই চিহ্নদ্বারাই আমাকে চিনিতে পারিবি।' * * * বাবার আর বিবাহ করা হইল না; * * সত্য সত্যই আমি অগ্রহায়ণ মাসে ভূমিষ্ঠ হই। আমার পৃষ্ঠে ঐ ছিদ্রটী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।"

১৭৪ পৃষ্ঠার এই স্থানের কিছু উপরে লিখিত আছে, "এই বৃত্তান্ত আমি প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে আমার মাতা এবং পিতামহী ঠাকুরাণীর নিকট শুনিয়াছি।" এতদ্ব্যতীত আরও একটী কথা শুনিয়াছিলাম, যাহা ঐ স্থলে লিখি নাই। তাহা এই:—যে রাত্রিতে মাতৃদেবী ঐরূপ স্বপ্ন দেখেন, সেই রাত্রিতেই আমার পিতামহী ঠাকুরাণীও ঠিক্ ঐ স্বপ্ন দেখেন। তিনি আমার মাতামহ ঠাকুরকে রহস্য করিয়া আমার নিকট বলিয়াছেন, "দেখ্, তোর দাদা বড় চালাক। যদি তিনি তোর জন্মের স্বপন আমাকে না দেখাইয়া কেবল বৌমাকে * দেখাইতেন, তবে আমি তাহা বিশ্বাস করিতাম না, তোর বাবার আবার বিবাহ নিশ্চয়ই দিতাম। আমাকে আর বৌমাকে এক সময়ে স্বপ্ন দেখানেই ত থামিয়া গেলাম।"

এই প্রমাণে দশ হাজার টাকা শ্রীযুক্ত শশীবাবু হারিবেন কি? তিনি বলিতে পারেন যে, আমার মাতামহের "আত্মা" ঐরূপ "ভাব-বিনিময়" করে নাই। আমার মাতৃদেবীর চিন্তার ফল রাত্রিযোগে স্বপ্নরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল মাত্র। সুতরাং এ প্রমাণ প্রমাণই নহে। এক্ষণে, যদিও তাঁহার ন্যায় শারীর-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতকে আমার কিছু বলা চলে না, তথাপি আমার ব্যবসায়ের খাতিরে গোটাকতক জেরা করিতে চাই। তিনি ক্ষমা করিবেন। যদি মাতৃদেবীর চিন্তাই স্বপ্নরূপে দৃষ্ট হইয়াছিল, কোন মৃত ব্যক্তির আত্মা জীবন্ত ব্যক্তির সহিত ভাব বিনিময় করে নাই; তবে ঠিক অগ্রহায়ণ মাসেই আমি ভূমিষ্ঠ হইলাম, ইহার অর্থ কি? আমার মাতামহের পৃষ্ঠের ছিদ্রটী যেখানে ছিল, ঠিক সেইখানে আমার পৃষ্ঠে ছিদ্র থাকিবার অর্থ কি? আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, শুধু আমার মাতৃদেবীকে স্বপ্ন দেখাইলে, পিতামহী যদি ভাবেন যে স্বপত্নী হইবার ভয়ে মাতৃদেবী ঐরূপ রটাইয়া আমার

* আমার মাতৃদেবীকে।

পিতাঠাকুরের বিবাহ বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় পুত্রকে বিবাহ দিতেন-ই; এই আশঙ্কায় বিবেচক ব্যক্তির ন্যায় তিনি আমার পিতামহীকেও ঐরূপ বলিলেন। তবেই ত পিতামহীর বিশ্বাস হইল, বাবার বিবাহও বন্ধ রহিল। সুতরাং তৃতীয় জেরা হইতেছে, এক রাত্রিতে মাতা ও পিতামহী উভয়ে একই স্বপ্ন কেন দেখিলেন, ইহার অর্থ কি? যদি বলা যায় যে, এ সকল যদৃচ্ছা-ক্রমিক * সম-কালীয় ঘটনা মাত্র, ইহার অন্য অর্থ নাই; তবে বহু উত্তর হইতে পারে, বুজরুকী নহে, সঙ্গত উত্তর। বরং প্রশ্নটীই বুজরুকী এবং "সকলে বুঝিতে পারিবে" না। "যদৃচ্ছা-ক্রমিক সম-কালীয় ঘটনা" যেরূপ দুর্ব্বোধ, Accidental coincidenceও তেমনই দুর্ব্বোধ; এবং এ সকলকে ন্যায়ের ফাঁকি বলিলেও দোষ হয় না। যাহা হউক, যদি শ্রীযুক্ত শশীবাবু একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া উল্লিখিত "পরবশতা" নামক গ্রন্থের ১৭১ হইতে ১৯১ পৃষ্ঠা একবার পাঠ করিতে সম্মত হন, তবে যে সকল ঘটনা পাঠ করিবেন, তাহা "মিথ্যা, ছলনা, প্রবঞ্চনা" ইত্যাদি বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন না; এবং বিশ্বাসযোগ্য মনে করিলে "যদৃচ্ছা-ক্রমিক সমকালীয় ঘটনা" বলিলেও চলিবে না। কারণ accident যদি সংখ্যায় অধিক হয়, তবে বৈজ্ঞানিক তাহাকে উড়াইয়া দিতে পারেন না; বৈজ্ঞানিক তখন তাহার কারণ যত্ন পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিতে বাধ্য। এইরূপ অনুসন্ধানের ফলেই প্রেত-তত্ত্বের সত্যতা সংস্থাপিত হয়। শ্রীযুক্ত শশীবাবু যত বাজীই ধরুন না কেন, এ যুগে এবং খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগে আকাশ-পাতাল তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। অন্ধ বিশ্বাস এবং অন্ধ অবিশ্বাস—দুইয়েরই দিন চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে আর তর্কাদি না করিয়া চেকখানি পাঠাইয়া দিলে অতিশয় বাধিত হইব, ইতি।

শ্রীশশধর রায়।

* Accidental.

শব-সাধন।

শুনিতে পাই, আমাদের পিতৃগণ শব-সাধন করিতেন। অন্ধকার রাত্রে শ্মশান ঘাটে শবের উপর বসিয়া মন্ত্র পড়িতেন, আর অমনি শব জাগিয়া উঠিত। ভারতে অন্ধকার রাত্রি আছে, শ্মশান ঘাট আছে, ৩৩ কোটি শব আছে, কিন্তু সাধক নাই, মন্ত্র নাই। তাই এ যুগে আর শব জাগিতেছে না।

একটা বিদেশী গল্প শুনুন। ইস্রায়েল দেশে ইলিশা নামে একজন ঋষি ছিলেন। ঋষিপ্রবর কখনও কখনও সুনাম নামে একটী গ্রামে জনৈক কৃষকের গৃহে অতিথি হইতেন। কৃষক ও কৃষক-পত্নী তাঁকে ঈশ্বরের দাস জানিয়া তাঁর সেবা করিতেন। তাঁরা ঋষিপ্রবরের স্থিত্যর্থ গৃহের দেউড়ির উপর একটা ছোট প্রকোষ্ঠ বানাইয়া দিয়া-ছিলেন। ইলিশা ঋষি যখন আসিতেন, সেই প্রকোষ্ঠে স্থিতি করিতেন।

দেশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছিল, ইস্রায়েলদের দ্বাদশ বংশ দুই রাজ্যে বিভক্ত হইয়া এক রাজ্যে দশ বংশ ও অপর রাজ্যে দুই বংশ বাস করিতেছিল। দশ

বংশ উত্তর দিকে ও দুই বংশ দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণ রাজ্যের কোন কোন ভূপতি ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছেন বটে, কিন্তু উত্তর রাজ্যের কোন ভূপতিই ধর্ম্মপরায়ণ হন নাই। রাজা, প্রজা উপ-ধর্ম্ম ও দুর্নীতি স্রোতে গা ঢালিয়া বহিয়া যাইতেছিল। স্বাধীনতার প্রদীপ টিম্ টিম্ করিয়া জ্বলিতেছিল, অচিরে তাহাও নিবিয়া যাইবে—ইস্রায়েল বংশ স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া সহস্র সহস্র বৎসর পর জাতিগণের পদ লেহন করিবে। দেশ ও জাতি আত্মঘাতী হইতে বসিয়াছিল।

তবু ঐ দেশে যেহোবার ভক্ত ইলিশা ঋষি ছিলেন, আবার ঐ সুনামবাসী কৃষক-দম্পতি যেহোবা ছাড়া আর কারো উপাসনা করিতেন না। ঐ অধর্ম্ম ও দুর্নীতি-প্লাবিত দেশে সেই মহা অমানিশায় এইরূপ দুই একটী পরিবারে ধর্ম্ম ও ভক্তির বাতি জ্বলিতেছিল।

কৃষক-দম্পতির কোন সন্তান ছিল না। ঋষিপ্রবরের আশীর্ব্বাদে তাঁহাদের ঘরে একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। পিতা মাতার প্রাণ আনন্দে ভরিয়া গেল।

ছেলেটী বড় হইল। একদিন সে শস্য-কর্ত্তকদের সঙ্গে পিতার কাছে মাঠে গেল। অমনি হটাৎ রৌদ্র লাগিয়া তার ভয়ঙ্কর শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল। সে "হায় আমার মাথা! হায় আমার মাথা!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। পিতার আদেশে একজন লোক তাহাকে তুলিয়া তাহার মাতার কাছে আনিল। সে মার কোলে মূর্চ্ছিত হইয়া মধ্যাহ্ন কালে গতায়ু হইল!

তখন মাতা কি করিলেন? না কাঁদিলেন, না চেঁচাইলেন, না কাহাকেও কিছু বলিলেন। বিশ্বাসিনী মাতা পুত্রটীকে লইয়া ঋষিপ্রবরের প্রকোষ্ঠে গেলেন। যে খাটে ঋষিপ্রবর শয়ন করিতেন, সেই খাটে তাকে শোয়াইয়া দ্বার রুদ্ধ পূর্ব্বক, তাড়াতাড়ি একটা গাধায় চড়িয়া ঋষিপ্রবরের উদ্দেশে কার্ম্মিল পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় ঋষিপ্রবর আপনার শিষ্য গেহসির সঙ্গে বসিয়া ছিলেন। শোকাকুলা রমণী গর্দ্দভ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক একেবারে ঋষিপ্রবরের চরণে গিয়া, আপনাকে ঢালিয়া দিলেন ও তাঁহার পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শিষ্য গেহসি আর এক ধাতুর লোক ছিল। সে সমবেদনা কি জিনিস, তাহা জানিত না। সে ঋষির সঙ্গে থাকিত বটে, ঋষির সঙ্গে ধর্ম্মোদ্দীপনী সভায় যাইত বটে, সঙ্কীর্ত্তনেও নাচিত বটে, কিন্তু স্রোত মধ্যগত প্রস্তরের ন্যায় তার অন্তর্জীবন কখনও প্রেম ও ভক্তির রসে গলে নাই। তাই সে মেয়েটীকে ঋষির চরণে বিজড়িতা দেখিয়া, তাকে সে চরণ থেকে টানিয়া তুলিতে উদ্যত হইল।

ঋষিপ্রবর গেহসিকে মেয়েটীকে ছুঁইতে বারণ করিলেন। ঋষি আর এক রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। তিনি যেহোবার শক্তিতে পরিপূর্ণ ছিলেন—মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্র জানিতেন। তিনি গেহসিকে বলিলেন, "তুমি আমার হাতের এই লাঠিগাছি নিয়ে দৌড়ে যাও ও লাঠিগাছি বালকের মুখের উপর রাখ, বালক জীবিত হইবে।" গেহসি লাঠি লইয়া দৌড়িল। এ দিকে ঋষিপ্রবর বুঝিতে পারুন আর না পারুন, স্ত্রীলোকটী গেহসির বকধার্ম্মিকতা বিলক্ষণ বুঝিতেন, কেন না, বার বার সে ঋষির সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে অতিথি হইয়াছে। নারীর তীব্র চক্ষু পুরুষের দুর্ব্বলতা অনায়াসে দেখিতে পারে। অতএব সুনামবাসিনী নাছোড় হইয়া ঋষিকে বলিতে

লাগিলেন, "হে প্রভো! আমি আপনাকে ছাড়িব না, আপনাকে যেতেই হবে।" অগত্যা ঋষিপ্রবর পর্ব্বত হইতে অবতরণ পূর্ব্বক রমণীর সঙ্গে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে গেহসি মিলিল, সে যষ্টি হস্তে ফিরিয়া আসিতেছে। সে বলিল, "হে গুরো! তোমার লাঠি ছেলের উপর রাখিয়াছিলাম, কিন্তু বালক কিছুতেই জাগিল না।"

মৃত লাঠি মৃত বালককে কি করে জাগাইবে? অথবা যে বিশ্বাসে লাঠি কার্য্যকর হয়, গেহসির সে বিশ্বাস কোথায়? পূর্ব্বকালে মুসার হস্তে মেষ চারণের দণ্ড ছিল। যেহোবার আশীর্ব্বাদে সেই চারণ-দণ্ডই মিশর দেশে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছে—পরাক্রান্ত ফেরোর শক্তি চূর্ণ করিয়া নিষ্পীড়িত ইস্রায়েল বংশকে শুষ্কপথে লোহিত সাগর পার করিয়া আনিয়াছে। বিশ্বাসই মৃত সঞ্জীবন মন্ত্রের মূল। গেহসির বিশ্বাস ছিল না। তা ছাড়া গেহসির চরিত্রবলও ছিল না, কাজেই মৃত বালক জাগিল না।

মাতা ও ঋষি নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিলেন, গেহসিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া গৃহ প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইল। ঋষিপ্রবর মাতা ও গেহসিকে নীচে রাখিয়া স্বয়ং উপরে চড়িয়া স্ব প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহারই পর্য্যঙ্কে বালক শায়িত—সাড়া নাই, শব্দ নাই—মৃত্যুর হিমস্পর্শে হেমময় কান্তি হিম হইয়া রহিয়াছে! দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঋষিপ্রবর প্রথমে সর্ব্বশক্তিমান যেহোবার নিকট প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনান্তে পর্য্যঙ্কে চড়িয়া ঐ শবের উপর নিজ দেহ বিস্তার করিয়া দিলেন। তার মুখের উপর মুখ রাখিলেন, চোখের উপর চোখ, হাতের উপর হাত রাখিলেন। কিছুক্ষণ পরে বালকের গাত্র গরম হইল। ঋষিপ্রবর পর্য্যঙ্ক হইতে অবতরণ পূর্ব্বক প্রকোষ্ঠ মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার পর্য্যঙ্কে আরোহণ পূর্ব্বক আবার বালকের উপরে আপনাকে বিস্তার করিলেন, এবার বালক সাত বার হাঁচিল ও চক্ষু মেলিয়া চাহিল। তখন ঋষিপ্রবর দ্বার খুলিয়া মাতাকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন, পুত্রকে লইয়া যাও। বিশ্বাসিনী মাতা ভূমিতে পড়িয়া ঋষিপ্রবরের পদযুগে প্রণিপাত পূর্ব্বক পুত্রকে কোলে তুলিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন।

এ যুগে আর সে যুগের ন্যায় বিশ্বাস নাই। এ যুগে আমরা দর্শন বিজ্ঞান পড়িয়া এই সকল প্রাচীন লিপিকে পৌরাণিক গল্প বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিই। পৌরাণিক গল্প হউক বা সত্য ঘটনা হউক, এ যুগে অন্ততঃ আমরা উহা হইতে অনেকগুলি উপদেশ লাভ করিতে পারি।

প্রথমতঃ শব সাধনের জন্য বিশ্বাস চাই। জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস—জীবন্ত ঈশ্বরের শক্তিতে বিশ্বাস। গেহসির ন্যায় অবিশ্বাসী মৃতকে জীবিত করিতে পারে না। এই মৃত ভারতে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইলে জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস চাই। আমরা সংস্কৃত পড়িয়া ভারতের প্রাচীন শ্মশান হইতে ঋষিদের খানকতক দগ্ধাবশিষ্ট লাঠি তুলিয়া আনিয়াছি। ঋষিরা যে সঞ্জীবনী শক্তিতে বিশ্বাস করিতেন, সে সঞ্জীবনী শক্তি ভিন্ন শুধু কি ঐ দগ্ধাবশিষ্ট লাঠিগুলি মৃত ভারতে জীবন দিতে পারে? আবার ইংরেজী পড়িয়া নানা জাতির উত্থান ও পতনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া রাজদ্বারে জীবন ভিক্ষার্থ দাঁড়াইয়া আছি। বৃটিশ পার্লেমেণ্ট যদি আমাদের পানে

একটু কৃপানেত্রে চান, তো অমনি আমরা জীবন পেয়ে জেগে উঠিব। ওরে অবোধ! জীবনের উৎস যিনি, তাঁকে পশ্চাতে ফেলে মানুষের দ্বারে জীবন ভিক্ষা করে কি জীবন পাওয়া যায়? বৃটিশ পার্লেমেণ্ট গেহসির হাতের মৃত যষ্টি। ঐশী শক্তি ভিন্ন সে যষ্টি কার্য্যকর হইবে না। একারণ প্রথমে ঈশ্বরে বিশ্বাস চাই—ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা চাই।

দ্বিতীয়তঃ শব সাধনের জন্য চরিত্রবল চাই। শুনাম-নিবাসিনী গেহসির চরিত্র-হীনতা বেশ জানিতেন। গেহসি বকধার্ম্মিক হ'য়ে ঋষির সঙ্গে দিনকতক বেশ ছিল, তারপর আর একটা ঘটনায় ধরা পড়ে কুষ্ঠী হয়ে ঋষির আশ্রম থেকে তাকে নিষ্ক্রান্ত হতে হ'ল। আমরা, যারা ভারতকে জাগাইতে চাই, আমাদের কি তদুপযুক্ত চরিত্রবল আছে? দেখ আমেরিকা এযুগে জগতে রাণী হয়ে বসেছে। আমেরিকা একেবারে নিষ্পাপ, তাহা ত বলিতে পারি না। তবু আমেরিকা একটা বিষয়ে নিশ্চয়ই চরিত্রবল দেখাইয়াছে। তাহা সে দেশ হইতে শুণ্ডি-কালয়ের অন্তর্ধান। ভারতের কোটি কোটি টাকা শুঁড়ির পেটে যাইতেছে—সহস্র সহস্র পরিবার মদের অত্যাচারে অন্নাভাবে মরিতেছে—লক্ষ লক্ষ অনশ্বর আত্মা মদ্যপের অপবিত্র দেহে মৃতবৎ অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। শুণ্ডিকালয় ছাড়া ভারতে বেশ্যালয়ও কম নহে। এ সকল বেশ্যালয় কেবল নিরক্ষর লোকের গম্যস্থান নহে। অগণ্য শিক্ষিত লোক এই সকল স্থানে চরিত্রহীন হইতেছে। যারা নিজ চরিত্র সংরক্ষণে সমর্থ নহে, তারাই আবার স্বরাজের ধুয়া ধরেছে। চরিত্রবল না হইলে স্বরাজ পররাজ অপেক্ষাও কষ্টদায়ক হইবে। এ দেশে একটা সামান্য কাজ বিনা উৎকোচে চলে না। চরিত্র নামক জিনিসটার অস্তিত্বই যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। চরিত্রবল ভিন্ন এ মৃত ভারত কি করে জাগিবে?

তৃতীয়তঃ সহানুভূতি ও সমবেদনা চাই। গেহসির হাতের শুষ্ক লাঠিতে সহানুভূতি ছিল না—গেহসির শুষ্ক প্রাণে সমবেদনা ছিল না। তাই সে শবসাধনে কৃতকার্য্য হইল না। কিন্তু ঋষিপ্রবর সেই নিস্তব্ধ প্রকোষ্ঠে চুপি চুপি ঢুকে সেই মৃত বালকের উপর আপনাকে বিস্তৃত করিয়া দিলেন। প্রথমে তিনি যেহোবার নিকট প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনার উত্তরে যেহোবা বলিলেন, ঐ মড়ার উপর আপনাকে প্রসার কর—তার মুখের উপর মুখ, চোখের উপর চোখ, বুকের উপর বুক, হাতের উপর হাত রাখ। ইহুদিদের বিধ্যানুসারে মৃতদেহ অস্পৃশ্য—যে তাকে ছোঁয়, সে অশুচিগ্রস্ত হয়, কিন্তু সহানুভূতি ও সমবেদনা বিধিব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলে। কাহারও নিমিত্ত প্রার্থনা করা অতি সহজ, কিন্তু তাকে হাত দিয়ে ছোঁওয়া অতি কঠিন। আমরা, যারা ধার্ম্মিকতার খাতায় নাম লিখাইয়াছি, স্বদেশের জন্য প্রার্থনা অনেক করিয়া থাকি, কিন্তু স্বদেশের দুঃখভার লঘু করিতে কোন্ কাজটায় হাত দিই? ইলিশা ঋষি সেই মৃতের খট্ট সমীপে কেবল প্রার্থনাই করিলেন না, বরং সেই মৃতের মুখে মুখ, বুকে বুক রাখিয়া তার উপর আপনাকে বিস্তার করিয়া দিলেন—পূর্ণরূপে আপনাকে মৃতের সংস্পর্শে আনিলেন। ইহাই শব সাধনের গূঢ় রহস্য।

দেশের নেতাগণ শিমলাশৈলে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ষোড়শোপচার সম্ভোগ

করে, লাট-দরবারে গোটাকতক রিজলিউশন পাশ করিয়ে মৃত ভারতকে তুলিতে চান, তা কি সম্ভব? এ দেশের অসংখ্য লোক অস্পৃশ্য। মৃত শবকেও মানুষ ছোঁয়, এদের কেউ ছোঁয় না। মৃত শবকেও মানুষ বুকে জড়িয়ে কাঁদে, এদের জন্য কেউ অশ্রুপাত করে না। এদের অবস্থা শবাপেক্ষাও শোচনীয়। ঈশ্বরের কৃপায় আমি প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া এদের ভিতর কাজ করিতেছি। কিন্তু এদের তোলা যে কি কঠিন, তা আর কি বলিব। একাজ মনুষ্যশক্তির অতীত। জনসমাজের নিম্নতম স্তরে মহাপঙ্কে এরা ডুবে আছে। নামে শুধু মানুষ, অবস্থায় পশু অপেক্ষাও হীন। আধ্যাত্মিক রাজ্যের কথা ত জানেই না, নৈতিক জীবন মহা পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত। আজ একটু তুলিলাম, কাল আবার চতুর্গুণ নীচে পড়িয়া গেল। তা ছাড়া যারা তাদের তুলিতে চায়, অন্য লোকে তাহাদিগকে উৎপীড়ন করে—গড়া কাজ ভেঙ্গে ফেলিতে চেষ্টা করে। লাট সাহেবের সভায় গিয়ে এদের সপক্ষে বলা অতি সহজ। কিন্তু গ্রামের যে কূপ হইতে তুমি জল তোল, সেই কূপ হইতে এদের জল তুলিতে দেওয়া সহজ নহে। শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। অস্পৃশ্যদের তুলতে হলে, তোমায় অস্পৃশ্য হতে হবে। তাদের পূর্ণ সংস্পর্শে আসিতে হইবে। ভাই বলে তাদের গলা জড়িয়ে ধরিতে হইবে। মুখে মুখ, বুকে বুক না রাখিলে এ মৃতে প্রাণ আসিবে না।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। পণ্ডিত জগন্নাথ নামে জনৈক রাজপুতনাবাসী ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর কিছুদিনের জন্য ধর্ম্মতত্ত্ব পাঠের নিমিত্ত আমাদের সেমিনরীতে প্রেরিত হন। একবার তিন মাসের জন্য অস্পৃশ্য লোকদের মধ্যে কাজ করিবার জন্য আমি ইহাকে কতিপয় গ্রামে পাঠাইয়া দিই। কিন্তু ঐ ব্যক্তির চরিত্রবল কি আশ্চর্য্য ছিল! কি আশ্চর্য্য আত্মত্যাগ! পণ্ডিত জগন্নাথ খ্রীষ্টের ক্রুশে আপনার ব্রাহ্মণত্ব বলিদান পূর্ব্বক অস্পৃশ্য লোকদের ভিতরে আপনাকে অস্পৃশ্য করিয়া তাদেরই একজন হইয়া দাঁড়াইলেন। তাদের মলিন গৃহে বসিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দেন। তারা নিজ হাতে যে অন্ন রাঁধিয়া তাঁর সম্মুখে রাখে, তিনি বিনা বিচারে তাহা খান। তাহাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে তাহার জন্য সহর থেকে ঔষধ লইয়া যান। পণ্ডিতজীর সহধর্ম্মিণীও তাঁহার সহধর্ম্মিণীই ছিলেন। বামুনের মেয়ে, অক্লেশে স্বামীর সঙ্গে পতিত জাতিদের মধ্যে ফিরিতেছেন—তাদের নারীগণকে ঈশ্বর ও ধর্ম্মের পথ দেখাইতেছেন। তিন মাসের মধ্যে ঐ দম্পতির এ অঞ্চলে ঘরে ঘরে মুখে মুখে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, ইহার কারণ কি? সহানুভূতি ও সমবেদনা—অস্পৃশ্যের সঙ্গে অস্পৃশ্য হওয়া—পতিতের সঙ্গে পতিত হওয়া—মুখে মুখ, বুকে বুক, হাতে হাত রাখা। যে এ সাধনে সিদ্ধ হইয়াছে, সে-ই শব সাধন করিতে পারিবে—তাহার স্পর্শে মৃত জাগিয়া উঠিবে।

মৃত ভারতকে প্রাণ দিতে হইলে এই সাধন চাই। যাদের তুমি হাত দিয়ে ছোঁবে না, তাদের জন্য গোটাকতক রিজলিউশন পাশ করিয়ে তাদের তুমি তুলিতে পারিবে না। তুমি হিন্দু হও, মুসলমান হও, ব্রাহ্ম হও, আর খ্রীষ্টান হও, যতদিন এই সহানুভূতি ও সমবেদনা-মন্ত্রে দীক্ষিত না হইবে, ততদিন

তুমি ভারতে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিবে না। অতএব শব-সাধনের গূঢ় রহস্য :—

(১) ঈশ্বরে বিশ্বাস।

(২) চরিত্রবল।

(৩) সহানুভূতি ও সমবেদনা।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

অনুন্নত জাতি-সংঘ

ভারতীয় অনুন্নত জাতিগণের উন্নয়ন-সমস্যা বর্ত্তমান যুগের বিবিধ সমস্যার মধ্যে অন্যতম একটী প্রধান সমস্যা। ভারত-হিতৈষী মনীষিবৃন্দের মধ্যে অনেকেই এই গুরুতর সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত বর্ত্তমান সময়ে প্রয়াস পাইতেছেন, স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীমতী আনি বেশান্ত, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস ও কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ ব্যক্তিগণ ভারতের বিবেক বুদ্ধিকে এই সম্বন্ধে অবহিত হইবার জন্য প্রবন্ধ লিখিতেছেন ও সভা-মণ্ডপ মুখরিত করিতেছেন, কোটী কোটী অনুন্নত ভ্রাতা ও ভগিনীকে সর্ব্ব প্রকার অধিকার লাভের অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া আবর্জ্জনা রাশির ন্যায় অবহেলার চক্ষে দর্শন করা যে বিষম ভ্রম ও অনর্থপাতের হেতু, তাহা প্রদর্শনের নিমিত্ত ইঁহারা চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, ভারতের উন্নতি-গঙ্গার পথে অনুন্নত জাতিরূপী ঐরাবত কিরূপ এক বিশাল বাধা স্বরূপে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে, শ্রীমতী আনি বেশান্ত বিগত দিল্লী কংগ্রেসে সভানেত্রীর আসন হইতে এই কথায়ই যে সত্যস্বরূপ দৃঢ়ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। তিনি বলিয়াছেন,—"It is useless to cry out to God, to cry out to England, to let you be free citizens in a free land if the curse of this slavery is to remain upon the land and freedom is only to be the freedom of the educated people" অর্থাৎ যদি শিক্ষিত সমাজের স্বাধীনতাই স্বাধীনতার দ্যোতক হয় এবং এই সামাজিক দাসত্বরূপ অভিসম্পাৎ দেশ হইতে বিলুপ্ত না হয়, তাহা হইলে স্বাধীন রাজ্যের স্বাধীন অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবার জন্য ভগবানের সমীপে প্রার্থনা করিয়া কোনও ফল হইবে না, তথা ইংলণ্ডের নিকটেও চীৎকার করা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

অসংখ্য অনুন্নত নর-নারীর মুক্তির বাণী বহন করিয়া যাঁহারা শ্রেষ্ঠ মানবরূপে পরিচিত হইতেছেন, তাঁহাদের কথা পৃথক, কিন্তু যাঁহারা স্বাধীনতার স্বপ্ন লইয়া বিভোর অথচ স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করিবার বাধাকে বাধা বলিয়াই স্বীকার করিতে চাহেন না, অধিকন্তু মুক্তির পথ-নির্দ্দেশকগণকে বিজ্ঞের আসন প্রদান করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদের প্রয়াসের পরিণাম চিন্তা করিলে সত্য সত্যই শঙ্কিত হইতে হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎলিখিত 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' নামক প্রবন্ধের এক স্থলে লিখিয়াছেন—"এত নিষ্ঠুর

জবরদস্তি দ্বারা যাদের অতি সামান্য খাওয়া ছোঁওয়ার অধিকার পর্য্যন্ত পদে পদে ঠেকান হয় এবং সেটাকে যারা কল্যাণ বলিয়াই মানে, তারা রাষ্ট্র ব্যাপারে অবাধ অধিকার দাবি করিবার বেলায় সঙ্কোচ বোধ করে না কেন ?" বাস্তবিক যেখানে সঙ্কোচের অত্যাবশ্যকতা স্বতঃসিদ্ধ, সেখানে যদি নিঃসঙ্কোচে অগ্রগতি আরব্ধ হয়, তাহা হইলে প্রকৃতই শঙ্কার কারণ থাকে না কি ? স্বাধিকার লাভেচ্ছু ভারত এখনও আপনার ভুল বুঝিবার মত যোগ্যতা-লাভ করিতে পারে নাই। তাহাকে অবহিত হইবার জন্য এ পর্য্যন্ত যে-সকল অভিঘাত বাহির হইতে ও ভিতর হইতে প্রদত্ত হইতেছে, সেগুলি এতই মৃদু ও মোলায়েম যে, তাহার বহুযুগার্জ্জিত অন্ধ সংস্কারকে স্থানচ্যুত করিতে তাহাদের ক্ষমতা অত্যন্তই অল্প। ভারত তাহার নব্যতার যতই বড়াই করুক না কেন, তাহার কণ্ঠে ও দেহে জড়তার প্রাচুর্য্য পূর্ণরূপে বিদ্যমান। অনুন্নত নারায়ণগুলির সেবার জন্য ভারতের বদ্ধ হস্ত প্রসারিত হইতে একান্তই অনিচ্ছুক। এমন কি, তাহাদের প্রকৃত দুরবস্থার উল্লেখ পূর্ব্বক সেগুলির অপনোদনের জন্য বাক্য উচ্চারণ করিতেও ভারতের কণ্ঠ একান্ত নারাজ। তাহা না হইলে ভারতব্যাপী বিশাল জন-সঙ্ঘের প্রতিনিধি সভা কংগ্রেসে একমাত্র বিদেশবাসিনী শ্রীমতী আনি বেশান্তের কণ্ঠ হইতেই অনুন্নতের প্রতি যা' কিছু সহানুভূতির কথা উচ্চারিত হইয়াছিল কেন ? এবং তিনি নারী হইয়াও ভারতের পুরুষগণকে ধিক্কার দিয়া কেন বলিয়াছিলেন—"Can you for shame's shake ask for that larger liberty for yourselves, unless you break the chains on the limbs of these out-castes that you have bound around them ?" অর্থাৎ এই সমূহ পতিত শ্রেণীকে তোমরা যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছ, তাহা উন্মোচিত না করিয়া অধিকতর প্রসর স্বাধীনতা লাভের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে কি তোমরা লজ্জানুভব কর না ?

প্রকাশ্য মহাসভায় এরূপ তীব্র ও মর্ম্মস্পর্শী ধিক্কার লাভ করিয়াও নব্যভারতের মনুষ্যত্ব আজিও সুপ্তি ত্যাগ করে নাই। শ্রীমতী আনি বেশান্তের ন্যায় মহীয়সী ও বিদুষী রমণীর জ্ঞানগর্ভ উপদেশবাক্যের প্রতি অনাস্থা ও অনাদর প্রদর্শন করিয়া ভারত যে নিতান্তই মূঢ়তার পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীমতী বেশান্ত কংগ্রেসের কর্ণধারের আসনে উপবেশন করিয়া উহার ছিদ্র-পথের সন্ধান দিয়াছেন। তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি সম্পাদন করিয়াছেন, কিন্তু নব্যভারত বধিরের ন্যায় ব্যবহার করিয়া আপনার গাম্ভীর্য্য ও বিশেষত্ব রক্ষা করিতেছে। এই গাম্ভীর্য্য ও বিশেষত্বের গভীরতা যে নিতান্ত নগণ্য, তাহা পৃথিবীর সুসভ্য জাতি-নিচয়ের অবিদিত নাই।

যাহারা দেশের সারবস্তু, যাহারা শরীরের শোণিত জল করিয়া দেশের শ্রী-সম্পদ ও সভ্যতা রক্ষার্থে দেহপাত করিতেছে, যাহাদের অভাবে দেশের গৌরব-মুকুট ভূলুণ্ঠিত হয়, যাহাদের সেবার হস্ত সঙ্কুচিত হইলে রোগ শোক ও মড়কে দেশ উচ্ছন্ন যাইবে, সেই সকল অনুন্নত শ্রেণী যে নিতান্তই উপেক্ষার বস্তু নহে, তাহা ভারতবর্ষকে হৃদয়ঙ্গম করাইতে কেবলমাত্র কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোকের প্রচেষ্টা যথেষ্ট নহে।

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের আন্দোলনও দেশের শরীরে তেমন গভীরভাবে স্পন্দন অনুভূত করাইতে সক্ষম হইতেছে না। তাহার কারণ এই যে, তাঁহাদের আশঙ্কাকে আশঙ্কা বলিয়া ভারত আজিও অনুভব করিতেছে না; নেতৃবর্গের উক্তিকে একটা মামুলী প্রলাপ বাক্য বলিয়াই লোকের ধারণা। তাঁহাদের আশঙ্কাকে যথার্থ আশঙ্কা বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য অনুন্নত জাতিগণের পক্ষ হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কোন চেষ্টা সংঘবদ্ধ ভাবে হয় নাই বলিয়াই অনুন্নত জাতির উন্নয়ন-সমস্যা অবহেলার সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে। যে দিন তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া বজ্র-নির্ঘোষে আপনাদের অধিকারের দাবী করিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রকম্পিত করিয়া তুলিবে, সেই দিনই তাহাদের উন্নয়ন-সমস্যা ভারতীয় বিবিধ সমস্যার মধ্যে নিশ্চয়ই আপনার স্থায়ী স্থান করিয়া লইবে। সে দিন আর বিগত 'কলিকাতা কংগ্রেসে'র রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হাস্যকর অভিনয়ের পুনঃপ্রকাশ হইবে না;—কোনও অনুন্নত ভ্রাতাকে লইয়া উন্নতি-প্রয়াসীর দল পুতুল-নাচ করাইয়া স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস পাইতে সাহসী হইবেন না। সংঘবদ্ধ অনুন্নত জাতিগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া তৎপশ্চাৎ তাঁহাদিগকে গমন করিতে হইবে। কোটী কোটী উপেক্ষিত অনুন্নত জনসংঘের সামাজিক অধিকার লাভের প্রস্তাবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়া তৎপরে অন্য সকল প্রস্তাবকে আসন দিতে হইবে। আহত সর্প ফণা উত্তোলনে উদ্যত হইয়াছে; সিংহ-শিশু আপনার ক্ষমতা উপলব্ধি করিয়াছে; ব্যাঘ্র পিঞ্জর ভাঙ্গিয়াছে। ভারতের কোটী কোটী উপেক্ষিত নর-নারীর আত্ম-সম্মান-বোধ জাগরিত হইয়াছে। সে দিন মান্দ্রাজের 'চেরুমা' জাতি চির-নিষিদ্ধ পথে গমন করিয়া ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ দিয়াছে, নমঃশূদ্র ভ্রাতাগণ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির জলস্পর্শ না করিয়া জাত্যভিমানের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষে অনুন্নত জাতিবৃন্দের অঙ্গ-গর দেহে চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। অনুন্নত জাতি-নিচয়ের এই নব জাগরণকে শক্তিমান সত্তা প্রদান করিতে হইলে তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। সমগ্র ভারতে "নিখিল-ভারত-অনুন্নত জাতি-সংঘ" All India Backward classes' League এবং প্রত্যেক প্রদেশে একটী করিয়া ইহার শাখা সংগঠন করিতে হইবে, আপনার পায়ে ভর দিয়া আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে এবং আপনাদের দাবী বুঝিয়া লইবার জন্য জাতীয় মহাসভার সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া হুহুঙ্কার করিতে হইবে। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক অনুন্নত জাতির মধ্য হইতে দলে দলে প্রতিনিধি লইয়া এই বিরাট সংঘ গঠিতে হইবে। প্রত্যেক অনুন্নত জাতির মধ্যে এমন এক মহাভাব প্রচার করিতে হইবে, যাহার প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী ভেদের বাঁধ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সাম্যের সমতলে মিশিয়া যাইবে। সামাজিক অধিকারের পরিপন্থী স্বেচ্ছাচার-পরায়ণতা যাহাতে তথা-কথিত উচ্চ শ্রেণীগণের হৃদয় হইতে উৎপাটিত হইয়া যায়, তাহার জন্য উক্ত 'সংঘ' তাহাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। প্রবল আন্দোলন উত্থিত করিয়া 'সংঘ' দেখাইয়া দিবে যে, অন্য কোনও সভ্যদেশের সমাজ-তন্ত্রে এমন অমানবোচিত অত্যাচার নাই; যুক্তিযুক্ত প্রমাণ

দ্বারা 'সংঘ' নির্দ্দেশ করিবে যে, অন্য কোনও সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-ব্যবস্থায় সমধর্ম্মীদের জন্য এমন বর্ব্বরোচিত বিধান নাই; এমন কি, উদার হিন্দুশাস্ত্র মধ্যেও মানব-ঘৃণার বিন্দুমাত্রও অনুশাসন নাই। মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দের জলন্ত ভাষায় সংঘ প্রচার করিবে —"সমগ্র ভারত আর্য্যময়—এখানে অপর কোন জাতি নাই; শূদ্র জাতি যে সকলেই অনার্য্য, একথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক; সকল জাতিকে ব্রাহ্মণত্বের গৌরব দিতেই হইবে; প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য দিতেই হইবে; একচেটিয়া অধিকারের একচেটিয়া দাবীর দিন চলিয়া গিয়াছে—চিরদিনের জন্য ভারতক্ষেত্র হইতে চলিয়া গিয়াছে।"

আমরা সেই মহাদিনের অপেক্ষা করিতেছি যে দিনে সমগ্র ভারতস্থিত অনুন্নত জাতির প্রতিনিধিরূপে 'নিখিল-ভারত-অনুন্নত-জাতি-সংঘ' উচ্চকণ্ঠে মহামনীষী ঋষিতুল্য টলষ্টয়ের এই অমর বাণী ঘোষণা করিবে, "All men live, not by the care they take of themselves, but by the love that there is in men. I have learned that it only seems to men that they live by the care they take of themselves; but in truth they live only by love." অর্থাৎ স্বকীয় যত্নের প্রভাবকেই যে মনুষ্য-সমাজের স্থিতি, তাহা নহে, এই স্থিতির প্রধান উপকরণ তাহাদের অন্তর্নিহিত প্রেম। সাধারণতঃ মানুষের আচরণ দেখিয়া আমি ইহাই জানিয়াছি যে, তাহারা মনে করে যে ব্যক্তিগত যত্নই তাহাদের জীবন-ধারণের হেতু; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেমের বিনিময়ই তাহাদের স্থিতির কারণ।

ভারতের তথা-কথিত উচ্চ শ্রেণীগণের হৃদয়ে প্রেমের এই মাহাত্ম্যকে দৃঢ়মূল করিয়া দিতে যেদিন 'সঙ্ঘ' তাহার কণ্ঠ নিনাদে দিক্ পরিপূরিত করিবে এবং সেই কণ্ঠস্বরের আহ্বান উচ্চশ্রেণীগণের হৃদয়ের দ্বারে আঘাতের পর আঘাত দিয়া তাহাদের সুপ্ত চৈতন্যকে জাগরিত করিবে ও লোক-স্থিতির এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিবে, সেই দিন প্রকৃতই 'সঙ্ঘের' পক্ষে মহামহোৎসবের দিন বলিয়া গণ্য হইবে। 'সঙ্ঘ' তাহার সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া বুঝাইতে ও জানাইতে চেষ্টা করিবে যে, উচ্চশ্রেণীগণ কেবলমাত্র আপনার উন্নতি করিয়া, কেবলমাত্র আপনার প্রতি যত্ন করিয়া, কেবলমাত্র আপনার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কোন কালেই তাঁহাদের স্থিতিকে অক্ষয় করিতে পারিবে না। 'সঙ্ঘ' নিরন্তর ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবে যে, অনুন্নত ভ্রাতাগণকে অপ্রেম করিয়া, ঘৃণা করিয়া, তাচ্ছিল্য করিয়া উচ্চশ্রেণীর জনগণ নিজেদের আত্মরক্ষার পথেই কণ্টকারোপ করিয়া চলিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন—"যে জাতি আপনাকে পৃথক রাখিয়াছে, তাহারই পক্ষে ফল অতি শোচনীয় হইয়াছে। আমার মনে হয়, ভারতের পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ—এই জাতির চারিদিকে এইরূপ আচারের বেড়া দেওয়া। * * * অপরকে ঘৃণা করিতে থাকিলে কেহই নিজে অবনত না হইয়া থাকিতে পারে না। * * যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোনমতেই স্বাধীনতার উপযুক্ত নয়। * *

দাসেরা শক্তি চায় অপরকে দাস করিয়া রাখিবার জন্য, * * যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কি স্বয়ং স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য ?" স্যর রবীন্দ্রনাথও 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' প্রবন্ধে বলিয়াছেন "যেখানে দুই পক্ষ লইয়া কারবার, সেখানে দুই পক্ষের শক্তির যোগেই শক্তির উৎকর্ষ; দুই পক্ষের দুর্ব্বলতার যোগে চরম দুর্ব্বলতা। * * * সবল দুর্ব্বলের পক্ষে যত বড় শত্রু, দুর্ব্বল সবলের পক্ষে তার চেয়ে কম বড় শত্রু নয়।" মান্দ্রাজ হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার মিঃ আর্ডলি নর্টন 'লুকার্ অন্' নামক কাগজে লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মণের প্রভাব ও অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার জন্য ও সামাজিক অধিকারলাভের জন্য অব্রাহ্মণগণকে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে। ভিক্ষাবৃত্তি কান্নাকাটিতে কোন ফল হইবে না। স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণগণ কখনও তাহাদের অধিকার ছাড়িবে না। চাই প্রকাশ্য বিদ্রোহ। স্বার্থত্যাগী সমাজ-সেবক এই বিদ্রোহ ঘোষণা করিবেন। * * * কেবলমাত্র প্রকাশ্য বিদ্রোহ দ্বারা মুক্তি ও নবজীবন লাভ করা যাইতে পারে।" (সঞ্জীবনী, ২২শে ফাল্গুন, ১৩২৫)

দেশের চিন্তাশীল, মনস্বী ও জ্ঞানীগণ এই যে উল্লিখিত ভাবরাজি প্রচার করিয়াছেন, ইহা কি কেবল তাঁহাদের পুস্তকের ও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার শোভা বর্দ্ধনের জন্য? এই সকল জলন্ত ও জীবন্ত ভাব-সম্পদ লইয়া যে দিন ভারতের উচ্চ ও নীচ সকল শ্রেণীর জনগণই সম্পন্ন হইয়া উঠিবে, সেই দিন প্রকৃত পক্ষে ভারতের এক মহা শুভদিন বলিয়া গণ্য হইবে। উচ্চশ্রেণীর পক্ষাবলম্বন করিয়া এস্থলে আমি কিছু বলিতে চাহি না। আমার বক্তব্য অনুন্নত ভ্রাতাগণের সমীপেই। তাঁহাদের কুম্ভকর্ণী নিদ্রা ভঙ্গ হইবে না কি? তাঁহাদের আহত আত্মসম্মান কি অপমান-ব্যথিত হইয়া শীর্ষোত্তোলন করিবে না? সমদর্শী মহাজনগণের জ্ঞানগর্ভ উপদেশবাণী পাঠ করিয়া কি তাঁহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগরিত হইবে না? এই সকল মহাবাণী যে বিধাতার অপার করুণারই নিদর্শন। তিনিই ত বিবেকানন্দ, টলষ্টয়, রবীন্দ্রনাথ ও নর্টন প্রমুখ নর-নারায়ণরূপে আমাদিগকে কর্ত্তব্যের ইঙ্গিত প্রদান করিতেছেন। হে নমঃশূদ্র, পোদ, রাজবংশী, ঝল্ল-মল্ল, ভুঁইমালী, পাটনী, মাহিষ্য, যোগী, কাপালিক, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, তেলি, তিলি, তাম্বুলী, গোপ, নরসুন্দর প্রভৃতি ভ্রাতা সকল, আসুন সকলের প্রাণ এক তারে বাঁধিয়া আমরা সংঘ-বদ্ধভাবে কর্ত্তব্যসাধনে বীরের ন্যায় অগ্রসর হই। বাঙ্গালা দেশ আমাদেরই ন্যায় নিম্ন সম্প্রদায়-সকলের কোটী কোটী পূর্ব্বপুরুষের অস্থি-পঞ্জর দিয়াই গঠিত। আমাদেরই পিতৃ-পিতামহগণের শরীরপাত পরিশ্রম ও অনশন-ক্লিষ্ট হস্তের সাহায্যেই এই সোণার বাঙ্গালার উৎপত্তি। আজিও আমাদের বিশ্রামের অবসর নাই। কবে কোন্ যুগে পূর্ব্বপুরুষগণ পরিশ্রম আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর পর্ণকুটীরে বাস করিয়া আজিও তাহা অবিশ্রান্ত চলিতেছে। অর্দ্ধাশন, অনশন ও অনাটন সম্বল করিয়া, পানীয়-বিহীন কর্দ্দমাক্ত জলাশয় পরিপূর্ণ পল্লীর পর্ণকুটীরে বাস করিয়া, কঙ্কাল-সার রোগ-জীর্ণ পুত্র-কলত্র লইয়া আমাদেরই ন্যায় লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত ও পদদলিত সমাজের কোটী কোটী ভ্রাতা বাঙ্গালার শস্য-সম্ভার ও পণ্য-সম্ভার উৎপন্ন করিতেছে। অন্ন ও

অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সমুৎপন্ন করিয়া দেশের বল, বীর্য্য, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য আমরাই প্রদান করিতেছি। কিন্তু তৎ-পরিবর্ত্তে আমরা পুরস্কার পাইতেছি কি ?—না অপমান, লাঞ্ছনা, অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য। ভ্রাতা সব! এমনই করিয়া কি মেষের ন্যায় দিন কাটিবে? আমাদের মর্ম্ম-যাতনাকে মূর্ত্তিমান বিদ্রোহরূপে প্রকাশমান না করিলে এ দুর্দ্দশার যে অন্ত হইবে না। আমরা সকলে সঙ্ঘ-বদ্ধ হইয়া আমাদের বিরাট অস্তিত্বকে প্রকট করিতে না পারিলে কেহ আমাদিগের দিকে ফিরিয়াও তাকাইবে না। মিঃ নর্টন যথার্থ কথাই বলিয়াছেন—"তোমাদের শূন্য আন্দোলন দেখিয়া সমাজকর্ত্তা ব্রাহ্মণগণ গোপনে একটু হাসে মাত্র।" আমরা শূন্য আন্দোলন করিতে চাহি না। আমাদের আন্দোলনকে খুব গভীর করিতে চাহি। আমরা আমাদের মিলিত সংঘ-শক্তি দ্বারা মুক্তি ও নবজীবন লাভ করিতে চাহি। ভ্রাতাগণ! দাসত্বের মোহ পরিত্যাগ কর; পরমুখাপেক্ষিতাকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা কর। ভাল করিয়া অনুভব কর যে, আশ্রয়-তরুর সুশীতল ছায়া রৌদ্র-তাপ হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেও জীবনীশক্তির হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি করে না। সংঘ-বদ্ধ হইয়া আত্মশক্তির চর্চ্চা আরম্ভ করিলেই আমাদের বিরাট সত্ত্বার অন্তর্নিহিত সুপ্ত বীর্য্য নিঃসন্দেহে প্রকট হইয়া দাঁড়াইবে।

মূলকথা এই যে, আমাদিগের উন্নতির পথ আমাদিগকেই আবিষ্কার করিতে হইবে। সে পথ আবিষ্কার করিতে হইলে আমাদের অনুন্নত সমাজগুলিকে মিলনের সূত্রে দৃঢ়বদ্ধ হইতে হইবে। আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে সামাজিক সূক্ষ্ম ব্যবধানটুকু রহিয়াছে, তাহাকে আমাদের মহা-মঙ্গলের সম্মুখে বলি-দান করিয়া সহানুভূতির পবিত্র বেদীমূলে সকলকে সম্মিলিত হইতে হইবে। যে পথকে উন্নতির পথ মনে করিয়া আমরা আত্ম-বিস্মৃত ও মোহাচ্ছন্নভাবে চলিয়া যাইতেছি, সে পথ আমাদের প্রকৃত উন্নতির পথ নহে। Moslem League যে নীতি অবলম্বন করিয়া ও যে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিকেও ঠিক সেই নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এবং তাহা করিতে হইলেই সকল অনুন্নত সম্প্রদায়কে সংঘ-বদ্ধ হইতে হইবে। এই সংঘই আপনাদের সকল দুরবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া ভাবী উন্নতির মার্গ নির্দ্দেশ করিয়া চলিবে। আমরা কয়েক মাস যাবৎ কয়েকটী অনুন্নত সমাজের নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিগণের সহিত এই 'অনুন্নত-জাতি-সংঘ' সংগঠনের জন্য আলোচনা করিতেছি। অধিকাংশ সমাজের নেতৃমণ্ডলী এই 'সংঘ' গঠনে তাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। 'নব্যভারত', 'নমঃশূদ্র-হিতৈষী' ও 'প্রতিজ্ঞা' সংবাদ পত্রে ইতিপূর্ব্বে এই 'অনুন্নত-জাতি-সংঘে'র অচির অভ্যুদয়ের বার্ত্তা ঘোষিত হইয়াছে। উক্ত সকল পত্রিকায় উহার সামান্য আভাষমাত্র দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা বিস্তৃতভাবে এই প্রস্তাব লইয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আশা করি, প্রত্যেক অনুন্নত সমাজের নেতৃবৃন্দ আমাদের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে গভীরভাবে বিবেচনা করিবেন ও যাহাতে আমাদের সম্মিলিত শক্তি ও স্বরকে উপেক্ষার বহু উর্দ্ধে স্থান দান করিতে পারা যায়, তজ্জন্য অচিরাৎ চেষ্টিত হইবেন।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল।

মৃত্যু-মঙ্গল।

জীবন ও মরণ, দুইই হেঁয়ালীর গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। কিরূপে, কি কারণে এবং কি উদ্দেশ্যে জীবন ও মরণ, তাহা নিঃসন্দেহ, নিশ্চিত ও সন্তোষ-জনক রূপে জানিতে পারিয়াছেন বলিতে পারেন, এরূপ লোক অতি বিরল—নাই বলিলেই চলে। এই দুইটী সমস্যার সমাধানার্থ ব্যগ্র প্রয়াসের ফলে বিরাট মানব সমাজে যুগে যুগে নানা মুনির নানা মত ও নানা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। জীব জীবন চাহে ও জীবনকে ভাল বাসিয়া অবিচ্ছেদ্য আলিঙ্গনে চিরতরে আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করে বলিয়া, সে জীবনের উদ্ভব, কারণ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানিবার জন্য বিশেষ উৎসুক ও যত্নবান নহে; কিন্তু সে জীবনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ব্যগ্রতা হেতু মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত, চিন্তিত ও কাতর এবং মৃত্যুকে পরিহার করিবার জন্য সতত ব্যাকুল। মৃত্যুই আমাদের সর্ব্বপ্রকার ভয় ও দুঃখ কাতরতার একমাত্র মূল কারণ। রোগ, সাংসারিক দুশ্চিন্তা, প্রবাসী প্রিয়জনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা, ও দূরদেশ যাত্রী আত্মীয় বন্ধুর সহিত বিদায় কালীন বিচ্ছেদ-যন্ত্রণানুভব, এসমস্তেরই মূলে মরণাশঙ্কা বিদ্যমান। মরণাশঙ্কাই আমাদিগের মনে দুর্ব্বলতা ও ভীরুতা উৎপাদন পূর্ব্বক আমাদিগকে বল বিক্রম ও পুরুষত্ব প্রদর্শনের সুযোগ লাভ করিতে দেয় না, এবং নানা প্রকার গঞ্জনা ও অবমাননা সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে বাধ্য করে।

নরনারী তাহাদের দেহকে কতই না ভালবাসে—কতই না আদর যত্ন করে! চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় নানা সুস্বাদু পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল রক্ষা করে, নানা উপকরণ দ্বারা অতি যত্নে বর্ণোৎকর্ষ সাধন করে, কারুকার্য্য-খচিত বসন ভূষণ রত্নালঙ্কারের সহায়তায় দেহ কান্তি বর্দ্ধনের চেষ্টা পাইয়া থাকে, সুগন্ধি তৈলানুলেপন সংযোগে কুঞ্চিত কুন্তলদামের সৌষ্ঠব সম্পাদন করে, এবং তাম্বুল রাগে অধর যুগের রক্তিমা ফুটাইয়া তুলে। নরনারীর—এবম্প্রকার অশেষ আদর যত্নের দেহের শেষ পরিণাম—বীভৎস পরিবর্ত্তন দর্শনে, জাগতিক জীবনের মূল্য, স্থায়িত্ব, উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনে নানা রূপ সংশয়, সমস্যা ও অনাস্থা উদিত হইয়া মনকে অতল নৈরাশ্য সাগরের ঘূর্ণায়মান আবর্ত্তে হাবুডুবু খাওয়াইয়া চির অপরিচিত অনির্দ্দিষ্ট মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী ছায়া-মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া থাকে।

সতত চঞ্চল অহরহঃ ক্রিয়মাণ সজীব দেহ একদিন মরণাহত হইয়া চিরতরে জীবনাভাবিহীন ম্লান মলিন ও সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় নিস্পন্দ হইয়া পচনশীল জড়পদার্থবৎ পঞ্চভূতে মিলিয়া যাইবে; এবং তাহার গুণাবলী, শক্তি ও পার্থিব অস্তিত্বের চিহ্নমাত্রও বিদ্যমান থাকিবে না। এক অদৃষ্ট অচিন্ত্য অজ্ঞের নিরাকার মহাশূন্যের ভিতর সহসা ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাওয়ার ন্যায়—স্থূলদেহী ব্যক্তির পার্থিব অস্তিত্বের এই যে অভাবনীয় বিলুপ্তি, হাসি অশ্রুমাখা মানব জীবনের সুখ দুঃখময় তাবৎ লীলাখেলায় এই যে মৃগতৃষ্ণিকা বা স্বপ্নবৎ অলীকতা—এই যে লয়ের ভোজবাজী—ইহাই অবিকসিতাত্মজ্ঞান মানবের মনকে অতিমাত্রায় উদ্ভ্রান্ত, অভিভূত ও মৃত্যু

বিভীষিকাভীত করিয়া তুলে। মৃত্যু কি ও কিরূপ, মানব তাহার জীবদ্দশায় সে তথ্য জানিতে পারে না—কেবল মুমূর্ষু অবস্থার কতকগুলি ব্যাহ্যিক লক্ষণ দেখিয়া অনুমানে মৃত্যুর সম্বন্ধে একটা কিম্ভূতকিমাকার অস্পষ্ট ধারণা করিয়া লয় মাত্র। কাজেই, মৃত্যুভীতি মানবের কল্পনায় এতটা প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে যে, যদিও জন্মের পর হইতেই সারা জীবন মানুষকে সহনীয়, অসহনীয় নানা প্রকারের রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, যদিও পূর্ব্বের রোগ যন্ত্রণা বাদ দিলে মুমূর্ষু ব্যক্তি, মৃত্যুর মুহূর্ত্তে (অনুভব শক্তির কেন্দ্র মস্তিষ্কের ক্রিয়া সর্ব্বাগ্রে লোপ প্রাপ্ত হয় বলিয়া) কিছুমাত্র যন্ত্রণাবোধ করে না ও করিতে পারে না, এবং যদিও মুমূর্ষু ব্যক্তির বেদনা-ব্যঞ্জক বলিয়া অনুমিত অঙ্গবিক্ষেপাদি অনুভূতি শূন্য পৈশিক আক্ষেপ ব্যতীত আর কিছুই নহে—তথাপি মানব মৃত্যুকে একটা উৎকট যন্ত্রণাপ্রদ বিকট বিভীষিকাময় ব্যাপার মনে করিয়া, মৃত্যুর নামে আকুল আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে।

পশু পক্ষী সরীসৃপাদির জ্ঞান ও চিত্তবৃত্তি নিতান্ত অপরিস্ফুট বলিয়া তাহারা অটোমেটিক বা স্বতঃ ক্রিয়াশীল যন্ত্রের ন্যায় প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি অনুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে এবং তন্নিমিত্ত তাহারা মৃত্যুভীতি বোধ করে না ও তুষ্ট-তৃপ্ত জীবন যাপন করে। কিন্তু মানব জ্ঞান-বৃক্ষের ফল আস্বাদন করিয়াছে বলিয়া—মানবের মনে চিন্তা, বিচার ও কল্পনা সতত ক্রিয়মান বলিয়া—এবং মানবের হৃদয়ে দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র ভাবলহরী সতত খেলা করে বলিয়া, কুসুমপেলব মধুময় মানব-মর্ম্মে মৃত্যুচিন্তারূপ দুরন্ত কীট প্রবেশ পূর্ব্বক নিয়ত দংশন দ্বারা মানব-জীবন মাধুর্য্যকে বিষাক্ত তিক্ত করিয়া দেয়।

ঈদৃশ বিষম আপদ্ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত ও প্রাণের আনন্দ অব্যাহত অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর মানবগণ বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন ও করিতেছেন। যে শ্রেণীর লোক ইউরোপে এপিকিউরিয়ান ও অস্মদ্দেশে সুখান্বেষী ভোগ-তৎপর চার্ব্বাকের দল বলিয়া পরিচিত, তাহারা ভোগবিলাসের নেশায় বিভোর হইয়া রোগ,শোক, দুঃখ, মরণ, ভীতি প্রভৃতি বিস্মৃতিগর্ভে নিমজ্জিত রাখিতে চাহে; কিন্তু মৃত্যুবিভীষিকা সময় সময় অট্টহাস্য দ্বারা তাহাদিগকেও চকিত স্তম্ভিত করিয়া দেয়—এমন কি, চপল আমোদ প্রমোদে রত থাকার সময়েও, প্রবাস-প্রত্যাগত বন্ধু দর্শনে গম্ভীর ভাবে কুশল জিজ্ঞাসা করতঃ তাহারা নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেরাই জানাইয়া দেয় যে, মৃত্যুর ছায়া তাহাদের পিছু পিছু ফিরিতেছে। মৃত্যুর আক্রমণে এই শ্রেণীর লোকের হৃদয় নিশ্চয় ভাঙ্গিয়া যায়।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা বিশেষরূপে আত্মমর্য্যাদাবিশিষ্ট দৃঢ়ান্তঃকরণ, কৃচ্ছ্রব্রত ও বীরহৃদয়, কিন্তু আত্মার অমরত্ব ও পরলোকে বিশ্বাসী নহেন। ইঁহারা জাতস্য হি ধ্রুবমৃর্ত্যুঃ, সুতরাং যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা সহ্য করিতেই হইবে, নান্যেব গতিরন্যথা, এবম্প্রকার বিচারের দ্বারা মৃত্যুভীতি দমনের বিশেষ প্রয়াস পাইয়া থাকেন। গ্রীক ও রোমক জাতির ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ষ্টোইক (Stoic) সম্প্রদায়ভুক্ত এই জাতীয় অনেক লোক আত্মমর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত স্থির-চিত্তে স্বহস্তে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত দৃঢ় বীর হৃদয়ের

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বটে। কিন্তু অবশ্যম্ভাবীকে সহ্য করিতেই হইবে, ঈদৃশ দৃঢ়তা দ্বারা মৃত্যু ভয় দমন করিতে পারা গেলেও তদ্দ্বারা চিত্তের স্থির সান্ত্বনা ও শান্তিলাভ করিতে পারা যায় না। অলঙ্ঘনীয় অদৃষ্টের বশ্যতা স্বীকার করিলে, শোকাশ্রুসিক্ত আঁখি-যুগল শুষ্ক হইতে পারে ও চতুর্দ্দিক মুখরণকারী বিলাপের হাহাকার ধ্বনি কণ্ঠ-নলীতেই বিলয় প্রাপ্ত হইতে পারে সত্য, কিন্তু স্থিরায়ত শুষ্ক নেত্রের মর্ম্মভেদী উদাস দৃষ্টি এবং চিন্তাভারস্তিমিত হৃৎপিণ্ড হইতে উদ্গত মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস হইতে বুঝা যায় যে, অবরুদ্ধ শোকবেগ প্রাণের ভিতর গুমরিয়া গুমরিয়া হৃদয়কে একেবারে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিতেছে।

প্রকৃত পক্ষে মৃত্যুভীতি দূর করিতে এবং মৃত্যুর সম্বন্ধে চির সান্ত্বনা ও শান্তি লাভ করিতে হইলে মরণের ভিতর মঙ্গল ও জীবন খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। যিনি সানন্দে সখা বলিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে সক্ষম, একমাত্র তিনিই মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারেন।

যাহারা অতিমাত্রায় দেহাভিমানী, অর্থাৎ যাহারা নিজকে দেহ হইতে অভিন্ন জ্ঞান করে, তাহাদিগেরই পারমার্থিক অজ্ঞানতা বশতঃ মরণভয় ও মরণ কাতরতা সমধিক। কিন্তু, জ্ঞানীর নিকট সর্পের জীর্ণত্বক পরিত্যাগের ন্যায় ও মানবের জীর্ণবাস পরিত্যাগান্তে নববাস পরিধানের ন্যায় আত্মার এক নামরূপ পরিত্যাগান্তে অপর নামরূপ বা মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় যে রূপান্তর ক্রিয়া—মধ্যসেতু—পরিবর্ত্তন মুহূর্ত্ত বা সন্ধিক্ষণ, তাহাই মৃত্যু নামে পরিচিত; এবং জ্ঞানী ব্যক্তি মৃত্যুকে কিছু মাত্র ভয়ানক বলিয়া মনে করেন না। যাথার্থ্যতঃ, জীবন ও মরণ একই ব্যাপারের দুই রূপ—এ পিঠ আর ও পিঠ। জীবন ও মরণ জমজ ভাইয়ের ন্যায় এক সঙ্গে দেখা দেয় এবং কায়া ও ছায়ার ন্যায় পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। যে মুহূর্ত্তে জীবনের আরম্ভ, তন্মুহূর্ত্তে মরণের আরম্ভ; এবং যে মুহূর্ত্তে মরণের আরম্ভ, তন্মুহূর্ত্তেই জীবনের আরম্ভ। মরণকে আমাদের জীবনের সঙ্গী—জীবনের খেলার সাথী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতের দিকে অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় যুগপৎ সংযোগ ও বিয়োগ অথবা আকর্ষণ ও বিকর্ষণের পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে খেলা। পরস্পরের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিয়োগ বা বিকর্ষণের উপর সংযোগ বা আকর্ষণের প্রাধান্য থাকে, ততক্ষণ দ্রুতগতিতে জন্ম ও বৃদ্ধি হইতে থাকে; আবার সংযোগ বা আকর্ষণের উপর বিয়োগ বা বিকর্ষণের প্রাবল্য আরম্ভ হইলে দ্রুত গতিতে হ্রাস ও নাশ সংঘটিত হইয়া থাকে। একের মৃত্যু, অপরের জন্ম, এবং একের জন্ম, অপরের মৃত্যু একই কারণে, একই অবস্থায় যুগপৎ হইয়া থাকে। বস্ত্রে অগ্নি সংযোগ হইলে, বস্ত্রের নাশের সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ ভস্মের উৎপত্তি হইতে থাকে।

বহিঃ প্রকৃতির সংঘর্ষে এবং অঙ্গসঞ্চালনাদি হেতু প্রতিনিয়ত আমাদের শরীর ক্ষয় হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনী শক্তি বাহ্য জগৎ হইতে আকর্ষণ করতঃ প্রতিনিয়ত সে ক্ষয় পূরণ করিয়া লইতেছে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই আমরা ক্ষয়ের ভিতর দিয়া চলিতেছি—প্রাথমিক অবয়ব কোন দিন চলিয়া গিয়াছে—আমাদের জীবনী

শক্তি অবিরত উপাদান সংগ্রহ পূর্ব্বক, ক্রমশঃ সেই প্রাথমিক অবয়বের সদৃশ করিয়া লইয়াছে ও লইতেছে। দন্ত, কেশ, নখ, ত্বক প্রভৃতি কতবার যে পুরাতন যাইয়া নূতন হইয়াছে, তাহা পরিবর্ত্তনের ধীরতা ও পূর্ব্বাপর সাদৃশ্য-রক্ষা হেতু আমরা সকল সময় বুঝিতে পারি না। অধিকন্তু, প্রতি রজনীতে সুষুপ্তির অবস্থায় আমরা এক প্রকার মৃত্যুর ক্রোড়ে শায়িত হইয়া থাকি বলা যাইতে পারে; কারণ তখন আমাদের সচেতন অবস্থার প্রায় সকল লক্ষণই তিরোহিত হইয়া থাকে। অতএব ধীর ব্যক্তিগণ মৃত্যুকে জীবনের একটী নিত্য নৈমিত্তিক অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার মাত্র জ্ঞান করিয়া, মৃত্যুভীতি পরিহার করিয়া থাকেন।

প্রাজ্ঞ মনীষিগণ মৃত্যুকে মঙ্গলময় গুরু স্বরূপ জ্ঞান করেন। কারণ মৃত্যু চিন্তা আমাদিগকে অমরত্বে পৌঁছিবার পথ দেখাইয়া দেয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব মরণকে ভুলিয়া জীবন তত্ত্ব না বুঝিয়া জীবনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, ততক্ষণ সে ক্রমশঃ কেবল ব্যর্থতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। মৃত্যুচিন্তা যাহার নাই,সে দেহও জাগতিক বস্তুবৈচিত্র্যকে স্থায়ী ও সত্য মনে করিয়া কেবলমাত্র অসতের সেবায় মিথ্যার আহরণে সতত রত থাকে। মৃত্যুচিন্তা-বিরহিত ব্যক্তির সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তেজঃ—সর্ব্ব প্রকার শক্তি, কল্য যাহার অভাব ঘটিবে, এইরূপ জিনিসের লাভ ও রক্ষণার্থই অপব্যয়িত হইয়া যায়। যে মরণকে ভাবে না, সে সারাজীবন কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থতাতেই মনোনিবেশ করে এবং অবশেষে তাহার পার্থিব অস্তিত্ব ভেল্কির ন্যায় মিথ্যা হইয়া যায়। কিন্তু মৃত্যু-চিন্তা যাহাদের মনে স্থান প্রাপ্ত হয়, সেই ভাগ্যবানদিগের বিবেক সম্যক উদ্বোধিত হয় ও তাঁহারা পরিণামদর্শী হইয়া থাকেন। মৃত্যুচিন্তা রূপ বিষাদ যোগের ফল স্বরূপ জীবনের সত্যতা উপলব্ধির জন্য ব্যাকুল প্রচেষ্টা দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ে যে আত্মজ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তাহাতে অমরত্বের ছবি উজ্জ্বল ও সুপ্রকট হইয়া থাকে।

আমি আহার বিহার করিতেছি—বুদ্ধি বিবেচনা বিচার পূর্ব্বক নানা কার্য্য করিতেছি—চিন্তা ভাবনা কল্পনা করিতেছি, জ্ঞানবলে প্রকৃতির গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন পূর্ব্বক আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়ের দ্বারা কত অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করাইতেছি এবং আমার হৃদয়ে অনন্ত আশা আকাঙ্ক্ষা স্নেহ মমতা ভক্তি ভালবাসা সতত উদ্বেলিত হইতেছে; কিন্তু অনন্ত কালের তুলনায় আমার পরমায়ুঃ অতিশয় অল্প, যে কোনও মুহূর্ত্তে আমার জীবনের শেষ হইতে পারে ও কতিপয় বৎসরের অধিক আমি বাঁচিবার আশা করিতে পারি না। এইরূপ চিন্তা মানুষের মনে বিষাদ-বিষ ঢালিয়া দেয় এবং তখন মানুষের সংসারে বিতৃষ্ণা ও ঔদাসীন্য জন্মে। অথচ জীবাত্মার স্বভাব আনন্দময় ও জীবাত্মার খাদ্য আনন্দ। সুতরাং মৃত্যুচিন্তা-জনিত বিষাদ ও বৈরাগ্য জন্মিলে, মনের শান্তি, সান্ত্বনা এবং আনন্দ লাভার্থ মানব জীবনের সত্যতার অনুসন্ধান করে এবং তজ্জন্য জীবন ও মরণ এতদুভয় সমস্যার সমাধান একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। জীবন ও মরণের তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেই মৃত্যুভীতি চিরতরে বিদূরিত হয় এবং মন প্রাণ অভয়াশ্বাস ও স্থিরানন্দে ভরপুর হইয়া যায়।

আমরা জগতে নানা বস্তুর ও ব্যক্তির জীবনের আবির্ভাব, কিয়ৎকাল স্থিতি ও তৎপরে অন্তর্দ্ধান নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমাদের ভেদবুদ্ধি ও নানাত্ববোধ বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ আমরা জীবনকে বুঝিতে পারি না। জীবন তত্ত্ব বোধের নিমিত্ত বিবর্ত্ত প্রণালীতে জীবনের আলোচনা করিলে আমরা সফলকাম হইয়া থাকি। অহংপূর্ণ জীব মাতৃগর্ভে অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বে জনকের দেহাভ্যন্তরে সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম একটী বিন্দুমাত্র ছিল। ঐ বিন্দু জনকের দেহে খাদ্যরূপে গৃহীত পাঞ্চভৌতিক উপাদানের সারাংশ এবং মাতৃগর্ভে অঙ্কুরিত হইবার পর হইতে ক্রমশঃ পাঞ্চভৌতিক উপাদান সংযোগে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়া পূর্ণাবয়ব জীবে পরিণত হয়। পাঞ্চভৌতিক উপাদান আবার এক হইতে অপর এইরূপ ক্রমে উৎপন্ন। এবম্প্রকার বিশ্লেষণ-পরম্পরা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই যে, গ্রহ, নক্ষত্র, জলচর, খেচর, ভূচর প্রাণিবৃন্দ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য জাগতিক বস্তু সমূহ একই উপাদানে গঠিত। পরম ব্যোম হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে অপ, অপ হইতে ক্ষিতি, ক্ষিতি হইতে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ হইতে প্রটোপ্লাজম্ বা জীবাণু এবং জীবাণু হইতে বিবিধ জলচর, খেচর ও ভূচর প্রভৃতি প্রাণিবৃন্দ উৎপন্ন হইয়াছে, সঙ্ক্ষেপতঃ বলা যাইতে পারে। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশবাদ উক্ত সিদ্ধান্তের পূর্ণ সমর্থন করে।

এই ত গেল উপাদানের একতার কথা। এখন আলোচ্য এই যে, জীবদেহে বিদ্যমান চৈতন্য উক্ত উপাদান হইতে স্বতন্ত্র, না উপাদান হইতে উদ্ভূত, অথবা উপাদান চৈতন্যেরই প্রকার বিশেষ। বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান বিজ্ঞানাচার্য্য পণ্ডিত জগদীশচন্দ্র বসু অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগে তথাকথিত জড়ে চৈতন্যের সাড়া প্রতিপন্ন ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের গোচরীভূত করিয়া স্বদেশে ও বিদেশে অমর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কতকগুলি চেতনাবিহীন মৌলিক জড় পরমাণু আছে এবং তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক সংযোগে চেতনার সাড়া-বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন যৌগিক জড় উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। মৌলিক পরমাণুতে চেতনা না থাকিলে যৌগিক পদার্থে চেতনার সঞ্চার হইতে পারে না, যখন একই উপাদান হইতে পূর্ব্বাপর ক্রমে বিশ্বের বৈচিত্র্যপূর্ণ বস্তু ও জীব জগৎ প্রকটিত হইয়াছে। মানবের উন্নত জ্ঞান,—বিবেক, কল্পনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রেম প্রভৃতির বিষয় ধীরভাবে চিন্তা করিলেও আমরা নিশ্চয় এ ধারণাকে মনে উদিত হইতেই দিব না যে, কতকগুলি চেতনাশূন্য উপাদানের কেবলমাত্র রাসায়নিক সংযোগে আমাদিগের সতত উপলব্ধ জীবাত্মা, ব্যক্তিত্ব বা আমিত্বের উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং চৈতন্য উপাদান সমবায়ের রাসায়নিক ফল না হইলে, এবং মূল পরমাণু বা একমাত্র আদ্যোপাদান সচেতন হইলে, সূক্ষ্ম চৈতন্যের আবরক উপাদান বা তথা-কথিত জড় চৈতন্যেরই স্থূলরূপ বিশেষ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ইহা যখন বিজ্ঞান-প্রতিপাদিত নিঃসন্দেহ সত্য যে, একই পদার্থ কঠিন, তরল ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের বোধাতীত বায়বীয় অবস্থায় থাকিতে পারে, তাহা হইলে কেন বিশ্বাস করিব না যে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত নিরাকার চৈতন্য স্থূলরূপ গ্রহণ করে এবং স্থূলরূপী উপাদান

ইন্দ্রিয়াতীত নিরাকার চৈতন্যেরই অবস্থা বিশেষ।

হিন্দুশাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্বের যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, অনাদি অনন্ত নিরাকার নির্গুণ সচ্চিদানন্দ "একঃ"—আপনাকে উপভোগ বা লীলা করিবার আগন্তুক সঙ্কল্প বা ইচ্ছা বশতঃ আপনাকে বহু রূপে অনন্ত আকারে অনন্ত প্রকারে প্রকটিত করায় এই ভেদ-বৈচিত্র্যপূর্ণ নানাত্বের বিশ্ব আবির্ভূত হইয়াছে, এবং যতকাল সেই একের সেই সঙ্কল্প পূর্ণ বা তৃপ্ত না হইবে, ততকাল ভেদদৃষ্টিতে প্রতীয়মান পৃথক পৃথক বস্তু ব্যক্তির খণ্ড প্রলয় হইলেও মহাপ্রলয় বা নামরূপী বিশ্বের এক-কালীন তিরোধান হইবে না ও বিশ্ব-চক্র খণ্ড খণ্ড সৃষ্টি-স্থিতি-লয় রূপ পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বরাবর চলিতে থাকিবে। বিশ্বের যাবতীয় বস্তু ব্যক্তি সেই একমাত্র পূর্ণ চৈতন্যেরই বিশেষ বিশেষ ভাব রূপে প্রকাশ—বিভিন্ন পরিবর্ত্তিত ক্ষণিক অবস্থা। আপনার বহু স্বরূপের পরস্পরের নিকট প্রকাশের ও পরস্পরকে উপভোগ করিবার দ্বার বা যন্ত্র রূপেই চৈতন্যের স্থূলরূপী দেহী বা সাবয়ব অবস্থা। এবং একই অবয়ব বিভিন্ন ক্রিয়ার নিমিত্ত চক্ষু কর্ণাদি বিভিন্ন দ্বার বা যন্ত্ররূপে পৃথক পৃথক অংশে পরিণত, বিভক্ত ও গ্রথিত হইয়াছে। চৈতন্যের ঈদৃশ মূর্ত্তাবস্থা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল এবং ঈদৃশ মূর্ত্তাবস্থায় প্রতি মুহূর্ত্তের পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এক নির্দ্দিষ্ট নিরবচ্ছিন্ন ধারায় সদৃশ ভাবে চৈতন্যের যে প্রকাশ, তাহাই অভিব্যক্তির ক্রমভেদে বস্তুর বা ব্যক্তির জীবন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ নামক প্রকাশমান চৈতন্যের ত্রিবিধ প্রকৃতি বা গুণের অনুপাত বা তারতম্যানুসারে কেবল মাত্র স্থূলরূপী স্থূলধর্ম্মী জড়াখ্য বস্তু,—অস্ফুটোন্মুখ-চৈতন্য উদ্ভিদ, স্ফুট-চৈতন্য কীটাদি ইতর প্রাণী, এবং বিকশিত-চৈতন্য ব্যক্তি, ইহাদিগের চিন্ময়াবৃত উক্তরূপ পরিমিত পরিণামী জাগতিক জীবন।

এবম্ভূত ভাবে একমাত্র চৈতন্যের বিকার রূপে প্রকটিত নিখিল অখিলের বস্তু ও জীবন সমূহ পরস্পরের প্রতি যুগপৎ একটা অনুকূল ও একটা প্রতিকূল ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে, পরস্পরের মধ্যে যে সাদৃশ্য বা সামান্যতা-টুকু আছে, তদ্দ্বারা—পরস্পরের পোষণাদি আনুকূল্য এবং যে পার্থক্য বা বৈসাদৃশ্যটুকু আছে, তদ্ধেতু আঘাতাদি প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবন্ধকাদি দ্বারা পরস্পরের প্রতিকূলতা করিয়া থাকে। এই যুগপৎ অনুকূল ও প্রতিকূল ক্রিয়ার ফলে বস্তু ও জীব-বৈচিত্র্যের উৎপত্তি বা আবির্ভাব, পরিবর্দ্ধন বা বিকাশ এবং নাশ বা লয় সংঘটিত হইতেছে। পরিণামী পরিমিত দেহ-যন্ত্র যে পর্য্যন্ত বাহিরের আঘাত প্রতিহত ও সহ্য করিতে সমর্থ হইয়া কার্য্যোপযোগী থাকে, সেই পর্য্যন্ত নামরূপী চৈতন্য নাম রূপ বজায় রাখিয়া প্রকট বা সপ্রকাশ থাকেন; কিন্তু বাহিরের ঘাত প্রতিঘাতে উক্ত দেহ-যন্ত্র চৈতন্যের আত্মপ্রকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী ও অকর্ম্মণ্য হইলেই চৈতন্য অন্তর্লীন হইয়া অপ্রকট হয়েন এবং বাহিরের অন্যান্য নামরূপী সত্তার ঘাত প্রতিঘাতে উক্ত অপ্রকট চৈতন্য দেহখণ্ড ক্রমশঃ পাঞ্চভৌতিক উপাদানে বিশ্লিষ্ট ও মিলিত হইয়া থাকে ও তদ্রূপে চৈতন্যের বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষ রূপে প্রতীয়মান নাম রূপের লোপ ঘটে।

জীবনে সর্ব্ব-সংস্কার-বর্জ্জিত ভাবে শুদ্ধ চৈতন্যের পূর্ণ বিকাশ হইলে, উক্তরূপে দেহ ও নাম রূপ লোপের সহিত মায়িক জীবাত্মার নির্ব্বাণ ঘটে, বা জীব জন্ম-জরা-মরণের অতীত

নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। আর, জীবনে পূর্ণতালাভ না ঘটিলে ও সংস্কারাদি বর্ত্তমান থাকিলে, জীবনান্তে পূর্ব্বোক্তরূপে বিশ্লিষ্ট সুপ্ত-চৈতন্য পূর্ব্ব-জীবনের সংস্কারগর্ভ পাঞ্চভৌতিক উপাদান-পরমাণু বিশ্বচক্রে নানা বস্তু ও জীবের মধ্য দিয়া পরিভ্রমণ করিতে করিতে সমধর্ম্মী বা সমগুণী অনুকূল জীব দেহের আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্ব জীবনের অনুরূপ নামরূপ বিশিষ্ট হইয়া জন্মান্তর গ্রহণ করে, এবং নির্ব্বাণ মুক্তি না ঘটা পর্য্যন্ত ঐরূপে বারম্বার জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাই সংক্ষেপতঃ জীবন ও মরণের তত্ত্ব।

মৃত্যু গুরুর প্রসাদে প্রবুদ্ধ সুধী ব্যক্তি উল্লিখিত জীবন ও মরণের তত্ত্ব সম্যক বোধ পূর্ব্বক বুঝিতে পারেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাগতিক জীবন ও মরণ একই প্রবহমান অনন্ত জীবনের দ্বিবিধরূপ বা প্রকারবিশেষ; এবং ভেদ-দর্শন-শীল মায়াবৃত জীবাত্মা বা ব্যক্তিত্বাভিমানীর বিচারে ভেল্কির ন্যায় নিমেষে নিমেষে পরিবর্ত্তনশীল, নশ্বর ও অনিত্য বলিয়া প্রতীয়মান জাগতিক নানা বস্তু ব্যক্তি ঐরূপ স্বতন্ত্র সত্ত্বা হিসাবে মিথ্যা হইলেও, অনন্ত প্রাণ-প্রবাহরূপে লীলায়মান, বিশ্বের পরম নিধান, লীলাধৃত বহুরূপ, একমাত্র সত্য সদ্বস্তু নিত্য-স্থির সচ্চিদানন্দের এক একটী ক্ষণিক রূপ বা নামরূপী প্রকাশ বিশেষ ও তৎ কারণে সেই একমাত্র "সৎ"য়ের সহিত অভিন্ন নিত্য-সত্য। ইত্যাকার বোধ জন্মিলে ভ্রান্তিজাত মৃত্যুভীতি ও তৎ-সম্পর্কীয় সকল হা হুতাশ শোক দুঃখ দূরে পলায়ন করে এবং মন প্রাণ অভয়াশ্বাসে সতেজ ও প্রফুল্ল হইয়া "অনোরণীয়ান মহতো মহীয়ান্" আত্মার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতঃ শাশ্বত সুখ ও শান্তি লাভ করিয়া থাকে; তখন মানব নাম-রূপী জীবাত্মার পরিণামী দেহের মৃত্যু পরিণামকে ভীষণং ভীষণানাং মহানর্থের পরিবর্ত্তে পরম-মঙ্গলরূপে উপলব্ধি করিয়া হৃষ্ট হইয়া থাকে। মৃত্যু পরিণাম নিত্য স্বরূপ হইতে নামরূপী অবতারে ও নামরূপী অবতার হইতে নিত্য স্বরূপে গমনাগমনের সেতু স্বরূপ। পৃথক পৃথক সত্ত্বারূপে প্রতীয়মান বিশ্বসৃষ্টি-বৈচিত্র্যের উৎপত্তি ও স্থিতি মৃত্যু পরিণামই সম্ভব করিয়াছে। একমাত্র নিরাকার নির্ব্বিকার অনন্ত সৎ অব্যক্তাবস্থা হইতে অভিব্যক্তির ক্রমানুসারে বিচিত্র বহু রূপ ধারণ পূর্ব্বক বিরাট বিশ্বে প্রকটিত ও লীলায়মান;—আবার অনন্ত মৃত্যু পরিণামের মধ্য দিয়া নিরাকার অব্যক্তে পুনর্লীন হইতেছেন। মৃত্যু পরিণামই এই যুগপৎ অব্যক্ত ও ব্যক্ত, নিরাকার ও সাকার, নির্গুণ ও সগুণ, অনন্ত ও সান্ত এবং এক ও বহু ইত্যাকার দ্বন্দ্ব বা ভাব-বৈপরীত্যের সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছে। মৃত্যু পরিণাম ব্যতিরেকে নির্ব্বিকার নিরাকার অনন্ত এক হইতে বৈচিত্র্য-পূর্ণ বিশ্বসৃষ্টি আদৌ সম্ভব হইত না। মৃত্যু পরিণাম বিশ্ব-লীলার মূল ভিত্তি মৃত্যু পরিণামের উপরই এই প্রপঞ্চময় বিরাট বিশ্ব দণ্ডায়মান। সুতরাং ব্যক্তিত্বাভিমানী আমাদের অতি প্রিয় অশেষ ভাবময় রস মাধুর্য্যপূর্ণ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিশিষ্ট জীব-জীবনের জন্য আমরা মৃত্যুর নিকট ঋণী। মৃত্যু-বন্ধুর সহায়তায় জীবাত্মা জন্ম জন্মান্তরের ভিতর দিয়া নব যৌবন লাভ পূর্ব্বক নব নব স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ উপভোগ এবং নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতঃ পূর্ণতেজে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয় ও পরিশেষে স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়।

অতএব, যতদিন দ্বৈতভাব থাকে, অর্থাৎ আত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ-জ্ঞান চলিয়া না

যায়, ততদিন পর্য্যন্ত অদ্বৈত-তত্ত্বের আভাস-প্রাপ্ত জ্ঞানীর নিকট মৃত্যু মঙ্গলময় বন্ধু; এবং অদ্বৈত-তত্ত্ব-নিধিতে নিমজ্জমান আত্ম-বিস্মৃত যোগীর নিকট মৃত্যু জীবনৈশ্বর্য্যের প্রকাশ বিশেষ—জীবনের সহিত অভিন্ন, এক।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার।

স্বর্গীয় কবি অক্ষয়কুমার বড়াল।

কবি,
সে দিন না কল্পনার নিভৃত নিলয়ে
বসিয়ে পাঠালে "এষা"—সেফালিকামালা,
পর-পার-নিবাসিনী প্রিয়তমা তরে,
হায় তৃপ্তিহীনা নারী, তবু নিয়ে গেলা,
তোমায় আহ্বানি আজ আপনার কাছে!
"কনক অঞ্জলি" লয়ে দাঁড়াবেনা আর,
হে সাধক, মুগ্ধচিতে মায়ের সম্মুখে
ছড়ায়ে অমল জ্যোতি "প্রদীপ"-শিখার?
হে সৌন্দর্য্য-উপাসক, সোণালী শরত
বর্ষে বর্ষে যুগে যুগে খুঁজিবে তোমায়!
বসন্ত, কোকিল্ কণ্ঠে তোমার বিহনে
কাঁদিয়া মরিবে তার মর্ম্ম বেদনায়!
দগ্ধ শ্মশান ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরি
প্রাবৃটে ফেলিবে অশ্রু প্রকৃতি সুন্দরী!

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

চাঁদসীর চিকিৎসা। (৩)

যন্ত্র-বিবরণ।

যন্ত্রই শরীর হইতে শৈল্য বাহির করার একমাত্র উপায়। অতএব শরীর হইতে শৈল্য বাহির করণ মানসে যাহা ব্যবহৃত হয়, তাহাকেই যন্ত্র বলে। এই জন্য হস্তও যন্ত্র মধ্যে পরিগণিত; কেন না, হস্ত ভিন্ন কোন যন্ত্রই ব্যবহার করা যায় না। যন্ত্র ছয় প্রকার। যথা সস্তিক, দংশন, তাল, নাড়ী, সলাকা ও উপযন্ত্র। তন্মধ্যে সস্তিক যন্ত্র চব্বিশ প্রকার অষ্টাদশ অঙ্গুলী পরিমিত দীর্ঘ। এবং সিংহ,ব্যাঘ্র, কুকুর, ভল্লুক,তরক্ষু, মার্জ্জার, শৃগাল, হরিণ, এর্ব্বারুক, কাক, কঙ্ক, কুরক, নীলকণ্ঠ, শীকারীপক্ষী, পেচক, চীল, বাজ, গৃধিনি,ক্রৌঞ্চ, ভৃঙ্গরাজ,গৃধ্র ও নন্দিমুখ, এই সকল পশু পক্ষীদের মুখের ন্যায় আকার এবং মধ্যস্থলের খীল মুসর কলাইয়ের ন্যায়ও হয়। গোড়ালা গোল, অথবা আকুরসির ন্যায়। শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট আগন্তুক শল্য অথবা অস্থিময় শল্যাদি বাহির করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দংশন যন্ত্র (শোন) দুই প্রকার, স্থূল ও সূক্ষ্ম অগ্র বিশিষ্ট। দংশন যন্ত্র মুখে দাঁত থাকে, মাংস অথবা শীরা মধ্যস্থ শল্য বাহির করিতে এবং কর্ত্তিত বা ছিন্ন রক্তবাহী শীরা বন্ধন করিতে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরিমাণ ষোড়শ অঙ্গুলী তালযন্ত্র দ্বাদশ অঙ্গুলী পরিমিত দীর্ঘ মুখ, মৎস্য তালুর ন্যায়। কর্ণ নাসিকা ও নাড়ী মধ্যস্থ শৈল্য বাহির করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নাড়ীযন্ত্র—অনেক প্রকার এবং অনেক কার্য্যে প্রয়োজন হয়। ইহার এক দিকে

মুখ হইয়া থাকে, শিরা ধমনি বা কোন দ্বার মধ্যে প্রবিষ্ট শৈল্য বাহির করিতে অথবা রোগ পরীক্ষা বা কোন পদার্থ চুষিয়া বাহির করন জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রয়োজন ও সুবিধা মতন ইহার দৈর্ঘ্যতা ও বিস্তৃতি হইয়া থাকে।

শলাকাযন্ত্র—এই যন্ত্র নানা প্রকার এবং অনেক বিষয়ে প্রয়োজন। ধনের তারতম্য অনুসারে ইহার আয়তনের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে দুই প্রকার শলার মুখ কেঁচোর মতন, দুই প্রকার সরের পাখার মতন, দুই প্রকার সাপের ফণা সদৃশ এবং দুই প্রকারের মুখ বড়শির মতন। অনুসন্ধান করা, ঔষধাদি বিন্যস্ত করা এবং মাংস বা অস্থি মধ্যে কোন পদার্থ চালনা করা বা শরীর হইতে কোন পদার্থ বাহির করাই ইহার কার্য্য। এবং ব্রণ পরীক্ষা করণ জন্য ছয় প্রকার শলার মাথায় তুলা জড়ানো থাকে। ব্রণ স্থানে ক্ষার ও ঔষধ প্রয়োগ করার জন্য হাতার অথবা খানার ন্যায় মুখ বিশিষ্ট তিন প্রকার শলাকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তিন প্রকার শলাকা জাম ফলের ন্যায় এবং তিন প্রকার শলাকার মুখ আঁকুরশীর মতন। এই ছয় প্রকার শলাকা ব্রণ দগ্ধ করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক প্রকার শলাকার মুখ কুলের আঁটির অর্দ্ধ খণ্ডের মতন, সেই মুখের অগ্রভাগ থালের মতন, কিন্তু তাহার দুই দিকে ধার থাকে, নাকের ছিদ্র মধ্যে আব অথবা পিনাক হইলে কাটিয়া বাহির করার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক প্রকার শলাকা মাস কলাই সদৃশ স্থূল এবং তাহার দুই দিক পুষ্পের মুকুলের মতন। এই শলাকা কেবল চক্ষে অঞ্জন দিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এক প্রকার শলাকা মালতী পুষ্পের বৃন্তের ন্যায় দীর্ঘাকৃতি, তাহা কেবল প্রস্রাব দ্বার পরীক্ষার কারণ জন্য ব্যবহৃত হয়।

উপযন্ত্র—রজ্জু, বেনিকা, পাট, চর্ম্ম, বৃক্ষের ছাল, লতা, বস্ত্র, অষ্ঠিনা (নুড়ী পাথর) মুদ্গর, দন্ত, পদতল, অঙ্গুলী, জিহ্বা, নখ, চুল, অশ্বের লাল, বৃক্ষের শাখা, ক্ষার, অগ্নি, ঔষধাদি উপযন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সকল যন্ত্রেরই আকার পরিমিত হইবে, গঠন দৃঢ় ও মনোরম হইবে এবং এ প্রকার সুগ্রাহী হইবে যে, যে কোন পদার্থকে দৃঢ়রূপে ধরিতে পারা যায়। এই সকল যন্ত্রের কার্য্য ২৪ প্রকার, ছেদন, পূরণ, বন্ধন, একত্রিকরণ, সংস্থাপন, চালন, বিবর্ত্তন, বহিঃক্ষরণ, বিদারণ, নাড়ন, নিঃসারণ, পরিষ্কার করণ, আহরণ, আক্রমণ, উন্নতকরণ, ভঞ্জন, উন্নয়ন, চুষণ, অনুসন্ধানকরণ, সরলকরণ, প্রক্ষালন, দগ্ধকরণ ও মার্জ্জন। শারীরিক শাল্য দৃশ্যভাবে বদ্ধ থাকিলে সিংহ মুখ, এবং অদৃশ্যভাবে থাকিলে কঙ্কমুখ যন্ত্র দ্বারা বাহির করিতে সুবিধাজনক। সকল যন্ত্র অপেক্ষা কঙ্কমুখ যন্ত্রই শ্রেষ্ঠ, কেন না শরীরে নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ করাইয়া এদিক ওদিক ঘুরানো যায়। এবং শৈল্যকে দৃঢ়রূপে ধরিতে পারা যায়। শরীরে শৈল্য নানাপ্রকারে অবস্থান করে, অতএব বুদ্ধিমান বৈদ্য স্থান ও অবস্থাভেদে বুদ্ধি অনুসারে যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইবেন। অতি স্থূল অতি হ্রস্ব গ্রহণের অযোগ্য, বক্র, শিথিল, উন্নত, মৃদু, ক্ষীণ বিশিষ্ট ইত্যাদি দোষ যাহাতে যন্ত্রে না ঘটে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র দাস।

পৃথ্বীরাজ। (২)

কবি, পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তাকে আদর্শ রাজা ও রাণীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। পৃথ্বীরাজের 'বহুপত্নীকতা বিনা' অন্য কোন দোষ নাই। আর সংযুক্তার কার্য্যের মধ্যে তাঁর স্বামীর চিতারোহণ ছাড়া আর কিছু অসমর্থনীয় মনে করিবার নাই। কবি সতীদাহের বিরোধী; কেন না,

"আত্মহত্যা মহাপাপ; সে পাপ আচারে
দিতে অনুমতি চিত্ত হয় সঙ্কুচিত।" (৩৪১ পৃঃ)

অন্ততঃ পৃথ্বীরাজ সম্বন্ধে এই চিত্রকে তিনি কবি-কল্পনা মনে করেন না। কবি, কাব্যের নায়ককে ঐতিহাসিক পুরুষ বলিয়াই বিশ্বাস করেন। মুসলমানের কাছে হিন্দুর পরাজয় জাতীয় অধঃপতনের ফল। পৃথ্বীরাজ নির্দ্দোষ হইয়াও সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে উৎসৃষ্ট হইয়াছেন। মানুষ কেবল নিজের কর্ম্মের ফলই ভোগ করে না, পার্শ্ববর্ত্তিগণের কর্ম্মের বোঝাও তাহাকে বহন করিতে হয়। এইরূপ বহু বলির প্রয়োজন, তবে তো দেশ উঠিবে।

"গুণে জ্ঞানে ভারতের শ্রেষ্ঠ নর নারী
যুগে যুগে বলি রূপে দিবে শির পাতি
তবে হবে প্রায়শ্চিত্ত।" (২৮৫ পৃঃ)

এখানে খ্রীষ্টীয় প্রায়শ্চিত্তবাদের গন্ধ রহিয়াছে, —তাহা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিব না, কেন না, তাহার সঙ্গে আসল বিষয়ের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। কবির কথা এই যে, জাতীয় অধঃপতনের ফল পরাজয়। কিন্তু কেহ যদি ইতিহাস উদ্ঘাটন করিয়া দেখায় যে, পরাজয়ে পৃথ্বীরাজের ব্যক্তিগত দোষও অনেকখানি ছিল, তা হলে কি কবির সকল শ্রমই পণ্ড হইয়া যাইবে? আমাদের সে আশঙ্কা নাই। বরং যদি একথা সত্য হয় যে, জয়চাঁদ কণোজরাজের ন্যায় পৃথ্বীরাজ, যাঁহার হস্তে দেশের জীবন ন্যস্ত ছিল,—তিনিও এই সঙ্কটকালে ব্যক্তিগত ঈর্ষা, দ্বেষ, সুখ, স্বার্থের অতীত হইয়া দেশের সেবা করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে কবির কথাই প্রমাণিত হইবে যে, দেশের অধঃপতন শেষ সীমায় পৌছিয়াছিল, তাই মুসলমানের আগমন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল। কবি বলিয়াছেন—

"ভৌতিক শকতি নহে নিয়ন্ত্রী বিশ্বের
রহি অন্তরালে তার শক্তি আধ্যাত্মিকী
শাসন, পালন বিশ্ব করেন সতত।
কদাচারে পাপাচারে সঙ্কুচিত যথা
বিধিরোধ, নিঃসন্দেহ, জানিও তথায়
নিষ্ফল পুরুষকার, দৈব বলবান।" (২৮৩পৃঃ)

অর্থাৎ কদাচার, অনাচারে দেশ যখন অধঃপতিত, তখন পুরুষকার তাহাকে উঠাইতে পারে না, তাই পৃথ্বীরাজও পারেন নাই। উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়া কেহ মনে করিতে পারেন যে, এই অদৃষ্টবাদের দেশে, যারা—

"না জানে পুরুষকার, দৈব দৈব করি'
নয়ন থাকিতে অন্ধ; হুঁছুটে হাঁচিতে,
কাক শৃগালের রবে গণে পরমাদে।" (২৮পৃঃ)

কবি বুঝি আবার দৈবের দোহাই দিয়া পুরুষকারকে চাপা দিবার কথাই বলিতেছেন। পৃথ্বীরাজের মত পুরুষসিংহই যখন কিছু করিতে পারেন নাই, তখন আমরা আর কি করিব? কবির ইচ্ছা যে ইহার বিপরীত, আমরা তাহাই বুঝিয়াছি। তিনি প্রায়শ্চিত্তের

জন্যই দেশকে আহ্বান করিয়াছেন। হাত, পা গুটাইতে বলেন নাই। পুরুষকার ছাড়া কি দেশের অনাচার দুরাচার দূর হইবে? ভৌতিক শক্তি সকলই বিশ্বের নিয়ামক নয়, তা সত্য, কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা যে এই সকল শক্তির মধ্য দিয়াই আপনার নিয়ম প্রকাশিত করিয়া জগৎকে মঙ্গলের পথে লইয়া চলিয়াছেন, 'শক্তি আধ্যাত্মিকী' এই ভৌতিক শক্তির মধ্য দিয়াই বিশ্ব শাসন পালন করিতেছেন—কোন দূর স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ হইতে করিতেছেন না—ইহা আরও সত্য। দৈবের সঙ্গে পুরুষকারের, ভৌমিক শক্তির সঙ্গে আধ্যাত্মিক শক্তির কোন অনতিক্রমণীয় পার্থক্য নাই। যে ব্যক্তি বা জাতি ভৌতিক শক্তিকে ভুলিয়া তন্ত্র মন্ত্রের সাহায্যে দৈবশক্তির সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখনই তাহার পতন হইয়াছে। জাতীয় জীবনে কোন পাপ ঢুকিয়া যদি যুদ্ধজয়ের বাধা উৎপন্ন করে, তবে তাহা স্বাভাবিক নিয়মেই করে—যুদ্ধ জয়ে যে শক্তি চাই, উক্ত পাপ তাহার অন্তরায় হয়। সুতরাং দৈব ও পুরুষকারে কোন বিরোধ নাই। যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় না—অস্ত্রে শান্ দিতে হয়। যুদ্ধ জয়ের জন্য যে শক্তির আরাধনা করিতে হয়, তাহার পূজা পদ্ধতি—

"কেহ কাটে হোমকুণ্ড, নৈবেদ্য সাজায় কেহ,
কেহ জবা মাখায় চন্দনে।
ঘটসংস্থাপন করি' দক্ষিণ কালিকামূর্ত্তি,
সিন্দুরে অঙ্কিত করি তায়।
করে ছাগ বলিদান, কেহ করে মন্ত্রপাঠ,
নাচে কেহ, কোন জন গায়।" (৩০৯ পৃঃ)

ইহা নয়, যেরূপ যুদ্ধের বিলম্ব দেখিয়া, পৃথ্বীরাজের সৈন্যগণ তরায়ণে করিয়াছিল, কিন্তু অস্ত্রে শানই সে পূজার উপচার—

"শৃঙ্খলায়, দৃঢ়তায় ধৈর্য্যে আয়োজনে
শ্রেষ্ঠ যারা, জয়লাভ করে তারা রণে।"
(৬৯ পৃঃ)

কোন অনৈসর্গিক দৈববলের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না, ইহাই কবির মনের ভাব।

"হিন্দুর দুর্গতি-মূলে দুর্ম্মতি হিন্দুর;
প্রায়শ্চিত্ত-অস্তে দুঃখ, দৈন্য হ'বে দূর।"

ইহাই কবির প্রথম কথা, গ্রন্থাভাসে কবি তাহা বলিয়াছেন—ইহাই শেষ কথা, এই কথা বলিয়াই কবি কাব্য শেষ করিয়াছেন। এই দুর্ম্মতি যে সব আকারে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি তিনি দৃষ্টান্তে, চরিত্রে ও উপদেশে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন—তাঁহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, ভারতবাসী তাহা বুঝিয়া জাতীয় উন্নতির প্রয়াস পায়।

১। জাতীয় অধঃপতনের কারণগুলির মধ্যে নারীজাতির অবনতি একটী প্রধান। বীরেরা, জাতিই হউন আর ব্যক্তিই হউন—নারীর সম্মান করিতে জানেন। কাপুরুষের হাতেই নারীর উৎপীড়ন। পৃথ্বীরাজ ও জয়চন্দ্রের চরিত্রে কবি ইহা পাথরে খোদাই করা মূর্ত্তির ন্যায় জাজ্বল্যমান করিয়া দেখাইয়াছেন। দিল্লীপতি দিগ্বিজয়ী মহাবীর পৃথ্বীরাজ যাত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"কৃতার্থ, কৃতার্থ আমি তোমারে লভিয়া
প্রিয়ে।" (১২০ পৃঃ)

ভাবা ও ভাবে এই সর্গটী গ্রন্থের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশের অন্যতম।

"শত দিল্লী এক দিকে, সত্য কহি,
প্রাণেশ্বরি!
অন্য দিকে তুমি।" (১২৪ পৃঃ)

চিত্রের অন্য দিকে জয়চন্দ্র—যিনি কাপুরুষের

মত প্রকাশ্যে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গোপনে ষড়যন্ত্র লিপ্ত হইয়াছেন। যে সমস্ত বীরেরা 'বাইরে হেরে' এসে, ঘরে স্ত্রীকে ধরে' মারে, জয়চন্দ্র তাদেরই একজন। চৌহানের হস্তে অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিয়া আসিয়া, জয়চন্দ্র ঝাল ঝাড়িতেছেন, কন্যা ও স্ত্রীর উপর। যে কন্যা পৃথ্বীরাজের মত স্বামীর ভালবাসা লাভ করিয়াও পিতৃ-দুঃখে বিষণ্ণ, সেই কন্যার সম্বন্ধে জয়চন্দ্র বলিতেছেন —

"বন্দিনী করিয়া যদি পারি আনিবারে,
বেত্রাঘাতে পিতৃভক্তি শিখাইব তারে।"
(২৫৩ পৃঃ)

কন্যার প্রতি স্বামীর এই অকারণ রোষ দেখিয়া রাণী রাজাকে বুঝাইতে গেলেন, ফল স্বরূপ উত্তর পাইলেন,—

"নারী হয়ে এত স্পর্দ্ধা! মোরে তুমি আজ
এলে উপদেশ দিতে? আমি নররাজ।
... ...
কিন্তু রাজ্ঞি! ত্যক্ত যদি কর বার বার,
পাঠাইব পিত্রালয়ে আনিব না আর।"
(২৫৫ পৃঃ)

'পিত্রালয়ে' কথাটা বড়ই সংস্কৃত হইয়াছে; 'পাঠাব বাপের বাড়ী' বলিলেই উক্তিটীব বাঙ্গালিত্ব ষোলকলায় পূর্ণ হইত। কবি যদি আর একটু যোগ করিয়া দিতেন, 'বিয়া করিব আবার', তা হলে তো সোণায় সোহাগা। স্বার্থপর পুরুষ নারীর উৎপীড়নের জন্য কত সব অস্ত্র শস্ত্র গড়িয়াছে, তার কিছু নমুনাও পাওয়া যাইত। যাহা হউক, কবি নারীজাতি সম্বন্ধে অতি উদার মত প্রচার করিয়াছেন। নারীর প্রতি অত্যাচার অবিচারগুলি দূর হইলেই হইল না, স্ত্রী পুরুষের সর্ব্বাঙ্গীন সাহচর্য্য ছাড়া যে জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়। জাতির অর্দ্ধেক মানবকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া জাতীয়তার সকল চেষ্টাই যে নিষ্ফল, কবি পুনঃ পুনঃ সে কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। নারীর প্রতি যে এ দেশে অন্যায় অবিচার আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না, "শক্তি-স্বরূপিণী নারী হেথা উপেক্ষিতা" (২৮২ পৃঃ)। কবি বলিতেছেন,—

"সংসার আশ্রমে নারী প্রত্যক্ষ দেবতা।
সে নারীরে মোহবশে করি হেয় জ্ঞান
পাপস্পৃষ্ট হইতেছে ভারত সন্তান।"
(২৫৫ পৃঃ)

পুনশ্চ,

"দেখি শুনি তবু মূঢ় ভারত-সন্তান
অকারণ রমণীর করে অপমান।" (২৫৭ পৃঃ)

সকল কার্য্যে নারীকে পুরুষের সহকর্ম্মিণী রূপে তাহার পাশে দাঁড়াইতে হইবে,—

"সে সংসার সে সমাজ স্বর্গ সম হয়,
ধর্ম্মে, কর্ম্মে নর, নারী মিলি যথা রয়।
উদাসীনা যথা নারী পুরুষের কাজে,
কুশল কল্যাণ তথা কভু না বিরাজে।"
(১৭৫ পৃঃ)

অনেক লোক আছেন, অন্য সকল বিষয়ে উদার মতাবলম্বী হইয়াও নারীজাতি বিষয়ক অনুদারতা যেন আপনার অজ্ঞাতসারেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। মানুষের মনের উপর আবেষ্টনের এতই প্রভাব। তাঁহারা ভাবেন, রান্ধুনী বামুন বা ঝি চাকরাণীর কাজ ছাড়া আর কিছুতে হাত দিলেই নারী নারীত্ব হারাইবে, সমাজ-স্থিতি ভঙ্গ হইবে। তবে আমাদের ভরসা এই যে, দেশ এ বিষয়ে বেশ অগ্রসর হইতেছে। ষষ্ঠ কন্‌গ্রেসে এক মহিলা সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন বলিয়া কত আপত্তি উঠিয়াছিল। এখন ত মহিলা সভাপতিও

করিলেন। বিগত স্পেশাল অধিবেশনে এক নারীর প্রস্তাবে Equal rights of franchise for women' স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে যদি সংস্কারকেরা আনন্দ করেন, তবে কাহারও ঈর্ষা করিবার কিছুই নাই। সমাজের সর্ব্বপ্রধান মারাত্মক ব্যাধি এই যে, নারী আপনার এই হীনতাকেই স্বভাবসিদ্ধ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ও সন্তুষ্টচিত্তে বাস করিতেছেন। কবি নারীকে এই ঔদাস্য ও আলস্য পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে বলিয়াছেন,—

"অবলা রমণী বলি না ভাবিও মনে
মহাশক্তিরূপা নারী রাখিও স্মরণে।"

(১৭৫ পৃঃ)

প্রয়োজন হইলে নারীকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্যও প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে—'ডরিবে কি যুদ্ধে যেতে, হলে প্রয়োজন' (১৭৪ পৃঃ) —এই উপদেশ দিয়া কবি সর্ব্বপ্রধান সমাজব্যাধির উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

ভারত-শাসন-সংস্কার এবং আমাদের কর্ত্তব্য।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারত-শাসন-ভার গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, জাতি বর্ণ নির্বিশেষে ভারতরাজ্য শাসন করিবেন। তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই ৬০ বৎসর ভারতবর্ষের শাসন হয় নাই, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ভারতবাসী ইংরেজেরা এই ৬০ বৎসর আইন-কানুন করিয়া দেশীয় লোকদিগকে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়কার কোন কোন অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, এবং স্বসম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগকে অনেক অধিকার দিয়াছেন। দেশী লোকের উপর ফৌজদারী বিচার ইংরেজ ও দেশী উভয় লোক করিতে পারিবেন, কিন্তু ইংরেজের বিচার ইংরেজ ছাড়া কেহ করিতে পারিবে না। দেশী লোককে প্রাণ রক্ষার্থ ও শস্য রক্ষার্থ ও আততায়ী হইতে আত্মরক্ষার্থ বন্দুকাদি অস্ত্রের জন্য লাইসেন্স্ লইতে হইবে; কিন্তু দেশীলোকের ভুক্তি-ভোগী ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীকেও তাহা করিতে হইবে না। এতদ্ভিন্ন উচ্চপদের চাকুরীগুলি ইংরেজের প্রায় একচেটিয়া হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সকল বিচার করিয়া ইংলণ্ডের মন্ত্রীবর্গের ধারণা জন্মিয়াছে যে, মহারাজ্ঞীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে কার্য্য হয় নাই; এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় এক ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতবর্ষে responsible Self-Government প্রচলন অথবা ভারতশাসনের ভার ভারতবাসীদের উপর অর্পণ করিবেন। কিন্তু তাহা হঠাৎ একবারে—একদিনে—না দিয়া অল্প অল্প করিয়া দিবেন। ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি (Viceroy) এবং ভারতবর্ষের রাজমন্ত্রী (Secretary of State for India) যে প্রণালী অনুসারে এই স্বরাজ বা দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে বলিয়া মনে করেন, তাহার এক পুস্তিকা এক বৎসর হইল প্রচার করেন। তাঁহার

নাম Report on Indian Constitutional Reforms. অনেকেই এই পুস্তক পাঠ করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রদেশে নূতন করিয়া ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইবে এবং এই সকল ব্যবস্থাপক সভাকে নূতন করিয়া স্বপ্রদেশ শাসন সম্বন্ধে ক্ষমতা দেওয়া হইবে। রাজপ্রতিনিধি ও রাজমন্ত্রীর এই অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য দুইটী কমিটী বা সমিতি (Franchise Committee and Committee on Functions) বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া গত অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া দুই খণ্ড রিপোর্ট দাখীল করিয়াছেন। তাহার এক খণ্ডে ব্যবস্থাপক সভা সমূহের গঠনপ্রণালী (franchise) এবং অন্য খণ্ডে ব্যবস্থাপক সভা সমূহের ক্ষমতা (functions) বর্ণিত হইয়াছে। এই দুই রিপোর্টের অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট সভায় এক পাণ্ডুলিপি পেশ হইয়াছে, এবং সম্প্রতি সেই পাণ্ডুলিপির বিচার জন্য পার্লিয়ামেণ্টের লর্ডস্ ও কমন্স্ উভয় শাখা হইতে সভ্য লইয়া এক কমিটী করিয়াছেন, এবং এই কমিটীর নিকট উক্ত পাণ্ডুলিপির বিচার চলিতেছে। বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভা, সমগ্র ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভা এবং বিলাতের ইণ্ডিয়া কাউন্সীল যে প্রণালীতে গঠিত হইবে বলিয়া প্রস্তাব ও বাদানুবাদ চলিতেছে, তন্মধ্যে বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভাগঠনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভা।

বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য সংখ্যা ৫৩ জন ছিল। তন্মধ্যে—

সরকারী সভ্য—	৫ জন
মনোনীত সভ্য—	২৮ „
লাটসাহেবের মনোনীত সভ্য—	২০ „
একুন	৫৩ জন

এতদ্ভিন্ন ২ জন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি লাট সাহেব মনোনীত করিতে পারিতেন। ভবিষ্যতে এই ৫৩ জন স্থানে ১২৫ জন সভ্য হইবে, যথা—

১ দফা। সরকারী কর্ম্মচারী—

(ক) লাটসাহেব, মেম্বরদের মধ্যে ২ জন এবং এডভোকেট জেনারেল—	৪
(খ) লাটসাহেবের মনোনীত সরকারী কর্ম্মচারী—	১৬
একুন	২০

২ দফা। লাটসাহেবের মনোনীত বে-সরকারী সভ্য যথা—

(ক) শ্রমজীবী—	১
(খ) দেশী খ্রীষ্টীয়ান—	১
(গ) নিম্নশ্রেণী—	১
(ঘ) অপর—	২
একুন	৫

৩ দফা। মুসলমান কর্ত্তৃক মনোনীত

(ক) প্রধান নগর সমূহে—	৬
(খ) পল্লীগ্রাম ও ক্ষুদ্র নগরে—	২৮
একুন	৩৪

৪ দফা। হিন্দু কর্ত্তৃক মনোনীত

(ক) প্রধান নগর সমূহে—	১১
(খ) পল্লীগ্রাম ও ক্ষুদ্র নগরে—	৩০
একুন	৪১

৫ দফা। বিশেষ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়—	২
(খ) প্রধান জমিদার—	৫
(গ) ইংরেজ—	২
(ঘ) ফিরিঙ্গী—	১
একুন	১০

৬ দফা। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদিতে লিপ্ত

(ক) ইংরেজ সওদাগর—	৪
(খ) পাটের কল ও বস্তাবন্দী—	২
(গ) কয়লাখনি প্রভৃতি	১
(ঘ) চা-করদের সভা	১
(ঙ) চা-বাগানের ম্যানেজার—	১
(চ) ইংরেজ দোকানদার—	২
(ছ) জাহাজে নিযুক্ত ইংরেজ—	১
(জ) দেশী সওদাগর—	৩
একুন	১৪
সর্ব্বমোট	১২৫

এতদ্ভিন্ন লাটসাহেব সময়ে সময়ে দুই জন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে সভ্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

হিন্দু ও মুসলমান সভ্য।

পূর্ব্বে যে ৭৫ জন হিন্দু ও মুসলমান সভ্যের কথা বলা হইল, তন্মধ্যে কোন সম্প্রদায় কোন্ জিলার বা কোন্ সহরে কয়জন সভ্যকে কয় হাজার লোক মনোনীত করিবেন, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

১। সহর সমূহে।

হিন্দু সংখ্যা সভ্য	হিন্দু সংখ্যা নির্ব্বাচক (হাজার)	সহরের নাম	মুসলমান সংখ্যা সভ্য	মুসলমান সংখ্যা নির্ব্বাচক (হাজার)
৬	৩২	কলিকাতা	২	৪
১	১২	হাওড়া }	১	{ ১
১	১১	হুগলী }		{ ২
২	২৮	২৪ পরগণা	২	৭
১	৫	ঢাকা	১	৪
১১	৮৮	একুন	৬	১৮

২। পল্লীগ্রাম ও ছোট সহরে।

সভ্য সংখ্যা	নির্ব্বাচক (হাজার)	জিলার নাম	সভ্য সংখ্যা	নির্ব্বাচক (হাজার)
২	৪২	বর্দ্ধমান }		
১	১৪	বীরভূম }	১	১২
১	৩৮	বাঁকুড়া }		
২	৬৪	মেদিনীপুর }	১	৯
४	৩৩	হুগলী ও হাওড়া }		
২	৭৯	চব্বিশ পরগণা	১	২৩
১	২৩	নদিয়া	১	১০
১	১৭	মুর্শিদাবাদ	১	৬
২	৪৯	যশোহর	১	২০
১	২৪	খুলনা	১	১২
১	২৮	ঢাকা	২	২০
২	৩০	ময়মনসিংহ	৩	২৮
২	৪৫	ফরিদপুর	১	২৩
২	৫২	বাখরগঞ্জ	৩	৭০
১	২৫	চট্টগ্রাম	২	৩১
১	১৯	ত্রিপুরা	২	২৫
১	৯	নোয়াখালী	১	২১
১	১৭	রাজসাহী	২	৩৪
১	১৬	দিনাজপুর	১	১৬
১	২১	জলপাইগুড়ি	১	৯
১	৩০	রংপুর	১	২৬
		{ বগুড়া পাবনা }		২১
		মালদহ		
৩০	৭০০	একুন	২৮	৪২২

উপরে যে তালিকা দেওয়া হইল, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ১২৫ জন সভ্যের মধ্যে ২৫ জন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক, ২৫ জন জমিদার, সওদাগর, চা-কর, কয়লা-কর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য প্রভৃতি কর্ত্তৃক এবং অবশিষ্ট ৭৫ জন হিন্দু-মুসলমান কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

হিন্দু-মুসলমানের প্রণয়-সন্ধি।

১৯১৫ সালে ইণ্ডিয়ান নেশানেল-কংগ্রেশ এবং মুসলমান-লীগ উভয়ে মিলিয়া সন্ধি করেন যে, দেশীয় লোক কর্ত্তৃক মনোনীত সভ্যের মধ্যে বঙ্গদেশে শতকরা ৪০ জন সভ্য মুসলমান হইবেক। ৭৫ জন সভ্যের মধ্যে ৩৪ জন সভ্য মুসলমান হইলে; মুসলমান

সভ্য সংখ্যা শতকরা ৪৫ জন হয়। এতদুত্তরে মুসলমানেরা বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন, জমিদার মনোনীত ৫ জন এবং দেশী সওদাগর কর্ত্তৃক মনোনীত ৩ জন সভ্য সম্ভবতঃ হিন্দু হইবেন। সুতরাং হিন্দুদের সভ্য সংখ্যা ৪১ জন না ধরিয়া ৫১ জন ধরা উচিত। তাহা হইলে ৩৪ জন মুসলমান সভ্য, মোট ৮৫ জনের মধ্যে শতকরা ৪০ জন হইয়া দাঁড়ান। এই হিসাবে লক্ষ্ণৌর সন্ধি-পত্র লঙ্ঘন করা হয় নাই। সে যাহা হউক, যে কমিটী কর্ত্তৃক এই সভ্যসংখ্যা নির্দ্ধারিত করা হয়, তাহার সভাপতি ভিন্ন ৬ জন সভ্য মধ্যে দুই জন হিন্দু এবং এক জন মুসলমান ছিলেন। তাঁহারা লক্ষ্ণৌর সন্ধিপত্র স্মরণ রাখিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সভ্যসংখ্যা বণ্টন করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও আপত্য করা উচিত নয়।

নির্ব্বাচককারীরা কোন্ সম্প্রদায়ের লোক ?

আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, পল্লীবাসী ৪০ জন হিন্দু সভ্য ৭ লক্ষ লোক কর্ত্তৃক, এবং ৩৮ জন মুসলমান সভ্য ৪ লক্ষ ২২ হাজার লোক কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। তাহা হইলে গড়পড়তা ২৩ হাজার হিন্দু-নির্ব্বাচক এবং ১৫ হাজার মুসলমান নির্ব্বাচক এক একজন সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন।

এতৎ সম্বন্ধে এক শ্রেণীর লোক আপত্তি করিতেছেন যে, এত লোক নির্ব্বাচক শ্রেণীভুক্ত করা উচিত হয় নাই; কলিকাতার ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকা এই সম্প্রদায়ের মুখপত্র। অন্য সম্প্রদায় বলেন যে, আরো অধিক লোক নির্ব্বাচক শ্রেণীভুক্ত করা উচিত ছিল। ইঁহাদের অগ্রণী বোম্বাইর ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড সিডান্‌হাম্ এবং মান্দ্রাজের স্বর্গীয় "অব্রাহ্মণ" ডাক্তার নায়ের। ইঁহারা উভয়েই ভারত-শাসন-সংস্কার বা ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের বিরোধী।

প্রথম শ্রেণীর শাসন-সংস্কার-বিরোধী।

তাঁহারা বলেন যে, এত অধিক লোক নির্ব্বাচক শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে যে, তাহাদের অনেকে নিরেট মূর্খ হইবে, অথবা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য লোক হইবে।

বাঙ্গালা দেশে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে Census সেন্‌সাস্ বা আদমসুমারী সময়ে দেখা গিয়াছিল যে, ২০ বৎসর বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক লেখা-পড়া-জানা পুরুষ হিন্দু ও খ্রীষ্টীয়ানের সংখ্যা প্রায় ১৬ লক্ষ ৪০ হাজার। আর হিন্দু ও খ্রীষ্টীয়ান নির্ব্বাচক সংখ্যা ৭ লক্ষ ৮৮ হাজার মাত্র। এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ২০ বৎসর বা তদধিক বয়সের লেখা-পড়া-জানা পুরুষের সংখ্যা ৭ লক্ষ ২৩ হাজার; সবে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার মুসলমান নির্ব্বাচন অধিকার পাইবে। ২৪ লক্ষ লেখ-পড়া-জানা বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষের মধ্যে ১২ লক্ষ লোক নির্ব্বাচন অধিকার পাইলে, অতি অল্প নিরক্ষর লোকেরই নির্ব্বাচক শ্রেণীভুক্ত হইবার সম্ভাবনা।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, নির্ব্বাচকেরা অনেকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইবে। ছয় শ্রেণীর লোক নির্ব্বাচক-ভুক্ত হইবে। যথা—

(১) যে সকল চাষী ১৲ টাকা বার্ষিক রোডসেস দেয়, অথবা ৩২৲ টাকায় জমা রাখে। যে চাষী ৩৲ টাকার জমা রাখে, সে গ্রামে একজন বর্দ্ধিষ্ট লোক। জিলা বিশেষে এবং বৎসর বিশেষে তাহার জমাভুক্ত

জমি হইতে বৎসরে ১০০০৲ হইতে ২০০০৲ টাকার ফসল উৎপন্ন করে। যে সকল লোক ৭০৲ কি ৮০৲ টাকার কেরাণীগিরি বা স্কুল মাষ্টারি অথবা গ্রাম্য সবরেজিষ্টরী চাকুরি করিয়া ভদ্রলোক বলিয়া গর্ব্ব করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা এই এক টাকা রোডসেস প্রদানকারীর অবস্থা যে সকল বিষয়ে অধিকতর বাঞ্ছনীয়, তাহা গ্রামবাসী মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এই শ্রেণীর কৃষিজীবী-সম্প্রদায়ের হিতাহিত জ্ঞান নাই, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজের ফিরিঙ্গী লেখকের কলমে এই প্রকার অমূলক আশঙ্কা প্রকাশ পাওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

(২) যে সকল লাখেরাজদার – ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, মহাত্রাণ, জায়গীর বা অন্য প্রকার নিষ্কর জমি যাঁহারা ভোগ করেন, তাঁহারা বঙ্গদেশের মধ্য শ্রেণীর লোক। বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য জন্য তাঁহারা বিখ্যাত। বঙ্গের পাঁচ বিভাগের ৬৩৫ প্রধান জমিদার তালুকদার ও জোতদার, ৫ জন সভ্য নির্ব্বাচিত করিবেন। তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট জমিদার, তালুকদার, জোতদার প্রভৃতি যে কেহ ১৲ টাকার অধিক রোডসেস দেন, তিনিও ১৲ টাকা রোডসেস-প্রদানকারী প্রজার ন্যায় নির্ব্বাচন অধিকার পাইবেন। ইহাদের মধ্যে মূর্খের সংখ্যা বা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য লোকের সংখ্যা নাই বলিলে হয়।

(৩) পল্লীগ্রামবাসী যে সকল ব্যক্তি রোডসেস দেন না, কিন্তু শিক্ষকতা, ব্যবসা, বাণিজ্য, পৌরোহিত্য, কবিরাজী, ডাক্তারী এবং অন্যান্য প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন এবং প্রতি বৎসর স্বগ্রামের ২৲ টাকা বা তদধিক করিয়া চৌকীদারী ট্যাক্‌স্‌ দেন, তাঁহারাও নির্ব্বাচনের অধিকার পাইবেন। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে নিরক্ষর বা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য লোক নাই বলিলে হয়।

(৪) চতুর্থ শ্রেণীর নির্ব্বাচক—যাঁহারা ইন্‌কাম ট্যাক্‌স্‌ দেন। তাঁহাদের মূর্খতাপবাদ নিরসন জন্য কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

(৫) পঞ্চম শ্রেণীর নির্ব্বাচক—যে সকল ব্যক্তি সৈনিকবৃত্তি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা দেশের বীরপুরুষ। মাতা-স্ত্রী-কন্যার সম্ভ্রম রক্ষার কর্ত্তা। তাঁহারা তো নির্ব্বাচন অধিকার পাইবেনই।

(৬) যে সকল লোক ক্ষুদ্র সহরে বাস করিয়া এই ৩৫ বৎসর মিউনীসিপালিটীর সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, ভারত শাসন-সংস্কার-বিরোধী লোকেরা তাঁহাদের সম্বন্ধেও আজ আপত্তি উপস্থিত করিতেছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শাসন-সংস্কার-বিরোধী।

ইঁহারা বলেন যে, অতি অল্প লোককে নির্ব্বাচক শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। কুলি, মজুর, কৃষাণেরা নির্ব্বাচক শ্রেণী হইতে বাদ পড়িয়াছে। বঙ্গদেশে ভদ্রলোকেরা, বেহার-প্রয়াগ প্রভৃতি দেশে আশ্‌রফ লোকেরা, এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণেরা এখন অপেক্ষা নূতন নির্ব্বাচন প্রথার সাহায্যে অন্যান্য জাতের উপর অধিকতর প্রভুত্ব করিবে। "ভদ্রলোকভীতি"র বা "ব্রাহ্মণ-ভীতি"র যে যথেষ্ট কারণ আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু নির্ব্বাচন প্রথা হইতে "ভদ্রলোকের" বা "ব্রাহ্মণের" প্রভুত্ব প্রদেশবিদেশে বৃদ্ধি পাইবে, এ কথা আমি স্বীকার করি না। বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট অনুমান করেন যে, ১২ লক্ষ লোক নির্ব্বাচক হইবে। তন্মধ্যে

(ক) ১৲ টাকা বা তদধিক
রোডসেস্-দাতা— ৮,৯৯,০০০
(খ) ২৲ টাকা বা তদধিক
চৌকীদারী-ট্যাক্স্-দাতা—১,৩৩,০০০
(গ) ক্ষুদ্র নগরবাসী মিউনী-
সিপাল-নির্ব্বাচক— ১,৯৪,০০০

একুন ১২,২৬,০০০

বাঙ্গালা দেশে খাস পল্লীগ্রামের ১০ লক্ষ ৩২ হাজার লোক নির্ব্বাচন অধিকার পাইবেন। এবং হারাহারি তিন হাজার হইতে তেইশ হাজার নির্ব্বাচক সহর বা মহকুমা বিশেষে এক এক জন সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। নির্ব্বাচক সংখ্যা ইহা অপেক্ষাও অধিক করিতে হইলে সভ্য সংখ্যাও বাড়ান উচিত। প্রথম ১০২২ বৎসরের ফলাফল না দেখিয়া তাহা করা উচিত নয়। সম্ভবতঃ তাহাই করা হইবে।

কে "ভদ্রলোক", আর কে "অভদ্র লোক", বঙ্গদেশে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারীর (census) রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণের মধ্যে শতকরা ৭২ জন পূর্ব্ব ও উত্তর বাঙ্গালায় এবং ৮১ জন পশ্চিম বাঙ্গালায় পৈত্রিকবৃত্তি (যাজকতা ও অধ্যাপনা) পরিত্যাগ করিয়াছেন। পাচকাদি বৃত্তিধারীর সংখ্যা ব্রাহ্মণের মধ্যে পূর্ব্ব ও উত্তর বাঙ্গালায় শতকরা ১৮ জন এবং পশ্চিম বাঙ্গালায় শতকরা ২৭ জন। কায়স্থের মধ্যে শতকরা ৩৭ জন এবং তেলির মধ্যে শতকরা ৫২ জন চাষ-বাস করিয়া জীবিকাধারণ করেন। এতদিন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যেরাই লেখাপড়া বেশী শিখিতেন, নবাব সরকারে চাকুরি করিতেন, এবং ভদ্রলোক বলিয়া পরিচয় দিতেন। কিন্তু ইংরেজের অধিকার হইতে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত হওয়ায়, বাঙ্গালা দেশে আর ব্রাহ্মণের প্রাধান্য নাই। প্রাচীন "ভদ্র" ও "অভদ্র" শ্রেণীভাগ উঠিয়া গিয়া "শিক্ষিত" এবং "অশিক্ষিত" এই নূতন শ্রেণীভাগ সর্ব্ববাদীসম্মত হইয়াছে। এখন আর পীরালীদিগকে বা সোণারবেণে ও সাহাদিগকে জল-অনাচরণীয় বলিয়া ঠেলিয়া রাখিতে কেহই চাহেন না। সুবর্ণবণিক বংশের কত লোক যে প্রাদেশিক এবং ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং মুনসেফ ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সাহাবংশের এক ব্যক্তি কলিকাতার হাইকোর্টের জজিয়তি পর্য্যন্ত করিয়াছেন। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে জাতিগত বৃত্তিভেদ উঠিয়া গিয়াছে। তদবধি আহারে, দেশভ্রমণে আর জাতিভেদ নাই বলিলে হয়। বেণে ও সাহা ত সামান্য কথা, চণ্ডালকে নমঃশূদ্র অভিধান দিয়া বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা এক স্কুলে বা কলেজে এক বেঞ্চে বসাইয়া একই শিক্ষা লাভের সহায়তা করিতেছেন। শুঁড়ি বা চণ্ডাল স্পর্শে অশুচি হয়, এই ধারণা বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি শিক্ষিত জাতি হইতে উঠিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক জমিদার সভায়, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সভায়, ন্যাশানাল কংগ্রেস নামক সর্ব্বজাতীয় সভায় ব্রাহ্মণ হইতে বাগ্‌দী পর্য্যন্ত, বৈদ্য হইতে বাউড়ী পর্য্যন্ত এবং কায়স্থ হইতে কাওড়া পর্য্যন্ত সকল জাতির ভূতপূর্ব্ব "শুচি" ও "অশুচি" জাতির লোক যোগ দিতেছে। সকল জাতির লোক একত্রিত হইয়া এই ৩৫ বৎসর জাতি বর্ণ ভুলিয়া মিউনিসিপালিটীর ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্য

নির্ব্বাচন করিতেছে। সাহা, শুঁড়ি ও সোণার বেণে যে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভ্য ও সভাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য বা হাইকোর্টের জজিয়তি পর্য্যন্ত করিয়াছেন; তাহাতে বাঙ্গালার কোন্ ব্রাহ্মণ বা কোন্ বৈদ্য বা কোন্ কায়স্থ আপত্তি করিয়াছেন? বাঙ্গালা দেশে দলাদলি যথেষ্ট আছে। কিন্তু তাহা এক জাতির সহিত অন্য জাতির দলাদলি নয়। এক সময়ে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা পীরালি ব্রাহ্মণদের বিদ্বেষী বা বিরোধী ছিলেন। আজ কাল শুনিতেছি "সামাজিক ব্রাহ্মণ" নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ উদ্ভূত হইয়াছেন। তাঁহারা বিলাত-ফেরতা ব্রাহ্মণদের বিরোধী। কিন্তু "সামাজিক ব্রাহ্মণেরা" বিলাত-ফেরতা কায়স্থ বা বারুইর বা বেণের সঙ্গে কোন শত্রুতা করেন না। বিভিন্ন জাতির হিন্দুরা একত্রিত হইয়া কত যৌথ কারবার করিতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই।

এই জন্য বলিতেছি যে, ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন ব্যাপার অবলম্বন করিয়া বর্ণে বর্ণে বা জাতে জাতে বা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে হিন্দুদের মধ্যে কোন বিরোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং স্বর্গীয় ডাক্তার নায়েব অথবা বাঙ্গালা দেশের অপরিচিত লর্ড সিডানহাম্ এতৎ সম্বন্ধে যে আশঙ্কা করেন, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক।

অন্য প্রদেশের কথা জানি না। বাঙ্গালা দেশের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, শ্রীচৈতন্য হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণেরাই বাঙ্গালা দেশে জাতিভেদ বিনাশের পথ দেখাইয়াছেন, এবং ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য অর্দ্ধ বিনাশ করিয়াছেন। তাহার পরে ইংরেজী শিক্ষার সবিশেষ প্রচলন হেতু প্রাচীন "ভদ্র" ও "অভদ্র" জাতিসমূহের মধ্যে অনেকটা সমতা হইয়াছে। স্বদেশপ্রেম স্বজাতিপ্রেমকে অতিক্রম করিয়া উঠিতেছে। ইংরেজদের এই সকল কথা জানিবার উপায় নাই। এজন্য ভারতহিতার্থী কোন কোন ইংরেজ মনুসংহিতা পাঠ করিয়া মনে করেন যে, এখনও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কায়স্থাদি শূদ্রেরা একাসনে বসিলে কায়স্থকে উত্তপ্ত লৌহ দিয়া তাঁহার ধৃষ্টতার দণ্ডবিধান করা হয়। বিদেশী ইংরাজের পক্ষে এই প্রকার অজ্ঞতা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কিন্তু অজ্ঞ লোকের নানা দোষ; তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহারা "সবজান্তা।"

যে প্রকারে এখন নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ হইতে নমঃশূদ্র পর্য্যন্ত স্থান পাইবে। কোন জাতির বিশেষ প্রাধান্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি জিলা বিশেষে কোন জাতির উপর অন্য কোন জাতির ক্রোধ জন্মে, তাহা হইলে ক্রুদ্ধ জাতির লোকেরা সমবেত হইলেও অন্য জাতকে অপদস্থ করিতে পারিবেন, তাহা বোধ হয় না। বিশেষতঃ রাজনীতি বিষয়ে বা ব্যবসা বাণিজ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার উঠিয়া গিয়াছে। সুতরাং সভ্যনির্ব্বাচন সম্বন্ধে কোন জাত বিশেষের উপর অন্য জাতের বিদ্বেষ হইবার কোন বিশেষ কারণ নাই।

এখন কর্ত্তব্য কি?

যাঁহারা ভারতশাসন-সংস্কারের পক্ষপাতী, তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে, স্ব স্ব জিলায় বা স্ব স্ব মহকুমায় যে সকল লোক নির্ব্বাচন-অধিকার পাইবেন, তাঁহাদিগকে ডাকিয়া এই নূতন নির্ব্বাচন-প্রণালী বুঝাইয়া দেন,

এবং জিলার বা মহকুমার কোন্ ব্যক্তিকে তাঁহারা সভ্য মনোনীত করিবেন, তাহা স্থির করেন। উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিলে হইবে না।

কোন কোন জিলায় একাধিক ব্যক্তি সভ্য মনোনীত হইবেন। যথা বাখরগঞ্জ এবং ময়মনসিংহে ২ জন হিন্দু এবং ৩ জন মুসলমান এবং যশোহর ও ফরিদপুরে ২ জন হিন্দু এবং ১ জন মুসলমান সভ্য হইবেন। এক এক জিলায় কোন সম্প্রদায়ের একাধিক সভ্য নির্ব্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া হইয়া থাকিলে, ঐ জিলার অন্তর্গত মহকুমাগুলি তদনুরূপ বিভক্ত হইবে যেন প্রত্যেক ভাগ হইতে একজন সভ্য নিযুক্ত হইতে পারে। এই জন্য যে সকল লোকদের নির্ব্বাচন ক্ষমতা পাইবার সম্ভব, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে,এখন হইতেই একজন উপযুক্ত সভ্য তল্লাস করিতে থাকেন। বিনা বেতনে পাঠশালায় শিক্ষা হইবে। পল্লীগ্রামে মদের দোকান বা ভাটী উঠিয়া যাইবে। বিনা মাশুলে সকলেই সমুদ্রকূলে লবণ করিতে পারিবে, এবং দেশী লবণের উপর মাশুল থাকিবে না। রেলপথ এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় যথেষ্ট পুল থাকিবে যেন বৃষ্টির জল যাতায়াতে বাধা পাইয়া ম্যালেরিয়া উৎপন্ন না করে, এবং দেশে বন্যা উপস্থিত না করে। প্রত্যেক মহকুমায় এবং থানায় যেন দাতব্য চিকিৎসালয় হয়। রেলপথের ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার এক পাশে যেন খাল থাকে। গ্রামে পানীয় জলের যেন যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকে। গ্রামে তাঁত হইতে কাপড় প্রস্তুত এবং চরকা হইতে সূতা কাটার যেন যথেষ্ট বন্দোবস্ত হয়। সভ্য মহাশয় যেন প্রতি বৎসর একবার প্রত্যেক থানায় উপস্থিত হইয়া গ্রামবাসীদের সঙ্গে জিলার মঙ্গলামঙ্গল আলোচনা করেন।

যেই লোক হইতে গ্রামবাসীরা এই প্রকার উপকার লাভের প্রত্যাশা করেন, তাঁহাকেই তাঁহারা মনোনীত করিবেন। কাহার বড় নাম শুনিয়া বা বাগাড়ম্বরে প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রতিনিধি করিবেন না।

নির্ব্বাচককারীদের শ্রেষ্ঠ লোক লইয়া প্রত্যেক থানায় একটা মণ্ডলী হওয়া উচিত। তাঁহারা অগ্রণী হইয়া সকলকে ভাল মন্দ বিচার করিতে সহায়তা করিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।

ভারত-মাতা

মা তোমার নহে এ তো সেই বেশ,
যে বেশে শাসিতে তুমি
রাণী হয়ে বসি গিরিরাজ পরে
শ্যামল ভারতভূমি ॥ ১

কত যে দেশের মুকুট তখন
লুটায়ে পড়িত পায়।
জগতের জ্ঞানী চাহিত আশ্রয়
তোমারি জ্ঞানের ছায় ॥ ২

কোথা কুরুকুল-যদুকুল কোথা
স্তন্য তব পান করি'
বিচরিত যারা দেবতার মত
জয়ের পতাকা ধরি ॥ ৩

আর কি তোমার বসিবে না শিরে
জ্ঞানের মুকুটমণি ?
কবে তব মাত ঘুচিবে এ বেশ—
চলেছি দিবস গণি' ॥ ৪

সুনীল আকাশ আজিকে তোমার
মাথায় আশ্রয় ধরে।
রবির কিরণ শুভ্র বস্ত্রে তব
লজ্জা নিবারণ করে॥ ৫

দখিণে বাতাস তব দুখে দুখী
আজিও করিছে সেবা।
গাছেদের কাছে গাহে কত গাথা
সে গান শুনিবে কেবা? ৬

ঘোষে ক্ষিতি আজো রাণী তুমি মাতঃ-
অজানা তোমার পায়
কোটী কোটী তারা প্রতিদিন আসি
প্রণতি করিয়া যায়॥ ৭

শ্রী ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সঙ্কণিকা

(২৪)

২১শে শ্রাবণ, ১৩২৬—সুযোগ্য "হিন্দুস্থান" পত্রিকা লিখিয়াছেন—

"কানু ছাড়া গীত নাই"

"ম্যাট্রিক হইতে আরম্ভ করিয়া এম-এল্ ও পি-আর-এস্ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষা-ক্ষেত্রেই স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কি হইয়া কেমন ভাবে বিরাজ করিতেছেন, তাহার পরিচয় ইতিপূর্ব্বে আমরা দিয়াছি। আজ আবার তাহারই প্রায় অনুরূপ বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত আর একখানি চিত্র পাঠক-সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি।—এ চিত্রখানির ভিতর হইতেও বিস্ময় ও কৌতুক রসের আস্বাদন-লাভ পাঠক যে না করিতে পাইবেন, এমন নহে।

যে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েটের মায়ায় সেনেট-সভা আজ মুগ্ধ, যাহার রক্ষা-কল্পে সেনেট-সভা আজ ফি-এর নাম করিয়া ম্যাট্রিক প্রভৃতি পরীক্ষার্থীদিগের নিকট হইতেও অর্থ শোষণ করিতে উৎসুক, সেই পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েটেরই একাংশের ইহা চিত্র। ইহার আর্ট ও বিজ্ঞান, এই দুইটা জিনিসের জন্য যে দুইটা 'কাউন্সিল' গড়া হইয়াছে, তাহারই ছবির কথা এখানে বলিতেছি। এ চিত্রের সভাপতির আসনগুলি সকলে একবার নিরীক্ষণ করিয়া দেখুন—

পোষ্ট-গ্রাজুয়েট

আর্ট-পরিষদ	বিজ্ঞান-পরিষদ
প্রধান সভাপতি—	প্রধান সভাপতি—
স্যর আশুতোষ	স্যর আশুতোষ
* *	* *
কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতি—	কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতি—
স্যর আশুতোষ	স্যর আশুতোষ
* *	* *
বোর্ড সভাপতি	বোর্ড সভাপতি
ইংরেজী—স্যর আশুতোষ	গণিত—স্যর আশুতোষ
সংস্কৃত— "	পদার্থ-বিজ্ঞান "
পালি— "	রসায়ন—স্যর প্রফুল্লচন্দ্র
আরবী— "	উদ্ভিদবিদ্যা—মহলানবীশ
পার্শী— "	শারীর-তত্ত্ব— "
ভাষা-বিজ্ঞান— "	ভূ-তত্ত্ব—এচ্-সি দাশগুপ্ত
নীতিশাস্ত্র— "	
মনোবিজ্ঞান— "	
ইতিহাস— "	
অর্থশাস্ত্র— "	
গণিত— "	
হিব্রু ও সিরীয় ভাষা—. হাউয়েল সাহেব	

যেমন কথায় আছে—'কানু ছাড়া গীত নাই', তেমনই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সব চিত্র দেখিয়াও বলিতে ইচ্ছা হয়—স্যর আশুতোষ ছাড়া সেখানে কর্ম্ম নাই। বাস্তবিক, আরবী, পার্শী ও ভাষা-বিজ্ঞান প্রভৃতি বোর্ডের যখন তিনি সভাপতি, তখন তিনি হিব্রু ও উদ্ভিদ-বিদ্যার বোর্ডেও সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া বসিলে আমরা কিছুমাত্র চমকিত হইতাম না। যাহা হউক, উপরি-উদ্ধৃত চিত্রখানি হইতে দেখা যায় যে, আর্টের একটী স্থান ও বিজ্ঞান-বিভাগের চারিটী স্থান ব্যতীত আর সর্ব্বস্থানের সভাপতির আসনই স্যর আশুতোষকে অধিকার করিয়া বসিতে হইয়াছে! এ চিত্র স্যর আশুতোষের পক্ষে কৃতিত্বের ও শক্তিমত্তার পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহা লজ্জার চিত্র—কলঙ্কের চিত্র। দুই শতাধিক অধ্যাপক থাকা সত্ত্বেও কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে যে একমাত্র স্যর আশুতোষ ছাড়া যোগ্য লোকের নিতান্তই অভাব, এ চিত্রখানি তাহারই প্রমাণ-পরিচয় দিতেছে।"

হিন্দুস্থান, নায়ক প্রভৃতি বহু পত্রিকা দরিদ্র ছাত্রদের হইয়া দুকথা বলিতেছেন—ইহা যারপর নাই আনন্দের বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু চেলা আছেন, তাঁহারা স্যর আশুতোষকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কেহ কেহ তাহার উপর উঠিয়া "মানহানির" কান্না আরম্ভ করিয়াছেন। পোষা নন্দী ভৃঙ্গীর এদেশে অভাব নাই, সুতরাং এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়। দুই দশ জন তাঁহার অনাত্মীয় ব্যক্তি উপযুক্ততার দাবীতে কাজ পাইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ কি? নায়কের নামে "লাইবেল" ছাড়িয়া, তাহার অভিযোগের উত্তর দেও না কেন?

কৃতিত্ব তাহাকেই বলে, যে শক্তি বলে মানুষ "নিজত্ব" ছাড়িয়া অন্যের দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতে পারে। পৃথিবীর প্রধান মন্ত্রীদিগের তাহাই কাজ। কোন মন্ত্রী নিজের হাতে একাধিক কাজ রাখিয়া বাহাদুরী লইয়াছেন? অন্যের প্রতিভাকে স্বীকার করাই প্রকৃত মহত্ত্বের লক্ষণ। শুধু নন্দী ভৃঙ্গীদিগকে দল-মাহাত্ম্য বজায় রাখিতে শিলাইয়া দেওয়াতে মহত্ত্ব নাই। লাইবেল-কলঙ্ক নন্দী-ভৃঙ্গীদিগকে আলিঙ্গন করিল কেন?

(২৫)

"সধবার একাদশী"- বহু দিনের পুস্তকখানি কুরুচির ধূয়ায় বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। তবু এবার অজুহত্ উল্লিখিত হইয়াছে!! কত কত সুন্দর সুন্দর পুস্তক যে বিনা অজুহতেই বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই!! আমরা সেজন্য বহুবার চীৎকার করিলেও কাহারও হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় নাই? ভূতপূর্ব্ব চিফ জষ্টিস্ মহাত্মা জেঙ্কিন্স বলিয়াছিলেন—"এমন কঠোর আইন হইয়াছে যে, বাইবেলকেও এই আইন বলে বাজেয়াপ্ত করা যাইতে পারে।" এদেশের কোন্ ভাল পুস্তক বাজেয়াপ্ত হয় নাই? যেখানে একটু দেশানুরাগের চিহ্ন আছে, একটু সহৃদয়তা আছে, একটু সংস্কার-স্পৃহা আছে, সেই খানেই কর্ত্তৃপক্ষের লোলুপ-দৃষ্টি। কংসের নির্ব্বাণ-নীতি অবলম্বনের পরিবর্ত্তে কালাপাহাড়ের নীতি ভাষা-নির্ব্বাণে অবলম্বিত হইতেছে, ইহা গভীর দুঃখের বিষয়। ভাষার স্বাধীনতা ভিন্ন কখনও কোন দেশে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। এই ভাষার কি দুর্দ্দশা হইতেছে, তাহা দেখিয়াও কেহ দেখেন না; দেশ

যাওয়ার পথে উপনীত, তবু এদেশ হাসে, নাচে এবং উল্লাসে দিকহারা হয়! ক্রমে ক্রমে কোন্ পুস্তক থাকিবে? কোন্ পত্রিকা জাগিবে? কোন্ নেতা তিষ্ঠিবে? আমরা এদেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দিবারাত্রি কেবল চক্ষের জল ফেলিতেছি! দেশ সহৃদয়তা-বিহনে যায় যায় হইয়াছে!!

(২৬)

দুর্ভিক্ষে সকল ঘরে হাহাকার—কত লোক অনশনে প্রাণ দিতেছেন—কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন—লোক মরে নাই! আমরা ১৩০০ সালে যখন ফরিদপুরের অধীন কোটালিপাড়ের দুর্ভিক্ষের সেবা করিতেছিলাম, তখন ঢাকার কমিসনার টিউট সাহেব এইরূপ বলিয়া আমাদিগকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার ভাগলপুরের কমিসনার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন মহোদয় দুর্ভিক্ষের সাহায্যকল্পে যে কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে আমরা মোহিত হইয়াছি। তিনি ঋষিপ্রতিম ব্যক্তি। তাঁহারই চেষ্টায় সাঁওতাল পরগণা দুর্ভিক্ষের করাল-গ্রাসে রক্ষা পাইতেছে। বিধাতা তাঁহার মঙ্গল করুন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট অনশনের মৃত্যুকে কিরূপে উড়াইয়া দিতেছেন, দেখুন। এইরূপ চেষ্টা এদেশে চিরদিন হইয়াছে। এই জন্য আমরা মর্ম্মে মরিয়া রহিয়াছি। সুখের বিষয়, এই দুর্ভিক্ষে মুক্তহস্তে এদেশের নরনারী সাহায্য করিয়া ধন্য হইতেছেন। একটা কথা—বিবাহাদি উৎসবে এদেশে এখনও কত বাজে ব্যয় হইতেছে, তাহা দ্বারা কি কতক লোক রক্ষা পাইত না? বাহাদুরীর আর সময় নাই—নিরন্নদিগকে রক্ষা করিতে সকলের অগ্রসর হওয়া উচিত। চতুর্দ্দিকে হাহাকার—ঘরে ঘরে যে ক্রন্দন, ঐ শোন, ঐ শোন।

শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায়ের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত ম্যাক্-অলপিন বলেন—

"সংবাদপত্রে অনাহারে মৃত্যু সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রকাশিত হইয়াছে, সে সমস্তই বাজে কথা—আসল কথা এই যে, প্রতি বৎসর বাঙ্গালা দেশে লোক রোগে ও রাগে যেমন মরে, এবারও সেই ভাবেই মরিয়াছে।

(১) রঙ্গপুর জেলা—মিঠাপুকুর থানার এলাকাধীন হেতমপুর-নিবাসী বারিকা সেখের পত্নী ওকিমন অন্নকষ্টের জন্য মরে নাই। বারিকা মজুরী করিত; গত ১৪ই জুন তারিখে সে একটী কাঁঠাল লইয়া আসে, "রোজার" পর খাইবে, ইহাই উদ্দেশ্য। কিন্তু ওকিমনের অসাবধানতায় কাঁঠালটী শৃগালে লইয়া যায়। বারিকা এজন্য তাহাকে মর্ম্মপীড়া দেওয়ায় সে রাগের মাথায় গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে।

(২) বরিশাল—(ক) বানরীপাড়া থানার এলাকায় আনারদ্দী নামক এক ব্যক্তি অপরের গরু বিক্রয় করিয়া সেই টাকা আত্মসাৎ করে। কারাবাসের দায় হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য সে আত্মহত্যা করিয়াছে। অন্নাভাবে মরে নাই।

(খ) ঝালকাঠি থানার এলাকায় দোসাতিনা গ্রামের মফিজদ্দী নামক এক ব্যক্তির চারি বৎসর বয়স্ক পুত্র উদরাময় ও জ্বরে মারা গিয়াছে—অনাহারে মরে নাই।

(গ) দরপাড়া গ্রামের দুইজন মুসলমান অনাহার-জনিত কষ্ট হইতে পরিত্রাণের জন্য উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সংবাদ পত্রে

এইরূপ প্রকাশিত হয়। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে এই গ্রামে উদ্বন্ধনে কেহ মরে নাই। গ্রামের পঞ্চায়েত সংবাদটা মিথ্যা বলিয়াই জানাইয়াছে।

(৩) ঢাকা জেলা—ওয়াড়ির সান্নিধ্যে পানগাঁওয়ের লালমোহন নামক এক ব্যক্তি ভিক্ষা করিয়া খাইত। সে কাঁঠাল খাইয়া উদরাময়ে মরিয়াছে, অনাহারে মরে নাই।

(৪) ময়মনসিংহ জেলা—অষ্টগ্রামের চৌকীদারেরা চারিটী অনাহারজনিত মৃত্যুর সংবাদ দেয়। কিশোরগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত করিয়া জানিতে পারেন যে, তিন জন জ্বরে ও একজন বসন্তে মারা গিয়াছে।

(৫) বীরভূম জেলা—কয়েকটী অনাহারজনিত মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু তদন্তে জানা গিয়াছে যে, এই জেলায় ঐ কারণে কেহই মরে নাই।

(৬) নদীয়া জেলা—(ক) পূর্ণী গ্রামের বিধু মুচিনী বৃদ্ধা, কুষ্ঠরোগে ভুগিতেছিল। সে এই রোগেই মরিয়াছে; অনাহারে মরিতেই পারে না, কারণ কুষ্ঠরোগগ্রস্তা বলিয়া লোকে দয়া করিয়া তাহাকে খাইতে দিত।

(খ) শোণ্ডা গ্রামের মাজি সেখ ছুতারের কাজ করিত এবং অধিক মাত্রায় আফিম ও চণ্ডু খাইত। কিছু দিন ধরিয়া সে জ্বর ও রক্তামাশয়ে ভুগিতেছিল—সেই রোগেই সে মরিয়াছে।

(গ) ঐ গ্রামের পাকড়ী সেখ অনাহারে মরিতেই পারে না। কারণ ঐ নামের কোন লোক ঐ গ্রামে ছিল না, এখনও নাই।"

টীকা অনাবশ্যক।

(২৭)

পীতাতঙ্ক যদি পৃথিবীর চিন্তার বিষয় হয়, নাগ্‌রা জুতা আতঙ্কও বঙ্গের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। চতুর্দ্দিকে যেরূপ দেখিতেছি এবং যেরূপ বুঝিতেছি, আর ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে বঙ্গের জমিদারী এবং সৌধ সকল হস্তান্তরিত হইবে, নাগ্‌রা জুতার তলে সকলকে বাস করিতে হইবে। আমাদের দেশের বড় বড় বুদ্ধিমানেরা টাকা গুছাইয়া বাড়ী ঘর ছাড়িয়া দিতেছেন! হায় রে বুদ্ধি! খয়রা-ষ্টেট যেরূপে গিয়াছে, অচিরে অন্যান্য অনেক ষ্টেটও সেইরূপে যাইবে। যে বাণিজ্যে ইংলণ্ড বড়, মার্কিন বড়, জাপান বড়, সেই বাণিজ্যে আজ এদেশের নিরক্ষর মাড়োয়ারী বড়! মাড়োয়ারীগণ এদেশকে ছাইয়া ফেলিতেছেন—অচিরে বঙ্গের সকলকে পাততাড়ি গুটাইয়া সুন্দরবনের দিকে ছুটিতে হইবে। চরিত্রহীনতা ও উদাসীনতা বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ করিতেছে। এখনও সাবধান, এখনও সাবধান।

(২৮)

এই দুর্দ্দিনে যাঁহারা বাণিজ্যের জন্য, শিল্পোন্নতির জন্য এবং কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে কোটী কোটী প্রণাম।

সম্প্রতি আমরা সংবাদ পাইয়াছি— মলুটী, সাঁওতাল পরগণায় "কৃষি-সমিতি-লিমিটেড্" প্রতিষ্ঠিত ও রেজেষ্টরীকৃত হইয়াছে। মূলধন ৫০ হাজার টাকা, ১০৲ টাকা সেয়ারের মূল্য। রেজিষ্টার্ড অফিস মাসেরা (বেঙ্গল) কেহ জানিতে ইচ্ছা করিলে, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মাসেরা, মলুটী পোষ্ট,

সাঁওতাল পরগণার ঠিকানায় লিখিবেন। এতদ্ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ নানা সৎগুণে ভূষিত, বঙ্গের অন্যতর কৃতী সন্তান। তাঁহার অদম্য চেষ্টায় এই কৃষি-সমিতির দ্বারা বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি। মূলধনের অভাবে এদেশের অনেক কার্য্য পণ্ড হইয়া যাইতেছে—আশা করি, এবার তাহা হইবে না, অত্যল্প কালের মধ্যেই এই "সমিতির" অংশ বিক্রয় হইয়া যাইবে।

(২৯)

পরম সুখের বিষয়, আফগান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি এবং শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। আমীর যে টাকা পাইতেন, তাহা বন্ধ হইয়াছে। নানা কারণে তাহা ভালই হইয়াছে। এত দিনে আফগান স্বাধীন হইল। এ সম্বন্ধে ১৫ই আগষ্টের মুসলমান পত্রে লিখিত হইয়াছে—"We think it was not honourable either for the British Government to give such subsidy or for the independent Kingdom of Afghanistan to accept it. It was more or less a sort of bribe and we are glad that it has been discontinued." ভারত-গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ভাল হইল কি ?

(৩০)

বাঙ্গালীর উন্নতি ভিন্ন ভারতের উন্নতি অসম্ভব, কেন না, বুদ্ধি এবং প্রতিভায় বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ। এই বাঙ্গালীর এখন ভারতের কোথাও স্থান নাই—ইহা ভাবিতেও প্রাণ অস্থির হয়। সামান্য সামান্য কাজের সংবাদ পাইলে সহস্র সহস্র উমেদার উপস্থিত হন, কিন্তু স্বাধীন বাণিজ্য, শিল্পোন্নতি এবং কৃষির উৎকর্ষ সাধনে কাহারও মন যায় না। গোলাম-গিরিতে বাঙ্গালীর মন দিন দিন মজিয়া যাইতেছে—বুঝি বা সেই জন্যই ঘোর দারিদ্র্যে বাঙ্গালী নিষ্পেষিত এবং কোথাও স্থান পাইতেছে না। বিধাতা বাঙ্গালীকে রক্ষা করুন।

(৩১)

বাঙ্গালীর লঘুচিত্ততা দলাদলিতে বিশেষ ভাবে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ইংলণ্ড স্বাধীন দেশ, পার্টি-লিডারদের দ্বারা সেখানকার উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু পরাধীন দেশের একতাই উন্নতির গূঢ় মন্ত্র। এখানে যে কথায় কথায় দলাদলি প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালী দিন দিন হেয় হইতেছে। এক মন্ত্র, এক তন্ত্র, এক লক্ষ্য, এক শক্তি লইয়া সকলের অগ্রসর হওয়া উচিত। পরস্পরের নিন্দা-প্রচারে বাঙ্গালীর লঘুচিত্ততাই প্রকাশ পাইতেছে। কে বড়, কে ছোট, ইহা বিচারের সময় নাই। "বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি"—এই মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, এক প্রাণে, এক জ্ঞানে, এক শক্তিতে সকলে মহা একতায় আবদ্ধ হউন, এদেশের দুঃখ দৈন্য ঘুচিয়া যাইবে।

পঞ্চ অবতারতত্ত্বের বৈজ্ঞানিকতা।*

মূর্ত্তি পূজার জন্য নব্য সভ্যজগতে আমরা অবজ্ঞাত। অনন্তের অনন্তত্ব, অসীমের অসীমত্ব যেন আমরা ধারণা করিতে পারি না, তাই মূর্ত্তিপূজা করি। যে মহান্ বিরাট জগতের স্রষ্টা ও রক্ষক, ক্ষুদ্র মূর্ত্তি তাহার কি অনুরূপ? পাশ্চাত্যজাতি ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া আমাদিগকে অর্দ্ধসভ্য ধরিয়া লইল। আমরা বৈদেশিক শিক্ষায় পণ্ডিত হইয়া, তাহাদের নূতন ঐন্দ্রজালিক মায়ায় মোহিত হইয়া একদিন বুঝিয়াছিলাম যে, আমরা অতি সামান্য, সত্যও বুঝিতে অক্ষম।

কেন? যে জগৎপূজ্য মহর্ষিগণ চিন্তা-রাজ্যের অত্যুচ্চ আসনে বিরাজিত ছিলেন, যাঁহাদের চিন্তার ছায়া মাত্র বিংশ শতাব্দীর মনীষিগণ কল্পনায় আনিতে পারেন না, সনাতন ধর্ম্মের সেই ঋষিগণ কেন এমন করিলেন, কৈ এ কথা ত আমরা একদিনও ভাবি না। আজ ইয়োরোপ নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ সাহায্যে জীবনের অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, সে কথা সত্য। কিন্তু তাহা ব্যতীত কি পথ নাই? দর্শন ও পরীক্ষা উত্তম, তাহার সহিত তোমার জ্ঞান মিলাও দেখি, দেখিবে, ঋষিগণ অসীম ধারণা বলে সূক্ষ্মতর বিষয় মীমাংসিত করিয়া আমাদের কি মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। ভালরূপ বোঝ, বুঝিবে, এখানে অজ্ঞতা, অক্ষমতা নাই, ভ্রান্তি সংশয় নাই, আছে জ্ঞানের গভীরতা, বিজ্ঞতার অভিব্যক্তি, সর্ব্বোপরি হৃদয়ের উদ্বেলিত ভক্তি।

* এই প্রবন্ধটীর জন্য অনেকাংশে বন্ধুবর শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কাছে আমি ঋণী।

প্রথম অনুযোগ, আমরা ঈশ্বরের নামে ইতর প্রাণীর পূজা করি, জড় নির্জ্জীব পদার্থের ধ্যান করি। বাস্তবিক মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি ইতর জন্তু আমাদের অবতার কেন? ঈশ্বর বলিয়া প্রপূজিত কেন? পাশ্চাত্য গবেষণার সহিত মিলাইয়া আমরা তাহার আলোচনা করিব।

মৎস্য।

প্রাণীজগতের অতি নিম্নস্তরে মৎস্যের স্থান। সেই মৎস্য কেমন করিয়া অবতার হইল, তাহা প্রথম আলোচ্য। আমরা প্রাণী-জগতের শ্রেষ্ঠ জীব হইতে নামিয়া ক্রমে ক্রমে মৎস্য পর্য্যন্ত এক শ্রেণীর জীব দেখিতে পাই। মানব হইতে আরম্ভ করিয়া মৎস্য পর্য্যন্ত সমস্তই এক শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। নর, বানর, মৃগ, বরাহ, সিংহ, ব্যাঘ্র, কুক্কুর, শৃগাল প্রভৃতির অস্থি মিলাইয়া দেখিলে একটী আশ্চর্য্য সমত্ব দেখিতে পাই। ইয়োরোপীয় বিবর্ত্তবাদ যদি সত্য বলিয়া মানা যায়, তবে মানুষ হইতে মৎস্য, অথবা মৎস্য হইতে মানুষ ক্রমে বিবর্ত্তিত হইয়াছে।

এইবার সৃষ্টির প্রথমাবস্থা লক্ষ্য করিতে হইবে, কল্পনা অনুমানাদির সাহায্য লইতে হইবে। কিরূপে জানি না, যখন জগৎ-প্রসবিতা সবিতা হইতে জ্বলন্ত বিন্দুর মত পুরাতন পৃথিবী খসিয়া পড়িল, তখনই প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা ক্রমে শীতল হইতে আরম্ভ করিল। সেই জ্বলন্ত পিণ্ড হইতে কোন্ পদার্থ জন্মিতে পারে? জ্বলন্ত পিণ্ড তেজস্থানীয় হইলে ত "তেজস আপঃ" তেজ হইতে জল, এই শ্রুতিবাক্য মিলিয়া

গেল। অথবা সেই জলন্ত পিণ্ড অপ্ শব্দেরই পর্য্যায় শব্দ। এই অপ্ জলপ্রধান তরল দ্রবীভাবময় সূক্ষ্ম পঞ্চভূত "অপএব সসর্জ্জাদৌ" ইত্যাদি। আর অপ্ শব্দে সাধারণতঃ জল বুঝিলে ত কথাই নাই। "যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্য" এই জল যে আদিসৃষ্টি, ইহা শাস্ত্রে অনেক স্থলেই উদাহৃত। জল আর তরল দ্রবীভাবময় জলপ্রধান সূক্ষ্ম পঞ্চীকৃত বা ত্রিবৃৎকৃত সূক্ষ্ম পঞ্চভূতই অপ্ শব্দে বোঝা যায়।

সৃষ্টির প্রথমে মহাপ্রলয়ের অবসানে এই বিশ্ব কেবল অনন্ত অসীম সলিলময় (অপ্), সেই অপ্ শব্দবাচ্য সলিলরাশির অভ্যন্তরে নিষ্ক্রিয় সৃষ্টিকার্য্যে অপ্রযুক্ত নির্গুণ চৈতন্য বিরাজমান। পুরাণেও দেখ, কারণার্ণবে নারায়ণ ভাসমান। যোগনিদ্রারূপা মায়াকে আপনাতে সংহৃত করিয়া সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম স্ব স্বরূপে অবস্থিত।

জল থাকিলেই তাহার নিম্নে মৃত্তিকা থাকিবে, জল থাকিলেই তাহাতে তরঙ্গ থাকিবে, ফেণা বুদ্বুদ দেখা দিবে। ক্রমে শুক্তি, শম্বুকাদি জলজন্তুই জন্মিতে আরম্ভ করিবে। শুক্তি, শম্বুক, মৎস্য প্রভৃতি বহুবিধ জলজন্তু থাকিতে মৎস্য আমাদের অবতার কেন? বৃহৎ রোহিত মৎস্য ঈশ্বরের প্রথম বিকাশরূপে উপাস্য হইল কেন? যে চৈতন্যে সকল প্রাণী চেতন, মৎস্যে সেই চৈতন্যের আদি বিকাশ কেন? অস্থি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, প্রাণী সকলের মধ্যে প্রথম জীব মৎস্য ব্যতীত অন্য কোন জীব হইতে পারে না। অস্থি সামঞ্জস্যের অনুসন্ধান করিলে বোঝা যায় যে, মৎস্যই ঈশ্বরের প্রথম রূপ।

ব্রহ্মই জীবরূপে বিবর্ত্তিত—ইহা বেদান্ত মত। জীবের মধ্যে মৎস্যই প্রথম। ব্রহ্মের প্রথম বিকাশই মৎস্য, তবে মৎস্যই ঈশ্বরের প্রথম বিকাশ হইল না?

জ্ঞান অর্থাৎ বিবেক বিকশিত, স্ফুটিত হইয়া মৎস্যকে ক্রমে মানবত্বের পদে পৌছাইয়া দিয়াছে। এই জ্ঞানে ব্রহ্ম নিশ্চলবৎ বেদ, বেদরূপী ঈশ্বর। "যং সত্যং তৎ ব্রহ্ম" ও সত্য যে মূর্ত্তিতে ক্রমে আমাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছে, সে মূর্ত্তি কি আমাদের কেহই নয়? সে মূর্ত্তির অবহেলা কি জানিয়া শুনিয়া আমরা করিতে পারি? ঋষিরা দ্রষ্টা ও জ্ঞানী। জ্ঞানে তাঁহারা ঈশ্বরকে প্রথম মৎস্যরূপেই দেখিলেন, সে সময়ে মানুষের সৃষ্টি হয় নাই, এজন্য প্রত্যক্ষভাবে অবশ্য তাঁহাদের দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না। এক্ষণে আবার দেখ, সেই মৎস্যরূপী ভগবান্ প্রলয়পয়োধিজলে মানবের অঙ্কুর স্থানীয়ই হইলেন। অতএব মৎস্যকে আমরা অবতার বলিয়া পূজা করি, এটা কি গভীর জ্ঞানের পরিচয় দেয় না?

আরও তত্ত্ব আছে, ভগবান্ কি করিয়া অঙ্কুর রক্ষা করিলেন, দেখা যাউক। ঋজু মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট প্রাণীদিগের অঙ্কুর জলে আবির্ভূত হইল, সেই অঙ্কুর হইতে ক্রমে উৎকৃষ্ট মানব জাতির সৃষ্টি হইল। এক্ষণে এই বীজের শত্রু কে? জলে এই বীজ নষ্ট করে কে? শম্বুক শঙ্খজাতীয় জীবই এই বীজ নষ্ট করিতে পারে। যদি বীজ নষ্ট হইল, তবে ক্রমে মানব সৃষ্টি হইবে কিরূপে? ভগবান্ জ্ঞানের রক্ষক, জ্ঞানময় বেদের প্রচার তাঁহার কার্য্য। মানবকে জ্ঞানী করিবার জন্য, তাহার বীজ অনন্ত সমুদ্রে না নষ্ট হয়, তাহার জন্য তিনি শত্রু সংহার করিলেন। মৎস্যাবতারে শঙ্খাসুর নিহত হইল। এই

নিধন গভীর মন্ত্রে গীত হইল। সাধারণে বুঝুক না বুঝুক, গভীর সূক্ষ্মতত্ত্বের এইরূপে জগতে প্রচার দেখা গেল। যখন সূক্ষ্ম জ্ঞান মানবের ধারণার অতীত বলিয়া বিবেচিত হইল, মানব যখন ক্রমে স্বরূপ হইতে বিচ্যুত প্রকৃতির অধীন যন্ত্ররূপে পরিণত হইয়া আসিল, তখনই ভক্তিবাদী হইয়া পড়িতে লাগিল। ভক্তি জ্ঞানকে যখন ছাড়াইয়া উঠিল, জ্ঞানবাদ অপেক্ষা ভক্তিবাদই জগদ্ব্যাপী সহজবোধে গ্রহণ করিল, তখন লোকে এই "কেন" ভুলিয়া গেল, সূক্ষ্মতত্ত্ব হইতে দূরে পড়িল, বিশ্বের একমাত্র কারণ ঈশ্বর—এই চরম শেষ সত্যকেই গ্রহণ করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। কবি গাহিলেন—

"কেশব ধৃত মৎস্য শরীর জয় জগদীশ হরে।"

কূর্ম্ম।

এইবার কূর্ম্মের কথা। জলময়ী পৃথিবী ক্রমে পুরাতন হইতে লাগিল। যে চৈতন্য-শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জলময় করিয়াছিল, সেই অনন্ত চৈতন্য শক্তির কার্য্য অশ্রান্তভাবে চলিতে থাকিল। জল হইতে কূর্ম্ম পৃষ্ঠাকার দ্বীপের উদ্ভব হইল। কি প্রকারে হইল, পরিচিত কালে যে প্রকারে প্রবাল দ্বীপের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই প্রকারেই জলজ প্রাণীর ধ্বংসাবশেষ ও তলস্থ মৃত্তিকা কূর্ম্ম পৃষ্ঠাকার দ্বীপ হইয়া থাকিবে। এক্ষণে জল ও স্থল দুইটী। বৃক্ষলতাসমাকীর্ণ শস্যরাশি পরিশোভিতা বর্ত্তমান পৃথ্বীর সহিত তুলনা হয় না। প্রথমাবস্থায় স্থলভাগ নদীগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া বালিদ্বীপের মত যে দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা কতকটা মনে করা যাইতে পারে। সে স্থলভাগ হয়তঃ জোয়ারে ডুবিয়া যাইত, ভাটায় আবার দেখা যাইত। এই জলে ও স্থলে কোন্ প্রাণী থাকিতে পারে? কূর্ম্মই স্থল ও জলচর, ইহা সকলেই জানেন। বিবর্ত্তনবাদীরা বলেন, মৎস্য হইতে কূর্ম্মই প্রথম বিবর্ত্তন। মৎস্যের চারিটী ডানা ক্রমে কঠিন হইয়া উঠিল, উহাই চারিটী পদ। অস্থিমালা একই রহিল।

এইবার কূর্ম্ম-পৃষ্ঠের কথাই বলিব। একটী জলন্ত বস্তু অগ্নি হইতে তুলিয়া রাখিয়া দাও, দেখিবে, ক্রমেই তাহা শীতল হইতে থাকিবে। উত্তপ্ত বস্তু হইতে উত্তাপ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। তাপবিকীর্ণকারী দ্রব্যমাত্রেই এইরূপে শীতল হইয়া থাকে। সূর্য্যের তাপ এক্ষণে যেরূপ আছে, বহু পূর্ব্বকালে তাহা অপেক্ষা যে অনেক উষ্ণ ছিল, তাহা সূক্ষ্মদর্শী কোন কোন মহাত্মা বলিয়া গিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রকারগণ এ কথার আভাস দিয়াছেন। সংজ্ঞা স্বীয় পতি সূর্য্যের অসহ্য উত্তাপ সহ্য করিতে পারে নাই। (সংজ্ঞা এ স্থলে জীবের সংজ্ঞা, ইহা কেহ কেহ বলেন) তখন বিশ্বকর্ম্মকৃৎ শাণ যন্ত্রে উত্তাপ কমাইয়া দিলেন। নব্য সূর্য্যের তেজ অপেক্ষা প্রাচীন সূর্য্যের তেজ যখন অধিক উষ্ণ, তখন প্রাচীন সূর্য্যের অসহ্য উত্তাপের জন্য মৎস্যগণ জলে ডুবিয়া জীবন রক্ষা করিয়া থাকিবে। জল তাপ বহন করিতে পারে না। সূর্য্যকরতপ্ত সলিল ফুটিতে থাকিলেও তাহার তলদেশের শীতলতা অব্যাহত থাকে, কাজেই মৎস্যের জীবনরক্ষার কোন ক্ষতি হয় না। কূর্ম্ম যখন জল হইতে স্থলে উঠিল, তখন তাহাকে সেই প্রচণ্ড সূর্য্যতাপ সহ্য করিতে হইবে, কাজেই তাহার উপযোগী আবরণ আবশ্যক। তাই কঠিন পৃষ্ঠ আবরণ। জীবদেহের মধ্যে এই পদার্থই অধিক উত্তাপ সহিতে পারে। যে উত্তাপে মৎস্য মজ্জা রক্ত বসা গলিয়া ছাই হইয়া যাইতে

পারে, অস্থির তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না। তাই অস্থিময় পৃষ্ঠ আবরণই প্রাচীন সূর্য্যের তেজ সহিবার উপযুক্ত বিবেচিত হইল। ভগবান্ জল হইতে স্থলে উঠিতেই এই আবরণ লইলেন।

এই সময়ে সমুদ্র মথিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে দৈব ও আসুর শক্তি মিলিয়া সমুদ্রকে আলোড়িত করিয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রথম সৃষ্টি জল (তরল দ্রবীভূত সূক্ষ্ম অপ্) প্রথমাবস্থায় পৃথিবী অনন্ত অসীম বারিরাশির সমষ্টিমাত্র। পৃথিবীর অগ্নিগর্ভের আন্দোলনে সেই বারি রাশি যে আলোড়িত হয় নাই, তাহা নহে; বরং অধিকতর বেগেই আলোড়িত হইয়া থাকিবে। মৎস্য অবতারে তাহা কথিত হয় নাই, কারণ সে সময়ে স্থলভাগ ছিল না। তখন জলের আন্দোলন তরঙ্গেই পর্য্যবসিত হইত। বিস্তৃত বারিধিবক্ষে আভ্যন্তরিক কারণ ব্যতীত নানা বাহ্য কারণেও তরঙ্গ উৎপাদিত হয়। তরঙ্গই মাত্র প্রবল আকার ধারণ করিত। আর সে তরঙ্গ ত প্রকাশ্যতঃ উৎকৃষ্টতর স্থলভাগের উৎপত্তির কারণ হয় নাই। দ্বিতীয় অবতারেই কূর্ম্মপৃষ্ঠ ভূভাগ জাগিয়া উঠিল, আভ্যন্তরিক অগ্নি উৎপাত সেই সময়ে তাহার উপর আলোড়িত সমুদ্রের বিক্ষিপ্ত তরঙ্গাঘাত আনিয়া দিল। স্থলভাগ আর পূর্ব্বের মত রহিল না। কোথাও অত্যুন্নত মহীধর, কোথাও গভীর হ্রদ, কোথাও বা সমতল ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়া ভূপৃষ্ঠ বিচিত্র আকার ধারণ করিল, নিম্নের মৃত্তিকা স্থানে স্থানে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পৃথিবীকে তরুলতাদির বাসোপযোগী করিল। তাই এই সমুদ্র-মন্থনই কূর্ম্ম অবতারের প্রধান ঘটনা বলিয়া বিবৃত আছে। জগৎসৃষ্টিতত্ত্ব যে ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতররূপে বর্ণিত হইতে পারে, তাহা বলিতে পারি না। সৃষ্টির সহিত হৃদয় মিলাইয়া বাহ্যের সহিত অভ্যন্তরকে এক করিয়া আর্য্যঋষিদের বিজ্ঞান যে বর্ত্তমান নব্য জড়বিজ্ঞানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

বরাহ।

স্থলভাগ নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। সমুদ্রমন্থনোদ্ভূতা কমলা বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইলেন। নানাপ্রকার ঔষধির দেবতা ধন্বন্তরি উঠিলেন। দৈবশক্তির অসম্ভাবিত উন্নতি অব্যাহতভাবে চলিতে লাগিল, দৈবশক্তি অমরত্ব লাভ করিল। বিশ্বকৃৎ শাণযন্ত্রে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সূর্য্যের তেজ কমাইয়া দিলেন। ক্রমে তৃণলতা বৃক্ষাদির বীজ উপ্ত হইল। জীব জগতে মহাশক্তি ফুটিয়া উঠিল। ভগবান্ তাহার কঠিন আবরণ নিষ্প্রয়োজন বোধে পরিত্যাগ করিলেন। এক্ষণে স্থলভাগ ব্যাপ্ত করিবার জন্য জলজন্তুর পক্ষ চতুষ্টয়—যাহা কূর্ম্মের পদরূপে জলে স্থলে ব্যবহৃত হইত, তাহা আর জলের মধ্যে আবশ্যক হইল না। তাই পদচতুষ্টয়ে ভগবান্ পল্বলচারী মহা বরাহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। বরাহের তীক্ষ্ণ দন্তই কোমল ভূপৃষ্ঠ খনন প্রভৃতি দ্বারা নানারূপে উদ্ভিদাদির জন্মিবার সহায়তা করিতে লাগিল। বরাহদন্ত লাঙ্গলের কার্য্য আরম্ভ করিল। অনন্ত সমুদ্রে ভগবান্ যে মহা অসুর বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহার বংশধরগণে পৃথ্বী পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। মহাবরাহের দন্তাঘাতে সেই অসুর বংশধরগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল, কতক অতল সমুদ্রতলে লুকায়িত রহিল। উন্নতির অসংখ্য অন্তরায় বিদূরিত হইয়া গেল। মৎস্যের পর কূর্ম্ম, কূর্ম্মের পর বরাহ, এইরূপে বিবর্ত্তন চলিতে লাগিল।

নৃসিংহ।

ক্রমে পৃথিবীতে সকল প্রকার উদ্ভিদই আবির্ভূত হইল। পৃথিবী নিবিড় অটবীপূর্ণ, পশু-সমাকীর্ণ হইয়া মানবের বাসোপযোগী হইল। ভগবানও উৎকৃষ্ট পশু সিংহের উপরার্দ্ধ, আর ভবিষ্যৎ উন্নত প্রাণীর নিম্নার্দ্ধ লইয়া অদ্ভুত নরপশু রূপ ধারণ করিলেন।

মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদিরূপের প্রাণী এখনও বর্ত্তমান, কিন্তু নরসিংহরূপের ত কোন অস্তিত্বই দেখিতে পাই না। তাহা হইলে কি বলিতে হইবে, এই মূর্ত্তি কল্পনা-প্রসূত? পৃথিবীর নানাস্থানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এমন নূতন অনেক প্রাণীরই অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে পৃথিবীতে যত প্রাণী ছিল, তাহার সকলগুলি তাহা নাই। এই নরসিংহ জীবকে সেইরূপ কোন লুপ্ত জীবের মধ্যেই ধরিতে পারি না কি? মানব বিজ্ঞানবিৎ ডারউইন্ বলেন যে, নর ও বানরের মধ্যে আর এক প্রকার জীব ছিল, যাহার অস্তিত্ব এক্ষণে নাই। অবশ্য নব্য মনীষিগণ অদম্য উৎসাহের সহিত এখনও অনুসন্ধান করিতেছেন, ফলে হয়তঃ সেই সূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে। সে জীব কি প্রকার হওয়া সম্ভব? এ জীব যদি বানর অপেক্ষা মানুষের নিকটবর্ত্তী হয়, তবে সে নিশ্চয়ই দ্বিপাদ হইবে, বুদ্ধিবিষয়ে মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে। উত্তরার্দ্ধ সিংহাকার, নিম্নার্দ্ধ মনুষ্যাকার, এইরূপ জীবই নর ও বানরের মধ্যবর্ত্তী বলা যাইতে পারে।

বামন।

অর্দ্ধ পশু ও অর্দ্ধ মানব দেহের পর ভগবান্ ক্ষুদ্র নর দেহে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। পৃথিবীর অতি নিম্নস্তরে যে নরকঙ্কাল প্রথম দৃষ্ট হয়, সেখানে তাহার আয়তন অতি ক্ষুদ্র। পরে স্তরে স্তরে দীর্ঘায়তন। ইহাতে কি ইহা প্রমাণিত হয় না যে, আদিম যুগে নরগণ হ্রস্বকায় ছিলেন। (বৈদিক ও উপনিষদকাল উপরোক্ত আদিমকাল নহে)। মেক্সিকো প্রদেশান্তর্গত অসভ্যদিগের দেশে বহুকালের রক্ষিত নরদেহ কঙ্কাল সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের সকলগুলিই বামনাকার। বর্ত্তমানে ঐ জাতি কিন্তু অতি দীর্ঘকায়। হ্রস্বাকার মানবগণের বংশধরগণ ক্রমেই দীর্ঘাকার হইয়াছে—তাই আমাদের ঋষিগণ ঐ হ্রস্বদেহ মানবকে ভগবানের প্রথম মানবাবতার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অতি হ্রস্বদেহ বলিয়া বামনদেব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হন নাই। বেদ-জ্ঞানই তাঁহার সাধন। তাঁহার জ্ঞানের নিকট অতি দর্পী বলিও মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জ্ঞানকে উৎকৃষ্ট স্থল অর্পণ করিয়া জ্ঞানলাভের আশায় পাতালে আশ্রয় লইল। এই প্রকারে ক্রমপরিবর্ত্তনে মানবের সৃষ্টি হইল।

পরশুরাম, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কল্কি ভবিষ্যদবতার, তৎসম্বন্ধে কিছু বলাও সহজ নহে। কাজেই এইখানেই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।

আসামী হিন্দুদিগের শ্রেণী-বিভাগ ও অসবর্ণ বিবাহ-পদ্ধতি।

প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা কামরূপ রাজ্যের যে অংশ এইক্ষণে আসাম নামে সুপরিচিত, তাহা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত।

১ম। পার্ব্বত্য প্রদেশ (Hill districts)

২য়। সুর্ম্মা উপত্যকা (Surma Valley)

৩য়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা (Brahmoputtra Valley)

(১) পার্ব্বত্য প্রদেশ—প্রধানতঃ খাসিয়া গারো, নাগা, আবর প্রভৃতি অনার্য্য জাতির বাস।

(২) সুর্ম্মা উপত্যকা—অর্থাৎ শ্রীহট্ট এবং কাছাড়, এই দুই জিলার হিন্দুগণের শ্রেণীবিভাগ এবং সামাজিক রীতিনীতি প্রায় সর্ব্বতোভাবেই বঙ্গদেশের সমতুল্য। তবে বিশেষত্ব এই যে, এই উপত্যকায় হিন্দুদিগের মধ্যে প্রধানতঃ বৈদ্য, কায়স্থ এবং সাহা, এই তিন বংশের মধ্যেই অসবর্ণ বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে। অর্থাৎ বৈদ্য ও কায়স্থ এবং কায়স্থ ও সাহাদিগের মধ্যে কন্যা আদান প্রদান হইতেছে। উচ্চশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণেরাই সেই সকল বিবাহ-ক্রিয়া করাইয়া আসিতেছেন এবং সন্তান-সন্ততি যথারীতি পৈত্রিক সম্পত্তিতে আইনতঃ অধিকারী হয়।

(৩) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাই এইক্ষণে প্রধানতঃ আসাম বলিয়া কথিত হয় এবং এই অঞ্চলের হিন্দুদিগের জাতি বা বংশ বিভাগই অনন্যসাধারণ বলিলেও চলে। এই প্রদেশেই উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ সমাজ ভিন্ন সকল সমাজেই অল্পাধিক পরিমাণে অসবর্ণ বিবাহ এবং বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। অনুলোম পদ্ধতি অনুসারে অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীস্থ কোনও পুরুষ তাহার নিম্নতর যে কোন শ্রেণীস্থ কন্যার পাণিগ্রহণ করুক না কেন, তাহাকে সেই কন্যাগত কুল প্রাপ্ত হইতে হয়। অর্থাৎ কলতা কি কায়স্থ বংশের ছেলে কৈবর্ত্ত বা কোঁচের কন্যা বিবাহ করিলে, এইরূপে বিবাহিত নব দম্পতিকে সেই কৈবর্ত্ত বা কোঁচের সমাজভুক্ত হইয়া থাকিতে হয় এবং সন্তান-সন্ততিও সেই বংশের উপাধি গ্রহণে পৈত্রিক সম্পত্তি ভোগ দখল করে। আর প্রতিলোম পদ্ধতি মতে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত উচ্চ বংশের কন্যা যদ্যপি নিম্নতর বংশের পুরুষ গ্রহণ করে, তবে তাহাদিগকে "বড়িয়া" (Boria) নামে এক অভিনব জাতিতে পরিণত করা হয়। এই "বড়িয়া" জাতি সমাজে জল-অনাচরণীয় হইলেও হিন্দু সমাজেরই অংশভূত বা অন্তর্গত।

বর্ত্তমান সময়ে যে সকল জাতি বা বংশ হিন্দু সমাজভুক্ত আছে, তাহাদিগকে বংশমর্য্যাদা অনুসারে ক্রমে নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণী বিভাগ করা হয়।

(১) ব্রাহ্মণ।—এই সকল উচ্চশ্রেণীস্থ সুব্রাহ্মণগণ প্রায় সমস্তই বৈদিক শ্রেণীস্থ। তবে হাড়ি, হীড়া, ডোম্ এবং যুগী জাতির ব্রাহ্মণ পতিত। সকল সমাজে তাহাদের জল চলে না। বিশেষতঃ যুগীই নিজে যুগীর ব্রাহ্মণ।

(২) কায়স্থ বা কাইথ।—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ইহারা বড়ুয়া প্রভৃতি নামে পরিচিত।

(৩) কলিতা বা কুল লুপ্তা।—এই অর্থে ইহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া অনেকে দাবী করে। পরশুরামের ভয়ে কুল গোপন করিয়া আসামের জঙ্গলে বাস করে। এই কলিতাদিগের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ আছে।

(৪) কেওট বা কৈবর্ত্ত।—এই জাতীয় হিন্দু বিহারেও আছে। ইহারাও চাষী কলিতা এবং জালীয়া কৈবর্ত্ত, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

(৫) কোঁচ বা রাজবংশী।—ইহাদিগের আদি পুরুষ এক হইলেও স্থানীয় দোষ গুণে বা সামাজিক অবস্থানুসারে ইহাদিগের মধ্যেও ছোট বড় এবং জলচল ও জল-অনাচরণীয়, এই দুই শ্রেণীর হিন্দু আছে।

(৬) নট বা নৃত্যকারী।—দেবালয়ে নৃত্য করা ইহাদিগের এক কার্য্য। ইহারাও কোন স্থানে কলিতা-শ্রেণীভুক্ত।

(৭) পটীয়া বা পাটীয়াল।—পাটী প্রস্তুত করাই প্রথমে এই জাতীয় লোকের প্রধান কার্য্য ছিল। বর্ত্তমান সময়েও শ্রীহট্ট এবং গোয়ালপাড়া জিলায় এই জাতীয় অনেক লোকে পাটী তৈয়ার করে। তাহারা অন্যত্র কৃষি কার্য্য করে।

(৮) কুমার।—মাটীর বাসনাদি প্রস্তুত করাই প্রথম অবস্থায় এই জাতির প্রধান কার্য্য ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় হিড়া জাতি এই কার্য্য করে। কুমারগণ কলিতাদিগের শ্রেণীভুক্ত হইতেছে।

(৯) শুঁড়ি বা সাহা।—পূর্ব্বে যাহারা মদ প্রস্তুত ও বিক্রয় করিত, তাহারাই সাউ শুঁড়ি বা সাহা শ্রেণীভুক্ত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহারা মদ প্রস্তুত বা বিক্রয় করে না এবং কৃষি ও বাণিজ্যাদি অন্য প্রকার ব্যবসা করিয়া থাকে। এজন্য ইহারা এইক্ষণে নবশাখের মধ্যে ভুক্ত। শ্রীহট্ট অঞ্চলে এই সাহাদিগের সহিত কায়স্থদিগেরও বিবাহ হইতেছে।

(১০) ডোম বা নদীয়াল।—আসামে যাহারা নদীতে মৎস্য ধরে ও বিক্রয় করে, তাহাদিগকে প্রধানতঃ নদীয়াল বলে। তবে কোন কোন স্থানে ইহারা ডোম বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু বঙ্গদেশাদির ন্যায় মেথরের বা ঝাড়ুবরদারের কার্য্য ইহারা করে না এবং পূর্ব্ব হইতে যে কারণেই ডোম নামে পরিচিত হউক না কেন, এই ক্ষণে এই হীনার্থক নামের পরিবর্ত্তে নদীয়াল নামে সেন্‌সাস রিপোর্ট ভুক্ত হইয়াছে।

(১১) হাড়ী বা বৃত্তিয়াল। পূর্ব্বে হাড়ী নামে পরিচিত থাকিলেও গত ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে আদম সুমারী হইতে ইহারা বৃত্তিয়াল বা সোণার বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয় এবং অনেকেই স্বর্ণকারের কার্য্য করে।

(১২) চঁড়াল বা চণ্ডাল।—ইহারাই কোন কোন স্থলে আবার হাড়ী নামে পরিচিত। হাড়িরা মাটীর বাসন প্রস্তুত করে। হীড়া, চণ্ডাল এবং নমঃশূদ্র, এই তিন জাতি বা সমাজ, কোন কোন বিষয়ে স্বতন্ত্র হইলেও ইহাদিগের মধ্যে পরস্পর কন্যা আদান প্রদান হইতেছে। এই দ্বাদশ জাতিই প্রধানতঃ আসামে হিন্দু-সমাজভুক্ত।

(১৩) যুগী।—উপরোক্ত দ্বাদশ জাতি ভিন্ন যুগী জাতিও আসামে লক্ষাধিক। অনেক স্থলেই পদস্থ এবং হিন্দু সমাজেরই অংশভুক্ত। সুর্ম্মাভেলিতে এবং গোয়ালপাড়া জিলা মধ্যেও ইহাদিগের মধ্যে কতক লোক

সাধকপ্রবর গোরক্ষনাথের বংশধর বলিয়া নিজকে নাথ নামে পরিচয় দিতেছেন। তবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অনেকেই যুগী কাটানি নামে পরিচিত। এই জাতির স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ নাই, নিজ জাতির লোকেই ব্রাহ্মণের কার্য্য করে এবং যুগীর বামুন বলিয়া পরিচিত। ইহাদের জল চলে না এবং অন্যান্য হিন্দুদিগের মধ্যে ইহাদিগের অসবর্ণ পদ্ধতি মতেও বিবাহ হইতে দেখা যায় না।

(১৪) বড়ীয়া।—উপরে যে বড়ীয়া নামক শঙ্কর জাতির কথা বলা হইয়াছে, তাহাদিগের ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায়, ব্রাহ্মণদিগের কন্যা বিশেষতঃ বিধবা মেয়ে অপর কোনও হিন্দু জাতির সহিত যুক্ত হইলে, সেই স্ত্রী পুরুষ এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি "বড়ীয়া" নামে অভিহিত হইত। কিন্তু এইক্ষণে প্রতিলোম পদ্ধতি মধ্যে বিবাহ বা যে কোন ভাবে স্ত্রী-পুরুষের যোগ হইলে তাহারা সকলেই ঐ 'বড়ীয়া' সমাজভুক্ত হইয়া হিন্দু সমাজের মধ্যেই থাকে। তবে, ইহাদিগের জল বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা ব্যবহার করেন না, এবং তাঁহারা ইহাদিগের ক্রিয়া কর্ম্মও করেন না। এই জাতীয় লোকের সংখ্যাও এইক্ষণে সাড়ে একুশ হাজারেরও কিছু অধিক।

(১৫) আহোম।—ইহারা অনার্য্য শান (শ্যাম) জাতির বংশধর হইলেও এইক্ষণে আসামে ইহারা হিন্দুসমাজভুক্ত। ইহাদিগের জনসংখ্যাও প্রায় দুই লক্ষ। ইহাদিগের মধ্যে শাক্ত এবং বৈষ্ণব, এই দুই শ্রেণীর লোকই আছে। বৈষ্ণবদিগের গুরু এবং শাক্তদিগের ব্রাহ্মণ আছে। ইহাদিগের মধ্যে অনুলোম এবং প্রতিলোম, এই উভয়বিধ অসবর্ণ বিবাহই চলিত আছে।

(১৬) স্মরণীয়া।—অনার্য্য বা অহিন্দু রাভা ও কাছাড়ি জাতির মধ্যে যে সকল লোক মদ এবং কুক্কুট ও শূকরের মাংসাদি খাওয়া ছাড়িয়া দিয়া শূকর স্মরণ লয়, তাহারাই প্রথমে স্মরণীয়া তৎপরে কোঁচ বা রাজবংশী জাতিতে উঠিয়া থাকে এবং এতদ্রূপে হিন্দুসমাজভুক্ত হইতেছে। ইহাদিগের মধ্যেও অসবর্ণ বিবাহ অবাধে চলিত।

আসামের প্রাচীন অধিবাসীদিগের মধ্যে ধোপা, নাপিত, চামার, মুচি প্রভৃতি জাতি নাই।

শ্রীআনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত।

পৃথ্বীরাজ। (শেষ)

২। এ দেশের দুর্গতির দ্বিতীয় কারণ, জাতিভেদ ও নিম্নশ্রেণীর প্রতি অবিচার।

"অসংখ্য মানবে
অবজ্ঞায়, ঔদাসীন্যে কে রাখিল হেন
পঙ্গু-মূক-জড়প্রায়, বাঁধি জ্ঞান সীমা
মুষ্টিমেয় নর মাঝে ?" (২৮৩ পৃঃ)

ইহা যে জাতীয় অবনতির এক বিশিষ্ট কারণ এবং আমাদের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ যে শত্রুরা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কবি দূতের মুখে দিয়াছেন,

"বলে সবে হিন্দু মোরা, কিন্তু পরস্পর
জাতি-ধর্ম্ম-দ্বেষে, নিত্য, রত বিসংবাদে,
নাহি সখ্য, নাহি প্রেম।" (২৩ পৃঃ)

মহম্মদ ঘোরীর আশাও ঐ খানে। মুসলমানের দিকে,

"হ'ক দীন, হ'ক দাস, তবু মুসলমান
জানে রাজা মন্ত্রী হ'তে নাহি তার ভেদ।"
(১১৪ পৃঃ)

"বীর্য্য, বুদ্ধি নীচ জনে মস্‌লিম সমাজে
করে উচ্চ ; আত্মাদরে দৃপ্ত তাই তারা।"
(১১৫ পৃঃ)

কিন্তু হিন্দুর দশা কি ?

"অন্ত্যজ অস্পৃশ্য জাতি যারা হিন্দুস্থানে,
শুনিয়াছি মনস্তাপে জর্জ্জরিত তারা।"

(২২২ পৃঃ)

পুনশ্চ,

"উচ্চবর্ণ জন কত মাত্র হিন্দুস্থানে,
অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, শূদ্র শুনি অগণন।
দেহের প্রত্যঙ্গ যদি সবল না রয়
সে দেহ বলিষ্ঠ দৃঢ় কখন (ও) কি হয় ?
পঙ্গু জড়প্রায় রাখি' অসংখ্য মানবে
কেমনে সমাজ বপু হবে বলবান ?''

(১১৪ পৃঃ)

"হিন্দুর যে নীচ, রহি' নীচ চিরদিন,
হতমান, স্বল্পায়াসে হইবে অধীন।"

(১১৫ পৃঃ)

অগস্ত্যও বলিতেছেন,—

"উপেক্ষিত, অশিক্ষিত হীনবর্ণ হেথা,
পরিণাম, হিতাহিত পারে না বুঝিতে ;
হারাইয়া জাতিগত মর্য্যাদা, সম্মান,
আছে কাষ্ঠলোষ্ট্রবৎ।" (২৮২ পৃঃ)

ইহার এক বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে। এই ভারতে কুকুরের যে অধিকার, মানুষের তা নাই। "কুকুর ভোজন নহে দূষ্য, দূষ্য নর শিশুর ভোজন'' (২৭২ পৃঃ)—রাস্তায় কুকুর হাঁটিলে দোষ নাই, মানুষ হাঁটিতে পাইবে না। কিন্তু জাতিভেদের নিগূঢ় কৌশলে নীচকে আপনার নীচতা বুঝিতে দেয় না। এই যে নীচ আপনার নীচতাকেও স্বভাব মনে করিয়া সন্তুষ্ট আছে, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অমঙ্গলকর। যার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই, তাকে উঠান কি সহজ কথা ? মেথরকে আবর্জ্জনা ফেলিতে বলিলে সে বলিবে, "হামকোই ধাঙ্গড় হ্যায়", ধাঙ্গড়কে পায়খানার পাশের আবর্জ্জনা সরাইতে বলিলে, সে বলিবে, "হামকোই মেথর হ্যায়"। যত নীচেই কেন থাকি না, তাহারই মধ্যে গৌরব অনুভব করিবার একটা মোহ জাতিভেদ উৎপাদন করিয়া দিয়াছে। "লাঞ্ছিত দলিত এই নীচ জাতি যারা" তাহাদের এই মোহ ভাঙ্গা চাই, নতুবা দেশের উদ্ধার নাই। রাজনৈতিক আন্দোলন যতই সত্য আকার ধরিতেছে, ততই আমরা বুঝিতেছি কোটী কোটী লোককে নীচ রাখিয়া দেশ উঠিতে পারে না। সংস্কারকগণের ধর্ম্মবুদ্ধির কথা যাঁরা উড়াইয়া দিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদিগকে বিষয় বুদ্ধির দ্বারস্থ হইতে হইতেছে, এবং আমরা যে দগ্ধপ্রাণ জাতি, তাহাও প্রমাণিত হইতেছে ! এই মোহান্ধ কোটী কোটীকে উঠাইতে হইলে, কেবল শিক্ষাবিস্তারের ধূয়া ধরিয়া বসিয়া থাকিলে হইবে না, কিন্তু উপর হইতে চাপ তুলিয়া লইতে হইবে। সামুরায়গণ যেমন আপনা হইতেই স্বত্ব ছাড়িয়া দিয়া নীচকে ধরিয়া তুলিয়া জাপানকে রক্ষা করিয়াছেন, যদি ভারতের উচ্চবর্ণ যুগযুগান্তের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, তত্তুল্য মহনীয় আত্মত্যাগ দেখাইতে পারেন, তবেই দেশের কল্যাণ—দেশবাসীর দেশভক্তির পরিচয়—যুগযুগান্তের মহাপাতক এই প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা করিতেছে,

"সর্ব্বজীবে, আত্মরূপে বিরাজিত যিনি
দেখ ভাবি, কি বেদনা লাগে তাঁর প্রাণে,
হেন বৃথা জাতি দর্পে, নির্ম্মম আচারে।
দর্পহারী তিনি, বৎস ! মহা গদা তাঁর,
হয় ত কখন আসি পড়িবে সহসা
চূর্ণিতে দর্পীরে, বংশ পরম্পরা ক্রমে।"

কত বংশ চলিয়া গিয়াছে, ঐ গদা দর্পীর মস্তক চূর্ণ করিতেছে, তবুও দর্প চূর্ণ হইল কৈ ? হায়রে মোহ ! এক জন মনস্বী বলিয়াছেন যে, এ দেশে সমাজ-সংস্কারকের কার্য্য,

'The removal of disabilities of sex and birth'. কবি দেখাইলেন যে, রাজনৈতিক সংস্কারকেরও দৃষ্টি প্রধানভাবে এ দিকে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

৩। দেশের অবনতির তৃতীয় কারণ ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিদ্বেষ—হিন্দু মুসলমানের বিদ্বেষের কথা হইতেছে না। হিন্দুতে হিন্দুতে, হিন্দুতে বৌদ্ধে বিবাদও এখনকার হিন্দু মুসলমানের বিবাদের অপেক্ষা দেশের মঙ্গলের পথে কম অন্তরায় হয় নাই। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ ধর্ম্মের আদর্শ ছাড়া উচ্চতর সার্ব্বদেশিক কোন আদর্শ না থাকায় দেশের বিপদ বলিয়া কোন বিপদের ধারণাই দেশবাসীর ছিল না। সুতরাং একজনের বিপদে আর সকলের সহানুভূতির উদ্রেক না হইয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থতারই সুযোগ বলিয়া মনে হইত। বহিঃশত্রুরা কি ইহার সন্ধান জানিত না? ঘোরী বলিতেছেন,

"হিন্দু বৌদ্ধ মাঝে আছে তীব্র দ্বেষানল
হিন্দু না রক্ষিবে তারে।" (১১৩ পৃঃ)

ভুপাচার্য্যের শিষ্য মুসলমানের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্য পাটলীপুত্ররাজকে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে যোগ দিতে বলায়, রাজা উত্তর করিলেন,

"বৃথা এ প্রয়াস। ভুলি নাই মোরা,
অহিংসক বৌদ্ধ প্রতি যত অত্যাচার
করিয়াছে হিন্দুগণ।...তবে লজ্জাহীন হায়,
বৌদ্ধের সাহায্য হিন্দু চাহে কোন্ মুখে?"
(২৩৬ পৃঃ)

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবিদ্বেষের উপরে উঠিবার জন্য যে সমগ্র দেশের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা, তাহার উন্মেষ মাত্র নাই। তাই হিন্দুতে হিন্দুতে বিবাদেও রক্তারক্তির অভাব হইত না। এই দেখুন,

"ব্রহ্মকুণ্ড স্নানে করি অগ্রে অধিকার,
শ্রেষ্ঠ কেবা হরি, হর উভয়ের মাঝে,
এই লয়ে বিসম্বাদ।
পরাজিত হ'ল ক্রমে বৈষ্ণবের দল;
শৈবগণ, মহা হর্ষে, বিঁধিয়া ত্রিশূলে
নরমুণ্ড, নাচে অই 'হর হর' রবে।"
(২৬৯ পৃঃ)

এ দেশের লোকের সমস্ত ভারত-জোড়া দেশবুদ্ধি কোন কালেই ছিল না। তাহাতে আবার ধর্ম্মসমাজ-বিমুখ একমাত্র কতকগুলি আচারে আবদ্ধ হওয়ায় উচ্চতর কিছুই ছিল না, যাহাতে মানুষ ধর্ম্মবিদ্বেষের উপর উঠিতে পারে। সকল ধর্ম্মের লোককে একত্রিত করিয়া উপাসনার মধ্য দিয়া সকলকে একত্রিত করিবার চেষ্টা রামমোহনের পূর্ব্বে আর কেহ করে নাই। ধর্ম্মবিদ্বেষের উপরে উঠিবার ঐ একমাত্র পথ—উহাই দেশেরও একমাত্র কল্যাণের পথ।

৪। সমস্ত দেশ খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হওয়ায় দেশবাসীর একত্ববোধ কখনও জন্মে নাই। পঞ্জাবের সঙ্গে বাঙ্গালার—আর্য্যাবর্ত্তের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের কোনও যোগ ছিল না। যোগ হয় আহারে—বিবাহে; জাতিভেদ সে পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সকলেই স্ব স্ব প্রধান—একের বিপদে অন্যের সহানুভূতি নাই। জোর করিয়া এক জনকে বশীভূত না করিলে, সম্মিলনের অন্য সুযোগ ছিল না। সুতরাং রাজসূয় অশ্বমেধে পরস্পরের মধ্যে কেবল বিদ্বেষেরই বৃদ্ধি পাইত, কোনরূপ যোগ স্থাপিত হইত না। মাগধী পাঞ্জাবীকে বলে—

"বসে যদি তুর্কবাজ দিল্লী সিংহাসনে
কি ক্ষতি মোদের তাহে? সমান উভয়,
পার্থক্য না হেরি মোরা তুয়ারে, তুরুকে।"
(২৩৭ পৃঃ)

দক্ষিণী বলিবে,—

"জাতিগর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তবাসী
অবজ্ঞা উপেক্ষা করে দাক্ষিণাত্য জনে;
কিষ্কিন্ধ্যানিবাসী বলি' করে উপহাস;
হয় যদি নিগৃহীত তুরুকের করে
কি ক্ষতি মোদের তাহে? ভাঙ্গুক গরব।"
(২৪১ পৃঃ)

আর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ—কুল গৌরবের উত্তাপ—ইহাই কি পরিণামে পতনের মূল কারণ হইল না? সে উত্তাপে, কবির উপদেশ,—

"ভ্রাতৃভেদে কভু কার(ও) হয় নাই হিত,
উভয়ে পাইবে ধ্বংস, জানিও নিশ্চিত।"
(৭১ পৃঃ)

অথবা,

"স্বদেশ, স্বধর্ম্ম বাঞ্ছা থাকে রক্ষিবার
এক পন্থা প্রেম, নাহি অন্য পন্থা আর।"
(৭৩ পৃঃ)

কোথায় উঠিয়া যায়! এই যে পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বনাশকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা—উচ্চতর কোন আদর্শ না থাকায় এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার একতায় মিলিয়া যাইবার কোন আয়োজনই ছিল না, যেমন ইংরাজ ফরাসীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজ একতায় মিলিয়া গিয়াছে। ইহাই ভারতের রাষ্ট্রশক্তিকে নির্ম্মূল করিয়াছে।

"আছে রাজপুত জাতি বটে বীর্য্যবান,
সম্মিলিত হ'লে তা'রা অজেয় সমরে;
কিন্তু গ্রামে, গ্রামে তা'রা রাজা জনে জনে;
সবে সার্ব্বভৌম, হবে মিলন কেমনে?"
(১১৫ পৃঃ)

এ বিষ কি ভীষণ বিষ। আমার ইহকাল পরকাল যাক্‌, আমি মরি তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু চৌহানের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেই হইবে—ইহাই কি জয়চন্দ্রকে ঘোরীর সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয় নাই? শুনুন,

"বুঝিতেছি ধর্ম্ম, দেশে করি দ্রোহাচার
ইহকাল পরকাল ঘুচিল আমার।
তথাপি প্রতিজ্ঞা মোর করিব পালন;
চূর্ণিব চৌহানে, শেষে, ত্যজিব জীবন।"
(২৬২ পৃঃ)

কবি পৃথ্বীরাজকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াও এই বিষ হইতে নির্ম্মুক্ত করিতে পারেন নাই, ইহাতে কবির দোষ নাই। করিলে যে ইতিহাসই অন্য আকার ধারণ করে। ইতিহাস ত উল্টান যায় না। কাব্যের ও ইতিহাসের উহাই Crisis। এইখানে পৃথ্বীরাজও হারিয়া গিয়াছেন,—চৌহান গৌরব আর কিছুর নিকটে খর্ব্ব হইতে পারে না—কেন না,

"সমগ্র চৌহানকুল চেয়ে আছে মোর পানে।"
(১২৫ পৃঃ)

অথবা,

"ঘোষিবে রাঠোরগণ করি মোরে উপহাস,
অনুগ্রহপ্রার্থী আমি হইয়াছি প্রাণভয়ে
কেমনে এ অপবাদ স'ব দিল্লীপতি হয়ে?"
(১২৬ পৃঃ)

একজন ভাবিতেছেন, রাঠোর-গৌরব অপহরণের প্রতিশোধ দিতেই হইবে, নষ্ট রাঠোর গৌরব উদ্ধার করিতেই হইবে, তা যে করেই হোক, আর একজন ভাবিতেছেন, চৌহানের গৌরব-পতাকা উড্ডীন রাখিতেই হইবে। ভারত-গৌরব কাহারও মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে নাই। অন্য দিকে সাধারণের মনের ভাব,—

"পিতৃপিতামহ হ'তে শুনিতেছি মোরা,
যে হ'ক সে হ'ক রাজা আমরা কৃষক
সকলের ভক্ষ্য। মোরা কি জানি যুদ্ধের?
নহি রাজপুত, নাহি অস্ত্রের অভ্যাস।"
(২৩৪ পৃঃ)

আর রাজপুত নিজের কুলগৌরব লইয়াই

ব্যস্ত, জনে জনে সার্ব্বভৌম হইবার জন্য প্রয়াসী। সমগ্র দেশের কথা ভাবিবার কাহারও অবসর নাই। এ জাতি কেন পতিত, তাহার কি আর উত্তর খুঁজিতে হয়? আজ যে ইংরাজ আপনার গর্ব্বিত মস্তক ফরাসী সেনাপতির চরণতলে নত করিতে সমর্থ হইল, তাহা কোন্ শক্তির বলে? ইংরাজও ত বলিতে পারিত, 'কেমনে এ অপবাদ স'ব দিল্লীপতি হয়ে?' জার্ম্মাণ-রাঠোরগণ যে উপহাস করিবে, তাও ইংরাজের জানা ছিল, এবং ইংরাজকে সে উপহাসের বিষয়ীভূত হইতেও হইয়াছে। ব্যঙ্গ-চিত্র (cartoon) যাঁহারা অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা জানেন "রাঠোর"গণ তীব্র উপহাসই করিয়াছে। কিন্তু ইংরাজ সেজন্য অভিমান করিয়া ঘরে ফিরিয়া যায় নাই! টেঁপী পিসি কি বলিবে, এই ভয় লইয়া জগতে কোন কাজই হয় নাই। এমন কিছু পাইতে হইবে, যাহার জোরে এ সব অগ্রাহ্য করা চলে। ইংরাজ ও ফরাসী এমন কিছু পাইয়াছে, যার কাছে আজ তারা আপনাদের জাতীয় গর্ব্বকে বলি দিতে পারে। ভারতের রাষ্ট্র জীবনে কোন দিনই এমন আদর্শ প্রকাশিত হয় নাই, যাহার কাছে খণ্ড রাজ্যগুলি আপনাদের মস্তক অবনত করিতে পারে। সমগ্র দেশবুদ্ধিই কখনও জাগে নাই, অন্য কোন উচ্চ আদর্শ ত দূরের কথা। ইহাই ভারত-ইতিহাসের সার্ব্বকালীন tragedy. ভারত-ইতিহাসের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, যখনই কোন বিদেশী হাত বাড়াইয়াছে, তখনই কোন দিনই 'ঘরভেদী বিভীষণ'এর অভাব হয় নাই যে, নিজের সামান্য স্বার্থের জন্য দেশকে বিদেশীর হাতে সঁপিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছে। মহম্মদ ঘোরীও জানিতেন,

"চিরদিন এই রীতি শুনিতেছি আমি,
যখন(ই) বিদেশী কেহ প্রবেশে ভারতে,
স্বদেশ,—স্বধর্ম্মদ্রোহী হিন্দু কোন জন
আসি, পক্ষ লয় তার।" (৩৪ পৃঃ)

ইহার কারণ এই যে, ব্যক্তিত্বের উপরে উঠিয়া সকলের ব্যক্তিগত স্বার্থকে একীভূত করিবার মত উচ্চতর 'কিছু'র অনুসন্ধান দেশ পায় নাই। হয় ব্যক্তিগত স্বার্থ, না হয় একেবারে সংসার ত্যাগ—এই দুইএর মধ্যখানে আর কিছু নাই। তাই দেশদ্রোহীর প্রতি তীব্র ঘৃণাও আমাদের হয় নাই। নতুবা কি একজন দেশদ্রোহীকে কাব্যের নায়ক করিয়া দুই শতাব্দী ধরিয়া কাব্য-সুধা পান করিতে পারিতাম? অন্য কোন জাতি পারে নাই। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবেই কেবল সে কাব্য পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। ইংরাজ রাজ্য সেই দিনই বিধাতার বিধান বলিয়া গৃহীত হইবে, যে দিন দেশবুদ্ধি ভারতবাসীর অন্তরে সত্য আকার ধারণ করিবে। নতুবা তাহাও বৃথা।

৫। সাধারণ নৈতিক অবস্থার যে বিবরণ কবি ঐতিহাসিক প্রমাণসহ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে, অন্তঃসারশূন্য হইয়াছিল বলিয়াই আর দেশ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে নাই। সে আপনার ভারেই পড়িয়া যাইত, বাহিরের আঘাত উপলক্ষ মাত্র। সে কথার পুনরাবৃত্তি মানসিক ধৈর্য্যকে কোন কোন ক্ষেত্রে পরাস্ত করিতে না পারিলেও কাহারই রুচিকর হইবে না। এক কথায়,

"ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্যে, গুপ্ত, ব্যক্ত ব্যভিচারে
সারশূন্য হইয়াছে আর্য্যসুতগণ।" (২৮১ পৃঃ)
"প্রতি রাজগৃহে জলে সপত্নী বিদ্বেষ,
ভ্রাতৃভেদ, পিতৃদ্রোহ।" (২৮৩ পৃঃ)

"মিটাইতে ভোগতৃষা এক পুরুষের
শত পত্নী, উপপত্নী নিয়োজিত তথা।
(২৮২ পৃঃ)
বিমাতা সোদরা সুতা স্নুষা কুটুম্বিনী
পায় নাই রক্ষা তাহে।" (২৭৯ পৃঃ)

কেবল কি রাজগৃহে? না,—
"মহামাত্র, সভাসদ্‌, রাজকর্ম্মচারী,
কি ভাবে যাপিছে দিন। ভাবে তা'রা মনে,
অনাথার, দরিদ্রার, সতীত্ব রতন
মূল্যহীন, বাক্য মাত্রে লভ্য তাহাদের।"
(২৮০ পৃঃ)

হায়! নারীর কি অধঃপতন—
"যে দেশে জানকী
আদরে লইলা শিরে বনবাস ক্লেশ
পরিতৃপ্তা পতিপ্রেমে; ঠে'ললা চরণে
লঙ্কার ঐশ্বর্য্য; সে দেশে এখন
পত্নী পতিপ্রাণহন্ত্রী!" (৪ পৃঃ)

প্রমাণ?—
"বীরেন্দ্র দাহির,
স্বদেশ—ধর্ম্ম তরে বিসর্জ্জিলা প্রাণ;
তাঁর পত্নী লাদি জয়ী কাসিমের পদে
অর্পিলা সতীত্ব রত্ন। উচাগড় রাণী
ঘোরীর কুহকে ভুলি', বধিলা পতিরে।"
(২৮২ পৃঃ)

সাধারণ জনমণ্ডলীর অবস্থা কি? সঙ্ঘারাম দেখুন—
"বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ,
গুপ্তসিদ্ধি তরে, অই বসেছে বিরলে
চণ্ডাল কুমারী লয়ে।" (২৭৬ পৃঃ)
"অদূরে তা'দের অই, চক্র বিরচিয়া
ভৈরব ভৈরবীদল বসেছে গোপনে।"
(২৭৭ পৃঃ)

দেবালয়ে একি দৃশ্য!
"সমাপ্ত আরতি; নিবিল আলোক।
দর্শক পূজক আর নর্ত্তকীর দল
জোড়ে জোড়ে, অন্ধকারে মিলাইল
কোথা।" (২৭৫ পৃঃ)

আর প্রয়োজন নাই। ইহারই ফলে ভারতের পতন বা ইহাই মুখ্য পতন। কেন না,
"পুণ্যে স্থিতি পাপে ধ্বংস বিধি বিধাতার।
জাতিগত কর্ম্মফল পাপপুণ্যময়
হইবে ভুঞ্জিতে তায় না হবে অন্যথা।"
(২৮৪ পৃঃ)

কিন্তু এখন কথা এই যে, ভারতের পতন কি কেবল তার দুর্ম্মতি দুষ্কৃতির ফল, না আমাদের সুকৃতি (?)ও সে জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী? ধীর ও নিবিষ্টচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, আমরা ভারতীয় সভ্যতা-বৃক্ষের যেগুলিকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল মনে করি, আমাদের রাষ্ট্রীয় অধঃপতনের মূলে সেগুলিও বিশেষভাবে রহিয়াছে, "যুগ যুগাবধি যে পাতক যে প্রমাদ হয়েছে সঞ্চিত এ ভারতে" কেবল তাহারই ফলে হিন্দুর সাম্রাজ্য শত খণ্ড হয়ে পড়ে নাই। একজন ব্রাহ্মপ্রচারক বোম্বাই অঞ্চলে প্রচারে গিয়াছিলেন। এক বক্তৃতায় তুলনায় হিন্দুর আধ্যাত্মিক আদর্শের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করায় খ্রীষ্টীয় মিশনারীর তাহা অসহ্য হইল। তিনি বলিলেন, "তুলনায় দেখা যায়, আমার ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। আমার ধর্ম্ম আমাকে এই বিশাল সাম্রাজ্য দিয়াছে, তোমার ধর্ম্ম তোমার জন্য কি করিয়াছে?" প্রচারক পশ্চাৎপদ হইবার লোক নহেন। তিনি উত্তর দিলেন, "এই সাম্রাজ্য আমার ধর্ম্মেরই দান! আমার ধর্ম্ম আমাকে সংসারটা নিতান্তই অবহেলার চক্ষে দেখিতে শিখাইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতা তোমাদেরই মত সংসারমুখীন হইলে আর এত বড় সাম্রাজ্য

লাভ করিতে হইত না। মিশনারী আর প্রত্যুত্তর করিলেন না, কেন না, তাঁহার কিছু বলিবার ছিল না।

১। আমাদের সভ্যতার একটা গৌরবের জিনিষ, "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"। এ তত্ত্ব এমন করিয়া আর কোথাও ফুটে নাই। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিচয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ইহাকে সোজা সরল রেখায় বর্দ্ধিত হইতে দিয়া আমরা নিজের নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিয়াছি। মানব-জীবনের বৃত্তিনিচয় এমন এক তারে বাঁধা যে, একটাকে অতিরিক্ত বর্দ্ধিত হইতে দিলে আর সকলের অনিষ্ট হয়। রাজা রামমোহন রায় আমাদের রাষ্ট্রীয় অবনতির যে দুইটী মূল কারণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার একটী জাতিভেদ, যাহার কুফল ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টী, 'অহিংসাকে ধর্ম্ম বলিয়া মানা।' যে শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'মা হিংসাৎ সর্ব্বভূতানি' তিনিই তো ব্যবস্থা দিয়াছেন, 'যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ" বা "আত্মানমেব সততং গোপায়ীত"। আত্মরক্ষা ধর্ম্ম। সুতরাং আত্মরক্ষার্থ নরহত্যা হিংসা নয়, ইহাই বেদের মীমাংসা। ইহাই তো সাধারণ স্মৃতিরও সিদ্ধান্ত। Homicide মাত্রই murder নয়। উদ্দেশ্যকে আদবে আমল না দিয়া হত্যা মাত্রই হিংসা, এই কুপরামর্শে অহিংসা পরম ধর্ম্ম আমাদের পক্ষে কুধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। দেশ শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও বৌদ্ধ জৈন বৈষ্ণব অস্ত্র ধরিবে না, তাহা হিংসা। গৃহে ডাকাত পড়িলে স্ত্রীপুত্রপরিবারের প্রাণরক্ষা করিতে পারিবে না, ব্যাঘ্রের আক্রমণেও নিরুপায়। তাই তো দাঙ্গার সময় ভীমকায় মাড়োয়ারী যোল বছরের মুসলমান বালকের আক্রমণে ভূলুণ্ঠিত। প্রাণীমাত্রেরই সনাতন ধর্ম্ম আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ, অনভ্যস্ত ও অপারগ। "ধর্ম্মঃ যো বাধতে ধর্ম্মঃ ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ।" তাই অহিংসা আমাদের কুধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। এই অহিংসা ধর্ম্ম কত হাস্যকর আচার উৎপন্ন করিয়াছে। রাত্রিতে আহার করিব না, পাছে অন্ধকারে কোন কীট নষ্ট হয়। বস্ত্রখণ্ডে মুখ সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখ, কোন কীট মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া বিনষ্ট না হয়। এই পরম ধর্ম্মের একটী ভাবাত্মক দিক জীবে দয়া, গোল আলু সিমের বীচি পর্য্যন্ত। এই জীবে দয়া কোন কোন স্থানে রীতিমত Fanaticismএ পরিণত হইয়াছে। যেমন পিঞ্জরাপোল। স্থানে স্থানে এমনই বিকৃত আকার পাইয়াছে যে, যুগপৎ হাস্য ও অশ্রুর উদ্রেক হয়। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অতি নিষ্ঠার সঙ্গে বানর ও কুকুরকে রুটী খাওয়ান হইতেছে, মানুষ হাত পাতলেই লগুড়াঘাত। জীবে দয়ার জীবের মধ্যে গোল আলু পড়িয়াছে কিন্তু মানুষ পড়ে নাই। ইহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না যে, পশ্চিমাঞ্চলে জৈনধর্ম্ম ও এতদঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্ম ও তদ্ধর্ম্মের বিকৃতির পরিণাম বৈষ্ণবধর্ম্ম এই বিকৃত পরম ধর্ম্মের নামে মানুষকে সনাতন মানব ধর্ম্ম হইতে দূরে লইয়া গিয়া মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত করিয়াছে। যুদ্ধের সম্ভাবনায় ভীতিগ্রস্ত বৌদ্ধকে তিরস্কার করিয়া যে রাজপুত বলিতেছে—

"তোমাদের উপদেশে গেল যশঃ মান,
কাপুরুষ হ'ল যত ভারত-সন্তান।
অহিংসা—অহিংসা এই প্রচারি ধরম
পুরুষেরে করিয়াছ নারীর অধম।"
(৫৪ পৃঃ)

"পাপ বৌদ্ধ ধর্ম্ম যদি না হ'ত প্রচার
ভারতে প্রবেশে হেন শক্তি হ'ত কার?"
(৫৬ পৃঃ)

ইহার মধ্যে যে একেবারেই কোন সত্য নাই, ইতিহাসে যাঁহার সম্যগ্ দর্শন আছে, তিনি সে কথা বলিবেন বলিয়া মনে হয় না। *

২। এই স্থানে আমাদের রাজনৈতিক উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ আর একটী গুণের উল্লেখ করিতে হইবে। আজ হেগ কন্‌ভেন্‌সনে বিবদমান জাতি সকলের জন্য যে সকল নীতির কেবলমাত্র পত্তন হইয়াছে, আমাদের দেশে আবহমানকাল তাহা ক্ষাত্রধর্ম্মরূপে পালিত হইয়া আসিতেছে। পরাজিত দেশকে মারিয়া ধরিয়া জ্বালাইয়া পুড়াইয়া সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা নীতিবিরুদ্ধ বিবেচিত হইত। পরাজিত দেশকে নিজের নীতিধর্ম্ম ও শাসন প্রণালী দিয়া নিজের সঙ্গে এক করিয়া না লইলে রাষ্ট্রের Consolidation অসম্ভব। তাই আমাদের আট ঘাট বাঁধিয়া সাম্রাজ্যের পত্তন হয় নাই। রাজ্যসমূহ বিচ্ছিন্নভাবেই ছিল, কাহারও বিপদে কেহ সাহায্য করে নাই। একপ্রাণ হইয়া দেশ কি কখনও শত্রুর প্রতিরোধ করিয়াছে? একপ্রাণ হইবার গোড়াপত্তন যে এক রাষ্ট্রীয়তা, তাহা আমাদের এই নীতি গড়িয়া উঠিতে দেয় নাই। আমাদের এই ধর্ম্ম "গুণ হয়ে দোষ হ'ল বিদ্যার বিদ্যায়" এর মত হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে Civil population এর অধিকার সম্বন্ধে আজকাল কত কথা শুনা যায়। আমাদের দেশে কিন্তু দুই দলে যুদ্ধ হইতেছে, আর কৃষকেরা অদূরে নির্ব্বিবাদে চাষ-বাস করিতেছে, ইহার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ভীত, পলায়িত, আহত শত্রুকে আঘাত করিতে নাই, তাহাকে আততায়ী জানিয়াও ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাই তো পৃথ্বীরাজ আহত ঘোরীর অনুচরকে বলিলেন,—

"লয়ে যাও ঘোরী বীরবরে,
যদিও অরাতি তিনি, তথাপি বিক্রমে তার
তুষ্ট মোরা হয়েছি অন্তরে।" (২০২ পৃঃ)

ইহাই বোধ হয় পৃথ্বীরাজ সম্বন্ধে টডের "a lofty and blind arrogance of Rajput character." যাহা হউক, শত্রুর শেষ রাখিতে নাই, এই নীতি অবলম্বন করিলে বোধ হয় আর এই বিপদ ঘটিত না। প্রতিপক্ষ যে নীতি ধরিয়া চলেন, সেই নীতি অবলম্বন না করিলে তার সঙ্গে আঁটিয়া উঠা যাইবে কেন? অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। জার্ম্মাণী প্রতি পদেই হেগ কন্‌ভেন্‌সন ভঙ্গ করিতেছে; উপদেশে প্রতিবাদে কোন ফল হইল না। শত্রু তরবারি উত্তোলন করিয়া আমায় আক্রমণ করিতেছে, আমি যদি, এক গালে চড় মারিলে আর এক গাল ফিরাইয়া দাও, এই নীতি লইয়া বসিয়া থাকি, তবে আমার বিনাশ অনিবার্য্য। তাই মিত্রপক্ষ 'যার শিল তার নোড়া তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া' এই ন্যায় অবলম্বন করিয়াছেন। কুকুরকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া বৃথা। সে তা বুঝে না। সে যা বুঝে, তাকে তাই দিতে হয়—সেটা চাবুক। জার্ম্মাণি কাজেই এখন সোজা হইয়াছেন। আমাদের কর্ম্মজীবনের মাপকাঠি কোথায়? উচ্চতম আদর্শ

* আমরা ইতিপূর্ব্বেও বলিয়াছি, কবি অপক্ষপাতে সকলের দোষ গুণ বিচার করিয়াছেন, সকলের প্রাপ্য সকলকে দিয়াছেন। বৌদ্ধেরও যে দাবী আছে, তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন,—

অপবাদে, নির্য্যাতনে রহিয়া অটল
কত তত্ত্ব প্রচারিছে বৌদ্ধ ভিক্ষুদল।
দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, শাস্ত্রে, সদাচারে
বৌদ্ধের অঙ্গুলি চিহ্ন পাবে দেখিবারে। (৫৭পৃঃ)

ইহার প্রতি বর্ণই যে সত্য, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

ও নিম্নতম প্রকাশ, ইহার গড় (average)ই সেই মাপকাঠি। ৯৮২ যে শরীরের স্বাভাবিক তাপ, তাহাও যে একটা গড় মাত্র। হেগেল এই গড়কে নিতান্ত fixed ভাবে ধরিয়াই গোলে পড়িয়াছেন। এই Standardকে fixed নয়, moving ধরিতে হইবে। আজ যেখানে আছে কাল সেখানে থাকিবে, তা নয়—এই গড়ের আদর্শ নীচকে টানিয়া উপরে তুলিবে, উপরকে আকাশে উড়িয়া যাইতে দিবে না। এই গড়ই প্রকট ব্রহ্ম—ইহাই কর্ম্মজীবনের ভারকেন্দ্র, ইহা ভুলিলে চলিবে না। কিন্তু ইহা moving centre. ইহা ভুলিলেই সমাজ অচলায়তন হইয়া উঠিবে। আদর্শ যতই আয়ত্ত হইবে, ততই তাহা উচ্চ হইতে উচ্চতর হইবে—ততই এই গড়ের সীমানাও উপরে উঠিবে—Centre of Gravity পরিবর্ত্তিত হইবে। এই পরিবর্ত্তন স্বীকারই সমাজ জীবনের Safety valve. যা হউক, এই গড়কে কর্ম্মজীবনে গ্রহণ না করিয়া আমাদের ক্ষাত্রনীতি রাষ্ট্র জীবনকে পোক্ত হইতে দেয় নাই। হইতে পারে যে, এক দিন আমাদেরই এই ক্ষাত্রনীতি ঐ গড় বলিয়া গৃহীত হইবে—তখন হয় ত এই উনবিংশ বিংশ শতাব্দী অসভ্য (Savage) বলিয়া উপেক্ষিত হইবে। তখন হয় ত আমাদিগকে শাস্ত্র খুঁজিয়া দেখাইতে হইবে যে, পঞ্চবিংশ শতাব্দী এমন বেশী কি করিয়াছে—বিংশ শতাব্দীতে কি Hague Convention ছিল না? আমরাও ত বলি, বিংশ শতাব্দী ত ভারী কিছু করিয়াছে! ও Aeroplane (পুষ্পকরথ) আমাদের পৌরাণিক যুগেই ছিল!

৩। আমরা আমাদের দর্শনশাস্ত্রের বড়ই গরিমা করিয়া থাকি। গরিমার স্থান নাই তা বলিতেছি না। কৈবল্য-প্রয়াসী অঙ্গলবাসী আত্মার পক্ষে আমাদের দর্শনের মীমাংসা ও অন্তর্দৃষ্টির বোধ হয় আর কোথায়ও তুলনা নাই। কিন্তু চৌকষ মানুষ গড়িবার পক্ষে তাহার খুব উপযোগিতা আছে বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ আমাদের জাতীয় জীবনে তাহার ফল রাষ্ট্রক্ষেত্রে উন্নতির সহায়তা করিতে পারে নাই, বরং বিপরীত ফলই ফলাইয়াছে। তুঙ্গাচার্য্যের শিষ্য ধর্ম্মক্ষেত্র প্রয়াগে সম্মিলিত সাধুগণকে মুসলমানের আসন্ন আক্রমণের সংবাদ দিয়া সাহায্যপ্রার্থী হইলে একজন সাধু বলিলেন,—

"কে ভারতমাতা? কারে উদ্ধারিবে
তুমি কহিছ সবায়?" (২৩৮ পৃঃ)

Salvation Armyর লোকেরা প্রথম প্রথম Londonএর East Endএ কুলিদের মধ্যে প্রচার করিতে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "What do you know of Christ?" তাহারা মনে করিল, ইহারা বুঝি কোন অজ্ঞাতনামা কুলির খোঁজে আসিয়াছেন। তখন এক জন প্রতি-প্রশ্ন করিল, "What number?" সাধুর প্রশ্নটাও সেই জাতীয়! ব্যাপারখানা কি জানিতে পারিয়া এক সাধু উত্তর করিলেন—

"মায়াবিজৃম্ভিত বিশ্ব; কেবা রাজা, প্রজা?
কেবা জেতা, কেবা জিত? অভিন্ন উভয়।
মোহ বশে মাত্র নর করে ভেদ জ্ঞান,
দ্বৈত অদ্বৈতের মাঝে, জয়, পরাজয়,
অসত্য অনিত্য এই জগতের মাঝে
তুল্য দুই। (২৩৯ পৃঃ)

জগৎটা মায়াবিজৃম্ভিত, মিথ্যা। এই যদি উচ্চতম জ্ঞানের মীমাংসা হয়, তবে তা লইয়া মানুষ কতকাল উৎসাহের সঙ্গে কার্য্যক্ষেত্রে থাকিতে পারে? আমাদের অদ্বৈতবাদাত্মক

দর্শন শুভাশুভ ও লাভালাভের ভেদরেখাকে এমনতর ক্ষীণ করিয়া দিয়াছে যে, মানুষ যাহার উপর দাঁড়াইয়া এ সংসারে লড়াই করিবে, সে ভূমিটুকু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দেশের জল মাটির গুণে বা দোষে কেবল আমাদের জীবনের গতি নয়, দর্শনেরও গতি ঐ অ-কর্ম্ম যোগের দিকেই। সুতরাং গীতার কর্ম্মযোগ পক্ষীর ব্যাখ্যা আমাদের বড় উপকারে আইসে নাই।

৪। আমরা আমাদের আধ্যাত্মিকতার জন্য যথার্থ গৌরবই করিয়া থাকি। কিন্তু সে আধ্যাত্মিকতার মধ্যেও গলদ আছে, যাহার ফলে আমরা সকল গৌরবভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইয়াছি। আমাদের আধ্যাত্মিকতা সন্ন্যাসমুখী। এ আধ্যাত্মিকতা জীবনের সকল অংশকে স্পর্শ করিয়া লোহা ছুঁইয়া সোণা করিয়া দেয় না। ইহা মানবজীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করে না—সমাজকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার প্রয়াস পায় না। বরং সমাজ-বিমুখ হইয়া সর্ব্বপ্রকার সামাজিক মঙ্গলামঙ্গলে উদাসীন হয়; সুতরাং তাহা দ্বারা কেবলই কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। তাই, আর এক সাধু বলিলেন,—

"মোরা সংসারবিরাগী—
সন্ন্যাসী সম্বন্ধহীন পৃথিবীর সনে;
কি ক্ষতি মোদের যদি আসে তুর্ক সেনা?
নাহি আমাদের গৃহ, নাহি ধন, ভূমি,
কি লইবে তারা?
রাজ্য, ধন, দারা, পুত্র, অনিত্য সকল,
ধর্ম্ম মাত্র নিত্য; ত্যজি' পূজা পাঠ, যোগ
বিসর্জ্জিব নিত্য কি সে অনিত্যের তরে?"

(২৩৮ পৃঃ)

এই যে ধর্ম্মকে সমগ্র জীবন হইতে খসাইয়া ঠাকুর ঘরে আবদ্ধ করা—এই যে সংসার ও ধর্ম্মের বিরোধ—ইহারই মধ্যে আমাদের অবনতির বীজ নিহিত রহিয়াছে। সংসারে বন্ধন, মুক্তি সর্ব্বত্যাগে, সন্ন্যাসে। সাংসারিক শুভাশুভ-নিরপেক্ষ ব্যক্তিগত মোক্ষ জীবনের আদর্শ হওয়ায়, যাহারা সন্ন্যাসী হইয়া সে পথ ধরিতে পারিল না, তাহারা আপনাদিগকে স্বাভাবিকভাবেই পতিত মনে করিত। সেই জন্য দেশের লোকের কাছে কোন উচ্চনীতির কথা বলিতে গেলে বলিবে, ও সব সংসারে থেকে হয় না। কোনরূপে পুলীশ বাঁচিয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই হইল। ইহাই সাংসারিক মানুষের আদর্শ। তাই সংসার দেখিয়া কেহ আমাদের আধ্যাত্মিকতার পরিমাণ করিতে গেলে ভুল হইবে। কেন না, বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া কাব্য, পুরাণ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই দেখা যাইবে যে, ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা ও তাহার পূর্ণতার চেষ্টা অন্য কোন জাতি অপেক্ষা আমাদের কম নয়। তবে আমরা সংসারে সকলের পশ্চাতে পড়িয়া গেলাম কেন? যে হেতু, আমরা সংসারে থাকি সংসারের উন্নতির জন্য নয়, রক্ত মাংসের টানে। ছোট বড় সকলেরই মনের ভাব সংসারটা কিছু নয়। যা কিছু নয়, তার জন্য কে খাটে? অথচ সংসারে বড় হইতে হইলে খাটিতে হইবে। কিছু করিতে হইলেই ত্যাগস্বীকার চাই। কিন্তু ত্যাগই যদি করিব, রক্ত মাংসের টানই যদি অতিক্রম করিব, তবে সংসারে থাকিব কেন? রক্ত মাংসের টান অতিক্রম করিতে পারিলে তো সংসার বন্ধন হইতেই মুক্ত হইতে পারি; তবে আবার নূতন করিয়া বন্ধন গড়িব কেন?

"শুন নাই কভু
বদ্ধমূল কর্ম্ম? হয়ে মুক্তিমার্গগামী
লব কি বন্ধন বৃথা কর্ম্ম অনুষ্ঠানে।"

(২৩৮ পৃঃ)

সুতরাং কবি যে আক্ষেপ করিয়াছেন,—

"বৃথা পাঠ, বৃথা পূজা, বৃথা জপ, ধ্যান,
মানব, মানব হিতে উদাসীন যদি।
... ... থাকে ধর্ম্ম যদি
পূজা পাঠে, আছে ধর্ম্ম রণে প্রাণদানে
স্বদেশ, স্বজাতি তরে। বিধির আদেশে
করে কর্ম্ম নর, তবে, কোন্ কর্ম্ম হীন ?"

(২৩৯ পৃঃ)

এই যে কর্ম্মযোগের আদর্শ, ইহা ধর্ম্মগুরুদের মধ্যে এক রাজা রামমোহন রায় ছাড়া আর কেহ জীবনে গ্রহণ করেন নাই। আর কেহ যদি স্বীকার করিয়া থাকেন, তবে তাহা কেবল (by sufferance) যেন নিম্নাধিকারীর প্রবোধের জন্য! রামমোহনই কর্ম্মকে কেবল ধর্ম্ম নয়, মোক্ষধর্ম্মের সাধন রূপে জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহাতেই জীবনপাত করিয়াছিলেন। রামমোহনের লোকশ্রেয়ঃ রূপ সনাতন ধর্ম্ম আদর্শে ও কাজে অনুসৃত হইবার জন্য দেশের কাছে অপেক্ষা করিতেছে। সন্ন্যাসমুখীন আধ্যাত্মিকতা পরীক্ষিত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। রামমোহনের আদর্শ গ্রহণ করা ছাড়া দেশের উদ্ধার নাই।

এখন আমাদের শেষ কথা, কবির শেষ প্রার্থনা,—

"যাও পৃথ্বীরাজ, যাও সংযুক্তা সুন্দরী!
... ...
আসিও আবার কিন্তু মিলিয়া উভয়ে,
রাজ রাজেশ্বর, রাজ রাজেশ্বরী রূপে,
এই কার্য্যভূমি মাঝে ... ... ভারত-সন্তান
লভে যেন জাতি ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে,
সুখ, শান্তি উভয়ের রাজছত্রতলে।"

(৩৪৩ পৃঃ)

আমাদের বিশ্বাস, কবির এই প্রার্থনা ঠিক এই ভাবে পূর্ণ হইবার নয়। ভারতে যদি স্বরাজ ফিরিয়া আসে, তবে কি তাহা আবার প্রাচীন তন্ত্রের রাজছত্রতলে আশ্রয় পাইবে? জগতের গতি ঠিক সে দিকে নয়। ইহার বিপদ এই যে, পৃথ্বীরাজ আসিলে জয়চন্দ্রও আসিবেন। রামচন্দ্র আসিলে রাবণ আসে, যুধিষ্ঠির আসিলে দুর্য্যোধনও আসে—লঙ্কাকাণ্ড হয়, কুরুক্ষেত্র গজাইয়া উঠে। আমরা কিন্তু তা চাই না। রাজারাণীরূপে পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে খাটে তুলিয়া রাখিলে কি হইবে? আমরা পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে ঘরে ঘরে দেখিতে চাই। বাস্তবিক যে যুগে ভারত আবার উঠিবে, সে যুগে এ রাজা, এ প্রজা নয়—কি সকলেই রাজা, সকলেই প্রজা—সকলেই রাণী, সকলেই সেবিকা। কেবল রাণী সুভদ্রাকে শিবিরে শিবিরে আহতের সেবা করিলে চলিবে না, রাণী সংযুক্তাকে আহতের সেবার জন্য গলার হার খুলিয়া দিলে চলিবে না। কেন না, সে যুগে,

"সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকেই আমরা পরের তরে।"

(আলো ও ছায়া)

কিন্তু সে যুগ আসিবে কি? কবি আমাদিগকে সে আশা দিয়াছেন। পাঠকদিগকে সেই আশার সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিয়া আমরা বিদায় লইতেছি—একটীমাত্র কথা এই যে, এখানে হিন্দুজাতি বলিতে কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়কে না বুঝিয়া হিন্দুস্থানের সকল জাতির সম্মিলনোৎপন্ন হিন্দুজাতি মনে করিবেন। পাঠক মহাশয় ভুলিবেন না যে, আমেরিকায় হিন্দুস্থানবাসী মুসলমানও হিন্দু পর্য্যায়ভুক্ত। এখানেও রামমোহনের মহাসমন্বয়বার্ত্তা মনে পড়িতেছে—কবির এই আশার বাণী শুনিয়া ভারত এসিয়াখণ্ডে

জ্ঞান ও সভ্যতা বিস্তারের কেন্দ্র হইবে, রাজার এই আশার কথাই স্মৃতিপথে পতিত হইতেছে—

"বিধির বিধানে বলে নব হিন্দুজাতি,
উদার স্বধর্ম্ম-প্রেমী স্বদেশবৎসল,
নবোৎসাহে দীপ্ত, নব মন্ত্রে সুদীক্ষিত,
হবে হেথা সমুদ্ভূত। সে জাতির মাঝে
ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, রণবীর কত
জন্মিবে আবার ; পুনঃ শৌর্য্যে, জ্ঞানে, প্রেমে
বিভাসিত বৈজয়ন্তী উড়িবে গৌরবে
হিমাচল শিরে। সেই বৈজয়ন্তী তলে
পৃথিবীর কত জাতি নত হ'বে আসি'
ভক্তি শ্রদ্ধাবশে। দীর্ঘ ত্রিযামার শেষে
সূচীভেদ্য তম এই করি নিরাকৃত
উদিবে তরুণ রবি ভারত-আকাশে।"

(৩৮৫ পৃঃ)

তথাস্তু ওঁম্।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

স্বর্গীয়া নগেন্দ্রবালা

সদ্য-অশ্রুজলে লেখনী সিক্ত করিয়া যে লোকান্তরিতার জীবন-কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি জোয়ান অব আর্কের মত বীরাঙ্গনা ছিলেন না, ব্রাউনিং-পত্নীর কবি-প্রতিভা তাঁহাতে ছিল না, কুমারী নাইটিঙ্গেলের বিশ্বসেবাব্রতের সাধনা তিনি করিয়া যান নাই। মধ্যবিত্ত বঙ্গগৃহে তাঁহার জীবনের আরম্ভ,বিকাশ ও পরিণতি। তাঁহার জন্য ইতিহাস রচিত হইবে না, শোকসভা আহূত হইবে না, স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে না। কবি গ্রে বড় দুঃখেই গাহিয়াছিলেন,—

"Full many a flower is born to blush unseen
And waste it's sweetness in the desert air."

কত না জীবন-কুসুম লোক-লোচনের অন্তরালে ফুটিয়া সৌরভ বিলাইয়া ঝরিয়া গিয়াছে, কে তাহার সন্ধান রাখিয়াছে ? নগেন্দ্রবালার জীবনও একটী ক্ষুদ্র বন-মল্লিকার মত ফুটিয়া অকালে ঝরিয়া গেল ! রহিয়া গেল তাহার সৌরভ-স্মৃতি। উহা কে গণনার মধ্যে আনিবে ? যিনি অনন্ত লোকপ্রবাহের হরণ-পূরণের হিসাব রাখিতেছেন, তিনি বুঝি একটী বৃহৎ পৃষ্ঠা সেই অখ্যাত অজ্ঞাত জীবনের জন্য স্নেহ দীপ্ত করিয়াই রাখিলেন ! নগেন্দ্রবালার শ্বশুরালয় ঢাকা জেলায় বিখ্যাত মালখানগর গ্রামে। পিত্রালয় বরিশালের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বানরিপাড়া গ্রামে। এই উভয় পরিবারই এখন রীতিমত কলিকাতায় বসবাস করিতেছেন। নগেন্দ্রবালার পিতা শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা মহাশয় পোষ্ট-আফিসের একজন সুদক্ষ অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। ভ্রাতা কলিকাতা জেনারেল পোষ্ট-আফিসের একটী উচ্চপদে নিযুক্ত। শ্বশুর পরলোকগত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয় একজন তালুকদার ছিলেন। স্বামী স্বর্গীয় বিলাসচন্দ্র বসু মহাশয় নিজগুণে সে অঞ্চলে সর্ব্বত্র সম্মানিত ছিলেন। এ সম্মানে নগেন্দ্রবালার ভাগ বড় অল্প নহে। পত্নীর প্রভাব পতির চরিত্রে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইত। নগেন্দ্রবালার ব্যক্তিত্বের এমন একটা প্রভাব ছিল, যাহা উজ্জ্বল, কিন্তু প্রখর নয় ; বাহিরে পদাঙ্ক অঙ্কিত করিয়া দেয় না, অন্তরের অন্তরে

ছাপ রাখিয়া যায়। সে যে কি, যিনিই নগেন্দ্রবালার সহিত মিশিয়াছেন, তিনিই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন। এই লেখক তাহার সংস্পর্শে আসিয়া ধন্য হইয়াছে। তাই তাহার উদ্বেলিত কৃতজ্ঞতা আজ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণাছলে সেই পরলোক-বর্ত্তিনীর উদ্দেশে প্রীতি-তর্পণে উদ্যত হইয়াছে। হে স্বর্গবাসিনি, তুমি তাহা গ্রহণ কর।

এই মৃত্যুতে কোন পরিবার অনাথ হয় নাই, কেহ বিপত্নীক হয় নাই, অপোগণ্ড শিশু মাতৃহীন হয় নাই; তথাপি নগেন্দ্রবালার বিয়োগে আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের মধ্যেই যেন একটা হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। কেন?—নগেন্দ্রবালার ব্যক্তিত্ব ইহার উত্তর দিবে। তাঁহার অভাব কখনও পূর্ণ হইবে না। ঊর্দ্ধ হইতে তাঁহার স্বভাবের সৌরভ এ বাণী বহিয়া আনিতেছে।

নগেন্দ্রবালার মধ্যে নারীত্বের এমন একটী বিকাশ হইয়াছিল, যাহা সর্ব্বত্র দুর্লভ। পূর্ণাঙ্গ না-ই বা হোক, উহা সংসার-দাবদগ্ধের একটী সুশীতল ছায়া!—স্নেহে ঢল ঢল, করুণায় কোমল! উহা পরের দুঃখে কাঁদে, পরের সুখে আনন্দ পায়। রোগে, শোকে, বিপদে, বিপাকে ব্যথিতকে একেবারে আপনার করিয়া লয়। রোগীর শয্যাপার্শ্বে নগেন্দ্রবালা আহার নিদ্রা ভুলিয়া বসিয়া থাকিতেন। ধৈর্য্যশীল সমবেদনায় রোগীর সেবা করিতেন। যেন ঠিক একজন সুশিক্ষিতা ধাত্রী! চিরকাল এই ব্যবসাই করিয়াছেন!

নগেন্দ্রবালা তাঁহার স্বল্প-পরিসর জীবনে অনেক ক্লেশ পাইয়াছেন, কিন্তু কাহাকেও তাহা জানিতে দেন নাই। একাকিনী গোপন মর্ম্মের ভার বহিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি চিরদিন দুঃখকে উড়াইয়া দিয়াছেন; সুখকে কদাপি বিশ্বাস করেন নাই। নগেন্দ্রবালার চরিত্রে আত্মসংযমের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল; আত্মত্যাগ-সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি যাহা করিতেন, মনে হইত, কেবল কর্ত্তব্য ভাবিয়াই করিতেছেন।—এমনই নির্লিপ্ত ভাবে তিনি কাজ করিয়া যাইতেন। তিনি সুগৃহিণী ছিলেন; কিন্তু সে কেবল পরের বেলায়; তিনি নিজের জন্য কিছু গুছাইতে জানিতেন না—যাহা হাতের কাছে মিলে, তাহাই সম্ভোগ কর! দু'দিনের জীবন!—ভোগের এ মায়াবাদ নগেন্দ্রবালাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি চিরকাল পরের জন্য খাটিয়া গিয়াছেন; যশের আশায় নয়, প্রতিদানের লোভে নয়, কেবল আত্মতৃপ্তির জন্য। তাঁহার জীবনের মন্ত্র ছিল,—

"ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে"

নগেন্দ্রবালা তরুণ বয়সেই স্বামীসৌভাগ্যে বঞ্চিত হন। এ দুর্দ্দিনে মূর্ত্তিমতী শোক ও ধৈর্য্যের প্রতিমা দুই নগেন্দ্রবালাকে একাধারে দেখিয়াছি। সে গোপন অথচ ভীষণ হৃদয়-সংগ্রাম আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কর্ত্তব্য শোককে জয় করিয়াছিল। শিশু পুত্র-কন্যা তাঁহারই মুখ চাহিয়া আছে, শুধু ইহা ভাবিয়াই নগেন্দ্রবালা আত্ম-সম্বরণ করেন নাই, মৃতপ্রায় শ্বশ্রূব ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সান্ত্বনার ভারও তিনি লইয়াছিলেন।

নগেন্দ্রবালা স্নেহ করুণার নির্ঝর, কিন্তু কর্ত্তব্যে পাষাণ। এমন মণিকাঞ্চন সংযোগ, শুভে সুষমায় গলাগলি, অতি অল্পই দেখিয়াছি। নগেন্দ্রবালা মনস্বিনী, কিন্তু তাঁহার

ক্ষুরধার বুদ্ধি কখনও হৃদয়-ধর্ম্মকে অতিক্রম করে নাই। নগেন্দ্রবালা তেজস্বিনী, কিন্তু তাঁহার তেজ কোনও ক্রমে নারীত্বের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে নাই। নগেন্দ্রবালার চরিত্রে সত্যনিষ্ঠা বড় প্রবল ছিল। তিনি অন্যায় দেখিলে কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহিতেন না। স্পষ্টবাদে তিনি চিরাভ্যস্ত। কিন্তু উহার মধ্যে এমনই একটা ইন্দ্রজাল ছিল, যাহা অন্তরের অন্তরে গিয়া আঘাত করিত! অন্যায়কারীকে বেদনা দিবার জন্য নহে, অন্যায়কে ব্যথিত করিতে। এমনি করিয়া তিনি তাঁহার প্রিয়জনকে গভীর পতন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি অভিমান জানিতেন না, কঠোর বচন, উচ্চকণ্ঠ তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। দাস দাসীকেও তিনি কোন দিন তিরস্কারে বিদ্ধ করেন নাই। কেহ তাঁহাকে কোন অবস্থায় ক্রোধের বশীভূত হইতে দেখে নাই। অথচ জীবনে তিনি অন্যায়ের প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই একটী মৃদু হাস্য লাগিয়া থাকিত। অতি দুঃখেও, অতি সুখেও। সেই মৃদুহাস্য যে দেখিয়াছে, বোধ হয় ভুলিতে পারিবে না! উহার কি একটা আকর্ষণী ছিল!—তারল্য নাই, অথচ সারল্যমণ্ডিত; অর্থহীন কিন্তু গভীর—গম্ভীর! তাপীর উহা সান্ত্বনা; পাপীর উহা আঁধারে আলো। মৃত্যুকালেও নগেন্দ্রবালার হিম অধরে সেই মৃদু হাস্যরেখা অঙ্কিত দেখা গিয়াছিল।

নগেন্দ্রবালা যাহা কহিতেন, তাহাই সুন্দর শুনাইত, যাহা করিতেন, তাহাই মধুর হইত। অথচ তিনি চিরকাল আত্মবিস্মৃতা, সকল কার্য্যে অহং-বর্জ্জিতা। কর্ত্তব্য করাই তাঁহার স্বভাব ছিল, তাহাই তিনি নীরবে করিয়া গিয়াছেন। যে দেখিয়াছে, সে মুগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তিনি সে দিকে একবারও ফিরিয়া দেখেন নাই। তাঁহার সেই এক আদর্শ—

"ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে"

কত লোকে তাঁহাকে আঘাত দিয়াছে, তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। কদাপি সেই প্রসঙ্গ তুলিয়া আঘাতকারীকে ব্যথিত ও লজ্জিত হইবার অবকাশ দেন নাই। তিনি যেন আপাদমস্তক প্রেমের সুদৃঢ় বর্ম্মে আচ্ছাদিত। কিছুই যেন তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই; অথবা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

দুর্দ্দিনে নগেন্দ্রবালাকে না ডাকিতেই বড় কাছে পাওয়া যাইত! তিনি আসিলে মনে হইত, একটা বল, একটা সান্ত্বনা, একটা শান্তি যেন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অথচ তিনি অধিক কথা কহিতে জানিতেন না। অতিরিক্ত মায়া দেখাইতে ভালবাসিতেন না। উৎসবের দিনে নগেন্দ্রবালাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। তিনি কখন গিয়া একেবারে রন্ধনশালায় ঢুকিয়া বসিয়া আছেন। বৃহৎ বৃহৎ প্রীতি-ভোজে তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার প্রতি ন্যস্ত হইত। হাঁক-ডাক নাই, রাগ-অভিমান নাই, আপন মনে তিনি অন্নপূর্ণার কাজ করিয়া যাইতেন। তিনি যে নেতৃত্ব করিতেছেন, ইহা কেহ বুঝিতেই পারিত না। তিনি অনেক সময় দাস দাসীকে বিশ্রাম করিতে দিয়া তাহাদের কার্য্য অক্লান্ত ভাবে করিতেন। ইতর, ভদ্র, ধনী, নির্ধন এই ভেদজ্ঞান তাঁহাতে ছিল না। তিনি সকলের সহিত সমান ভাবে মিশিতেন। শিশুর নিকট শিশু বনিতেন! দু'দিনের জন্য তিনি অন্যত্র যাইবেন শুনিলে, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হৃদয়গুলিতে বড় ব্যথা লাগিত! তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া যাইতে দিবে না বলিয়া তাহারা জেদ করিত। অথচ কেহই

তাঁহার নিকট অন্যায় প্রশ্রয় পাইত না, অসঙ্গত আব্দার করিতে সাহসী হইত না।

নগেন্দ্রবালা শুধু গৃহকর্ম্মেই সুনিপুণা ছিলেন, তা নয়, তিনি ঘরে বসিয়া একান্তে বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন। তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র অবসর গ্রন্থপাঠে ও কবিতা রচনায় যাপন করিতেন। এক দিন তাঁহার খাতাখানি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলাম। কবিতাগুলি ছাপিবার জন্য আগ্রহও প্রকাশ করিয়াছিলাম, তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি বলিতেন,—"আমি নিজের তৃপ্তির জন্য লিখিয়া থাকি, সাধারণকে দিবার মত ইহাতে কিছু নাই।"

বহুদিন হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা কাহাকেও জানিতে দেন নাই। চিকিৎসক তাঁহাকে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনি তাহা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নাই। অক্লান্ত শ্রমে, গৃহকর্ম্ম করিয়া যাইতেন। কিছু দিন হইতে তিনি বলিতেন, "আমার কন্যা সুপাত্রে প্রদত্ত, পুত্র সংসারে প্রবিষ্ট, আমার কর্ত্তব্য প্রায় শেষ হইয়াছে। এখন কিছু দিন বিশ্রাম লইব।" কে জানিত, তিনি চিরবিশ্রামের জন্য—চিরবিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স মাত্র ৪৩ বৎসর হইয়াছিল। নগেন্দ্রবালা তাঁহার একটী শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া শোকার্ত্ত পিতা ও ভ্রাতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য পিতৃগৃহে যান। ভ্রাতুষ্পুত্রটীর যে প্লেগ হইয়াছিল, তখনও তাহা ধরা পড়ে নাই। তিন দিন পিত্রালয়ে থাকিয়া শ্বশ্রূর অসুস্থতার সংবাদ শুনামাত্র নগেন্দ্রবালা বাড়ী ফিরিয়া আইসেন। কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই, তিনি দারুণ প্লেগের বিষ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। দুই দিনের মধ্যেই প্রবল জ্বর প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রথমতঃ উহা প্লেগ বলিয়া কেহ নিশ্চিত ধরিতে পারে নাই। ৩৬ ঘণ্টাকাল অসহ্য রোগ যন্ত্রণা অম্লান বদনে সহ্য করিয়া তিনি ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। মৃত্যুর ৩ ঘণ্টা পূর্ব্বেও তিনি সেবাপরায়ণ পুত্র এবং আর একটী আত্মীয়কে জেদ করিয়া বিশ্রামের জন্য অন্য ঘরে পাঠাইয়া তবে নিশ্চিন্ত হ'ন। তাঁহাকে দেখিয়া তৎকালে তাহার দুঃসহ যাতনার চিহ্নমাত্রও তাহারা ধরিতে পারে নাই। তিনি জীবনে মরণে নিজকে ভুলিয়া পরকে দেখিয়াছেন। এই গুণেই বধূ শ্বশ্রূর পুত্রশোক ভুলাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শ্বশ্রূ বধূ যেন একাত্মা ছিলেন। এক জনকে ছাড়িয়া আর একজনের চলিত না। আরও দুই পুত্র এবং দুই পুত্রবধূ থাকা সত্বেও জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ নগেন্দ্রবালার সহিত পরামর্শ না করিয়া বৃদ্ধা কোন কাজ করিতেন না। আজ তাঁহার দক্ষিণ বাহু ভগ্ন হইয়াছে। পুত্রকে হারাইয়া তিনি বধূকে দীর্ণ বক্ষে টানিয়া লইয়াছিলেন। আজ সেই কন্যাধিক পুত্রবধূকে ডালি দিয়া হতভাগিনীর জীবনের সকল বন্ধন বুঝি ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

টেনিসন তাঁহার In Memorium কাব্যে একস্থলে তাঁহার মৃত বন্ধুর উদ্দেশে বলিয়াছেন—"প্রত্যহ প্রিয়-বিয়োগ ঘটিতেছে সত্য, কিন্তু আমি যেমনটী হারাইয়াছি, তেমনটী কে হারাইয়াছে?" আজ কেবলই মনে হয়, —নগেন্দ্রবালা নাই, তবুও আমাদের পৃথিবী চলিতেছে!—কাল শোক-ক্ষতের একমাত্র চিকিৎসক। কিন্তু একথা নিশ্চিত, যাঁহারা ঘনিষ্টভাবে নগেন্দ্রবালার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবনের

একটী শূন্য অংশ চিরদিনের মত অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

হে তুমি আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয়, সর্ব্ব জ্বালা হরের অভয় চরণ তোমার অবলম্বন হোক্। তাঁহার স্নেহচ্ছায়া তোমাকে আশ্রয় দান করুক্। তুমি শান্তি লাভ কর, মঙ্গল তোমাকে ঘিরিয়া থাক্। মরণের মধ্য হইতে তোমার জীবন আমাদিগকে স্পর্শ করিবে। সকল অভিশাপকে আশীর্ব্বাদ-মণ্ডিত করিবে। তোমার সেই যাদুকরী মৃদু হাস্য আজ বড় স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। তাহা ইঙ্গিতে জানাইতেছে—কাহারও মৃত্যু নাই, জীবন যে করুণার দান, মরণ সেই দয়ারই বিধান। বিরহ পুনর্ম্মিলনেরই নূতন প্রকরণমাত্র।—তোমার সেই চিরমধুর ধীর গভীর ভাষা পরিষ্কার শুনিতেছি। সূক্ষ্মতম লোক হইতে আজ তোমার অশরীরী বাণী তোমার বিয়োগ ভগ্ন গৃহস্থালীকে আশ্বস্ত করিতেছে,—

মরি নাই, মরি নাই, প্রিয়,
প্রেম সে যে ধরার অমিয়!

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

গোবিন্দ-প্রসঙ্গ।

(১)

দুনিয়ায় যাহা স্বাভাবিক, তাহার ব্যতিক্রম প্রায় দেখা যায় না। কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় কত বড় কবি ছিলেন, তাঁর আদৌ কবিত্ব ছিল কি না, তাঁহাকে কবি বলাটা সঙ্গত কি না, ইত্যাদি ব্যাপার যে আমরা তাঁহার মৃত্যুর পরক্ষণেই বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহা বোধ হয় সত্য নহে। তাঁহার সম্বন্ধে আগে যাহা জানা ছিল, পরেও যে তার অতিরিক্ত বড় বেশী কিছু জানা গিয়াছে, আমি ত এমন বিশ্বাসও করি না। কারণ গোবিন্দবাবুর ভিতর বাহির দুই রকম ছিল না এবং তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন দৈন্য ও উপবাসের কোন অন্তরালও ছিল না। তবে আজ কাল-সাময়িক ভদ্রতার খাতিরে তাহার জন্য এক আধটু অনুসন্ধান করা হইতেছে মাত্র। আমি এমন সময় ভাবি যে, আজ যদি সত্য সত্য গোবিন্দবাবু বাঁচিয়া উঠেন, তবে যে তিনি বকেয়া 'সুখ শান্তির' অপেক্ষা বেশী কিছুর ভরসা পাইবেন, এমন নূতন ঘটনার উপর আস্থা স্থাপন করিতে আমি মোটেই সাহস পাই না। বরং যাঁহারা তাঁহার জন্য "করতালি" দিয়া সভা করিয়াছেন, কাগজে কৃত্রিম কান্নার ভাষা ফেনাইয়াছেন,—তাঁহারা মনে করিবেন—আঃ কি ঝকমারিই করিয়াছি। বেটা যখন সত্য সত্য মরবে—তখন আবার নূতন রকম কান্নাকাটির ভাষা গড়বে কে? আর যে সকল বন্ধুরা (অবশ্য গোবিন্দবাবুর ষোল আনা বন্ধুই So-called আখ্যা পাওয়ার যোগ্য) "গোবিন্দ ফণ্ডে" টাকা তুলিবার পরিশ্রম করিতেছিলেন, (যদিও উহা সভার Resolutionএর গণ্ডী ছাড়ায় নাই) তাঁহারা নারায়ণ স্মরণপূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করিবেন।

গোবিন্দবাবু পুনরায় বাঁচিয়া যে উঠিবেন না, একথাটা নির্ঘাত সত্য। তবে এমন মিথ্যা কল্পনার আশ্রয়ে আমার দেশী ভদ্র-

লোকদিগের উপর যে কলঙ্কটা ঘোষণা করিয়াছি, তাহা হয়ত সকলের নিকট ক্ষমার্হ বিবেচিত হইবে না। ১৩২২ সালে কবি যখন ঢাকার মিটফোর্ড হাঁসপাতালে মৃতপ্রায় পড়িয়া থাকিতেন, যে অবস্থার চেহারাটা নিতান্তই না হইলে নয়, মনে করিয়া, বন্ধুবর কেদারবাবু সুহৃৎ অমরেন্দ্রবাবুকে ফটো তুলিতে মুহুর্মুহু অনুরোধ করিতেছিলেন। এবং সেই মূর্ত্তিমান তেজস্বিতার ম্রিয়মাণ ছবি দিয়া গৌরভের মুখপত্রের জাতি রক্ষা করেন; তখনও এই গোবিন্দদাসই ছিলেন। সেই সময় যখনই গোবিন্দবাবুকে দেখিতে গিয়াছি, দেখিয়াছি, তাঁহার রগ্ন শয্যার পাশে মলিন-মুখ পুত্র ভোলা আর বরুণ। গোবিন্দবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—ঢাকার সুহৃৎগণের মধ্যে কামিনীবাবু (বাবু কামিনীকুমার সেন) প্রত্যহ একটীবার আসেন। আর মিঃ পি. কে. রোস এক দিন আসিয়াছিলেন। আর ত কাহাকেও দেখি নাই। আর সর্ব্বদা সংবাদ লইতেন, গোবিন্দবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু—কেদার বাবু। যাঁহারা দুয়ার দিয়া জুড়ি গাড়ী হাঁকাইতেন, ঢাকায় এমন সাহিত্যিক অনেক আছেন—কেউ গোবিন্দবাবুর ছায়া মাড়াইতে যান নাই। আমি দুই একজনকে অনুরোধ পর্য্যন্ত করিয়াও দেখিয়াছিলাম। আর একবার বাড়ীতে মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া কামিনী বাবুকে এক পত্র লেখেন,—আমিও তখন তাঁহার এক পত্র পাই। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র, কামিনীবাবু ও কেদারবাবু ব্যতীত আর কোনও বন্ধুর সহানুভূতি পাইয়াছিলেন,—এরূপ শোনা যায় নাই। সুতরাং আমার ঐ উক্তি নিতান্ত অসঙ্গত হয় নাই।

(২) যে দিন কবিবরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, সে দিন আমার জীবনের এক শুভদিন। শ্রদ্ধেয় বন্ধু কেদারনাথ আমাকে দাস কবির সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন। আগে ভাবিতাম, না জানি এই কবি মানুষটি কত রাশভারী—হিমালয়ের চাইতে উচ্চ এবং অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রকম কিছু। তাই দূর হইতে দেখিতাম—কাছে ঘেঁসিতাম না। কেদারবাবু আমাকে যথেষ্ট আশ্বাস দিয়া গোবিন্দচন্দ্রের সান্নিধ্যে লইয়া গেলেন। তাঁহার হাসিমাখা কথাগুলি শুনিয়া আমার দেহে রোমাঞ্চ হইল। লোকে বলে—তীর্থস্থানে পাপ ঘুচিয়া যাওয়ার সময় লোমহর্ষণ হয়;—আমিও ভাবিলাম, আমার পাপ ঘুচিয়াছে, তাই রোমাঞ্চ হইল।

তার পর এখানে সেখানে, পথে ঘাটে, সময়ে অসময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। তিনি যে আমাদেরই মত 'আটপৌরে' গরীব মানুষ! সুতরাং 'কার্ড' দিয়া দেখা করার দরকার ছিল না। বরং অনাবৃত আকাশ তলেই তাঁহার নগ্ন বাসস্থানেই তাঁহার অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত। আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে যাই—অনেক খ্যাত, অখ্যাত ও তথাকথিত অনেক কবি, অকবি এবং সাহিত্যিকের সহিত সম্মিলন করিতে; কিন্তু সেখানে দেখি, প্রত্যেকের 'অহমিকা'র বেষ্টনী যথেষ্ট পুরু;—সেখানে ত কৈ গোবিন্দচন্দ্রের মত মানুষ বড় একটা পাই না।

গত ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে এক দিন কবিবর আমাকে বলিলেন, "সম্প্রতি আমার বাসাবাড়ীতে থাকার অসুবিধা। বরুণকে নিয়া ক'দিন আপনার কোঠায় থাকবার সুবিধা হয় না?"—আমি নিজকে যেন মহা সৌভাগ্যবান মনে করিলাম। পর-

দিন সপুত্র কবি আমার ক্ষুদ্র কোঠায় আসিলেন। কোন অভ্যর্থনা নাই,—আদর নাই,—যত্ন নাই,—যেন মূর্ত্তি ধরিয়া উদারতা আমার ঘরে আসিয়া বসিলেন। আমি হাসিয়া কহিলাম—"গোবিন্দবাবু! লালবিহারীর হোটেলেও আপনার জায়গা হয় না,—আমার এই ক্ষুদ্র কোঠায়ও আপনাকে সুবিধা মত স্থান দিতে পারি না,—এম্‌নি অধম আমরা;—আর আজ যদি রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় আসেন, সহর উজাড় করিয়া সকলে ষ্টেসনে যাইবে; সহরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৌধ তাঁহার বাসস্থান হইবে এবং সরকারী বেসরকারী অনেক লোকই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া কৃতার্থ হইবে।" (পাঠকগণের নিকট বিনীত নিবেদন, আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের তুলনা করি নাই। আমি বলিতেছিলাম—যদি গোবিন্দ বাবুর প্রতি কমলার কৃপা রবীন্দ্রনাথের মতই বর্ষিত হইত) গোবিন্দবাবু স্বভাব-সরল হাসিয়া কহিলেন—"তাও হয় কৈ? হোটেলেও রীতিমত খাবার সংস্থান হয় না—অর্থাভাবে! আর আপনার এই ক্ষুদ্র কোঠায় স্থান না পাইলে, আমার এই সহর ছাড়িয়া সপুত্রক যাইতে হইত।"

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিলাম—"গোবিন্দ বাবু, একটু ঘুরে দেখুন না, ঢাকায় এত সব ধনী ও শিক্ষিত লোক আছেন, আপনার ছেলের চাট্টি ভাত কি যোগাড় হয় না? আপনার জন্য কি একখানা কোঠার সংস্থান হয় না?" কবি তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন—"সুহৃৎ, অনেকের নিকট অনেক ভরসাই পাইতাম, অনেকে মাসিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, অনেকে বা আগন্তুকে লক্ষ্য করেন। আর যে সকল অজুহাত দেন,—আমার হাসি পায়। আমি না খেয়ে মরি, সেও ভাল, তথাপি কুকুরের মত দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিব না। আমার ছেলেকে ভিক্ষাবৃত্তি আমি নিজে শিখাইব না,—তাকে এই দারুণ হেয়কর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার মত নীচতা আমার নাই। বড় লোকদের মধ্যে রাজা জগৎকিশোর, আর বন্ধুগণের মধ্যে দেবীবাবু, কামিনীবাবু, আর কেদারবাবু আমার সহায়। তাঁদের দেওয়া ক্ষুদও আমার আদরের।" কবি আরও দুই একটী বন্ধুর নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন, নাম ভুলিয়া গিয়াছি।

আমি নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দুই চারিজন ধনীর নিকট গোবিন্দবাবুর প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু সর্ব্বত্রই বিফল হইয়াছি। কবির অদৃষ্ট দোষ! কবির নব-প্রকাশিত যে সকল কবিতা নানা মাসিকে আছে, সেগুলি একত্র করিয়া ছাপানের পরামর্শ অনেকবার হইয়াছে। বাসন্তী, মলয়া, প্রভৃতি নাম লইয়া রগড় হইয়াছে। আধুনিক রুচিসঙ্গত উত্তম ছাপান, বাঁধান বই করার জন্য কোন কোন প্রকাশকের দুয়ারে ঘুরিয়াছি,—কিন্তু কবির অদৃষ্ট তখনো অবরুদ্ধ। কবির ঋণ শোধ করার সাহায্যার্থও দুই এক স্থানে হাত পাতিয়া বিফল হইয়াছি। গোবিন্দ বাবুর বইগুলি সুন্দর করিয়া ছাপানের পরামর্শ দুই একদিন বন্ধুবর নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্-এ মহাশয়ের সহিতও হইয়াছিল। ফলে কিছু দাঁড়ায় নাই। এক দিন কথাপ্রসঙ্গে আমার পরম বন্ধু ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ বি-এ মহাশয় বলিয়াছিলেন—

"ঢাকার কপাল ঢাকা
প্রকাশ না পায়,
কুকুর মাথার মণি
ঠাকুর ছু' পায়।"

আমার যেন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—কবি না মরিলে "ভাল" হইবেন না। মধ্যে মধ্যে এই নিয়া হাসিঠাট্টাও হইত। গোবিন্দবাবু বলিতেন—লোকের যেমন বাড়ী ভাল হয় *, আমারও তেমনি সব দিক ভাল। সে দিন ত্রিগুণাবাবু নামক জনৈক গায়ক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অমনি গান ধরিলেন—

"যে ভাল করেছ কালি,
আর ভালতে কাজ নাই,
এখন ভালয় ভালয় বিদায় দে মা,
আলোর আলোয় চলে যাই।
জঠরে দিয়েছ স্থান,
করো না তার অপমান,
এখন কিসে পাই মা, পরিত্রাণ,
সদা মনে ভাবি তাই।"

গোবিন্দবাবুর অনুরোধে তিনবার গানটী গীত হইল। কবি নীরব রহিলেন। সে রাত্রে আর কোনও গল্পই হইল না। কেন ? আর জিজ্ঞাসা করি নাই।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গয়ার ইতিহাস

(হিন্দুযুগ।)

ধামী :—ইহারা কি ব্রাহ্মণ, এবং কিরূপে ইহাদের উৎপত্তি, তাহা শাস্ত্রে পাওয়া যায় না; কিন্তু কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, ইহারা আদৌ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী শ্রমণ বা বৌদ্ধ-পুরোহিত ছিল,ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম দেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া বৌদ্ধ দেবতা সকলের হিন্দু দেবদেবীতে পরিণতির সহিত তীর্থ গুরু "ধামী" (ধানুক) রূপে সমাজে পরিচিত হইয়াছে। গয়া সহরের মধ্যে ইহাদের এক স্বতন্ত্র বাসস্থান আছে, তাহা "ধামীটোলা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহাবীর পাঁড়ে, দীননাথ পাঁড়ে, মেহল পাঁড়ে, জগমোহন পাঁড়ে, কিশুন পাঁড়ে প্রভৃতি ধামীগণ খুব অর্থবান এবং ধনী বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমার মনে হয় যে, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র-প্রমুখ মনীষিগণ যে পূর্ব্বমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সমীচীন নহে। ধামীগণের উৎপত্তি আদি সকলই আমাদের শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। তাহা ক্রমশই বিবৃত হইতেছে। বায়ুপুরাণে ধামীগণকে "ধানুষ্ক" রূপে বিবৃত করা হইয়াছে। প্রাচীন কালে যখন প্রেতশীলা পর্ব্বত বন মধ্যে দস্যু ডাকাতগণ দ্বারা পরিসেবিত ভূমিমধ্যে অবস্থিত ছিল,তখন এই সশস্ত্র তীর ধনুকদ্বারা রক্ষিত দেহপালগণ যাত্রীগণকে প্রেতপর্ব্বতে লইয়া গিয়া পিণ্ডদান করাইয়া আনিতেন। তাঁহারা পারিশ্রমিকরূপে যাত্রীদের নিকট হইতে যাহা পাইতেন, তাহার মধ্য হইতে-

* বাড়ী পুড়িয়া যাওয়াকে 'বাড়ী ভাল হওয়া' বলে।

অর্দ্ধেক গয়ালী বৌদ্ধসাহী পঞ্চাননকে বৃত্তি ও কর স্বরূপ দিতেন এবং অর্দ্ধেকের মধ্যে নিজেদের জীবিকা নির্ব্বাহ ও ভরণপোষণ করিতেন। পূর্ব্বে এই বৃত্তি এক আনা প্রত্যেক যাত্রী পিছে নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু এখন বঙ্গদেশীয় যাত্রীগণের নিকট হইতে বৃত্তি ১৷৹ ও ১৷৴৹ ধামী বা ধানুষ্কগণ আদায় করিয়া থাকেন এবং অন্য যাত্রীদের নিকট হইতে ১৲ মাত্র ভেটী গ্রহণ করেন। যাত্রীদের সশস্ত্র সধনুষ্ক রক্ষা করিতেন বলিয়া ইঁহা-দিগকে "ধানুক্" বা "ধামী" বলা হয়। পাটনা ও ছাপরা প্রভৃতি জেলায় "ধানুক" নামে যে এক সাহসী যোদ্ধা জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা গয়া জেলার ধামীগণের অন্যতম। ধামীগণ গয়ালীগণকে একরূপ হারে বৃত্তি দেন না। কোন গয়ালীকে ৷৹, কাহাকে ।৴৹ এবং কাহাকেও ।৵৹ যাত্রীলব্ধ প্রত্যেক টাকায় দিয়া থাকেন। ধানুষ্ক বা ধামীগণের আদি নিবাসভূমি দুমকা ও মালদহ জেলার মধ্যস্থ "ধামীনকোহ্" পর্ব্বতের তরাই ভূমি দেশে বলিয়া গয়াতীর্থে ইহাঁদিগকে ধামী ব্রাহ্মণও বলা হইয়া থাকে। হাজারি-বাগ, দুমকা, মালদহ প্রভৃতি জেলায় পার্ব্বত্য ও বঙ্গ দেশে এই ধানুষ্কগণের স্বজাতিগণ অদ্যা-বধি বাস করিয়া থাকেন। তাহাদেরই সঙ্গে ইহাঁদের যৌন সম্বন্ধাদি আবদ্ধীকরণ হইয়া থাকে। পুরাকালে গয়ায় ইহাঁরা তিনশত গৃহ আসিয়া বাসস্থাপন করেন; এখন ৫০।৬০ গৃহের বেশী কদাচ হইবে না। প্রেতশীলার পালা গয়ার সমগ্র ধামীগণের মধ্যে বিভক্ত আছে। সেত্রাগঞ্জ কোইরিবাড়ী পাড়া-নিবাসী ৺অমৃত সিংহ বাবু ইহাঁদিগের কয়ে-কটী পালা বৃত্তি খরিদ করিয়াছেন। ৺পিতা-মহের শিবের সন্নিকট ৺শীতলা দেবীরও এইরূপ পালা আছে। এই পালাও ধামীদের মধ্যে বিভক্ত; কিন্তু আজ কাল কায়স্থ, ৺অমৃত সিংহ বাবু প্রভৃতি কয়েকজন অপর জাতীয় লোকও এই সকল পালা বৃত্তি খরিদ করিয়াছেন। কিছু দিন গত হইল, ইহারা উনাও জেলার একটী বড় পণ্ডিতের দ্বারায় "নূতন গয়া মাহাত্ম্য" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করাইয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়কার গয়াপাল শিরোমণি ৺ছোটেলাল সিজুয়ার সি, আই, ই, মহোদয় সেই নববিধান পুস্তক প্রচলনকারী ধামীকে বিশেষরূপ ব্যতিব্যস্ত করিলে সেই পুস্তক লোপ পাই-য়াছে এবং সেই স্বতন্ত্রীকরণ মনস্কামনাও তাহার সহিত তিরোহিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের ধামী ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন যুগের করগ্রাহী ধানুষ্ক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। আজকাল কোন কোন ধামী সন্তানগণ ইংরাজী লেখাপড়া শিক্ষা করিতেছেন। তীর্থে ভিক্ষা এবং যাত্রীর নিকট হইতে দক্ষিণা গ্রহণদ্বারাই ধামীদিগের জীবিকা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। গয়া শ্রাদ্ধের অবসানে যেমন গয়ালীগণ "সুফল" দান করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই পঞ্চতীর্থের শ্রাদ্ধ কর্ম্মের শেষে ধামীগণও রামশীলা পর্ব্বতের পাদদেশস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে সুফল দিয়া থাকেন। এই "পঞ্চতীর্থে" বঙ্গবাসী যাত্রীগণের নিকট ১৷৴৹ এবং পশ্চিমাগণের নিকট হইতে ১৴৫ ভেটী আদায় হইয়া থাকে; ইহার মধ্যে কতকাংশ গয়ালীগণকে দিতে হয়। তাহাকে "ব্রহ্মোত্তর" বলে। ভিন্ন ভিন্ন গয়ালীর দরবারে ভিন্ন ভিন্নরূপ ব্রহ্মোত্তর ব্যবস্থিত আছে। নাদ্রাগঞ্জ পল্লীর সন্নিকট রামনার মধ্যে আমার বাটী "উমেশগঞ্জের" সম্মুখে উত্তরমানস, পিতামহে-

শ্বর শিব শীতলাদেবীর মন্দির প্রভৃতি পঞ্চবেদী বর্ত্তমান, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শীতলা দেবীর মন্দিরের পালা ক্ষত্রিয় বা রাজপুত, কায়স্থ, সুরতওয়ালা, ধামী প্রভৃতি জাতিগণ ভোগ করিয়া থাকেন। ঐ মন্দিরের ভিতর প্রবেশদ্বারের বামদিকে একটী শিলালিপি আঁটা আছে। তাহার অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই শিলালিপি "যক্ষপালের" শিলালিপি। রাজা যক্ষপাল কর্ত্তৃক শীতলাদেবীর পুষ্করিণীটী খোদিত হয়। ইহার অব্যবহিত দক্ষিণ দিকে আমার "উমেশলজ" বাটী !!! মদ্বন্ধু বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যক্ষপাল লিপি তাঁহার "Palas of Bengal" নামক পুস্তকের ৯৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই লিপি যথাযথ যেরূপ আমি বহু চেষ্টায় প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা পরে প্রদত্ত হইল।

গয়ার যক্ষপাল লিপি ঃ—গয়ার যক্ষপাল লিপি পূর্ব্বে সতিঘাটে ছিল। পুরুষিয়ার অন্তর্গত গটিঞ্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার কিলহরণ ইহা প্রথমে লোকসমাজে প্রকাশিত করেন। ডাক্তার কানিংহ্যাম্ সতিঘাটে ইহাকে পাইয়াছিলেন। ইহা দেবনাগরী অক্ষরে একুশ পংক্তিতে অজিগ্রাম বংশীয় মুরারী নামক এক পণ্ডিতের দ্বারা খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। * (Arc Sur Ind. Vol III. Plate XXXVII)

ইহার অনুরূপ লিপি পরে প্রবর্ত্তিত হইল। এই রাজা যক্ষপাল মুরারী নৈয়ায়িকের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তারানাথের মতে যক্ষপাল দেব পাল বংশের শেষ রাজা ছিলেন। †

এই লিপি এখন উত্তর মানসের উত্তর দিকস্থ শীতলাদেবীর মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের পার্শ্বে আঁটা আছে।

ওঁ নমঃ সূর্য্যায়

বিষয় মধূৎকরপূর্ণং, প্রাণী নিকায়ালি বিশ্বশতপত্রং। অষ্টাশাদলরম্যং প্রকাশয়ন্নবতু বো ভানুঃ (১)॥ ১। তীর্থং ফল্গু (ত) টাদি তীর্থ ঘ(ট) না ব্যাজেন সোপানিনীগঙ্গাণাং পরমস্য ধৌততমসাং ধাম্নোগয়া রাজতে (২)॥ শ্রীমত্তৈবয়য়া মহীময়মিলচ্ছিত্রস্য জীবাত্মনা শিল্পোৎর্ষমমন্যতাত্মনি বিধিঃকৃত্বা ত্রিলোকী মপি॥ ২ অস্যাং বভূব রিপুবৃন্দমনিন্দ্য শৌর্য্যঃ কুর্ব্বন্ন প্রণয়ি পত্রনিকেতনস্থং। শ্রীশূদ্রকঃ স্বয় মপূজ যদিন্দ্রকল্পো গৌড়েশ্বরো নৃপতি লক্ষণ পূজয়াম্ম॥ ৩ তস্মাদদ্ভুত পৌরুষাম্বুধিরভূৎ শ্রীবিশ্বরূপোনৃপঃ কীর্ত্তি শ্রীমতয়ঃ স্বয়ং ববতয়া তেজুর্যমেকংপতিং। অদ্যাপি স্ফুরদুগ্র বিক্রম কথা মাকর্ণ্যদাস্যচ, শ্বাসং ভূ তি মরাতি চক্রম সমত্রাসাত্তদা লাঘতে॥ ৪ লক্ষ্মীং রিপোঃ স্বভুজোবীর্য্যাবশীকৃতাং যো, ভোগ্যাং তথাবিহিতবান্ দ্বিজ পুঙ্গবানাং। এষাং যথা যুবতয়ো দ্যুতিমাদধানা নাকাঙ্গনাইব বিরে জুরিলাতলেপি (৩)॥ যস্যোজ্জ্বলেন যশসা ভ্রমতা সমস্তাচ্চক্রে চিরং ধবলিতে বিদিশাং দিশাঞ্চ। লোকেম্বভি প্রণয়িতুং মৃগলাঞ্ছনঃ স্ব, মেণাঙ্ক মুদ্রণ অহর্নিশ মাদধাতি॥ ৬ যেনাদ্যাপি চকাশতি প্রতিদিশং দেবালয়াঃ কারিতা ভূয়াঙ্গে হিমদিধিতি দ্যুতিমুষোমেদিন্যলঙ্কারিণঃ। মূর্ত্ত্যা যা মতয়া হিমাদ্রি শিখরস্য র্দ্ধোচ্ছিতৈ মূর্দ্ধিভিঃ কুর্ব্বন্ত বিয়তি স্খলদ্গতি-

* Ind. Ant. Vol. XVI, P. 63-66.

† বাবু রাখালদাস বন্দ্যোর 'বঙ্গের পালরাজগণ' (M A S B Vol. No. 3 P. 96) দেখ।

(১) আর্য্যা।

(২) শার্দ্দূল বিক্রিড়ীতঃ।

(৩) বসন্ততিলক।

রথং প্রস্থান তুস্থং রবিং (১) ॥ ৭ ধর্ম্মস্য জন্যাইব স্মুরজাত শক্রস্তস্যাথ ধৈর্য্যানিলয়োজনি যক্ষপালঃ। লুপ্তক্রতৌ কলিযুগস্য বিজৃম্ভিতে যঃ কামাল্ ভৃশংক্রতুভুজঃ ক্রতুভিঃ পুপোষঃ (২)॥ ৮ প্রৌঢ়ৌনঙ্গতয়া পরেশ্বরময়ং ভিক্ষাঃ ভুজামির্জ্জিতঃ সর্ব্বেণপ্যাবলাবলোয়ম চিরস্থায়ী মনোভূরয়ং। ইত্যন্যো বিধিনা মনোজ্ঞতনুভূজ্জেতা (ত্বষাং) যো ভুজাদণ্ডৈক প্রবলঃ স্থিরোযুধি সদা মীন ধ্বজোনির্ম্মিতঃ (৩)॥ ৯ ভুভারো রোহণোভূদিতর তরুতুলামাশ্রিতঃ কল্পশাথী(ক্ষী)কিং ধেনুঃ কামধেনুঃ ক্ষিতিতলপরিখা কীর্ত্তি পাত্রং পয়োদিঃ। ইত্যাসন্নাদি দাতৃ প্রতিজগতি (গি) রো গীয়মানা নরেন্দ্রে যস্মিন্নভ্যর্থ্য মানৈর্ব্বসুভিরবিরতং তর্পিতার্থি সার্থান ॥ ১০ * যদ্ধৃৎ পদ্মকুটীরক প্রণয়িতা মাপামিতে শ্রীপতৌ, সুপ্রীতে ব্যভিচারণি ত্বরতয়া ভক্ত্যা পরিক্রীড়িতং। অর্থি ভ্যো বিনিযুক্ত যাপ্যাসু দিনং পাত্রে শুচৌ জাতয়া যৎদ্বামিপ্রিয় বাস এষ ইতি যঃ কামং শ্রিয়া সংশ্রিতঃ (৪)॥ ১১ মৌনাদিত্য সহস্র লিঙ্গ কমলার্দ্ধাঙ্গীন নারায়ণ দ্বি (স্থা) মেশ্বর ফল্গুনাথ বিজয়াদিত্যা হ্বয়া নাং কৃতী। স প্রাসাদ মচীকরদ্দি বিষদাং কেদার দেবস্য চ খ্যাত স্যোত্তর মান সস্য খননং সত্রং ত (থা) চাকরে॥ ১২ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ যাবদ্যাবৎক্ষোণী সসাগরা। তাবৎ শ্রীযক্ষপালস্য রাজস্তাং ভুবি কীর্ত্তয়ঃ (১)॥ ১৩ ন্যায় বিদ্যাবিদাং শ্রেষ্ঠঃ নাগী গ্রাম কুলোদ্ভবঃ শ্রীমূবাণির্দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ প্রশস্তি মকরোদিমাং॥ লিখিতাসৌ পদ্ম পানিনা॥ *

প্রপিতামহেশ্বর ঃ—প্রপিতামহেশ্বর শিব মন্দির কঠিন প্রস্তরে নির্ম্মিত; ইহার স্থাপত্য দেখিলেই বোধ হয় যে, বৌদ্ধযুগে ইহার রচনা সংঘটিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় ইহা হিন্দু দেবতায় পরিণত হইয়াছে। ইহার সন্নিকট দুই একটী প্রস্তরফলক আছে, তাহার অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

মঙ্গলাগৌরী ঃ—দেবী ভাগবতে আমরা মঙ্গলাপীটের উল্লেখ পাই এবং দেবীর আদ্যাস্তোত্রে গয়ায় দেবী গায়ত্রীরূপে বিরাজমানা, তাহা পাই। এখানে ভৈরব স্বয়ং গদাধর। তাঁহার মন্দির বিষ্ণুপদের পার্শ্বেই। বিষ্ণুপদের মন্দির খুব রমণীয় এবং প্রস্তরনির্ম্মিত। উপরের চূড়ায় স্বর্ণ কলস ও পতাকা শোভিত। "প্রেতশীলা" এখান হইতে তিন ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিকে এবং বুদ্ধ গয়া ৩॥০ ক্রোশ দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। উভয় স্থানেই গাড়ী, একা বা পাল্কীযোগে যাইবার পথ আছে। গয়ায় বহু দেবদেবীর নব ও প্রাচীন মন্দির আছে, তাহার সকল-

(১) শার্দ্দূল বিক্রিড়ীতঃ।

(২) বসন্ততিলক।

(৩) শার্দ্দূল বিক্রিড়ীতঃ।

* এই শিলালিপি মদ্বন্ধু বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "The Palas of Bengal" নামক পুস্তকের ৯৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণরূপে আদি প্রশস্তি হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

(৪) শার্দ্দূল বিক্রিড়ীতঃ।

(১) অনুষ্টুভ।

* যক্ষপালদেব মগধের রাজা ছিলেন; তিনি সম্ভবতঃ সম্রাট তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের রাজত্বকালে স্বাধীন হইয়া এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন এবং তিনি রামপালদেবের মাতুল মথন দেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মগধের সম্রাট রামপালদেবের বশ্যতা স্বীকার করেন। এই প্রস্তরলেখে কোন সন তারিখ নাই বলিয়া ইহা কবে যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহার সময়ের কোন নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই।

গুলির উল্লেখ এস্থানে অসম্ভব। মন্ট-গোমেরী মার্টিণ ল সাহেবের রিপোর্ট, মোনিয়ার উইলিয়াম সাহেবের "Religious Life and thought in India" এবং বুকানান্ হামিল্টন প্রভৃতির পুস্তকগুলি পাঠ করিলে গয়া জেলা সম্বন্ধে সবিশেষ জানা যাইবে। ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি সম্বন্ধে গরড় পুরাণ এবং বায়ুপুরাণে সবিশেষ বর্ণিত আছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে দশম শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত গয়া নগরের অনেক সংস্কার এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপর নির্য্যাতন করিয়া মায়াবাদী শঙ্কর কর্ত্তৃক দেশে পুনশ্চ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ও প্রবর্ত্তিত হয়। এই সময় মহারাজ শশাঙ্কদেব বৌদ্ধ শ্রমণগণকে নিপীড়ন করিয়া নিহত করেন এবং সমস্ত দেবতা ও মন্দিরগুলিকে ব্রাহ্মণ্য দেবাগারে ও দেবতায় পরিণত করেন। শশাঙ্কদেব বৌদ্ধদেব প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ গাছটীকে (বোধিদ্রুম) শিকড় শুদ্ধ উঠাইয়া তৎস্থানে স্বসংস্কার নূতন পিপ্পল (অশ্বত্থ) বৃক্ষ রোপণ করিয়া পিণ্ডদান বিধিরূপে প্রবর্ত্তিত করেন। যে বোধিদ্রুমতলে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন, শশাঙ্ক মহারাজ তাহা এককালীন বিনষ্ট করেন, চিহ্নমাত্র রাখেন নাই। সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউন শাং এই কথা স্বয়ং গয়া পরিদর্শন করিয়া তাঁহার অলৌকিক ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উপরোক্ত পিপ্পল বৃক্ষ যমরাজ প্রতিষ্ঠিত বলিয়া হিন্দুগণ উল্লেখ করেন; কিন্তু বৌদ্ধগণ বলেন যে,এই বৃক্ষ শাক্য বৌদ্ধ দ্বারা রোপিত এবং ইহারই মূলে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমধ্বংসের পর এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃ দেশে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, ব্রাহ্মণগণ এই বৌদ্ধ আরাধ্য বৃক্ষটীকে হিন্দুর তীর্থ মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন বলিয়া মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মিঃ ও ম্যালী প্রমুখ বিপশ্চিৎগণ এই কথা বলেন। কিন্তু আমার মনে ইহা ততটা লাগে না। আমার মনে হয়, ইহা হিন্দুর নিজস্ব জিনিষ। পাদপূজা, মুফল গ্রহণ, পিণ্ডদান প্রভৃতি সবই বৌদ্ধধর্ম্মের পদ্ধতি বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উল্লেখ করেন। নারায়ণ ভট্টকৃত "ত্রিস্থলী-সেতু," "গয়া মাহাত্ম্য" এবং "দ্বীপবংশ" "অঙ্গুত্থাননিকায়", "পুগ্ গল পন্নথী", কানিংহ্যাম সাহেব কৃত "মহাবোধী," ডাঃ মিত্রের "বুদ্ধগয়া", মহাবংশ অবদান প্রভৃতি পুস্তক পাঠে আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং পিণ্ডদান বিধির উৎপত্তির বিষয় অবগত হই।

ভস্মকূট পর্ব্বতের শিখর দেশে ৺মঙ্গলা দেবী অধিষ্ঠিত আছেন। এই পর্ব্বতে ভীমগয়া, পুণ্ডরীকাক্ষ, মার্কণ্ডেয় শিব (বৈতরণী পুষ্করিণীর পশ্চিম ঘাটের উর্দ্ধ) জনার্দ্দন, গোপ্রচার, আম্র শেচন (মঙ্গলা পর্ব্বতের দক্ষিণদিকস্থ পর্ব্বতে) তারকব্রহ্ম, প্রভৃতি তীর্থ অবস্থিত আছে। ইহার পার্শ্বে শ্যামলাল বিট্টল গয়ালীর বাগানের পূর্ব্ব, পুণ্ডরীকাক্ষ তীর্থের উত্তরস্থ পর্ব্বত মধ্যে এবং মঙ্গলাগৌরীর পশ্চিম ক্ষীরসাগর তীর্থ এবং ইহার সন্নিকট "স্বর্গদ্বার" বিরাজমান আছে।

ব্রহ্মযোনী ঃ—ব্রহ্মযোনী পর্ব্বতের উপর যে মন্দির বহু দূর হইতে দেখা যায়, এবং রেলে আগন্তুক পথিকের হৃদয়ে স্বতই "গয়ার" মাহাত্ম্য এবং পিতৃগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান বাঞ্ছা জাগরূক করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রসের আবির্ভাব করে, তাহা সেই

প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাষ্ট্রকুলভূষণ পরম ধর্ম্মনিষ্ঠা হিন্দু-রমণীকুল-গৌরব অহল্যাবাইর সমসাময়িক গোয়ালিয়র রাজ জীয়াজী রাও সিন্ধিয়ার কীর্ত্তিস্তম্ভ !! এই পর্ব্বতটী সমতল শ্যামল ক্ষেত্র হইতে প্রায় ৪৫০ বা ৪৭৫ ফিট উচ্চ হইবে। পাহাড়ের পাদদেশ হইতে শিখর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ সোপানাবলী বর্ত্তমান আছে। পর্ব্বতের উপরে মন্দিরাভ্যন্তরে ব্রহ্মার মূর্ত্তি; কিন্তু ইহা চতুর্ম্মুখ না হইয়া পঞ্চমুখী, তাই মনে হয় যে, ইহা শিবের মূর্ত্তি এখন পঞ্চমুখী দেবীরূপে আপামর হিন্দু সমাজের দ্বারা সাদরে পূজিত হইতেছে। এই প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে একটী অশ্বের প্রতিমূর্ত্তি বিরাজমান; ডাঃ কানিংহ্যাম সাহেব বলেন যে, ইহা তৃতীয় জৈন তীর্থঙ্কর শম্ভুনাথের অশ্ববাহনের প্রতিলিপি, তাহা পরে বলিয়াছি। মহারাজা জিয়াজী রাও সিন্ধিয়া যবে গয়ায় পিতৃকার্য্য করিতে আইসেন, তখন পাণ্ডা গয়ালীদের অনুনয়ে এবং নিজের ভবিষ্যৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ চিরতরে রাখিয়া যাইবার জন্য, অধিকন্তু ভবিষ্যতে অভ্যাগত যাত্রীগণের সুবিধার জন্য, এবং এই ভীষণ দুর্ভেদ্য বনাকীর্ণ ব্রহ্মযোনীর উপর সুগমে উঠিবার জন্য, তাঁহার কর্ম্মচারী শ্রীবলবন্ত রাও ৪৪০ পাদ বা ধাপ বিশিষ্ট সর্পাকৃতি সোপানাবলী এবং চূড়া বা শিখর দেশে এক প্রাচীন পঞ্চমুখী দেবীমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া তদুপরি এক মন্দির (১৮৩০ খ্রীঃ) নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া যান। সেই মন্দির এতাবৎকাল পর্য্যন্ত রৌদ্র, বৃষ্টি এবং কালের কঠোর শাসন অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান ছিল। ৫।৬ বৎসর গত হইল সহসা বজ্রপাতে তাহা ভগ্ন প্রাপ্ত হওয়ায় গয়াবাসীদের আবেদনে গোয়ালীয়র দরবার ঐ মন্দির পুনশ্চ নির্ম্মাণ ও সংস্কার করাইয়া দিয়াছেন। এই কার্য্য উদ্ধার জন্য মাড়নপুর গ্রামের অন্যতম জমিদার বাবু কৌলেশ্বরীচরণ ৺ব্রহ্মযোনী পর্ব্বতের পাহাড়ের যাত্রীদত্ত আয় ছয়মাস কাল আটক করিয়া এবং গোয়ালীয়রদত্ত টাকা একত্র করিয়া তিনি এই মন্দির সংস্কার করাইয়া দিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন।

পশ্চিম পুলীষ লাইনের দিক হইতেও এই পর্ব্বতে আরোহণ করিবার অসমতল পার্ব্বত্য পথ আছে। ব্রহ্মযোনী পর্ব্বতের পাদদেশে প্রস্তর ফলক-জড়িত গায়ত্রী মাতার মন্দির। ইহাও পূর্ব্ব কথিত সিন্ধিয়া মহারাজের কর্ম্মচারী মুন্সী শ্রীবলবন্ত রাও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। আমার মনে হয় যে, ইহাও বৌদ্ধযুগের দেবীর প্রতিমূর্ত্তি; হিন্দুগণ দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মের সার্ব্বভৌমত্ব দেশে প্রতিষ্ঠিত হইলে, হিন্দুদেবী রূপে পরিচিত হইয়াছে। পর্ব্বতের শিখরদেশের কিঞ্চিৎ নিম্নে "ব্রহ্মযোনী।" ইহার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া নির্গত হইলে আর জঠর যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না, এবং পুনর্জ্জন্মও হয় না !! বুদ্ধগয়ায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ভগবান শাক্যসিংহ এইখানে আসিয়া কিছু কাল তপস্যা করিয়াছিলেন; ইহার বিষয় সবিস্তার আলোচনা বুদ্ধগয়া প্রসঙ্গে পরে করিব। বর্ত্তমান ব্রহ্মযোনী পর্ব্বতকে প্রাচীন হিন্দুযুগে "উদ্বংগিরি" এবং বৌদ্ধযুগে 'ব্রহ্মশির' নামে অভিহিত করা হইত। ইহার শীর্ষদেশের কিঞ্চিদধঃ প্রদেশে "ব্রহ্মযোনী"; আদি সাবিত্রী দেবী; নিম্নদেশে ধৌতপদ কাকশীলা, উদ্বন্তকুণ্ড (ঊর্দ্ধ সোপানের পার্শ্বে) এবং সাবিত্রীকুণ্ড অবস্থিত।

ব্রহ্মযোনী পর্ব্বতের পাদদেশের, যথায় সাবিত্রী কুণ্ড অবস্থিত আছে, পার্শ্বেই,

ভগবান চৈতন্যদেব যখন গয়ায় আইসেন,তখন ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য ভারতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট একটী মহাতীর্থ রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য, কিন্তু উদ্যোগহীন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এদিকে আদৌ দৃষ্টি নাই!!! পর্ব্বতের শিখরদেশে যে শক্তি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার পাদদেশে একটী শ্লোক উৎকীর্ণ আছে, তাহা বহু কষ্টে পাঠ করা যায়। ইহা পাঠে আমরা অবগত হই যে, এই মূর্ত্তি বিক্রমসম্বৎ ১৬৯০ বা খ্রীষ্টাব্দ ১৬৩৩ ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার বিষয় ডাঃ কানিংহ্যাম সাহেবও স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মযোনী পর্ব্বত মাড়নপুর গ্রামে অবস্থিত। এই গ্রামের সত্বাধিকারী কলিকাতার অন্তর্গত শ্যামবাজার-নিবাসী বঙ্গীয় দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলগৌরব মিত্রবংশাবতংশ রায় প্রমথনাথ মিত্রদিগর, ৺বিষ্ণুপাদপদ্মের পক্ষে সেবায়ত গয়ালী বালগোবিন্দ সেন, এবং মাড়নপুর-নিবাসী রায় ৺অজায়েচলালের পুত্র ও জ্ঞাতিগণ হইতেছেন। ইহাঁদের বংশে রায় কৌলেশ্বরী সহায় নামক একজন অতি ভগবৎনিষ্ঠ এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি আছেন। এই মন্দির পুনঃসংস্কারে বহু অর্থ ব্যয়িত হয়। কোলেশ্বরীবাবু মন্দিরের বৃত্তি আটক করিয়া ছয় মাসে তাহা সংস্কার করাইয়া দেন। তাহার কিছুদুর অন্তর "ভস্মকূট" পর্ব্বতে জনার্দ্দন দেবের মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। দধি-মিশ্রিত পিণ্ড তাঁহাকে দিতে হয়। গয়াক্ষেত্র পঞ্চক্রোশ ব্যাপী, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ব্রহ্মযোনী পর্ব্বতের উপর সিদ্ধার্থ বুদ্ধদেব বহুদিন পর্য্যন্ত থাকিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন এবং এইখানেই তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য এবং খুড়াত ভাই আনন্দকে বৌদ্ধধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

এই পর্ব্বত গয়া নগরের দক্ষিণ সীমা হইতেছে,ইহার পাদদেশে কয়েকটী প্রাচীন মন্দির ও স্তূপের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্ব্বত নিম্নস্থ সমতল ভূমি হইতে প্রায় ৫০০ ফুট উর্দ্ধ উঠিয়াছে। এই পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিবার অহল্যাবাই-নির্ম্মিত দক্ষিণ দিক দিয়া সোপানশ্রেণী সর্পাকৃতিতে বিলম্বিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, এই ৪৪০ সিঁড়িযুক্ত সোপানাবলী মহারাষ্ট্র বীর দেবরাওভাও কর্ত্তৃক প্রায় ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বে যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। এই পর্ব্বতের শিখরদেশে একটী কুণ্ড আছে; তাহার নিম্নে ব্রহ্মযোনী অর্থাৎ পর্ব্বতের নিম্নস্থ প্রস্তরখণ্ড হইতে একটী দ্বারবৎ গুহা। প্রবাদ এই যে, এই গুহাদ্বার দিয়া যে প্রবেশ করিয়া অপর দিক দিয়া বহির্গত হইবে, সে আর মানব জন্ম গ্রহণ করিবে না, অর্থাৎ তাহার চিরমুক্তি হইবে। এই মন্দিরের পাদদেশে "রাধাস্বামী" প্রভৃতি কতকগুলি সিদ্ধপুরুষের "আসন" ও গুহা আছে। গয়ায় বহু মহাপুরুষের সাধন ভজন ও সিদ্ধির পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। শাক্যসিংহ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, লাঙ্গাবাবা, বাবা গম্ভীর নাথ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, তোতাপুরী, ভুভিয়া বাবা, চ্যবন ঋষি, শৃঙ্গি ঋষি, ব্যাস, বশিষ্ঠ, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি মহাত্মাগণ এইখানে সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ৺ভৈরব মন্দিরের কিঞ্চিদূর্দ্ধে ৺হনুমানজীর মঠের সন্নিকট গুহায় ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মন্ত্রলাভ ও দীক্ষা হইয়াছিল। স্থানীয় বাঙ্গালা সম্প্রদায় এই স্থানটীর স্মরণরক্ষার্থ চাঁদা

সংগ্রহ করিয়া একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মযোনী পর্ব্বতের শিখরদেশে একটী মন্দিরের মধ্যে "পঞ্চমুখী দেবীর" মূর্ত্তি ও তাহার সমক্ষে তৃতীয় জৈন তীর্থঙ্কর শম্ভুনাথের বাহন ঘোটকের প্রস্তর মূর্ত্তি খোদিত আছে। এই পর্ব্বতের সন্নিকট পূর্ব্বদিকে ৺অক্ষয় বট। এইখানে গয়ালীগণ যাত্রীগণকে সুফল দান করিয়া থাকেন। এই স্থানে কতকগুলি প্রাচীন মন্দির ও প্রস্তরলিপি আছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন স্মার্ত্তবাগীশ-ঘটিত গয়ার "পঞ্চক্রোশী" সম্বন্ধে একটী বেশ গল্প আছে। অষ্টবিংশতিতত্ত্ব স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গের প্রধান স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এক সময়ে ৺গয়া শ্রাদ্ধ করিতে আগমন করিলে, স্থানীয় গয়ালীগণ অর্থ প্রাপ্তির আশায় তাঁহাকে ৺বিষ্ণুব মন্দিরাভ্যন্তরে পিণ্ডদান করিতে অবরোধ করে। গয়ালীগণ বলে যে, আপনি বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা বড় পণ্ডিত, আপনি আমাদের যথেষ্ট অর্থদান করিয়া ভগবানের পদতলে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করুন। স্মার্ত্ত বলিলেন, "আমি নিঃস্ব ব্রাহ্মণ, তোমাদিগের দিবার যোগ্য প্রভূত অর্থ কোথায় পাইব? গয়ালীগণ কোন মতেই তাঁহাকে যাইতে দিল না, অবশেষে তিনি শাস্ত্র দেখাইয়া বলিলেন যে, কোন চিন্তা নাই; আমি পঞ্চক্রোশী গয়ার মধ্যে বঙ্গবাসী মাত্রের পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। গয়ালীগণ তখন দেখিলেন যে, পূর্ব্বরাজ্য নষ্ট হইলে আমাদের আয়ের বিশেষ ক্ষতি হইবে। বঙ্গবাসীগণই বেশী অর্থদাতা। তখন তাঁহারা বহু অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে মন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া পিণ্ডদান ক্রিয়া সমাধা করাইলেন। গয়া হেন বিদেশে বঙ্গের প্রধান স্মার্ত্তের প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল। যে পুরুষসিংহের প্রভাবে বঙ্গের হিন্দুর ঘরে ঘরে যাবতীয় দৈব, পিত্র্য, এবং নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত এবং সম্পাদিত হইতেছে, তাঁহার প্রতিভায় যে সে কালের অর্থলোলুপ গয়ালী সম্প্রদায় ম্রিয়মাণ হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

গয়ায় পিণ্ডদান কার্য্য করিতে হইলে, নিজের ভূমিতে বসিয়া ঐ পিতৃকার্য্য করিতে হয়, নচেৎ ভূম্যধিকারীর পিতৃগণের ফললাভ হয়। সেই জন্য গয়ালীগণ যাত্রীদের নিকট হইতে ভূস্বামীর বৃত্তি আদায় করিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বেই বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি।

ভৈরবস্থানের সন্নিকট কতকগুলি তীর্থ আছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। গোদাবরী, গৃধ্রেশ্বর, ঋণমোচন, পাপমোচন, বশিষ্ঠ কুণ্ড, কাশীখণ্ড, মহাকাশী, আকাশ গঙ্গা, পাতাল গঙ্গা প্রভৃতি।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

স্বর্গীয় কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের প্রতি।

"সৌরভের" সৌরভ তুমি
গন্ধে উদাস মন।
স্বর্গপুরে ইন্দ্রদেবের
ফুল পারিজাত বন।

ফুলের রাজা গন্ধরাজ
গোলাপ বেলীর ঝাড়।
রাত্রিকালের নিশা রাণী
নাই তুলনা যার।

শারদীয় জোছনা রেতে
শিউলী বনের ফুল।
মনে প্রাণে গন্ধ বিলাও
নাই যে তোমার তুল!
"কুঙ্কুমেতে" তোমার সুবাস
ছুটছে দেশে দেশে।
"কস্তুরীর" গন্ধে উঠে
দিগ্ দিগন্ত ভেসে।
"প্রেম ও ফুলের" সুবাস তুমি
আকুল যাতে প্রাণ!
নাই যে তোমার মৃত্যু, জরা,
স্বর্গে তোমার স্থান!

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত।

সমাজ-তরুর পরগাছা।

তরুশাখায় পরগাছা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। উহার মূল মৃত্তিকা সংলগ্ন নহে—বৃক্ষশাখায় শিকড় প্রবিষ্ট করিয়া বিনা-শ্রমে তরুর কষ্ট-সংগৃহীত রস আত্মসাৎ করতঃ আনন্দে জীবিত থাকে। তরুশাখা পরগাছা প্রভাবে ক্রমশঃ অসারত্ব লাভ করে। মানব সমাজে নানা জাতীয় পরগাছা থাকিলেও, পুরোহিত নামক এক শ্রেণীর পরগাছা সমাজের পক্ষে সাংঘাতিক। ইহারা ধর্ম্মের নামে নানাবিধ কুসংস্কার মস্তকে বহন করিয়া মানব সমাজ-তরুর প্রত্যেক শাখায় মূল স্থাপনপূর্ব্বক বিনাশ্রমে সসম্ভ্রমে রক্ত বিনিময়ে অর্জ্জিত অর্থ নানাছলে শোষণ করতঃ সুস্থ শরীরে পরম সুখে সময় যাপন করে—প্রভাবাধীন শাখা অন্তঃসারবিহীন হইয়া শুকাইয়া যায়, অথবা জীবন্মৃতবৎ ধরাবক্ষে বিচরণ করে; স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন ইচ্ছা হইতে চিরতরে বঞ্চিত থাকে। পুরোহিত-গণ যে মুক্তির ধ্বজা হস্তে ধরিয়া আস্ফালন করে, বাস্তব পক্ষে তাহাদের পক্ষে উহা প্রদানের শক্তির সম্পূর্ণ অভাব। বরং কু-সংস্কারের শত শৃঙ্খলে যজমানকে বন্ধন করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে বহু দূরে পিছাইয়া দেয়। ফলতঃ, আত্মপোষণই যাহা-দের লক্ষ্য, তাহাদের দ্বারা কখনও কেহ মুক্তি বা স্থায়ী শান্তিলাভ করিতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাস তারস্বরে ঘোষণা করে, যখনই যে দেশের দুর্ভাগ্য উদয় হয়, তখনই সেই দেশে পুরোহিত সম্প্রদায় প্রবলতা লাভ করে। পুরোহিত প্রভাবাধীন দেশ কখনও সত্য প্রচার করিতে বা অসঙ্কোচে সত্য গ্রহণ করিতে পারে না। পুরোহিত প্রভাবান্বিত দেশে জন্মিয়া কত মহাপুরুষ সত্য প্রচার করিতে যাইয়া, সত্যধর্ম্ম জীবনে প্রকট করিতে চেষ্টা করিয়া অকালে অন্যায়রূপে জীবন হারাইয়াছেন; কত জন লাঞ্ছনার আগুনে ভস্মীভূত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঈশা ও মহম্মদ সত্য প্রচারের জন্য, একে ক্রুশে বদ্ধ হইয়া নির্দ্দয়রূপে নিহত হইলেন; অন্যে প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। গেলেলিও ও সক্রেটিস তৎকালে অপ্রচলিত সত্য প্রকাশ করিয়া বর্ব্বরোচিত ভাবে প্রাণ হারাইলেন। পুরোহিত প্রভাব ব্যতীত ইহার অন্য কারণ ছিল না। কুসংস্কারে দেশ তমোময় করিয়া স্বাধীন চিন্তা বর্জ্জিত রাখার ইহাই ফল। যেখানেই যাও, যে দিকেই চাও, পুরোহিত শ্রেণীর কুহক মন্ত্রে সম্মোহিত নহে, এমন

কোন শ্রেণীই প্রায় দেখিতে পাইবে না। হইতে পারে, কতকগুলি লোককে, কোন কোন মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া কুসংস্কারের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন—সত্যের আলোকে হৃদয় আলোকিত করিয়া দেন। পরন্তু তাহার সত্যগ্রহণকারীগণ যখন দলবদ্ধ হয়, তখনই তাহাদের অঙ্গে পুরোহিতরূপী পরগাছা সংলগ্ন হইয়া কুসংস্কারের বীজ বপন করিয়া অচির কাল মধ্যে সত্যালোক আবৃত করিয়া ফেলে; মহাপুরুষের উদ্দেশ্য পণ্ড করে। সমাজ-শোষণকারী পুরোহিত সম্প্রদায়ের সাহায্যে কেহ কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই—পারিবে না। মুক্তিলাভ নিষ্কাম হৃদয় যোগী ঋষি মহাপুরুষবর্গের সংসর্গের অনুকম্পা বশেই হইবে—অন্য পন্থা নাই। সকল দেশেই প্রায় সকল সম্প্রদায়ের পুরোহিতেরাই অল্লাধিক পরিমাণে স্বর্গের প্রলোভন ও নরকের ভয় দেখাইয়া নানাবিধ ক্রিয়া যজমান দ্বারা নিষ্পন্ন করাইয়া আত্মোদর তৃপ্তির বন্দোবস্ত করিয়া লয়। খেলনায় ভুলাইয়া মুক্তির সোপানে উঠিতে দেয় না—নিম্নে টানিয়া রাখে। প্রাচীন সভ্যতা-দীপ্ত মিশরের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, যৎকালে হিক্‌সস্ জাতীয় রাজারা মিশরের অধিপতি ছিলেন; তৎকালে রাজশক্তির দৌর্ব্বল্যে পুরোহিতসম্প্রদায় প্রবল হইয়া উঠে। দেশবাসীগণ সূর্য্যোপাসক ছিলেন; তাহাদের সহজ-সংস্কার ছিল, যে যত সৎকার্য্য করিবে, সূর্য্যদেব তাহাকে তত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন। ফলে সৎকার্য্যের স্পৃহা তাহাদের বলবতী ছিল—দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধিত হইতেছিল। পুরোহিত সম্প্রদায় শক্তিমান হইয়া প্রচার করিলেন, সূর্য্যদেব রাত্রিতে পাতালে থাকেন, তখন কবরস্থ মৃতদেহে পুরোহিত-লিখিত কবচ বান্ধিয়া দিলে তাহার সমস্ত পাপ দেবতা ক্ষমা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে মাত্র রাজ পরিবারে 'মোমি' (মৃতদেহ শুষ্কাবস্থায় সংরক্ষণ) রাখিবার প্রথা ছিল; সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এখন 'মোমি' রাখার প্রথা সৃষ্ট হইল। পুরোহিতগণের রস গ্রহণের সুবিধা নব আকারে দেখা দিল। দেশ কুসংস্কারের একটী নূতন শৃঙ্খল গলে পরিল—অল্প কিছু দক্ষিণার বিনিময়ে পাপ নাশের সুযোগ লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। শ্রমসাধ্য সৎকর্ম্মের স্পৃহা দিন দিন শিথিল হইতে থাকিল। পোপের একাধিপত্যের যুগে ইউরোপে রাজশক্তি কিরূপ ব্যাহত হইয়াছিল; কপটতা ও গুপ্ত পাপ কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছিল; তাহা অনেকেই পরিজ্ঞাত আছেন। স্বাধীন চিন্তা-ফল দেশ-প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধ হইলে কেহ সাহসপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেন না, অথবা যিনি সাহস প্রদর্শন করিতেন, তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইত। পুরোহিত-প্রাধান্যের কুফল ইউরোপে তখন সর্ব্বত্র প্রকটিত হইয়াছিল। সে দিনের কথা, রুষিয়ার জগৎবিখ্যাত বিদ্বান ও মনীষী উদারচেতা মহাত্মা কাউণ্ট-লিও টলষ্টয় রুষিয়া দেশীয় ধর্ম্মযাজক সমিতি কর্ত্তৃক অবাস্তর ক্রিয়াকলাপের প্রতিকূলে অভিমত ব্যক্ত করিয়া সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধুনা প্রায় সর্ব্বদেশেই পুরোহিত-শক্তি বিষদন্তহীন ভুজঙ্গের ন্যায় হীন-প্রভাব হইয়াছে। পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রতাপ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় রাজশক্তি, কোথাও বা প্রজাশক্তি প্রবলা হইয়া দেশের সর্ব্বত্র স্বাধীন চিন্তার দ্বার খুলিয়া দিয়াছে—বিজ্ঞানে, দর্শনে স্বাধীন চিন্তা কার্য্য করিতেছে—কাব্যে, সাহিত্যে স্বাধীন

মত আদৃত হইতেছে; যাজক সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষা করিয়া কাহাকেও কোন নব মত প্রকাশে সসঙ্কোচে অগ্রসর হইবার প্রয়োজন আর নাই। স্বাধীন বাতাসে স্বাধীন চিন্তার ফল পরিপুষ্ট হইয়া মানবমণ্ডলীকে উপকৃত করিতেছে। যাজক মণ্ডলী রাজশক্তি বা প্রজাশক্তি কর্তৃক নিয়মিত হইয়া পরগাছা বৃত্তির অস্তিত্ব লোপ হইতে না দিয়া থাকিলেও ইদানীং স্বেচ্ছাচারিতা বর্জ্জিত হওয়ায় দেশের ও জাতির যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইতেছে।

ভারতের ভাগ্যগুণে হিন্দুজাতির কর্ম্মফলে ভারতের রাজশক্তি বিদেশীয় বিধর্ম্মী জাতির হস্তগত! রাজশক্তি প্রকৃতিপুঞ্জের কোনরূপ সামাজিক ব্যাপারে ধর্ম্মে কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন না। কাজেই হিন্দু সমাজে আজিও পুরোহিত প্রভুগণ অনিয়ন্ত্রিত এবং অবাধ প্রভাবশালী। সামাজিকগণ তাহাদের হাতের ক্রীড়নক বা ক্রীতদাস স্বরূপ। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহাদের কবলমুক্ত হওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। স্বার্থ-বুদ্ধি-হল দ্বারা সমাজ কর্ষণ করতঃ ইহারা সমাজগর্ভে এমনতর সংস্কার বীজ বপন করিয়াছে যে, সামাজিকগণ 'দেওয়ালী পোকা' যেরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে স্বেচ্ছায় অনলে আত্মাহুতি দেয়, তদ্রূপ মোহ-মুগ্ধ-চিত্তে সর্ব্বদাই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের রস গ্রহণের নানাবিধ সুবিধা করিয়া দিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করে। অধুনা পুরোহিত বলিলেই ব্রাহ্মণ বুঝায়; অন্য শ্রেণী হইতে পুরোহিত সৃষ্টি হওয়া একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ই ভারত-ভূমির হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান একমাত্র নিয়ন্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাল্যকাল হইতেই ব্রাহ্মণেতর জাতি সমূহ আত্মস্থ করিতে শিখে যে, ব্রাহ্মণ ভোজনের ন্যায় পুণ্য আর কিছুতেই নাই—ব্রাহ্মণকে দান করিলে স্বর্গদ্বারের অর্গল শিথিল হইয়া পড়ে—ব্রাহ্মণের সেবা করিলে নরকের ভয় থাকে না; ব্রাহ্মণ ভূ-দেবতা। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিলে, ব্রাহ্মণের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে, ব্রাহ্মণের বিত্ত আত্মসাৎ করিলে, ব্রাহ্মণের কোনরূপ অতৃপ্তি জন্মাইলে নরকবাসের আর সন্দেহ নাই। সামাজিকগণের এইরূপ বিশ্বাস অটল থাকিতে, পুরোহিত শ্রেণীর নানাবিধ চাতুরী যে, অবাধে সমাজবক্ষে নৃত্য করিয়া বেড়াইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? বিচার বুদ্ধি যদিও কাহারও মনে চতুরতার প্রতিকূলে উত্তেজনা আনয়ন করে; সমাজে থাকিয়া তাহা ব্যক্ত করিলে তাহাকে উপহসিত বা নিপীড়িত হইতে হয়। কেহ তাহা শুনিতেই চায় না—ভাবিবার কথা ত পরে! বদ্ধমূল সংস্কারের অনুকূলতা পুরোহিত পরগাছাকে নিরাপদে রক্ষা করিতেছে। দেবদেবীর পূজা ও ব্রতের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে এবং সুযোগক্রমে এখনও দু' একটী নব দেবতার আবির্ভাব হইতেছে যে, যজমানগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। অথচ পুরোহিত প্রভাবে মুহ্যমান যজমানগণ বিনা বিচারে ভয়ে দেব দেবীর পূজায় ব্রতী হইতেছে। দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন :—

জ্বর সংক্রামক হইয়া বহুলোক মরিতেছিল; পুরোহিত জ্বরাসুরের পূজা আবিষ্কার করিলেন। ওলাউঠা রোগে গ্রামকে গ্রাম উজার হইল, পুরোহিত ওলাদেবী নামে নূতন দেবীর কল্পনা করিয়া যজমানদিগকে নির্ভয় করিয়া তুলিলেন। বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন, রাসভবাহনা শীতলা। অন্যান্য সভ্যদেশে এবং অস্মদ্ দেশেও সাধারণতঃ

অবলম্বন করিয়া সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ ও মৃত্যুর হস্ত হইতে বহুলোক রক্ষিত হয়। কল্পিত দেবতার পূজা দিলেই যদি রোগ পলায়ন করিত, তবে অন্যান্য দেশাপেক্ষা আমাদের দেশে সংক্রামক ব্যাধিতে এত অধিক লোক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় কেন? কুসংস্কার স্বাস্থ্যরক্ষায় উদাসীন করিয়া ভারতের জনসংখ্যা দিন দিন হ্রাস করিয়া তুলিতেছে। স্বাস্থ্যবিদ্গণের উপদেশ অবহেলিত হইতেছে—প্রবঞ্চক স্বার্থপর পুরোহিতের শিক্ষা সর্ব্বত্র জয়লাভ করিতেছে। ব্রাহ্মণকে দান করিলে অক্ষয় স্বর্গলাভের সংস্কার অস্থি-মজ্জায় মিশিয়া যাওয়ায় শুধু শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি বৃহৎ ব্যাপারে নয়, ছোট বড় প্রত্যেক ব্যাপারেই দানের একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি ব্রাহ্মণই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ব্রত পূজা ত আছেই, সূর্য্য গ্রহণ, চন্দ্র গ্রহণ হইল, যজমানকে গ্রহ দানের অসামান্য পুণ্য লাভে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিল। একাদশীর উপবাস করা হইল, ব্রাহ্মণকে ভোজ্য দান না করিলে, উপবাস-জনিত কর্ম্মে সম্যক ফললাভ হইবে না। মধ্যে মধ্যে শনিগ্রহের উপাসনা না করিলে, শনি রুষ্ট হইয়া অশান্তি আনয়ন করিতে পারেন; সত্যনারায়ণের পূজায়ও নানাবিধ অভীষ্ট পূর্ণ হয়। কোনরূপ উৎকৃষ্ট দ্রব্য ব্রাহ্মণকে অগ্রে না দিয়া ভোজন করিলে, পাপভাগী হইতে হয়—যেহেতু, ব্রাহ্মণ ও নারায়ণ উভয়কেই সমভাবে পরিতৃপ্ত করাই মানবজীবনের কর্ত্তব্য, তাহাতেই স্বর্গের দ্বার-মুক্ত হইয়া, যজমানের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে! নানা প্রলোভন, নানারূপ ভয়ে যজমানগণ রক্তসম অর্থ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া পুরোহিত প্রভুদের গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া তৃপ্তি বোধ করে। কেহ বা ঋণ করিয়া, কেহ বা ভিক্ষা করিয়া, কেহ বা পরিবার পরিজনের ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে সংস্কার বশে পরগাছার রস গ্রহণের সহায়তা করিয়া থাকে। আত্ম-সম্মান বিসর্জ্জন দেয়, পরিণাম ভাবিবার অবকাশ পায় না। পুরোহিত সম্প্রদায়ের মুগ্ধকরী শক্তিই কি ইহার একমাত্র হেতু নহে? চিন্তাশীল বলিবেন—ইহার একবিন্দু অসত্য নহে। সে যাহা হউক, যদি কেবলমাত্র যজমানবৃন্দের রস গ্রহণ করিয়াই পুরোহিতগণ সন্তুষ্ট থাকিত—কথা ছিল না। ইহাদের গুণ অপার। কোন উন্নতিকর কার্য্যে অগ্রসর হইলে, অথবা কোনরূপ সংস্কার সাধন করিতে চাহিলে, ইহারা ন্যায়ান্যায় বিচার না করতঃ খড়্গ-হস্ত হইবে—বায়সের ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া বিরক্তিকর স্বরে চীৎকার করিবে। সদিচ্ছাকে অঙ্কুরিত হইবার মুখেই ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। দেশের ও জাতির কল্যাণ ভাবিবে না। দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তোমার প্রাণে জ্ঞান-পিপাসা বর্দ্ধিত হইয়াছে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে; তুমি সাগরপারে সভ্যতা-দীপ্ত দেশে শিক্ষার্থ গমন করিতে চাহিতেছ। আত্মীয়-স্বজনের অভিমত হইলেও, হিন্দু-সমাজ-গণ্ডী ছেদন না করিয়া কখনই যাইতে পারিবে না; যাইতে পার। তোমার স্বেচ্ছাধীন হইলেও ফিরিয়া আসিয়া সমাজের অঙ্কে স্থান মিলিবে না। স্নেহের বাধ্য হইয়া আত্মীয়বর্গ তোমাকে গ্রহণ করিলেও পুরোহিত-প্রভাবান্বিত সমাজ তাহাদিগকেও নির্দ্দয় ভাবে বর্জ্জন করিবে। অতএব ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তোমাকে নিরস্ত হইতে হইবে, কিম্বা স্নেহ ও প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া সমাজ-গণ্ডীর বহির্দ্দেশে চিরজীবন বাস

করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই মনোরথ পূর্ণ করিতে হইবে।

ভাবিয়া দেখিলে সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন—পুরোহিত-শাসন অগ্রাহ্য করিয়া যাহারা ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে শিক্ষার্থ গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বর্ত্তমান ভারতের গৌরব-নিদর্শন। তাঁহাদিগকে পাইয়া আমরা বাস্তবিকই গৌরবশালী। দত্ত রমেশচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ঘোষ মনোমোহন, লালমোহন, বসু আনন্দমোহন, জগদীশচন্দ্র, বন্দ্যোপাধ্যায় উমেশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ ব্যক্তিগণকে লইয়া আমরা সর্ব্বদা গৌরব করিয়া থাকি ; ইঁহারাই জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, পরন্তু ব্রাহ্মণশাসিত সমাজ ইঁহাদিগকে হিন্দুসমাজ-গণ্ডীর বাহিরে রাখিয়া দিয়াছে ! যদি বিলাত-ফেরতদিগকে সমাজ গ্রহণ করিত, তবে আজ কি সহস্র সহস্র কৃতীসন্তানে জন্মভূমির শোভাবর্দ্ধন করিত না ? সমাজভয়ে কত প্রতিভাশালীর প্রতিভা বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই—কত প্রতিভা নিভিয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যাবধারণ করা দুঃসাধ্য।

কোন জাতি শাস্ত্রানুসরণ করতঃ স্ব-শ্রেণীর মধ্যে সদাচারের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলে—স্বজাতির অধিকার লাভ করিতে চাহিলে, পুরোহিত-শ্রেণী তাহার সাহায্যকারী না হইয়া প্রতিকূলাচারী হইবেন—সে শ্রেণীকে চাপিয়া ধরিবেন, মস্তকোত্তোলন করিতে দিবেন না ! পুরোহিত শ্রেণীর ইচ্ছা, যে যাহা আছে, তাহাই থাকিবে ; বরং নিম্নাবতরণ করে, ক্ষতি নাই ; ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে কিছুতেই দেওয়া হইবে না। ইহাতে জাতির লাভ লোকসান গণনার আবশ্যকতা তাহাদের মনেই উদয় হয় না। যে শাখার রস পান করিয়া তাহারা জীবিত, আনন্দিত, তাহার পরিপুষ্টিই উহাদের অনভিপ্রেত। আত্ম প্রাধান্যের কণামাত্র অপচয়ও পুরোহিতগণের অসহ্য !

ব্রাহ্মণেতর কোন জাতি শাস্ত্রালোচনা করিবে, ইহারা তাহা সহ্য করিতে পারেন না। বেদ বেদান্ত পাঠ ত দূরের কথা, কেহ গীতা কি চণ্ডী পাঠ করিলেও ইহারা শিহরিয়া উঠেন—ঘোর কলির স্বপ্ন দেখেন। ফল কথা, শাস্ত্রজ্ঞান অন্য জাতিতে প্রসৃত করিতে ইহারা ভয় করেন। এতটা সঙ্কীর্ণতা কোন দেশের পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে এমন কতকগুলি সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে ; যাহা অপরিহার্য্য, পরন্তু পুরোহিত-শ্রেণীর ভ্রুকুটী ভাঙ্গিয়া ভয়ে ভীত সামাজিকগণ যুক্তি মূলে সংস্কারের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। সমাজ উত্তরোত্তর শোভাহীন, প্রেমহীন ও হীনবল হইয়া অস্তিত্ব লোপই বাঞ্ছনীয় বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছে।

পুরোহিতেরা যদি সমাজ পানে চাহিত—যজমানগণের নৈতিক উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিত, দুর্নীতি বিলোপের প্রয়াস পাইত, তাহা হইলে তাহাদের অস্তিত্বের একটা কারণ দেখান যাইত। তাহারা কি যজমানের চরিত্র দেখিতে চায় ? যে যজমান "গোরু মারিয়া তাহাদিগকে জুতা দান করে", তাহার প্রশংসায় তাহারা শতমুখ হয়। যিনি চরিত্রবান, নিরীহ ভাবে জীবন-যাপন করেন ; জলে ফুলে ভগবানকে ডাকেন ; পুরোহিতেরা তাহার কথা মুখেও আনেন না। রতনে রতন চিনে, পুরোহিতগণ

নিজেরা যেরূপ পবিত্র জীবন যাপন করেন, তদ্রূপ যজমানই তাঁহাদের মনোপূত হইবার কথা। যেখানে রস নাই—ভ্রমরের গুণ গুণ রবই বা তথায় থাকিবে কেন? তবেই বোঝা গেল, কোন একটা উচ্চাদর্শ, কোনরূপ উপকার পুরোহিতবৃন্দের সন্নিধানে সমাজ পাইতেছে না। নানা দিকে নানা বিধ অপকারই উপচিয়া পড়িতেছে। এমতাবস্থায় নানা উপায়ে রস পান করাইয়া পরগাছা সম্প্রদায়কে সজীব রাখা কি বুদ্ধিমান সামাজিকবর্গের কর্ত্তব্য? উঁহাদের প্রভুতা ক্ষুণ্ণ করিতে না পারিলে হিন্দুজাতির মুক্তির উপায় নাই। আরব্যোপন্যাসের সিন্ধুবাদ নাবিকের স্কন্ধে আরূঢ় দৈত্যের ন্যায় পুরোহিত দল হিন্দুসমাজের প্রত্যেক শাখায় দৃঢ়ভাবে উপবিষ্ট আছে; তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করা সহজসাধ্য নহে। তবে কি উপায় নাই? আছে। সামাজিকগণের বিচার বুদ্ধি ও মানসিক বলের সহায়তায়ই ইহাদিগকে ক্ষীণ-প্রভাব ও স্থানচ্যুত করা সম্ভব।

এ পর্য্যন্ত আমরা যাহা বলিলাম, তাহা সম্পূর্ণ সত্য হইলেও আমরা ইহা স্বীকার করি, যতদিন সমগ্র জাতি সুশিক্ষিত না হইবে, বিশেষতঃ নারীজাতি অশিক্ষিতা থাকিবে, ততদিন পূজা ব্রত সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইতে পারিবে না। পূজা ব্রত থাকিলেই পুরোহিতের প্রয়োজন থাকিল। প্রয়োজন থাকিলেই পুরোহিতের আনুগত্য স্বীকার অনিবার্য্য। বুদ্ধিমান সামাজিকগণ এরূপ স্থলে কি উপায় অবলম্বন করিবেন? তিনি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া একেবারে সমস্ত পূজা ব্রত বন্ধ করিবেন না। তাঁহার কর্ত্তব্য গর্ভাধান হইতে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সংস্কারগুলি যথারীতি নিষ্পন্ন করিবেন, অথচ ব্যয়বাহুল্য করিবেন না। দেব দেবীর সংখ্যাধিক্য হ্রাস করিয়া শিক্ষাপ্রদ ব্রতগুলি বজায় রাখিয়া পূজা ও ব্রতানুষ্ঠান করিবেন। ধীরে ধীরে পূজা ও ব্রতের রহস্য সমাজে অভিব্যক্ত করিবেন; স্বাভাবিক নিয়মে নরনারীর হৃদয়ে জ্ঞানের বিকাশ হইয়া প্রকৃত ধর্ম্মের জন্য লালায়িত করিবে—ক্রমে ক্রমে পূজা ও ব্রত করিবার স্পৃহা রূপান্তরিত হইয়া দেশ ও সমাজহিতকর কার্য্যে উদ্যম প্রকাশ করিবে। ব্রত পূজার সংখ্যা হ্রাস করিতে পারিলে প্রচুর রসপানের অভাবে পুরোহিতের সংখ্যাও ক্ষীণাকার ধারণ করিবে। উদরান্নের জন্য ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিবে। পুরোহিতের সংখ্যা হ্রাস হইলে প্রভুতাও ক্ষুণ্ণ হইবে—সামাজিকগণের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বা কোনরূপ সংস্কারে তখন আর হস্তক্ষেপ করিতে পুরোহিত সম্প্রদায় সাহসী হইবেন না। অধুনা যজমানগণ অযথা মান প্রতিপত্তি ও যশের প্রলোভনে সাধ্যাতীত অর্থ প্রতি কার্য্যে ব্যয় করিয়া পুরোহিতগণের স্থূলতা সম্পাদন করায়, উঁহাদের বিষদন্ত উৎপাটিত হইতেছে না—প্রভুতার দংশনে সমাজ জর্জ্জরিত হইতেছে। শুধু কি পুরোহিত শ্রেণীর প্রভুতায় সমাজ উৎপীড়িত? পুরোহিতগণের আত্মীয়-স্বজন যাহারা পৌরোহিত্য না করিয়া, বৈশ্যকর্ম্ম, শূদ্রধর্ম্ম অথবা স্ববৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহারাও পুরোহিতবর্গের ন্যায় সম্মান ও অধিকার সর্ব্বত্র ভোগ করিয়া আসিতেছে। অন্য কোন স্থানে এমন বিস্ময়কর ব্যবস্থা দেখা যায় না। সমাজ বুঝিয়াও নীরবে ইহা হজম করিতেছে। পুরোহিতেরা যখন দলবদ্ধ হয়, তখন ঐ সব শূদ্রধর্ম্মী, বৈশ্যকর্ম্মী আত্মীয়েরাও তাহাদের সহিত যোগদান করিয়া, পুরোহিত-শক্তিকে

দুর্দ্দমনীয়া করিয়া তোলে। যতদিন ব্রাহ্মণ জাতিতে সকল বর্ণের পুরোহিত খুঁজিতে হইবে, ততদিন কোন বর্ণই স্বেচ্ছানুরূপ স্বসমাজের সংস্কার সাধন করিতে পারিবেন না। পরাধীনের ইচ্ছা কোথায় কবে পূর্ণ হইয়া থাকে? আমার বোধ হয়, যদি প্রত্যেক জাতি যুগীপ্রভৃতির মত স্ব স্ব শ্রেণীর মধ্য হইতে পুরোহিত সৃষ্টি করেন, তবে অচিরে সমস্ত জাতি অভ্যুদয় লাভে সমর্থ হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের স্ব স্ব পূজা ব্রত করিবার অধিকার শাস্ত্রসঙ্গত। মুক্তির আস্বাদ যদি লাভ করিতে চাও, পরাধীনতার হস্ত হইতে নিস্তার লাভের উপায় কর। স্ব শ্রেণীর মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তার কর—সংস্কৃত ভাষা-চর্চ্চার পথ প্রশস্ত করিয়া লও—শাস্ত্রানুশীলনে ও পাঠে স্ত্রী পুরুষ প্রত্যেকেরই অধিকার আছে, ঘোষণা করিয়া দাও—পূজা ও ব্রতাদিতে পৌরোহিত্য করিতে ব্রাহ্মণের ন্যায় ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতিরও শাস্ত্রসঙ্গত অধিকারের কথা ব্যক্ত করিয়া, স্ব স্ব শ্রেণীর সদাচার-সম্পন্ন বিদ্বান ব্যক্তিগণকে পুরোহিত পদে বৃত কর। ব্রাহ্মণ-শাসন হইতে একদিকে যেমন অব্যাহতি লাভ করিবে অন্য দিকে, শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপে তোমাদের প্রত্যেকের অধিকারের দেদীপ্যমান নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করা হইবে। স্বশ্রেণীস্থ পুরোহিত সৃষ্টিতে তুমি লাভবান হইবে—তোমার শোণিতসম অর্থ তোমার জাতীয় শরীরেই থাকিয়া যাইবে—শরীরের কৃশতা আনয়ন করিবে না। পক্ষান্তরে স্বশ্রেণীস্থ পুরোহিত নিপীড়ন করিতে চাহিলে তুমি বিড়ম্বিত হইবে না; তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্রদানে বিদায় দিয়া স্বয়ংই ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করিতে পারিবে, কুসংস্কারে বাধা দিতে পারিবে না।

চিন্তা করিয়া দেখ, ইহা তোমার কি বাঞ্ছনীয় নহে? পরগাছায় সমাচ্ছন্ন থাকাই কি তুমি বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিবে? সত্য বটে, বহুদিনের সংস্কার তোমাকে রস প্রদানে অভ্যস্ত করিয়াছে—পদে পদে অধীনতাই তোমাকে আনন্দিত করিতেছে! এ অবস্থার পরিবর্ত্তন তোমার অভিপ্রেত নহে। স্বাধীনতা লাভ করিয়াও যে মানুষ আনন্দ লাভ করে না; অধীনতাই চায়—বহুকালের অধীন জাতির তাহা স্বভাব। আমেরিকার ক্রীতদাসেরা প্রথমতঃ স্বাধীনতা লাভ করিয়াও সে অবস্থায় সুখী হয় নাই—পর পদ-তলে মস্তক ন্যস্ত করিতেই ব্যস্ত হইয়াছিল। ক্রমে স্বাধীনতার সুমধুর আস্বাদ অনুভব করিয়া আজ তাহারা বুঝিতেছে, কি নরক ভোগই এতদিন করিয়াছিল! চিন্তা কর, চিন্তা কর, অধীনতার হীনতা উপলব্ধি করিয়া, সামাজিক স্বাধীনতা লাভ করিয়া, তোমার মনুষ্যত্বের পরিস্ফুট কর—তোমার জাতি ও দেশকে ধন্য কর। মুক্তি-পথের কণ্টক উন্মূলিত করিতে তুমি কি ভীত হইবে—নির্ব্বোধ সাজিবে? তুমি যদি মানুষ হও, তোমার পক্ষে তাহা অশোভন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

নাম-মাহাত্ম্য।*

অনেক দিন হইল, আমি একখানি নৌকা করিয়া কোন স্থানে যাইতেছিলাম। যাইতে যাইতে আমার তরিখানি যখন একটী খালের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন দেখিলাম, নানাজাতীয় বৃক্ষ খালের দুই ধারে শোভা পাইতেছে; বৃক্ষগুলি সতেজ, তাহাদের পাতা ও ডালগুলি রসেতে পূর্ণ। তখন বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে; সূর্য্যদেবও পশ্চিমাকাশে আপনার অঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিতেছেন, এই মনোহর সময়ে প্রকৃতির কোলে বসিয়া, কাহার চিত্ত উচ্চতর বিষয়ের দিকে ধাবিত না হয়? এই সময়ে একজন সাধুর একটী বচন আমার প্রাণে উদিত হইল।

"And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper."

ভাবার্থ,—জলস্রোতের নিকট রোপিত বৃক্ষ যেমন সজীব থাকে, তাহার পত্রগুলি যেমন শুষ্ক হয় না, সময়ে ফল পুষ্প প্রদান করিয়া থাকে, ঈশ্বরানুগত ব্যক্তিরাও সেইরূপ। তাঁহারা যাহা করেন, তাহাতেই ফল লাভ করিয়া থাকেন।

এ বচনগুলি কাহার? য়ীহুদি জাতির রাজা মহাত্মা দায়ুদের। তিনি দায়ুদ নরপতি বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহার গীতাবলীর এই উক্তিগুলি কি সুন্দর!—তখন আমার মনে হইল, সত্যই কি ধার্ম্মিকেরা, ভগবদ্ প্রেমিকেরা, জলস্রোতের নিকট রোপিত বৃক্ষের ন্যায়? তাঁহারা কি সত্যই সজীব ও সরস থাকিয়া মানবের চিত্ত হরণ করিয়া থাকেন? মন সায় দিল, দায়ুদ নরপতির উক্তিগুলি কেবল সুললিত কবিত্বপূর্ণ সঙ্গীত নহে; উহা অধ্যাত্ম জীবনের পরীক্ষিত সত্য।

দায়ুদ নরপতির উক্তিগুলির মধ্যে ভগবদ্ ভক্তের জীবন যে সরস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কারণ কি? সেই রসস্বরূপ পরমেশ্বরের সহিত যাঁহার চিত্তের যোগ স্থাপিত হইয়াছে, যিনি ভগবানের মঙ্গলময় নিয়ম অনুধ্যান ও পালন করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হন, তাঁহার চিন্তা, তাঁহার কার্য্য, তাঁহার বাক্য, মধুময় হইয়া উঠে। সলিল-তীরবর্ত্তী বৃক্ষলতাদি যেমন প্রখর সূর্য্যের তাপেও সহজে মলিন হয় না, হইলে শীঘ্রই আবার নবীনত্ব প্রাপ্ত হয়, ঈশ্বরানুগত চিত্তও তদ্রূপ। কেবল দায়ুদ কেন, সকল দেশের ভক্তেরাই একবাক্যে এই মর্ম্মের কথার সাক্ষ্য দান করিয়া গিয়াছেন।

কিরূপে জীবন সরস হয়, কিরূপে প্রাণ মধুময় হয়, এ বিষয়ে সকল দেশের ভক্তেরা একই কথা বলিয়া গিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। সে কি কথা, ভগবৎ প্রেম লাভে—তাঁহার মননে, তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনে।

দায়ুদ নরপতি প্রথমে বলিয়াছেন, যাঁহারা

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু কর্ত্তৃক বিবৃত।

সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিয়ম অনুধ্যান করেন, তাঁহার নিয়ম পালনে আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহাদের জীবনই সরস হয়,—তাঁহাদের চিত্তই মধুময় হয়। পরমেশ্বরের নিয়ম পালন বলিলে আমাদের সম্মুখে অনেকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আসিয়া উপস্থিত হয়। যথা, শারীরিক,মানসিক ও আধ্যাত্মিক। কিন্তু সর্ব্বোপরি আধ্যাত্মিক ভাবই আমাদের সকল কর্ত্তব্যকে মধুময় করে,—সকল অনুধ্যানকে জীবন্ত করিয়া তুলে।

এমন লোক ত অনেক সময়ে দেখা যায়, বিশাল জ্ঞানের অধিকারী, কিন্তু চরিত্র নাই। সামান্য নিরক্ষর লোকের মধ্যে যে মনুষ্যত্ব দেখা যায়, তাঁহার মধ্যে তাহার পঞ্চমাংশের একাংশও অনেক সময় দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি ঈশ্বরভক্ত ইংলণ্ডের ঋষি সদৃশ কার্ডিন্যাল নিউম্যানের ন্যায় জ্ঞানের সার্থকতা দেখাইয়া এ জীবনপ্রদ কথা বলিতে পারেন না।

> "Lead kindly Light,
> Amidst the encircling gloom
> Lead thou me on—"

ভাবার্থ, হে ভগবান, দেখ চারিদিকে ঘোর অন্ধকার! তুমি দয়াময়, জ্যোতির জ্যোতি,—তোমার আলো প্রকাশ করিয়া, আমাকে জীবন-পথে লইয়া চল।

অথবা নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্যের ন্যায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরি ও সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক সার্ব্বভৌমাচার্য্যকে বিচারে পরাস্ত করিয়া এরূপ মধুর বিনয়ের কথা বলিতে পারেন না,

> "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
> অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

যে ব্যক্তি তৃণাপেক্ষাও নীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু—অর্থাৎ বৃক্ষ-ছেদনকারীকেও সে যেমন ছায়াদান করে, এবং যে ব্যক্তি নিরভিমানী হইয়া, অপরকে মান দান করে, সেই ব্যক্তিই হরিগুণ কীর্ত্তনের যথার্থ অধিকারী।

শারীরিক শক্তি আছে,—কিন্তু সে শক্তি পশু প্রকৃতির ন্যায়ই অনেক সময় মানব-সমাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পরমেশ্বরের শক্তি প্রাণে অনুভব করিতে না পারিলে মানব আপনার শারীরিক শক্তি ও নরসেবায় বা দুর্ব্বলের রক্ষায় যথাযথরূপে নিয়োগ করিতে সমর্থ হয় না। অধ্যাত্ম-শক্তিই সকল শক্তিকে উচ্চতরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকে,—প্রাণে নবভাবের সঞ্চার করিয়া থাকে।

খাল বিলের নিকটবর্ত্তী সুরসাল ফল-পুষ্পযুক্ত বৃক্ষের ন্যায় জীবন-তরুকে সরস রাখিবার উপায় কি? ভক্তির ইতিবৃত্তে ভক্তেরা বলিয়াছেন, নাম জপ, নাম সাধন, নাম কীর্ত্তন, এই সকলই অধ্যাত্ম জীবন লাভের পরম সহায়। ভক্ত বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন, নামেতে তাঁহাতে কোনও প্রভেদ নাই। নাম এবং নামী একই।

> "নামেতে তাঁহাতে নাহিক প্রভেদ
> ভাব ওরে মন ভাবিয়ে অভেদ।"

সাধক যখন যে ভাবে ভগবানের নাম গ্রহণ করেন, তখন তিনি সেই ভাবেই তাঁহার আত্মস্বরূপ তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন।

নাম মাহাত্ম্য কেবল যে আমাদের দেশের বৈষ্ণব সাধুরা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। পুরাণাদি গ্রন্থে দেখা যায়, নারদ মুনির উক্তিতে নানাস্থান পূর্ণ রহিয়াছে। তিনি বীণা যন্ত্র হস্তে করিয়া হরিনামের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন। দেবর্ষি নারদ নবজীবন লাভ করিয়া, নর-

নারীর নিকট এই সত্য ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভগবানের নামে মহা পাতকী উদ্ধার হয়, পাপী নব জীবন লাভ করে। তাঁহার বীণা মধুর ঝঙ্কারে এই কথাই ঘোষণা করিত যে, সেই সত্যম, শিবম ও সুন্দরমের নামে নরনারীর প্রাণে মধুর ধারা বহিয়া যায়, জীবন-তরু রসযুক্ত হইয়া নবীনভাব ধারণ করে।

ইজরেল বংশের রাজা দায়ুদ নরপতি তাঁহার মধুর গীতাবলীর মধ্যে কি সুন্দর কথাই বলিয়াছেন,

—"Praise the Lord. While I live will I Lord: yea, as long as my being, I will sing prais my God."

মন! ভগবানেরই মহিমা কীর্ত্তন কর। প্রভো! যতদিন দেহে প্রাণ থাকিবে, আমি তোমারই মধুর নাম কীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত করিব।

এইরূপ কথা কি একবার বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইয়াছিলেন? না না, তাঁহার গীতাবলী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, তিনি অনেক স্থলেই পরমেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন।

বৈদিক ঋষিরা ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ ও ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হইলেও তাঁহারা সেই ভূমানন্দের স্তবস্তুতিতে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতেন,—হৃদয়ের অদৃশ্য বীণার দ্বারা মঙ্গলময়ের মহিমা কীর্ত্তনে রসনার পরিতৃপ্তি সাধন করিতেন; হৃদয়ের অন্তঃস্তল প্রেমরসে সিক্ত করিতেন।

নামের কোন রূপ নাই, উহা চক্ষে দেখা যায় না, কোন গন্ধও নাই, নাসিকা দ্বারা তাহার আঘ্রাণ লওয়া যায় না। অথবা অণু-পরমাণু বিশিষ্ট এমন কোন বস্তুও নয় যে, স্পর্শের দ্বারা আমরা কোন ইন্দ্রিয়-সুখ অনুভব করিতে পারি; অথচ প্রেমিকেরা বলেন, রূপ, রস, গন্ধ না থাকিলেও নাম উচ্চারণে অরূপের রূপমাধুরীতে চিত্ত বিমোহিত হইয়া পড়ে; আত্মা বহিরিন্দ্রিয়ের বস্তু অপেক্ষা এক নির্ম্মল, অপার্থিব বস্তুর স্পর্শে যেন তন্ময় হইয়া যায়। শত শত সুগন্ধযুক্ত গোলাপ অপেক্ষা নামের সৌরভে প্রাণকে বিভোর করিয়া ফেলে।

তবে শব্দের কি এতই গুণ, এতই ভারতের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই না যায়, শব্দ ব্রহ্ম; ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের সার কথা। ভারতের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ, মানব সভ্যতার বিকাশ-সূচক আদি ধর্ম্মগ্রন্থ—বেদ, উহা ব্রহ্মবাণী বা আপ্তবাক্য বলিয়াই পূজ্যপাদ আর্য্য-ঋষিরা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় বাইবেল গ্রন্থে দার্শনিক জন্, তাঁহার গ্রন্থারম্ভের প্রথমেই বলিয়াছেন,—

"In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God."

আদিতে কেবল মাত্র বাক্যই ছিলেন; বাক্যই ভগবানের সহিত একীভূত হইয়াই বাস করিতেন, সেই আদি বাক্য পরব্রহ্ম ভিন্ন আর অন্য কিছুই নহে।

আমরা প্রতিনিয়তই শব্দের শক্তি দর্শন করিতেছি। সংসারে যাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসা যায়, তাহার নাম শ্রবণ বা উচ্চারণে অন্তরের মধ্যে এক আনন্দ ধারা বহিয়া যায়। সাপুড়েরা গর্ত্তের নিকট মধুর রবে বীণা বাজাইতে থাকে, এই বীণার রবে বিষধর আপনার হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, বাদকের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে। অরণ্যমাঝে কুরঙ্গের দল, ব্যাধের চিত্ত-বিমোহন

বীণার রব শ্রবণে বহুদূর হইতে ছুটিয়া আসে, এবং মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নীরবে দাঁড়াইয়া বীণার ধ্বনি শ্রবণ করে; হায়! যে পর্য্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যাধের বাণে তাহার প্রাণ ক্ষতবিক্ষত না হয়, সে পর্য্যন্ত আর সে স্থান পরিত্যাগ করিতে পারে না।

সেই অনাদি পরম সুন্দর পুরুষের স্বরূপা-নুসারে সাধক আপনার মনোমত, তাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া, সেই পরিত্রাণপ্রদ নামে, প্রাণে সুখ ও আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, ভক্ত বৈষ্ণবেরা এই নামের প্রভা নাই। দেশে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন, মনুষ্যত্ব নামের গুণেই সহস্র সহস্র মহাপাপী ংশের ত্রাণ লাভ করিয়াছিল। দাম্ভিক তৃণা। দীন হইয়া সকলের চরণে আপনার মস্তক অব-নীত করিয়াছিল। ধনী অতুল ঐশ্বর্য্য ঠেলিয়া ভগবৎ প্রেমে আত্মহারা হইয়া-ছিল। জাতিভেদের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া উচ্চবংশের লোকেরা নিম্নশ্রেণীর লোকের কণ্ঠালিঙ্গনে পরস্পরের চক্ষের জলে, আপনা-দিগের বক্ষঃস্থল সিক্ত করিয়াছিল। এই নামেরই প্রভাবে চ্যবন ব্রাহ্মণের ন্যায়ই পূজিত হইয়াছিলেন, এবং নিম্নবর্ণের লোকেরা গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ-দিগকে মন্ত্রদান করিয়া শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া-ছিলেন। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যখন বঙ্গদেশে বর্ণভেদের প্রভাবে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল;—যখন চণ্ডালের ছায়াস্পর্শে সমাজ মানুষকে স্নান করিয়া শুচি হইবার বিধি প্রদান করিয়াছিল, তখন কিসের প্রভাবে সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া শত শত লোককে একসূত্রে বাঁধিতে সমর্থ হইয়াছিল? —জ্ঞানের প্রভাবে? পুস্তক বা শাস্ত্রের শ্লোকের প্রভাবে? না না, ভাবের প্রভাবে, হৃদয়ের প্রভাবে, ব্রহ্মনামের প্রভাবে। নাম সঙ্কীর্ত্তনে যখন বঙ্গদেশ টলমল করিয়া উঠিল, বহুদিনের দেশাচারের শৃঙ্গ আপনা আপনি ছিন্ন হইতে লাগিল, তখন লোকে পূর্ব্বে যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে করিত, তাহা সম্ভব হইল দেখিয়া অবাক হইয়া গেল! ইহাকেই বলে নামের শক্তি। এই শক্তি যখন নর-নারীর প্রাণে জাগিয়া উঠে, তখনই মানব এক নব বলে বলীয়ান হইয়া, এক দিব্যজ্ঞান লাভ করতঃ সমাজ মধ্যে যেন যাদুকরের ন্যায় উচ্চতরভা করিয়া থাকে। মানুষ যখন সাধন নবভাবের সঞ্চা নাম শ্রবণমাত্র তাঁহার সমস্ত থাল -এক ভাবের স্রোত প্রবাহিত পুলকাশ্রু অশ্রু লক প্রভৃতি ভক্তির লক্ষণ সকল তখন তাঁহাতে প্রকাশ পায়। সকল কার্য্যের মধ্যে প্রেমাস্পদের প্রেম লাভই তখন তাঁহার প্রকৃতিগত হইয়া দাঁড়ায়—তাঁহার দ্বিতীয় স্বভাব হইয়া উঠে। সকল বিভাগেই সাধনার শক্তি ও অভ্যাসের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত সুবি-খ্যাত অধ্যাপক জেমস্ তাঁহার মনোবিজ্ঞান নামক গ্রন্থে অভ্যাসের শক্তি সম্বন্ধে এই মর্ম্মের একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন। একবার এক সৈনিক পুরুষ প্লেটে করিয়া খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইতেছিল। এমন সময় সেনাধ্যক্ষ তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিলেন, Order. খাদ্যদ্রব্যবাহী সেনার কর্ণে যেই এই কথা প্রবেশ করিল, অমনি তাহার হস্তস্থিত খাদ্য-পূর্ণ পাত্র ভূতলে পতিত হইয়া গেল; সে প্যারেডের সময় ঐ অনুজ্ঞায় যেরূপ সংযত-ভাবে দণ্ডায়মান হয়, সে তখন যথারীতি

আপনার বাহুদ্বয় স্থাপন করিয়া, সেইরূপে দণ্ডায়মান হইল। ভক্তির ইতিবৃত্তেও মানব হৃদয়ে ভক্তির এইরূপ প্রভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বিশেষ সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে পরম ভক্ত বলিয়া অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি যখন নবদ্বীপে আগমন করেন, তখন তাঁহার সহিত হস্তী, অশ্ব ও বহুসংখ্যক দাসদাসী আসিয়াছিল। তিনি রাজার ন্যায়ই আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনের পর পরম ভক্ত গদাধর ও সুগায়ক মুকুন্দ দত্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। তাঁহারা গিয়া দেখিলেন, বিদ্যানিধি সুসজ্জিত পর্য্যঙ্কে সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর বসিয়া আলবালায় ধূম পান করিতেছেন; নানা বর্ণের উপাধান সকল তাঁহার চারিদিকে শোভা পাইতেছে। রূপার ডিপাসকল সুগন্ধিযুক্ত তাম্বুলে পূর্ণ রহিয়াছে। চিরকুমার ভক্ত গদাধরের মনে হইল, প্রভু এমন সৌখিন বাবুকে কিরূপে ভক্ত বলিয়া ভালবাসেন। পুণ্ডরীকের বিলাসিতা দেখিয়া, গদাধরের তাঁহার প্রতি ভক্তের বিপরীত ভাবই মনে হইতে লাগিল। গদাধরের মনোগত ভাব বুঝিয়া মুকুন্দ দত্ত ভাগবতের একটী শ্লোক সুস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। গানের সুললিত ধ্বনি পুণ্ডরীকের কর্ণে প্রবেশ মাত্র তাঁহার হৃদয়-তন্ত্রী যেন বাজিয়া উঠিল। তাঁহার আরাধ্য দেবতার আবির্ভাবে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া পড়িল। তিনি অস্থির হইয়া, শয্যা হইতে নামিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, এবং "গাও গাও," "আবার গাও" বলিতে বলিতে সংজ্ঞাহারা হইলেন। গদাধর দেখিয়া অবাক্। বিদ্যানিধি চেতনা লাভ করিলে গদাধর তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিলেন, আপনি যে এত বড় ভক্ত, তাহা বুঝিতে পারি নাই, আপনাকে অন্যরূপ ভাবিতেছিলাম, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। ইহাকেই বলে নাম সাধন; ইহাকেই ভক্তেরা নামানুরাগ বলিয়া থাকেন। যেমন সেনানায়কের Order কথায় সৈনিক পুরুষের হস্তস্থিত প্লেট ভূতলে পড়িয়া গিয়াছিল, বিদ্যানিধিরও ভাগবতের শ্লোক শ্রবণে তাঁহার উপাস্য দেবতার কথা হৃদয়ে উদিত হইয়া তাঁহার চিত্তকে মাতাইয়া তুলিল—ঐশ্বর্য্যের অতীত করিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রেমস্বরূপ দেবতার নিকট উপনীত করিল।

এই সকল ঘটনা এই প্রকাশ করিতেছে যে, শব্দের এক অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে। উহা যে কোন ভাবেই হউক, মানব-হৃদয়ে কার্য্য করিয়া থাকে। এই জন্যই ভক্তেরা বলেন, নাম সাধন কর, নাম শ্রবণ কর, নাম গান কর, ক্রমে তোমার ইষ্টদেবতার নাম শ্রবণমাত্র তাড়িৎ প্রবাহের ন্যায় তোমার হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দের ধারা বহিতে থাকিবে। এই জন্যই মহাত্মা শ্রীচৈতন্য, তুকারাম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঈশ্বর-প্রেমিকেরা নাম-মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছিলেন, এবং নামের পরিত্রাণপ্রদ শক্তিতে, শত শত মানবকে পবিত্রতার পথে, শান্তির পথে ও আনন্দের পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন! ভারতে বিশ্বজনীন, মানবের পরিত্রাণপ্রদ ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ের কয়েক বৎসর পরে যখন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম মত ঘোষণা করিয়া, চারিদিক তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার উৎসাহী শিষ্যেরা নবালোকে আলোকিত হইয়া সেই নিরাকার, চিন্ময়,

পরমেশ্বরের প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া, কি মধুর স্বরেই ব্রহ্মের নাম-মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছিলেন,—তাঁহাদিগের সেই পুরাতন সঙ্কীর্ত্তনটী এখানে যথাযথ উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

দয়াময় কি মধুর নাম।
আমার নাম শুনে প্রাণ জুড়াল রে, কি মধুর নাম।
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে, কি মধুর নাম।
এ নাম কোথা ছিল কে আনিল, কি মধুর নাম।
এ নাম জীব তরাতে এসেছিল, কি মধুর নাম।
এ নাম তোমরা বল আমরা শুনি, কি মধুর নাম।
নামে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল, কি মধুর নাম।
নামে মরা মানুষ বেঁচে গেল, কি মধুর নাম।
আমার নামে অঙ্গ শীতল হ'ল, কি মধুর নাম।
আমার পাপ তাপ সব দূরে গেল, কি মধুর নাম।

ব্রহ্মোপাসকেরা এই মধুর সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে, আনন্দে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। কে বলে নিরাকার পরমেশ্বরের নাম-কীর্ত্তনে প্রাণ উন্মত্ত হয় না? কাল্পনিক উপাস্য দেবতার নাম কীর্ত্তন অপেক্ষা সেই চিন্ময় পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তনে প্রাণে অধিকতর আনন্দের সঞ্চার হইবারই কথা। কিন্তু সকলেরই মূলে অটল বিশ্বাস, ভক্তি ও নিষ্ঠার প্রয়োজন। যাঁহার উক্তি লইয়া অদ্যকার বক্তব্য বিষয় আরম্ভ করিয়াছি, সেই দায়ুদ নিরাকার পরমেশ্বরেরই উপাসক ছিলেন। তিনিও বীণাযন্ত্রে সেই মধুর স্বরূপ পরমেশ্বরের মহিমা নিরন্তর কীর্ত্তন করিতেন। যাঁহারা বলেন, নিরাকারে হৃদয়ে প্রেমোদয় হয় না, তাঁহারা কি ভ্রান্ত!

আমরা যতই সেই প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিব—যতই সেই নাম অন্তরে সাধন করিব, ততই আমাদের প্রাণ সরস হইবে—প্রাণ মধুময় হইবে—আমরা অপার আনন্দের অধিকারী হইব।

এই রসাল ভগবানের নামে, জলস্রোতের নিকট রোপিত বৃক্ষের ন্যায় আমাদের প্রাণ সর্ব্বদা সরস ও সজীব থাকিবে, আমাদের জীবন মধুময় হইবে, এবং ক্রমে আমাদের জীবনের সকল কর্ত্তব্যকেও মধুময় করিয়া তুলিবে।

শ্রীশশিভূষণ বসু।

"নরহরি ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী"র প্রতিবাদ।

নব্যভারতের গত বৈশাখ সংখ্যায় "নরহরি ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। শীর্ষ দেখিয়া প্রথমে মনে হইয়াছিল যে, নরহরি ঠাকুরের জীবনী গৌরাঙ্গভক্তদিগের গ্রন্থ ও পদাবলীতে যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, লেখক তাহা সংগ্রহ করিয়া, স্বীয় প্রবন্ধ রচনা করতঃ, নব্যভারতের পাঠকদিগকে উপহার দিয়াছেন। পরন্তু প্রবন্ধ আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, উহা নরহরি সরকারের জীবন বৃত্তের কয়েকটী সুবিদিত কথা সহ বহু অবান্তর কথায় পরিপূর্ণ। অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে,

প্রবন্ধলেখক নরহরি ঠাকুরের জীবনী উপলক্ষ করিয়া, স্বীয় গূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্ত কতকগুলি অমূলক ও অপ্রাসঙ্গিক কথা প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। উহা যদি গৌরাঙ্গভক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোনরূপ উপকারে আসিত, তাহা হইলেও না হয় উপেক্ষণীয় হইতে পারিত। উক্ত সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ যখন জাতিভেদ মানেন না, অধিকন্তু নরহরি ঠাকুরকে তাঁহারা দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তখন তাঁহাদের নিকট নরহরি ঠাকুরের জাতি পরিচয় ইদানীং নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও নিষ্প্রয়োজন, সন্দেহ নাই। প্রবন্ধলেখক কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া নরহরি বৈদ্যবংশে জন্মলাভ করিয়াছিলেন, এবং সেই বৈদ্যজাতি এক প্রকার (অর্থাৎ অম্বষ্ঠ) ব্রাহ্মণ এবং তাহা না হইলে সমাজের আব্রাহ্মণ সকল জাতি এ পর্য্যন্ত নরহরির বংশধরদিগের মন্ত্রশিষ্য হইয়া থাকিতে পারিত না, এইরূপ হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন নরহরির বংশে দুইজনের নামের উত্তর তালব্য "শ" যুক্ত "দাশ" উপাধির প্রয়োগ এবং অন্যান্য বৈদ্যবংশে "শর্ম্মা" উপাধির উল্লেখ করিয়া, তিনি স্থির করিয়াছেন যে, অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ পরবর্ত্তীকালে বৈদ্যক ব্যবসা অবলম্বন করিয়া বৈদ্য জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। প্রবন্ধলেখকের এই সকল উক্তি কতদূর সত্যমূলক ও সঙ্গত, তাহা আমরা নিম্নে আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ। প্রবন্ধলেখক নরহরি ঠাকুরের যে একটী বংশলতা দিয়াছেন, তাহাতে উর্দ্ধতন একাদশ পুরুষকে তিনি নরহরি বংশের বীজপুরুষ বলিয়াছেন। তাঁহার নাম "পান্থদাশ"। নরহরির পিতার নাম "নারায়ণ দাশ"। এই লতায় আর যে সকল নাম আছে, তাহাদের উত্তর "দাশ" বা অন্য কোন উপাধি লিখিত হয় নাই। এই বংশলতা কোথা হইতে সংগৃহীত বা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণও প্রদর্শিত হয় নাই। প্রমাণ থাকা অসম্ভবও নহে। কিন্তু এই বংশলতার দুই স্থানে তালব্য "শ" যুক্ত "দাশ" শব্দ যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সেই অপ্রদর্শিত মূল প্রমাণে ঠিক আছে, কি তথায় দন্ত্য "স" যুক্ত "দাস" শব্দ আছে, তাহা জানা যায় না। আমরা বিবেচনা করি, দন্ত্য "স" যুক্ত "দাস" শব্দ থাকাই সম্ভব। কেন না, সচরাচর দেখা যায়, আমাদের নামের একটা আভিধানিক অর্থ থাকে, আর উপাধি বংশ পরিচায়ক হয়। পান্থদাস ও নারায়ণদাস শব্দের দাসশব্দ উপাধি নহে, পরন্তু নামেরই একাংশ বলিয়া বোধ হয়। এস্থলে পান্থদাস বলিলে পথিকের সেবক, নারায়ণদাস বলিলে নারায়ণের সেবক, এই অর্থ যেরূপ সঙ্গত হয়, পক্ষান্তরে ঐ "দাস" শব্দকে ব্রাহ্মণ উপাধি "দাশ" বলিয়া গ্রহণ করিলে ক্রমান্বয়ে "পান্থদাশ" বলিলে পথিক ব্রাহ্মণ এবং "নারায়ণদাশ" বলিলে নারায়ণ ব্রাহ্মণ অর্থ সেরূপ সঙ্গত হয় না। সমাজ ব্যবহারেও রামব্রাহ্মণ, শ্যামব্রাহ্মণ, নারায়ণব্রাহ্মণ, এরূপ বলিবার নিয়ম নাই। প্রবন্ধলেখকের প্রদর্শিত বংশলতায় বারটী নামের মধ্যে উপরি উক্ত কেবল দুইটী নামের উত্তর "দাশ" শব্দ প্রযুক্ত আছে। ইহাতে প্রতীত হয়, এই দুই স্থলে দন্ত্য "স" যুক্ত "দাস" শব্দ নামের একাংশরূপে ব্যবহৃত আছে। প্রবন্ধলেখক ইচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া "দাস" শব্দস্থলে তালব্য "শ" যুক্ত "দাশ" শব্দের অযথা প্রয়োগ করিয়াছেন। যদি বল ভৃত্য অর্থেও ত তালব্য "শ"

যুক্ত "দাশ" শব্দ কদাচিৎ নিষ্পন্ন হইতে পারে * সুতরাং দন্ত্য "স" যুক্ত "দাস" শব্দকে তালব্য "শ" যুক্ত "দাশ" শব্দে পরিবর্ত্তিত করিবার প্রবন্ধলেখকের কোন প্রয়োজন নাই। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রবন্ধলেখক যদি সেরূপ অর্থে "দাশ" শব্দের প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে তিনি বৈদ্য জাতিকে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রবন্ধে নির্দ্দেশ করিতে ব্যস্ত হইতেন না। সুতরাং তিনি নরহরির জীবন-লতায় যে "দাশ" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা ব্রাহ্মণ অর্থে † প্রতীত হইতেছে। আবার যদি প্রবন্ধলেখকোক্ত বৈদ্যের ব্রাহ্মণবাচী "শর্ম্মা" উপাধি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে নরহরির বংশলতিকায় যে "দাশ" শব্দের প্রয়োগ, তাহা ব্রাহ্মণ অর্থ বুঝাইবার অভিপ্রায়ে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, নরহরি যদি ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব ব্রাহ্মণই ছিলেন, তবে তাহার প্রমাণ অবশ্যই কোন না কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে বিদ্যমান থাকিত। প্রবন্ধলেখক সে প্রমাণ আহরণ করিতে আলস্য করিয়াছেন কেন? আবার তিনি কুলপঞ্জিকা বা কারিকাকে পুরাণের ন্যায় এক প্রকার ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া আমাদিগকে মনে করিতে বলিয়াছেন। বাস্তবিক সেরূপ কেহ মনে না করিলেও, উহারা জাতিবিশেষের কতকটা বংশচরিত্র পরিচায়ক বটে। মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক-কৃত চন্দ্রপ্রভা ও কবিকণ্ঠহারকৃত কারিকা যে বৈদ্য জাতির বংশ-পরিচায়ক প্রামাণিক গ্রন্থ, উহা সকলে স্বীকার করেন। প্রথমোক্ত কারিকা হইতে যে কতকাংশ প্রবন্ধলেখক স্বীয় প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে দন্ত্য "স" যুক্ত "দাস" শব্দ উপাধি-রূপে প্রযুক্ত দেখা যাইতেছে। তদ্ভিন্ন ঐ চন্দ্রপ্রভার গ্রন্থকার অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যকে "কলৌ শূদ্রসমা মতাঃ" বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে পাঠকগণ কি বুঝিবেন?

দ্বিতীয়তঃ। অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া কোন জাতি ভারতবর্ষে কখন বিদ্যমান ছিল, ইহার প্রমাণ নাই। মন্বাদি শাস্ত্র প্রমাণে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বৈশ্যায় অনুলোমোৎপন্ন এক প্রকার সঙ্কর জাতি। চিরকাল সমাজে বৈদ্যক-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। বৈধ অম্বষ্ঠ বৈশ্যাচার অনুসরণ করিতেন। কলিতে তাঁহারা আচার-ভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রাচার হইয়াছেন। সে জন্য স্মার্ত্ত রঘুনন্দন কলিতে অম্বষ্ঠগণ আচারহীন, ইহা স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বৈদ্য জাতি মহাভারত প্রমাণে শূদ্র বিশেষ উল্লিখিত হইয়াছে। সে জন্য তাহাদের উপনয়নাদি সংস্কারের কোন সম্ভাবনা কখনও ছিল না। সুতরাং তাহাদের দন্ত্য "স" যুক্ত দাসোপাধিই স্বাভাবিক। নরহরি ঠাকুর যদি বিশুদ্ধ অম্বষ্ঠ বংশোদ্ভূতও হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার গলায় পৈতা থাকা অসম্ভব হইত না। কিন্তু পদাবলীতে তাঁহার গলায় লম্বা মালা থাকার উল্লেখ দেখিতেছি। যথা—

প্রতপ্ত স্বর্ণাভং ভাবভরণ ভূষিতং।
নীলাবাসোধরং দিব্যং চন্দনোহিতঃ ভালকং॥
নামসূত্র প্রদাতারং কণ্ঠে বিপুল লম্বিতং।
দিব্য সিংহাসনাসীনং শ্রীমন্নরহরিং ভজে॥

ইতিহাস-পাঠকের নিকট ইহা বলা বাহুল্য যে, ঢাকার রাজা রাজবল্লভের পূর্ব্বে বৈদ্য জাতির মধ্যে উপনয়নের কোন প্রসঙ্গ ছিল না। ইদানীং কেহ কেহ আবার পৈতা

* দাশ্যন্তে ভৃতিরস্মৈ (রমানাথ)।
† দাশৃ—দানে দাশ্যন্তাস্মৈ দাশোবিপ্রঃ।

লইতেছেন এবং আপনাদিগকে একপ্রকার ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে সাহসী হইয়াছেন।

তৃতীয়তঃ। অব্রাহ্মণ সকল জাতির লোকই নরহরি ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ইহা তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ চৈতন্য-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ জাতি, বর্ণ, কুলাচার কিছুই মানিতেন না। তাঁহারা প্রেমের বন্যায় সমস্ত ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণাদি যে কোন জাতি সেই প্রেমলাভে প্রয়াসী হইতেন, তাঁহারাও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন। পাঠকগণ বোধ হয় শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের নাম অবগত আছেন। সে স্থানের গোস্বামিগণ প্রথমতঃ করণজাতীয় ছিলেন, তৎপরে বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আপনাদিগকে "গোস্বামী" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের শিষ্য আছেন। কিন্তু সেই সমস্ত বৈষ্ণবীভূত ব্রাহ্মণ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত সমান অধিকার লাভে বঞ্চিত হইয়া আছেন। নরহরির শিষ্য ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণসমাজে কিরূপ আদর লাভ করিতেছেন, তাহা আমরা অবগত নহি।

চতুর্থতঃ। নরহরি সরকার জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। তিনি অথবা তাঁহার বংশের কেহ "শর্ম্মা" উপাধি কখনও ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ আমরা অবগত নহি। অথচ "নরহরি ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী" উপলক্ষ করিয়া প্রবন্ধলেখক "ধান ভানিতে শিবের গীতের" ন্যায় বৈদ্য জাতির শর্ম্মা-উপাধির বিষয় তথাকথিত প্রমাণ সহ উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ প্রমাণে "দাশ" ব্যতীত "কর" "ধর" "গুপ্ত" "সেন" প্রভৃতি আরও কয়েক ঘর বৈদ্যের "শর্ম্মা" উপাধির নির্দ্দেশ আছে। আজকাল দেখা যায়, নব্যদলের কতকগুলি বৈদ্য ও তাঁহাদের বন্ধুগণ বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ মিশ্র বৈদ্যজাতিকে একপ্রকার ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করিবার জন্য দাসোপাধিক বৈদ্যের উপাধিতে তালব্য "শ" যুক্ত "দাশ" ও "শর্ম্মা" শব্দ এবং অন্য কয়েক ঘর বৈদ্যের উপাধির উত্তর কেবল "শর্ম্মা" শব্দ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এদিকে প্রবন্ধলেখকের মতে পুরাণের তুল্য যে কুলপঞ্জিকা, তাহাতে বৈদ্যের উপাধিতে "শর্ম্মা" বা "দাশ" শব্দের কুত্রাপি প্রয়োগ নাই। এ বিষয়ে যে প্রমাণটী প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত আধুনিক ও নব্য বৈদ্যগণের স্বকপোলকল্পিত। এই প্রতিবাদ-লেখক একজন দাসোপাধিক উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। আমাদের শ্রেণীর কতকগুলি ঘর ব্রাহ্মণ বহুকাল পূর্ব্ব হইতে পুরী, কটক, বালেশ্বর, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় বসবাস করিয়া আসিতেছেন। আমাদের মধ্যে যে উৎকলকারিকা প্রচলিত আছে এবং যাহার প্রমাণ স্বর্গীয় লালমোহন বিদ্যানিধি স্বীয় সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থে প্রামাণিক বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এই :—

করশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মাচ গৌতমঃ
আত্রেয় রথশর্ম্মাচ নন্দশর্ম্মাচ কাশ্যপঃ
কৌশিকো দাশশর্ম্মাচ পতিশর্ম্মাচ মুদ্গলঃ ॥

নব্যভারতের পাঠকগণ দেখুন, এই প্রমাণে গুপ্ত, সেন ও রক্ষিত উপাধির কোন নির্দ্দেশ নাই। আমাদের উৎকল ব্রাহ্মণসমাজে তাদৃশ উপাধির কোন ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব দেখা যায় না।

শ্রীভাগবতচন্দ্র দাস

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

অনন্ত কারণ-জলে
বিকসিত শতদলে,
শোভে যথা আদি কবি বেদ-কর্ত্তা বিধি,
ভারতে বিরাজে রবি,
অনন্ত বিলাসী কবি,
বাগ্দেবীর দুগ্ধপোষ্য অঞ্চলের নিধি।
প্রেম-পুলকিত চিতে
সুমধুর সাম গীতে,
চতুর-আনন যথা মোহিল ধরণী,
তেমতি পরমানন্দে
নিত্য নব নব ছন্দে
মোহিছেন চরাচরে কবি-চূড়ামণি।
সঙ্গীতের অবভাসে
কল কল কলোচ্ছ্বাসে,
আনন্দ-সাগরে ভাসে অখিল সংসার।
দার্শনিক ভাব চিত্র
ছন্দে বন্ধে সুবিচিত্র
করে নিত্য জগতের চিত্ত চমৎকার।
কাব্য কমলেতে শুধু
মধুর রসের মধু,
মুমূর্ষু প্রাণেও করে জীবন সঞ্চার!
প্রেমরঙ্গে 'জয়' 'জয়'
গাহে দিগঙ্গনাচয়,
কেহ করে স্তুতি কেহ দেয় উপহার।
পান করি গীত ধারা
তৃপ্তিহীনা বসুন্ধরা,
কে পারে অমৃত পানে তৃপ্তিতে উদর।
যতই বুঝি সে বাণী,
তত মধুরতা মানি,
ততই আকুল রহে অতৃপ্ত অন্তর।
কবির "সোণার নৌকা"
আঁকে অনন্তের রেখা;
মানসী আরসি মাঝে অসীমের ছায়া।

প্রভু পদে গীতাঞ্জলি
প্রীতি-প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি!
ফাল্গুনী আঁকিছে আদি কারণের কায়া।
প্রভাত সঙ্গীত-সুধা
জুড়ায় ভবের ক্ষুধা,
কল্পনা কবিত্ব হেন কি আছে ধরায়?
তাহারি বিশিষ্ট অঙ্গ
নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ,
ভাবের তরঙ্গ যাহে রঙ্গে বয়ে যায়!
যদ্যপি নির্ব্বোধ আমি
এই বাক্য মনে মানি
স্বতঃ উচ্ছ্বসিত যাহা হৃদয়-কন্দরে;—
সেই কবি এ ধরায়,
যার প্রাণ ডুবে যায়,
[illegible]ন্তর অন্তহীন সৌন্দর্য্য-সাগরে।
সকল ব্রহ্মাণ্ডময়
'জয়' 'জয়' শব্দ হয়,
অম্বরে সাগরে শৈলে গায় প্রতিধ্বনি;—
ঋষিবংশ-অবতংশ
ব্রহ্মসাগরের হংস
জয় বিশ্বকবিকুল শিবচূড়ামণি!"
কবির রুধির ধারা
সদৃশ আপন যারা,
প্রাণাধিক, প্রিয়, বন্ধু, সখা, সহোদর,
তাহাদেরি কয় জাতি
কহে ভ্রান্তি মদে মাতি,
কলঙ্কিছে বঙ্গভাষা কবি কুলেশ্বর।
বড় বিচক্ষণ কথা,
নহে কিছু বিচিত্রতা,
সাধু, সাধু, ধন্য মানি সহ বন্ধুগণ!
শুভাবহ অভিলাষ
করিয়াছ পরকাশ
সবাকারে করি আমি সুখে আলিঙ্গন।

একবার হে বিবেকি!
যদি বিচারিয়া দেখি,
অণুমাত্র দোষ নাহি হয় অনুমিত।
গীর্ব্বাণীর পুত্রবর
প্রেমে মত্ত নিরন্তর,
ভাব-বিহ্বলিত সদা ভেদ-বিরহিত;
সুখে দুঃখে সমজ্ঞান
অনন্ত-বিলাসী প্রাণ,
স্তুতি-নিন্দা ভাল-মন্দ দ্বন্দ্ব সম্মিলন
কিছুতেই নহে মুগ্ধ,
নিত্য-মুক্ত-শুদ্ধ-বুদ্ধ,
প্রেমের মদিরা পানে মত্ত অনুক্ষণ।
নিস্যন্দিত দর্ দর্
যেন সুধাকর-কর,
মলয় সৌরভবাহী সমীর যেমন,
তেমতি উত্তাল রঙ্গে
প্রেমের তরঙ্গ-ভঙ্গে
কুসুমে কলুষে কবি করে আলিঙ্গন।
কবি সৌন্দর্য্যের ভৃত্য
শিশুপ্রায় করে নৃত্য,
বিশ্ব সৌন্দর্য্যের এক কণিকা নেহারি,
আনন্দে উন্মত্তপ্রায়
তাহাই রচিতে যায়,
ক্ষুদ্র মানবের নিন্দা, স্তুতি না বিচারি।
পানি মাতৃস্তন্য দুগ্ধ
শিশু যথা হ'য়ে মুগ্ধ
আনন্দ প্রকাশে মৃদু অস্ফুট ভাষায়।
ভাব মুগ্ধ স্তব্ধ চিতে
চাহে কবি বিরচিতে,
অর্দ্ধ-কুসুমিত অতি অব্যক্ত কথায়।
তথাপি মধুর আহা,
অমৃত মিশ্রিত তাহা,
ভাবুক জনের মন করে বিমোহিত।
লুকায়ে সৌন্দর্য্য রাশি—
মৃদু মৃদু মৃদু হাসি,
পুষ্প যেন আহা মরি, অর্দ্ধ-বিকসিত!

বিসর্জ্জিয়া শান্ত ছবি
ভব-কবি-কুল-রবি,
সান্ত কল্পনার কূপে অতৃপ্ত হইয়া,
বরষি প্রতিভা-রশ্মি
অজ্ঞান-রজনী-ভস্মি
অনাদি অনন্ত অব্ধি দিল প্রকাশিয়া।
দূরে গেল জীর্ণ ছন্দ
পবন মানে কি বন্ধ?
নব নব ভাব-গন্ধ তরঙ্গ উঠিল।
সুর-বর্ণ-বধূগণে
প্রাকৃতের আভরণে
সুকৌশলে কাব্য-শিল্পী আজি সাজাইল।
মাতঙ্গের দন্তদ্বয়
যেন মণি মুক্তাময়,
সোণায় সোহাগা যেন হয়েছে মিলিত!
প্রভাতের ফুলচয়
শিশির মুকুতাময়,
দ্বিতীয়ার শশীকলা তারকা-মণ্ডিত।
কবীন্দ্রের বাগুরায়
বদ্ধ আজি বসুধায়,
বাগ্দেবী ও ধনদায় প্রেম-সম্মিলনে।
তাই এত জয় শব্দ
সকল ভুবন স্তব্ধ,
স্বর্গীয় বাদিত্র ধ্বনি পশিছে শ্রবণে।
গুণবানে অনাদরি,
কি করিছ মরি মরি,
হে ভারত-রত্ন যত বঙ্গ অলঙ্কার!
কুবৃত্তির পদে পড়ি
আশার প্রাসাদ গড়ি
হে ভারত, ইচ্ছ তুমি উচ্চ অধিকার?
শাখামৃগ স্বর্ণ হার
পায় যদি পুরস্কার
না বুঝে গুরুত্ব তার চপলতা হেতু!
চঞ্চলতা পরিহর
গুণের আদর কর
দমিত ইন্দ্রিয় ভব সংসারের সেতু।

ধর্ম্মজ্ঞ পরম জ্ঞানী,
আশুতোষ কহে বাণী,
সে বাক্য তাঁহার মুখে বড় শোভা পায় ;—
রবীন্দ্রের গ্রন্থরাজী
যেন পুষ্পপূর্ণ সাজি !
অভিনব বেদরাশি এসেছে ধরায়।
সংগোপনে নিরজনে
বসিয়া একান্ত মনে
ভর দার্শনিক ভাবে আপন হৃদয়,
শিশু প্রায় কাব্য খুলি
খাইও না পত্রগুলি,
রস-সুধা মিষ্ট তার পত্র মিষ্ট নয় !
পশ্চাতে শ্বাপদ দল
করে কত কোলাহল,
ধায় যবে মদকল বনজ বারণ,
ভেকরাজ অভিমানী
বরষি অজস্র গ্লানি
অমর্ষে আকাশে তোলে যুগল চরণ ;
কিন্তু দন্তী মহাকায়
ভ্রূক্ষেপ করে কি তায়,
আপন উল্লাসে সেই আপনি মগন ;
দলি অরবিন্দ দলে
অবগাহে স্বচ্ছ জলে
বারণ মানে কি কভু প্রমত্ত বারণ ?

যত বাধা বিঘ্ন পায়
ততই বেগেতে ধায়,
সিন্ধু প্রেমাকাঙ্ক্ষী নদ সাগর সঙ্গমে ;
তেমতি কবীন্দ্ররাজ
শত বিঘ্ন-রাশি আজ
অবহেলে অবিরল অবলীলাক্রমে।
অতএব ত্যজ রোষ,
না হের পরের দোষ,
মধুকর সম মধু কর আহরণ ;
হিংসা দ্বেষ পরিহরি
পরম ধৈরজ ধরি,
মধুময় কর ভাই ভারত-ভবন।
বাজুক অনন্ত স্বরে
হৃদয়ের স্তরে স্তরে
বিশ্ব-প্রেমিকের স্নিগ্ধ মধুর বচন ;
বিবেক-আনন্দ স্বামী,
ঘোষিল যে মহাবাণী,
বারেক মিলিত কণ্ঠে কর সঙ্কীর্ত্তন।
"কিছুই নাশের তরে
আসি নাই চরাচরে,
এসেছি সকল বস্তু করিতে সুন্দর ;
মধু হ'তে মধুময়
কবির কর্ত্তব্যচয়,
আরও করিব মধু আরও সুন্দর !"

শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন মজুমদার।

বিজয়ের বিজয়-স্তম্ভ

আজ অনেক দিনের কথা, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, যখন আমার বাল্যকাল, সেই সময়ের ঘটনা যতদূর স্মরণ থাকিতে পারে, তাহাই সংগ্রহ করিয়া সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেছি। আমার যত দূর মনে হয়, অনুমান বাঙ্গালা সন ১২৬৯ সালের শেষে অথবা সন ১২৭০ সালের প্রথম ভাগে কোন একটী বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে আমাদের বাগআঁচড়া গ্রাম হইতে পূজনীয় শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ হালদার

(মল্লিক) শ্রীযুক্ত হলধর সমাদ্দার (মল্লিক) ও শ্রীযুক্ত রামরতন বন্দ্যোপাধ্যায় (মল্লিক) এই ব্যক্তিত্রয় কলিকাতায় গমন করেন। তথায় যাইয়া একদিন যোড়াশাঁকো আদি-ব্রাহ্মসমাজে গমন করেন। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রমুখাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ও ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার জন্য তাঁহাদের মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়। তৎপরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে নিজেদের মনের অভিপ্রায় জানাইবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হন ও সবিশেষ সকল কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করেন। হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও পরিত্যক্ত বাগআঁচড়া নিবাসী পিরালি ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ও ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল ও ইচ্ছুক। সেই সময়ে মফঃস্বলস্থ আরও অনেক লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের জন্য মনের ইচ্ছা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। এই সমস্ত বিষয় লইয়া একদিন সঙ্গতসভায় আলোচনা হইয়াছিল। এই সকল স্থানে যাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশাদি দিতে পারেন, এরূপ কয়েকজন লোকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এরূপ লোক পাওয়া যায় কোথায়? মহর্ষির মুখে এই কথা শুনিয়া, পরদুঃখকাতর করুণ-হৃদয় মহানুভব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় অতি আগ্রহের সহিত সেই সময়ে সেই সব কথা শুনিয়া, এই সমস্ত স্থানে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। তখন তিনি মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়িতেন। কলেজের পড়া ছাড়িয়া ধর্ম্মপ্রচারার্থ মফঃস্বলে যাইবেন শুনিয়া তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন যে, তোমার মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবার আর অল্পমাত্র সময় বাকী আছে,— এখন পড়া ছাড়িয়া দিলে কি প্রকারে তোমার সংসার চলিবে ও পরিবার প্রতিপালিত হইবে? তাহাতে তিনি বলেন, "যিনি মরুভূমিতে তৃণ গুল্ম রক্ষা করেন, এবং সমুদ্রের গভীর জলের মধ্যে প্রাণীপুঞ্জকে প্রতিপালন করিতেছেন, কোন্ অবিশ্বাসী বলিতে পারেন যে, তিনি অনাহারে এই দুঃখী পরিবারকে বিনাশ করিবেন?" এই কথা শুনিয়া ভক্তিভাজন কেশব বাবু বলিলেন, প্রচারক হইতে হইলে পরীক্ষা দিতে হইবে। তাহাতে তিনি সম্মত হইলেন, এবং ঈশ্বর-ইচ্ছায় সে পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইলেন। এই সময় তিনি কলিকাতায় থাকিয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে অধ্যেতার কার্য্য, এবং বেহালা, পটলডাঙ্গা, কোন্নগর প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজ গুলিতে উপাসনার কার্য্য করিতেন। এই সমস্ত স্থানে তাঁহার কার্য্যে কোন আপত্তি ছিল না, কেবল শ্রীরামপুরের ব্রাহ্মণগণ সমাজে সংস্কৃত ভাষাতে উপাসনা করিতে আপত্তি করিয়া একটুকু গোলযোগ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এই প্রথম মতভেদ তিনি দর্শন করেন, কিন্তু সামান্য মতভেদে তাঁহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের বিন্দুমাত্র অভাব বোধ হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে যেমন অল্প মাত্র মতভেদ হইলেই ভ্রাতৃভাব তিরোহিত হয়, ভ্রাতায় ভ্রাতার দোষ ঘোষণা করিতে থাকেন, এবং কুণ্ঠিত না হইয়া বরং ক্ষিপ্রহস্তই হন, পূর্ব্বে কিন্তু এরূপ ভাব ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন,—

"সন ১২৭০ সালের ১০ই পৌষ আচার্য্য মহর্ষিদেবের আদেশানুসারে কলিকাতা হইতে বাগআঁচড়ায় যাইবার জন্য যাত্রা করিলাম। উক্ত গ্রাম কলিকাতার উত্তর পূর্ব্ব কোণে প্রায়

৩৫।৩৬ ক্রোশ দূরে। বাষ্পীয় রথে শিবাদহ বর্ত্তমান শিয়ালদহ হইতে হামিদপুর ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া গো-শকটে গমন করত তাহার পূর্ব্ব-উত্তর ৮ ক্রোশ দূরে গোপালনগর গ্রামের বাজারে পান্থশালায় বেলা ২টার সময় পৌছিয়া, সে দিবস অবাস্থতি করিলাম। সঙ্গে ছিলেন প্রাণনাথ, রূপচাঁদ, হলধর, রামরতন। পরদিন ১১ই পৌষ প্রাতঃকালে তথা হইতে গমন করিতে আরম্ভ করিয়া দিবা ২টার সময় বাগআঁচড়া গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। যদিও পথশ্রমে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম, কিন্তু তত্রত্য মল্লিক পরিবারের সাদর অভ্যর্থনা ও যত্নে এবং অকপট সরল ব্যবহারে ও ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা ও আগ্রহ দেখিয়া, আমার সমস্ত শ্রান্তি ও ক্লান্তি বিদূরিত করিয়া আমাকে অবাক করিল। বিশ্রামাদির পর আমি দেখিলাম, এই পরিবারস্থ প্রায় সকল লোকই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের জন্য উৎসুক ও ব্যাকুল; কিন্তু অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিষয়ে কিছুই জানেন না। আহারের পর বিশ্রাম করিয়া, ঈশ্বরের করুণার কথা কিছু বলাতে সকলের অন্তর যেন দ্রব হইতে লাগিল ও মনের আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি হইল। পরদিবস হইতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদার মত সকল তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহান ভাব ও উদারতার বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহাদিগকে যথারীতি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত করিলাম। আমি এবার এখানে ৯ দিবস মাত্র ছিলাম। ইঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপ এককালেই পরিত্যাগ করিলেন। ইঁহারা সকলেই দরিদ্র ও সরল, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মবল একজন সম্রাটের বল অপেক্ষা অধিক শক্তিমান হইয়া উঠিল। ইহাঁদের মধ্যে কেহই ভাল লেখাপড়া জানেন না, তথাপি ভক্তি, প্রীতি, কৃতজ্ঞতা ও সরলতাতে ইহাঁদের হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। যাঁহারা ভূরি ভূরি পুস্তক পড়িয়া বিদ্বান ও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ও সভ্য সমাজে আদৃত হইয়াছেন, যাঁহাদিগের অর্থের অভাবে সংসারে কোন প্রকার ক্লেশ পাইতে ও অভাব বোধ করিতে হয় না; তাঁহারা একবার এই গণ্ডগ্রামের বিদ্যাবুদ্ধি ও সভ্যতা-বিহীন দরিদ্র লোকদিগের হৃদয়ের সরলতা ও ধর্ম্মবল দেখিয়া শিক্ষালাভ করুন। ধর্ম্ম কেবল ধনী, পণ্ডিত ও জ্ঞানাভিমানীদিগের জন্য নহে, জগতের সমুদায় মানব জাতির চির সম্পত্তি। উচ্চশিক্ষা এবং জ্ঞানের চর্চ্চা না থাকাতেই এখানকার অবস্থা এরূপ শোচনীয় ও হীন হইয়া পড়িয়াছে! ইহাঁদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও জ্ঞানের উন্নতি না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও তাহার উচ্চ আদর্শ এবং পবিত্র উদার ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া স্থায়ী হইবে না। ধর্ম্মে গাঢ় অনুরাগ থাকিলেও অজ্ঞানতা বশতঃ ধর্ম্মপথে স্থির থাকা দুর্ব্বল মানবের পক্ষে বড়ই কঠিন, মূর্খতা দ্বারা ধর্ম্মের বিশেষ ক্ষতি হয়। প্রেমাবতার মহাত্মা শ্রীচৈতন্যের বিশুদ্ধ ভক্তিময় ধর্ম্মও অধিকাংশ মূর্খলোকের হাতে পড়িয়া কলঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। ক্রমে বাগআঁচড়ার অবস্থাও সেইরূপ হইবার উপক্রম হইতেছিল, তাঁহাদের মধ্যে আবার কতকগুলি লোক ব্যভিচারকে ধর্ম্মের নামে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন, কেহ কেহ ধর্ম্মের কোন

ধারই ধারিতেন না ও উপাসনা করা দূরে থাকুক, বরং আরও দেবদেবীর পূজাতে উৎসাহ দিতেন এবং নানা কুসংস্কারে পতিত হইতেন। জ্ঞানের উন্নতি ব্যতীত এই সকল ভ্রম ও কুসংস্কার এবং কুরীতি কিছুতেই দূর হইতে পারে না। যদি প্রত্যেক ব্রাহ্ম এই ধর্ম্ম প্রচারের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইঁহাদের এই গুরুতর অভাব মোচনের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলেও আমার বিশ্বাস, এই দীন দুঃখী লোকদিগের বিশেষ উপকার হইতে পরিত। মহামারিতে পীড়িত লোকদিগকে ঔষধ ও পথ্য প্রদান না করিলে, দুর্ভিক্ষে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে অন্নদান না করিলে লোকে পাপ ও নিষ্ঠুরতা মনে করে; কিন্তু জ্ঞানহীন মূর্খদিগের আন্তরিক দুর্দ্দশা, ধর্ম্মহীন পাপদগ্ধ মনুষ্যের হৃদয়-যন্ত্রণা দূরীভূত না করিলে তাহাকে কেহই নিষ্ঠুরতার কার্য্য মনে করে না। পরের দুঃখ দূর করাই যদি দয়ার কার্য্য হয়, তবে মানব হৃদয়ের পাপ যন্ত্রণা দূর করা অপেক্ষা দয়ার কার্য্য পৃথিবীতে আর কি হইতে পারে? যাহারা একবার পাপের যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, তাহারাই জানে, অন্নদান অপেক্ষা স্বর্গীয় উপদেশ মূল্য তদপেক্ষা কতগুণে অধিক। যে পাপের যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই পাপদগ্ধ মনুষ্যের জন্য অশ্রুপাত করিয়া থাকে। যে একবার দুঃখের বিভীষিকা ও কশাঘাত সহ্য করিয়াছে, তাহারই হৃদয় দুঃখীর জন্য ক্রন্দন করে। বাগআঁচাড়ার এই সমস্ত ব্যক্তিগণের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিলে ও মনে হইলে আমি না কাঁদিয়া থাকিতে পারি না। যখনই ইঁহাদের অবস্থার বিষয় চিন্তা করি, তখনই প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।"

গোস্বামী মহাশয় আমাদের এই সমস্ত দুরবস্থার বিষয় জানিয়া, শুনিয়া এবং চক্ষে দেখিয়া এখানে ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে একটী বিদ্যালয় স্থাপনের বিশেষ আবশ্যকতা অনুভব করেন এবং তাহা স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েন। এইবার তিনি এখানে মাত্র নয় দিবস ছিলেন, সকলের অনুরোধে এই সময়ের মধ্যে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ ঘরের ভিত্তি স্থাপন করিয়া ১৬ই পৌষ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন স্থির করিয়া তথায় উপাসনাদি করেন। তৎপরে তিনি এখান হইতে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। সেই দিন হইতেই প্রতি বৎসর উক্ত তারিখে বাৎসরিক উৎসবের দিন স্থির হইল।

শুনিয়াছি, তার পর তিনি কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান, এবং পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, পাবনা প্রভৃতি নানা স্থানে প্রচার কার্য্য করিয়া নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন। তাহার পর বৎসর মাঘোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় প্রত্যাগত হন; এবং এই উৎসবের পর কলিকাতাস্থ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট বাগআঁচড়ার অবস্থার বিষয় বিশেষ করিয়া বলেন। আমার যত দূর মনে আছে, অনুমান মাঘমাসের শেষ ভাগে, কি ফাল্গুন মাসের প্রথমে, আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পরামর্শানুসারে, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়গণ ঢাকার শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়গণ সমভিব্যাহারে আমাদের গ্রামে আগমন করেন। এখানে আসিয়া গ্রামস্থ সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থানীয় বাজারে একটী ঘর লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করেন। এই সময় উক্ত গোবিন্দবাবু

ও গোস্বামী মহাশয় সপরিবারে এখানে ছিলেন। গোবিন্দবাবু ইংরেজী পড়াইতেন, গোস্বামী মহাশয় বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য প্রথম শিক্ষকের কার্য্য করিতেন, উক্ত সান্ন্যাল মহাশয়ও কিছুদিন বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন। আমি তাঁহার নিকট পড়িয়াছি। তাঁহার পরে নিম্নশিক্ষার জন্য আর একজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। যাহাদের বয়স বেশী অথচ লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছা আছে, এরূপ সকল সম্প্রদায়ের জন্য একটী নৈশ বিদ্যালয়ও উক্ত পাঠাগারে আরম্ভ করেন, গোস্বামী মহাশয় নিজেই ইহার কার্য্য করিতেন।

বালকদিগের চরিত্র গঠনের জন্য ব্রাহ্ম-বালকদিগকে লইয়া আত্মোন্নতি সভা নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত করেন ও প্রত্যেক বালকের হাতে এক এক খান খাতা নিজে হাতে লিখিয়া দিতেন, তাহাতে সমস্ত দিনের কার্য্যবিবরণ লিখিতে হইত, তিনি তাহা দেখিয়া যাহা করা উচিত, লাল কালীর দাগ দিয়া বুঝাইয়া দিতেন। এখানে স্ত্রী শিক্ষারও সূত্রপাত তিনি করেন। বলিতে কি, আমাদের সকল বিষয়ের উন্নতির পথ তিনিই উন্মুক্ত করেন। এখানে চিকিৎসকের অভাব দেখিয়া, তিনি এই দুস্থ গরিবদিগের জন্য একটী ক্ষুদ্র দাতব্য-চিকিৎসালয় খুলিয়া চিকিৎসার ভার নিজেই গ্রহণ করেন। এই সমস্ত কার্য্য চালাইবার জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ধর্ম্মতত্ত্বে অর্থ সাহায্যের জন্য এক আবেদন পত্র প্রকাশ করেন। তাহা পাঠে দেশহিতৈষী সহৃদয় নরনারীগণও কিছুদিন কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তাহা অধিক দিন রহিল না। সমাজ-ঘরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে একটী সুন্দর পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করিবার জন্য উৎসাহদাতা* ছিলেন অমৃতবাবু ও সান্ন্যাল মহাশয়; ইঁহারা প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠিয়া বালক ও যুবক-দিগকে সঙ্গে লইয়া তথাকার জমী পরিষ্কার করিবার জন্য নিজেরা কোদাল হাতে লইয়া মাটি কাটিয়া তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিতেন ও তাঁহাদিগকে লইয়া মহা উৎসাহের সঙ্গে বাগানের চারিদিকে সমানভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বেল, জুঁই, রজনীগন্ধা, গোলাপ, কামিনী, গেঁদা ও শেফালিকা প্রভৃতি সুগন্ধ ফুলের গাছ সকল রোপণ করিতেন।

এবারকার ● ১৬ই পৌষ সাম্বৎসরিক উৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইল; সমাজগৃহের অনতিদূরে সম্মুখের গেটের বাহিরে নহবত-খানা প্রস্তুত হইয়া একদিন পূর্ব্বে নহবত বাজিতে আরম্ভ হইল, সম্মুখের গেট আলোক-মালায় মণ্ডিত, সমাজপ্রাঙ্গণও দীপালোকে সুশোভিত, সমাজগৃহও নানাবিধ লতাপাতা ও পুষ্পহারে মণ্ডিত করিয়া সুন্দর সুসজ্জিত ও আলোকমালায় সুশোভিত করা হয়। ১৫ই পৌষ সন্ধ্যার পর উৎসবের উদ্বোধন-সূচক উপাসনা হয়। পরদিন ১৬ই পৌষ অতি প্রত্যূষে উষাকীর্ত্তন করিতে করিতে সমস্ত পল্লী প্রদক্ষিণ করিয়া সকলে মিলিয়া নিম্নলিখিত সঙ্কীর্ত্তনটী গাইতে গাইতে সমাজ-গৃহে প্রবেশ করিলেন। সঙ্কীর্ত্তনটী এই,—

"চল ভাই সবে মিলে যাই, সে পিতার ভবনে।
শুনেছি নাকি তাঁর বড় দয়া দুঃখী তাপী
কাঙ্গাল জনে॥
কাঙ্গাল ব'লে দয়া করে, কেউ নাই মোদের
ত্রিভুবনে,

* বোধ হয় ১২৭৩ কি ৭৪ সালে, আমার ভাল মনে নাই।

আর কে বুঝিবে মর্ম্মব্যথা, সেই দয়ার সাগর
পিতা বিনে ?
দ্বারে গিয়ে কাতরস্বরে, পিতা বলি ডাকি
সঘনে,
তিনি থাকিতে পারিবেন না কভু, পাপী-
জনের কান্না শুনে।
নিরাশ্রয় নিরুপায় যত, নিতান্ত সম্বল-বিহীনে,
সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু, উদ্ধারিছেন
নিজ গুণে।
দুর্ব্বল অসহায় দে'খে, কিছু ভয় করো না মনে,
ওরে অনায়াসে ত'রে যাব, সেই সুধামাখা
দয়াল নামে।
চল সবে ত্বরা ক'রে, কিছু সুখ আর নাই
এখানে,
একবার জুড়াই গিয়ে তাপিত হৃদয়, লুটায়ে
তাঁর শ্রীচরণে।
অজ্ঞান দীন দরিদ্র যত পতিত সন্তানে,
পিতা অধমতারণ বিলাচ্ছেন ধন,
আয় রে সবে যাই সেখানে।
(অভাব আর রবে নারে)

সমাজগৃহে প্রবেশ করিয়া সকলে স্থির ভাবে উপবেশন করিলে, উৎসবের উদ্বোধন-সূচক নিম্নলিখিত গানটী গাইয়া কার্য্য আরম্ভ হয় ;—

আহা কি অপরূপ হেরি নয়নে, মিলে সব
বন্ধুগণে,
প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে, ভক্তি-কমল ল'য়ে,
করেন অঞ্জলি দান বিভু-চরণে।
তরুণ ভানু-কিরণে, প্রভাত-সমীরণে,
মেদিনী অনুরঞ্জিত নবজীবনে ;
প্রকৃতি মধুর স্বরে, ব্রহ্মনাম গান করে,
আনন্দে মগন হয়ে পিতার প্রেমে।
উৎসব-মন্দিরে আজ, বিশ্বপতি ধর্ম্মরাজ,
করেন বিরাজ রাজসিংহাসনে ;
আহা কি সুন্দর শোভা, পুণ্যময়ের পুণ্যপ্রভা,
কৃতার্থ হইল প্রাণ দরশনে।
স্নেহময়ী মাতা হয়ে, পুত্র কন্যাগণে ল'য়ে,
বসেছেন আনন্দময়ী আনন্দ-ধামে ;
নিমন্ত্রণ করি সবে, এনেছেন মহোৎসবে,
বিতরিতে প্রেম-অন্ন ক্ষুধিত জনে।

এই প্রকারে প্রাতঃকালীন উপাসনা ও সংগীত সঙ্কীর্ত্তন হইয়া উপাসনার কার্য্য শেষ হইলে, সম্মুখে নহবত বাজিয়া উঠিল, শানাইদার শানাইতে গাহিতে লাগিল,

দয়াময় কি মধুর নাম।
নাম শুনে প্রাণ জুড়া'লো রে ;
কি মধুর নাম।

উপাসনা শেষ হইলে পর কাঙ্গালী বিদায় আরম্ভ হইল। সকলকে চাউল ও পয়সা দেওয়া হইল, কেবল অন্ধ, খঞ্জ ও আতুরদিগকে উহা ব্যতীত এক এক-খান নূতন কাপড় দেওয়া হইল। মধ্যাহ্নে সবান্ধবে সকলে মিলিয়া প্রীতিভোজন করা হইল। বেলা ২টার পরে আবার উপস্থিত কাঙ্গালীদিগকে ভোজন করান হইল। তাহার পর বেলা ৪টার পর ৫টা পর্য্যন্ত শাস্ত্র পাঠ, ব্যাখ্যা ও আলোচনাদি হইল ; ৫॥০ সাড়ে পাঁচটা হইতে ৭॥০ সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন, পরে রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত রাত্রিকালীন উপাসনার পর কিছু সময় সঙ্কীর্ত্তন হইয়া উৎসব শেষ হইল। সর্ব্বশেষে উৎসবের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ দান সংগ্রহ হয়, এবৎসর প্রায় ৮০।৯০ টাকা দান সংগ্রহ হইল। এবার এই মহোৎসবে কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, যশোহর প্রভৃতি স্থান হইতে অনেকে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। এবার এই ক্ষুদ্র পল্লীতে ভগবদ্ভক্ত প্রেমিক সাধুগণের পদধূলি গ্রহণে

ও সমবেত উপাসনাতে যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারা যায় না। এই প্রকারে প্রতি বৎসর ১৬ই পৌষ উৎসবের সময় তিন দিবস নহবত বাজিত, প্রাতে কাঙ্গালী বিদায় করা হইত; অন্ধ, খঞ্জ ও আতুরদিগকেও নূতন কাপড় দেওয়া হইত এবং রাত্রিকালীন উপাসনার পরে দান সংগ্রহ করা হইত।

ক্রমশঃ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দক্ষিণ-ভ্রমণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মান্দ্রাজের অন্যান্য স্থানও দর্শন করিলাম, কিন্তু তাহার বর্ণনা করিবার কোন প্রয়োজন মনে করি না। চারি দিন মান্দ্রাজ অবস্থিতির পর শ্রীরঙ্গম রওনা হইলাম। এইখান হইতে South Indian Railway আরম্ভ হইয়াছে। যথা সময়ে সন্ধ্যার সময় Egmore ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এই রেলওয়েতে Inter Class নাই, আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর পাশ পাইয়াছিলাম, সুতরাং ষ্টেশনে একটু খাতির পাইলাম। একটী ফিরিঙ্গি সাহেবের নিকট পাশখানি দেওয়ার পর তিনি একটী Berth reserve করিয়া দিলেন। আমি নিজের ব্যাগটী লইয়া যথাস্থানে কম্বল বিছাইয়া শয়ন করিলাম। সচরাচর রেলওয়ে গমনাগমনে তৃতীয় শ্রেণীতেই আরোহণ করিয়া থাকি, কখনও বা বড় জোর মধ্যম শ্রেণীতে উঠি। সুতরাং আজ দ্বিতীয় শ্রেণীতে শয়ন করিয়া একটু অহঙ্কারের উদয় হইল। বেঞ্চের সঙ্গে যে লেবেলখানি বদ্ধ রহিয়াছে, তাহাতে আমার নামটী লেখা দেখিয়া কতই আনন্দ হইতেছে এবং বারবারই উহা দেখিতেছি। সম্মুখে গাড়ীর চাকরকে ডাকিবার জন্য ঘণ্টা আছে, তাহা একটু টিপিয়া দেওয়া মাত্র একজন লোক আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল, "What do you want Sir ?" আমি ভাবিলাম, এই লোকটী আমাকে Sir বলিল কেন। বাঙ্গালা দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে কেহ "Sir" বলে না। মান্দ্রাজ দেশে বাঙ্গালীদিগকে একটু খাতির করে বলিয়াই বোধ হয় Sir বলিয়াছে। কোন একজন সুরসিক লেখক রেলওয়ের চারি শ্রেণীর গাড়ীকে চারি প্রকার নূতন নামে অভিহিত করিয়াছেন। যথা—

১ম শ্রেণীর নাম Ticket please Sir,
২য় শ্রেণীর নাম Ticket please,

মধ্যম শ্রেণীর নাম Tickets এবং ৩য় শ্রেণীর নাম টিকিট দেখলাও ম্যান, কখন কখন বা শালালোকও উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ যখন Ticket collector মহাশয়গণ গাড়ীর টিকিট পরীক্ষা করিতে আইসেন, তখন ১ম শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলেন, Ticket please Sir। যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আগমন করেন তখন আর "Sir" থাকে না, শুধু বলেন Tickets please। যখন মধ্যম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, তখন Sirও থাকে না, Pleaseও থাকে না; শুধু Tickets Tickets বলিয়া চীৎকার করেন। তাপর যখন ৩য় শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, তখন আর

ইংরেজী শব্দই থাকে না। টিকিট দেখলাও বলিয়া গাড়ীর দরজায় ঘন ঘন আঘাত প্রদান করিয়া থাকেন।

সুতরাং আমাকে Sir বলায় একটু আশ্চর্য্যও হইলাম এবং বেশ আনন্দও অনুভব করিলাম। গাড়ীর চাকরটীকে কিছু আহারীয় দ্রব্য আনিবার হুকুম করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। যথা কালে সে আমার আহারীয় দ্রব্য আনিয়া দিল। গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে Refreshment Car থাকে। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী, সুতরাং সেই গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আহার করিবার ক্ষমতাও আমার ছিল, কিন্তু অতটা সাহস হইল না। কি জানি, বিদেশে আবার কোন্ সাহেব গালি দিবে,সহ্য করিতে না পারিয়া হয়তো বিশেষ একটা হাঙ্গামায় পড়িব। এমন কি, শরীর মধ্যস্থিত প্লীহাটাও হঠাৎ ফাটিয়া যাইতে পারে। সুতরাং আহারীয় দ্রব্যাদি নিজের কামরায় আনাইয়া আহার করিলাম। নিকটস্থ জনৈক ভদ্রলোক Refreshment Carএ না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, উত্তর দিলাম, "ম্লেচ্ছদিগের সঙ্গে বসিয়া আহার করা ঘৃণাজনক মনে করি।"

এখন রাত্রি হইয়াছে, গাড়ী ক্রমাগত দৌড়াইতেছে—ছোট ছোট ষ্টেশনগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া ছুটিয়াছে,—কারণ ইহা মেল ট্রেণ। জগতে বড় হইলে ছোটকে এই প্রকারেই অগ্রাহ্য করিয়া থাকে, ছোট ছোট ষ্টেশনগুলি বক্ষস্থলে একটী দীপ ধারণ করিয়া যেন বলিতেছে, হে প্রভু, এই দেখ তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছি—কিন্তু তুমি আমাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলে। যাহারা আমার আশ্রয় লইয়াছে, তাহারা তোমার কৃপা পাইল না বটে, কিন্তু তোমারই স্বরূপ অন্যের আশ্রয় পাইবে। ফলে তুমি যাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছ, তাহারাও যেখানে যাইবে, আর এই সকলও তথায় যাইবে; তবে একটু সময়সাপেক্ষ। ইহাদের পুঁজি অল্প, তাই একটু বিলম্বে পৌঁছিবে। গাড়ী বন জঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত, নদী নালা অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, রাত্রের অন্ধকারে কিছুই দেখা যাইতেছে না। সুতরাং শয়ন করিলাম এবং নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া স্বপ্ন দেখিলাম যেন পৃথিবী জলময় হইয়াছে, সব একাকার। রাজা প্রজা, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ধনী নির্দ্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, বড় ছোট সমস্ত জলের উপর ভাসিতেছে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে এবং রাজা প্রজার নিকট স্তব স্তুতি করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য মিনতি করিতেছে। আমি যেন জলে ডুবিয়া যাইতেছি, এমত সময়ে কামরাস্থ অপর ভদ্রলোকটী আমাকে ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া বলিলেন, "আপনি গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছিলেন কেন?" আমি চেতন লাভ করিয়া বলিলাম, উহা Nightmare, সমস্তই মিথ্যা। আপনাকে ধন্যবাদ।

রাত্রি প্রভাত হইল। আজ আর মুখ ধুইবার জন্য গরম জলের অভাব হইল না, কল টিপিয়া দেওয়া মাত্র গাড়ীর চাকরটী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হুকুম মত এক ঘটী গরম জল, চা, বিস্কুট প্রভৃতি লইয়া হাজির। চা পান করিয়া একটু বেড়াইতে বাহির হইলাম। গাড়ী চলিতেছে অথচ বেড়াইতে বাহির হইলাম, ইহা একটু নূতন কথা সন্দেহ নাই। সমস্ত গাড়ীতে ইঞ্জিন হইতে আরম্ভ করিয়া পিছনের Brake-van

পর্য্যন্ত বরাবর বারান্দা আছে, সুতরাং সেই বারান্দায় বেড়াইতে লাগিলাম। এই ট্রেণ খানি রামেশ্বর পর্য্যন্ত যাইবে, সুতরাং রামেশ্বরের যাত্রী দ্বারা পরিপূর্ণ। সমস্ত গাড়ী দেখিলাম, কিন্তু ইহার মধ্যে একটীও বাঙ্গালী দেখিতে পাইলাম না। মাদ্রাজি এবং হিন্দুস্থানী লোকে পরিপূর্ণ। বাঙ্গালী গয়া কাশী বৃন্দাবন যাইতে ভালবাসে, রামেশ্বরে অতি অল্প লোকই যায়। ইহার কারণ বোধ হয় এই দেশের ভাষার কাঠিন্যতা। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বস্থানেই অল্প বিস্তর হিন্দুস্থানী ভাষা জানিলেই কার্য্য চলিতে পারে, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে আদৌ চলে না; কিন্তু রামেশ্বরের পাণ্ডাগণ প্রায় সকলেই হিন্দুস্থানী জানেন, কারণ তাঁহারা উক্ত দেশবাসী নহেন।

প্রাতে প্রায় ৭টার সময় Trichonopoly পৌঁছিল। এই স্থানে গাড়ী বদল করিয়া Trichonopoly Fortএর গাড়ীতে উঠিলাম এবং সময় মত তথায় পৌঁছিলাম। পূর্ব্বেই মাদ্রাজ হইতে একটী ভদ্রলোককে আমার আগমনবার্ত্তা জানাইয়াছিলাম। ষ্টেশনে নামিয়াই তাঁহাকে পাইলাম এবং তিনি অতি সমাদরের সহিত আমাকে তাঁহার আলয়ে লইয়া গেলেন। ভদ্রলোকটী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ভক্ত এবং ইঁহারই চেষ্টায় এই সহরে পরমহংস দেবের নাম বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছে। ইনি ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত এবং সংস্কৃতও বেশ জানেন, অত্রস্থ একটী Secondary schoolএ শিক্ষকতা করেন। জাতিতে ব্রাহ্মণ। গৃহে স্ত্রী এবং তিনটী সন্তান। বেতন মাসিক ৪০৲ টাকা। এই সামান্য আয়েই সংসার সুন্দররূপে চলিয়া যাইতেছে। এ দেশের ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণেতর জাতিকে একটু অবহেলার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকে এবং শূদ্রদিগকে অর্থাৎ যাহাদিগের জল আচরণীয় নহে, তাহাদিগকে ত ঘৃণাই করিয়া থাকে। শুনিয়াছি, রাস্তায় হঠাৎ যদি কোন পেরিয়ার সহিত ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হয়, তবে উক্ত ব্রাহ্মণ অবগাহন করিয়া শুদ্ধ হইয়া থাকেন। আমি ব্রাহ্মণ নই, অথচ এই ব্রাহ্মণ পরিবার আমাকে আজ অতি যত্নে তাঁহাদের পংক্তিতে বসাইয়া আহার করাইলেন এবং এমন কি, আহারান্তে উচ্ছিষ্ট পত্রখানিও তাঁহারা নিজেই নিক্ষেপ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার স্ত্রী নিজেই আমাকে আহারীয় দ্রব্যাদি পরিবেশন করিলেন। এ দেশে লঙ্কা মরিচ একটু বেশী পরিমাণে ব্যবহার হইয়া থাকে, সুতরাং আহারীয় দ্রব্যগুলি আমি বড় তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিতে পারিলাম না। শুনিলাম, গৃহকর্ত্তা পূর্ব্বেই তাঁহার স্ত্রীকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যেন ব্যঞ্জনাদিতে লঙ্কা মরিচ বেশী না পড়ে, কারণ অতিথি বাঙ্গালী, লঙ্কা মরিচ বেশী খাইতে পারিবেন না এবং তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য খানিকটা চাটনী প্রস্তুত হইয়াছিল। গৃহকর্ত্রী সেই চাটনীর কিঞ্চিৎ পরিমাণ আমাকেও যখন দিতে আসিতেছিলেন, তখন গৃহকর্ত্তা তাঁহাকে নিবারণ করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, Dont take it; it is scorpion অর্থাৎ উহা বিচ্ছুটের ন্যায় তীক্ষ্ণ। আমি ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিয়াই বিশেষ কষ্ট পাইতেছি—অতি কষ্টে মুখের জ্বালা অম্ল দ্বারা নিবারণ করিতেছি, তাহার উপর যদি ঐ চাটনী মুখে দিতাম, তবে না জানি আমার আজ কি দশা ঘটিত। যাহা হউক, অবশেষে দধি এবং রসম্ (এক প্রকার চাটনি

বিশেষ, ইহা ডাইলের রস হইতে প্রস্তুত হয়) দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলাম। এই দেশের রসম্ নামক সামগ্রীটী অতি উপাদেয়; স্থানবিশেষে উহাকে চারুপানি বা Pepper water বলে।

আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির দর্শন করিবার জন্য রওনা হইলাম। মন্দির প্রায় ২ মাইল দূরে, সুতরাং যাতায়াতের জন্য একখানি গাড়ী নিযুক্ত করিলাম। ভদ্রলোকটী নিজেই আমার সঙ্গে যাইয়া সমস্ত দর্শন করাইবেন, প্রস্তাব করায় আমি নিষেধ করিলাম, কারণ তাহা হইলে তাঁহাকে আবার একদিনের জন্য স্কুল হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইত। তিনি স্কুলে গমন করিলেন এবং আমি গাড়ীতে উঠিয়া শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরাভিমুখে রওনা হইলাম।

মন্দিরে যাইতে হইলে কাবেরী নদী পার হইতে হয়। এই নদীর উপর সুন্দর একটী পোল নির্ম্মিত আছে। নদীতে বন্যা আসিয়াছে সুতরাং স্রোত অতি প্রবলবেগে যাইতেছে। এই নদী হিন্দুগণের নিকট পরম পবিত্র এবং ইহাতে অবগাহন করা সৌভাগ্যের বিষয়।

শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরের প্রথম গেটের মধ্য দিয়াই গাড়ী প্রবেশ করিল, এবং তথায় গাড়ী হইতে নামিয়া চারিদিকে দৃষ্টি করিয়া আমি আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। এ প্রকার সুন্দর এবং প্রকাণ্ড মন্দির আমি ইতিপূর্ব্বে দর্শন করি নাই। এই মন্দিরের বিবরণ লেখা আমার সাধ্য নাই। একজন পাণ্ডা লইয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিলাম, পাণ্ডা মহাশয় অল্প অল্প হিন্দি এবং ২।১টী ইংরেজী কথা দ্বারা আমাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। একটী একটী করিয়া ৫টী কি ৬টী (ঠিক স্মরণ নাই) ফটক পার হইয়া শ্রীগর্ভ-মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম। এই শ্রীগর্ভ-মন্দিরের মধ্যেই শ্রীরঙ্গনাথ অবস্থিতি করিতেছেন। ভিতরে ভয়ানক অন্ধকার, আলো ভিন্ন কিছুই দেখা যায় না। শ্রীগর্ভ-মন্দিরের সম্মুখে গরুড়ের পাষাণ মূর্ত্তি। এই সমস্ত দর্শন করিয়া, মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পরিক্রম করিলাম, এবং নানা স্থানে নানা প্রকার দেবদেবীর মূর্ত্তির নিকট ২।১টী পয়সা দিয়া সমস্তই দর্শন করিলাম। এই মন্দিরের মধ্যে একটী স্থানে একটী পুষ্করিণীর উপর একটী পোলাং বৃক্ষ দেখিলাম। এই বৃক্ষটী পুরীধামের সিদ্ধবকুল নামক বৃক্ষটীর অনুরূপ, অর্থাৎ শুধু বল্কল দ্বারা আবৃত; ভিতরে কাঠ নাই। লোকে এই বৃক্ষটীকে পূজা করিয়া থাকে। পুরীর সিদ্ধবকুলেরও পূজা হয়। এই মন্দিরটী সর্ব্বসমেত সাতটী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং প্রত্যেক প্রাচীরে একটী করিয়া ফটক। ফটকগুলি বেশ উচ্চ এবং নানাবিধ শিল্পকার্য্য দ্বারা নির্ম্মিত। মন্দিরের মধ্যে প্রসাদ বিক্রয়ের জন্য বাজার আছে এবং অর্চ্চকদিগের বাস করিবার স্থানও আছে।

সাতটী প্রাকার বিশিষ্ট মন্দিরটীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাপিয়া দেখি নাই বটে, কিন্তু উহার আয়তন একটী ছোট গ্রাম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মন্দিরের এক স্থানে পুলিশ থানা আছে। রামানুজের জীবনী লেখক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ লিখিয়াছেন, যে সময়ে ইংরেজ ও ফরাসীগণ ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যের কর্ত্তৃত্ব লইবার জন্য সংগ্রাম করিতেছিলেন, সেই সময়ে সমুদয় ফরাসী সৈন্য উক্ত মন্দিরের এক পার্শ্বেমাত্র আশ্রয় লইয়াছিল।

শ্রীরঙ্গনাথের এই পবিত্র মন্দিরের সহিত

কত অসংখ্য মহাপুরুষের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। সেই সমস্ত মহাপুরুষের সংশ্রবে কত শত শত পাপী উদ্ধার হইয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে? বহুপূর্ব্বে এই মন্দিরের স্থানটী জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। অর্চ্চক মহাশয় প্রতিদিন যথাসময়ে ঠাকুরের পূজা করিয়া চলিয়া যাইতেন এবং ব্যাঘ্র শৃগালাদির ভয়ে কেহ এখানে আগমন করিত না। তৎপর মহাপ্রেমিক ও সুকবি তিরুমঙ্গই আলোয়ার তাঁহার ৪টী শিষ্যের সাহায্যে এই স্থানে শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করিতে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু বড় বড় রাজা ও ধনিদের নিকট কোন প্রকার অর্থ সাহায্য না পাইয়া তিনি শিষ্যদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া একটী দস্যুদল গঠন করেন এবং তাহাদের সাহায্যে বহু ধন সংগ্রহ করিয়া নানা দেশ হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিল্পিগণকে আনাইয়া মন্দিরের কার্য্য আরম্ভ করেন। প্রায় ৬০ বৎসরে এই মন্দিরের সম্পূর্ণ কার্য্য সমাধা হয়। মন্দির নির্ম্মাণের পর দস্যুদল ভঙ্গ করিয়া দেন এবং প্রবাদ আছে যে, সমস্ত দস্যুগণ কাবেরী নদীতে জলমগ্ন হইয়া মারা যায়। ইহার পরও প্রায় ২০ বৎসরকাল তিনি জীবিত থাকিয়া ভগবদারাধনায় সময় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

এই শ্রীরঙ্গমে মহামতি যমুনাচার্য্য তাঁহার বিশাল রাজ্য, ধন, সম্পত্তি সমস্ত ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় গুরুদেব মহামতি রামমিশ্রের (অপর নাম নম্বি) সেবা করিতে করিতে পরমপদ লাভ করেন। যমুনাচার্য্যের জীবনী অতি শিক্ষাপ্রদ। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম বার বৎসর, সেই সময়ে পাণ্ড্য রাজ্যের অধিপতির (অধুনা মাদুরা) সভা-পণ্ডিত কোলাহলকে তর্কে পরাস্ত করেন এবং পুরস্কার স্বরূপ রাণীর নিকট পূর্ব্ব প্রতি-শ্রুতি পালন জন্য রাজা বালককে অর্দ্ধ রাজ্য দান করেন। বালক নিজ বুদ্ধি বলে ক্রমে ক্রমে রাজ্যের বহু উন্নতি সাধন করেন এবং তৎপর সমস্ত বিষয়-বৈভব ত্যাগ করিয়া, স্বীয় গুরু নম্বির পদানুসরণ পূর্ব্বক এই শ্রীরঙ্গ-নাথের মন্দিরে আগমন করেন এবং নারায়-ণের সেবায় নিযুক্ত থাকেন। এই যমুনাচার্য্যের দেহত্যাগ কালে তদীয় শিষ্য মহাপূর্ণ কর্ত্তৃক শ্রীরামানুজকে কাঞ্চিপুর হইতে শ্রীরঙ্গমে আনাইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া আচার্য্যের জীবিতাবস্থা দেখিতে পান নাই। তৎপর তাঁহার পবিত্র দেহটী কাবেরী তীরে সমাধি-গর্ভে স্থাপিত হইলে, রামানুজ অত্যন্ত মনের দুঃখে পুনরায় কাঞ্চীপুরে গমন করেন। তৎপর যমুনাচার্য্যের শিষ্য মহামতি বররঙ্গ কাঞ্চিপুর গমন করিয়া, পুনরায় তাঁহাকে শ্রীরঙ্গমে লইয়া আইসেন এবং তথায় বহু শিষ্যকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া, ভগবদারাধনায় জীবন অতিবাহিত করিতে থাকেন।

এই সেই শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির, যেখানে শ্রীরামানুজ স্বীয় গুরু গোষ্টিপূর্ণের নিকট নারায়ণ মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বসাধারণের মুক্তি কামনায় গুপ্ত মন্ত্র প্রকাশ করিয়া গুরুকর্ত্তৃক ভৎর্সিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই মন্ত্রটী আজ যেন আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হই-তেছে। গুরুদত্ত গুপ্ত মন্ত্র প্রকাশ করিলে নরকগামী হইতে হয়, ইহা জ্ঞাত হইয়াও তিনি পাপী তাপীর হিতার্থে মন্দিরের উচ্চ বেদীতে দণ্ডায়মান হইয়া উহা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। সেই "ওঁ নমো নারায়ণায়" মন্ত্র আজ যেন আমি মন্দিরের সর্ব্বস্থান হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিতে পাইতেছি। হৃদয়ে বিশ্বাস নাই, ভক্তি নাই, সুতরাং ঐ মন্ত্র

দ্বারা আমার কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে আসিয়াছি, শেষের দিনের জন্য অপেক্ষা করিতেছি, আজও গুরুদেবের কৃপা হইল না, আজও জীবনে শান্তি পাইলাম না। আজও বিষয়-বাসনা লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছি, আজও "আমার" "আমার" রূপ মোহান্ধকার দূর হইল না; আর কবে হইবে? হে নারায়ণ, আজ আমি তোমার মন্দিরে দণ্ডায়মান। কত কত প্রেমিক সন্ন্যাসী তোমার এই মন্দিরে পদধূলি নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সেই পদধূলির কণিকামাত্র আবার যেন আমার মস্তকে পতিত হয়।

হে নারায়ণ, তুমি বঙ্গদেশে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া যবন হরিদাসের প্রতি কৃপা করিয়া শিষ্যদিগকে যে প্রকারে শিক্ষা দিয়াছিলে, সেইরূপ, এই মন্দিরেও চণ্ডাল (প্যারিয়া) তিরপ্পান আলোয়ারের প্রতি কৃপা করিয়া ব্রাহ্মণের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলে। চণ্ডাল তিরপ্পান বীণাযন্ত্রে তোমার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে একদিন কাবেরী তীরে যাইবার পথে নিদ্রিত হইয়া পড়েন এবং প্রধান অর্চ্চক নদী হইতে জল আনিবার কালে চণ্ডাল কর্ত্তৃক পথ বন্ধ হইয়াছে দেখিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ দ্বারা তাহাকে জাগরিত করেন। ইহাতে তুমি দুঃখিত হইয়া নিজের মন্দির বন্ধ করিয়াছিলে। অর্চ্চক প্রত্যাগমন করিয়া ভিতর হইতে মন্দির বন্ধ দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং পরিশেষে তোমার আজ্ঞায় চণ্ডালকে মস্তকে বহন করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া তোমার সন্তোষ বিধান করেন। হে নারায়ণ! তুমি এই প্রকারে যুগে যুগে তোমার ভক্তের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তোমাকে শতকোটী নমস্কার।

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব দক্ষিণ-ভ্রমণ-কালে এই শ্রীরঙ্গমে আসিয়া নারায়ণের সম্মুখে কতই না নৃত্য ও অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে এখানে আসিয়াছিলেন, সে সময় বর্ষাকাল, সুতরাং চাতুর্ম্মাস্য করিতে তিনি এখানে চারিমাস অবস্থান করিয়াছিলেন। এখানে চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি;—

"কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরঙ্গ দর্শন।
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন॥
সৌন্দর্য্য প্রেমাবেশ দেখি সর্ব্বলোক।
দেখিবারে আইসে সভায় খণ্ডে দুঃখ শোক॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নানা দেশ হইতে।
সভে কৃষ্ণনাম কহে প্রভুরে দেখিতে॥
কৃষ্ণনাম বিনে কেহো নাহি বলে আর।
সভে কৃষ্ণভক্ত হৈল লোকে চমৎকার॥"

উপরোক্ত কথা কয়েকটী উদ্ধৃত করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যে শ্রীরঙ্গমে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল, তাঁহাদেরই বংশধরগণের মধ্যে কচিৎ কেহ গৌরাঙ্গ প্রভুর নাম জ্ঞাত আছেন কি না, তাহাও সন্দেহ! এই শ্রীরঙ্গমে কি একটী গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মঠ স্থাপিত হইতে পারে না?

শ্রীরতিকান্ত মজুমদার।

ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী।

বিগত ২৭শে আগষ্ট, রাত্রি ১১টা ৩৬ মিনিটের সময় ভাই ব্রজগোপাল ইহধাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের কক্ষ হইতে আর একটী স্তম্ভ খসিয়া পড়িল! আজ যাঁহার কথা বলিতে আসিয়াছি, তিনি সমাজের সেই উত্তম উৎসাহের যুগে এ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করেন নাই। তিনি কেশব, প্রতাপ, অঘোর, গিরিশ, গৌর, কান্তি প্রভৃতির সমসাময়িকরূপে সেই বৈরাগ্য-প্রধান গৃহ-সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে এ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন নাই। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যযুগে যখন অঘোর, কেশব ও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি চলিয়া গিয়াছেন—যখন নববিধান মণ্ডলী এক উদ্যমশীল নবীন প্রচারকদলের অপেক্ষা করিতেছিলেন, ভাই ব্রজগোপাল, প্রমথলাল, কালীনাথ ও আশুতোষ প্রভৃতি নবীন উৎসাহের সহিত নবদলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ ভাই ব্রজগোপালের সহিত প্রথম পরিচয়। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সে সময়ে তাঁহার তাদৃশ যোগ ছিল না। তাঁহার প্রিয় সহধর্ম্মিণী (আমাদের প্রিয় ভগিনী) দেবী মনোরমা ও আমার সহধর্ম্মিণী দেবী সুমতি যখন সম-পাঠিনীরূপে তাৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠিত নেটিভ্ লেডিজ নর্ম্যাল স্কুলে শিক্ষালাভ করিতেছিলেন, সেই সময়ে ও সেই সূত্রে ভাই ব্রজগোপালের সঙ্গে আমার এক মধুর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আমাদের উভয়ের বিশেষ সহানুভূতি সত্বেও আমাদের ভিতর হইতে এমন কিছু তখনও বুঝিতে পারি নাই যে, আমরা উভয়েই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পড়িব। উপরোক্ত সূত্রে যখন ভাই ব্রজগোপালের সঙ্গে প্রথম আলাপ পরিচয় হয়, সে আলাপ তাঁহার নিষ্ঠাবান প্রাচীন শ্বশুর মহাশয়ের বীডন্ ষ্ট্রীটস্থিত ৬নং গুরিপদ্ লেনের বাড়ীতে দ্বিতল অট্টালিকার উপর সেই সুবৃহৎ পরিবারের মধ্যে হইয়াছিল। তাঁহার সেই নিষ্ঠাবান ভক্ত শ্বশুর মহাশয় তখনকার সময়ের প্রাচীন হিন্দু হইলেও আমাদিগকে অবারিত ভাবে তাঁহার কন্যার সহিত আলাপ পরিচয় সম্বন্ধে দেশীয় প্রথানুসারে কোন অবরোধের ব্যবস্থা করেন নাই। আমি ও আমার সহধর্ম্মিণী ও ভাই ব্রজগোপাল ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীতে যে রজনীতে একত্রে বসিয়া মধুর পরিচয়ের বিমলানন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, আজও তাহা স্মৃতিপথে নূতনের ন্যায় জাগিতেছে। আর আজ সেই ভাই ব্রজগোপাল ও তাঁহার সেই পবিত্র-মূর্ত্তি সহধর্ম্মিণী দেবী মনোরমা শরীরে বর্ত্তমান নাই! ভগিনী মাঘোৎসব শেষ করিয়া বিগত জানুয়ারী মাসে ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন, আর সোদরোপম ভ্রাতা ভাদ্রোৎসব শেষ করিয়া সেই পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে পরলোকে মিলিত হইলেন! বিধাতার রহস্য কে বুঝিবে? ভাই যে সপরিবারে ব্রাহ্মসমাজে আসিলেন, তাহাও আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের স্বর্গারোহণের অনেক পরে। তবে আমাদের উভয়ের পরিচয়ের পর ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, আচার্য্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তির ভাব ছিল। আচার্য্যের তেজস্বিনী প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা যখন কলিকাতার টাউন্ হল ও বীডন্ পার্ক প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থান সমূহকে প্রতিধ্বনিত করিতেছিল, সেই

সময়ে তাঁহার প্রাচীন শ্বশুর মহাশয় কোন সময়ে বীডন্‌পার্কে আচার্য্যের বাঙ্গালা বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া নিজ বাড়ীর সকলকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, কেশবচন্দ্র সেন সত্য সত্য ঈশ্বর-প্রেরিত লোক"। ভাই ব্রজগোপাল এক দিন খুব আগ্রহের সহিত আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা-জীবনে কোন কোন সময় তাঁহার ভক্ত মাতুল ভাগলপুর-নিবাসী ভক্ত হরিসুন্দরের নিকটেও অবস্থান করিতেন। এই সময় হইতেই আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের গ্রন্থ ও বক্তৃতাদি পাঠ করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বাড়িতে লাগিল। এ কথা ঠিক যে, তিনি এই সমস্ত অধ্যয়ন করিয়া ও বিধাতার আলোক প্রাপ্ত হইয়া, আচার্য্যের স্বর্গারোহণের কয়েক বৎসর পরে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। স্কুল ও কলেজের পড়া, যতদূর সম্ভব, শেষ করিয়া তিনি প্রথমে গয়া বালিকা-বিদ্যালয়ে, তৎপরে বাঁকিপুর বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হয়েন। গয়ায় অবস্থানকালে তিনি প্রায়ই বুদ্ধগয়ায় যাতায়াত করিতেন এবং তথায় ধর্ম্মপাল-প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ-মন্দিরের মোহন্ত সিংহলবাসী "মঙ্গলের" নিকট পালি-ভাষা শিক্ষা ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সংক্রান্ত অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং বাঁকিপুর অবস্থানকালেই শিক্ষকতা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া প্রচারক ব্রত অবলম্বন করেন। প্রচারক-জীবনে তিনি বাঁকিপুর ও কলিকাতা হইতে ভারতের অনেক দূরতম স্থানেও প্রচার-যাত্রা করিয়াছিলেন। লিপি-বাহুল্য বোধে সে সকলের বিশেষ বিবরণ এ প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল না। তাঁহার সংযোগিগণ তাহা পত্রস্থ করিবেন। বাঁকিপুর অবস্থানকালে তিনি বিশেষ উদ্যম, উৎসাহ ও একপ্রাণতার সহিত স্বর্গীয় প্রচারক ভাই দীননাথ মজুমদার, ভাই বলদেবনারায়ণ এবং এখনও যিনি শরীরে বর্ত্তমান, সেই উৎসাহী ভ্রাতা গণেশ-প্রসাদের সহিত মিলিত হইয়া "কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না" এই মহামন্ত্র লইয়া যে নববিধানাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা এস্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। হস্তে এক কপর্দ্দকও সম্বল নাই, অথচ আশ্রম চলিতেছে। উৎসাহী কার্য্যকারকগণ যেন এক এক জন ছোট ছোট জর্জ্জ মূলারের মত বসিয়া রহিয়াছেন, অথচ দিন কাটিয়া যাইতেছে—রাত্রি প্রভাত হইতেছে। তারপর তাঁহার জীবনের আর একটা বিশেষ দিক্ ছিল, তাহাও এস্থানে উল্লেখযোগ্য। যখন কোথাও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত, ভাই ব্রজগোপাল আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। হাতে সম্বল নাই, অথচ দুর্ভিক্ষ-পীড়িতকে কি খাওয়াইবেন, তাহাও জানেন না, তবুও ভিতর হইতে কি নিভৃত শক্তি লাভ করিয়া, বিধাতার ডাক্ অনুভব করিয়া, দূরতম প্রদেশেও ছুটিয়া যাইতেন। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থান হইতে কয়েকটী অনাথা, আহারাভাবে জীর্ণ বালিকাকে বাঁকিপুরে আনিয়া বন্ধুবান্ধবদিগের তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন।

বাঁকিপুরবাসী ভক্ত প্রকাশচন্দ্র যেমন ব্রাহ্মসমাজে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যেও একটা উদার ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন, ভাই ব্রজ-গোপালও বিভিন্ন দলের সঙ্গে মিশিয়া সেই-রূপ উদার ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন। ভাই ব্রজগোপাল একদিন কৌতূহল-পরবশ হইয়া ভক্ত প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, "পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আপনার বাল্য-সুহৃদ্ ও সমপাঠী এবং এখনও আপনাদের মধ্যে সেই ভাবই বর্ত্তমান, তবে আপনি

কুচবিহার বিবাহের পর শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে না মিলিয়া নববিধান সমাজে কিরূপে আসিয়া পড়িলেন ?" ভক্ত প্রকাশ কিয়ৎ-ক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তুমিই এ প্রশ্নের উত্তর দাও।" ভাই ব্রজগোপালও তদ্রূপ নীরবতার পরে বলিলেন যে, "আপনি কোন দলগত উচ্ছ্বাস অথবা ভাবের অনুবর্ত্তী নহেন। আপনি আপনার আলোক ধরিয়া চলিতেছেন।" তখন ভক্ত প্রকাশ তদ্রূপ নীরবতার পর তাঁহার স্বাভাবিক জ্যোতিষ্মান্ মুখে বলিলেন, "অবশ্য তুমি যাহা ধরিয়াছ, তাহার প্রতিবাদ করিতেছি না। আলো-কের নিকট এমন একটা স্বাধীনতা আছে যে, যে ব্যক্তি আলোক-বাদী, বন্ধুবা বিরোধী হইলেও আলোকের পথ তিনি ছাড়িতে পারেন না। যদি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শিবনাথ বাবুর মিলন অসম্ভব হইতে পারে, আমার সঙ্গেও তাঁহার সে স্থানে মিলন অসম্ভব হইতে পারে। অবশ্য আমাদের চিরাগত বন্ধুত্ব-সূত্র অক্ষুণ্ণই থাকিবে। কেশবচন্দ্রের আলোক স্বীকার করি, তবে অবশ্য সম্পূর্ণ না বুঝিতেও পারি। পৃথিবীর ছায়াপার্শ্বে সূর্য্যের আলোকও আচ্ছন্ন হয়, কিন্তু সূর্য্য যেমন আলোকবিশিষ্ট সেইরূপই থাকে। কেশবচন্দ্রের উপর একটা নিন্দের ছায়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তিনি আলোক-বিশিষ্ট সূর্য্যের মতই চলিয়া ছিলেন।" ভক্ত প্রকাশ আরও বলিলেন যে, "দেখ আমরা সকল সময় সকল বস্তুকে ধরিতে পারি না। হয় ত যাহা দেখিতেছি, তাহা ঠিক নহে। চন্দ্রে যে কৃষ্ণবর্ণ রেখা আছে, প্রাচীন যুগে তাহা চন্দ্রের কলঙ্ক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, পরে যখন মানুষের বৈজ্ঞানিক চক্ষু ফুটিয়া উঠিল, মানুষ বুঝিতে পারিল যে, সে সব চন্দ্রের কলঙ্ক নহে— পাহাড়, পর্ব্বত ও সমুদ্র। চন্দ্র যখন কলঙ্কী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, তখন কবি শতমুখে চন্দ্রের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কুচবিহার বিবাহকে যদি লোকে প্রথম-পরিচিত চন্দ্রের মতই বুঝিয়া থাকে, তবুও তাহা স্বীকার করিতে হইবে। মানুষের ভবিষ্যৎ চক্ষু তাহার ভিতর এমন কিছু দেখিতে পাইবে, যাহা পাহাড় পর্ব্বতের মত স্বীকৃত হইবে। আমাকে আমি অস্বীকার করিতে পারি, কিন্তু আমার আলোককে অস্বীকার করিতে পারি না। এমন দিন আসিবে, যখন মানুষ কেশবের পথ বুঝিতে পারিবে।"

"মহাজনদিগের একটা দিক আছে, সে স্থানে সাধারণের সঙ্গে মিল হয় না।" এই বলিয়াই তিনি (প্রকাশচন্দ্র) বলিলেন যে, "এক সময়ে পাহাড়ে অবস্থান কালে কোন ইউরোপীয় খ্রীষ্টিয়ান প্রচারকের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে তিনি খ্রীষ্টের সম্বন্ধে বলিলেন যে, "The ways of the great are singular. We Christians do not still understand all the ways of Christ. We are as much Christian as we can understand and follow him. There is no fuller Christian yet." তিনি এই কথা বলাতে, প্রকাশচন্দ্র, আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কথা কহেন, তাহাতেও তিনি এই বলেন যে, "It is so applicable to your leader Keshub and to the Brahmos at large." ভাই ব্রজগোপালের সঙ্গে যখন এইরূপ প্রসঙ্গ হইতেছে, তখন আমিও উপস্থিত। আমি তখন এই কথা প্রসঙ্গের মধ্যে বলিয়া ফেলিলাম যে, "There is not a fuller Brahmo yet" কথাটা শুনিবা মাত্র ভক্ত প্রকাশ ও ভাই ব্রজগোপাল

হাসিয়া উঠিলেন। সেই সময়ে ইস্লাম্ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের কথা মনে আসিল। রমজান্ পর্ব্বের অনশনের দিনে মহম্মদ সরবৎ পান করিয়াছিলেন। সেই কথা তাঁহাদের বলিলাম। ১৮৮০ অথবা ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে আমি আমাদের নিজ জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী বোহার গ্রামে তত্রত্য সুবিজ্ঞ পারস্য ভাষাবিদ্ ইস্লাম্-শাস্ত্রজ্ঞ বিখ্যাত জমীদার শ্রীযুক্ত সৈএদ সদরউদ্দীন আহম্মদ ও সৈএদ শ্রীযুক্ত সদরউদ্দীন আহম্মদ মহোদয়দ্বয়-প্রতিষ্ঠিত ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত, তখন তাঁহাদিগকে শ্রীমহম্মদের সরবৎ পানের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে তাঁহারা বলিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর মহম্মদ ভিন্ন আর কাহারও দিবার অধিকার নাই। তিনি আমাদের মতে চলিতেন না। তিনি পরমেশ্বরের আদেশে চলিতেন। আমি আমাদের কালনার ভগবান দাস বাবাজীর কথাও তাঁহাদের বলিলাম। ভগবানদাস একটী নিভৃত ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিতেন। কুটীরের গায়ে "নাম ব্রহ্ম" এই কথাটা লিখিত ছিল। তিনি বিড়াল কুক্কুরকে লইয়া একত্রে ভোজন করিতেন। কেহ কেহ দেখিয়াছেন যে, দারুণ গ্রীষ্মের সময়ও তিনি কখন কখন প্রজ্বলিত অগ্নির পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। কোন সময়ে এক বন্ধু তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার ভিতরের পাপ দগ্ধ হইতেছে।" তাঁহার গৃহে কোনরূপ দেবদেবীর মূর্ত্তি ছিল না, অথবা তিনি কোন দেবালয়ে গিয়া গঠিত মূর্ত্তির সম্মুখে অবনত হইতেন না। সাধারণ বৈষ্ণবশ্রেণী তাঁহাকে সেরূপ বুঝিতে পারিতেন না, বরং অস্বীকার করিতেন। আমার কথার পর ভাই ব্রজগোপাল বুদ্ধদেব সম্বন্ধেও সেইরূপ বলিলেন। তত্ত্ব প্রকাশও অন্যান্য সাধু মহাজন সম্বন্ধে সেইরূপ বলিলেন। স্থির হইল যে, সকল সাধু মহাজনদিগের সকল পথ না বুঝিলেও তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে এবং এমন দিন আসিবে যে, যাহা আমরা এক সময়ে বুঝি নাই, তাহা পরে বুঝিব। এই কথায় আজ এই প্রবন্ধের মধ্যে আমিও বলিতেছি যে, আমরা অল্প বিশ্বাসী হইয়া বড় বড় সাধুমহাজনদিগকে অস্বীকার করি। সে দিন আমাকে আমেরিকাবাসী ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরস্থ রেভারেণ্ড জি, ডব্লু ম্যাকালা যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহার একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন যে, "Many are the professors of religion but few are its believers." আমি তাঁহার "Words of Faith" পত্রের একজন নিয়মিত লেখক। ধর্ম্ম অনেকে মুখে স্বীকার করেন, কিন্তু ইহার প্রকৃত বিশ্বাসী খুবই অল্প। সত্যই যত বয়স বাড়িয়া যাইতেছে, ততই দেখিতেছি যে, আমাদের অবস্থাও ঐরূপ। মুখে স্বীকার করিতেছি, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে। কেশবচন্দ্র এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, "ব্রাহ্মসমাজ এখনও আসে নাই। দশ হাজার বৎসর পরে আসিবে।"

ভাই ব্রজগোপাল এই ভবিষ্য বাণীকে খুব মানিতেন, অথচ একটা প্রাণ, উদ্যম, উৎসাহ, প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস লইয়া তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে চলিতেন। তিনি এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "দিন এখনও আসে নাই, তাহা আসিবে।"

এইরূপ আলোচনায় যেন ভাই ব্রজগোপালের ভিতর একটা নূতন আলোক আসিল। তিনি কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের অনেক পরে বিশেষভাবে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগদান

করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের বক্ষে অনেক ধূমায়মান বহ্নিকে প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়াছিলেন, তবুও প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাসের বলে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া মাথা দিয়াছিলেন। লোক অনেক আসে, কিন্তু কয়জন মাথা দিতে পারেন? ভক্ত প্রকাশ ও ভাই ব্রজগোপাল অনেক দিন একগৃহে কাটাইয়াছেন ও একাসনে বসিয়া উপাসনা করিয়াছেন। উভয়ের ভিতর এমন একটা সাম্য ও উদার ভাব বর্ত্তমান ছিল যে, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক বিভাগের সঙ্গে অবাধে মিলিতে পারিতেন,অথচ তাঁহাদের বিশ্বাস ও মত অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। উভয়েই কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে এমন একটা বিশেষ যোগ অনুভব করিতেন যে, তাহা অনেকের ভিতর খুবই বিরল। ভক্ত প্রকাশ যখন ১৯০৯ খ্রীঃ কুচবিহারে গিয়াছিলেন, তখন বলিলেন, যখন এ ভূমিতে আসিয়াছি, তখন আচার্য্য-কন্যা মহারাণী মহাশয়ার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় করিয়া যাইতেই হইবে। মহারাণী মহাশয়াও তাঁহার ইচ্ছা অবগত হইয়া রাজপ্রাসাদে তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত অনেক কথাবার্ত্তা কহিলেন। প্রকাশ তাঁহার আলাপে খুবই আনন্দ লাভ করিয়া সকলকে আসিয়া বলিলেন। আমিও প্রসঙ্গের স্থানে উপস্থিত ছিলাম। মহারাণী মহাশয়ার আগ্রহে তিনি কুচবিহারে নববিধান মন্দিরে সম্মুখের রবিবারে উপাসনা করেন। ভাই ব্রজগোপালও সেই ভাব লইয়া কয়েকবার কুচবিহারে গমন করিয়াছেন। ভাই ব্রজগোপালের কথা লিখিতে গিয়া অনেক কথা বলিয়া আসিলাম। তাঁহার সঙ্গে একত্রে অনেক দিন কাটাইয়াছি। তাঁহার জীবনের অনেক কথা অবগত আছি। তাঁহার সম্বন্ধে দ্বাচত্বারিংশ বৎসরের অভিজ্ঞতা। ক্ষুদ্র পত্রে, ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সমস্ত বিবৃত করা অসম্ভব। যাহা লিখিলাম তাহা অভিজ্ঞতার আভাস মাত্র। আশা করি, বন্ধুগণের নিকট তাঁহার জীবনকাহিনী আরও পরিস্ফুট হইবে।

যে প্রাচীন মগধ-ভূমিতে ভাগীরথীর অববাহিকায় সেই পুণ্যশ্লোকা, সেবাপরায়ণা, তপস্বিনী দেবী অঘোরকামিনী, সেবাপরায়ণা দেবী গিরিবালা ও দেবী উত্তমা, ও যে পূত শ্মশানবক্ষে ভক্তিমান প্রকাশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ, অপূর্ব্বকৃষ্ণ, শ্রীশচন্দ্র প্রভৃতির দেবদেহের পবিত্র ভস্ম ভাসিয়া গেল, সেই মহাশ্মশানের মহাবক্ষে ভক্ত, প্রেমিক ও মহাবিশ্বাসী ভাই ব্রজগোপালেরও পবিত্র দেহভস্ম ভাসিয়া গেল!! সেই সিন্ধুদেশবাসী ভক্ত হীরানন্দেরও দেহভস্ম এই স্থানে ভাসিয়া গিয়াছে!

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

'স্মৃতিপূজা।'

(আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার।)

জন্ম—অগ্রহায়ণ, ১২৫৩। মৃত্যু—আশ্বিন, ১৩২৪।

বঙ্কিম-যুগের কৃতী লেখক, প্রসিদ্ধ সমালোচক আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সহিত আমার প্রথম দেখা হয়, চুঁচুড়ার ৫ম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন-ক্ষেত্রে। তাঁহার সহিত পরিচয়টা হইয়াছিল একটু অভিনব ধরণে। সম্মিলনের প্রথম দিনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে,অভিভাষণ প্রভৃতি পাঠ হইতেছে, এমন

সময় হঠাৎ খুব ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঝড়ের বেগে বাঁশ-খড়-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড সম্মিলন-মণ্ডপ এক পাশে হেলিয়া পতনোন্মুখ হইলে, ছোট বড় প্রায় সমস্ত সাহিত্যিকই সাহিত্য-চর্চ্চা ছাড়িয়া 'য পলায়তি স জীবতি' মন্ত্রের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। মঞ্চের উপরে সম্মিলনের সভাপতি কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র এবং অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি প্রবীণ সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র ও তাঁহাদের সহিত আরো কয়েকজন তখনও স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন, কিন্তু ঝড়ের দ্বিতীয় বেগে উপস্থিত সকলে তাঁহাদিগকে মণ্ডপ ত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ করায় সভাপতিদ্বয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি দেখিলাম, পরিচিত হইবার এই সুযোগ, তাই অতি দ্রুত মঞ্চের সিঁড়ির নিকট গিয়া হাত বাড়াইয়া অক্ষয় বাবুকে বলিলাম 'আসুন'। আমার মত আরো অনেকে তাঁহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার সৌভাগ্য, তিনি আমার হাতে হাত দিয়া বলিলেন, 'পারবেন ?'—"আসুন ত"। ভগবানের প্রসাদে বিরাট পুরুষকে আমি অক্লেশে নামাইয়া মণ্ডপের বাহিরে একখানা ছোট ঘরে লইয়া বসাইলাম। এখানে বসিয়া সুস্থ হইয়া অক্ষয়চন্দ্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কোন্ জেলা হইতে আসিতেছেন ?"—"খুলনা"। "গ্রাম" ?—"সেনহাটী"। "সেনহাটী! এই সেনহাটী কি পূর্ব্বে যশোহর জেলায় ছিল ?"—"আজ্ঞে, হাঁ।" "সেনহাটীর পীতাম্বর কবিরাজ মহাশয় এত দিন জীবিত না থাকিবার কথা, কিন্তু তাঁহার আর কে আছেন ?" আমি—"তিনি আমার পিতামহ।"

অক্ষয়চন্দ্র উৎফুল্ল নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—"আপনি পীতাম্বর কবিরাজ মহাশয়ের পৌত্র, তবে ত আপনি আমার নিজের লোক, এখন হইতে আমি আপনাকে 'আপনি' বলিব না, তুমি বলিব।"—"আচ্ছা তাই বলিবেন। কিন্তু ঠাকুরদাদাকে আপনি জানিলেন কিরূপে? তিনি ত এ দেশে আসিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই।" "না, তাঁহার সহিত আমার দেখা এখানে নয়, যশোহরে হইয়াছিল—সে মাত্র একদিনের জন্য।" "একবারের দেখায় তাঁহার কথা আপনার এত দিন মনে আছে ?" —"দেখা একদিনের মাত্র, কিন্তু তাঁহার কথা আমার মনে থাকিবার বিশিষ্ট কারণ আছে। সে কথা এখানে বলার সময় নাই। সম্মিলন শেষ হইলে তুমি যদি আমার বাড়ীতে যাও, আমি বড় সুখী হইব এবং তোমার পিতামহের কথা বলিব।" আমি একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিলাম—"আপনার কাছে কিছু সময় থাকিতে পারিলে কৃতার্থ হইতাম, কিন্তু তাহার সম্ভাবনা নাই, কারণ সম্মিলন শেষ হইলেই আমাকে দেওঘর যাইতে হইবে।"—"দেওঘর যাইবে কেন ?"—"সেখানে আমার দাদা আছেন, তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইব।" তিনি আর কিছু বলিলেন না। এই সময় ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল—আবার সম্মিলনের অধিবেশন আরম্ভ হইল।

আমি অভ্যর্থনা-সমিতির নিমন্ত্রিত প্রতিনিধিস্বরূপ সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার বন্ধু হুগলী কলেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ আমাকে জোর করিয়া তাঁহার বোর্ডিংএ লইয়া গেলেন—আমার আর অভ্যর্থনা-সমিতির আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইল না। দুই দিনে সম্মিলনের কার্য্য শেষ হইয়া

গেল। তৃতীয় দিন প্রত্যূষেই হেমচন্দ্র বাসার ঠাকুর, চাকরকে তাড়া দিয়া অতি তৎপরতার সহিত আমার অন্ন ব্যঞ্জনের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, আমি খাওয়া দাওয়া করিয়া দেওঘরে যাইবার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম, কিন্তু আমি ষ্টেশনে পৌছিতে না পৌছিতে গাড়ী হুস, হুস শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল। গাড়ী ধরিতে না পারিয়া প্রথমটা মন বড় খারাপ হইয়া পড়িল, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া গাড়োয়ানকে অক্ষয় বাবুর বাড়ীতে যাইবার কথা বলিয়া স্থির হইয়া বসিলাম। যথা সময়ে গাড়ী পৌছিল— বাড়ীতে ঢুকিয়াই অক্ষয় বাবুর সহিত দেখা হইল। আমি অগ্রসর হইয়া নমস্কার করিলে তিনি 'এস' বলিয়া আমার হাত ধরিলেন। আমি—"দেওঘর যাইব বলিয়া বাহির হইয়াছিলাম, কিন্তু গাড়ী ধরিতে পারি নাই।" "তা' বেশ হইয়াছে।" ইহা বলিয়া তিনি আমাকে লইয়া তাঁহার বৈঠকখানায় বসাইলেন। কিছুক্ষণ এ কথা ও কথা চলিল, পরে তিনি বলিলেন—"তোমার পিতামহকে আমার কেন এত দিন মনে আছে, তাহা জানিবার জন্যই তুমি বোধ হয় বিশেষ উৎসুক হইয়াছ—সেই কথা প্রথম বলিতেছি।

আমার পিতার নাম গঙ্গাচরণ সরকার। তিনি যশোহরের সব্‌জজ ছিলেন। সেই সময় তোমার পিতামহ খুলনা মুনসেফী আদালতে তাঁহার এক প্রজার নামে বাকী করের নালিস করেন। প্রজা কিছুমাত্র খাজনা আদায় না করা সত্ত্বেও মিছামিছি হয়রাণ করিবার জন্ত খাজনা দিয়াছে, জবাব দিয়া, কবিরাজ মহাশয়কেই সাক্ষ্য মান্ত করিল। তখনকার লোকে অতি ধর্ম্মভীরু ছিলেন—আদালতের ত্রিসীমানাও মাড়াইতে সাহসী হইতেন না। আদালতে গেলে মান, সম্ভ্রম থাকে না, উকীলের কৌশলে পড়িয়া অসাবধানতাবশতঃ হয়ত মিথ্যা কথাও বলিতে হইবে, এই ভয়ে তিনি আদালতে হাজির হইলেন না। এদিকে যে মুনসেফের আদালতে এই মোকদ্দমা ছিল, একবার তাঁহার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য কবিরাজ মহাশয়কে আনিতে যায়, কিন্তু তখন প্রতিবেশী কোনও দরিদ্র রোগীর চিকিৎসা করিতে ছিলেন বলিয়া তিনি সেখানে যাইতে পারেন নাই। মুনসেফ বাবু সেই জন্য অসন্তুষ্ট ছিলেন—এখন সময় পাইয়া অনুপস্থিতি অজুহাতে তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া তাঁহার স্থাবর সম্পত্তি নীলাম করিবার আদেশ দিয়া মূল মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া দিলেন। যশোহরে আমার পিতার নিকট এই উভয় মোকর্দ্দমারই আপিল হয়। আপিলে কবিরাজ মহাশয়ই জয়লাভ করেন। এই মোকর্দ্দমার বিচারকালীন উকীল রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয়ের বহুবিধ গুণ বর্ণনা করিয়া বলেন যে, তিনি তাঁহার বাসায় উপস্থিত আছেন।

আমার পিতা বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কোন স্থানে কোন বিদ্বান বা গুণবান ব্যক্তি উপস্থিত হইলে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়া আসিতেন। সেই মোকর্দ্দমার সময় আমি পিতার নিকট যশোহরেই ছিলাম। সে দিন কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রামান্তে পিতা আমাকে বলিলেন—"চল হে, উকীল রামদাস বাবুর বাসায় সেনহাটীর পীতাম্বর কবিরাজ মহাশয় আসিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া আসি। কবিরাজ একজন বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, তেজস্বী ও পরদুঃখকাতর।"

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে প্রস্তুত হইয়া পিতার সঙ্গে চলিলাম। রামদাস বাবুর বাসায় পৌছিলে তিনি কবিরাজ মহাশয় ও পিতাকে পরস্পর পরিচিত করিয়া দিলেন। পিতা কবিরাজ ও রাম বাবুকে বলিলেন, 'চলুন আমার ওখানে।' তাঁহারা গাড়ীতে উঠিলে সকলে আমাদের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

পিতা বলিলেন—"কবিরাজ মহাশয়, আপনি কয়েকদিন এখানে আসিয়াছেন, কিন্তু কই আমাকে ত খবর দেন নাই, তাহা হইলে ত এ কয়দিন আলাপ করিয়া সুখী হইতাম।" কবিরাজ উত্তর দিলেন, 'রামদাস বাবুর নিকট আপনার খ্যাতি শুনিয়াছি। আমি নিজেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম, কিন্তু আপনার নিকট আমার দুইটী আপিলের মোকর্দ্দমা ছিল বলিয়া যাওয়া সঙ্গত মনে করি নাই।'—'সে কি! আমার আদালতে মোকর্দ্দমা ছিল, সে আদালতের কথা, তাই বলিয়া বন্ধুভাবে বাড়ীতেও কি আমরা দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারিব না,—তাতে দোষ কি? আচ্ছা কবিরাজ মহাশয়, মোকর্দ্দমার কথা উঠিল ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি যে আপনারা সাক্ষ্য দিতে অসম্মত কেন? বিচারক যাঁহারা, তাঁহারা কিছু আর ঘটনার সময় উপস্থিত থাকেন না, অপরের কথা শুনিয়াই তাঁহাদের বিচার কার্য্য শেষ করিতে হয়, কিন্তু এমনই মুস্কিল যে, কোন সম্ভ্রান্ত লোকই সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত নহেন, ইহাতে বিচারকের পক্ষে সত্য নির্দ্ধারণ করা বড় কঠিন হইয়া পড়ে।' পিতার কথার উত্তরে কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—'আপনার কথাগুলি ঠিক। সম্ভ্রান্ত সাক্ষীর অভাবে আপনাদের কার্য্যের বড় অসুবিধা হয়, তাহাও বুঝি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আদালতে কি আপনারা সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্তের সহিত ব্যবহারে কোন তারতম্য করিয়া থাকেন? নিম্ন শ্রেণীর মুচি মুদ্দফরাস যেখানে যে ভাবে সাক্ষ্য দিবে, বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব মহাকুলীন বিষ্ণুঠাকুরের সন্তানকেও ত ঠিক সেখানে দাঁড়াইয়া সেই ভাবেই সাক্ষ্য দিতে হইবে? স্বয়ং খুনী আসামীর যে স্বাধীনতাটুকু আছে, সাক্ষীর সেটুকুও নাই। সাক্ষ্য দিতে আসিয়াই সে যেন মহা অপরাধ করিয়াছে। তাই বিচারক হইতে আরম্ভ করিয়া আদালতের সামান্য চাপরাসি পর্য্যন্ত তাহার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করেন—উকীল বাবুরা ত শুনিয়াছি, যে কোন প্রকারেই হউক, সাক্ষীকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়া ছাড়িয়া দেন—এ অবস্থায় কোন্ ভদ্রলোক ইচ্ছা করিয়া আসিয়া লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত ও অপমানিত হইতে চাহেন? যত দিন এ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না হইবে, ততদিন কোন ভদ্রলোকই স্বইচ্ছায় সাক্ষ্য দিতে আসিবেন না। আপনারা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, ইহার কি কোন প্রতীকারই করিতে পারেন না?" কবিরাজ মহাশয়ের কথা শুনিতে শুনিতে পিতার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, 'আপনি যাহা বলিলেন, তাহা বাস্তবিকই খাঁটি। এত দিন বিচার বিভাগে কার্য্য করিতেছি, কিন্তু সাক্ষীর বিষয়ে এ ভাবে ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ হয় নাই। গভর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে লিখিয়া কিছু ফল হইবে, মনে হয় না—তবে সংবাদপত্রে আলোচনা চলিতে পারে।' এই বলিয়াই পিতা আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'এবার এই বিষয়েই লিখিব।' এই আলোচনার ফলে কয়েক সপ্তাহ পরে আমার 'সাধারণী'তে পিতার

'সাক্ষ্য' নামক প্রবন্ধ বাহির হয়—ইহাই হইল আমার কবিরাজ মহাশয়কে এত দিন মনে থাকিবার কারণ।"

আমার পিতামহ প্রায় ৩০ বৎসর হইল সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন—এত দিন পরে, এত দূর দেশে অপরিচিত ব্যক্তির মুখে তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে গৌরবে আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—আমি কিছুক্ষণের জন্য আপনা ভুলিয়া গেলাম।

অক্ষয় বাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—'তোমার পিতামহের কথা হইল—এখন আমার কথা বল ত।'—'আপনার কথা কি?' বলিয়া আমি জিজ্ঞাসুনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিলাম। তিনি বলিলেন,—'আমার কথা,—সম্মিলনে আমি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছি, সে বিষয়ে তোমার কি মত—সাধারণই বা কি বলেন?' আমি বলিলাম—'আপনার ভাষার আমি চিরকালই পক্ষপাতী। সেই ভাষায় যখন আপনি বাঙ্গালা তথা বাঙ্গালী ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়া কিরূপে দ্রুত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে—সেই কথা বলিতেছিলেন, সেই কথা বলিতে বলিতে অজস্র অশ্রুপাত করিতেছিলেন, তখন দেশের একটা ধ্বংস-চিত্র আমার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়া আমার নয়ন-প্রান্তও অশ্রুসিক্ত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু সাধারণে আপনার অভিভাষণের বড় অনুকূল সমালোচনা করেন নাই। তাঁহারা বলেন—'বঙ্কিম যুগের কৃতী লেখক আজীবন সাহিত্য-সেবী অক্ষয় বাবুর নিকট আমরা অনেক আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি সাহিত্যের বিষয় নামমাত্র বলিয়া ম্যালেরিয়ার কান্না অনবরত গাহিয়া আমাদিগকে একেবারে নিরাশ করিয়াছেন—এ প্রবন্ধ কোন চিকিৎসা-সম্মিলনের বৈঠকে পাঠ করিলেই শোভন হইত—এ তিনি একটা কি করিলেন?' আমার কথা শুনিয়া অক্ষয় বাবু যেন একটু আহত হইলেন—তাঁহার চোখ সজল হইয়া উঠিল—তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীর আর্ত্তস্বরে বলিতে লাগিলেন—"আমি চিরকাল এই কান্নাই কাঁদিয়া গেলাম—এই গানই গাহিয়া গেলাম, কিন্তু কেহই তাহাতে কর্ণপাত করিল না। সাহিত্যের কথা বলা বড় একটা কঠিন কাজ নয়, কিন্তু তাহাই বা কে শোনে? এখানে সাহিত্যের কথা শুনিয়া গেলে, কিন্তু পথে যাইতে যাইতেই তোমাকে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়া বসিল। বাড়ীতে গিয়া দেখিলে, ছেলেরা সব জ্বরে কম্পান্বিত কলেবর—তখন কোথায় থাকিল তোমার সম্মিলন—আর কোথায় থাকিল তোমার সাহিত্য-চিন্তা? শরীর সুস্থ না করিলে কাজ করিবে কে? তাই ত শাস্ত্রকার বলেন—'শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনম্।' কিন্তু বাঙ্গালী কথা বোঝে না, এইটা বড় দুঃখ। আমার সময় হইয়া আসিয়াছে—আমি ত চলিলাম, কিন্তু তোমাদের জীবনেই হয় ত দেখিয়া যাইবে যে, স্বাস্থ্য বিষয়ে অমনোযোগে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে? তখন হয় ত আমার কথা মনে হইবে।' এই কথা বলিতে বলিতে প্রবীণ পুরুষ উচ্ছ্বসিত-বেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন—আমি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম।

প্রায় মিনিট পনের আমরা উভয়ে নীরব রহিলাম, পরে আমি অতি ধীরস্বরে বলিলাম, 'আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম—অনুমতি করিলে আর ২।১টা কথা জিজ্ঞাসা করিতাম।' তিনি বাধা দিয়া বলিলেন—'সে কি, আমি ত

বড় সুখেই তোমার সহিত সময় অতিবাহিত করিতেছি—তোমার জানিবার কি আছে বল।'

"আপনি বঙ্কিম যুগের লোক, 'বঙ্গদর্শনের' লেখক, বঙ্কিম বাবুর সহিত অনেক দিন কাটাইয়াছেন, তাই আপনার কাছে জানিতে চাই যে, লোকে যে বলে 'বঙ্কিম বাবু বড় দাম্ভিক, বড় অহঙ্কারী ছিলেন' এ কথা কি ঠিক?"—"হাঁ, বঙ্কিম বাবু দাম্ভিক ছিলেন, এ কথা ত তাঁহার অতি বড় শত্রুও বলিতে পারে না। তবে গরিমা-জ্ঞান তাঁহার ছিল—প্রবল গরিমা-জ্ঞানই ছিল—খাঁটীর কাছে নয়, মেকীর কাছে—সেইটুকুই তাঁহার বিশেষত্ব—তাঁহার সেই দেমাকটুকুই তাঁহাকে 'বঙ্কিম বাবু' করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্য-ক্ষেত্রে আর একজনকে মাত্র দেখিতে পাই—তিনি সাহিত্যের সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সমাজপতিকে সকলে গোঁয়ার বলে, কিন্তু এই গোঁয়ার্ত্তুমি আছে বলিয়া—সমাজপতির সাহিত্য সমালোচনা এমন নিরপেক্ষ, নির্ভীক, ও শক্তিশালী হইতে পারিয়াছে।'

"বাঙ্গালা সাহিত্যে বর্ত্তমান সময়ে গদ্য-লেখকদিগের মধ্যে আপনার মতে কে উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য?"

"দেখ, কাহার আসন কোথায়, তাহা আমি বলিতে পারিব না, তবে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতির লেখায় একটা প্রাণ আছে। জলধর সেন ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাও বেশ"—'কবিদিগের মধ্যে?'—"কবীন্দ্র রবীন্দ্রের কথা ছাড়িয়া দেও, যোগীন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও অক্ষয়কুমার বড়াল নিজ নিজ ভাবের খুব বড় কবি।'—'নব্য কবিদিগের সম্বন্ধে কি বলিতে চান?'—"আমি বৃদ্ধ—বৃদ্ধের মুখে আর সে কথা নাই শুনিলে। তোমরা যুবক—তাহাদের গুণাগুণের তোমরাই উপযুক্ত সমালোচক।"

তখন বেলা বেশী হইয়া গিয়াছিল, তাই এবার আমি উঠিলাম। অক্ষয়বাবু কিছুদূর আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিলে আমি—'আর কেন, বেলা অনেক হইয়াছে।' এই বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতেই তিনি যেন একটু বিচলিত হইয়া আমার মস্তকে হস্ত রাখিয়া স্নেহগদ্গদকণ্ঠে বলিলেন— আশীর্ব্বাদ করি, সুস্থ শরীরে থাকিয়া কর্ত্তব্যসাধন করিতে সমর্থ হও, আর আমার সেই পুরাতন কথা, সাহিত্যের মধ্য দিয়া দেশমাতাকে ভালবাসিতে শিখ। মায়ের অঙ্গে যাহাতে রোগ পীড়া প্রবেশ করিতে না পারে—ভাই যাহাতে নীরোগ, সুস্থ, সবল হইয়া কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারে, সাহিত্যের মধ্য দিয়া দেশের লোককে তাহাই শুনাইয়া দেও—তোমার সাহিত্য-সাধনা জয়যুক্ত হউক।'

আমি আভূমি শির নত করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম। পথে আসিতে আসিতে আমার মনে হইল, ইঁহারাই প্রকৃত কায়মনোবাক্যে সাহিত্যসেবী। সাহিত্য-সেবার দ্বারা কেমন করিয়া দেশের, দশের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে হয়—সাহিত্যের মধ্য দিয়া দেশমাতৃকার অভাব অভিযোগের করুণ কাহিনী গাহিয়া কেমন করিয়া লোকের মনে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া দিতে হয়, তাহা ইঁহারা যেমন জানেন, এমনটী বুঝি এখনকার কেহই জানেন না। সার্থক ইঁহাদের দেশপ্রীতি—সার্থক ইঁহাদের সাহিত্য-সাধনা।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

বৈদিক দেবতা।

৩। "স্বয়ংভূর্বেদপুরুষঃ"

বা বেদের পরমেশ্বর।

বেদ জগতের প্রথম ধর্ম্মবিধান। সে সময়ে 'পরমেশ্বর', 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ইত্যাকার কোন শব্দ আজ কালের মত "পরমেশ্বর" অর্থে রূঢ়ি প্রাপ্ত হয় নাই। অগ্নি * ইন্দ্রাদি, + এবং 'অক্ষর' 'একং সৎ' ইত্যাদি নামে বেদমাতা তাঁহার মানব সন্তানদিগের নিকটে পরমেশ্বরের স্বরূপের প্রথম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বৈদিক মানব সমাজ যেন এক বিরাট নারদ, এবং ভগবান "বেদপুরুষ" বা পরমেশ্বর বেদের প্রকাশদ্বারা সেই বিরাট নারদকে যেন আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, এবং বলিতেছেন, "সকৃৎযদ্দর্শিতং রূপমেতৎকামায়তেঽনঘ। অবিপক্কষায়াণাং দুর্দর্শোঽহং কুযোগিনাং॥" "তোমাকে আমার দিকে টানিবার জন্ত একবার মাত্র দর্শন দিয়াছি। বিশুদ্ধান্তঃকরণ ভিন্ন কেহ আমার দেখা পায় না।" সেই ঈশ্বর দর্শন বেদের সময়েও অল্প কালের জন্য মাত্র, যেহেতু "অবিশুদ্ধ অসংযত চিত্তে" ঈশ্বর দর্শন স্থায়ী হয় না। তবে এরূপ কথা কি কাহারও গ্রহণযোগ্য হইবে? কে না জানে যে, বেদে অগ্নি, বায়ু, জল, আকাশ, পৃথিবী, এমন কি, ওষধি প্রস্তর ইত্যাদিরই স্তুতিবাদ? কে না জানে যে, অগ্নি, জল, বায়ু সকলই প্রাণহীন জড়। এরূপ অবস্থায় কেন মনে করা যাইবে না যে, বেদে জড়েরই উপাসনা, বৈদিক ঋষি জড়ের উপাসক ("Fetishism")? কেন কল্পনা করা যাইবে যে, বেদে পরমেশ্বর আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন? অপর দিকে পাশ্চাত্য মনীষিগণ গভীর গবেষণার পর সাক্ষ্য দিতেছেন যে, বেদে বহু-ঈশ্বরবাদ বা বহু-পরমেশ্বরবাদ (Polytheism, Henotheism), এবং বৈদিক ঋষিগণ 'অর্দ্ধসভ্য বা অসভ্য নিরক্ষর কৃষক'। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'কোরাণ' সম্বন্ধেও ঐরূপ অনেক কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু "কাফেরের" কথা জানিয়া তাহাদের কথাতে কোন মুসলমান বিচলিত হয়েন না। আমরা "কাফের" বা "ম্লেচ্ছ-যবন" বলিয়া উপেক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে উড়াইয়া দিতে পারি না। কেন? যেহেতু আমরা নিজে বেদকে লুপ্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিলাম, বেদমাতাকে বিনাশের মুখে ফেলিয়া দিয়াছিলাম, এবং মৎস্যাবতারের বিষ্ণুর ন্যায়, পাশ্চাত্য মনীষিগণই আমাদের নষ্টপ্রায় বেদের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগের নিকট চির ঋণী। আমরা পৌরোহিত্যের কুহকে পড়িয়া পুরোহিতদিগের মুখপাত্র মীমাংসকদিগের প্ররোচনায়—"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যং অতদর্থানাং" (মীমাংসা-দর্শন (১—২—১)—"বেদের উদ্দেশ্য যাগযজ্ঞ, যাহা যাগ-যজ্ঞে না লাগে, তাহা নিরর্থক", এই বলিয়া আমাদের বেদমাতার প্রতি, জন্মীর

* "অগ্রণীঃ", "অঙ্গং নয়তি", "অঞ্জনং অভিব্যক্তং প্রকাশকত্বাত্মকত্বেন বা নয়তি।" (যাস্ক-নিরুক্ত)। "The quick or agile, in Sanskrit, *Agnis*, in Latin *ignis*." (M. M's H. L.—IV).

+ "ইরাং অন্নং বা বলং। তদাধারভূতো মেঘঃ। ইরাং মেঘং দৃণাতি। অন্নং দদাতি বা। ইন্দ্বে দীপয়তি। ইদং পশ্যতি বা ইন্দ্রঃ"। যাস্ক। "In Sanskrit the drops of rain are called *indu*, he who sends them is called *Indra*, the rainer." (M. M's H. L.—IV.)

প্রতি যুগযুগান্তর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া বেদমাতাকে বিনাশের মুখে ফেলিয়া দিয়াছিলাম, এমন কি, পৌরোহিত্যের কুহকে পড়িয়া আমরা বেদের নামে পরমেশ্বরকে "স্বয়ম্ভু বেদপুরুষ"কেও—"তস্মাৎ শশ-বিষাণবৎ অসৌ নাস্তি" তিনি নাই, তিনি শশবিষাণবৎ অলীক কল্পনা মাত্র; (মীমাংসাদর্শন, শবরভাষ্য, ১—১৫) বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম। হায়্ পৌরোহিত্য, তুমি ভারতের কি সর্ব্বনাশই করিয়াছ, অদ্যাপি করিতেছ! আরও কত সর্ব্বনাশ করিবে। সন্তানদিগের এই অসদ্ব্যবহারে বেদমাতা মুমূর্ষু প্রায় হইয়াছিলেন। তখন মৎস্যাবতারে বিষ্ণুর বেদ-উদ্ধারের ন্যায়, "বেদানুদ্ধরতে" (গীতগোবিন্দ), পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আসিয়া আমাদের মত মাতৃঘাতীদের হাত হইতে আমাদের বেদমাতাকে উদ্ধার করিয়াছেন। এ কথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে, আমরা ঘোর কৃতঘ্ন হইব। অপর দিকে সত্যের অনুরোধে, এ কথাও স্বীকার করিতে হইতেছে যে, বুঝিয়া হউক আর না বুঝিয়াই হউক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের প্রতি সুবিচার করেন নাই, অথবা করিতে পারেন নাই। এমন কি, তাঁহাদের কৃপার গুরুভারে রুদ্ধশ্বাস হইয়া বেদমাতার আবার বিপরীত দিকে প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে। যদিও আচার্য্য মোক্ষমূলার সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তিনি বেদে 'ফিটিসিজম্' বা প্রাণকল্পনা করিয়া হস্তনির্ম্মিত জড় বস্তুর পূজার কোন নিদর্শন পান নাই,* তথাপি তিনিও বলিতেছেন যে, বেদে বহু-ঈশ্বরবাদ (Polytheism), বহু-পরমেশ্বরবাদ (Henotheism) এমন কি, নিরীশ্বরবাদ (Atheism)ও রহিয়াছে।* তাঁহার মতে বেদে প্রথমে বহু-ঈশ্বরবাদ, তার পর বহু পরমেশ্বরবাদ, তার পর নিরীশ্বরবাদ। (তবে সকল স্থানে তিনি যেন এক কথা বলেন নাই)। নিরীশ্বরবাদের পরে কি? তিনি বলেন, বেদের শেষ অংশে সর্ব্বাত্মবাদের অঙ্কুর দৃষ্ট হয়,—তিনি বলেন, "যদিও কোন কোন স্থলে ইহার পরিণামে নাস্তিকতাই দাঁড়াইয়াছিল, তথাপি অন্যান্য স্থলে এক নূতন যাত্রার নূতন বিশ্বাসের সূত্রপাত হইয়াছিল—"এক সৎ" স্বরূপে বিশ্বাস,—যাহা সকলের আত্মা, যাহা কেবল যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত সসীম বস্তুর অতীত, সমস্তের আশ্রয়, তাহা নয়, যাহা আমাদের সসীম 'অহং'এরও অতীত, এবং আশ্রয়, যাহা সকল আত্মার আত্মা (the self of all selfs)। † মোক্ষমূলার যে বেদের শেষাংসে বৈদান্তিক সর্ব্বাত্মত্বের অঙ্কুর দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন, সে জন্য তিনি ভারতবাসীমাত্রেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন। তিনি বিদেশীয় হইয়াও যে বেদের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে এতটুকু

* "They did not start with a worship of fetishes." H. L. VII.

* "We found how a belief in single supreme beings or Devas, Henotheism, tended to become a belief in one God, presiding over the other, no longer supreme gods,—Polytheism. We found that all the old Devas or gods were found out to be but names; that discovery in some cases led to Atheism." H. L. VII.

† "That discovery, though in some case, it led to Atheism, led in others to a new start, and to a new belief in one being, which is the self of every thing, which is not only beyond and beneath all finite things, as apprehended by the senses, but also beneath and beyond our own finite Ego, the Self of all Selfs. (H. L. VII).

সমর্থ হইয়াছেন, সেজন্য আমরা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা বেদকে "অর্দ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তির রচনা", এবং বৈদিক ঋষি "নিরক্ষর অর্দ্ধসভ্য বা অসভ্য কৃষক ছিলেন" বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। তবে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, স্বর্গীয় সার্ রমেশচন্দ্র দত্ত, মাতৃপ্রাণ "রমেশ দত্ত"ও যেন পাশ্চাত্য শিক্ষার কুজ্ঝটিকায় দৃষ্টিহীন হইয়া অনেক সময়ে তাঁহাদের কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। এই সকল নানা কারণে বৈদিক আকাশ অধুনা গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন। বিস্তারিত আলোচনা ভিন্ন সে আকাশ পরিষ্কার হইতে পারে না।

বস্তুতঃ এক কথায় বলিতে গেলে শঙ্করাচার্য্যের "সর্ব্বাত্মভাব" "বিদ্যায়াশ্চ কার্য্যং সর্ব্বাত্মভাবাপত্তিঃ" (বৃহদারণ্যক ভাষ্য ১—৪—১০) বেদেরও লক্ষ্য, প্রথম মণ্ডল হইতে শেষ মণ্ডল পর্য্যন্ত বেদেরও একমাত্র লক্ষ্য। শেষ মণ্ডলের কথা মোক্ষমূলার নিজেই স্বীকার করিতেছেন। প্রথম মণ্ডলে বলা হইয়াছে "একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" চতুর্থ মণ্ডলে (৪—২৬—১) ঋষি বামদেব "সর্ব্বাত্মভাব" সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া বলিতেছেন "আমি (বামদেব) মনু হইয়াছিলাম, সূর্য্যও হইয়াছিলাম, আমিই ঋষি কক্ষীবান্ হইয়াছি, অর্জ্জুনের পুত্র কুৎস ঋষিতেও আমারই প্রকাশ।" কক্ষীবান্ কে? ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬ হইতে ১২৬ সূক্তের ঋষি। কুৎস কে? ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৯৪ হইতে ১১৫ সূক্তের ঋষি; নিশ্চয়ই কক্ষীবান্ এবং কুৎস ও সর্ব্বাত্মভাব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই ঋষি বামদেবের নিকটে তাঁহারা এই বিশেষ সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ বেদের সহিত বেদান্তের কোন বিরোধ নাই। সে বিরোধ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের স্বকপোল কল্পনা মাত্র। সর্ব্বাত্মত্ব যেমন কক্ষীবান্ বামদেবাদি আদিম বৈদিক ঋষির একমাত্র লক্ষ্য, তেমনি বৃহদারণ্যকাদি উপনিষদেরও একমাত্র লক্ষ্য, (১—৪—১০), তেমনি শঙ্করাচার্য্যাদি বৈদান্তিকেরও একমাত্র লক্ষ্য, তেমনি আধুনিক হিন্দুরও লক্ষ্য, কার্য্যে না হউক, মতে, অন্ততঃ মুখে, আধুনিক হিন্দুরও সর্ব্ববাদিসম্মত লক্ষ্য। 'বেদান্ত' বলিতে বেদের 'অন্ত' বুঝায়—এই অর্থে নয়যে, বেদান্তে মোক্ষমূলার কল্পিত এমন এক নূতন বিশ্বাস, এমন এক নূতন পথে যাত্রা, "a new start", "a new belief" আরম্ভ হইয়াছে যে, সেই হইতে বেদ নিরর্থক হইয়াছে; এই অর্থে যে, বেদান্তে বেদেরই সার তত্ত্ব, যজ্ঞাদির বাহ্যাড়ম্বর হইতে মুক্ত করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে, এই অর্থে যে, বৈদিক ঋষি বামদেব, দধীচি প্রভৃতির নিকটে প্রকাশিত সর্ব্বাত্মভাব বা "মধুবিদ্যা" * যজ্ঞাদি অসার বাহ্যানুষ্ঠান হইতে পৃথক্ করিয়া, উপদেশ করা হইয়াছে। এজন্যই বেদান্ত বলা হইতেছে—"শ্রুতি-শিরাংসি" বা "শ্রুতেমস্তকং"।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, বেদের পরমেশ্বর কিংস্বরূপ? বেদমাতা স্বয়ং এ প্রশ্নের কি উত্তর দিতেছেন? বেদমাতার উত্তর বুঝিতে হইলে পাঠককে দুইটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে; "আমাদের সকল ক্রিয়াই ভৌতিক ছাঁচে ঢালাই করা"—(Our acti-

* "বামপর্ব্বা মনুষ্পিতা দধ্যঙ্ ধিয়মত্নত"। ১—৮০—১৬। "দধ্যঙ্ হ যন্মধ্বাথর্ব্বণো বামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্রযদী মুবাচ"। ১—১১৬—১২।

vity is fitted into the material world"—Berg. C. E.), এবং আমাদের ভাষারও উৎপত্তি ভৌতিকেতে। উপমিতি (Metaphor)* আদিম ভাষার প্রাণ, * বৈদিক ভাষার প্রাণ। ঋগ্বেদের সময়ে "পরমেশ্বর", পরমেশ্বরার্থক ব্রহ্ম বা "পরমাত্মা" ইত্যাদি শব্দ উৎপন্ন হয় নাই, আমাদের হাতে, 'স্রষ্টা' অর্থে, এই সকল শব্দ যেরূপ রূঢ় (technicalised) প্রাপ্ত হইয়াছে, বৈদিক সময়ে সেরূপ রূঢ়ি প্রাপ্তি ত দূরের কথা। ঋগ্বেদের সময়ে 'পরম' শব্দ ছিল যথা, "পরমে ব্যোমন্" (১—৬২—৭), ঐশ্বর্য্য অর্থে 'ঈশ' ধাতুমূলক 'ঈশান' শব্দও ছিল—"ঈশানং বার্য্যাণাং" 'সকল কল্যাণের নিয়ন্তা।' (১—৫—২); কিন্তু 'ঈশ্বর' বা 'পরমেশ্বর' শব্দ ছিল না, পরমেশ্বর অর্থে ব্রহ্ম শব্দও ছিল না। ঋগ্বেদের সময়ে "সাতত্য-গমন" অর্থে "অত" ধাতু ছিল, এমন কি,তাহা হইতে উৎপন্ন 'সতত-গমনশীল প্রাণবায়ু' অর্থে 'আত্মা' শব্দও ছিল—"আত্মেব বাতঃ স্বসরাণি গচ্ছতং" (১—৩৪—৭) 'আত্মা বা প্রাণবায়ু যেরূপ দেহমধ্যে নিয়ত গমনাগমন করে, তোমরাও সেইরূপ কর।' কিন্তু পরমাত্মা শব্দের তখনও উৎপত্তি হয় নাই। "ধাতুসামান্যাৎ"—ধাতু সকল সামান্য বা সাধারণ অর্থবাচী। পরমেশ্বর অর্থে কোন শব্দ বিশেষের রূঢ়ি প্রাপ্তি ত দূরের কথা। পরমেশ্বর বা পরমাত্মাকে বুঝাইতে হইলে বৈদিক ঋষির ঐ সামান্যবাচী ধাতুর ব্যবহার ভিন্ন, এবং ভৌতিক উপমা এবং শ্লেষালঙ্কারের ব্যবহার ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। অথবা তাহাই বা কেন বলি? বৈদিক ঋষির ক্রান্তদর্শী চক্ষুর নিকটে "the vision and the faculty divine"এর নিকটে আমাদের মনঃকল্পিত জড়-চেতনের প্রাচীরই ছিল না, জড়-চেতন নির্ব্বিশেষে সকলই প্রাণবান্ ছিল। 'স্পিনোজা' (Spinoza) অনেক মাথা ঘামাইয়া প্রমাণ করিয়াছিলেনঃ— 'বিজ্ঞান এবং বিস্তৃতি' ("Thought and extension" এক পরমেশ্বরেরই দুইটী গুণ ("two attributes of God"); বৈদিক ঋষির চক্ষে এ সত্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ ছিল, "এই সমস্ত এক সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ পুরুষের চতুর্থাংশ মাত্র" "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি" (১০—৯০—৩) ছিল। লাইবনিজ্ (Leibnitz) কত মাথা ঘামাইয়া বলিতে পারিয়াছিলেন যে, "পরমেশ্বর বিশ্বের সমন্বয়-স্বরূপ" "God is the universal harmony" ; বৈদিক ঋষির দিব্য দৃষ্টির নিকটে এ সত্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ "সং সমিৎযুবসে বৃষন্ অগ্নে বিশ্বান্যর্য্য আ" (১০—১৯১—১), "হে পরমদাতা পরমেশ্বর অগ্নি, যেখানে যাহা কিছু আছে, তুমি সে সকলকে পরস্পর মিলিত কর।" যাঁহার দিব্য দৃষ্টিতে কিছুই প্রাণহীন ছিল না, সকলই ব্রহ্মময় ছিল,—তাহার পক্ষে আগুন, অথবা মেঘ কিরূপে প্রাণহীন অথবা ব্রহ্মহীন অথবা নিরীশ্বর হইবে? তাহার পক্ষে পরমেশ্বরকে অগ্নি ইন্দ্র ইত্যাদি নামে অভিহিত করাতে দোষ হইবে কিরূপে? * এজন্য বলি-

* "Words expressive of objects which can not fall under the immediate cognisance of the senses, are invariably derived from others which originally were meant to express the objects of the senses (Compare *as* to be, and *asu* the Vital breath.) Metaphor is one of the most powerful engines, in the construction of human speech." (M. M's Science of Language II. 387, 388 &c.)

* আধুনিক বঙ্গবাসিদিগের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ এই দিব্য দৃষ্টির সুন্দর দৃষ্টান্ত ;—"কাঠের ভিতর, কলের

তেছি, বৈদিক অগ্নি, ইন্দ্রাদি শব্দের মধ্যে ঋষি দয়ানন্দ যে উপমিতি এবং শ্লেষালঙ্কার দেখিয়েছেন, সে কেবল আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য মাত্র। যাঁহার দিব্য দৃষ্টির নিকটে "জ্বলন্ত আগুনের ন্যায় চারিদিক ব্রহ্মাগ্নি ফট্‌ফট্‌ করিতেছে, হু হু করিয়া বাতাসের ন্যায় ব্রহ্ম আসিয়া গায়ে লাগিতেছেন" ('যোগের সঞ্চার'), তাহার পক্ষে পরমেশ্বরকে 'অগ্নি' কি 'বায়ু' বলাতে উপমিতি কোথায়? শ্লেষালঙ্কার কোথায়? যাঁহার দিব্য দৃষ্টিতে জড়-চেতন সকলই "একং সৎ"—এক সদ্বস্তুর বিচিত্র প্রকাশ মাত্র, তাহার সম্বন্ধে উপমিতি অথবা শ্লেষালঙ্কার কল্পনার স্থান কোথায়? বৈদিক দেবতা বিষয়ে উপমিতি এবং শ্লেষালঙ্কার কল্পনা আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য মাত্র। সে যাহা হউক, বৈদিক অগ্নীন্দ্রাদি নামের বিস্তারিত আলোচনা পরে করা যাইবে।

বেদে পরমেশ্বর কিংস্বরূপ? আপাততঃ অগ্নীন্দ্রাদি বৈদিক শব্দ সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন না করিয়া, বেদমাতা, আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত, এ প্রশ্নের যে উত্তর দিতেছেন, আমরা সংক্ষেপে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছি—

(১) বেদে পরমেশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ পিতা-পুত্র সম্বন্ধ। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে প্রথম সূক্তেই ঋষি মধুচ্ছন্দা প্রার্থনা করিতেছেন:—"স নঃ পিতেব সূনবেহগ্নে সূপায়নো ভব। সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে" "হে অগ্নে

ভিতর, চন্দ্র সূর্য্যের মধ্যে, বায়ু অগ্নির মধ্যে, জলের মধ্যে সার ব্রহ্মবস্তুকে দেখিলাম।......জলের ভিতরে ব্রহ্ম, পর্ব্বতের মধ্যে, পাহাড়ে ব্রহ্ম, জল দেখিলাম স্পষ্ট ব্রহ্ম ভাসিতেছেন, ডুবিতেছেন দেখিতে পাই। (জীবনবেদ-যোগের সঞ্চার।)

("অগ্রণী" বা "অগ্রনয়নাদিগুণবিশিষ্ট"), পুত্রের পক্ষে পিতার ন্যায় তুমি আমাদের সহজগম্য হও, এবং নিয়ত সঙ্গে থাকিয়া আমাদিগের কল্যাণ বিধান কর।" ঋগ্বেদের মধ্যভাগে ষষ্ঠ মণ্ডলে অগ্নিকে বলা হইতেছে, "পিতুর্ন পুত্রঃ সুভৃতঃ"—পিতা যেমন পুত্রের, সেইরূপ অগ্নি আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিপালক। ঋগ্বেদের শেষ ভাগে আবার বায়ুকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—"উত বাত পিতাসিন উত ভ্রাতোত নঃ সখা" (১০—১৮৬—২)। ঋগ্বেদের আদি অন্ত মধ্য সর্ব্বত্রই, তবে জীবেশ্বর সম্বন্ধ পিতা-পুত্র সম্বন্ধ। যজুর্বেদেও পিতা-পুত্র সম্বন্ধ—"পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি"—'তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান দান কর'। অথর্ব্ববেদেও তাহাই—"পিতেব পুত্রানভিরক্ষতা দিমং"—(হে অগ্নি) 'পিতা যেমন পুত্রদিগকে রক্ষা করে, সেইরূপ তুমি ইহাকে রক্ষা কর'। সামবেদেও তাহাই—"পিতা যৎ কশ্যপস্যাগ্নিঃ শ্রদ্ধা মাতা মনুঃ কবিঃ" (পূ ১—৪—১০) "যেহেতু কশ্যপের পক্ষে অগ্নি পিতৃস্থানীয়, শ্রদ্ধা মাতৃস্থানীয়া, এবং মনু গুরুস্থানীয়।" যীশুখ্রীষ্টের "স্বর্গস্থ পিতার" ("Our Father which art in heaven")ও মূল বৈদিক কি না পাঠক বিচার করিবেন।

(২) বেদের পরমেশ্বর পাপের মোচনকর্ত্তা। অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিলে, পরমেশ্বর পাপভারাক্রান্ত জীবকে পাপ-মুক্ত করিয়া শুদ্ধ করেন, তাই ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলে ঋষি বসিষ্ঠ বরুণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:—'হে বরুণ, আমাদিগকে পিতৃতঃ-প্রাপ্ত (inherited) পাপ হইতে মুক্ত কর, নিজের শরীরদ্বারা কৃত পাপ হইতে মুক্ত কর। 'হে রাজন্, পশু-চোরকে

যেমন পশুর ঘাস দানাদিরূপ দণ্ডদ্বারা দোষ মুক্ত করে, তুমি বসিষ্ঠকে সেইরূপ পাপের বন্ধন হইতে মুক্ত কর, যেরূপ লোকে গোবৎসকে বন্ধন রজ্জু হইতে মুক্ত করে, (সেইরূপ আমাকে পাপের বন্ধন হইতে মুক্ত কর)। "অব দ্রুগ্ধানি পিত্র্যা সৃজা নোঽব যা বয়ং চকৃমা তনূভিঃ। অব রাজন্ পশুতৃপং ন তায়ুং সৃজা বৎসং ন দাম্নো বসিষ্ঠং।" (৭—৮৬—৫ সমস্ত সূক্তটীই দ্রষ্টব্য)। ঋগ্বেদের আরম্ভেই বলা হইতেছে —"পাবকা নঃ সরস্বতী" (১—৩—১১)। "সরস্বতীর জলের মত ব্রহ্মবাণী আমাদিগকে পাপমুক্ত করে।" জল শরীরের ময়লা ধৌত করে, জলরূপী পরমেশ্বর সেইরূপ আমাদের যত পাপ ময়লা সকলি ধৌত করেন। "ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি" (১—২৩—২২)। দশম মণ্ডলেও ঐ কথা— "আপো অস্মান্ মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপ্বঃ পুনন্তু। বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবী রুদিদাভ্যঃ শুচিরাপূত এমি।" (১০—১৭—১০)। "জল-রূপা জগজ্জননী আমাদিগকে শোধন করুন। জলময়ী মা আমাদিগকে জল দ্বারা পবিত্র করুন। সেই মাতৃদেবী লোকের সকল পাপ ভাসাইয়া লইয়া যান। আমিও তাঁহার জল-স্পর্শে পাপ-মুক্ত এবং শুদ্ধ হইয়া উঠিতেছি।" বৈদিক ঋষিদিগের এই তীব্র পাপবোধের সহিত শঙ্কর দিগ্বিজয়ের "শুচির্দ্বিজোঽহং শ্বপচ ব্রজেতি বাক্যের" তুলনা কর। হায়, পৌরোহিত্য এবং জাত্যাভিমানের ঘূর্ণা পাকে পড়িয়া কোথাকার ভারত ইতিমধ্যে কোথায় চলিয়া আসিয়াছে!

(৩) বেদের পরমেশ্বর ঋষির দিব্য চক্ষুর দর্শনের বিষয় (objective reality) "দর্শত" (১—২—১; ১—১৪৪—১০) "রণ্বঃ সন্দৃষ্টৌ" 'তাহাকে দেখিলে, আনন্দ হয়' (১—১৪৪—৭)। বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে বিশ্বমানব সেই ঈশ্বর-দর্শন লাভের অধিকারী, এজন্য বলা হইতেছে, ঈশ্বর "দর্শত" বা সকলের দর্শনীয়, এবং ঈশ্বর-দর্শন সকলের পক্ষেই "রণ্ব" বা রমণীয়। পাশ্চাত্য ঋষি 'বার্গসো' (Bergson) এই দিব্য দৃষ্টিরই নাম দিয়াছেন—"ইন্দ্রিয় মনাতীত সাক্ষাৎ জ্ঞান" ("Supra intellectual intuition") এবং অন্তর্দৃষ্টি ("Knowledge from within")। প্রথম মণ্ডলেই ঋষি মেধাতিথি মানবমণ্ডলীর নিকটে সাক্ষ্য দিতেছেন; "নরাশংসং সুধৃষ্টমং অপশ্যং সপ্রথস্তমং। দিবো ন সদ্মমখসং" * (১—১৮—৯) মহাশক্তি, স্বপ্রকাশ—আকাশের ন্যায় জ্যোতির্ময় "নরাশংসকে" (অর্থাৎ মানব মণ্ডলীর পূজনীয় পরমেশ্বরকে) দেখিয়াছি। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং॥ ১—২২—২০॥ জ্ঞানীগণ সেই বিষ্ণুর দিব্য প্রকাশ নিয়ত দর্শন করেন। আকাশে অবস্থিত—বস্তু-বিশেষ যেমন প্রতিবন্ধকের অভাবে চক্ষু দ্বারা বিশদরূপে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ। ঋগ্বেদের আরম্ভে যেমন ঋষিগণ পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ দৃশ্যত্বের সাক্ষ্য দিতেছেন, দশম মণ্ডলেও সেইরূপ; "একঃ সুপর্ণঃ সমুদ্রমাবিবেশ স ইদং বিশ্বং ভুবনং বিচষ্টে। তং পাকেন মনসা পশ্যমন্তিতস্তং মাতা রেহ্লি স উ রেহ্লি মাতরং॥ ১০—১১৪—৪॥ 'সেই পরমাত্মারূপ পক্ষী একাকী আকাশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিশ্বভুবন বিশেষরূপে দেখিতেছেন।

* মানবমণ্ডলীর পূজনীয় পরমেশ্বরকে দেখিয়াছি। তিনি মহাকর্ম্মী, মহাপ্রকাশরূপী, দ্যুলোকের মত তেজোময়।

বিশুদ্ধ মনে আমি তাঁহাকে আমার নিকটে দেখিলাম। সৃষ্টিকারিণী বাক—"নিঃশব্দ শব্দ" তাঁহাকে প্রকাশ করে, তিনিও সৃষ্টিকারিণী বাক্‌কে প্রকাশ করেন।" ইহার ভিতরে কি আমরা খ্রীষ্টের উক্তির—"যাঁহারা শুদ্ধ-স্বভাব তাঁহারা ধন্য, যেহেতু তাঁহারা ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন"—মূল পাইতেছি না? অথবা 'জনে'র উক্তির "আদিতে বাক্ ছিলেন, সেই বাক্ ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন" 'জনে'র এই উক্তির মূল (Logos)ও পাইতেছি না? বৈদিক পরমেশ্বর আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বৈদিক ঋষির সমান প্রত্যক্ষসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ ব্যাপারে আধুনিকদিগের আবিষ্কৃত ক্রমবিকাশের স্থান কোথায়? এবং কিরূপ? পাঠক বিচার করিবেন।

(৪) বেদের পরমেশ্বর—শব্দব্রহ্ম তিনি সকল মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ভিতরে বসিয়া মানুষকে "নিঃশব্দ শব্দে" সদুপদেশ দান দ্বারা সুপথে লইয়া যান,—"চোদয়িত্রী সুনৃতানাং, চেতন্তী সুমতীনাং" "ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি" (১—৩—১২) "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" (৩—৬২—১০) বেদের পরমেশ্বর তটস্থ-ঈশ্বরবাদীর (Deist) কল্পেও পরমেশ্বরের মত মৃত বা কল্পিত নহেন, কায়মনো প্রাণে ডাকিলে বা প্রশ্ন করিলে, তিনি প্রাণের ভিতরেই উত্তর দেন,—তাই আধুনিক ঋষি যেরূপ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তাঁহার "নিঃশব্দ শব্দ তোমার আমার সকলের কাছে আসিতেছে" (শব্দব্রহ্ম), ঋষি মধুচ্ছন্দা বৈদিক বেদের আরম্ভেই মানব-মণ্ডলীকে উপদেশ করিতেছেন,—"পরেহি বিগ্রমস্তৃতমিন্দ্রং পৃচ্ছা বিপশ্চিতং। যস্তে সখিভ্য আবরং॥" ১—৪—৪॥ 'মহা জ্ঞানী ইন্দ্রের নিকটে যাও, তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারে না। তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ। সকল বন্ধু হইতে তিনি তোমার অতি শ্রেষ্ঠ বন্ধু।" "সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা" দীর্ঘতমাও প্রথম মণ্ডলেই জনগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"ইং পৃচ্ছতা, স জগামা, স বেদ, স চিকিত্বাঁ, ঈয়তে সান্বীয়তে। তস্মিন্ সন্তি প্রশিষ তস্মিন্নিষ্টয়ঃ, স বাজস্য শবসঃ শুষ্মিণস্পতিঃ॥ তমিৎপৃচ্ছন্তি ন সিমো বিপৃচ্ছতি স্বেনেব ধীরো মনসা যদগ্রভীৎ। ন মৃষ্যতে প্রথমং নাপরং বচোহস্য ক্রত্বা সচতে অপ্রদৃপিতঃ॥ তমিদ্গচ্ছন্তি জুহ্বস্তমর্বতী-র্বিশ্বান্যেকঃ শৃণবদ্বচাংসি মে। পুরুপ্রৈষস্ততুরির্যজ্ঞসাধনোহচ্ছিদ্রোতিঃ শিশুরাদত্ত সংরভঃ॥ স ইং মৃগো অপ্যো বনর্গুরুপত্বচ্যুপমস্যাং নিধায়ি। ব্যব্রবীৎ বয়ুনা মর্ত্যেভ্যোহগ্নির্বিদ্বাঁ ঋতচিদ্ধি সত্যঃ॥ (১—১৪৫—১,২,৩,৫।) (হে জনগণ, তোমাদের যাহা জিজ্ঞাস্য) "তাঁহাকে (অগ্নিকে) জিজ্ঞাসা কর। তিনি জানেন, যেহেতু তিনি সর্ব্বত্র গিয়াই আছেন। তিনি সকলই জানেন, যে হেতু তিনি জ্ঞেয়ের নিকটে গিয়া থাকেন, বিনা বিলম্বে গিয়া থাকেন। তাঁহার মধ্যেই সকল ধর্ম্মানুশাসন, তাহার মধ্যেই যাহা কিছু বাঞ্ছনীয়; তিনিই অন্নদাতা, তিনিই বলদাতা; তিনি পরাক্রমশালী রাজারও রাজা। যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, সে আর লোক সকলকে, সে সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করে না; সেই শান্তচিত্ত ব্যক্তি নিজের মনের ভিতর হইতে যাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া বুঝিতেছেন, সে সম্বন্ধে কখনও সে এ ব্যক্তির অথবা ও ব্যক্তির মতামত সহ্য করে না; সে নিরহঙ্কার হইয়া অগ্নির শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। আহুতি সকল তাঁহার উদ্দেশ্যেই অর্পিত হয়, স্তুতি সকল তাহাকেই লক্ষ্য করে। তিনি একাকী আমার সকল কথা

শ্রবণ করেন। অসংখ্য তাঁহার দাস, তিনি সকল বিপদের উদ্ধারকর্ত্তা, যজ্ঞের সাধক, তাঁহার পালন কার্য্য নির্দ্দোষ; তিনি শিশুবৎ সকলের প্রেমের পাত্র; তিনি আমাদের এই অনুষ্ঠান গ্রহণ করুন। তিনি বন মধ্যে লুক্কায়িত মৃগের স্থায় অন্বেষণীয়, তিনিই লভনীয়; ওষধি দ্বারা আবৃত পৃথিবীর উপমাভূত ইন্ধনদ্বারা আবৃত যজ্ঞবেদিতে * লোকে তাহাকেই স্থাপন করে। সেই অগ্নিই মানুষকে স্ব স্ব কর্ত্তব্য বলিয়া দেন, তিনি জ্ঞানময়, তিনি সত্যজ্ঞ, তিনি স্বয়ংই সত্য।" পাঠক দেখিতেছেন যে, বৈদিক ঋষির চক্ষে পরমেশ্বরের বাক্য শ্রবণে (Inspiration) বিশ্বমানবের অধিকার। শঙ্করাচার্য্য কি না বলিতেছেন, শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার নাই,—"ন শূদ্রস্যাধিকারো বেদাধ্যয়নাভাবাৎ" (সূ-ভা ১—৩—৩৪) হায়, কোথায় বেদ, আর কোথায় শঙ্কর!

ক্রমশঃ

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

প্রেততত্ত্ব।

শ্রীযুক্ত বাবু শশধর রায় "শশীবাবুর বাজী চোর" নামক প্রবন্ধটীতে গত ভাদ্র মাসের নব্যভারত পত্রিকায় যে প্রেততত্ত্বের সমর্থন করিয়া নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রেতের অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন, আমিও তাহা সমর্থন করিয়া নিজ জ্ঞানের একটী এবং অত্যন্ত বিশ্বাসসূত্রে অবগত আর দুইটী দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিব, মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার নব্যভারতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

আমার পিতা মৃত শম্ভুনাথ সেন কবিভূষণ, নড়াল স্বর্গীয় বাবু রাধরত্ন রায়ের বাড়ীর পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা সপরিবারে সকলেই নড়ালে বহুকাল ছিলাম। আমি ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রায় উমেশচন্দ্র সেন বাহাদুর যখন নড়াল স্কুলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি, তখন আমার আর একটী ভ্রাতার নাম যোগেশ ছিল। মাত্র ১৭।১৮ মাস বয়সের বালক, সকলেই "ভেগা" বলিয়া ডাকিত। বালকটী অতি সুশ্রী, সবল, সুস্থ, বড়ই মনোরম আকৃতির ছিল। পিতা মহাশয় প্রত্যহ প্রাতে পরিদর্শনার্থ বাবুদিগের বাটীতে যাইতেন এবং ৯।১০ ঘটিকার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিতেন। এক দিন প্রায় ৯টার সময় প্রাতে আমরা উত্তরের ঘরের বারেন্দায় বসিয়া পড়িতেছি এবং মধ্যে মধ্যে ভেগাকে লইয়া খেলা করিতেছি, সে হামাগুড়ি দিয়া যাইতেছে, আমি ধরিলে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে, আবার ছাড়িয়া দিতেছি —এই ভাবে খেলা করার সময় পিতা মহাশয় বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া কতক্ষণ ঐ খেলা দেখিলেন, পরে একটু অগ্রসর হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগে বলিলেন যে, "উহাকে লইয়া আর খেলিতে হইবে না—সর্ব্বনাশ!!" কথাটা যদিও সাজ্ঘাতিক ভাবের, কিন্তু তৎকালে আমরা কিছু বুঝিতে না পারিয়া পিতাঠাকুর মহাশয়ের মুখপানে তাকাইয়া রহিলাম এবং কিছুকাল পরে তাঁহাকে

* শতপথব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য (অং ১—২—৫—২০) "অগ্নিং পুরস্তাৎ সমাধায় তেনার্চ্চন্তঃ তেনেমাং সর্ব্বাং পৃথিবীং সমবিন্দন্ত। তস্মাদাহূর্ষাবতী বেদিস্তাবতী পৃথিবী।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবা সে কি? একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন যে, "নীলাম্বর বলিল যে, সাত দিনের মধ্যে ও মারা যাইবে" এ কথায় অবাক হইয়া আমরা কিছুকাল থামিয়া পরে আমি বলিলাম যে, নীলাম্বর তো আপনার বড় বাধ্য ও অনুগত লোক, এ বিষয়ের প্রতিকার জন্য তাহাকে কিছু বলিলেন না কেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, তাহাকে অনেক বলিয়াছি, কিন্তু সে বলে যে, কবিরাজ মহাশয়, আপনার পুত্রের সম্বন্ধে সে অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতে কিছু হইল না। ইত্যবসরে মাতাঠাকুরাণী আসিয়া ভেগাকে কোলে করিয়া লইয়া গেলেন, আমরাও আহারাদি করিয়া স্কুলে গেলাম। কথাটা ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িল। বিকালে মাষ্টার পণ্ডিত মহাশয়েরা এবং পাড়ার অনেক ভদ্রলোক আসিয়া পিতাঠাকুরকে নানারূপ প্রবোধ দিলেন, এবং দুই এক দিন পরে নীলাম্বরকেও এক দিন বাহিরের ঘরে দেখিলাম। এ সময় নড়ালের বাবুদের বাড়ীর অবস্থা বড়ই জমকাল ছিল। নানা দিক হইতে নানারূপ গুণী ব্যক্তিগণের আগমন হইত। কোটালিপাড়ার রঘুনাথ শিরোমণি নামক একটী উচ্চদরের জ্যোতিষ একদিন আসিয়া ভেগার হাত দেখিয়া তাহার জন্ম তারিখ নক্ষত্রাদি কেবল হাত দৃষ্টেই বলিতে লাগিলেন, ভেগার জন্ম দিন পঞ্জিকাতে আমি পূর্ব্বে দাগ দিয়া রাখিয়াছিলাম। ঐ পঞ্জিকা হাতে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, ঠিক মিলিয়া যাইতেছে। কিছুকাল পরে তিনি বলিলেন যে, এ বালক এখন মরিতে পারে না—ইহার মৃত্যুর কোন লক্ষণ হাতে দেখা যায় না। এরূপে তিন চারি দিন চলিয়া গেল, আমরাও ঐ সকল কথা এক রকম বিস্মৃত হইলাম। এক দিন বৈকালে স্কুলের পর আমরা ভেগাকে লইয়া হাতি নাচ খেলিতেছি। মাতাঠাকুরাণী আসিয়া মাই দেওয়ার জন্য ভেগাকে কোলে লইয়া উত্তরের ঘরের মধ্যে চৌকিতে যাইয়া শয়ন করিলেন, একটু পরেই চীৎকার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, তোমা শীঘ্র আয় ভেগা যেন কেমন করে—দৌড়িয়া যাইয়া দেখি, ভয়ানক খিচনি convulsion। তৎকালে আমাদের বাসায় পিতা মহাশয়ের পঠনিয়া চারি পাঁচ জন থাকিত এবং দাতব্য ডাক্তারখানার সহকারী ডাক্তার উমাকান্ত সেনও থাকিতেন। তাঁহারা সকলে দৌড়িয়া আসিলেন। এণ্ডারসন (Anderson) সাহেবও নিকটেই থাকিতেন, তিনি ও মেম সাহেব আসিয়া সমুদয় রাত্রি নানা প্রকার চিকিৎসা, গরম জলে বসাইয়া রাখা ইত্যাদি অনেক হইতে লাগিল। রাত্রি যখন প্রায় ১টা তখন আমি একটু নিদ্রিত হইয়া একটা বড় বাক্সের উপর কিছুকাল ছিলাম, পরে প্রায় রাত্র শেষে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ভেগা কেমন? পিতাঠাকুর মহাশয় তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন, ঐ দেখ বোধ হয় এক অর্দ্ধ বাতে ধরিয়াছে। গায়ের কাপড় উঠাইয়া দেখিয়া অবাক—সে মূর্ত্তি নাই, সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ লোপ—কাল অতি শীর্ণ একটা পোকার মত পড়িয়া আছে। এই ভাবে নানা চিকিৎসা চলিল কিন্তু কিছুতেই আর কিছু হইল না। ঐ সময় নড়ালে একটী পণ্ডিত ব্রহ্মচারীর আগমন হইল, তাঁহার চেহারা দোহারা, একটু দীর্ঘ, গৌরবর্ণ, নাতিস্থূল নাতিশীর্ণ, মুখখানা একটু বাতাবি রকমের। মুখখানা সর্ব্বদা হাসি

হাসি, সর্ব্বদা খড়ম পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইতেন, বাড়ী অম্বিকা কালনা অঞ্চলে। তিনি প্রশ্নের উত্তর বলিয়া দিতে পারিতেন, কোন প্রশ্ন লিখিয়া দিলে তৎপর দিন তাহার উত্তর পাওয়া যাইত। ভেগার সম্বন্ধেও তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিয়া লিখিয়া দেওয়া হইল। ভণ্ডামী না কিছু হয় সে জন্য যতদূর সতর্কতার দরকার, তাহা সম্পূর্ণ লওয়া হইল। পর দিবস সংস্কৃতে অনুষ্টব ছন্দে তিনটী কবিতা পাওয়া গেল, তাহার মর্ম্ম এই স্মরণ আছে যে, যাহার অনিষ্ট ভূতনাথের কিঙ্করে ইচ্ছা করে, তাহার গ্রহ নক্ষত্রাদি ভাল থাকিলে কি হইবে ইত্যাদি। ইহার কয়েকদিন পরে নী সাত দিবস মধ্যেই ভেগা মারা গেল।

এই বৃত্তান্ত পাঠে অনেকেরই নীলাম্বরের সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা হইবে। নীলাম্বর নড়াল বাবুদের বাড়ী অতি নীচ কোন এক কর্ম্মে ২৫৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত ছিল। সাধারণতঃ সদর নায়েব বলিয়া সকলে জানিত। পিতাঠাকুর মহাশয়ের নিকট মধ্যে মধ্যে আসিয়া নিদান পড়িত। লোকটা শ্যামবর্ণ দীর্ঘাকার স্থূল দেহ কিন্তু ভুঁড়ি অল্প নয়, যেমন লম্বা তেমন সৌষ্ঠব মত শরীর, মাথায় জটা। অল্পভাষী, চিন্তাশীল। শুনিতাম, গভীর রাত্রে চিতা খোলা কি কোন নির্জ্জন স্থানে প্রেত সিদ্ধির জন্য জপ তপ করিত। যখন আমাদের ভেগার সম্বন্ধে ঐরূপ বলিল, তখন ঐরূপ আরও দুই একটী কথা বলায় বহু লোক জনতা হইতে লাগিল দেখিয়া এক দিন রাত্রে আহারান্তে কোথায় চলিয়া গেল, আর কিছু জানা গেল না—নিরুদ্দেশ।

দ্বিতীয় বৃত্তান্ত—এ কথাটা যদিও শুনা কথা, কিন্তু অবিশ্বাসের কিছু নাই। কারণ দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান; এবং যাহারা এ বিষয় আমাকে বলিয়াছে, তাহাদিগকে অবিশ্বাস করার কারণ নাই।

মুকস্দপুর থানার অন্তর্গত কর্ণিগ্রাম-নিবাসী শ্রীবৃন্দাবন খৃষ্টান প্রাচীন রকমের লোক। এক দিন আমার তহসিল কাছারীতে আসিয়া কথায় কথায় প্রেতের প্রসঙ্গ উঠিলে সে বলিল যে, তাহার বাড়ীতে অল্প দিন হয় এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছে। তাহার ভগিনীর ...ান হইয়া মারা যাইত, পরে একটী সন্তান ...লে পর কবর দেওয়ার পূর্ব্বে তাহার ভ...নী একটা লোহা দ্বারা মৃত বালকটীর ...ণ একটা ছিদ্র করিয়া দিল; বিশ্বাস যে, ঐরূপ করিয়া দিলে ভবিষ্যতে সন্তান এভাবে আর মারা পড়িবে না। মৃত বালকটীকে ঐভাবেই কবর দেওয়া হইল। ভগিনীর পরে যে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহার কাণের ঠিক সেই স্থানে তদ্রূপ একটী ছিদ্র-সহ জন্মিয়াছে। সন্তানটী জীবিত থাকাই যেন বলিয়াছিল ঐ কথা আরও দুই এক জন এক রকমেই সমর্থন করিয়াছেন।

তৃতীয় বৃত্তান্ত—পাঁচচরের বাবু বাড়ীতে রামকানাই রায়ের একটী ভগিনী ছিলেন, নাম ব্রজ। যশোহরের অন্তর্গত কাভিয়াতে তাহার বিবাহ হয়। তিনি যখন পূর্ণ যুবতী, তখন তাঁহার উপর প্রেতের দৃষ্টি পড়ে। উঁহার সম্বন্ধে এখনও অনেক অদ্ভুত কথা গ্রামে শুনা যায়। অদ্য এই বৃত্তান্ত লেখার সময় আমার মাতাঠাকুরাণীও স্বচক্ষে দেখিয়াছেন বলিয়া দুই একটা ঘটনা সমর্থন করিলেন। বাবুদের বাড়ী দুই খণ্ডে বিভক্ত। উত্তরের বাড়ী রামকানাই রায়দের এবং দক্ষিণের বাড়ী সরকারী উকিল মৃত ব্রজমোহন রায় যে ছিলেন, তাহাদের। ব্রজবাবু স্বয়ং এই ঘটনাটী বলিয়াছেন এবং মাতাঠাকু-

রাণীও দেখা কথা বলিয়া বলিলেন যে, এক দিন সন্ধ্যার সময় নিল, নিল বলিয়া উত্তরের বাড়ী শোর পড়িয়া গেল। ব্রজ বাবুদের বাহির বাড়ীর বৈঠকখানার উত্তরপূর্ব্ব ধারে যে একটা নারিকেল গাছ ও একটা কুলের গাছ আছে, ঐ স্থানে ধপ্ করিয়া একটা বড় শব্দ ঐ সময় হওয়ায় ব্রজ বাবু প্রভৃতি দৌড়িয়া যাইয়া দেখেন, একখানা বড় পিঁড়ির উপরে নিদ্রিত অজ্ঞানাবস্থায় ব্রজ পড়িয়া আছে। কাদের বাবুদের বাড়ী হইতে ঐ স্থানে যাইতে হইলে দুই তিনটী দ্বিতল দালানের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। অপরাহ্ণ সন্ধ্যাকালে পুষ্করিণীতে বসিয়া টাটে ফুল বেল্পাতা রাখিয়া পূজা করিতেছে—ইতিমধ্যে টাট-খানা সর্ সর্ করিয়া মধ্য পুষ্করিণীতে এক-বার চলিয়া যায়, পুনঃ ব্রজর নিকট আসে দেখিয়া অনেক লোক আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে ব্রজর হাতের কঙ্কন হঠাৎ অদৃশ্য হইত, কিছুকাল পরে সকলে দেখিত কঙ্কন দালানের ১৫।২০ হাত উর্দ্ধে লোকের অগম্য স্থানে বটের চারার ডালে ঝুলিতেছে। মধ্যে মধ্যে পানের খিলি, ভাল খাওয়ার সন্দেশাদি পাওয়া যাইত। দশ পাঁচ জনে বসিয়া আছে সর্ সর্ শব্দে শূন্য হইতে পড়িত। পণ্ডিত কেহ চণ্ডী পড়িতে আরম্ভ করিলে—ওখানে এই শব্দ ভুল হইল, ঐ শব্দ ছাড়িয়া গেল ইত্যাদি, অজ্ঞানাবস্থায় চীৎকার করিয়া বলিত। নিজে লেখা পড়া জানিত না—কোন রোঝা আসিলে বাহিরে থাকা সময়ই চেঁচাইয়া বলিত, ঐ রোঝার কর্ম্ম নয় যে আমাকে ছাড়ায়। দূর—দূর হও। দুর্গোৎসবকালে তাজা রুধির সহ মনসার সম্মুখে আসিয়া পড়িত। কি অদ্ভুত ঘটনা সকল।

এ সকল বৃত্তান্ত কানাই বাবুর বৃদ্ধ স্ত্রী ব্রজমোহন রায়, আমার পিতা মহাশয় ও মাতাঠাকুরাণীর নিকট এবং তৎকালের অনেক ভাল ভাল মনুষ্যের মুখে ঠিক এক ঘটনা এক রকমই বলিতে শুনিয়াছি। অনুরূপ ঘটনা যাহা দেখিয়াছি, তাহাতেও খানাতত্ত্ব অবিশ্বাসের বলিয়া বোধ হয় না। রোগী মাথার বেদনায় ছট্ ফট্ করিতেছে, প্রায় অজ্ঞানাবস্থা অপর ঘরে দীপান্বিতা পূজার আয়োজন হইতেছে, অমাবস্যা রাত্রি ; হঠাৎ কেহ আসিয়া রোগীকে বলে ধর— রোগী আমার পিসতুত ভ্রাতা চন্দ্রকান্ত সেন, হাত মেলিয়া দিলে একটা শিকড় হাতে পাইলেন—সে শিকড় আমি দেখিয়াছি এবং মাথায় বান্ধিয়া রাখাতে মাথার অসহ্য ব্যথা তখনই কমিয়া গেল। রোগী সুস্থ হইল।

এ সকল ঘটনার ভিতর যে কোন অজ্ঞাত শক্তি প্রেতবেশে কার্য্য করে, তাহা অবিশ্বাস কি প্রকারে করি? নানা মুনির নানা মত, প্রমাণ আবশ্যক, প্রমাণ ব্যতীত কেন বিশ্বাস হইবে, একথা চিরকালই থাকিবে, প্রেতও তাহার কার্য্য যথানিয়মে চালাইবে—বিশ্বাস কর আর না কর।

শ্রীহরিশচন্দ্র সেন।

শশধর বাবুর বাজীহার।

এই ভাদ্র মাসের নব্যভারতে শ্রদ্ধাস্পদ শশধর বাবুর লিখিত "শশীবাবুর বাজী হার" পড়িয়া কেহ কেহ বলিতেছেন, "তিনি তাঁহার দিদিমার নিকট যাহা শিখিয়াছিলেন, তাহা এখনও ভুলিতে পারেন নাই, তদতিরিক্তও কিছু শিখেন নাই।" কিন্তু আমার মনে হইতেছে, যিনি যত বড় উকীল, তাঁহার তত রাত্রিকে দিন ও দিনকে রাত্রি করিবার ক্ষমতা!

১ম স্বপ্ন। আগে আমি নিজের স্বপ্নের কথাই লিখি। আমার অগ্রজ মহাশয় যশোহর জেলার ঝিনৈদহা মহকুমায় চাকুরী করিতেন। আমি তাঁহার নিকটে থাকিয়া তথাকার স্কুলে পড়িতাম। তখন আমার বয়স ৯।১০ বৎসর। এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম:—

দাদার স্থানান্তরে ভাল চাকুরী হইয়াছে এবং তথায় যাইবার জন্য দ্রব্যাদি নৌকায় উঠিতেছে। আমরাও সেই নৌকায় যাইব। আমি বিকালে স্কুলের মাঠ হইতে খেলিয়া আসিতেছি, এমন সময় হেড মাষ্টার মহাশয় (তখন জীবিত ছিলেন) আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি চলিয়া যাইতেছ, তোমার দাদার এই ছেলেটীকে লইয়া যাও।" এই বলিয়া তিনি একটী ধূলি-ধূসরিত ছেলে দেখাইয়া দিলেন। আমি উত্তর করিলাম, "আমার দাদার ত কোন ছেলে নাই।" হেড মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "এই তাঁহার ছেলে, লইয়া যাও।" আমি তখন সেই শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া বাসায় আসিলাম। স্বপ্নের শেষ হইল।

আমি সেই রাত্রির অবশিষ্ট অংশ জাগিয়া কাটাইলাম। পর প্রভাতে স্বপ্নের কথা সকলকে বলিলাম। তখন আমি প্রথম শুনিলাম যে বৌঠাকুরাণী অন্তঃসত্ত্বা। পরে তাঁহার একটী পুত্র সন্তান হইয়াছিল। ঐ স্বপ্নের কয়েক দিন পরেই দাদা ঐ উন্নত নূতন পদের নিয়োগপত্র প্রাপ্ত হন। তখন আমরা নৌকায় দ্রব্যাদি তুলিয়া নৌকাযোগে রাজসাহী যাই।

২য় স্বপ্ন। আমার বয়স যখন ৪৪।৪৫ বৎসর, তখন এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম:—

আমি জমি খুঁজিতে মোরং গিয়াছি (সমতল ক্ষেত্রে যে নেপাল রাজ্য, তাহাকেই মোরং বলে)। বিকালে জমি দেখিয়া বেড়াইতেছি। অধিকাংশ জমিতেই কাশবন। মধ্যে মধ্যে আবাদ আছে। আমি তাহার মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে পথ ভুলিয়া গেলাম। সন্ধ্যা আগত প্রায়। মাঠ জনহীন। কোথায় কিরূপে লোকালয় পাইব, ভাবিতে লাগিলাম, আর চলিতে লাগিলাম। এমন সময় দেখিলাম, কতকগুলি বাঙ্গালী স্ত্রীলোক কলসী লইয়া জল আনিতে যাইতেছে। আমি ভাবিলাম, তাহাদের অনুসরণ করিলে, তাহাদের সঙ্গে লোকালয়ে যাইতে পারিব। এই ভাবিয়া আমি তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কিছু দূর গমন করিলে দেখিলাম, একটী মধ্য বয়সী, গৌরবর্ণা, বাঙ্গালী স্ত্রীলোক গা ধুইয়া আসিতেছেন। পরিধানে আর্দ্র বস্ত্র, মাথায় এলোকেশী গামছা। তিনি আমার নিকটবর্ত্তী হইলে বলিলেন, "কোথায় যাইতেছ? আমার

সঙ্গে এস।” আমি তখন নীরবে তাঁহার পাছে পাছে চলিতে লাগিলাম। তিনি পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে আমাকে লইতে লাগিলেন। কিছুদূর গমন করিলে দেখিলাম, সেই পথের উভয় পার্শ্বেই দুইটী পাকা ঘর রহিয়াছে। তিনি সন্ধ্যার পরে আমাকে দক্ষিণ পার্শ্বের ঘরে উঠাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সেই ঘরের পশ্চাৎ ভাগের দেয়ালে ছাদ-সংলগ্ন কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ দেখিলাম। স্বপ্নের শেষ হইল।

এই স্বপ্নের কিছু দিন পরে আমি এই স্থানে, ইংরাজ রাজ্যে, একটী সম্পত্তি নীলামে খরিদ করি। আমি আদালত হইতে দখল পাওয়ার পরে কোন এক বিকাল বেলায় তাহা দেখিতে যাই। তৎপূর্ব্বে আমি তাহা কখনও দেখি নাই। যখন আমি সেই জমিতে উপস্থিত হইলাম, তখন আমার বিস্ময়ের সীমা থাকিল না। কারণ স্বপ্নে যে জমি দেখিয়াছিলাম, তাহার সহিত এই জমির অনেক বিষয়ে আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য ছিল। আর সেই জমিতে একটী পাকাঘর ছিল। কোন একটী মধ্যবয়সী, গৌরবর্ণা, বেহারী স্ত্রীলোক সন্ধ্যার পরে আমাকে ডাকিয়া পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে লইয়া গেল ও আমার দক্ষিণ পার্শ্বের ঐ পাকাঘরে উঠাইয়া দিয়া আলোক হস্তে ঘরটী দেখাইতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই ঘরের পশ্চাদ্ ভাগের দেয়ালে ছাদ-সংলগ্ন যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল, স্বপ্নেও ঠিক সেইরূপ দেখিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য যে, এই পাকাঘরটীও আমি নীলামে খরিদ করি।

৩য় স্বপ্ন। আমার বয়স যখন ৫৫।৫৬ বৎসর, তখন আমি ভয়ঙ্কর পীড়িত হই। সে সময়ে কবিরাজী ঔষধি ব্যবহার করিতেছিলাম। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম :—

আমার কোন এক ভ্রাতুষ্পুত্র (এখনও জীবিত) দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আমার নিকট আসিলেন। তিনি এলোপ্যাথী ঔষধিপূর্ণ একটী মেজার গ্লাস আমার হাতে দিয়া বলিলেন, “ইহা অমুক ঔষধি। তুমি ইহাই সেবন কর, ইহাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।” আমি তাঁহার হস্ত হইতে সেই গ্লাস লইয়া সেই ঔষধি পান করিলাম। স্বপ্ন শেষ হইল।

আমি পর প্রভাতেই সেই ঔষধি ক্রয় করিয়া আনি এবং তাহা সেবনে সে যাত্রায় আরোগ্য লাভ করি।

আমার আরও আশ্চর্য্য স্বপ্নের কথা আবশ্যক হইলে পরে লিখিব।

স্বপ্ন কি? আমরা জাগিয়া থাকিয়া যাহা দেখি বা বলি বা ভাবি, তাহার কতকাংশ আমাদের মনে থাকে, আর কতকাংশ আমরা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাই। সেই অংশ আর কখনও আমাদের মনে হয় না। আবার সে সকলের আর কতকাংশ মন হইতে একেবারে যায় না। আমরা ইচ্ছা করিয়া, চেষ্টা করিয়া, তাহা স্মরণ করিতে পারি না। কিন্তু অনেক দিন পরে আকস্মিক কোন এক ঘটনায় তাহা স্মরণ হয়। এইরূপে পাঁচটী ঘটনার কোন কোন অংশ মিলিত হইয়া স্বপ্নরূপে মনে উদিত হয়। অসম্পূর্ণ নিদ্রিত অবস্থায় মনের যে চিন্তা, তাহাই স্বপ্ন। গাঢ় নিদ্রা হইলে মনের চিন্তার বিরাম হয়, স্বপ্নও দেখা যায় না।

আত্মা, মন, বুদ্ধি ও পঞ্চ শারীরিক ইন্দ্রিয়—এই আটটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। আমাদের যে কিছু জ্ঞান হয়, সুখ দুঃখ বোধ হয়, ইহাদেরই সাহায্যে হয়। আত্মা, মন, বুদ্ধি এবং শরীরের কোন একটী ইন্দ্রিয়—এই চারিটী সমকালে বর্ত্তমান না থাকিলে,

আমাদের কোন বিষয়েরই জ্ঞান হইতে পারে না। মানুষ মরিলে, তাহার শরীরের সহিত সকল ইন্দ্রিয়ই নষ্ট হয়, মন ও বুদ্ধিও নষ্ট হয়। এইরূপ অবস্থায় মরণান্তে আমাদের কোনরূপ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। সুতরাং পুত্র কন্যাদের দুঃখে বিচলিত হওয়ায় অসম্ভব। কথা বলা ত আরও অসম্ভব। যাহার মাথা নাই, তাহারই মাথার ব্যথা।

তবে পাবনার কতিপয় কৃতবিদ্যেরা যেরূপ মৃত স্ত্রীলোকের ফটো তুলিয়াছিলেন, শশধর বাবুও (তাঁহার বাড়ীতে ঐ জেলায়) ঐরূপ ৮৷১০ খান ফটো তুলিতে পারিলেই বাজীমাত করিতে পারিতেন। আবার তাহা শুনিয়া রাজসাহীর কোন কৃতবিদ্য উকীল বলিতেছেন "ফাদার লাফোঁ সাহেব ঐ ফটো দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে কোন কোন প্রেতাত্মার ফটো তোলা যায়।" বোধ হয়, তাহা হইলে ফটো তুলার সরঞ্জাম ঘাড়ে করিয়া প্রেতলোকে গমন করা প্রয়োজন!

এখন শশধর বাবুর ছিদ্র। পিতা বা পিতামহের বা মাতামহের যে পীড়া থাকে, তাহা পুত্র বা পৌত্র বা দৌহিত্র সময় সময় প্রাপ্ত হয়। কখনও কখনও তাহা পুত্র কন্যায় প্রকাশ না পাইয়া পৌত্রে বা দৌহিত্রে প্রকাশ পায়।

যদি শশধর বাবুর কথিত স্বপ্নের দ্বারা তাঁহার সিদ্ধান্ত ঠিক হইয়াছে বলা যায়, তাহা হইলে আমার দ্বিতীয় স্বপ্ন শুনিয়া একজন অতি বুদ্ধিমতী যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহাও ঠিক বলিতে হয়। তিনি বলিয়াছেন, "ঐ স্বপ্নের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, স্বয়ং লক্ষ্মী কৈলাস ছাড়িয়া আসিয়া তোমাকে সুখের নিকেতনে তুলিয়া দিয়া গেলেন।" আমি এখনও ৭২র নিকটবর্ত্তী হই নাই—সবে মাত্র ৫৮, এজন্য শশধর বাবুর মত স্ত্রীলোকের সিদ্ধান্তে সায় দিতে পারি নাই।

সকল পিতা মাতাই পুত্র কন্যাদিগকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভালবাসেন। যদি মৃত্যুর পরেও তাঁহারা পুত্র কন্যাগণের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন বা ভাব বিনিময় করিতে পারিতেন, তাহা হইলে সেইরূপ ঘটনা প্রত্যহ এত ঘটিত যে, পরলোকেও অসংখ্য তার, টেলিফোন ও পোষ্টাফিস বসাইবার দরকার হইত। আর বহু বাঙ্গালীকে তথায় যাইয়া কার্য্য করিবার প্রয়োজন হইত—বাঙ্গালীর মত সুদক্ষ চাকুরীয়া আর কে? মাড়োয়ারী বাবুরাই কি নিশ্চিন্ত থাকিতেন? তাঁহারাও বাঙ্গালীদের কাপড় যোগাইতে হাটে হাটে, বাজারে বাজারে—পরলোকে এ সকল না বসিলে বাঙ্গালী বাবুরা মিহি চাউল, চুণা মাছ ও বল্‌কা দুধ না পাইয়া যে মারা যাইতেন, সকলেরই যে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া!—দোকান খুলিতেন। আর ইংরাজ বাহাদুর? তাঁহাদের subject race এক নূতন colony করিয়াছে শুনিয়া তাহা তাঁহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে কামান, গোলা, গুলি, বন্দুক, ম্যাক্‌সিমগান এবং এয়ারোপ্লেনসহ পরলোকে উপস্থিত হইতেন। আবার তথায় বাঙ্গালী ভায়াদের এত আমদানি, না জানি কখন কি করে, এই ভয়ে কাউন্‌সিলের সুদক্ষ সদস্যেরা Defence Act ও Rowlat Act হস্তে করিয়া পরলোকে পদার্পণ করিতেন। আর খুব সম্ভবতঃ হাইকোর্টের প্রাচীন উকিলেরাই বিচারক নিযুক্ত হইয়া সবুজ গাউনে সাজিয়া পরলোকে প্রবেশ করিতেন।

গালি খাওয়ার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

আশা করি, তাহাতে নব্যভারতের খুব কাটুতি হইবে। সম্পাদক মহাশয়ের যে খুব অভাব। যদিও শুনি নিত্য নূতন বাড়ীতে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা জুড়িয়া গেল।

এখন প্রার্থনা, শশধর বাবু যেই শশী বাবুর দশ হাজার টাকার চেকখানি পাইবেন, অমনই যেন দয়া করিয়া সেইখানি এখানে পাঠাইয়া দেন। শশধর বাবু দুর্ভিক্ষ-পীড়িত-দিগের জন্য ব্যয় করিতে চাহিয়াছেন, আর আমি সরকারী হাঁসপাতালে দিব। এ দেশে মরিলেই লাভ—কেহ বাঁচিয়া থাকিয়া কষ্ট না পায়, তাহাই ত দেখা উচিত।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

জগজ্জননী-আবাহন।

(১)

পাপভারে কাতরা ছিলেন বসুমতী;
ব্যাকুল ক্রন্দন তাঁর বক্ষ ভেদ করি
উঠিল তোমার পানে; তাই পরিহরি
শান্তরূপ, নিলে তুমি ভীষণ মূরতি।

(২)

দুরন্ত অসুরদল শক্তিতে অধীর
সমূলে তাদের সবে করিতে সংহার
নামিলে সমরাঙ্গনে; শান্ত ধরণীর
সন্তানের, ভয়ে চিত্ত কাঁপিল সবার।

(৩)

ভীষণ নিনাদে শ্রুতি হইল বধির।
বিরাট মূরতি তব, ধাঁধিল নয়ন।
"অকালে বিনাশ নাকি হ'বে পৃথিবীর ?"
'ত্রাহি' 'ত্রাহি' রব পুন উঠিল সঘন।

(৪)

নাশিলে অসুরদলে প্রচণ্ড বিক্রমে,
শান্তিরে আনিলে ডাকি এই পৃথিবীতে,
নিলে অন্নপূর্ণামূর্ত্তি; সবাকার চিতে
জাগিল উৎসাহ আশা, ওগো বিশ্বরমে!

(৫)

শূন্য আজি ধরিত্রীর অন্নের ভাণ্ডার,
ক্ষুধায় কাতর আজি সবে দিশেহারা।
ঢেকেছে তাদের মন অবিদ্যা আঁধার,
অন্ন আর জ্ঞান আজি মাগিছে তাহারা।

(৬)

এস দেবি অন্নপূর্ণে! অন্ন তুলে দিতে
ক্ষুধার্ত্ত সন্তান মুখে; আসে যেন শিব
তোমার সহিত দেবি; এ শুভ উৎসব;
শিবহীন যজ্ঞ মোরা চাহিনা করিতে!

(৭)

জ্ঞানের আলোক লয়ে আসুন ভারতী,
রত্নাকরোত্থিতা রমা সমৃদ্ধির সহ,
সিদ্ধিদ গণেশ আর দেব-সেনাপতি
জগতের ভার যিনি বহেন দুর্ব্বহ।

(৮)

এস দুর্গে! এস মাগো দুর্গতিহারিণী
এই বিশ্বযাগে আজি তব নিমন্ত্রণ
আছে মাত্র অন্তরের অস্ফুট এ বাণী
দরিদ্রের গৃহে নাহি অন্য আয়োজন!

(৯)

নহে এ আহ্বান দেবি! শুধু বাঙ্গালীর
এ নহে আহ্বান মাগো! মাত্র ভারতের,
ব্যাকুল প্রার্থনা এ যে সারা অবনীর
এ সঙ্গীতে মিলে গেছে কণ্ঠ সকলের!

শ্রীঅবনিভূষণ দাস।

চাঁদসীর চিকিৎসা। (৪)

শস্ত্র বিবরণ।

শস্ত্র বিংশতি প্রকার। যথা মণ্ডলাগ্র, করপত্র, বৃদ্ধিপত্র, নখ শস্ত্র, মুদ্রিকা, উৎপল পত্র, অৰ্দ্ধধার, সূচি, কুশপত্র, আটীমুখ, শরারিমুখ, অন্তঃমুখ, ত্রিকুর্চ্চক, কুঠারী, ব্রহীমুখ, আরা, বেতশপত্র, বড়িশ, দন্তকুষ, এষনি।

মণ্ডলাগ্র ও করপত্র, ছেদন ও লেখন ক্রিয়া করিতে ব্যবহৃত হয়। বৃদ্ধিপত্র, নখশস্ত্র, মুদ্রিকা, উৎপলপত্র ও অৰ্দ্ধধার এই কয় প্রকার শস্ত্র ছেদন ও ভেদন ক্রিয়া করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কুশপত্র, আটীমুখ, শরারীমুখ, অন্তঃমুখ এবং ত্রিকুর্চ্চক স্রাব করিতে। কুঠারিকা ব্রহীমুখ অরা বেতশপত্র ও সূচি বিদ্ধ করণ জন্য, বড়শি ও দন্তকুশ, শরীর হইতে কোন পদার্থ বাহির করণ জন্য। এষণি শরীর মধ্যে অন্বেষণ করিতে এবং সূচি সেলাই কার্য্য করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ শস্ত্র সকলের যে প্রকার নাম তদনুরূপ আকৃতি হইয়া থাকে। কিন্তু নখশস্ত্র ও এষনির পরিমাণ অষ্ট অঙ্গুলী, সূচির পরিমাণ চারি অঙ্গুলী। বড়িশ ও দন্তকুশ অস্ত্রের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ নত তীক্ষ্ণ কটক বিশিষ্ট এবং যবের নূতন পত্র সদৃশ। মুখ বিশিষ্ট। এষণি শস্ত্রের আকার ও মুখ কোচার মতন। মুদ্রিকা শস্ত্রের মুখ কনিষ্ঠা অঙ্গুলির অগ্র পৰ্ব্ব সদৃশ। শরারীমুখী শস্ত্রের পরিমাণ দশ অঙ্গুলী, ইহাকে কৰ্ত্তরী কহে। অবশিষ্ট সকল শস্ত্রের পরিমাণ ছয় অঙ্গুলী। অস্ত্র সকল দৃঢ়রূপে ধরিবার উপায় থাকা এবং উত্তম লৌহে উত্তম গঠন ও ধার হওয়া ও মুখের অগ্রভাগে সু সমাহিত হওয়া ও দেখিতে ভয়ঙ্কর না হওয়া আবশ্যক। বক্র ধার রহিত ভগ্ন খৰ্ব্ব ধার, অতি স্থূল, অতি সূক্ষ্ম, অতি হ্রস্ব, অতি দীর্ঘ, অস্ত্রের এই সকল দোষ। কিন্তু করপত্র খরধার বিশিষ্ট হওয়াই আবশ্যক। সকল অস্ত্রের ধারই বিভিন্ন প্রকার হওয়া উচিত। ভেদনকারী অস্ত্রের মুসর কলাই প্রমাণ, লেখনকারি অস্ত্রের অৰ্দ্ধ মুসর প্রমাণ ধার হইবে। বেধনকারী ও বিস্রাবনকারী অস্ত্রের ধার কেশের প্রমাণ এবং ছেদনকারী অস্ত্রের ধার অৰ্দ্ধ কেশর প্রমাণ সূক্ষ্ম হইবে। অস্ত্র সকলের পাইন, ক্ষারজল, এবং তৈল দ্বারা সম্পন্ন হওয়া উচিত। শরশলা অথবা অস্থি ছেদনকারী অস্ত্রের পাইন ক্ষার দিয়া দিবে।

মাংস ছেদন ভেদন বা পাঠন করিতে হইলে বিশুদ্ধ জলের পাইন দিবে। শিরা বিদ্ধ বা ছেদন করিতে হইলে তৈল পান বিধি। অস্ত্র সকল শাণিত করিতে মাস কলাইর বর্ণ সদৃশ পাথর ব্যবহার করিবে। এবং ধার সমভাবে রক্ষা করিতে শিমুল কাঠের ফলক মধ্যে অস্ত্র রক্ষা করিবে।

বাস, কটীক, কাচ, লবণ, ক্ষার, অগ্নি ক্ষার, সূত্র জেখ, নখ, গোজী, সেফালিকা পত্র, এই সব শস্ত্রের অনুকলা মাত্র। শিশু বা যাহারা অস্ত্র দেখিতে ভীত, তাহাদিগের জন্যই অনুকলা অস্ত্র। ছেদ ভেদ ও আহার্য্য ক্রিয়া নখ সাধ্য হইলে, নখই ব্যবহার করিবে। মুখ এবং চক্ষের পাতার ব্যারামে স্রাব ক্রিয়া করিতে হইলে গোজী অথবা সেফালিকা পাতা ব্যবহার করিবে। যথা ক্রিয়া করিতে হইলে এষণির অভাবে কেশ, অঙ্গুলী ও অঙ্কুর ব্যবহার করিবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র দাস।

সঙ্কলিকা।

(৩২)

জন্ম ১২৪৮ (১৮৪১ খ্রীঃ) ২৫শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার।

৺কালীমোহন ঘোষ—দেরাদুনের ট্রিগো-মেট্রিক্যাল সার্ভের সুবিখ্যাত গণিতজ্ঞ শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয়, তাঁহার জন্মভূমি রাধাপাড়া গ্রামে (ফরিদপুর) ২৫শে শ্রাবণ (১৩২৬) দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি ঋষিপ্রতিম ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার গভীর গবেষণামূলক জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত সকল প্রসিদ্ধ অধ্যাপকেরা গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতিভার পূজা করিয়াছেন। তিনি ফরিদপুর এবং পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব ছিলেন। তাঁহার সমতুল্য ব্যক্তি এদেশে বড় অধিক নাই। তাঁহার মৃত্যুতে ফরিদপুর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। তাঁহার চরিত্র এবং ধর্ম্মভাব আমাদের আদর্শ ছিল। ফরিদপুরের ঋষিপ্রতিম কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন তাঁহার সমতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। এরূপ নিষ্ঠাবান লোকের আবির্ভাবে ফরিদপুর এবং বঙ্গপ্রদেশ ধন্য হইয়াছে।

(৩৩)

২৪ পরগণার অধীন টাকী এবং শ্রীপুর, দুটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। শ্রীপুরের বিহারীলাল ঘোষ ভবানীপুরের বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। তাঁহারই ঔরষে শরচ্চন্দ্র ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। বিগত ১১ই শ্রাবণ, (১৩২৬) রবিবার, তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। তিনি আমাদিগের বাল্যবন্ধু ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ এবং চরিত্র-বল সর্ব্বদা আমাদের আদর্শ ছিল। তিনি দেশানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার তিরোধানে আমরা যার-পর নাই ক্লেশ পাইয়াছি। বিধাতা শোকসন্তপ্ত পরিবারে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

(৩৪)

১৯শে ভাদ্র, (১৩২৬) শুক্রবার, রাত্রি ১টার সময় সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে তাঁহার জন্ম হয়। সুতরাং তাঁহার বয়স মাত্র চুয়ান্ন বৎসর হইয়াছিল। তিনি প্রভূত ধনসম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্যাটেল-বিল সমর্থক ও নিম্ন শ্রেণীর উন্নয়নের প্রবর্ত্তক উদারচরিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেনের ভ্রাতা। তাঁহার ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথও দেশানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। সামান্য অবস্থায় জীবন আরম্ভ করিয়া কর্ম্মদক্ষতা গুণে বিপুল ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানাইতেছি।

(৩৫)

৺ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহোদয় এদেশের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য যে কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। তিনি স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী স্মরণ করিলে হৃদয় উন্নত হয়। তাঁহার হৃদয়খানি পাইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সরকার মহাশয়। তিনিই বিজ্ঞান সভাকে এত দিন রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত "বিজ্ঞান পত্রিকা" তাঁহার গবেষণার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। একনিষ্ঠ বিজ্ঞান-সাধক এদেশে শ্রীযুক্ত পি, সি, রায় এবং অমৃতলাল সরকার।

গত রবিবার, ২১শে ভাদ্র, (১৩২৬) প্রাতে তিনি ৬০ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি এদেশে অধিক আছেন বলিয়া মনে করি না। তাঁহার মৃত্যুতে এদেশের বিজ্ঞান-মন্দির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। কি আর বলিব, তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে আমাদের প্রাণমন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

(৩৬)

২০শে ভাদ্র, (১৩২৬) শনিবার, প্রত্যুষে রিপণ কলেজের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত অমৃতচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। বরিশাল জেলার গাভা তাঁহার জন্মস্থান। বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত হরনাথ ঘোষ মহাশয় এবং ফরিদপুরের স্বনাম-খ্যাত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় তাঁহার অকৃত্রিম সুহৃদ্। ইহাতেই বুঝা যায়, অমৃত বাবু কিরূপ স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রিপণ কলেজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ত্রিবেদী এবং অমৃত বাবুর মৃত্যুতে রিপণ কলেজের যে ক্ষতি হইল, তাহা আর পূরণ হইবে না। তিনি সুরেন্দ্রনাথের চির-বিশ্বাস-ভাজন ব্যক্তি ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এখন সমুদ্র গর্ভে, বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার কি অনিষ্ট হইল। এই বার্দ্ধক্যে তাঁহার দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুর তিরোধানে তাঁহার হৃদয়-প্রাণ ভাঙ্গিয়া না পড়িলে হয়। অমৃতলালের নাম রিপণ-কলেজের স্মৃতিতে অক্ষয় হউক।

(৩৭)

ঋষিপ্রতিম ব্রজগোপাল নিয়োগী

জন্ম—৬ই এপ্রেল, ১৮৫৭, মৃত্যু ২৭শে আগষ্ট, ১৯১৯।

দীক্ষা ডিসেম্বর, ১৮৮৫।

প্রচারব্রত গ্রহণ—২৪শে আগষ্ট, ১৮৯১।

১৮ই ভাদ্রের (১৩২৬) সঞ্জীবনী লিখিয়াছেন,—

"নববিধান সমাজের সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয় গতপূর্ব্ব বুধবার রাত্রিকালে ইহকালের কর্ম্মাবসানে পরমধামে গমন করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি সৎকর্ম্মানুরাগী ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে ষ্টীমার যাত্রীদের ক্লেশ ও লাঞ্ছনা দেখিয়া এমন মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন যে, নিজের অর্থে ষ্টীমার ক্রয় করিয়া পোড়াবাড়ী হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত তাহা চালাইয়াছিলেন। ভেজাল ঘৃতে লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে, ইহা দেখিয়া স্বয়ং ঘৃতের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। আফিংএর ব্যবসায় সম্বন্ধে তদন্তের জন্য ইংলণ্ড হইতে যখন এক কমিশন ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, তখন বেহারের কৃষকদের উপর যেরূপ জুলুম করিয়া আফিং চাষ করান হয়, তাহার অকাট্য প্রমাণ তিনি কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সময় নানারূপে স্বদেশের হিত-সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। বহুদিন পবিত্র শিক্ষা কার্য্যে যাপন করিয়া অবশেষে ধর্ম্ম-প্রচার ব্রত অবলম্বন করেন। কোয়েটা হইতে মান্দ্রাজ এবং মালাবার হইতে সিমলা ও শিলং পর্য্যন্ত নানাস্থানে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রাচীন কার্য্যক্ষেত্র বাঁকিপুর নগরে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।"

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস এম-এ অন্যান্য কথা লিখিয়া শেষে লিখিয়াছেন—

"His literary activities were not inconsiderable. He carried on regular correspondence with friends and fellow-believers. Of

his books, all in Bengali, the most important is the *Mahaparinirvanasutra* (Buddha's sermon translated from *Pali*). Among other publications may be mentioned the *Brahmopasana, Devi Gandharvi* (a memoir of his mother written by Bhai B. G. Niyogi and his elder brother), the *Nityabhiksha* a book of short poetic pieces (dealing with the spiritual life) and a number of pamphlets. His addresses, sermons, accounts of travels, reports of mission work published in the Dharmatattwa, if brought together, would make up quite a large volume. Besides these he had been translating Protap Chunder's "Heart Beats" and choice bits of the devotional writings of the same author. For sometime he was in charge of the Bengali monthly for ladies—*the Mahila,* and he himself had a monthly of his own entitled the *Bidhan Prakash.* He had, for sometime also edited this English Weekly. In fact it was Bhai Brojo Gopal who added the expression *The World,* and since then our weekly organ has come to be called *The World and The New Dispensation.*"

The Resolution of the Executive Committee of the Congregation of the Bharatvarshiya Brahma Mandir :—

I. "This meeting makes an offering of its gratitude and reverence, at his departure from this life, to Rev. Bhai Braja Gopal Niyogi, the servant and missionary of the New Dispensation, who, an witness of the New Dispensation, seeing it in a clear vision firmly based by Providence with the flag of the New Gospel of peace, of the New Age in hand, on the broad, high, many-sided human nature, travelled many times over many parts of India at great trouble and sacrifice, with faith, trust and ever fresh enthusiasm to preach the spiritual, universal life and Gospel of harmony, who tried his very best to keep the community alive by prayers, worship and enthusiasm of the work of humanity, and cherished in the depth of his heart the desire to see the community well established on free spiritual life and the fulfilment of all devotions in the life of work and service, and to better organise the congregation took upon himself for many years the responsibilities of the post of its Secretary, and served the community with all his heart and energy by keeping open the way of freedom in spiritual life, reorganising the Ladies' Victoria Institution, by founding the Bidhan Educational Society and bringing the Keshub Academy under the management of the congregation to extend the sphere of its activity, by reviving the charity organisation of the Church, by trying his best to increase its capacity for work and stock of devotional life by re-organising the Mission Asram on a permanent basis, and by a spirit of freshness

in worship, prayers, and sermons on occasions of utsav, ceremonies and in weekly congregations in the Mandir, and prays to God to bless us with the spirit to keep the ideal of his life and spiritual relation with him ever fresh and bright, suffering no loss in time."

The Resolution adopted by the Executive Committee of the Sadharan Brahmo Somaj :—

"Resolved that the Executive Committee of the Sadharan Brahmo Somaj record their deep sense of sorrow at the death of Rev. Bhai Braja Gopal Niyogi, missionary of the New Dispensation Church, who by his unostentatious piety, selfless service to the sick and distressed, and charity of feelings was a tower of strength to the cause which he served so long."

এই মহাপুরুষের জীবনের মোটামুটি কথা উপরোক্ত কথা-সকলে ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল কথা তাঁহার জীবনের প্রকৃত অভিব্যক্তি নয়। তিনি পুরুষোত্তমের প্রসূন-কুটীরে আমাদের সহিত একত্রে কিছু দিন সপরিবারে ছিলেন। তাঁহার পরিবারে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের ছায়া পড়িয়াছে। তাঁহার যে সাধ্বী পত্নী ১৩২৪ সালের মাঘোৎসবের পরই দেহরক্ষা করেন, তাঁহার সহিত ব্রজগোপাল অভিন্নাত্মক ছিলেন। পত্নীর তিরোধানের পর তাঁহার শরীর মন ভাঙ্গিয়া পড়ে। এক বৎসর শেষ হইতে না হইতেই তিনি পত্নীর সহিত মিলিত হইলেন। ইহা তাঁহার গভীর ভালবাসা-মূলক আধ্যাত্মিকতার পরিচয়। একদা আমরা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিরঞ্জন সম্বন্ধে তাঁহার নিকট প্রশংসা করিতেছিলাম। তিনি সব শুনিয়া বলিলেন,—"আপনি ভালবাসেন বলিয়া ঐরূপ বলিতেছেন, কিন্তু জানিবেন, আমি তত আশান্বিত নই। যতদিন ভক্তি বিশ্বাসের অঙ্কুর না জন্মিবে, ততদিন প্রশংসার কিছুই নাই। সুশিক্ষিত হইলেই লোক মহৎ হয় না—সুচরিত্র ও বিশ্বাস ভক্তি ভিন্ন মানুষ মহৎ হইতে পারে না।" আমরা ব্রজগোপালের কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। ঐ কয়েকটী নিষ্ঠা-পূর্ণ কথায় তাঁহার আধ্যাত্মিকতা গভীরভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। বিশ্বাসে তাঁহার জীবন আরম্ভ, বিশ্বাসে স্থিতি, বিশ্বাসে কর্ম্মানুপ্রাণন, বিশ্বাসে প্রচার-ব্রত পালন, বিশ্বাসে তিরোধান। একদিনও তিনি অবিশ্বাসের রাজ্যে বাস করেন নাই। তাঁহার নিষ্ঠা, কর্ম্মানুরাগ, দেশানুরাগ, উদারতা, প্রেম, ভক্তি—তাঁহার বিশ্বাসেরই জলন্ত নিদর্শন। আমাদের মনে হয়, তিনি অজাত-শত্রু ছিলেন। তাঁহার সূক্ষ্ম দর্শনে তাঁহাকে দ'লো ভাব এবং গণ্ডী-মাহাত্ম্যের অতীত করিয়াছিল—তাঁহার সঙ্গ লাভ করিলেই বুঝা যাইত—তিনি সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত একাত্মক ছিলেন। সেশ্বর মাত্রেই তাঁহার পূজ্য ছিল। তাঁহার সূক্ষ্ম দর্শন তাঁহাকে পবিত্র সাত্ত্বিকতার নিরহঙ্কার মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছিল, যিনি তাঁহাকে দেখিতেন, তিনিই মোহিত হইতেন। বাল-সুলভ সারল্যে, ঋষি-সুলভ ভক্তিতে, জ্ঞানী-সুলভ গাম্ভীর্য্যে, কর্ম্মী-সুলভ কর্ত্তব্যে, প্রেমিক-সুলভ অহেতুকিত্বে, তিনি সদা পূর্ণ ছিলেন। তাঁহার দেব-দুর্লভ চরিত্রের সহিত তুলনা করিবার লোক, সত্যই, এ যুগে, এদেশে বড় বিরল। তিনি ছিলেন ত,

আপনারই কেবল যোগ্য ছিলেন; তিনি ছিলেন ত, কেবল তাঁহার পত্নীরই যোগ্য ছিলেন; তিনি ছিলেন ত, ব্রহ্মানন্দের অকৈতবেরই এক মহা যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কথা কহিতেন অল্প, কিন্তু কাজ করিতেন অনেক, বাক্যাড়ম্বর তাঁহার জীবনের ত্রিসীমায় ছিল না। তিনি অকপট নিষ্ঠা-যোগ-সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা, ধর্ম্মানুরাগ ও বিশ্বাস ভক্তি তদীয় পুত্র কন্যার মধ্যে, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এবং এদেশ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হউক—তাঁহার জীবন ধারণ সার্থক হউক।

(৩৮)

ভারতবর্ষ হইতে অন্যান্য দেশে গত জুলাই মাসে কত চাউল রপ্তানি হইয়াছে, তাহা দেখুন—

১।	ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে	২০৭৪ মোণ
২।	তুরস্ক	১৭৪০৪৬ „
৩।	এডেন প্রভৃতি দেশে	৫৭২৭ „
৪।	আরব	১৭১০২৭৬ „
৫।	বেহেরিণ	২৮০২০৬ „
৬।	পারস্য	৩৫৫৮০৬ „
৭।	লঙ্কাদ্বীপ	৯৯৫১২২৮ „
৮।	ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট	২৯০৫৯০২ „
৯।	জাভা	২০৫২ „
১০।	চীন	৬৩৭২ „
১১।	জাপান	৬৪৭৪৬৩ „
১২।	মিশর	৫৪০ „
১৩।	ন্যাটাল	৬৫৮৪ „
১৪।	পর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব আফ্রিকা	৭৩২৫১ „
১৫।	মরীসস	১২২০৪ „
১৬।	জার্ম্মাণ পূর্ব্ব আফ্রিকা	৩৬১৩ „
১৭।	পূর্ব্ব আফ্রিকা	৫১০৫৭ „
১৮।	অন্যান্য আফ্রিকা বন্দর	৬৪২৮৫ মোণ
১৯।	অন্যান্য দেশ	৬৭৫০০ „

এদেশের অন্নাভাবের কারণ কি, উপরোক্ত হিসাবে তাহা বুঝা যাইবে। যে রক্ষক, সে যদি ভক্ষক হয়, তবে দেশরক্ষা কে করিবে? এই তালিকা পড়িয়া সকলে একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হউন!!

(৩৯)

কলিকাতার মিউনিসিপাল টেকস্ দিন দিন এত বাড়িতেছে যে, তাহার বর্ণনা করিতে পারে, এমন লোক নাই। দশ বিশটী বাড়ী বেশী টাকায় বিক্রীত হওয়ায় মিউনিসিপালিটী দশগুণ টেকস্ বৃদ্ধি করিয়া দিতেছেন। ছয় বৎসর অন্তর প্রত্যেক ওয়ার্ডের টেকস্ বৃদ্ধি হয়। এবার ৬নং ওয়ার্ডে কিরূপ টেকস্ বৃদ্ধির নোটিস জারি হইয়াছে, ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা জানেন। বাড়ীর ডিপ্রিসিয়েসন এক পয়সাও বাদ যাইবে না, অথচ জমীর দর বৃদ্ধির অজুহাতে টেকস্ বৃদ্ধি হইবে!! পৈতৃক বাসভবনে বাস করা দরিদ্রদের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। ইহারই নাম স্বায়ত্তশাসন!! অথচ এই কলিকাতায় মৃত্যু-সংখ্যা দিন দিন কিরূপ বাড়িতেছে, হেলথ্ অফিসারের প্রদত্ত বিবরণে তাহা দেখুন—

Dr. Crake the Health Officer of Calcutta in the course of his remarks upon the health of the City in 1918-19 says :—

"The number of deaths registered during the year reached the appalling total or 81, 871. This is equivalent to a death-rate of 350. per mille, calculated on the census population of 1911. This

is the highest death-rate recorded in Calcutta since 1907. It is a sad record compared with 1917, when the total mortality was only 21,360, and the death-rate 23.8 per mile, the lowest ever recorded in Calcutta. A sudden rise in the general mortality by nearly 60 per cent involving 10.000 extra deaths, points unmistakeably to the presence of a severe and widespread epidemic in the City. Whilst several infectious diseases were prevalent in epidemic form during the earlier part of the year, the principal cause of the heavy mortality was influenza. This broke out in epidemic form in June, and again with increased virulence in September and caused many thousands of deaths."

কলিকাতা কালে মাড়োয়ারীগণের বিচরণ-ক্ষেত্রে পরিণত হইবে। দেখিয়া শুনিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি।

(৪০)

যদি জিজ্ঞাসা কর, কিসে এদেশে অধিক অত্যাচার হয়? আমরা বলিব, সহরের মিউনিসিপাল টেক্স ধার্য্যে এবং ইনকম্ টেক্স নিরূপণে। পুরীর পুরাতন বাসন্দাদের টেক্স যেমন ছিল, প্রায় তেমনই আছে, কিন্তু সমুদ্রের ধারে যাঁহারা স্বাস্থ্যলাভের মায়ায় বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহাদের টেক্স ৩.৪ গুণ বাড়িয়াছে। ইহার আর বিচার নাই। আর সমস্ত দেশে ইনকম্ টেক্স ধার্য্যকালে কি ক্লেশ পাইতে হয়, যাঁহারা এই বিপদে পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। এদেশে বাস করা দিন দিনই কষ্টসাধ্য হইতেছে। উদরে অন্ন নাই, শরীরে বস্ত্র নাই, মুখে হাসি নাই—চতুর্দ্দিকে ঘনাইয়া আসিতেছে শুধু অত্যাচার!! যাঁহারা দেহত্যাগ করিতেছেন, তাঁহারাই বাঁচিতেছেন। জীবন ধারণ এদেশে কঠোর হইতেও কঠোর বিধান। বিধাতার কি ইচ্ছা, কে জানে?

(৪১)

কলিকাতা-অনাথ-আশ্রম।

দুর্গোৎসব সমাগত; এই আনন্দের দিনে আপনাদের আশ্রিত কলিকাতা অনাথ আশ্রমের অনাথ বালক বালিকাগুলি আপনাদের স্নেহপ্রদত্ত নব বস্ত্রাদি লাভ করিয়া যাহাতে তাহারা পিতা মাতার অভাব বিস্মৃত হইয়া পূজার আনন্দ অনুভব করিতে পারে, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা করিয়া জগজ্জননীর শুভ আশীর্ব্বাদ লাভ করেন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

এক্ষণে কলিকাতা অনাথ আশ্রমে ৭৭টী বালক ও ৬৮টী বালিকা বাস করিতেছে। নিম্নে তাহাদের বয়সের উপযোগী বস্ত্রের তালিকা প্রদত্ত হইল। ১২১ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য।

ধুতি।		শাটি।	
১০ হাত	৯ খানি।	১০ হাত	৪ খানি।
	৭		
৮	২১	৮	
৭	১৪	৭	
৬	১৯		
		৫ „	৪

বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তে আর্থিক সাহায্যও সাদরে গৃহীত হইবে।

(৪২)

শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহো-

নয় একটী বক্তৃতায় প্রতিবাদকারীদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। কাইজার-সুলভ এ দর্প, এ অহঙ্কারের তাপ অসহ্য। তিনি সকলের সব কথায় উত্তর দিতে পারিলে ভাল হইত। তাঁহার এক শিষ্য আমাদিগের নিকট বলিয়াছেন, "দেশের লোক যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকা দান করিতেছেন না, তখন ফি বাড়াইয়া টাকা আদায় করা ন্যায়সঙ্গত; যদি কেহ তাহা দিতে না পারেন, তবে তাহার পড়িয়া কাজ নাই।" ধনীরা আজ না হয়, কাল টাকা দিবেন। ধনীরা টাকা দিতেছেন না বলিয়া দরিদ্রদিগকে নিষ্পেষণ করিয়া টাকা আদায় করিতে হইবে, এ যুক্তি মন্দ নয়। একের অপরাধে অন্যে শাস্তি পাইবে, ইহা বোধ হয়, ইন্দুরের উপর রাগ করিয়া ধানের গোলায় আগুন দেওয়ার ন্যায়। গালাগালি দেওয়া যত সহজ, কিন্তু অভিযোগ সকলের উত্তর দেওয়া তত সহজ নয়। দুই তিন স্থলে যাঁহারা কাজ করেন, তাঁহাদিগকে বেতন দেওয়ার কোন্ যুক্তি আছে? যদি তিনি উপযুক্ত লোকই পাইয়া থাকেন, তবে নানা বোর্ডের মোড়লগিরি তিনি করেন কেন, অন্যকে সে কাজের ভার দিলেই ত হয়। গালাগালি দিয়া যাঁহারা রাজ্য জয় করিতে চাহেন, তাঁহাদের বাহাদুরী খুব বটে!!

(৪৩)

গবর্ণমেণ্ট বলেন, এবার শতকরা ১০ জন উত্তীর্ণ ছাত্র কেবল কলেজে স্থান পায় নাই। এই দশ জনের মধ্যে কি প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ ছাত্র থাকিতে পারে না? তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা হইল কেন? ইউনিভার্সিটি-কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর নিন্দা করিয়াছেন। আশুতোষ সেই কমিশনে ছিলেন, তিনি কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর সংশোধন করেন না? বারো-ইয়ারী শিক্ষায় এদেশের ছাত্রদের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে—তাহাতে প্রতিভার উন্মেষ হইতেছে না। কত এম-এস্‌সি, বি-এস্‌সি-উত্তীর্ণ ছাত্র দুই পংক্তিও ইংরাজী লিখিতে পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয় দুর্নীতি-পরায়ণ ছাত্রই সৃজন করিতেছেন—সুদীর্ঘকালে একজনও গোখলে, পরাঞ্জপে সৃষ্টি করিতে পারিলেন না! হায় রে বিশ্ববিদ্যালয়!!

(৪৪)

এতদিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-বিল উপস্থিত হইয়াছে। এখনও সম্পূর্ণ বিলখানি প্রকাশিত হয় নাই। ভাল কি মন্দ হইবে, বলা যায় না। শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই বিল আপাততঃ স্থগিত রাখিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হয় নাই। ইউনিভার্সিটি কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে কি পরিবর্ত্তন হয়, তাহা জানিয়া এই বিল উপস্থিত করিলেই ভাল হইত। ব্যস্ততার কারণ কি?

(৪৫)

গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বত্র ইউনিয়ন-কমিটী গঠনের চেষ্টা করিতেছেন। ভারতসংস্কার-প্রস্তাবের পরিণতি দেখিয়া ইহা করিলেই ভাল হইত না কি? শীঘ্র শীঘ্র এ কাজের আয়োজন না করিলেই ভাল হইত, আমাদের মনে হয়। সব বিধানের মর্ম্ম বুঝা বড় কঠিন।

একটি মাতৃমূর্ত্তি বা দেবী দীনতারিণী

স্বর্গারোহণ--২৭শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩২৬।

(১)

শৈশবে যাঁহারা মাতৃহীন হন, মাতৃজ্ঞান তাঁহাদের সম্যক পরিস্ফুট হয় না।—হত-ভাগ্য আমিও সেই শ্রেণীভুক্ত। বড় হইতে না হইতে, জ্ঞানানুশীলনের জন্য বিদেশে থাকার সময় মাতৃহীন হইয়াছিলাম, সুতরাং মা যে কি বস্তু, তখন ভাল করিয়া বুঝি নাই। সেই অভাব পূরণের জন্য দেবী দীনতারিণীকে যেন বিশ্বজননী আমার সন্নিধানে উপনীতা করিয়াছিলেন। সে যে কি মধুর মূর্ত্তি—এ জগতে তাহা ব্যাখ্যাত হইবার নয়। সে এক অপরূপ স্বর্গীয় জ্যোতি।

(২)

দেবী দীনতারিণীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ আমার কখন হয়? সে প্রায় ৪০ বৎসরের কথা, যখন তাঁহার স্বামী স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার স্বামী প্রৌঢ় বয়সে খ্রীষ্টধর্ম্ম-মণ্ডলীতে প্রবেশ করিয়া অপার্থিব বিশ্বাস ভক্তির জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন। বীরগ্রাম হইতে স্থানান্তরিত কালনার অতি সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁহার জন্ম—কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস-ঘোষণার সময়ে কোন চিন্তাই তাঁহাকে অচ্যুত ভক্তি-মার্গ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি রেঃ ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহা-শয়ের নিকট ব্যাপ্তিস্ম হন। সেই সময়ের নানাপ্রকার অমানুষিক অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াও আমার মা ব্যাকুলিতা হন নাই। এই পরীক্ষাতেই মাতৃভাবের অঙ্কুর উপ্ত হইল, স্বামী-পুত্র কন্যা লইয়া গাছতলার আশ্রয় লইলেন। ৫।৬টী পুত্র কন্যাকে হারাইয়া পূর্ব্বেই সহিষ্ণুতার মাতৃমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এবার স্বামী-সেবা তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। তিনি ব্যাপ্তিস্ম হন নাই বটে, কিন্তু এক দিনও স্বামীকে পরিত্যাগও করেন নাই। রাণাঘাটের সম্ভ্রান্ত মুকুর্য্যে ঘরের মেয়ে, কালনার সম্ভ্রান্ত গাঙ্গুলি ঘরের কুলবধূ বিনা বাক্য ব্যয়ে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী স্বামীর অনুসরণ করিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত এ জগতে অতি অল্পই দেখা যায়। অসময়ে যখন স্বামী দেহরক্ষা করিলেন, সরলা তখন বালিকা, আমার ভ্রাতা মণ্মথমোহন তখন যুবক—আমিও তখন যুবক। পিতৃদেব দেহত্যাগের সময় পত্নীকে বলিলেন—"তোমার ভাবনা কি, নীলরতন, কুঞ্জলাল ও দেবীপ্রসন্ন রহিলেন—তোমার কোন ভাবনা নাই।" সেই দুর্দ্দিনে মাণিক-তলায় সেই দেহত্যাগের ক্ষুদ্র ঘরে আমরা মৃতদেহ সম্মুখে রাখিয়া যে উপাসনা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, সেরূপ বুঝি বা আর জীবনে কখনও করি নাই। একদিকে প্রবল খ্রীষ্টসমাজ মাকে ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, আমরা তখন নিরাশ্রয়, কি করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিব? পিতার দেহ, মহা সংগ্রামের পর, খ্রীষ্টান-সমাজের প্রথা-নুসারে প্রোথিত হইল, আমরা মাকে লইয়া সংসারে ভাসিলাম। খ্রীষ্টান সমাজ মাকে ব্যাপ্তিস্ম করিয়া দলে গ্রহণের জন্য যত চেষ্টা যত্ন করা সম্ভব, সব করিলেন, কিন্তু

মা দমিলেন না—আমাদের মধ্যে কি বিশ্বাসের বীজ দেখিলেন, তাহা ধরিয়াই রহিলেন। কটূক্তি ও গালাগালি কত বর্ষিত হইয়াছিল, তাহা ব্যাখ্যাত হইবার নয়। আমরা অতি সন্তর্পণে মাকে লইয়া অকূলে ভাসিতে লাগিলাম। মা দেখিলেন আমাকে, আমি দেখিলাম মাকে। দেখার পরই অহেতুকী মাতৃ ভক্তিতে আমি পূর্ণ হইলাম। মাতৃদর্শনে আমি যেন নবজীবন পাইলাম। মাতৃ নামে আমার দীক্ষা হইল। এই সন্দর্শন-লালসা তাঁহারও কখনও ঘুচে নাই, আমারও না। দেহত্যাগের শেষ মুহূর্ত্তেও, তাই মা আমার বলিয়াছিলেন—"দেবীর শরীর যদি ভাল থাকে, তবে আমাকে একবার দেখিয়া যাইতে বলিও।" বুঝি বা সেই আহ্বানেই সেদিন (বৃহস্পতিবার, ১লা আশ্বিন) পরলোকে এক পা দিয়া মাকে দেখিয়া আসিয়া জীবনকে সার্থক করিয়াছি।

(৩)

মা যে কেবল আমাকে বশ করিয়াছিলেন, তাহা নয়। নীলরতন, কুঞ্জলাল হইতে আরম্ভ করিয়া সকলকে ভালবাসিতেন। মা প্রবল হিন্দুসমাজকে মাতৃসুলভ দয়ায় বশ করিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজের তাঁহার আত্মীয় আত্মীয়ারা সকলেই তাঁহার গুণে মোহিত ছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ ৭৫ বৎসর জীবিত ছিলেন, কখনও কাহাকে পর ভাবেন নাই। ৬ বৎসর কাল কপর্দ্দক গ্রহণ না করিয়া ব্রাহ্মবালিকা স্কুলের বোর্ডিংয়ে সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃভাব এই খানে ফুটিতে বিশেষ অবসর পায়, তাঁহার মাতৃভাবে সকল বালিকাই মোহিত হইতেন। যাকে পাইতেন, তাহাকেই কোল দিতেন, যেন অনাথাশ্রমের সুবিখ্যাতা কান্তমণি দত্ত। সুবিস্তৃত ব্রাহ্মসমাজকে যে দিন হইতে আপনার প্রাণের বস্তু করিয়া লইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে, যিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকিয়াছেন। উদারতা পবিত্রতা, দয়াদাক্ষিণ্য, ধীরতা, সহিষ্ণুতা ও বিশ্বাস ভক্তি সব জমিয়া এমন এক অপার্থিব মূর্ত্তি রচিত হইয়াছিল, যিনি তাঁহাকে দেখিতেন, তিনিই মা বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতেন। মহিলাকুলের উদ্ধারকারিণী কৃষ্ণভাবিনী দাসের ন্যায় মাতৃভাবে জগতকে আপনার করিয়া লইবার জন্য তাঁহার আগমন হইয়াছিল। লোকেরা যাহাকে ঘৃণা করে, পরিত্যাগ করে, মা তাহাকেও আদর করিয়া কোলে লইতেন। এরূপ দৃষ্টান্ত শত শত আছে। তাঁহার ভিতরে কি এক মধুর স্বভাব লুক্কায়িত ছিল, সেই স্বভাবের গুণে সকলকেই আপন করিয়া লইতেন; কেহই তাঁহাকে পর ভাবিতে পারিত না। তিনি দেহধারিণী দেবী-মূর্ত্তি ছিলেন।

(৪)

সরলার তিরোধানের পর সেই ভালবাসা পড়িয়াছিল, কমলকামিনী এবং সুধাংশুর উপর। তাঁহার সাধন ছিল—কেবল অহেতুকি প্রেম। তাঁহার নিগূঢ় প্রেম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল—কমলকামিনী এবং সুধাংশুতে। যাহারা তাহা দেখিয়াছে, তাহারা কত কি কথা বলিয়াছে। সরলা গেলেন, কমলকামিনী মাতৃপ্রেমে দীক্ষা লইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। তিনি গেলেন—মাতৃপ্রেমে দীক্ষা লইয়া বিনোদিনী দাঁড়াইলেন। তিনি গেলেন—প্রেম জগতে আরো ছড়াইয়া পড়িল—মথুরামোহন, কুঞ্জলাল, নীলরতন, সুধাংশু, দেবীপ্রসন্ন, সুপ্রসন্ন, প্রভাতকুসুম, লীলা, কুমুদনলিনী, সান্ত্বনা—সব

ছাড়াইয়া জগৎকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিল। কাহাকেও ভালবাসিতে তিনি কার্পণ্য করেন নাই। সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। শুধু দেখিত না, তাঁহার নিকট মাতৃ নামে দীক্ষা লইত। মা সত্যই ছিলেন যেন— জগতের মা।

(৫)

তিনি যতক্ষণ জীবিতা ছিলেন—কেবল খাটিয়াই গিয়াছেন। তিনি যতক্ষণ ছিলেন, কেবল অন্যের চিন্তা লইয়াই ছিলেন। অন্যকে খাওয়াইবেন, আদর করিবেন, ভালবাসিবেন, হৃদয়ে ধারণ করিবেন, ইহাই তাঁহার যেন প্রাণের কামনা ছিল। তিনি কাহারও সেবা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার ভিতর এমন অপার্থিব এক জিনিস দেখিয়াছি, যাহা এই সংসারের আর কোথাও দেখি নাই। সে পবিত্রতামাখা এক সোনার আলেখ্য! তাঁহার দৃষ্টিতে তাহা ঝরিত, বাক্যে তাহা ফুটিত, কার্য্যে তাহা পরিব্যাপ্ত হইত, জাগরণে তাহা খেলিত, শয়নে তাহা জ্বলিত—সকলকে জয় করিবার কি এক মধুময় মূর্ত্তি এই মর্ত্ত্য-ধামে প্রকটিত হইয়াছিল। সে মূর্ত্তি যিনি দেখিয়াছেন, তাঁহাকেই বলিতে হইয়াছে— "কি অপরূপ মূর্ত্তিই দেখিলাম!"

(৬)

অনেক সময় গিয়াছে—আর বেশী কিছু বলিব না—শুধু এইটুকু বলা বাকী রহিয়াছে যে,—তিনি অজাতশত্রু ছিলেন! শুধু তাহাই নয়, তিনি অপার্থিব প্রেমে গঠিতা ছিলেন। লোকরা বলে, ঈশ্বরকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, ধরা যায় না। আরো কত কি কথা বলে। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, তাঁহার মাতৃভাব ফুটাইবার জন্য বিশ্ববিধাতা এ জগতে কি চেষ্টা করিতেছেন। আমরা প্রতিদিন ঘরে ঘরে কত মাতৃমূর্ত্তি দেখিতেছি, তাহা দেখিয়াও ভুলিয়া যাইতেছি, তিনি সব সময়ে মাতৃমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ। তিনি অবতীর্ণ শুধু সীতা বা সাবিত্রী, মেরি বা ম্যাগডেলিন, মণিকা বা দ্রৌপদীতে নহেন, তিনি অবতীর্ণ অসংখ্য মহিলা-বৃন্দে। ঐ মাতৃমূর্ত্তি ঘরে ঘরে দেখিয়া আমি মোহিত, স্তম্ভিত, আত্মহারা হইয়া রহিয়াছি। চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী, এজন্য, কখনও কোন পুস্তকে, প্রবন্ধে বা বক্তৃতায় মাতৃজাতির নিন্দা ঘোষণা করি নাই। সর্ব্বদাই দেখিতেছি, মা ফুটিয়া রহিয়াছেন— অসংখ্য মহিলা-বৃন্দে। তাঁহাদিগকে দেখিলেই যেন বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাই। ভাই তুমি যদি তাহা দেখিতে চাও, মাতৃরূপিণীদিগের প্রতি একবার পবিত্র চক্ষে তাকাও—নিশ্চয় মোহিত হইয়া যাইবে—বলিবে—Divinity in humanity—incarnated.

এই শিক্ষা দিবার জন্য মা দীনতারিণী অবতরণ করিয়াছিলেন। দীনতারিণীর নাম ধারণ সার্থক হইয়াছে সেই দিন, যেদিন তিনি মাতৃপ্রেমে সকলকে উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার প্রেমের স্পর্শে আমরা কুড়ু পুত্র কন্যা ধন্য হইয়াছি—কুল পবিত্র হইয়াছে, দেশ কৃতার্থ হইয়াছে, ব্রাহ্ম-সমাজ উজ্জ্বল হইয়াছে। দীনতারিণীর নামে চিরদিন সন্তানবৃন্দের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি বর্ষিত হইতে থাকুক।

মাতৃ নামে দীক্ষা গ্রহণের পর সকল মহিলাকেই মা বলিয়া সম্বোধন করার পিপাসা বাড়িয়াছে। বাড়িয়াছে—বাড়িয়া দুর্নিবার হইয়া দিন দিন চলিয়াছে। দুর্ভিক্ষের সময় সহস্র সহস্র মহিলাকে মা বলিয়া ডাকিয়াও সে পিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই। মা গেলেন—

কিন্তু তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপিণী কোটী কোটি মহিলাবৃন্দকে এই সংসারে রাখিয়া গিয়াছেন। মা নামে জগৎ পূর্ণ হইয়া যাক্‌ —মা নামে সকলে দীক্ষা লাভ করুক,—মা দীনতারিণীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক !!

জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে।

বিবেকানন্দ ও ব্রাহ্মসমাজ

স্বামী বিবেকানন্দ জীবনের প্রারম্ভে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন। পরে ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া দেন। ইহার মধ্যে কর্ম্মক্ষেত্রের কার্য্যপ্রণালীর ও আবেষ্টনের পরিবর্ত্তন যতটা সূচিত হইয়াছে, গুরু মতের পরিবর্ত্তন ততটা সূচিত হয় নাই। তাঁহার গ্রন্থাবলী অপক্ষপাতে অভিনিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলেই ইহা প্রমাণিত হইবে। স্বামীজির এক দল শিষ্য আছেন, তাঁহারা যে পরিমাণে বাক্যবাগীশ, সেই পরিমাণেই স্বামীজির নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ। ইহারাই তাঁহাকে ব্রাহ্মবিরোধী বলিয়া চিত্রিত করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত। প্রয়োজন এই যে, তাহা হইলে লোকমত-বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সাধারণের অপ্রিয় হইবার ঝঞ্ঝাট্‌ বহন করিতে হইবে না। লোকপ্রিয় হইবার বাসনায় তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, বিবেকানন্দ নিজে লোকমত থোরাই গ্রাহ্য করিতেন। বিবেকানন্দের মতের কোনও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল কি না, কোন কোন বিষয়ে তিনি নিতান্তই Reactionary ছিলেন কি না, আমরা এখন সে প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি না। কিন্তু যে সব বিষয়ে তাঁহাকে পুরাপুরি পুনরুত্থানবাদী (Reactionary) সাজান হয়, সেই সব কয়েকটী অতি গুরুতর বিষয়ে যে ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিলেও তিনি ব্রাহ্মসমাজের কথা শেষ পর্য্যন্ত ভুলেন নাই, আমরা তাঁহার উক্তি হইতে তাহাই প্রমাণ করিব। কোন কোন বিষয়ে Emphasis এ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার যতটা বিভিন্নতা দেখা যায়, মূল মতে ততটা নয়। একটা ভাব প্রকাশ করিবার প্রণালীটা ভিন্ন হইলেই যে বস্তুটাও ভিন্ন হইল, তাহা নহে। কাহারও মত আলোচনার সময় ইহা মনে না রাখিলে ভ্রান্তি না হইয়া যায় না।

কেহ কেহ দাবী করেন যে, বিবেকানন্দ পূর্ব্ব পশ্চিমের নিখিল ধর্ম্মসমন্বয়ের ভিত্তি স্থাপনের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এই দাবীর মধ্যে তীব্র ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম গন্ধ রহিয়াছে, তাহারা ইহা জানেন। তাই এই গন্ধ চাপা দিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজকে একচোট্‌ গালাগালি দিতে হয়। তাহাতে অসতর্ক পাঠক এই বুঝিবেন যে, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বিবেকানন্দের কোন সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু দু'চার জন অজ্ঞ লোককে ভ্রান্তিতে ফেলিলেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহনের পরে ঐ দাবীর মৌলিকতা সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই ভ্রমে পতিত হইবেন না। পূর্ব্ব পশ্চিমের সমন্বয় ব্রাহ্মসমাজের Programme ছাড়া আর কোথায়ও নাই। বিশেষতঃ নিছক্‌ হিন্দুত্বের ভূমি পরিত্যাগ করিয়া, আদর্শেই হউক বা কার্য্যেই হউক, উচ্চতর ও ব্যাপকতর কোন সার্ব্বভৌমিকতার উপর না দাঁড়াইলে যে পূর্ব্ব পশ্চিমের সমন্বয় হইতে পারে

না, তাহা জানিবামাত্র ঐ দাবীর আদিম গন্ধ অতি অন্ধের নিকটও আর ঢাকা মানিবে না।

স্বদেশের দোষ দেখিয়া তাহার উল্লেখ ও সংশোধন চেষ্টা দেশের নিন্দা নহে বা তাহা স্বদেশপ্রীতির বিরোধীও নহে। এই তুচ্ছ কথার আলোচনা করিয়া আর কথা বৃদ্ধি করিতে চাই না। জগতে যাঁহারা প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহারাই ইহা অধিক পরিমাণে করিয়াছেন বলিয়াই প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। কিন্তু বিবেকানন্দের উল্লিখিত শিষ্যগণ কাজের নয়, মুখের—বুঝাইতে চান যে, তিনি এই প্রকৃতির ছিলেন না। সুতরাং ব্রাহ্মদের সঙ্গে তাঁর কত পার্থক্য। স্বামীজি একস্থানে বলিয়াছেন, "এই সমাজের বিরুদ্ধে একটা কর্কশ কথা বলিও না, আমি ইহার অতীত মহত্ত্বের জন্য ইহাকে ভালবাসি।" ভারতের অতীত মহত্ত্বের জন্য ইহাকে ভালবাসার মধ্যে নূতনত্ব তো নাই-ই, বিশেষত্বও কিছু নাই। কেন না, প্রাচীন ভারতকে সকলেই ভালবাসে। কিন্তু এই উক্তিটীর অন্তর্নিহিত ভাব কি এই নয় যে, বর্ত্তমান ভারতে ভালবাসিবার বড় কিছু নাই। কেন না, তার প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিও না তার অতীতের খাতিরে। ইহা বর্ত্তমান ভারতের নিন্দা হইল না অবশ্য! সংস্কারকেরা দোষ দেখায় নিন্দার উদ্দেশ্যে নয়, সংশোধনেরই জন্য। এক জনের অতীত ভাল বলিয়া তাহার মধ্যে বর্ত্তমানে কিছু নিন্দনীয় থাকিতে পারে না, ইহা কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন না। কোন্ কালে ঘি খাইয়াছিলাম, তাই আজ হাত শুঁকে সুখে নিদ্রা দিব, না বর্ত্তমানের অভাব জানিয়া তাহা দূরীকরণের জন্য ত্যাগ ও লাঞ্ছনার পথে পা বাড়াইব—ইহার মধ্যে কোন্‌টী প্রশংসনীয় উদ্যম, তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন। যে মা সন্তানের পীড়ার উল্লেখ করিতে দেন না, তিনি অজ্ঞাতসারে হইলেও মঙ্গল না চাহিয়া সন্তানের মৃত্যুই চাহিতেছেন। মায়ের ছেলে একদিন বলবান্ ছিল, আজ রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া যদি কোন আত্মীয় বলে যে ছেলে রোগা হয়েছে, কবিরাজ ডাকিয়া মকরধ্বজ খাওয়াও, তাহাতে যদি মা উপদেষ্টাকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করে ও ছেলের রুগ্নাপবাদের বিরুদ্ধে নজির দেখায় যে, সে ১৮৯৫ সালে একাই এক বাঘ মারিয়াছিল, তাহা হইলে মায়ের হৃদয়ের সঙ্গে সহানুভূতি করিলেও কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহার মস্তিষ্কের প্রশংসা করিতে পারিবে না। মা হইলেই বোকা মা হইতে হইবে, এমন কোন আইন নাই। বিবেকানন্দ এই সামান্য কথাটা বুঝিতেন না, সুতরাং ইহাকেই তিনি একটা মূলমত (Principle) দাঁড় করাইয়াছিলেন বলিলে তাঁহার বুদ্ধির অবমাননা করা হয়। আর কিছু না হউক, তিনি যে বুদ্ধিমান ছিলেন, এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। শিষ্যেরা নিজেদের দুর্ব্বলতা ঢাকিবার জন্য গুরুকে এমনই লাঞ্ছনার মধ্যে ফেলার অভিনয়, জগৎ এই একবার মাত্রই দেখে নাই। কোন একটা বিশেষ অবস্থায় একটা ভাবের আবেগে ক্ষণিক উত্তেজনায় যাহা বলা যায়, তাহাকে একটা মূল মতরূপে খাড়া করিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে যে, জীবনের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য আছে কি না। বিবেকানন্দ নিজেই কি সার্জ্জনের ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া, যা অনেকের কাছে অতি নির্ম্মম মনে হইবে, সেই ভাবে দেশের ক্ষতের গভীরতা পরখ্ করেন নাই? 'ভিক্ষু দার্শনিক

ষ্টির প্রত্যক্ষ প্রমাণ।' তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মদের এ বিষয়ে কোনই বিভিন্নতা নাই। স্বামীজি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, অর্থান্তর করিবার উপায় নাই—"ধর্ম্ম কি আর ভারতে আছে দাদা! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ সব পলায়ন, এখন আছেন কেবল ছুৎমার্গ।" "এখন ব্রহ্ম হৃদয়-কন্দরেও নাই, সর্ব্বভূতেও নাই, এখন ভাতের হাঁড়িতে।" "ভারতে দুই মহাপাপ, মেয়েদের পায়ে দলান, আর জাতি জাতি করে গরীবগুলোকে পিশে ফেলা।" "আমরা মহাপাপী, স্ত্রীলোককে ঘৃণ্যকীট, নরক-মার্গ ইত্যাদি বলে বলে অধোগতি হয়েছে।" "৬ বৎসরের মেয়ের গর্ভাধানের যারা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন, তাদের কোন্ দেশী ধর্ম্ম।" "নিরুদ্যম হতভাগার দল, দশ বৎসরের মেয়ে বিয়ে করতে কেবল জানে, আর জানে কি?" "শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ জগতের অধম কেন? শক্তির অবমাননা সেখানে বলে।" "আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহাহেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল আমরা পশু, দাস, উদ্যম-হীন, দরিদ্র।" ইহা যদি কর্কশ কথা হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, কোন্ ব্রাহ্ম কবে ইহা অপেক্ষা কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন? আর যদি না হয়, তবে উহা কি স্বামীজি ব্রাহ্ম-সমাজের কাছেই শেখেন নাই? আসল কথা এই, ব্রাহ্মসমাজের সমাজ-সংস্কার কার্য্যাবলীর যে দুইটী সর্ব্বপ্রধান—জাতিভেদ ও নারী-জাতির অবস্থা—তাহা বিবেকানন্দ কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। সে প্রভাব তাঁহার উপর চিরদিনই কাজ করিয়াছে। নারীজাতি সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে, "না জাগিলে যত ভারত ললনা, এ ভারত কভু জাগে না জাগে না" এই মতের বিভিন্নতা কোথায়? একটু যা বিভিন্নতা তা এই। ব্রাহ্মসমাজ বলে এসেছেন যে, বর্ত্তমান ভারতের নারীর অবস্থা শোচনীয়। যে সমস্ত কুপ্রথায় বর্ত্তমান ভারতে গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী জন্মিতে পারে না, তার সংস্কার প্রয়োজন। বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়া, সেখানকার মেয়েদের গুণে এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি "ডায়েনা দেবীর ললাটস্থ তুষার কণিকার ন্যায় নির্ম্মল", "রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী" "আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন" "স্বাপেক্ষ ও দয়াবতী" মার্কীণ মহিলাদিগকে আদর্শ ধরিয়া "আমাদের দেশের দশ বছরের বেটাবিটুনী"-(স্বামীজির নিজের কথা, ভাষাটা অতি কঠোর মনে হয় না কি?) দিগকে উন্নীত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। 'যখন সময় আসবে হবে' এই বলিয়া কি তিনি আর দশ জনের ন্যায় ব্যবস্থাটাকে চাপা দিবার উপদেশ দিয়াছেন? না, তিনি হৃদয়ের আবেগের সঙ্গে বলিয়াছেন,—"ঐ রকম মা জগদম্বা যদি এক হাজার আমাদের দেশে তৈরী করে মর্ত্তে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে মরব।" স্বামীজির এই আকাঙ্ক্ষা যে, প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই আকাঙ্ক্ষা, তাহা বাতুল ভিন্ন আর সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।

তবুও যদি কেহ বলেন যে, স্বামীজি কোন দিনই নিজেকে সমাজ-সংস্কারক বলিয়া মনে করেন নাই, তবে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কেন না, মনুষ্য সমাজে নরাকারে অনেক জীবই বাস করে। যিনি বলিয়াছেন, এদেশে ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে নাই, আছেন ভাতের হাঁড়িতে; এদেশে ধর্ম্ম মানব হৃদয় ছাড়িয়া বিরাজ করিতেছেন ঘণ্টা, ভেঁপু, সিন্নায়—

তিনি নাকি ধর্ম্মপ্রচারক হইয়াও সংস্কারক ছিলেন না! তিনি জাতিভেদ ও নারীজাতির অবস্থাকে দেশের মহাপাতক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; জাতিভেদের কঠোরতাকে তিনি পৈশাচিক প্রথা বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, জগতের কল্যাণ নারীজাতির জাগরণ ছাড়া সম্ভব নয়। তিনি জানিতেন, আমাদের দেশের নারীজাতি যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, সম্যগ্ পরিবর্ত্তন ছাড়া তাহাদের দ্বারা জগতের কল্যাণ সম্ভব নয়। দেশে উচ্চতর নারী আদর্শের প্রতিষ্ঠা এই জীবনেই করিয়া যাওয়া ছিল, তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। যে সমস্ত সামাজিক আচার ব্যবহার, রীতি নীতি "দশ বৎসরে বেটাবিউনী" ছাড়া দেশে আর কিছু হইতে দেয় না, তাহার আমূল সংস্কার ব্যতীত এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার যে কোন সম্ভাবনাই নাই, তাহা বিবেকানন্দের মত মনস্বী ব্যক্তি বুঝিতেন না, ইহা বলিলে তাঁহার বুদ্ধির সম্মান করা হইবে না। আসল কথা, তিনিও একজন সংস্কারক ছিলেন এবং শিক্ষা ও পরিবর্ত্তনের সাহায্যে ভবিষ্যৎ ভারত যে প্রাচীন ভারত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, এ বিষয়েও সংস্কারকদের সঙ্গে মূলতঃ তাঁহার মতভেদ ছিল না। কিন্তু এই শিক্ষা ও সংস্কার সম্বন্ধে অনেকের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে। অনেকের মতে হাত পা বন্ধ করিয়া কেবল মস্তিষ্কের চালনা করিতে থাক, দেখিবে এক দিন হঠাৎ হাত পা দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। অর্থাৎ এখন আমরা যে কয় দিন জীবিত আছি, আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত করিও না, জনমণ্ডলীকে শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত কর, পরে সংস্কার আপনা হইতেই হইয়া যাইবে। এই প্রণালী গ্রহণের তলায় সর্ব্বদাই যে একটু কিন্তু থাকে, এখন আর তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু আগে শিক্ষা দাও, পরে সংস্কার করিও—এই প্রণালীটী আংশিক ভাবে অন্ততঃ Putting the car before the horse, লজিকের ভাষায় Begging the question. "আমরা গরু খাই" বলিয়া কলিকাতার রাস্তায় চীৎকার করাটা রামগোপাল ঘোষের কেবল পাগলামি নয়। খাওয়ার আগে কাণে মন্ত্রিয়া যাওয়া চাই। কি সংস্কার করিতে হইবে, তাহার প্রচার ও তাহা হাতে কলমে দেখানও যে লোকশিক্ষার একটা সর্ব্বপ্রধান প্রকরণ, তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? আমরা যে তা একেবারেই ভুলিয়াছি, তাও নয়—যদি ভুলি তা সুবিধার খাতিরে। এই দেনা পাওনার সংসারে দেওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে পার্থক্যরেখা আছে, সেইটা ভুলিতে পারি না। পাওয়াটা মধুর, দেওয়াটা কষ্টকর। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্ব বিভাগে Reactionaryগণের যে প্রথা, তাহা এ ক্ষেত্রে অনুসৃত না হইবে কেন? প্রজা সাধারণের অধিকার সংপ্রসারণের বিরুদ্ধে আমাদের ইংরাজ প্রভুরা তো এই যুক্তিটাই দিয়া থাকেন। রাজনৈতিক অধিকার পাইবার বেলায় যে যুক্তিটার অসারতা শতকণ্ঠে বর্ণনা করি, সামাজিক অধিকার দিবার বেলায় যে সেই যুক্তিটাই নিমজ্জমান ব্যক্তির তৃণখণ্ড ধারণের ন্যায় আঁকড়াইয়া ধরি, ইহা আমাদের সমাজ শরীরের সুস্থতার পরিচয় প্রদান করে না—হাতের ও হৃদয়েরও না, মস্তিষ্কেরও না। ইহাতে শত্রুগণের অট্টহাস্য, আর বন্ধুগণের মনোকষ্ট—কিন্তু নিরুপায়। এ রোগ সহজে সারিবে না।

এদেশে দু'চার জন বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছিয়াছেন, সে কথা অস্বীকার করি না। তথাকথিত শিক্ষিতদেরও অধিকাংশই যে পঞ্চদশ শতাব্দীর কোঠা ছাড়াইয়া আসিয়াছেন, সে কথা হলপ করিয়া বলিতে পারিব না। কেন না, "আট বছরের মেয়ের সঙ্গে ৩০ বছরের পুরুষের বে দিয়ে মেয়ের মা বাপ আহ্লাদে আটখানা!" "শত শত যুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারের কথা যাহাতে ভগবানের প্রতিমাস্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দ্দভে এবং ভগবতীর প্রতিমাস্বরূপ রমণীকে সন্তানোৎপাদন করিবার দাসী স্বরূপ করিয়া ফেলিয়াছে এবং জীবনকে বিস্ময় করিয়া তুলিয়াছে, তাহার কথা তাহাদের স্বপ্নেও মনে হয় না।" (বিবেকানন্দ-সৃজ্জনের ছুরিকা নয় কি?) কিন্তু ঐ বিপুল জনমণ্ডলীর মনের আনাই যেখানে তন্ত্র মন্ত্র লইয়া অথর্ব্ব বেদের যুগ মৌরুসী পাট্টা লইয়া বাস করিতেছে—শিক্ষা দ্বারা এই সকলকে এক ভূমিতে আনিয়া যদি সংস্কারে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তবে নিশ্চয়ই সংস্কারের জন্য মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। ঐ এক হাজার 'মা জগদম্বা' তৈরী করা নিজের জীবিত কালে তো দূরের কথা, জাতির জীবনেও কুলাইবে না। সুতরাং যিনি যে পরিমাণে শিক্ষাপ্রাপ্ত, তিনি সেই পরিমাণ সংস্কার গ্রহণ করুন ও "যৎ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ" এই নীতি অনুসারে পশ্চাদ্বর্ত্তীদিগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হউন। ইহাই সংস্কারের প্রণালী, ইহাই শিক্ষারও প্রণালী। সমাজের যে সমস্ত রীতি নীতি ভারত নারীকে সন্তানোৎপাদনের দাসী মাত্রে পর্য্যবসিত করিয়াছে, তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়াই কোন্ মন্ত্রবলে 'দশ বছরের বেটাবিটনীরা' আদর্শ নারীতে পরিণত হইবেন? ভারতের অতীত পুণ্যবলে 'ডায়েনা দেবীর ললাটস্থ তুষার কণিকার ন্যায় নির্ম্মল' আমেরিকার হাজার মেয়ে আকাশ হইতে ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া পড়িবে না, অথবা জাহাজ ভাড়া করিয়া তাঁহারা আটলাণ্টিক পার হইয়া আসিবেও না। শত লাঞ্ছনা অগ্রাহ্য করিয়া, শত টিট্‌কারী সহ্য করিয়া, স্বামীজি যাহাকে বলিয়াছেন, আমাদের দেশের মহাপাতক তাহা দূরীভূত করতঃ বর্ত্তমান ভারতেরই জল মাটীর মধ্যে তাঁহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। যেখানে বাধা তাহা নির্ম্মম ভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। ঐ যাঁহার হৃদ্‌গত আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার সঙ্গে সংস্কারকগণের মৌলিক পার্থক্য কোথায়? ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা স্বামী বিবেকানন্দের হৃদয়ে শেষ পর্য্যন্ত যে বর্ত্তমান ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার পথ নাই। কেন না, Logic of Facts-এর উপরে কোন তর্কই উঠে না।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

বিজয়ের বিজয় স্তম্ভ। (২)

গোস্বামী মহাশয় সর্ব্বদা এখানে থাকিতেন না, প্রচার কার্য্যে মধ্যে মধ্যে নানা স্থানে গমন করিতেন। একবার এখানকার উৎসব সমাধা করিয়া পৌষ মাসের শেষে হউক, কি মাঘ মাসের প্রথমে হউক, ৩ জন ব্রাহ্ম বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া যশোর, খুলনা,

বাগেরহাট, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করেন। এই সময় তাঁহার মনে ধারণা ছিল, পাল্কী কিম্বা গাড়ী চড়া পাপ, সুতরাং তিনি পদব্রজেই সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন। হটাৎ একদিন প্রাতে উক্ত তিন জন বন্ধুকে বলিলেন, 'আজই যশোর যাইতে হইবে। আমাদের গ্রাম হইতে যশোর প্রায় ১০।১১ ক্রোশ অর্থাৎ প্রায় ২৪ মাইল দূর হইবে; সেই সময়েই তিনি তিনজন বন্ধুর সহিত পদব্রজে যশোরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, অপরাহ্ন ২॥ টা কি তিনটার সময় যশোরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় পৌঁছিবামাত্র তথাকার প্রধান প্রধান উকিলগণ তাঁহাদিগকে অত্যন্ত আদর ও যত্নের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং সেই দিনই সায়ংকালে তথায় একজন প্রধান উকিলের (তাঁহার নাম এখন আমার মনে নাই। বোধ হয় উমেশচন্দ্র বসু) বাসায় উপাসনাদির আয়োজন করিলেন। প্রায় ৫০।৬০ জন ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত হইয়া উপাসনাতে যোগ দিয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া খুলনাভিমুখে রওনা হইলেন। সমস্ত দিন চলিয়া খুলনা পার হইয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই বাগেরহাট পৌঁছিলেন, তথায় এক চটিতে থাকিয়া রাত্রিতে আহারাদি ও বিশ্রাম করিবেন স্থির করিলেন, চটির কর্ত্তা, শান্তিপুরের গোঁসাই এসেছেন, এই কথা শুনিয়া অতি আগ্রহের সহিত দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিল, তাহার মনে বড়ই ইচ্ছা যে গোঁসাইর প্রসাদ গ্রহণ করিবে; কিন্তু যখন গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, ওগো আমি ব্রাহ্ম, জাতিভেদ মানি না, সকল জেতের সঙ্গে ব'সে খাই, তখন সেই মুদি ভগ্নমনোরথ হইয়া তাহার চটি হইতে তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। সেই পৌষ মাঘ মাসের শীতে তাঁহাদিগকে সমস্ত রজনী একটা বটবৃক্ষের তলায় অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। আহারাদি হইয়াছিল কি না শুনি নাই। কি বিশ্বাস, কি সত্যনিষ্ঠা! যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন ও বিশ্বাস করিতেন, তাহাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকিতেন, তাহার এক চুল এদিক ওদিক হইবার যোটি ছিল না। পরদিবস নৌকাযোগে বাগেরহাট হইতে বরিশালে পৌঁছিলেন। সে স্থান হইতে লাখটিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র রায় জমীদার মহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়া তথায় কয়েক দিবস থাকিয়া, তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় রাখালবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার কর্ম্মচারী বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন কি বিবাহ করিবেন? আমার নিকট একটী বালবিধবা পাত্রী আছে। উক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেনকে বিধবা বিবাহের জন্য আপনি অনুরোধ করিবেন ও বিশেষ চেষ্টার দ্বারা তাহার জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত করিয়া লইয়া আমাকে সংবাদ দিবেন। যাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাঁহারা বরিশালে বাস করিবার জন্য উক্ত জমীদার বাবুর নিকট জানাইয়াছিলেন, তাহা সফল হয় নাই। সেখান হইতে পুনরায় বাগআঁচড়ায় ফিরিয়া আসিলেন।

এখানে আসিয়া কুলবাড়িয়া-নিবাসী সাতকড়ি সোমাদ্দার মল্লিকের কন্যা বসন্তকুমারীর সহিত তাঁহার ভাগিনেয়, শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল মৈত্র মহাশয়ের পুত্র রাধিকাপ্রসাদ মৈত্রের বিবাহের প্রস্তাব করেন; এবং ঐ সঙ্গে পরলোকগত তারাচাঁদ হালদারের অল্প বয়স্কা বিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহ করিবার মত জানিয়া লইয়া বরিশালে

উক্ত রাখাল বাবুকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন, তাঁহারাও গোস্বামী মহাশয়ের এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহার উত্তর প্রদান করিলেন। এই বিবাহ বাগআঁচড়ায় না হইয়া বরিশালেই সম্পন্ন হয়। তখন রেলপথ ছিল না, নৌকা-পথে বরিশালে যাইতে হইত। শ্রীযুক্ত কিশোরিলাল মৈত্র মহাশয় এই সংবাদ পাইয়া মহা আনন্দিত হইলেন। তিনি তাঁহার পুত্র রাধিকাপ্রসাদের বিবাহ হিন্দুসমাজে দিলে হয় ত অনেক টাকা ও অলঙ্কার প্রভৃতি অনেক দ্রব্য পাইতে পারিতেন; কিন্তু ধর্ম্মের খাতিরে ও সত্যের অনুরোধে তাহা তৃণবৎ অগ্রাহ্য করিয়া, পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া এই বিবাহে সম্মত হইয়া অগ্রসর হইলেন। এই দেশে ইহা একটী অতি রমণীয় দৃশ্য নহে কি? ধর্ম্মরাজ্যের কি বিচিত্র গতি! উক্ত বিবাহ ফুলবাড়িয়া গ্রামেই সম্পন্ন হয়। এই উভয় বিবাহ গোস্বামী দ্বারাই সুসম্পন্ন হয়। শান্তিপুরের কিশোরিলাল মৈত্রের পুত্র রাধিকাপ্রসাদ মৈত্রের সহিত বসন্তকুমারীর বিবাহ এবং বরিশালের বৈকুণ্ঠনাথ সেনের বালবিধবা ভবানীসুন্দরীর বিবাহ, এই দুইটী বিবাহ ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই দুইটী বিবাহের দ্বারা বিজয়বাবু আমাদের যে কতদূর কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহার বর্ণনা হয় না। আমাদের দেশে এই প্রথম ব্রাহ্ম বিবাহ ও অসবর্ণ বিধবা বিবাহ কেবল বিজয়বাবুর দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আরও অনেকগুলি বিবাহ ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে বিজয়বাবুর দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় সপরিবারে আমাদের গ্রামে অনেক দিন পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। আর এক সময় একদিন কোন কারণে একটী লোকের উপর বিরক্ত হইয়া বাগআঁচড়া হইতে চলিয়া যান। কিছু সময় পরে তাহা জানিতে পারিয়া ৪।৫ জন লোক তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ছুটিলেন। গ্রাম হইতে প্রায় ৭ মাইল কি ৮ মাইল দূরে উত্তর দিকে যাদবপুরের বাজারে (যেখানে রেলওয়ে ষ্টেশন) গিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন। যেমন পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়া, অমনি বিজয়বাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন, পরে আহারাদি করিয়া সকলে একত্রিত হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া বাড়ীতে পৌঁছিলেন; আসিয়া সকলে নীরবে বসিয়া আছেন, এমন সময় তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট উপাসনার ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই এই সঙ্গীতটী গাইলেন।

পিতা গো দেখা দাও, আমায় দেখা দিয়ে
প্রাণে বাঁচাও।
আমি তোমারি নাথ, তোমারি চিরদিন,
তোমার দীনহীন অধম তনয়
আমি একাকী অরণ্য-মাঝে, আমার ভয়ে
অঙ্গ অবশ হ'ল।
ওহে কোথায় রইলে হৃদয়ের ধন,
কোথা রইলে প্রাণসখা দেখা দাও।
আমি আর যাব না, পিতা তোমায় ছেড়ে,
আমায় ক্ষম এবার দয়া ক'রে॥

এই গানটী গাইতে গাইতে তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। পার্শ্বে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাও না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলেন না; এই দিনের উপাসনাতে সকলে যেরূপ ভাবে ও প্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন, তাহা লেখনীতে লিখিতে অক্ষম। সে ভাব মনে ভাবিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। (উক্ত গানটী বিজয়বাবুর রচিত)

তাঁহার মুখের কথায় যে কত লোকের উপকার হইত, তাহা বলা যায় না। অনেক

সময় অর্থ ব্যয় করিয়াও সেরূপ উপকার পাওয়া কঠিন। তাঁহার নিকট ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ ও ছোট বড় কিছুই প্রভেদ ছিল না, বরং ধনী অপেক্ষা গরীবকে অধিক আদর করিতেন ও ভাল বাসিতেন; এইটী তাঁহার জীবনের ও চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। এরূপ সদাশয়, পরোপকারী, কর্ম্মী, সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্ম-পরায়ণ, প্রেমিক, সাধক ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম-ভ্রাতা ব্রাহ্মসমাজে বর্ত্তমান সময়ে পাওয়া অতীব দুর্লভ।

যে সময়ে গোবিন্দ বাবু ও বিজয় বাবু সপরিবারে আমাদের গ্রামে বাস ও বিদ্যালয়ের কার্য্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে মাগুরা হইতে শিশিরকুমার ঘোষ ও বসন্তকুমার ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয় আমাদের এখানে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দেন। ইহাঁদের সমবেত চেষ্টায় ও সাহায্যে বিদ্যালয়ের জন্য সাত খান বেঞ্চ ও দুইখান চেয়ার প্রস্তুত হইয়া গেল। ভক্ত সমাগমের কি আশ্চর্য্য শক্তি! ভক্তবৎসল ভগবানের কৃপায় ভক্তগণের সকল অভাব দূর হইয়া যায়, ইহাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ভগবান তাঁহার ভক্তগণের দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া দেন, তাহা না হইলে আমাদের অবস্থা সে সময়ে যেরূপ শোচনীয় ছিল, এরূপ সংঘটন হইবে কেন? এই দীন, হীন, কাঙ্গালদিগের ভাগ্যে কাঙ্গালশরণ ভগবানের কৃপা ভিন্ন কি এরূপ সম্ভব হইতে পারে!

এই ভক্তগণের সম্মিলনে, ভক্ত-হৃদয়ে যে প্রেম-প্রবাহ প্রবাহিত হইত ও যেরূপ মধুর ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হইত, তাহা এখনও হৃদয়-পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। সে সময়ে তাঁহাদের ভাব, ধর্ম্মোৎসাহ ও কার্য্য-তৎপরতা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, কি উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত বিজয়বাবু তাঁহাদের সঙ্গে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলেই আমাদিগকে ছাড়িয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন; কিন্তু করুণ-হৃদয় গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন না। যদি সেই সময়ে কোন এক জন বিশুদ্ধজীবন, সহৃদয় ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্ম গোস্বামী মহাশয়ের উপরোক্ত বিদ্যালয়টী লইয়া আমাদের এখানে অবস্থিতি করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমাদিগকে এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইত না; বিশেষ উপকারই হইতে পারিত; আজ আমাদিগকে মূর্খ, জ্ঞানহীন, দীন হীন কাঙ্গাল ও চরিত্রহীন বলিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের সমক্ষে দুঃখে ও লজ্জায় মস্তকাবনত করিয়া থাকিতে হইত না, এবং ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের ঘৃণা ও অবজ্ঞাসূচক বাক্যবাণের তীব্র প্রহার সহ্য করিতে হইত না। দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, আমাদের ভাগ্য দোষে দরিদ্রতা নিবন্ধন অর্থের অভাবে ও উপযুক্ত লোকের সাহায্য না পাওয়াতে বিদ্যালয়টী স্থায়ী হইতে পারিল না; এবং আমরা জ্ঞান, ধর্ম্ম ও চরিত্রের উৎকর্ষতা লাভ করিয়া মানব জীবনের উন্নতি সাধন করিতে পারিলাম না।

গোস্বামী মহাশয় চিকিৎসা বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন। প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া উপাসনা করিতেন, পরে চিকিৎসার্থ যতগুলি রোগী আসিত, তাহাদিগকে যত্নসহকারে দেখিয়া ও ঔষধাদি প্রদান করিতেন। দুই মাইল পর্য্যন্ত পথ প্রায়ই হাঁটিয়া যাইতেন; কঠিন কঠিন রোগগ্রস্ত রোগীর বাটীতে যাইয়া বিনা মূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ দান করিতেন। তাঁহার নিকট যে সমস্ত রোগী আসিত, ঈশ্বরের কৃপায় সকলেই অতি শীঘ্র আরোগ্য লাভ

করিত ও রোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইত। এক দিবস একটী মুসলমান জোলার ১৪।১৫ বৎসরের ছেলে তালগাছ হইতে পড়িয়া গিয়া তাহার হাতের হাড় ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়ে। সকলে ধরাধরি করিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট লইয়া আসিল, তিনি অতি সাবধানে তাড়াতাড়ি যত্নের সহিত তাহাকে সজোরে টানিয়া ধরিয়া হাড়খানি ভিতরে ঢুকাইয়া দিয়া ঔষধ সহ উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া দিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে তাহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়া দিলেন। এইরূপ অনেক কঠিন কঠিন পীড়া তিনি অল্পদিনের মধ্যে আরোগ্য করিয়া দিতেন। এক দিবস ডাক্তার তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের (স্বর্ণলতা লেখক) স্ত্রী প্রসব বেদনাতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন, বেদনায় অস্থির হইয়া মূর্চ্ছিত হইতেছিলেন; এই সংবাদ লইয়া উক্ত বাবুর ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহনবাবু গোস্বামী মহাশয়কে ডাকিতে আসিয়াছিলেন। বিজয়বাবু সে সময়ে উপাসনাতে বসিয়াছিলেন, কিন্তু সে দিন তাঁহার উপাসনাতে মন স্থির না হইয়া, কেমন চঞ্চল হইতে লাগিল। সংক্ষেপে উপাসনা শেষ করিয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, তারকবাবুর ভ্রাতা ক্ষেত্রবাবু তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার মুখে এই সংবাদ শুনিয়া তখনই তাঁহার সঙ্গে তাঁহাদের বাড়ী গমন করিলেন; এবং রোগিণীকে দেখিয়া ঔষধ না দিয়া অন্য প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, বলিলেন, ইহাতে কোন ভয় নাই, ইহার দ্বারাই উপকার হইবে ও অল্প সময়ের মধ্যে একটী পুত্র সন্তান হইবে। যেই তিনি বাড়ী আসিলেন, তাহার কিছু সময় পরেই ক্ষেত্রবাবু এক থালা মিঠায় সমভিব্যাহারে আসিয়া খবর দিলেন যে, তাঁহার পুত্র সন্তান হইয়াছে। সেই পুত্রটী এখন উপযুক্ত হইয়া সংসারে কাজ-কর্ম্ম করিতেছে। তাঁহার অস্ত্র চিকিৎসাতেও বেশ পারদর্শিতা ছিল, তাঁহার দ্বারা আমাদের যে কত উপকার হইতেছিল, তাহা বলিতে পারি না। পরিতাপের বিষয় এই যে, ভাগ্যদোষে তাহাও বিলুপ্ত হইয়া গেল। একমাত্র দারিদ্র্যই আমাদের সকল অবনতির মূল।

গোস্বামী মহাশয় সকল সময়ে আমাদের এখানে থাকিতেন না, নানা স্থানে প্রচার কার্য্যে গমন করিতেন। মধ্যে মধ্যে যখন আসিতেন, তখন এখানে অনেক দিন থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ ও গভীর উপদেশ সকল প্রদান করিতেন ও প্রচার সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনা করিতেন। এক দিন আলোচনার সময় জাতিভেদ ও উপবীত ধারণের কথা উত্থাপিত হইলে, আমাদের মধ্য হইতে প্রাণনাথ মল্লিক মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন,—যদি উপবীত রাখা কপটতার চিহ্ন ও মহাপাপ হয়, তবে আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারামবাবু উপবীত পরিত্যাগ না করিয়াও ব্রাহ্মসমাজের বেদিতে বসিয়া কার্য্য করেন কেন? তাঁহাদের দৃষ্টান্তে ত অনেকে উপবীত রাখা উচিত মনে করিতে পারেন। এই সরল ব্রাহ্ম ভ্রাতার কথা শুনিয়া তিনিও মনে মনে চিন্তা ও আন্দোলন করিতে লাগিলেন, এবং মনে স্থির করিলেন, ব্রাহ্মসমাজে এরূপ অসত্যের ব্যবহার চলিত থাকা উচিত নহে। যদি ব্রাহ্মসমাজে এই প্রথা সংশোধিত না হয় এবং যে সমাজ এই অসত্যের প্রশ্রয় দেয়, তাহার সহিত যোগ রাখা উচিত নহে। এইরূপ চিন্তা ও সঙ্কল্প করিয়া বিজয়বাবু আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও ভক্তিভাজন আচার্য্য কেশববাবুকে এই মর্ম্মে এক

আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ মফঃস্বলস্থ সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ; ইহাতে কোন প্রকার অসত্য ও কুরীতির ব্যবহার থাকিলে, তাহা সমস্ত ব্রাহ্মসমাজে পরিগৃহীত হইবে; অতএব তাহার সমূলে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। তখন আদি সমাজকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ বলা হইত। অতএব কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যগণ যদি উপবীতধারী থাকেন, তবে তিনি এই সমাজকে অসত্যের আশ্রয় বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন। কেশববাবু এই আবেদন পত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রদান করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন; এই জন্য তিনিও এই আবেদন পত্রে অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারামবাবু কোন ক্রমেই এই উপবীত পরিত্যাগ করিবেন না। দুই জন উপবীতত্যাগী উপযুক্ত লোক পাইলেই তাঁহাদিগকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য করা হইবেক।

এক সময়ে তাঁহাদের মধ্যে বেশ সাধন-ভজন চলিতেছিল, এমন সময়ে বিশেষ কোন ঘটনা পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হওয়াতে কতিপয় প্রচারকের সহিত তাহার বাদানুবাদ হইতে লাগিল। এই সকল কারণে তিনি তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া সপরিবারে আবার আমাদের গ্রামে আসিয়া বাস করেন। সেই সময়ে তিনি আমাদের চারি গ্রামে চারি দিন যাহাতে উপাসনা হইতে পারে ও প্রত্যেক গ্রামের স্ত্রী, পুরুষ সকলে মিলিয়া ভগবানের উপাসনা করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মঙ্গলবার বাগুড়ি, বুধবার কুলবাড়িয়া, শুক্রবার সঙ্করপুর এবং রবিবার বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজে সাপ্তাহিক উপাসনা, এবং শনিবার সঙ্গত সভা। সঙ্গত সভা ও সাপ্তাহিক উপাসনা সমাজ গৃহেই হইত। শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ মল্লিক মহাশয় স্থানীয় উপাচার্য্য নিযুক্ত হন। রবিবার প্রাতে সমাজ ঘরে উপাসনা, বিকালে কিছু সময় কীর্ত্তন হইয়া সন্ধ্যার পরে উপাসনা ও সঙ্গীতাদি হইত। সেই সময়ে এক এক দিন সঙ্কীর্ত্তনে যেরূপ জমাট হইত ও ভাবের তরঙ্গ উঠিত, তাহা কখনও ভুলিবার নহে। বালক, বৃদ্ধ ও যুবা সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন হইত। সেরূপ কীর্ত্তনের রোল আর এখন শুনা যায় না। বিজয়বাবুর ভগিনীপতি কিশোরিলাল মৈত্র মহাশয় এই সঙ্কীর্ত্তনের উৎসাহদাতা ছিলেন, কীর্ত্তনে যেরূপ মত্ততা, উপাসনাতেও সেইরূপ গম্ভীরতা ও ভাবাবেশ হইত। তখন গানের সঙ্গে হারমনিয়ম ও বেহালা প্রভৃতি যন্ত্র ছিল না; কেবল এক মৃদঙ্গ ও করতাল সংযোগেই কীর্ত্তন হইত, তাহাতেই যেন কেমন মধুর ভাব বর্ত্তমান থাকিত ও মন মাতাইয়া দিত। এখন এত বাদ্যযন্ত্র সংযোগেও সেরূপ ভাব ফোটে না ও মনও মাতে না। মৈত্র মহাশয় প্রতি দিন অতি প্রত্যূষে গান গাইতে গাইতে নদীতে স্নান করিতে যাইতেন, সকলে তাঁহার উষাকীর্ত্তন শুনিয়া মোহিত হইত। তিনি যখন না থাকিতেন, তখন সকলে জিজ্ঞাসা করিত, তোমাদের সে ঠাকুর কই?

একদিন এমন অবস্থা ঘটে যে, বিজয়বাবুর ছেলের দুধ ফুরাইয়া যায়, তাঁহার শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিজয়! দুধ যে নাই, ছেলে খাবে কি? সন্ধ্যা হ'লো এখনও দুধ আসিল না, দুধ এ সময় কোথায় পাওয়া যাবে?" শুনিয়া বিজয়বাবু উত্তর করিলেন, আজকের মত ছেলেকে ভাতের ফ্যান খাওয়াইয়া রাখ। ইহার কিছু সময় পরেই দুধ

আসিয়া পৌঁছিল,ছেলেকে আর হ্যান খাওয়াইতে হইল না। এই উত্তর দিয়াই বিজয়বাবু কিন্তু নিশ্চিন্ত। ভগবানের কৃপার উপর কি বিশ্বাস, কি নির্ভর! বিন্দুমাত্র টলিলেন না।

আর এক দিন কুলবাড়িয়া গ্রামের বিশু কারিকরের ঘরে হঠাৎ আগুন লাগে। উহার বাড়ী হইতে অনেক দূরে গোঁসাই বসিয়াছিলেন, আগুন লাগিয়াছে শুনিয়া অমনি কোমর বাঁধিতে বাঁধিতে সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত। তাঁহার সঙ্গে আরও প্রায় ৩০।৩৫ জন লোক চলিলেন, তাঁহারা যাইতে যাইতে একখানা ঘর পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, অন্য ঘরগুলি গোঁসাই ও অন্যান্য লোকদিগের চেষ্টায় রক্ষা হইল। একে ফাল্গুন মাস, তাহাতে প্রবল দক্ষিণে বাতাস ও আগুনের উত্তাপে গোঁসাই অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের শৌচক্রিয়ার জন্য বাহিরে যে জল ছিল, তাহাতেই হাত মুখ ধুইয়া ফেলিলেন। কি পরোপকার-স্পৃহা! তাঁহা দ্বারা এরূপ অনেক কাজ সাধিত হইত।

আরও একবার এই নিয়ম করেন যে, অন্য কাহারও হস্তের রন্ধন আহার করিবেন না; নিজের পরিশ্রম দ্বারা আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ অথবা ভিক্ষালব্ধ নিজের আবশ্যক মত জিনিস গ্রহণ ও নিজের হাতে রন্ধন করিয়া আহার করিবেন। প্রতিদিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া এক জোড়া করতাল হাতে লইয়া কোন ব্রাহ্মের বাড়ী বসিয়া গান গাইতেন;—

সদাই হরি বল, সদাই হরি বল,
হরিনামের নাই তুলনা, সদাই হরি বল।
অজামিল পাপী ছিল, হরি নামে তরে গেল,
তারে যমদূতে ছুঁতে পেলে না।
যদি বিষয়েতে সুখ হ'ত রে,
তবে লালাজি ফকির হ'ত না।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল এই গানটী গাইতেন, পরে গৃহের কর্ত্তা বা কর্ত্রী কিছু চাউল, আলু, বেগুন, কাঁচকলা, দুটী কি চারিটী পয়সা যাহার যাহা থাকিত, তাহাই দিতেন; এই ভিক্ষা করিয়া যে দিন যাহা পাইতেন, তাহাই বাসায় আনিয়া নিজ হাতে পাক করিয়া আহার করিতেন, এমন কি, কলাপাতাখানিও নিজে কাটিয়া আনিতেন ও কেমন তৃপ্তি ও ভক্তির সহিত আহার করিতেন। একটী ছোট মাটীর ঘট ছিল, তাহাতেই পানীয় জল পান করিতেন। এইরূপ ভাবে প্রায় এক মাসকাল অতিবাহিত করেন। অতি দীন ভাবে থাকিতে ভাল বাসিতেন।

সমাজ ঘরের সম্মুখের পুষ্পোদ্যানটী তাঁহার নির্জ্জনে ধর্ম্ম সাধন ও যোগ শিক্ষার সুন্দর অনুকূল স্থান হইয়াছিল। এই উদ্যানে নির্জ্জনে তিনি দিনের পর দিন গভীর ধ্যানে ও ভগবচ্চিন্তাতে অতিবাহিত করিতেন। এই সময়ে তিনি এক দিন ধ্যানে মগ্ন আছেন, হঠাৎ চকিতের ন্যায় উঠিয়া "মল্লিক মহাশয়, মল্লিক মহাশয়" বলিয়া রূপচাদ মল্লিক মহাশয়কে ডাকিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, শঙ্করপুরের কালীবর মল্লিক আমার নিকট আসিয়া বলিয়াছেন, দেখুন আমার মুক্তি হইতেছে না, আমি এক্ষণে একটা কুকুরের সঙ্গে বাস করিতেছি; আমি মৃত্যুর পূর্ব্বে যে জমি ব্রাহ্ম সমাজে দান করিয়াছিলাম, তাহা সমাজ পান নাই। এই সমাজের উপাচার্য্য সেই জমি তাঁহার মাসতুতো ভাইদিগকে বাৎসরিক দুই টাকা কর ধার্য্য করিয়া জমা করিয়া দেন, কিন্তু তাহারা সে টাকা সমাজকে দেয় না। এই

চিন্তা সর্ব্বদা মনে জাগিতেছে। গোস্বামী মহাশয় এ ঘটনার কিছুই জানিতেন না। কালীবরের যখন মৃত্যু হয়, তখন গোস্বামী মহাশয় আমাদের এখানে ছিলেন না। তাই রূপচাঁদ মল্লিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কথা কি সত্য? গোস্বামী মহাশয় ধ্যানযোগে এই ঘটনা জানিতে পারিয়া ও রূপচাঁদ মল্লিক মহাশয়ের নিকট সমস্ত অবগত হইয়া, নিজ ব্যয়ে তাহার বিধবা পত্নীকে লইয়া শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন এবং গরীব দুঃখীকে কিছু কিছু চাউল ও পয়সা দান করিলেন। ইঁহার বিবাহও গোস্বামী মহাশয় দিয়াছিলেন, সমাজ ঘরে বিবাহ হয়; শ্রাদ্ধও সমাজ ঘরে সম্পন্ন হইল।

"এক দিন আমি উপরোক্ত পুষ্পোদ্যানের ভিতর নির্জ্জনে ধ্যান ও প্রার্থনা করিতেছি, এমন অবস্থায় সহসা আমার ভিতরে যেন এক অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশিত হইল, এবং কে যেন বলিয়া দিল, তুই আর আপনাকে গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখিস না, গণ্ডীর ভিতর থাকিলে ধর্ম্ম সাধন হয় না। এবার ভাদ্র মাসে এখানে আমি ভাদ্রোৎসব করিয়াছিলাম, তাহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন স্বর্গ হইতে প্রেম-মন্দাকিনী প্রেম-স্রোত প্রবাহিত করিয়া হৃদয় প্লাবিত করিল। এরূপ প্রেমানন্দ জীবনে আর কখনও লাভ করিয়াছি কি না বলিতে পারি না।" (বিজয়বাবুর উক্তি)

"এই সময় কলিকাতা হইতে (ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের) প্রচারক ভায়ারা ক্রমাগত আমাকে চিটি লিখিতে লাগিলেন, তুমি ওখানে একাকী থাকিলে শুষ্ক হইয়া মারা পড়িবে; মাতৃস্তন্য পান না করিলে, অর্থাৎ কেশববাবুর নিকট থাকিয়া ধর্ম্ম উপদেশাদি গ্রহণ না করিলে কিরূপে বাঁচিবে? এই পত্র পাইয়া আমি একেবারে অবাক! আমি নিজে আছি ভাল, ইঁহারা আমাকে গালি দেন কেন, ইহারই বা কারণ কি? এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় আবার যেন আমাকে কে ডাকিয়া বলিল, "দ্যাখ্‌ যদি ধর্ম্ম জীবনের উন্নতি চা'স আর গণ্ডীর ভিতর প্রবেশ করিস্‌ না।" আমি পিঞ্জর মুক্ত পক্ষীর ন্যায় উড়িতে চাই, কিন্তু পাখার বল পাই না; তখন বুঝিতে পারিলাম, ইহাই গণ্ডীর ভিতর থাকার পরিণাম।" (বিজয় বাবুর নিজের উক্তি)।

এখানে আরও একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না;—এক সময়ে গোস্বামী মহাশয় ঢাকাতে থাকিতেন, সেই সময়ে এক দিন ধ্যানস্থ হইয়া যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা এই,—ঢাকা হইতে যখন পুনরায় আমাদের গ্রামে আসিলেন, সেই সময়ে এক দিন কথাপ্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন—"আমি এক দিন ঢাকাতে ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছি, এরূপ সময় দেখিতে লাগিলাম যেন বাগআঁচড়ার পীতাম্বর মল্লিক (ইহার অনেক আগে পীতাম্বর মল্লিকের মৃত্যু হইয়াছে) গলদেশে একখানা উত্তরীয় দিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, আমার মৃত্যুর সময় আপনাকে দেখিবার জন্য প্রাণটা বড়ই ব্যাকুল হয়, কিন্তু দেখা হয় নাই, তাই এখানে দেখা করিতে আসিয়াছি; আপনি আমার পরিত্রাণের জন্য একটু প্রার্থনা করুন।" ভগবানের কৃপা এবং সাধক জীবনের মহত্ত্ব বুঝা বড়ই কঠিন! শাস্ত্রে বলে, ভগবানের কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়! মনুষ্য দেবত্ব হয়!!

ক্রমশঃ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশ্ব-বিলাপ

আকাশের পারে আলেরে আকাশ,
অগাধ অকূল অচেনায়!
এই শূন্য-সার বিহার-পত্তনে,
এই ক্লান্তি হীন গতির বর্তনে,
আমার বিকারে আমারই বিকাশ;
বিধি কি বিনাশ রচে নাই?
ভাঙ্গিয়া অঙ্গ ফেলি গো ছড়ায়ে,
গড়িয়া ওঠে সে তড়িতে জড়ায়ে,
জলে ওঠে মোর জীবনের জ্বালা;
কোটি তপনের চেতনায়।
ছুটেছি একাকী অন্ধ পান্থ;
এ দূর পথের নাহিরে প্রান্ত!
শূন্যের পরে মথিয়া শূন্য,
গান গেয়ে ছুটি বেদনায়।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু ও প্রেততত্ত্ব

সম্পাদক মহাশয়, কি কুক্ষণেই "নব্যভারতে" আমাদের "প্রেততত্ত্ব" নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। ঠিক যেন একটা বোলতার চাকে আঘাত করিয়াছি! খুব হুল-ফোটান খাইতেছি। প্রথম হুল ফোটালেন শশধরবাবু—"নব্যভারতে"ই। দ্বিতীয় হুল ফোটালেন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়—তাঁর "ব্রহ্মবিদ্যা" নামক (গত আশ্বিন মাসের) পত্রিকাতে। একটা সান্ত্বনা আছে। হুল ফোটালেই হুলফোটানি খেতে হয়,—জগতের ইহাই নিয়ম। তার উপর সোণায় সোহাগা,—প্রতি-হুলটা আমাদের নিজেদের ফোটাইতে হয় নাই। বঙ্কিমবাবু "নব্যভারতে"ই আপনা আপনি এক বিষম প্রতি-হুল ফোটাইয়া শশধরবাবুর "শশীবাবুর বাঙী হায়" নামক প্রবন্ধের সদুত্তর দিয়াছেন। আর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় তাঁহার "সাহিত্যে" (গত কার্ত্তিকের) নিজেই একটী সুমিষ্ট প্রতি-হুল ফোটাইয়া দত্ত মহাশয়কে সুশিক্ষা দিয়াছেন। আরও ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক জন উকীল মহাশয় দুই একটী গল্পও "নব্যভারতে" প্রকাশ করিয়াছেন। সমাজ মধ্যেও এ সম্বন্ধে মন্দ আলোচনা চলিতেছে না। তার পর কলিকাতায় Psychical Research Societyর সহকারী সম্পাদক মহাশয় আপনা আপনিই এ সম্বন্ধে আলাপ করিবার জন্য, আন্দাজ গত জুলাই মাসে, আমাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া অত্যন্ত ভদ্রতার সহিত আলাপ করিলেন এবং বলিলেন, তিনি আমাদের ভূত দেখাইবেন। আমরা (তাঁকে বুঝাইবার জন্য যে, তাঁর প্রমাণ প্রমাণই নহে) ভূত দেখিতে চাহিলাম। তিনি তখন বলিলেন, তাঁর মধ্যবর্ত্তী পীড়িত—তাই তখন দেখাইতে পারিবেন না। সেপ্টেম্বরে দেখাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া গেলেন। সেপ্টেম্বর চলিয়া গেল, অক্টোবরও চলিয়া গিয়াছে, "ভূত" ত তিনি আজও দেখাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, এই সব হইতে একটা কথা বোঝা যাইতেছে যে, এ বিষয়ে একটা বেশ আন্দোলন চলিতেছে। বিচার, বাদানুবাদ, তর্কাতর্কির একটা হুজুগ

আছে। বিচার্য্য বিষয়ে জনসাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, আর বিচারের ফলে আমরা বুঝিতে পারি, উক্ত বিষয় সম্বন্ধে মানব সমাজ কোথায় দণ্ডায়মান। তবে বিচারটী সুবিচার হওয়া চাই। ঠানদিদির গল্প বা আবোল-তাবোল বকা সুবিচার নয়।

আমরা গোড়াতেই এ সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলিয়া রাখিতে চাই। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বা দিব্যদৃষ্টি (clairvoyance) সম্বন্ধে প্রমাণ (যাকে সকলে প্রমাণ বলিবে) চাওয়াকে দত্ত মহাশয় আমাদের "তুচ্ছ বিতণ্ডাবৃত্তি" ও "কৌতুক" বলিয়াছেন। তিনি নিজে ব্যাপার-গুলিকে ঐভাবে দেখিতে পারেন (ও দেখিয়া-ছেনও) কিন্তু আমরা দেখি না। তিনি নিজে যে ব্যাপারগুলিকে ঐ ভাবে দেখিয়াছেন, তাহা পরে দেখাইব। আমরা এখানে কেবল বলিতে চাই যে, আমরা ঐ দুইটী বিষয়কেই খুব গুরুতর বিষয় মনে করি। আর আমা-দের বোধ হয়—দত্ত মহাশয় ছাড়া আর সকলেই তাই মনে করেন। কেন না, যদি তথাকথিত দিব্য দৃষ্টি প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে, পাঠক ভাবিয়া দেখুন, মানব সমাজ কত শত রকমে উপকৃত হইবে। মানব সমাজ ভূতের, আত্মার, ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে পারিবে। আর কার্য্য জগতেও নানা উপকার পাইবে। দৃষ্টান্তঃ—চোর ডাকাত ধরার বিশেষ সুবিধা হইবে। আর যদি প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলেও মানুষ প্রভূত উপকার লাভ করিবে। একটা কুসংস্কারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া এ সম্বন্ধে সুদৃঢ় পদ বিক্ষেপে এ জগতে চলিতে পারিবে। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধেও সেই কথা। 'ভূতের' অস্তিত্ব প্রমাণিত হইলে বিজ্ঞানের একটা অতি দুরূহ প্রশ্নের—চৈতন্য জড় ছাড়া থাকিতে পারে কি না—মীমাংসা হইয়া যাইবে। অনেক মানুষের ব্যক্তিগত পরলোকে (personal immortality তে) অবিশ্বাস ঘুচিয়া যাইবে। যাঁদের উক্ত পরলোকে বিশ্বাস আছে, তাঁদের সে বিশ্বাস সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইবে। দুর্নীতির ফল পরলোকেও ভুগিতে হইবে, ইহা স্থির জানিয়া মানুষ অধিকতর নীতিপরায়ণ হইবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। "ভূতের" অস্তিত্ব প্রমাণিত না হইলেও মানব সমাজের কম উপকার সাধিত হইবে না। আজ ঐ অন্ধ বিশ্বাস (যে বিশ্বাসের মূলে ছিল মাত্রও প্রমাণ নাই, তাহাকে আমরা 'অন্ধ বিশ্বাস' বলি) জগতের কত অনিষ্ট সাধন করিতেছে, কে তার ইয়ত্তা করিবে? পাঠক একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? আমরা দুই একটী দৃষ্টান্ত দিব। খিদিরপুরে একটী পরিবারে একটী প্রথম পোয়াতির প্রসব কাল উপস্থিত। কোন বাধার দরুণ প্রসব হইতেছে না। নিদারুণ কষ্ট পাইতেছেন। বাপ মা ভূতে বিশ্বাস করিতেন। বাটীতে একটী বেলগাছ ছিল। বাপ মার বিশ্বাস ঐ বেলগাছ হইতে একটা ব্রহ্মদৈত্য পোয়া-তির পেটে চড়িয়াছে। কোন ডাক্তারের বাবারও সাধ্য নয় উহাকে প্রসব করাইতে পারেন। বাপ মা ডাক্তার ডাকিলেন না। কন্যার মৃত্যুকাল উপস্থিত। কন্যা মরণের পূর্ব্বে বলিলেন, "মা, তুমি একবার ডাক্তার ডাকিয়া আমার চিকিৎসা করাইলে না?" কন্যা মরিলেন এবং তাঁর সহিত তাঁর উদরস্থ অজাত শিশু। খুব সম্ভব উপযুক্ত ডাক্তার ডাকিলে ঐ দুইটী প্রাণীই বাঁচিয়া যাইত। কি লোমহর্ষণ ব্যাপার! কে জানে আজ ভারতের, পৃথিবীর কত স্থানে কত নিদারুণ

নরহত্যা ঐ ভীষণ অন্ধ বিশ্বাস সাধন করিতেছে! বেশী দিন নয়, এই সে দিন (১৩ই সেপ্টেম্বরের Statesman দেখুন) বর্ম্মায় একটী বালক আর একটী বালককে 'ভূত' মনে করিয়া এমন আঘাত করিল যে, তাহাতেই তার প্রাণটী গেল! কে জানে কত প্রাণ পৃথিবীতে এইরূপে নষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে! অন্য দৃষ্টান্ত দিয়া পাঠক আপনার সময় নষ্ট করিব না। যা বলিলাম, তাই যথেষ্ট। এই সব হইতেই স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, প্রেততত্ত্ব ও দিব্য দৃষ্টি—এই দুইটী গুরুতর ব্যাপার,—ছেলে খেলা নয়। আর উহাদের সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণের মত প্রমাণ চাওয়াও "তুচ্ছ বিতণ্ডা বৃত্তি"র পরিচয় দেওয়া বা "কৌতুক চরিতার্থ" করা নয়। বরং ঐ সব ব্যাপারের প্রমাণ না দিয়া বা প্রমাণ দিতে চেষ্টা না করিয়া কতকগুলো বাজে, পরস্পরবিরুদ্ধ, অসার কথা বলিয়া "ব্রহ্মবিদ্যা"র পাত আষ্টেক ভরাণকেই লোকে "তুচ্ছ বিতণ্ডা বৃত্তি"র পরিচয় দেওয়া বলিবে, এবং লোকে আরও বুঝিবে যে, বেদান্তরত্ন মহাশয় নিশ্চয়ই সর্ব্বভূতকে আত্মবৎ দেখেন, কেন না তাহা না হইলে এমন গুরুতর সব বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ চাওয়াকে তিনি "কৌতুক চরিতার্থ" করা বলিয়া ধারণা করিবেন কেন। বেদান্ত চর্চ্চার ফল দত্ত মহাশয়ে সম্যক রূপেই ফলিয়াছে।

দত্তমহাশয় আমাদের জানাইতেছেন, তিনি প্রেততত্ত্ববাদী নহেন, ভূত দেখেন নাই। বেশ ভাল কথা। ইহা হইতে আমরা এ সিদ্ধান্ত করিতে পারি, তিনি ভূতের কোন কার্য্যও দেখেন নাই; কেন না, অনেক সময় আমাদিগকে কার্য্য দেখিয়াই কারণে উপস্থিত হইতে হয়। আর এ সিদ্ধান্তও অনিবার্য্য যে, দত্ত মহাশয় ওয়ালেস্, লজ্ প্রভৃতি ভূতের অস্তিত্বের যে সব প্রমাণ দিয়াছেন, সে সকলকেও বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না। কারণ, যদি সে সকল প্রমাণকে বিশ্বাসযোগ্যই মনে করিতেন, তাহা হইলেত তিনি প্রেততত্ত্ববাদী হইয়া পড়িতেন। তবে দত্ত মহাশয় এ কথাও বলিয়াছেন যে, তিনি ওয়ালেস্, লজ প্রভৃতির ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথাকে "অগ্রাহ্য" করেন না। এটী মনে না রাখিলে দত্ত মহাশয়ের প্রতি অবিচার করা হইবে। তাহা হইলে এই কথাটী মনে রাখিয়া আমরা বলিতে পারি, দত্ত মহাশয় নিজেই ওয়ালেস্, লজ্ প্রভৃতির ভূতের প্রমাণকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না। পাঠক মহাশয়, দত্ত মহাশয়ের মত সম্বন্ধে এই কথাটী মনে রাখিবেন।

দত্ত মহাশয় এখানে সাধারণ লোকের মত একটী বিষম ভ্রমে পড়িয়াছেন না কি? সাধারণ লোক মনে করে, কোন এক জন লোক বিজ্ঞান সম্বন্ধে জোরের (authorityর) সহিত কথা কহিতে পারেন বলিয়া, (কেবল সেই জন্য) অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও—ধর্ম্ম সম্বন্ধে বা "ভূত" সম্বন্ধে বা সমাজ সম্বন্ধেও—জোরের সহিত কথা কহিতে পারিবেন। সাধারণ লোকের এ ধারণা যে ভ্রমাত্মক, তা আর বলিতে হইবে না।

আর লোকে বলে Theosophy ও Spiritualismএর মধ্যে প্রেমের হাসি খুসী চলিতেছে; শীঘ্র বিবাহ হইবে। (বিখ্যাত Maskelyne বলিতেছেন:—"the two cults are at present coquetting affectionately. I predict a wedding in the near future.") দত্ত মহাশয় প্রেততত্ত্ববাদী না হইয়াও প্রেততত্ত্ববাদের স্বপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন—ইহা হইতে

উক্ত বিবাহের আশঙ্কাটা সহজেই আসে। এটা দুর্ভাগ্যের কথা; তাহা না হইলে আজ শাঁখ বাজাইতাম।

যাহা হউক, দত্ত মহাশয়ের চক্ষে আমরা এক বিষম অপরাধে অপরাধী এই জন্য যে, আমরা প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে ওয়ালেসের কথা অবিশ্বাস করিয়াছি ও তাই করিতে গিয়া দত্ত মহাশয়ের মতে একটা questionকে beg করেছি। দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "মিত্র মহাশয় বলিতেছেন, তিনি (ওয়ালেস্) একজন প্রেততত্ত্ববাদী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কথা বিশ্বাস করিবার আবশ্যক নাই, যেহেতু তিনি একজন 'মধ্যবর্ত্তী' পুরুষের (medium) বাম পার্শ্ব হইতে একটী ছায়ামূর্ত্তি রমণীনিঃসৃত হইতে দেখিয়াছিলেন! ইহাকেই ইংরাজীতে বলে, "Begging the question." এখন কথা হইতেছে, আমরা ওয়ালেসের অতিরিক্ত বিশ্বাসপ্রবণতা (credulity) দেখাইতে গিয়া যে কারণ প্রদর্শন করিয়াছিলাম, সে কারণটীকে দত্ত মহাশয় যথাযথ ভাবে তাঁর পাঠকদিগের সম্মুখে ধরেন নাই। এখানে কতকগুলি কথা তিনি চাপিয়া গিয়াছেন। চাপিয়া যাইবার উদ্দেশ্য ওয়ালেসের ঐ অতিরিক্ত বিশ্বাসপ্রবণতারূপ অপরাধকে দত্ত মহাশয় পাঠকের চক্ষে যতটা লঘু করিতে পারেন, তার চেষ্টা। দত্ত মহাশয় এখানে একটী দুটী নয় কিন্তু সাতটী কথা চাপিয়া গিয়াছেন। সে সাতটী কথা এই (১) যে পুরুষ "মধ্যবর্ত্তী" (Dr. Monck) তাঁর পার্শ্বদেশ হইতে স্ত্রী মূর্ত্তি প্রসব করেন, তিনি একটী ধূর্ত্ত ও প্রতারক ছিলেন। (২) ঐরূপ ধূর্ত্ততা ও প্রতারণার জন্য ওয়ালেস্‌কে স্ত্রী মূর্ত্তি দেখাইবার কিছু দিন পূর্ব্বে উক্ত Monck শ্রীঘর দর্শন করেন। * (৩) উক্ত Monckএর সরঞ্জামের (apparatusএর) মধ্যে মুখোস্ (mask) ভরাট করা দস্তানা (stuffed gloves) সূক্ষ্ম, শুভ্র বস্ত্র (muslin) ও কব্জা-বিশিষ্ট দণ্ড (jointed rod) পাওয়া গিয়াছিল। ঐ সব জিনিস দিয়ে অন্ধকার ঘরে একটী স্ত্রীলোকের মত একটী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাকে প্রকৃত স্ত্রীলোক বলিয়া দেখান বড় কঠিন ব্যাপার নহে। (৪) আমরা বলিয়াছিলাম, ওয়ালেস্ বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, উক্ত Monck (পুরুষ মানুষ হইয়াও) একটী "শরীরী" স্ত্রীলোক প্রসব করিয়াছিলেন। * (৫) আমাদের লেখা ছিল, ঐ শরীরী স্ত্রীলোকটী শুভ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত ছিল। (পাঠক দেখিবেন, দত্ত মহাশয় এই 'বস্ত্রাচ্ছাদিত' কথাটী একবারে তুলিয়া দিয়াছেন। উদ্দেশ্য বুঝিতেই পারিতেছেন)। (৬) আমরা লিখিয়াছিলাম, Barrettএর মত প্রেততত্ত্ববাদীও

* এইরূপ একজন প্রতারক মধ্যবর্ত্তীর দ্বারা প্রদর্শিত কার্য্যের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে একজন বিশিষ্ট প্রেততত্ত্ববাদীই (Barrett) কি বলিতেছেন শুনুন:—"......Yet it is obvious we must regard with the gravest doubt all phenomena obtained through any medium who has not a perfectly clean record."

* পাঠক দেখিবেন, দত্ত মহাশয় আমাদের "শরীরী" কথাটী তুলিয়া দিয়া "ছায়ামূর্ত্তি" বসাইয়াছেন, কেন না, একটা "ছায়া" দেখান তেমন অলৌকিক ব্যাপার নহে। কিন্তু মূর্ত্তিগুলি বস্তুতঃ প্রেতবাদিদের মতে ছায়া নহে। প্রেততত্ত্ববাদীরা এই ব্যাপারকে materialization বলেন। "মূর্ত্তি"গুলি বস্ত্র পরেন। ছায়া কিরূপে বস্ত্র পরিবে? আবার ঐ বস্ত্র যে আমরা যে বস্ত্র পরি, সেই বস্ত্রের মত, তাও একস্থানে ধরা পড়িয়াছে! "মূর্ত্তি"গুলির মাথায় আবার চুল আছে। ঐ চুল আবার আমাদের মাথার চুলের মত। Crookes একবার ঐরূপ "মূর্ত্তি"র মাথা হইতে চুল কাটিয়া লইয়াছিলেন! পাঠক, আপনিই বিচার করুন এরূপ মূর্ত্তিকে "ছায়ামূর্ত্তি" বলা উচিত না 'শরীরী' মূর্ত্তি বলা উচিত।

ভূতের ঐরূপ কীর্ত্তিতে (materialization) বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। (পাঠক দেখিবেন, এ কথাটীও দত্ত মহাশয় একেবারে চাপিয়া গিয়াছেন!) (৭) আমরা লিখিয়াছিলাম, আষাঢ়ে গল্প ছাড়া এ বিষয়ে অন্য প্রমাণ কিছুই নাই। (পাঠক দেখিবেন, এ কথাটীও দত্ত মহাশয় একেবারে চাপিয়া গিয়াছেন!)

এইরূপে দত্ত মহাশয় ৭টী কথা চাপিয়া গিয়াছেন। ইংরাজীতে, না, লাটীনে ইহাকেই Suppressio Veri (Suppression of truth) বলে। বাঙ্গালায় সত্য চাপা বলা যাইতে পারে। উদার-হৃদয়, প্রকৃত সত্যান্বেষী সমালোচকেরা তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষ বা মতটীকে আগে যত দূর পারেন, সবল করিয়া পাঠকদিগের সম্মুখে ধরেন, তারপর সাধ্যানুসারে সেই মতের খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন। ইহাই সমীচীন বিচার-প্রণালী। দত্ত মহাশয়ের প্রণালী অন্যরূপ। তিনি কার্য্যতঃ বলিতেছেন:—"প্রতিদ্বন্দ্বীর মতটীর ব্যাখ্যাকালে তাকে যতদূর পার দুর্ব্বল সাজে সাজাইয়া তোমার পাঠকদের সম্মুখে ধর, তার জন্য দুটী চারটী, বা সাতটী আটটী সত্য চাপিয়া যাইতে হয়, তাও যাও, তারপর মতটীকে যেন তেন প্রকারেণ নষ্ট কর, তা বাজে বকিয়াই হউক আর ন্যায়ের (logicএর) একটা কথা তুলিয়াই হউক, তা ঐ ন্যায়ের কথাটা বোঝ আর না বোঝ তাতে ক্ষতি নাই।"

যাক, ওয়ালেস্ সম্বন্ধে দত্ত মহাশয়ের মতে আমাদের অপরাধ এই যে, আমরা question beg করিয়াছি। ওয়ালেস বলেন, তিনি একটী পুরুষ মধ্যবর্ত্তীকে (যিনি একের নম্বরের জুয়াচোর) এক শুভ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত শরীরী স্ত্রীলোক প্রসব করিতে দেখিয়াছেন! আমরা ওয়ালেসের এই কথা বা এইরূপ কথাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করি নাই;—ইহাই হইল (দত্ত মহাশয়ের মতে) আমাদের "Begging the question." এটী একটী ন্যায়ের কথা। ও গো শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়, ইহাকে Begging the question বলে না! দেখিতেছি, দত্ত মহাশয়ের logicএর জ্ঞানটী কিঞ্চিৎ বাষ্পাকার লাভ করিয়াছে,—theosophyর তীব্র আলোচনার জন্য বা অন্য কোন কারণে, তা বলিতে পারি না। হয় ত দত্ত মহাশয় Inductive logicটা গোড়াতেই ভাল করিয়া হজম করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, ওয়ালেসের পূর্ব্বোক্ত কথাকে অবিশ্বাস করিয়া আমরা ন্যায়বিরুদ্ধ (illogical) কিছু করি নাই,—question beg করি নাই। আমরা ঠিক কাজই করিয়াছি। Logic ওয়ালেসের পূর্ব্বোক্ত কথা বা ঐরূপ কথাকে (যেমন "ঝাউ গাছেতে লাউ ফলেছে" এইরূপ কথাকে) antecedently improbable or incredible বলে। ওরূপ কথাকে অবিশ্বাস করিবার অধিকার মানুষের খুবই আছে, যতক্ষণ না প্রমাণের মত প্রমাণ পাওয়া যায়। আর ইহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত (logical) অধিকার। আর বার বার আমরা ইহাও বলিয়াছি যে, ওরূপ কথার প্রমাণ দাও বিশ্বাস করিব। কারণ আমরা বিলক্ষণ জানি যে, বিজ্ঞানে চরমত্ব (finality) নাই; আর আমাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, তিনিও বলিতে পারেন না যে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ;—যে তিনি বিশ্বপ্রহেলিকা ভেদ করিয়াছেন। (আমরা দত্ত মহাশয়কে Millএর Grounds of Dis-

belief আর Bainএর Credibility and Incredibility নামক অধ্যায় দুইটী দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।) *

আর লজ্ সম্বন্ধে আমাদের বিরুদ্ধে দত্ত মহাশয়ের অভিযোগ? অভিযোগ আছে বই কি। সকলেই জানেন, লজ্ প্রেতবাদের একজন প্রধান পাণ্ডা। প্রধান পাণ্ডা বলিয়াই তাঁর এ সম্বন্ধে প্রধান যুক্তি বা প্রমাণ সমূহ আমরা খণ্ডন করিয়াছি। এ খণ্ডনের বিরুদ্ধে দত্ত মহাশয় কোন কথা বলিতে পারেন নাই। বোধ হয় ক্ষমতায় কুলায় নাই। তবে অভিযোগ হইতেছে কি না যে, দত্ত মহাশয়ের মতে আমরা বলিয়াছি, বৃদ্ধ বয়সে পুত্রবিয়োগ হেতু লজের "মাথা খারাপ" হইয়াছে। তাঁর "মাথা খারাপ" হইয়াছে এ কথা বস্তুতঃ আমরা বলি নাই। এটী দত্ত মহাশয়ের কল্পনা। কল্পনা শক্তির দৌড়ের রাজ্যেও যে দত্ত মহাশয় উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছেন, তা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। আমরা লিখিয়াছিলাম, 'বৃদ্ধ বয়সে ছোট পুত্রটী (Raymond) হারাইয়া অধীর হইয়াছেন—ইহার জন্য অবশ্য কার প্রাণের সহানুভূতি না ঐ শোকার্ত্ত বৃদ্ধের দিকে ছুটিবে?' এ কথা বলিয়া আমরা লজকে আমাদের প্রাণের সহানুভূতিই দিয়াছি। এ কথা বলায় তাঁর "মাথা খারাপ হইয়াছে" বলা হয় কি না, তাহা পাঠক মহাশয়ই বিচার করিবেন। আর এক অভিযোগ আছে। আমরা লিখিয়াছিলাম, 'আর প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিষয়ে লজের নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা আছে কি না, তাহাতেই আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে।' এই সন্দেহের একটী কারণও দেখাইয়াছি। কিন্তু সে কারণটী খণ্ডন না করিয়া দত্ত মহাশয় কোন কোন স্ত্রীলোকের মত কেবল বৃথা ক্রন্দন করিয়াছেন! তিনি অন্য স্থানে তাঁহার আইন জ্ঞানের "নাড়া" দিয়াছেন। জিজ্ঞাসা ক এখানে তাঁহার আইন কি বলে। কেবল ক্রন্দনে আদালতে কোন ফল হয় কি? না তাঁহার foetishএর (লজের) গৌরব যদ্দ্বারা কিছু মাত্রও ক্ষুণ্ণ হয়, এরূপ কোন কথা বলিলে তাঁহার (অর্থাৎ দত্ত মহাশয়ের) গাত্রজ্বালা হয়!

তার পর ক্রুক্স্ (Crookes)? হাঁ, ক্রুক্স্ সম্বন্ধেও আমাদের বিরুদ্ধে দত্ত মহাশয়ের অভিযোগ আছে। অভিযোগ হইতেছে যে, ক্রুক্সকে প্রেততত্ত্ববাদী বলা যায় কি না, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে, আর আমরা এ সন্দেহ করিয়াছি "পরের মুখে ঝাল" খাইয়া। না, আমরা পরের মুখে ঝাল খাই নাই; নিজের মুখেই ঝাল খাইয়াছি। আমাদের সন্দেহের দুইটী কারণ দিয়াছিলাম। (১) প্রথম কারণ:—(ক) ক্রুক্সের নিজের উক্তি, "There is no bridge between the material and the spiritual

* এ সম্বন্ধে একজন বিশিষ্ট প্রেততত্ত্ববাদীই (Barrett) কি বলিতেছেন, প্রিয় পাঠক শুনুন। Barrett বলিতেছেন:—"This brings, me to the perfectly legitimate position which many take up, and which is justified by the caution that characterizes all sound advance in knowledge. It is that the antecedent improbability of these phenomena (যেমন "materialization") is so great, they are so far removed from the common experience of mankind, and moreover they involve ideas so unrelated to our existing scientific knowledge, that before we can accept them, we must have not only evidence, but incontestable evidence, on their behalf."

world." (খ) পরোক্ষ উক্তি "that he (Crookes) had come to a brick-wall." (২) দ্বিতীয় কারণ ক্রুক্সের নিজের অন্যতর উক্তি—"I have never once had satisfactory proof that the dead can return and communicate." এই দ্বিতীয় কারণটী অর্থাৎ ক্রুক্সের নিজের অন্যতর উক্তিটী তাঁর নিজ লিখিত একটী চিঠি হইতে উদ্ধৃত; ঐ চিঠি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে বিলাতের প্রেততত্ত্ববাদীদিগের সুপ্রসিদ্ধ মুখপত্র Light নামক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। এই উক্তিটী যে উক্ত তারিখের Light নামক পত্রিকায় বাহির হয়, তাও স্পষ্টাক্ষরে আমরা বলিয়াছিলাম। কিন্তু দত্ত মহাশয় এই দ্বিতীয় কারণটী একেবারে চাপিয়া গিয়াছেন। প্রথম কারণটীরও অর্দ্ধেক (ক অংশ) চাপিয়াছেন, অর্দ্ধেক (খ অংশ) প্রকাশ করিয়াছেন! যদিও দ্বিতীয় কারণটী, সকলেই বুঝিবেন, প্রথম কারণ অপেক্ষা অধিকতর প্রবল, তবুও ঐ দ্বিতীয় কারণটীকেই একেবারে সমূলে চাপিলেন। এইরূপ দুইটী কারণের মধ্যে প্রবলতর কারণটীকেই সমূলে চাপিবার উদ্দেশ্য কি? পাঠক মহাশয় বুঝিতেই পারিতেছেন। দত্ত মহাশয় আইনের নাড়া দেন, তিনি কি জানেন না যে, যেখানে দুটী স্বাধীন প্রমাণ একই সিদ্ধান্তের দিকে যায়, সেখানে সাধারণতঃ ঐ দুইটী প্রমাণ পরস্পর পরস্পরের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। যাই হউক, আমরা জিজ্ঞাসা করি, সত্যচাপারূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায়। যদি theosophy চর্চ্চার পরোক্ষ ফল ইহাই হয়, তাহা হইলে সে theosophy যত শীঘ্র এই পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হয়, ততই মঙ্গল। এই ত গেল এ সম্বন্ধে আমাদের দ্বিতীয় কারণের কথা। প্রথম কারণ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহারও অর্দ্ধেক চাপিয়াছেন। যাহা হউক, দেখা যাউক দত্ত মহাশয় এই ছিন্ন (mutilated) প্রথম কারণটীকে কিরূপে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ প্রথম কারণে ক্রুক্সের যে কথাগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা Begbie নামক এক ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তার "Master Workers" (1905, P 215) নামক পুস্তকে লিখিত আছে। দত্ত মহাশয় বলিতেছেন, Begbie এক জন "অজ্ঞাত" লেখক, তার কার্য্যতঃ বলিতেছেন, যে "অজ্ঞাত" বলিয়া উহার কথায় বিশ্বাস কি? Begbie দত্ত মহাশয়ের নিকট "অজ্ঞাত" হইতে পারেন। কিন্তু ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তাদের নিকট পরিচিত। উনি বিলাতের সাময়িক পত্রিকায় জড়বাদীদিগকে কুট্ কুট্ করিয়া কামড় দিয়া যে সব প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা বিলাতের সাহিত্যিক সমাজে পরিচিত। তারপর উনি ক্রুক্স্ ও লজের খুব ভক্ত। অলৌকিক ঘটনায় উৎসাহের সহিত বিশ্বাস করিতেন। আর উঁর Master Workers এ ক্রুক্সের পূর্ব্বোক্ত যে দুইটী উক্তি লিখিয়াছেন, তাহা তিনি বলিতেছেন, ক্রুক্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার ভিতরের ঠিক মত জানিয়া লিখিয়াছেন। একটী উক্তি ত ক্রুক্সের নিজের কথায় দিয়াছেন। এই Begbieকে অবিশ্বাস করিবার কি কারণ আছে? উনি একজন হক্সলি বা লজ্ নহেন বটে, কিন্তু উহাঁকে অবিশ্বাস করিবার কারণ কি? আরও দেখুন, উনি ক্রুক্সের মুখের যে উক্তি উহাঁর পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে উক্তিটী ক্রুক্সের আর একটী নিজের

উক্তি—যাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, Light নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়—সেই উক্তির সহিত মিলে। আরও দেখুন, যখন ক্রুক্সের পূর্ব্বোক্ত উক্তিটী—'There is no bridge between the material and the spiritual world"—Begbieর পুস্তকে বাহির হইল, তখন কেহ কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন—অর্থাৎ ঐ লইয়া একটা গোলমাল (sensation) হইয়াছিল। Begbie তাঁহার পুস্তকে ক্রুক্সের নিজ মুখের উক্তি বলিয়া যদি একটা মিথ্যা উক্তি লিখিতেন, তাহা হইলে কেহ না কেহ, এমন কি, ক্রুক্স্ নিজেই তার প্রতিবাদ করিতেন। এরূপ প্রতিবাদ দত্ত মহাশয়ও জানেন না, আমরাও জানি না। এই সব কারণেই বলিতেছি, Begbieকে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। তবেই দাঁড়াইতেছে যে, যতদিন না একথা প্রমাণিত হয় যে, ক্রুক্সের নিজ মুখের পূর্ব্বোক্ত উক্তি দুইটী (Begbieর পুস্তকে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে) ক্রুক্সের উক্তি নয়, তত দিন ক্রুক্স্ সাধারণের গ্রাহ্য অর্থে প্রেততত্ত্ববাদী কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকাই ত স্বাভাবিক। আমাদের তাই সন্দেহও আছে। আমরা ক্রুক্সের পুস্তক পড়ি নাই। তা পড়িবার আবশ্যকতাও দেখি নাই। কেননা এ সম্বন্ধে তাঁর পরীক্ষা ও মতের একটী সুন্দর সংক্ষিপ্তসার Barrett তাঁর On the Thresh hold of the Unseen নামক পুস্তকে দিয়াছেন। Barrett, কিরূপ অবস্থা সমূহের মধ্যে Crookes মধ্যবর্ত্তীগণের সহিত উক্ত পরীক্ষাগুলি করেন, তাও ঐ পুস্তকে দিয়াছেন। পাঠক এখানে স্মরণ রাখিবেন Barrett নিজে একজন প্রেততত্ত্ববাদী, সুলেখক, বৈজ্ঞানিক আর ক্রুক্সের সহিত পরিচিতও ছিলেন। ক্রুক্সের ঐ পরীক্ষাগুলি সম্বন্ধে Barrett ক্রুক্সের সহিত কথাবার্ত্তাও কহিয়াছিলেন। তিনি ক্রুক্সের পরীক্ষাগুলিকে সাধারণতঃ সহানুভূতির চক্ষেই দেখিয়াছেন, এরূপ লোকের সংক্ষিপ্তসার যে ক্রুক্সের পরীক্ষা ও মত সম্বন্ধে একটী উপাদেয় জিনিস তা বুঝিতেই পারা যায়। Barrett ঐ সংক্ষিপ্তসার লিখিতে যদি কোন দিকে টেনে বলে থাকেন ত প্রেতবাদের স্বপক্ষেই টানিবেন। আর পাঠক এটাও স্মরণ রাখিবেন, অনেক সময় ভাল সংক্ষিপ্তসার হইতে কোন গ্রন্থকর্ত্তার প্রতিপাদ্য বিষয় যেমন সহজে ও সুন্দর ভাবে বোঝা যায়, তেমন তাঁর মূল গ্রন্থ হইতে পারা যায় না। যাহা হউক, ঐরূপ সুন্দর সংক্ষিপ্তসার পড়িয়াও ক্রুক্স্ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ দূরীভূত হয় নাই। ক্রুক্স্ এক "psychic force"এ, এক "hitherto unknown force"এ বিশ্বাস করিতেন ইহা নিশ্চয়। * কিন্তু তাহা হইলেই ত

* এ বিশ্বাস যে অমূলক তাও বেশ বোঝা যায়। তিনি বিশ্বাস করিতেন Home (বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ মধ্যবর্ত্তী) তাঁর নিজের শরীরের ওজন (weight) প্রায় দুই সের কমাতে বাড়াতে পারিতেন। ক্রুক্স্ বলেন, তিনি নিজ রচিত খুব ভাল পাল্লায় Homeকে ওজন করিয়া তাহা দেখিয়াছেন। ক্রুক্সের মতে ইহা তাঁর তথাকথিত "Unknown force"এর প্রমাণ। প্রমাণে কিন্তু একটী সাংঘাতিক গলদ আছে। Homeএ পরীক্ষায় তাঁর নিজের Conditions impose করেন। একে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বলে না। ইহা যাদুকরের যাদু বা খেলা। (Modern Spiritualism. Vol II p 237)। Annie Eva Fay নামক এক সুন্দরী "মধ্যবর্ত্তী"ও ক্রুক্সকে ঐ পূর্ব্বোক্তরূপ ওজন কমাবার বাড়াবার ক্ষমতা দেখান। ঐ সুন্দরীর ফাঁকি (trick) Mr. Maskelyne নামক প্রসিদ্ধ যাদুকর প্রকাশ করিয়া (The Supernatural. p 194.

সাধারণের দ্বারা গৃহীত অর্থে Spiritualismএ বিশ্বাস করা হইল না। Spiritualismএর সাধারণ মৌলিক অর্থ হইতেছে এই যে মানুষ মরিলে তার আত্মা থাকে এবং সেই আত্মা কখন কখন পরলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়া জীবিতদের সহিত ভাব বিনিময় করে, এই বিশ্বাস। যদি Light এ প্রকাশিত ক্রুক্‌সের পূর্ব্বোক্ত উক্তি বাস্তবিক ক্রুক্‌সের উক্তি হয় —আর তা না হবারও কোন কারণ দেখিতেছি না—তাহা হইলে ক্রুক্‌স্‌কে সাধারণ অর্থে Spiritualism এ বিশ্বাসী বলা যায় না। কারণ তিনি স্পষ্ট বলিতেছেন :—"মৃত মানব যে ফিরে আসে, আর আসিয়া জীবিতদের সহিত ভাববিনিময় করে, তার সন্তোষজনক প্রমাণ আমি কখন পাই নাই।" ক্রুক্‌স্ নিজেই হয়ত আজীবন এ সম্বন্ধে সন্দেহ দোলায় দুলিয়াছিলেন। প্রেতত্ত্ববাদী, ক্রুক্‌স্-বিশ্বাসী Barrett লিখিতেছেন :— "Even Sir W. Crookes writes that in recalling the details of what he witnessed, he finds an antagonism in her mind between his reason on the one hand and on the other the evidence of his senses, corroborated as it was by that of other witnesses who were present. (On the Threshold of the Unseen. p 95-96) হয়ত বা তাঁর পরীক্ষাগুলিতে তাঁর মতে যে বিজ্ঞানের অজানিত এক "Psychic force" এর প্রমাণ পাইয়াছিলেন বলেন, তাহা জীবন্ত "মধ্যবর্ত্তী" (Mediums) দিগের দ্বারাই প্রসূত ও প্রকাশিত হয় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

দত্ত মহাশয় বলিতেছেন, ক্রুক্‌স্ "পূর্ণমাত্রায়" প্রেততত্ত্ববাদী ছিলেন। এ বিষয়ে যে দুই মত আছে, এ সম্বন্ধে আমরা যা বলিয়াছি তাছাড়া আরও প্রমাণ আছে। চিন্তাশীল প্রসিদ্ধ সুলেখক Joseph Mc Cabe লিখিতেছেন :—"The name of Sir W. Crookes is grossly abused in this connection (অর্থাৎ ক্রুক্‌স্‌কে প্রেততত্ত্ববাদী বলা যায় কি না এ সম্বন্ধে)। He believes in a material telepathy, as I do; the rest is a 'brick wall'." আরও ক্রুক্‌স্ মারা যাইবার পরেই বিলাতের সুবিখ্যাত সংবাদপত্র Nationএ তাঁর একটী সুন্দর জীবনী বাহির হয়। ঐ জীবনী-লেখক বলিতেছেন :—"Sir William Crookes was a Spiritualist, though how much of the creed he really held is difficult to say." (Nation এ প্রকাশিত ঐ জীবনী গত ১লা জুনের Bengaleeতে উদ্ধৃত হয়।) প্রিয় পাঠক এখন আপনিই বলুন, ক্রুক্‌স্ সাধারণ অর্থে (নানা লোক Spiritualismএর নানা লক্ষণ দিয়াছেন) একজন প্রেততত্ত্ববাদী ছিলেন কি না, আর যদি ছিলেন ত কি মাত্রায় ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে কি না। দত্ত মহাশয় যদি মিছে তর্কপ্রিয়তার পরিচয় না দিয়া ক্রুক্‌সের কোন পুস্তক হইতে তাঁর এমন একটী স্পষ্ট উক্তি উদ্ধৃত করিতেন, যেখানে তিনি বলিতেছেন যে তিনি "that the dead can ruturn and communicate" ইহার সন্তোষজনক প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহা হইলে দত্ত মহাশয়ের পাঠকেরা ও আমরা সকলেই উপকৃত ও বাধিত হইতাম। এরূপ উক্তি উদ্ধৃত করাকে দত্ত মহাশয় যুক্তিসিদ্ধ বা শ্রেয় মনে করেন নাই। কিন্তু যতদিন তা না করিতেছেন ততদিন বোধ হয়, তাঁর ও আমাদের পাঠক মহাশয়দিগের

মনে সন্দেহ ঘুচিবে না যে কে "পরের মুখে ঝাল" খাইতেছে—দত্ত মহাশয় না আমরা ?

আর যদি ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ক্রুক্‌স্‌ একজন প্রেততত্ত্ববাদী—"পূর্ণমাত্রায়" প্রেততত্ত্ববাদী ছিলেন, "ভূতে" বিশ্বাস করিতেন, —বিশ্বাস করিতেন যে তিনি যে সব তথাকথিত অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়াছিলেন —যেমন টেবিল আপনাআপনি (অর্থাৎ মনুষ্য কর্ত্তৃত্ব বিনা) শূন্যে উঠিল, আপনাআপনি বাজনা বাজিল ইত্যাদি—সে সব "ভূতের"ই কীর্ত্তি, তাহা হইলে আমরা বলিব, প্রতারিতের সংখ্যা একটা আরও বাড়িল। লজ্‌ ও ওয়ালেস্‌ যেমন প্রতারিত হইয়াছেন, তেমনি উনিও হইয়াছেন। আর লজ্‌ ও ওয়ালেসের "ভূত" দেখার যুক্তি ও প্রমাণ যেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়, ক্রুক্‌সের "ভূত" দেখার যুক্তি ও প্রমাণও তেমনি বিশ্বাসযোগ্য নয়। এখানে পাঠক স্মরণ রাখিবেন, দত্ত মহাশয়ও কার্য্যতঃ বলিতেছেন যে, ও-সকল যুক্তি ও প্রমাণ বিশ্বাসযোগ্য নয় ;—কেন না, তাঁর নিকট যদি বিশ্বাসযোগ্য হইত, তাহা হইলে ত তিনি প্রেততত্ত্ববাদী হইতেন। কিন্তু তিনি বার বার বলিতেছেন যে, তিনি প্রেততত্ত্ববাদী নহেন। তবে এ সম্বন্ধে পাঠক মহাশয় দত্ত মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত reservationটীও স্মরণ রাখিবেন।

Lombroso সম্বন্ধে আমাদের বিরুদ্ধে দত্ত মহাশয়ের অভিযোগ হইতেছে যে, আমরা আমাদের "নব্যভারতে" প্রকাশিত প্রবন্ধে উঁহার নাম উল্লেখ করি নাই। উল্লেখ করি নাই এই জন্য যে, সকল প্রেততত্ত্ববাদীদিগের যুক্তি ও প্রমাণকেই যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখাইতে হইবে যে, উহারা প্রকৃত যুক্তি ও প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, তার কোন অর্থ নাই। তার পর আমাদের পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধেই বলিয়াছি যে, লজ্‌ প্রেততত্ত্ববাদের, একজন প্রধান পাণ্ডা, আর দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এ সম্বন্ধে লজের তথাকথিত প্রমাণ ও যুক্তিকে প্রকৃত প্রমাণ বা যুক্তি বলা যায় না। ইহাই কি যথেষ্ট নয় ? Lombroso কি এমন যুক্তি বা প্রমাণ দিয়াছেন, যা লজ্‌ দেন নাই ? তার পর আমরা বাস্তবিক মনে করি যে, Lombroso একজন চতুর্থ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক।

তার পর দত্ত মহাশয়ের অভিযোগ হইতেছে যে, "বিজ্ঞানের যে অপরাজেয় সহিষ্ণুতার কথা আমরা শুনিয়াছি, সে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে পারেন নাই।" এ কথাটী ঠিক নয়। ইহা একটী প্রেততত্ত্ববাদীদিগের মামুলী অভিযোগ বটে। কিন্তু এ অভিযোগের কারণ নাই। গোড়াতেই পাঠক মনে রাখিবেন যে, 'ভূতে'র অস্তিত্বের প্রমাণের ভার (*the onus*) প্রেততত্ত্ববাদীদিগের উপর। আর দুই একজন বৈজ্ঞানিক, প্রেততত্ত্ববাদীদিগের তথাকথিত প্রমাণের মিথ্যাত্ব পুনঃ পুনঃ দেখিয়া, জ্বালাতন হইয়া, পুনরায় তাঁহাদের আহ্বান গ্রহণ করিতে অপারগ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তার জন্য বিজ্ঞানের উপর বা সাধারণ বৈজ্ঞানিক সমাজের বিরুদ্ধে দত্ত মহাশয়ের উক্ত অভিযোগ একেবারেই খাটে না। আমরা Ray Lankesterএর সহিত একবাক্যে বলিতে চাই, "Lovers of Science have never been unwilling to investigate such marvels if fairly and squarely brought before them." (*Diversions of a Naturalist* p. 364) আর দুই একটী

দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা আমাদের পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, যখনি বা যেখানেই প্রবঞ্চনা-শূন্য ভাবে ("fairly and squarely") প্রেততত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধে পরীক্ষা বৈজ্ঞানিকদিগের সম্মুখে আনীত হইয়াছে, সেইখানেই প্রেততত্ত্ববাদীরা হারিয়াছেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, এ পর্য্যন্ত কোন প্রেততত্ত্ববাদীই (তা তিনি ওয়ালেসই হউন আর লজই হউন), বিলাতের কোন প্রেততত্ত্ববাদীই বিলাতের Royal Societyর সম্মুখে তাঁর তথাকথিত প্রমাণ আনয়ন করিতে পারেন নাই। না,আমাদের ও কথাটা ঠিক বলা হইল না। আমরা আমাদের পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে লজ নিজেই বলিতেছেন যে, প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে সেরূপ প্রমাণ নাই। দত্ত মহাশয় আমাদের ও কথার কি কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলেন? খালি বচনে চিঁড়ে ভেজে কি? আরও দেখুন, প্রেততত্ত্ববাদীদিগের আর এক জন প্রধান পাণ্ডা (Barrett) বলিতেছেন, প্রেততত্ত্ববাদের স্বপক্ষে "knock down" evidence অর্থাৎ যে প্রমাণকে সকলে প্রমাণ বলিতে বাধ্য হইবে, এরূপ প্রমাণ নাই। তবেই প্রমাণ সম্বন্ধে প্রেত-পূজার প্রধান পাণ্ডাদেরই দশা যখন এরূপ, তখন বিজ্ঞান বা সাধারণ বৈজ্ঞানিক সমাজকে মিছে দোষ দিলে কি হবে। প্রমাণই যখন নাই, তখন "প্রমাণ দেখিলেন না" বলিয়া চীৎকার করায় ফল কি? মাথাই নাই, তার আবার মাথা ব্যথা!

আমরা আমাদের প্রবন্ধে ভূতের অস্তিত্বের প্রমাণ চাহিয়াছিলাম; আরও বলিয়া ছিলাম, প্রমাণ দাও বিশ্বাস করিব। আরও বলিয়াছিলাম যদি কেহ প্রবঞ্চনাশূন্য প্রমাণ —যে প্রমাণকে সকলে প্রমাণ বলিবে—এরূপ প্রমাণ দিতে পারেন, তাঁহাকে আমরা দশ হাজার টাকা দিব। দত্ত মহাশয় এই আহ্বানকে "বিতণ্ডা প্রিয়তা"র পরিচয় বলিয়া পাশ কাটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পাঠক আপনিই বলুন, এখানে "বিতণ্ডা প্রিয়তা"র পরিচয় কে দিলেন—দত্ত মহাশয় না আমরা? মিছে তর্কবিতর্ক, কথা কাটাকাটি বা বিতণ্ডার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশা ঐ আহ্বানের একটী প্রধান কারণ ছিল। "উল্টা বুঝিলি রাম!" দত্ত মহাশয় কি জানেন না যে, আমরা যেরূপ প্রমাণ (অর্থাৎ একটা টেবিল একটী ঘরের উত্তর দিক হইতে মানব কর্তৃত্ব বিনা দক্ষিণ দিকে আসিল) চাহিয়া ছিলাম, সেরূপ প্রমাণ যদি তিনি দিতে বা দেওয়াইতে পারিতেন, তাহা হইলে "ভূতে"র অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ এক কোপে নির্ম্মূল হইত? দত্ত মহাশয় বলিতেছেন, "মধ্যস্থ ভিন্ন বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়।" মধ্যস্থ রাখিতে কে বারণ করিয়াছে? দুই জন নয়, দুই শত,—দুই সহস্র মধ্যস্থ রাখুন না। আমরা কি তার আপত্তি করিয়াছি? আমরা ত তাই চাই। সকলে যাকে প্রমাণ বলে, এরূপ প্রমাণ চাওয়াতেই ত তাহা প্রকাশ পাইতেছে। আর মধ্যস্থ না থাকিলেই বা কে নির্ণয় করিবে প্রবঞ্চনা আছে কি না, টেবিল উত্তর দিক হইতে মানব কর্তৃত্ব বিনা বাস্তবিক দক্ষিণ দিকে আসিল কি না। "সন্তোষজনক প্রমাণ পাইলেও মিত্র মহাশয়ের যদি সন্তোষ না হয়?" এটা কি কাযের কথা হইল? এরূপ স্থলে "মিত্র মহাশয়ের সন্তোষ" অসন্তোষের উপর ত কিছু নির্ভর করিতেছে না। মধ্যস্থরাই ত সব নির্দ্দেশ করিবেন। আর আমাদের বোধ হয় আমাদের মত দুর্ভাগারা—যারা 'রাজার ম

কাক ছানা বিইয়েছে, (প্রসব করিয়াছে)' এই মহা সত্যটী প্রমাণাভাবে বিশ্বাস করিতে অপারক—সেই আমাদের মত দুর্ভাগারা "সত্যদর্শন হইতে" যত না "বঞ্চিত" হইবে, তদপেক্ষা ঢের বেশী বঞ্চিত হইবেন তিনি, যিনি প্রমাণের মত প্রমাণ না পাইয়াও, খালি এক জন যাদুকরের যাদু দেখিয়া বিশ্বাস করেন যে, মানুষ চক্ষুর ব্যবহার না করিয়াও দেখিতে পায়। দত্ত মহাশয় প্রেততত্ত্ববাদী-দিগের পক্ষ হইতে, আমাদের পূর্ব্বোক্ত আহ্বান (ভূতের প্রমাণ দিবার জন্য) স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তার আর একটী কারণ দিয়াছেন। তাঁর এই দ্বিতীয় কারণ বা ওজর হইতেছে এই যে, "প্রেতরা আহ্বানকারীর আজ্ঞাকারী ভৃত্য নয়।" বিড়ালটী এইবার থলে হইতে বাহির হইল! "ভূত" আহ্বানকারীর ঠিক ভৃত্য না হউক, দত্ত মহাশয় কি জানেন না যে, শত শত, সহস্র সহস্র প্রেততত্ত্ববাদী বলেন যে তাঁহারা "ভূত" বা ভূতের কার্য্য দেখিয়াছেন বা দেখাইয়াছেন;—"ব্যবসায়ী" নয়, কিন্তু বহু অব্যবসায়ী প্রেততত্ত্ববাদীও বলেন যে তাঁহারা "ভূত" বা ভূতের কার্য্য দেখিয়াছেন বা দেখাইয়াছেন? তবে একটা মিছে ওজর করিয়া পাশ কাটান কেন? মিছে "বিতণ্ডা" না করিয়া যাহাতে "ভূতে"র অস্তিত্বের প্রবঞ্চনাশূন্য একটী প্রমাণ (যেমন টেবিল সরান) দিতে বা দেওয়াইতে পারেন, তার চেষ্টা করুন। আর মহা বিজ্ঞতার সহিত আমাদিগকে যে বহুমূল্য উপদেশটী দিয়াছেন, সেটী তাঁর theosophist ভ্রাতাদিগকে দিন,—বেশী ফলদায়ক হইবে। আমরা পুরাতন পাপী।

প্রিয় পাঠক, যিনি যাঁহাই বলুন, দত্ত মহাশয়ের বাহাদুরি আছে। তিনি প্রেততত্ত্ব-বাদী না হইয়াও প্রেততত্ত্ববাদীদিগের পক্ষে অস্ত্রচালনা করিলেন—নিদারুণ, দিব্য, বায়বীয় (gaseous) অস্ত্র চালনা করিলেন। সে অস্ত্রচালনা আবার এরূপ যে তার আঘাতে আমরা এখন রক্তাক্ত কলেবর এবং কম্পান্বিত। দত্ত মহাশয় তবুও ছাড়িবেন না,—তিনি "সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন।" এইবার ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিবেন। দত্ত মহাশয় তাঁর আইন-রূপ ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িবেন বা ঝাড়িবেন। আমাদের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি এবার নিশ্চিত। প্রিয় পাঠক, আপনি আমাদের জন্য এখন একটী পিপীলিকার গর্ত্ত দেখুন। প্রথম কথা হইতেছে, দত্ত মহাশয়ের আইন অস্ত্র ছাড়িবার কোনও প্রয়োজনই ছিল না; কেন না আমরা এরূপ কথা কোথাও বলি নাই যে, শুধু কেবল টিণ্ডেল, হক্সলি প্রভৃতি অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক "প্রেততত্ত্বের সন্তোষ-জনক প্রমাণ প্রত্যক্ষ করেন না বলিয়া লজ্‌ প্রভৃতির সাক্ষ্য অগ্রাহ্য" হইবে। আরও দত্ত মহাশয় নিজেই বলিতেছেন, "অবশ্য Sir Oliver Lodge...প্রভৃতির সাক্ষ্য যদি বিশ্বাসযোগ্য না হয়, সে স্বতন্ত্র কথা।" Lodge প্রভৃতির সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য কি না, ইহাই ত বিচার্য্য বিষয় ছিল; আর আমরা দেখাইয়াছি যে, প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে উহাঁদের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়; আর দত্ত মহাশয় নিজেও উহাঁদের সাক্ষ্যকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না। তবে কেন দত্ত মহাশয় এ তরবারি খেলায় নাবিলেন? তরবারি খেলিতে পারেন, এইটা খালি দেখানই তাঁর উদ্দেশ্য না কি? আমরা আমাদের "নব্যভারতে" প্রকাশিত

প্রবন্ধে যে Faraday, Tyndall, Huxley, Mivart, Darwin, Lord Kelvin, Ray Lankester, G. Darwin, Clifford, Ferrier, প্রভৃতির মত একদিকে উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, আর অপর দিকে Wallace Lodge প্রভৃতির মত দিয়াছিলাম, তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের দেশের কোন কোন শিক্ষিত লোক আমাদিগকে যে প্রশ্ন করেন ("লজের মত অত বড় বৈজ্ঞানিক প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করেন, আর আপনি করিবেন না?") সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। যেমন প্রশ্ন, তেমনি উত্তর। অর্থাৎ আমরা কার্য্যতঃ বলিয়াছিলাম:—'তুমি যদি কেবল শব্দকে (authorityকে) একটা মস্ত প্রমাণ বল আর তা বলিয়া ওয়ালেসের, লজের মত আমাদের চক্ষের সম্মুখে নাড়, তাহা হইলে আমরাও ফ্যারাডে, টিন্‌ডেল, হক্সলি প্রভৃতি দশ জন বৈজ্ঞানিকের (যাঁরা সর্ব্ববিষয়েই ওয়ালেস, লজের অন্ততঃ সমকক্ষ) মত তোমার চক্ষের সম্মুখে নাড়িব। এ ক্ষেত্রেও তোমার হার। তা ছাড়া ওয়ালেস্, লজ যাকে প্রেততত্ত্বের প্রমাণ বলেন, তা যে প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, তাও দেখাইব।' একথা বলাতে, পাঠক বলিতে পারেন, আমাদের অপরাধ কোথায় হইয়াছে? আমরা কোথায় আইন-বিরুদ্ধ কথা বলিয়াছি? দত্ত মহাশয় নিজেই এখানে আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে একটা বিষম ভ্রমে পড়িয়াছেন। দত্ত মহাশয় বলিতেছেন "Law of Evidence হইতে আমরা জানিয়াছি যে, Negative Evidence অপেক্ষা Positive Evidenceএর মূল্য অনেক বেশী। যদি পঞ্চাশ জন একদিকে বলে আমরা ইহা দেখি নাই, অন্যদিকে একজন বলে আমি ইহা দেখিয়াছি, এবং সে ব্যক্তি বিশ্বাসের যোগ্য হয়, তবে দৃষ্ট ঘটনা প্রমাণিত বলিয়া গৃহীত হইবে।" না, দত্ত মহাশয় যে প্রকারে কথাটী লিখিয়াছেন, তাতে কথাটী ঠিক নয়। এখানে দত্ত মহাশয় একটী বিশেষ কথা উহ্য রাখিয়া গিয়াছেন,—জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তা জানি না। বিশেষ কথাটী হইতেছে এই যে, ঐ যে পঞ্চাশ জনের কথা বলিলেন, তারা বিশ্বাসযোগ্য কি না, আর ঐ একজন যে বলিল "দেখিয়াছে," তার মত মোটামুটি সমান বিশ্বাসযোগ্য কি না। এই বিশেষ কথার উপর দত্ত মহাশয়ের উক্তির সত্যতা অসত্যতা নির্ভর করিতেছে। যদি ঐ পঞ্চাশ জনও ঐ একজনের মত বিশ্বাসযোগ্য হয়, আর অন্যান্য অবস্থা (Circumstances) দুই দিকেই সমান হয়, তাহা হইলে দত্ত মহাশয়ের কথাটী ঠিক নয়,—ঐ একজনের সাক্ষ্য affirmative বা positive হইলেও। প্রায় সব জজই সাধারণতঃ ঐ পঞ্চাশ জনের negative সাক্ষ্যকেই অধিকতর প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিবেন। সাধারণতঃ negative সাক্ষ্য অপেক্ষা positive সাক্ষ্য অধিকতর মূল্যবান হইলেও positive সাক্ষ্য হলেই যে negative সাক্ষ্য অপেক্ষা বলবত্তর হইবে, তা নয়। এমন ক্ষেত্র আছে, যেখানে negative সাক্ষ্য positive সাক্ষ্যের সমান বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। The Law of Evidence সম্বন্ধে একজন সর্ব্বজন-মান্য authority—Mr. Starkie বলিতেছেন "The application of this principle (that the positive evidence is more weighty other things being equal) supposes that the positive can be reconciled with the negative testimony without violence and constraint. Evidence

of a negative nature may, under particular circumstances not only be equal, but superior to positive evidence. This must always depend on the question whether under the particular circumstances the negative testimony can be attributed to inattention, error or defect of memory." বর্ত্তমান ক্ষেত্রে Starkieর এই কথাগুলি খুব খাটে। মনে করুন এক দিকে লজ্ আর অন্য দিকে ফ্যারাডে, টিণ্ডেল, হক্সলি প্রভৃতি পঞ্চাশ জন একটা "মধ্যবর্ত্তী"র "ভূত" নামান দেখিতে গিয়াছেন। "মধ্যবর্ত্তী" বলিলেন এই "ভূত" দেখ। লজ্ বলিলেন, ভূত দেখিতেছি; আর ফ্যারাডে, টিণ্ডেল, হক্সলি প্রভৃতি পঞ্চাশ জন সেই সময়েই বলিলেন, না, কই "ভূত" ত দেখিতেছি না। এখানে ভূত দেখিতে গিয়া পঞ্চাশ জনই যে অমনোযোগী (inattentive) হইবেন তা সম্ভব নয়; আর পঞ্চাশ জনেরই যে একটা ভুল (error) হবে, আর লজের হবে না—এ সম্ভাবনাও কম; আর ঐ পঞ্চাশ জনেরই স্মরণ শক্তিটা (memory) যে একই সময়ে কমিয়া (defective হইয়া) গেল, আর লজের গেল না, এটাও সম্ভব নয়। এরূপ স্থলে পঞ্চাশ জনের কথাই আইন অনুসারেও অধিকতর প্রামাণিক বলিয়া লোকে গ্রহণ করিবে—যদিও এই পঞ্চাশ জনেরই সাক্ষ্য negative,—নাস্ত্যক। অবশ্য দৃষ্টান্তটা ideal কিন্তু এই রূপেই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে positive evidence সম্বন্ধে আইনের প্রয়োগটা (applicationটা) কর্ত্তব্য। দত্ত মহাশয় তা করেন নাই। তাহা না করিয়া মিছে আইনের নাড়াদিয়াছেন"।

তবেই দেখা যাইতেছে, দত্ত মহাশয়ের আইন রূপ অস্ত্রটী সম্পূর্ণই বায়বীয় (gaseous)। আর ইহাও দেখা যাইতেছে যে, তিনি এ সম্বন্ধে আইন পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু আইনটী প্রয়োগ করিতে অসমর্থ। এটীও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, কেন না দত্ত মহাশয় বঙ্গদেশের theosophist-দের প্রধান নেতা। তাঁকে "লজ"এর দ্বার উন্মোচন করিতে হয়, (তাঁর নিজের সম্পাদিত কাগজের ভাষায়) "সরল হৃদয়-স্পর্শী বঙ্গভাষায়", "তাঁহার স্বভাব সুলভ সরল ও ওজস্বিনী ভাষায়" "সারগর্ভ" বক্তৃতা করিতে হয়।—এমন বক্তৃতাও করেন, যাহা (তাঁর নিজের কাগজেরই ভাষায়) "সভাস্থ সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ শ্রবণ করেন।" এ সকল যশস্কর কার্য্যের মধ্যে কোন একটা আইনের প্রয়োগ ঠিক হইল কি না, এটা দেখিবার সময় কোথায়?

প্রিয় পাঠক, আপনার ধৈর্য্যচ্যুতির ভয় আছে। এখানে আর একটীমাত্র কথা বলিয়া আজকার মত বিদায় লইব। দত্ত মহাশয় বলিতেছেন, যেমন জাল নোট আছে বলিয়া আমরা নোটের ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে পারি না, তেমনি প্রতারক medium আছে বলিয়া "প্রেততত্ত্বের সমস্ত পরীক্ষাকে প্রবঞ্চনামূলক বলা সঙ্গত" নয়। দত্ত মহাশয়ের এই নোটের তুলনাটী (analogyটী) একেবারেই ঠিক হইল না। এটী প্রেততত্ত্ববাদীদিগের একটা মামুলী তুলনা। কিন্তু ইহাতে একটী সাংঘাতিক গলদ আছে। নোটের বেলা আমরা জানি যে, অনেক নোটই, এমন কি অধিকাংশ নোটই খাঁটী,—জাল নয়। আর mediumদের বেলা,—ইহাঁদের মধ্যে একজনও খাঁটী আছে কি না, অর্থাৎ একজনও প্রতারক বা আত্ম-

প্রতারিত নয় কি না, তাহাই জানি না, —অন্ততঃ তাহাই বিচার্য্য। আর প্রেত-তত্ত্বের সমস্ত পরীক্ষাকে প্রবঞ্চনামূলক কেহ বলে না; কেহ বলিলেও আমরা বলি না। কেন না আত্ম-প্রতারণা বলিয়া একটা জিনিস আছে; ভ্রম, ভ্রান্তি (error of judgement) বলিয়া একটা জিনিস আছে; অজ্ঞাতসারে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করা বলিয়া একটা জিনিস আছে। এসব জিনিস থাকিতে প্রেততত্ত্বের "সমস্ত পরীক্ষাকে প্রবঞ্চনামূলক" বলা যায় কিরূপে? তবে আমরা এই কথাটী বলিতে চাই,—স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই,—বার বার বলিতে চাই যে, এ পর্য্যন্ত প্রেত-তত্ত্বের স্বপক্ষে যে সব প্রমাণ ও যুক্তি সাধারণের সম্মুখে আনীত হইয়াছে, তার একটী-কেও প্রমাণ বা যুক্তি বলা যায় না। আগেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি প্রমাণ দাও,—তথাকথিত প্রমাণ নয়, প্রবঞ্চনামূলক প্রমাণ নয়,—সকলে যাকে প্রমাণ বলিবে এরূপ প্রমাণ দাও, বিশ্বাস করিব। আর আমাদিগের আগের প্রতিজ্ঞা ও আহ্বান —যে যদি কেহ ঐরূপ প্রমাণ দিতে পারেন তাঁকে দশ হাজার টাকা দিব—সে প্রতিজ্ঞা ও আহ্বান আগেও যেমন ছিল আজও তেমনি রহিল। দত্ত মহাশয়ের কথার পুঁটুলির মত আর একটী কথার পুঁটুলি চাই না।

এখন ফল কথাটী দাঁড়াইতেছে এই:—প্রেততত্ত্ববাদের স্বপক্ষে বিশ্বাসযোগ্য, প্রমাণ-নাম-যোগ্য কোন প্রমাণ নাই। এরূপ প্রমাণ দত্ত মহাশয়ও দেখিতে পান না। দেখিতে পাইলে তিনিও একজন প্রেততত্ত্ব-বাদী হইতেন। কিন্তু তিনি প্রেততত্ত্ববাদী নহেন। তবে তিনি লজ, ওয়ালেস, ক্রুক্‌স্ প্রভৃতির কথা অগ্রাহ্যও করিতে পারেন না। আমরা কিন্তু দেখাইয়াছি (আমাদের নব্য-ভারতে"র প্রবন্ধে) যে লজ্ যাহাকে প্রেত-তত্ত্ববাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলেন, তাহাকেও প্রমাণ বলা যাইতে পারে না। দত্ত মহাশয় এ সম্বন্ধে আমাদের যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন নাই। আর লজ্ নিজেই বলিতেছেন যে, যদি কেহ লজের উক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণকে প্রমাণ বলিতে না চাহেন, তাহা হইলে সেটাও ন্যায়সঙ্গত ("legitimate") কার্য্য হইবে। লজ্ নিজেই বলিতেছেন, প্রেততত্ত্ববাদের স্বপক্ষে এরূপ কোন প্রমাণ নাই, যাহা তিনি বিলাতের Royal Societyর সম্মুখে আনয়ন করিতে পারেন। প্রিয় পাঠক, এখানে এ কথাটীও স্মরণ রাখিবেন যে, Barrettএর মত এক জন বিশিষ্ট প্রেততত্ত্ববাদী নিজেই বলিতেছেন যে, প্রেততত্ত্ববাদের স্বপক্ষে "knock-down" evidence নাই। আমরা দেখাই-য়াছি, প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে ওয়ালেসের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। আর ইহাও দেখা-ইয়াছি যে, ক্রুক্‌স্ সাধারণের গৃহীত অর্থে প্রেততত্ত্ববাদী ছিলেন কি না, আর যদি ছিলেন ত কত দূর ঐ পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন,—এ সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে। পাঠক, এখানে ইহাও মনে রাখি-বেন যে, বিলাতের Psychical Research Society আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে,—প্রধানতঃ ভূতের অস্তিত্বের প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য। এ সম্বন্ধে সে Society চল্লিশ বৎসর আগেও যে তিমিরে আজও সেই তিমিরে। একটীও "Knock-down" প্রমাণ—অর্থাৎ যে প্রমাণকে সক-লেই প্রমাণ বলিতে বাধ্য হইবে এরূপ প্রমাণ

সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। আর এখানে এ কথাটীও স্মর্ত্তব্য যে, দুই চার জন ছাড়া প্রায় সমস্ত শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিকেরা ভূতের অস্তিত্বের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পান নাই। আরও, পাঠক মহাশয়কে এ স্থলে এ কথাটী স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি যে, যেখানেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাত মিথ্যা,—প্রবঞ্চনা-শূন্যভাবে ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরীক্ষা হইয়াছে, সেইখানেই প্রেততত্ত্ববাদীরা হারিয়াছেন। পরিশেষে আমরা বলিতে চাই যে, আমরা যে আহ্বান করিয়াছিলাম—বলিয়াছিলাম, যিনি ভূতের অস্তিত্বের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ—(যেমন টেবিল সরান) দিতে পারিবেন, তাঁহাকে দশ হাজার টাকা দিব,—সে আহ্বান এ পর্য্যন্ত কেহ গ্রহণ করেন নাই। সে আহ্বানের উত্তরে বন্ধুবর শশধর বাবু এক ঠান্‌দিদির গল্প আমাদিগকে দিয়াছেন; আর বন্ধুবর হীরেন্দ্রবাবু দুটী বাজে ওজর করিয়া পাশ কাটাইয়াছেন। প্রিয় পাঠক, এখন বিচারভার আপনার হস্তে ন্যস্ত করিলাম,—আপনি বিচার করুন "ভূতে"র অস্তিত্ব সম্বন্ধে সত্য সম্ভবতঃ কোন্ দিকে। আমরা আর কেবল কথার পুঁটুলির উত্তর দিতে নেহাৎই অপারক। দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে "মহাত্মা" "letters" সম্বন্ধে একটী demonstrationএর প্রতীক্ষায় রহিলাম।*

শ্রীশশিভূষণ মিত্র।

প্রত্যাদিষ্ট পিতৃমূর্ত্তি বা শাস্ত্রী শিবনাথ।

জন্ম—১২৫৩ সাল, ১৯শে মাঘ।
৩১শে জানুয়ারি, ১৮৪৭ খ্রীঃ।
মৃত্যু—৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৯।
১৩ই আশ্বিন, ১৩২৬, মঙ্গলবার।

"আমি বড় দুঃখী তাতে দুঃখ নাই,
পরে সুখী করে সুখী হতে চাই।
নিজেত কাঁদিব, কিন্তু মুছাইব
অপরের আঁখি, এই ভিক্ষা চাই।"

পুষ্পমালা।

আর্য্যদর্শনের সম্পাদক ৺যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম-এ, মহাশয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে নব্যভারতে (বৈশাখ, ১৩০৭) লিখিয়াছিলেন—"যিনি আস্বাদিত বিষয়ে অনাসক্ত ও অনাসক্ত বিষয়ে বাসনাহীন, এরূপ ব্যক্তি সংসারে অতি দুর্লভ। প্রথম শ্রেণীর লোককে বুভুক্ষু বলে, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোককে মুমুক্ষু বলে। কিন্তু যাঁহারা ভোগ-মোক্ষ-বাসনা-শূন্য, এরূপ মহানুভব ব্যক্তির সংখ্যা সংসারে আরো বিরল। * * এ অবস্থায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—জীবন, মরণ—কিছুরই উপর হেয়োপদেয়তা থাকে না। সংসার বিনষ্ট হউক, ইহাও তাঁহার ইচ্ছা নহে, আবার সংসার-স্থিতি বিষয়েও তিনি উদাসীন। জীবিকা নির্ব্বাহে যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রাপ্ত হন, তিনি তাহাতেই সুখে কালযাপন করিয়া থাকেন। এই ব্যক্তিই ধন্য। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এই দশায় উপনীত হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি ধন্য ও জগন্মান্য। তাঁহাকে আমরা বার বার নমস্কার করি।"

উপরোক্ত কথা মহাত্মা শাস্ত্রী শিবনাথ সম্বন্ধে প্রযুজ্য বলিয়া, আজ শোক-ভারাক্রান্ত-চিত্তে গভীর ভক্তির সহিত বারম্বার বলিতেছি, হে দেব, তুমি বাসনা-কামনা-বিজয়ী

* এ সম্বন্ধে আর বাদ প্রতিবাদ নব্যভারতে ছাপা হইবে না। ন, স।

বীর, তোমাকে বারম্বার প্রণাম করিতেছি, তুমি অক্ষম ব্যক্তির পূজা গ্রহণ কর।

উৎকল যেমন ভারতের নিত্য-স্মর্ত্তব্য, অনুগঙ্গ প্রদেশও তেমনি পূর্ব্ববাঙ্গালার নিত্য বরেণ্য। ধর্ম্মার্থে উৎকল সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ইতিহাসে ধন্য হইয়াছে। ভুবনেশ্বর, কণারক ও পুরীর মন্দিরে এবং পুরীর বহু বহু মঠে তাহার পরিচয় অঙ্কিত। আর পশ্চিমবঙ্গ? যে প্রদেশ সেকালে চৈতন্যদেব ও অদ্বৈত গোস্বামী এবং বহু বহু বৈষ্ণব কবিদিগকে, এবং একালে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ভক্ত কেশবচন্দ্র, শাস্ত্রী শিবনাথ, ঋষি রামতনু, রাজনারায়ণ, পরম ঋষি রামকৃষ্ণ এবং কর্ম্মী বিবেকানন্দকে জন্ম দিয়াছে, সে প্রদেশ সামান্য প্রদেশ নয়। যে প্রদেশ সাহিত্যিক অক্ষয়-কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, প্যারীচাঁদ, গিরীশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, চন্দ্রনাথ, বিহারীলাল, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতির জন্মভূমি, সে প্রদেশও সামান্য প্রদেশ নয়। পরন্তু যে প্রদেশ হরিশচন্দ্র, রসিককৃষ্ণ, রামগোপাল, ভূদেব, কৃষ্ণদাস, সুরেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রলাল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির মাতৃ-ভূমি, সে প্রদেশও সামান্য প্রদেশ নয়। হে পশ্চিম-বঙ্গ, তোমাকে আমি আজ ভক্তির সহিত বারম্বার প্রণাম করিতেছি।

২৪ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর এবং জয়নগরের মধ্য দিয়া সুরধুনী একসময়ে প্রবাহিত হইত। তাহাও অনুগঙ্গ প্রদেশ।* সে প্রদেশ সাধু শিবকৃষ্ণ দত্ত, ৺কালীনাথ দত্ত, ৺উমেশচন্দ্র দত্ত এবং ৺হরনাথ বসুর বিচরণ-স্থান। মজিলপুরে ব্রাহ্মসমাজ এবং বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া তাঁহারা যে নিগ্রহ ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা নিত্য-স্মর্ত্তব্য—তাঁহারাই শিবনাথের অভ্যু-থানের কারণ। আজ এ সকল মহাত্মাকেও প্রণাম করিতেছি।

চাঙ্গড়িপোতায় সোমপ্রকাশের সম্পাদক সুবিখ্যাত ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভবনে শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হরানন্দ বিদ্যাসাগর। তাঁহার মাতা, মামা এবং পিতাকেও সসম্ভ্রমে প্রণাম করিতেছি।

হরানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় তেজী পুরুষ ছিলেন। এক-মাত্র পুত্রের প্রতি তাঁহার নানাবিধ অত্যাচার ও উৎপীড়ন স্মরণ করিলে চক্ষে জলধারা বহে। কিন্তু তখনই ইহা মনে হয়, ইহা যেন বিধাতার আদেশ ছিল। তাঁহার তেজ ভিন্ন এরূপ ভক্ত-প্রহ্লাদ সদৃশ শিবনাথের অভ্যুত্থান হইত না। এই কারণে তাঁহাকেও আজ প্রণাম করিতেছি।

১২৫৩ সালের ১৯শে মাঘ মাতুলালয়ে শাস্ত্রী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। যে শতা-ব্দীতে তিনি এবং বঙ্গের বহু বহু মহৎ লোকের জন্ম হইয়াছিল, সেই শতাব্দীকেও প্রণাম করিতেছি। যে সকল কার্য্য তিনি করিয়াছেন এবং যে সকল কার্য্যের সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এই :—

(১) শ্যামাচরণ গুপ্তের নিকট বাল্য-শিক্ষা।

(২) নবম বৎসর বয়সে উপনয়ন।

(৩) ১৮৩৩ খ্রীঃ সাইক্লোন—তাহাতে চিন্তাদাসীর আগমন।

(৪) হরিদাস দত্ত যে মজিলপুর পত্রিকা বাহির করেন, তাহাতে লিখন।

* উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—১ হইতে ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৫) ব্রজনাথ দত্তের পুত্র শিবকৃষ্ণ কর্তৃক ব্রাহ্মধর্ম্মে ৺উমেশচন্দ্র দত্তের প্রবেশ।

(৬) ১৮৫৬ খ্রীঃ কলিকাতায় আগমন ও সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় অধ্যক্ষ ছিলেন এবং হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাসাতে ও পরে হরেকৃষ্ণ বাবাজীর বাড়ীতে স্থিতি।

(৭) ১৮৫৮ খ্রীঃ সোমপ্রকাশ প্রকাশ ও জেলিয়াপাড়ায় অবস্থিতি।

(৮) ১৮৫৭ খ্রীঃ মিউটিনী হয়। বিদ্যাসাগরের পর ই, বি, কাউয়েল সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন।

(৯) এই জেলিয়াপাড়ায় থাকার সময় প্রসন্নময়ীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

(১০) তৎপর বাদুড়বাগানে স্থিতি।

(১১) তৎপর ভবানীপুর মহেশচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীতে স্থিতি।

(১২) ১৮৫৯ খ্রীঃ মজিলপুর বালিকা-বিদ্যালয় প্রিয়নাথ রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও শুকর মোল্লার মোকদ্দমা।

(১৩) ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মহা ঝড়।

(১৪) ১৮৬৫ খ্রীঃ কোন ভদ্রলোকের দ্বীপান্তর গমনে "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" প্রণয়ন ও প্যারীচরণ সরকারের সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে লিখন।

(১৫) উড্রো সাহেবের সহিত জুতা খোলা লইয়া বিবাদ।

(১৬) ১৮৬৫ কি ১৮৬৬ খ্রীঃ বিরাজমোহিনীর সহিত বিবাহ।

(১৭) উমেশ বাবু-প্রদত্ত থিওডোর পার্কারের Ten sermons পাঠ।

(১৮) যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত বন্ধুত্ব ও কেশববাবুর সহিত পরিচয়।

(১৯) ১৮৬৭ খ্রীঃ শাকারিটোলাতে অবস্থিতি।

(২০) ১৮৬৮ খ্রীঃ প্রথম বিধবা বিবাহ হয়। বিপত্নীক যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত মহালক্ষ্মীর বিবাহ।

ইহার পরেই নির্য্যাতন আরম্ভ।

(২১) ১৮৬৮ খ্রীঃ পৈতৃক ভবনে হেমলতার জন্ম।

(২২) ১৮৬৬ খ্রীঃ এন্‌ট্রান্স উত্তীর্ণ হইয়া মাংসাহার পরিত্যাগ ও আপনাকে ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত করিবার দুরন্ত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ ও উপেন্দ্রনাথ দাসের সহিত মিলন। উপেন্দ্র দাসের বিধবা বিবাহ।

(২৩) শোভাবাজার রাজবাটীতে বেণীসংহার নাটকের অভিনয়।

(২৪) ১৮৬৯—৭ই ভাদ্র কেশবচন্দ্র সেনের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ও উপবীত ত্যাগ ও পিতৃগৃহ হইতে নির্ব্বাসন।

(২৫) ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে নির্ব্বাসিতের বিলাপ প্রকাশ।

(২৬) সিন্দুরিয়াপটি ও শ্যামবাজারে ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

(২৭) ১৮৭০ খ্রীঃ কেশবচন্দ্রের বিলাত গমন ও বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা। কয়েক মাস পরে কেশবচন্দ্রের প্রত্যাবর্তন ও শাস্ত্রী কর্তৃক "মদ না গরল" সম্পাদন।

(২৮) ভারতাশ্রমে আগমন।

(২৯) ১৮৭২ খ্রীঃ সংস্কৃতে এম-এ পাশ ও শাস্ত্রী উপাধি লাভ ও মহিলা-বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদান।

(৩০) ১৮৭২ খ্রীঃ বিরাজমোহিনীকে আনয়ন। ইহার পূর্ব্বে হেমলতা, তরঙ্গিণী ও প্রিয়নাথের জন্ম হয়। মাতুলের সাহায্যের জন্য হরিনাভিতে বাস।

(৩১) ১৮৭৩—২৫শে ডিসেম্বর হরিনাভিতে সুহাসিনীর জন্ম। এই খানে লক্ষ্মীমণি ও প্রকাশচন্দ্র রায়ের আগমন। লক্ষ্মীমণিকে আশ্রয় দান।

(৩২) ১৮৭৪ খ্রীঃ সাউথ সুবার্ব্বন স্কুলে ইনস-পেকটার ৺রাধিকানাথ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে আগমন।

(৩৩) ১৮৭২—অন্নদাচরণ খাস্তগির, বাবু দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্রহ্মমন্দিরের প্রকাশ্য স্থানে মহিলাদের উপবেশনের আন্দোলনে যোগদান।

(৩৪) দ্বারিকবাবু কর্ত্তৃক হিন্দুমহিলা বিদ্যালয় সংস্থাপন।

(৩৫) ১৮৭৪—সমদর্শীর সম্পাদন। ভবানীপুরে সরোজিনীর জন্ম।

(৩৬) ১৮৭৬ খ্রীঃ হেয়ার স্কুলে রাধিকা বাবুর চেষ্টায় আগমন।

(৩৭) আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিয়া ভারতসভার প্রতিষ্ঠা ও ইণ্ডিয়ান-লিগের সংস্থাপন। ৯৩নং কলেজ ষ্ট্রীটে ব্রাহ্মসমাজ-কমিটী ও ভারতসভার আপিস সংস্থাপন।

(৩৮) ১৮৭৬-৭৭ খ্রীঃ পুষ্পমালা প্রকাশ।

(৩৯) ১৮৭৭ খ্রীঃ মুঙ্গেরে গমন ও সরোজিনীর মৃত্যু।

(৪০) ১৮৭৮ খ্রীঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন। সমদর্শীর দল, স্ত্রীস্বাধীনতার দল ও নিয়মতন্ত্রীগণের মিলন এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামকুমার বিদ্যারত্ন ও গণেশচন্দ্র ঘোষের সহিত প্রচারক-পদ গ্রহণ।

(৪১) কার্য্যত্যাগ ও Brahmo Public Opinion প্রকাশ। ইহা উত্তরকালে Bengalee-র সহিত মিশিয়াছে এবং এখন সুরেন্দ্রনাথের সুযোগ্যতায় সুন্দরভাবে চলিতেছে।

(৪২) "এই কি ব্রাহ্ম বিবাহ" প্রকাশ। আনন্দমোহনের সহিত মিলন।

(৪৩) সিটী-স্কুল সংস্থাপন।

(৪৪) তত্ত্বকৌমুদী প্রকাশ ও ব্রাহ্মমিসন প্রেস ও বাঁকীপুর রামমোহন সেমিনারি সংস্থাপন।

(৪৫) নানা দেশে ধর্ম্ম প্রচার এবং মাদাম ব্লাভাস্কীর সহিত পরিচয়।

(৪৬) পরীক্ষকের পদ গ্রহণ।

(৪৭) ১৮৬৯—২৩শে জানুয়ারী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন (১১ই মাঘ, ১৮৪ সাল)।

(৪৮) ১৮৮১ খ্রীঃ ১১ই মাঘ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠা। এই সময়ে New Dispensation প্রণয়ন।

(৪৯) ১৮৮৪ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ। ১৮৮৫ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি হন। প্রথম সভাপতি আনন্দমোহন ১৮৭৮, ১৮৭৯, তৎপর শিবচন্দ্র দেব ১৮৮০ হইতে ১৮৮৪, ১৮৮৬ হইতে শাস্ত্রী সভাপতি হন। * ১৮৮৮ শাস্ত্রীর বিলাত গমন ও ভয়সী ও ষ্টেডের সাহত পরিচয়।

(৫০) ১৮৯২ সাধনাশ্রম সংস্থাপন। ১৮৯৩—১২ই মাঘ প্রথম সাধনাশ্রমের উৎসব। কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর উন্নতি সাধন করিয়া—একেশ্বরবাদীদের উপাসকমণ্ডলী স্থাপন ও অন্যান্যের সহিত মিলিয়া ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।

(৫১) ১৮৯৩—হেমলতার বিবাহ। হিমালয়ে বাসকালে হিমাদ্রিকুসুম প্রণয়ন।

(৫২) ১৮৯৯ সুহাসিনীর বিবাহ। ছাত্রসমাজ স্থাপন। তৎপরে ধর্ম্মজীবন প্রকাশ ও রামতনু লাহিড়ীর জীবনী ও প্রবন্ধাবলি প্রকাশ।

---

* শিবচন্দ্র দেবের জীবনী, ২১০ ও ২১১ পৃষ্ঠা।

(৫৩) ১৯০১ ৩রা জুন প্রসন্নময়ী স্বর্গারোহণ করেন। ১৮৮৮ তিনি রামকুমার বিদ্যারত্নের মাতৃহীন কন্যা রমাকে কন্যারূপে গ্রহণ করেন। ইহার মধ্যে নয়নতারা, যুগান্তর, Men I have seen, আত্মচরিত, গৃহধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তিনি তত্ত্বকৌমুদী, Indian Messenger, সখা ও সাথী, মুকুল প্রভৃতি প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত কার্য্যের তালিকা এইরূপে লিপিবদ্ধ করিলাম। ১৮৮৭ হইতে ১৯১৯, এই ৭২ বৎসর ব্যাপিয়া তাঁহার কার্য্যাবলী সুবিস্তৃত। এই সময়ে এ দেশে এমন কোন সুকার্য্য হয় নাই, যাহার সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ের কিছু যোগ ছিল না। উনবিংশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দী যেন তাঁহার হাতে গড়া। তাঁহার জীবন সকল কাজে বিস্তৃত। তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হওয়ার নয়। প্রচারকরূপেও তিনি ভারতের অধিকাংশ প্রদেশ পরিদর্শন করিয়াছেন। কত লোকের সহিত যে তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। ঐ জন্য বহু লোক তাঁহার সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করিতেছেন। আরো কত জনে যে ভবিষ্যতে লিখিবেন, কে জানে?

তাঁহার জীবনী পরিস্ফুট হইতে আরো অন্ততঃ ১০ বৎসর লাগিবে—এখন তাঁহার জীবনচরিত প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়। তাঁহার সম্বন্ধে যিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই পাঠ করিয়াছি। অনেকেই বিশেষ কিছু না জানিয়াই লিখিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। বোধ হয়, অনেকে তাঁহার আত্মজীবনচরিত খানিও পড়েন নাই। তাঁহার জীবন—ভক্ত কালীনাথ দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবকৃষ্ণ দত্ত, হরনাথ বসু, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, উপেন্দ্রনাথ দাস, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, প্যারীচরণ সরকার, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, মহেন্দ্রলাল সরকার, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস, দুর্গামোহন দাস, রজনীনাথ রায়, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি মহাজনবর্গের জীবনীর অন্তর্ভুক্ত। দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের অধিকাংশের জীবনীই অলিখিত, সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের দুরবগাহ্য জীবন সম্যক পরিস্ফুট হওয়ার উপায় নাই। বহু চেষ্টাতেও যাহা হইবে, তাহা আংশিক মাত্র। অনেক লোক তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ভুল কথা লিখিয়াছেন। ১৩২৬—কার্ত্তিক মাসের নারায়ণে সুলেখক শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। লেখা ভাল, কিন্তু ভ্রমপূর্ণ। তিনি ঐ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে নিয়মতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া এই নিয়মতন্ত্রের মধ্যে থাকিয়া আচার্য্য শিবনাথ ১৮৭৮ হইতে ১৯১৯, এই ৪১ বৎসর একাদিক্রমে সাক্ষাতে ও পরোক্ষে এই কেশব-বিরোধী নূতন সমাজের নেতৃরূপে ইহাকে পরিচালিত করিয়াছেন।" * যে ভক্ত কেশবচন্দ্র জীবনবেদের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে "স্বাধীনতা প্রবন্ধ" লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং যিনি কখনও কাহাকে কোন আদেশ করিতেন না এবং যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে আচার্য্যপদে বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে অটোক্রাট ও শাস্ত্রী মহাশয়কে ডিমোক্রাট বলিয়া ঘোষণা করা মহা ভুল। উঁহারা অটোক্রাট হইলে সাধনাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শাস্ত্রী মহাশয়ও

* নারায়ণ ১৩২৬—কার্ত্তিক—৪২৭ পৃষ্ঠা।

অটোক্রাট। শাস্ত্রী মহাশয়, বিবেককে বলি দিয়া তত্ত্বাবধায়কের আদেশানুসারে চলিতে, অনুদেশ করিতেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র কখনও সেরূপ করেন নাই। আমরা মনে করি, কেহই অটোক্রাট নহেন, তিন জনই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আমরা গিরিজাশঙ্করের প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্রের জীবনে অটোক্রেসির পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

কেশবচন্দ্র, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির সহিত মিলিয়া নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তনের আয়োজন করিতেছিলেন, এই সময়ে কুচবিহারের বিবাহের আন্দোলন উঠে। এই উপলক্ষে বন্ধুগণ বিচ্ছিন্ন হন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূল ব্যক্তি আনন্দমোহন-প্রমুখ ব্যক্তিগণ। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৺দুর্গামোহন দাস প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ আনন্দমোহনের অন্তরঙ্গ ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমতঃ এই দলে সম্পূর্ণরূপে যোগ দেন নাই, শেষে ৺শিবচন্দ্র দেব মহাশয় যোগ দিলে শাস্ত্রী মহাশয় যোগ দেন। শাস্ত্রী মহাশয় কি লিখিতেছেন, শুনুন। "এক আনন্দমোহন বাবু ব্যতীত আমরা সকলেই নিয়মতন্ত্র-প্রণালীর বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলাম। তিনিই সব বিষয়ে সারথী হইলেন। * * তদুত্তরে আমি লিখিলাম, আমাকে বাদ দিয়া করুন।" *

বরাবরই অধিকাংশের মতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কাজ হয়। দশ পনর জনের কর্ম্ম এক জনের কৃতকর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করা সমীচীন নয়। বিশেষতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কখনও কোন ব্যক্তি বা প্রচারকের প্রাধান্য দেখা যায় নাই। ইহা ভাল কি মন্দ, সে বিচার করিতেছি না, যাহা সত্য, তাহাই লিখিলাম। প্রাধান্য না দেওয়ার জন্য প্রচারকেরা মনোক্ষুণ্ণ হইতেন। একাদিক্রমে ৫ বৎসরের জন্য শাস্ত্রী মহাশয়কে তাঁহার ইঙ্গিত সভাপতিত্বও দেওয়া হয় নাই। এই জন্য ৺গণেশচন্দ্র ঘোষ, ৺রামকুমার বিদ্যারত্ন, ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৺লক্ষ্মন প্রসাদ প্রভৃতি প্রচারক এবং প্রচারিকাগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সে সকল বিবরণ বরাবর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্বই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ব্যক্তিগত প্রাধান্য খর্ব্বের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত—বরাবর তাহাই বজায় রাখা হইয়াছে। শাস্ত্রীই নিয়মতন্ত্রের প্রবর্ত্তক একথা আদৌ সত্য নহে। এ সম্বন্ধে তিনি অল্পই কাজ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৯২ খ্রীঃ সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা নিয়মতন্ত্রের বিরুদ্ধ কাজ। সর্ব্ববিষয়ে তত্ত্বাবধায়কের আদেশানুসারে চলিতে হইবে; সাধনাশ্রমের এইরূপ নিয়ম আছে। এই জন্য ৺সীতানাথ নন্দী মহাশয় এই আশ্রমের সহিত যোগ রাখিতে না পারিয়া সরিয়া পড়েন। এতৎ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমাদের অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল, কিন্তু তিনি প্রত্যাবৃত্ত হন নাই—গণ্ডী-প্রস্তুতের জন্য একাধিপত্য প্রয়োজন, বলিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বহুবার স্বাধীনতার উপর সমাজকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেও, শেষে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি একাদিক্রমে ৫ বৎসরের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিত্ব চাহিয়াছিলেন। সকলের মত না হওয়ায়, পরে আর সভাপতি হন নাই। যদিও তিনি একাধিপত্য না করুন এবং যদিও সুদীর্ঘকাল পরে তাহা

* আত্মচরিত ২৫৫ পৃষ্ঠা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে অর্পিত হইয়াছে, তবু একথা বলিবই, নিয়মতন্ত্রের মূল সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠায় খর্ব্ব হইয়াছে। গিরিজাশঙ্কর ভুল কথা লিখিয়াছেন। তিনি আত্মচরিত বা সাধনাশ্রমের বিবরণ জানেন না, মনে হয়। একজনকে বড় করিতে হইলেই যে অসত্যকে প্রশ্রয় দিতে হইবে, তাহা নয়। আমরা জানি, পৃথক সমাজ করার তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়দিগের প্ররোচনায় তাহা হইয়াছে, আত্মচরিতের নানা স্থানে তাহা বিবৃত আছে। সমালোচকে আমাদের এবং দ্বারকানাথের অগ্নিবর্ষণের কথা যে আত্মচরিতে উল্লিখিত হইয়াছে, বিরোধিতার তাহা অকাট্য প্রমাণ। তিনি দলাদলির পরিণাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, —"এরূপ দলাদলির মাথায় ধর্ম্ম টিকে না। আমরা সেই যে ধর্ম্ম হারাইয়াছি, তাহার সাজা এতদিন ভোগ করিতেছি, আর কতদিন ভোগ করিব, ভগবান জানেন। ব্রাহ্মসমাজ এতৎ দ্বারা লোকসমাজে যে হীন হইয়াছে, তাহা আজিও সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ব্রাহ্মসমাজের অধঃপতন আমাদের কাজের শাস্তি।" * তিনি সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া কেশবচন্দ্রের ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠারই পৌনঃপুনিক অভিনয় করিয়াছিলেন,—ইহা তাঁহার নিয়মতন্ত্রতার বিরোধী কাজ।

এইরূপ অনেকে অনেক কথা লিখিতেছেন, সত্যের উপর যাহার ভিত্তি নয়। বিস্তৃতির ভয়ে সে সকলের উল্লেখ আর করিব না। তবে শাস্ত্রীর মহত্ত্ব ঘোষণায় যে অনেকেই তৎপর,তাহাতে আমরা আনন্দিত। তাঁহাদের

* আত্মচরিত ২৩৭ পৃষ্ঠা।

সকলের নিকটই অল্পাধিক পরিমাণে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু একথা বলা বাহুল্য, শাস্ত্রীর জীবনের আসল জিনিস যাহা, তাহার উল্লেখ অনেকেই করিতেছেন না ;—তাহা তাঁহার চির-অবলম্বনীয় "প্রেম"। শাস্ত্রীর মূল কথা—তাঁহার অহেতুক প্রেম। এরূপ নিষ্কাম প্রেম, আমরা এযুগে, আর কুত্রাপি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমরা তাহারই অনুধ্যানে দিবারাত্রি নিমগ্ন। আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে মনে হইতেছে—তদীয় জীবনে কি অপার্থিব প্রেমের চিত্র দেখিয়াছি।

এই প্রেম তিনি কোথায় পাইয়াছিলেন, ঠিক জানি না। মনে হয়,তাঁহার মাতার নিকট হইতে ইহা উপার্জ্জিত। মাতৃকুলের বিশেষত্বেই তিনি চিরভূষিত, অথবা হয় ত ভগ্নী উন্মাদিনী হইতেই তাহা প্রাপ্ত। অথবা হয় ত তাহা উমেশচন্দ্র, কালীনাথ, হরনাথ, এবং বিদ্যাসাগর হইতে উপার্জ্জিত। আমরা তাঁহার আজীবনব্যাপী তপস্যার মূলে তাঁহার এই অপার্থিব প্রেমের চিত্রই দেখিতে পাই।

তাঁহার পিতা তাঁহার প্রতি যে কত নির্ম্মম অত্যাচার এবং প্রহার করিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও চক্ষে জল পড়ে। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের পর যে পিতা ১৮ কি ১৯ বৎসর তাঁহার মুখদর্শন বা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করেন নাই, এবং বাল্যে যিনি শাস্ত্রীর বিবাহের পর, কুটুম্বদের বাড়ী থাকার সময়ই, সামান্য কারণে চেলা কাঠ দ্বারা শাস্ত্রীকে প্রহার করিয়া অচেতন করিয়াছিলেন, * তাঁহার প্রতি শাস্ত্রীর গভীর ভক্তি দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া যাইতাম। তাঁহার আত্মচরিতেও পিতৃভক্তির কত কথাই পাঠ

* ২৩, ৬৯—৭০ পৃষ্ঠা।

করিয়াছি। তাঁহার পিতা স্থূলকেশব, শুক্রকেশব, স্থূলকেশব তাঁহার পুত্রকে বিগড়াইয়াছে বলিয়া, দীননাথ, হরনাথ ও উমেশচন্দ্রের প্রতি বিদ্রূপ করিতেন, কিন্তু ইঁহারা মজিলপুরে যখন বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন, যখন অত্যাচার আরম্ভ হইল, তখন শাস্ত্রীর পিতা মাতাই স্কুলে দুই মেয়েকে পাঠাইলেন। শাস্ত্রীর জীবনে যে পিতৃমাতৃভক্তির পরিচয় পাইয়াছি, অকপটে বলিতেছি, তেমন আর কোথাও পাই নাই।

এই প্রেম শাস্ত্রী কোথায় পাইলেন? তিনি মায়ের ভালবাসা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— "আমার মা আমাতে কিছু অন্যায় দেখিলে রাগ করিতেন এবং সাজা দিতেন বটে, কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার কি প্রকার স্নেহ ছিল, তাহার বর্ণনা হয় না।" ইহা লিখিয়া, তাঁহার মাতার বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া ব্রত উদযাপনের যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা পড়িলে অবাক্ হইতে হয়।* শাস্ত্রীর ৬ বৎসর বয়সের সময়ে এক ভগ্নী জন্মিল। তাহার নাম উন্মাদিনী। উন্মাদিনীর ভালবাসায় তিনি ডুবিলেন। এই সময়ে তাঁহার মাতা সামান্য কারণে দুইখানা খোলার কুচি একত্র করিয়া শাস্ত্রীর গালের মাংস ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু এই মাতার কথা স্মরণ হইলেই শাস্ত্রীর বাক্‌রোধ হইত। উন্মাদিনী শাস্ত্রীকে একেবারে গ্রাস করিয়াছিলেন, এক স্থানে লিখিতেছেন—"বার বৎসরের বালকের পক্ষে ১৮ মাইল পথ হাঁটিয়া যাওয়া বড় সহজ কথা নহে। আমিত গলদঘর্ম্ম হইয়া বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। উন্মাদিনীকে আমি এমনি ভালবাসিতাম যে বাড়ীতে গিয়া যখন দেখিলাম, উন্মাদিনী ঘরে নাই, তখন যেন সব শূন্য দেখিলাম। মাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, সে বাহিরে আমের বাগানে গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সেই দিকে দৌড়। মা চীৎকার করিতে লাগিলেন, "ওরে বোস, ওরে দাঁড়া, তাকে ডাকচি," কে বা তাহা শোনে। আমি একেবারে গিয়া উন্মাদিনীকে বুকে তুলিয়া ঘরে আনিয়া তবে নিঃশ্বাস ফেলিলাম। এই উন্মাদিনীই সেই গ্রীষ্মকালে মারা পড়িল। বাবা এক দিন তাহাকে সঙ্গে করিয়া জমিদার বাবুদের বাগানে বালিকাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার প্রিয়নাথ রায়চৌধুরীর সহিত দেখা করিতে যান। তিনি উন্মাদিনীকে আদর করিয়া লীচু খাওয়াইলেন। উন্মাদিনী আনন্দিত অন্তরে হাসিতে হাসিতে বাবার সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই তাহার দারুণ কলেরা রোগ দেখা দিল। এক বার ভেদ বমি হইয়াই সে চুপসিয়া গেল। তার বমিতে আস্ত আস্ত লীচু উঠিল। সে কথা এই জন্য বলিতেছি যে, তাহার মৃত্যুতে এত আঘাত পাইয়াছিলাম যে, তদবধি আজ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকাল ভাল মনে লীচু খাইতে পারি নাই।* মৃত্যুকালে মনে হইল, সে আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে এবং তাহার দুই চক্ষে জলধারা পড়িতেছে।" এই উন্মাদিনী সম্বন্ধে কত কথাই কত স্থানে লিখিয়াছেন। উন্মাদিনী প্রেমাপ্লুত শাস্ত্রী যেন ভ্রাতৃ-শোণিত-স্নাত রিয়েঞ্জি, অথবা খ্রীষ্ট-রক্ত-প্লাবিত ম্যাক্‌ডেলিন, অথবা অত্যাচারিত ও রক্ত-প্লাবিত নিত্যানন্দ, অথবা দৈত্যকুলের অত্যাচারে জর্জ্জরিত প্রহ্লাদ, অথবা নির্ব্বাসিত এবং অত্যাচারিত মাতৃপ্রেম-স্মরণে কাতর ম্যাটুসিনি। আমাদের মনে হয়, এইখানেই শাস্ত্রীর প্রেমে

* আত্মচরিত ২৩ ও ২৬ পৃষ্ঠা।

* আত্মচরিত ৬০-৬১ পৃষ্ঠা।

দীক্ষা লাভ হইল। এই প্রেম পশুতে, পাখীতে, পাড়ার ছেলে মেয়েতে কিরূপভাবে ক্রীড়া করিয়াছে, আত্মচরিতে মোয়েদের ও শেয়ালখাকী প্রকৃতির কথা পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া যাইত।

এই প্রেমের প্রথম পরিচয় মজিলপুরের বালিকা বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধাচারী জমীদারদের শুকর মোল্লা নামক ভৃত্যের বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ ভাঙ্গার অভিযোগে মেয়াদ হইলে, শম্ভুনাথ বসু মহাশয় কালীঘাট হইতে শুকর মোল্লাকে দেখিতে ও খাবার দিতে যাইতেন। সেই ভার তিনি শাস্ত্রীকে দেন। শাস্ত্রী অম্লান চিত্তে সে ভার বহন করেন। * কি আদর্শ প্রেমের দৃষ্টান্ত। পরম শত্রুর প্রতি এরূপ প্রেম একালে বড় একটা দেখা যায় না।

দ্বিতীয় পরিচয়—মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে থাকার সময়ে তামাক দেওয়ায় গোল হওয়ায় নবীন রাঁধুনি শাস্ত্রী মহাশয়কে অপমান করে। মহেশ চৌধুরী তাহাকে ডিসমিস করেন। নবীনের চাকরী গেলে তাহার জন্য শাস্ত্রী মহাশয় অনুরোধ করিয়া চাকরী দেন। † মহেশ চৌধুরী প্রথমতঃ কিছুতেই কথা রাখেন নাই, শেষে শাস্ত্রীর প্রেমের পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া নবীনকে চাকরী দেন।

তৃতীয় পরিচয়—ঝড়ে পতিত হওয়ায় যে বাড়ীতে সাহায্য পাইয়াছিলেন—তাহাদের প্রতি জীবনব্যাপী কৃতজ্ঞতা—যথা—"আমি ব্রাহ্মণকে পরে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলাম এবং পরে যখন শালতি করিয়া বাড়ী যাইতাম, সেই গ্রামে গিয়া তাহাদিগকে অন্বেষণ করিয়া কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতাম। সে গ্রামটী যেন আমার তীর্থস্থানের ন্যায় হইয়াছিল।"

চতুর্থ পরিচয়—মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে থাকার সময় একটী ভদ্র সন্তানের দ্বীপান্তর হয়, সেই উপলক্ষে নির্ব্বাসিতের বিলাপ প্রণয়ন।

পঞ্চম পরিচয়—এলোকেশীর মৃত্যু উপলক্ষে "নবীন জন্মের মত জলে ভেসে যায়" প্রভৃতি যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ পরিচয়—তাঁহার পুষ্পমালার অধিকাংশ কবিতা প্রেমমূলক। গৃহধর্ম্ম নামক পুস্তকে এই প্রেমের গভীর অভিব্যক্তি রহিয়াছে। পরিবার উন্নত না হইলে সমাজের উন্নতি নাই। গৃহকে কিরূপে উন্নত করিতে হয়, এ পুস্তক তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এরূপ পুস্তক এদেশে অধিক নাই।

সপ্তম পরিচয়—মহালক্ষ্মী, লক্ষ্মীমণি, গণেশসুন্দরী, কুসুম, গিরিবালা, সরোজিনী প্রভৃতি বহু নারীকে উদ্ধার ও পালন করিবার সময় তাঁহার সস্নেহ ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন, ৺প্রমদাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দে, ৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু বহু ব্যক্তির প্রতি সস্নেহ ব্যবহারে ইহা সম্যক পরিস্ফুট।

অষ্টম পরিচয়—গবর্ণমেণ্টের বৃত্তির টাকা ৺যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও মহালক্ষ্মী ও ৺উপেন্দ্রনাথ দাস ও তাঁহার পত্নীর জন্য অম্লান চিত্তে ব্যয় করায় পাওয়া যায়।

নবম পরিচয়—রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে প্রথম যে বিধবা বিবাহ হয়, তাহাতে উপস্থিত হওয়ায় এবং পরে মেয়ে চুরি করিয়া উপেন্দ্রনাথ দাসের সহিত বিবাহ দেওয়ায় পাওয়া যায়। গিরিবালার বিবাহে তাঁহার বিশেষ বন্ধু আনন্দমোহন ও দুর্গামোহন প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ যোগ দিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও যোগ দিয়া গভীর প্রেমের পরিচয় দেন।

দশম পরিচয়—পরীক্ষকরূপে প্রাপ্ত দশ সহস্র টাকা পাইয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ বিপন্নের সাহায্যে ব্যয় করেন।

---

* আত্মচরিত ৮৭ পৃষ্ঠা।

† আত্মচরিত [illegible]

একাদশ পরিচয়—ইন্দু ও হরিমোহনের বিবাহে সম্মতি দান।

দ্বাদশ পরিচয়—প্রেমের অবতার "পণ্ডিত-বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" প্রবন্ধের প্রতি পংক্তিতে পাওয়া যায়।

ত্রয়োদশ পরিচয়—পত্নীদ্বয়ের ও কন্যাদের ও পুত্রের প্রতি ভালবাসায় পাওয়া যায়।

এইরূপ অসংখ্য কর্ত্তব্যের ভিতর দিয়া তাঁহার হৃদয়টা ক্রমেই বিশাল হইতে বিশালতার দিকে অগ্রসর হইল। তৎপর শেষ প্রেমের পরিচয়—দেশকে ধর্ম্ম ও নীতিতে ভূষিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের চাকরী পরিত্যাগ করা। উপেক্ষিত হইয়াও ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি তিনি যে ভক্তি দেখাইতেন, তাহার তুলনা নাই। শাস্ত্রী মহাশয় প্রেমের প্রকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এই ধরায় অবতরণ করিয়াছিলেন।

আমরা এদেশের চারি জন মহাপুরুষকে প্রেমে যাঁহারা অতুলনীয়—এক মহারাণী স্বর্ণময়ী, দ্বিতীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তৃতীয় তারক প্রামাণিক, ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র মল্লিক, তাঁহাদের পার্শ্বে বসিতে পারেন, ৺দুর্গামোহন দাস। ইঁহাদের চরিত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া শাস্ত্রী বাল্যকাল হইতে কেবল পরার্থপরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এদেশে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি বেশ ভূষা, আহার পরিচ্ছদ সব অন্যের অভাব স্মরণে ভুলিয়া যাইতেন। কত মহিলা এবং কত বিপন্ন যে তাঁহার সাহায্য পাইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। প্রেমে তাঁহার জীবন আরম্ভ, প্রেমে পরিপুষ্ট, প্রেমে বর্দ্ধিত—প্রেমেই পরিসমাপ্ত। দেখা হইলেই বলিতেন, "দেবি, থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়"—ইহাই জীবনের সম্বল। শেষ দিনের পূর্ব্বে যে দিন সাক্ষাৎ করিতে যাই, সে দিন কেবল বলিয়াছিলেন—"দেবি, ইঁহারা বেশ খাওয়াইতেছে, বেশ খাইতেছি।"

তিনি যখন সাউথ সুবারবন স্কুলের শিক্ষক, তখন আমি চেতলায় থাকিয়া ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী স্কুলে পড়ি, সেই সময় হইতে তাঁহাকে জানি। তৎপরে ৯৩ কলেজ ষ্ট্রীট সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সময় একত্র ছিলাম। তৎপর ৺দ্বিজদাস বিশ্বাস মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পর আমরা উভয়ে তাঁহার ইকজিকিউটার হইয়া অনেক মেলা-মেশা করি, কিন্তু আমাদের এই সম্বেহ ব্যবহারের কথা কিছু বলিব না, ব্যক্তিগত বহু বহু কথা বাদ দিলাম। কারণ কাহাকে তিনি ভালবাসিতেন না? সে সকল ব্যক্তিগত ব্যবহারের কথার উল্লেখে প্রয়োজন দেখি না। সাউথ সুবারবন স্কুলের হেড মাষ্টারের বেশ ভূষার প্রতি কোন দৃষ্টি নাই। —কখনও কখনও ছেঁড়া কম্বল গায় দিয়া স্কুলে গিয়াছেন, দেখিয়াছি। সিন্দুরিয়াপটি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে মহর্ষির আচার্য্য, শাস্ত্রী ছিন্ন বিছানার চাদর গায় দিয়া বক্তৃতা করিতেছেন, দেখিয়াছি। তাঁহার সে দৃশ্যের তুলনা কেবল জেনারেল বুথ। থোবরণ গির্জ্জায় বুথের বক্তৃতা শ্রবণের সময় আমাদের মনে প্রেমাগ্নিময় শাস্ত্রীর কথা জাগিয়াছিল। "ছিন্ন কন্থা বারমাস, পথের কাঙ্গাল হরিদাস"—আমাদের শাস্ত্রী এই কথার উপমা। "Plain living and high thinking"এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এদেশে কেবল পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

শাস্ত্রী প্রবন্ধাবলীতে বলিতেছেন—"তবে আমরা বুঝিতেছি যে, ভক্তির পথ ভোগ ও ত্যাগ, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী পথ। ভক্তি বলেন, আমি ভোগও জানি না, ত্যাগও জানি না, জানি প্রেম, জানি আত্মসমর্পণ, জানি সেবা। ভক্তের কেবল স্বাধীনতার পথ। কি সুন্দর অনাসক্তির পথ। গীতাকার বলিতেছেন, যে অতিশয় ভোগী, তাহার যোগ নাই, আবার যে অতিশয় ত্যাগী, তাহারও যোগ নাই।

ভক্তের পথ সেই যোগের পথ। এই পথাবলম্বীর পক্ষে ধর্ম্মাচরণ আয়াসসাধ্য নহে, শিশুর গতিবিধির ন্যায় স্বাভাবিক।" প্রবন্ধাবলি অতি সুন্দর পুস্তক, তাহার স্থানান্তরে বলিতেছেন—

"অগ্রে যাহা বলা হইল, তাহাতে সকলেই অনুভব করিতে পারিতেছেন যে, ঋষি ও কবি, উভয়ের কার্য্য পরস্পরের এত সন্নিকট যে, ঋষি এক সময়ে কবি এবং কবি এক সময়ে ঋষি। ঋষি সসীম জগতের অন্তরালে অসীম জ্ঞান ও শক্তি দেখেন, ব্রহ্মাণ্ডের আবরণের মধ্যে এক জ্ঞানবস্তুর আভা দেখিতে পান; কবি সৃষ্টিরাজ্যে সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য ও প্রেম দেখিয়া থাকেন। এই কারণেই দেখিতে পাই যে, প্রাচীনকালে অর্থাৎ লৌকিক ও পারমার্থিকের মধ্যে বর্ত্তমান সুস্পষ্ট প্রাচীর যতদিন উপস্থিত হয় নাই, ততদিন ঋষিত্ব ও কবিত্ব একসঙ্গে মিশিয়াছিল, প্রত্যেক ঋষিই কবি এবং প্রত্যেক কবিই ঋষি ছিলেন।"

অপর স্থানে—"প্রকৃতিকে ভালবাসিলে, মানুষকে ভালবাসিলে, জীবনকে ভালবাসিলে সকল প্রেমের উৎস যিনি, তাঁহার কাছে কাছে কি থাকা যায় না? জগদীশ্বর ত সকলি ভালবাসিবার জন্য দিয়াছেন। ফুলটীকে এইজন্য মধুতে পূর্ণ করিয়াছেন যে, মধুকর তাহাতে বসিবে ও প্রাণ ভরিয়া মধুপান করিবে। সে যখন ফুলটীর উপর বসিতে চাহিয়াছে, তখন তাহাকে করতালি দিয়া তাড়ান যেমন, জগৎ ও মানুষকে ভালবাসিয়া মানুষ যখন সুখী হইতেছে, তখন তাহার পশ্চাতে বেদান্ত ধর্ম্মের তালি লাগাইয়া—"ওই আসক্তি! ওই আসক্তি" বলিয়া তাহার সুখটুকু ভাঙ্গিয়া দেওয়াও তেমনি। দুই নির্দ্দয়তার কার্য্য।" স্থানান্তরে—"এইরূপ মনে হয় যে, তুমি যদি পথ-ভিখারীর ন্যায় আঁচল পাতিয়া "সুখ দেও, সুখ দেও" বলিয়া বাসনা কর, ঈশ্বর সুখ দিবেন না; কিন্তু তুমি সুখের প্রতি উদাসীন হও, মানুষকে ভালবাস, পরকে সুখী করিবার চেষ্টা কর, জগতে তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়া যাও, ঈশ্বর পশ্চাৎ হইতে আঁচল ভরিয়া তোমাকে সুখ দিয়া যাইবেন।" স্থানান্তরে—"মন, বাক্য ও কার্য্যে খাঁটি মানুষ না হইলে ভক্তিরাজ্যের দ্বারে আঘাত করিবার অধিকার থাকে না, ভিতরে প্রবেশ ত পরের কথা।"

স্থানান্তরে—"প্রেম হইতে ভক্তির জন্ম, ভক্তি প্রেমের পরিপক্কাবস্থা। এবিশ্বে আমি কিছুই নই, প্রভু আমাকে সত্তা দিয়াছেন বলিয়া সত্তা পাইয়াছি, তিনি যা দেন, আমি তাই পাই, তিনি আমাকে যা করেন, তাই হই, অকপট চিত্তে এই বিনয়কে ধারণ করা ভক্তির প্রথম স্ফূরণ, তাঁহাকে জানা আমার জ্ঞানের সার্থকতা, তাঁকে পাওয়া আমার প্রেমের সার্থকতা, তাঁহার আদেশের অধীন হওয়া আমায় শক্তির সার্থকতা, এই অনুভবঃ ভক্তির দ্বিতীয় স্ফূরণ; জ্ঞানে, প্রেমে, আনন্দে তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া তাঁহার প্রেমে আত্মসমর্পণ করা ও তাঁহার আদেশের বশবর্ত্তী হওয়া ভক্তির তৃতীয় স্ফূরণ।

ভক্তিই সেই উৎস, যাহা হইতে সকল সাধুতা উৎসারিত হয়। ভক্তি শক্তিরূপে হৃদয়ে বাস করিয়া পুণ্যকর্ম্ম উৎপন্ন করে, আলোকরূপে চক্ষে প্রবেশ করিয়া অধ্যাত্ম দর্শনে সমর্থ করে ও মানব-প্রেমকে উদ্দীপ্ত করিয়া নরসেবাতে নিযুক্ত করে। ভক্তি জীবনের অন্তরালবর্ত্তী সেই পরম পুরুষকে কাছে আনিয়া দেয় ও তাঁহার সহিত একীভূত করে।"

যথেষ্ট হইয়াছে—আর উদ্ধৃতির প্রয়োজন দেখি না। সকল স্থলেই একই প্রেম ও ভক্তির কথা। তিনি প্রেম সাধনে জীবন আরম্ভ করিয়া, অচলা ভক্তি মার্গে উঠিয়া

যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, এ কথায় কাহারও কোন সংশয় থাকা উচিত নয়। তাঁহার প্রতি লেখায় তাঁহার এই প্রেমের স্ফূর্ত্তির কথা। প্রেমময় জীবনের আরম্ভ প্রেমে, পরিব্যাপ্তি প্রেমে, পরিণতি প্রেমে—শেষে অচলা ভক্তিতে নির্ব্বাণ মুক্তি। জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে।

প্রেম সাধন যাঁহার জীবনের আরম্ভ, সেখানে পশু ও পক্ষী, বালক ও বালিকা, ভগ্নী ও আত্মীয়া,পিতা ও মাতা ধরিয়া আরম্ভ; শেষে পত্নী, শেষে পুত্রকন্যা, শেষে দেশ, শেষে সমাজ, শেষে নরনারী, শেষে পৃথিবীব্যাপী তন্ময়তা। প্রথম দর্শন ঘটে, তারপর পটে, তারপর আকাশে, তারপর অন্তরীক্ষে, তারপর দ্যুলোক ভূলোকে, তারপর ব্রহ্মাণ্ডে। এইরূপে ক্রম ধরিয়া শিবনাথ আজীবন অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি মহৎ-আশ্রমের দ্বিতল গৃহের দক্ষিণ কুটীরে থাকার সময় একদিন তাঁহার পিতাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন,"শিব আগে ছিলেন কালীর পদতলে, এখন মাথার উপর উঠিয়াছেন।" বাস্তবিকও তাই। সাধনার মার্গ অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে অগ্রে সকলের পদতলে ছিলেন—শেষে অচ্যুত ভক্তি লাভ করিয়া মহামায়াকে জয় করিয়া তাঁহার শিরোভূষণ হইয়াছিলেন। সুতরাং শিবনাথের জীবন ধারণ সার্থক হইয়াছে।

তাঁহার সংক্ষিপ্ত কার্য্যাবলীর মধ্যে কি সাহিত্যসেবা, কি সমাজ-সংস্কার, কি রাজনীতির সেবা, কি ধর্ম্মপ্রচার, কি মহিলাদের উন্নতি—কিছুই বাদ যায় নাই। একাধারে তিনি সাহিত্যিক, কবি, জীবনচরিত, উপন্যাস ও প্রবন্ধরচক, সমাজসংস্কারক, রাজনীতিজ্ঞ, প্রচারক, অবলাবন্ধব। এ সকলের মূলেই আমরা প্রেমের পরিচয় পাই। মাতৃসেবা ভিন্ন জগতের উন্নতি নাই, মাদিগকে ভাল না করিলে দেশের কল্যাণ নাই,এজন্য আজীবন মহিলাদের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন। ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত না হইলে দেশের উন্নতি নাই, তাই সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াছেন। পরাধীনতা না গেলে জাতির রক্ষা নাই, তাই রাজনীতির চর্চ্চা করিষাছেন। আর ধর্ম্মই ভারতের একমাত্র ধন যদ্দ্বারা ভারত রক্ষা পাইবে, এই বিশ্বাসে তিনি প্রচারক। সমাজের উন্নতি ভিন্ন দেশের রক্ষা নাই,তাই সমাজ-সংস্কারক। তাঁহার জীবন খানিকে ভাগ ভাগ করিয়া দেখিলে কখনও তিনি সাহিত্যিক, কখনও সমাজ-সংস্কারক, কখনও রাজনীতিজ্ঞ, কখনও ধর্ম্মপ্রচারক। তাঁহাব সকল কাজের মূলেই প্রেমের স্ফুরণ, প্রেমের অভিব্যক্তি। কি অদম্য ভালবাসা লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সময়ে সময়ে ভাবিয়া অবাক হইয়া যাই। তাহা গভীর হইতেও গভীর, তাহা অনন্যসাধারণ, অননুমেয়, অননুকরণীয়। তিনি এদেশের মহাপ্রেমিক সন্তান।

লোকেরা বলাবলি করিয়া বলে, প্রবন্ধের প্রারম্ভে যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে. তাঁহাদের সহিত তদীয় জীবনের তুলনা হয় কি? একা রামমোহন রায় ভিন্ন এদেশের কোন্ সাধক একাধারে রাজনীতিজ্ঞ, সমাজসংস্কারক, ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং সাহিত্যক? রামমোহন বাদে—একাধারে এরূপ শক্তি, এ যুগে আর কোথাও দেখা হায় নাই। মহর্ষি বিশ্বাসে অটল, কিন্তু তিনি সাহিত্যিক বা রাজনীতিজ্ঞ নহেন; কেশবচন্দ্র সমাজসংস্কারক, ভক্ত, কিন্তু রাজনীতিজ্ঞ বা সাহিত্যিক নহেন। তাঁহাদের বক্তৃতায় সাহিত্য ফুটিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য তাদৃশ অবসর

পান নাই। আর সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, মনোমোহন, দুর্গামোহন প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞ, কিন্তু ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন নাই। হরিশ্চন্দ্র, রামগোপাল ও কৃষ্ণদাস রাজনীতির চর্চ্চা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন, সমাজ-সংস্কার বা ধর্ম্ম চর্চ্চা করেন নাই। এই রূপ সকলের জীবন এক এক বিভাগে শ্রেষ্ঠ। দয়ার অবতার বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারক ও সাহিত্যিক, কিন্তু রাজনীতিজ্ঞ বা ধর্ম্মপ্রচারক নহেন। হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্যিক, কিন্তু রাজনীতিজ্ঞ বা প্রচারক নহেন। বিজয়কৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ ভক্ত ও প্রেমিক, কিন্তু সাহিত্যিক বা রাজনীতিজ্ঞ নহেন। শাস্ত্রী মহাশয় একাধারে সকলের বিশেষত্বকে আত্মস্থ করিয়া যে উপাদেয় জীবন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা কেবল তিনিই। তিনি জ্ঞানী পণ্ডিত, কিন্তু জ্ঞানে তাঁহাপেক্ষা আরো মহৎ ব্যক্তি এদেশে আছেন; তিনি সাহিত্যিক কিন্তু সাহিত্যে তাঁহাপেক্ষা অনেক বড় লোক এদেশে জন্মিয়াছিলেন। তিনি সমাজ-সংস্কারক, তাহাতেও বিদ্যাসাগরের সহিত তাঁহার তুলনা চলে না, তিনি ধর্ম্মসংস্কারক, তাহাতেও মহর্ষি বা কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার তুলনা চলে না। তিনি সাহিত্যক, কবি, তাহাতেও বঙ্কিমচন্দ্র বা হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার তুলনা চলেনা। তিনি একাধারে সকলের বিশেষত্বকে আত্মস্থ করিয়াছিলেন, তাহা যখন ভাবি, তাঁহাকে জমাট বিশেষত্বের সুন্দর মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। তিনি একাধারে সকলের বিশেষত্বে সকলের শ্রেষ্ঠ; তবে একথা অবশ্যই বলিব, তিনি রামমোহনের নিম্নস্তরের লোক। প্রতিভায় যদি তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইতেন, তবে সকল বিষয়েই সকলকে পরাস্থ করিতে পারিতেন। আমরা ঐক সময়ে বড় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলাম, শাস্ত্রী মহাশয় যদি কেবল কাব্যের সাধনা করিতেন, কবিতা লেখায় সকলকে পরাস্থ করিতে পারিতেন। যদি কেবল প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহাতেই সকলকে জয় করিতে পারিতেন। যদি কেবল উপন্যাস লিখিতেন, তাহাতেই সকলকে পরাজয় করিতে পারিতেন। যদি কেবল জীবনী লিখিতেন, তাহাতেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতেন। যদি কেবল রাজনীতির চর্চ্চা করিতেন, সকলকে জয় করিতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ—একাধারে সকলের বিশেষত্ব-ভূষিত মানব-দেবতা রূপে তাঁহাকে সৃজন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, তাহাই করিয়াছেন। শিবনাথ সকলের বিশেষত্ব-ভূষিত অনুগঙ্গ প্রদেশের অমর মানব-দেবতা বা অচ্যুত পিতৃমূর্ত্তি।

পিতার অর্থ—"পঞ্চপিতৃতুল্য গুরু—যথা অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা। জনিতা চোপনেতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ।" অন্যত্র সপ্ত পিতৃতুল্য গুরু যথা—"কন্যাদাতা-ন্নদাতাচ জ্ঞানদাতা ভয়প্রদঃ। "জন্মদো মন্ত্রদো জ্যেষ্ঠভ্রাতাচ পিতরঃ স্মৃতাঃ॥"

অচ্যুত শব্দের অর্থ—"বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার রত্নাকর ভট্টের মতে সৃষ্ট বস্তুর সহিত যাহার সংহার হয় না।" শাস্ত্রী যে অচ্যুত পিতৃপদ লাভ করিয়াছেন—বোধ হয় সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। তিনি সমাজ-সংস্কারে গুরু, তিনি সাহিত্যে গুরু, তিনি রাজনীতিতে গুরু, কিন্তু শিক্ষায় দীক্ষায় গুরু, তিনি প্রেমভক্তিতে গুরু। আজ অচ্যুত গুরুদেবকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি।

ভাবিতেছিলাম, তিনি কি আদেশ মানিতেন না? মানিতেন বই কি? আত্মচরিতের ১৫২ পৃষ্ঠা দেখ—"প্রার্থনাতে বারম্বার বলিতে লাগি-

লাম—"তুমি আমাকে লইয়া যাহা হয় কর।" কি আশ্চর্য্য, কিছুদিনের মধ্যে হৃদয়ে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। এত যে ভয় বিভীষিকা, কোথায় যেন পলাইয়া গেল। আমার মনে অভুতপূর্ব্ব বল ও উৎসাহ আসিল? উঠিতে, বসিতে, শুইতে, জাগিতে, কি এক অপূর্ব্ব আশ্বাসবাণী শুনিতে পাইলাম। কেবল বলিতে লাগিলেন—"তোমার কাজ আছে, তোমাকে চাই, তুমি আমার হইয়া চল।"

২৩৯ পৃষ্ঠা খোল—"জীবনের প্রধান প্রধান সঙ্কটে ব্যাকুল প্রার্থনা আমার জন্য আলোক আনয়ন করে, আমি ঈশ্বরের বাণী শুনি। একদিন বড় ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিতে বসিলাম। সে প্রার্থনার মর্ম্ম এই—"নিষিদ্ধ প্রণয়ে আসক্তা নারী যেমন তাহার প্রেমাস্পদের জন্য পিতা মাতা গৃহ পরিবার আত্মীয় স্বজন সকল ছাড়িয়া আপনার অলঙ্কারের বাক্সটি সঙ্গে লয়, এমন কি, আবশ্যক হইলে তাহাও পথে ফেলিয়া চলিয়া যায়, তেমনি আমি সকল ছাড়িয়া যেটী ধরিয়া আছি, হে ভগবান্, আবশ্যক হইলে সেটীও ছাড়াইয়া আমাকে লইয়া যাও।" এই প্রার্থনার পর "ছাড় ছাড়" বাণী আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। বন্ধুগণের অনেকে নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি যে আর বিলম্ব করিতে পারি না। একটী দিন যায়, যেন একবৎসর যায়। অক্টোবর শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে এক বৎসরের বোনাস (Bonus) স্বরূপ স্কুলফণ্ড হইতে অনেক গুলি টাকা পাইতে পারিতাম। শিক্ষক বন্ধুগণ সে জন্য বারম্বার অপেক্ষা করিতে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্তরের বাণী অপেক্ষা করিতে দিল না। ১৫ই ফেব্রুয়ারি শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারের হস্তে পদত্যাগ-পত্র দিলাম। ১লা মার্চ্চ হইতে স্বাধীন হইয়া এই আন্দোলনে ডুবিলাম।

১০৪ ও ১০৫ পৃষ্ঠা দেখ—"আমি মনে সংকল্প করিলাম, "কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা, নির্ভয় করিব তাহা, যায় যাক্ থাকে থাক্ ধন মান প্রাণ রে।' আমি ধর্ম্মের আদেশ ও হৃদয়বাণী ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে চলিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।"

১২৩ পৃষ্ঠা দেখ—"ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা দ্বারা আমার হৃদয় পরিবর্ত্তন ঘটিলে, আমার প্রাণে এক নূতন সংগ্রাম জাগিয়াছিল। সকল বিষয়ে আপনাকে ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত করিবার জন্য দুরন্ত প্রতিজ্ঞা জন্মিয়াছিল। ইহার ফল জীবনের সকল দিকেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। ১৮৬৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলাম। তৎপরে সেই প্রতিজ্ঞা ও সেই দৃঢ়ব্রত রহিয়া গেল। এই সময়ে আমি প্রথমে মাংসাহার পরিত্যাগ করি, প্রাণীহত্যা নিবারণের ইচ্ছায় নয়, কিন্তু মাংসের প্রতি আসক্তি ছিল বলিয়া।"

আবার ১১৯ ও ১২৫ পৃষ্ঠা দেখ—"আমার যতদূর স্মরণ হয়, তখন আমার মনের ভাব এই প্রকার ছিল যে, আমার ধর্ম্ম বুদ্ধিতে থাকিয়া ঈশ্বর যে পথ দেখাইবেন, তাহাতে চলিতে হইবে, ক্ষতি লাভ যাহা হয় হউক। সকল বিষয়ে ও সকল কার্য্যে ঈশ্বরচরণে প্রার্থনা করিতাম, এবং যাহা একবার কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, তাহাতে দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞার সহিত দণ্ডায়মান হইতাম, ফলাফল ও জীবন মরণ বিচার করিতাম না। "ঈশ্বর রাখ, এই বিপদে রাখ" বলিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্ধারিত হইল।"

আর প্রয়োজন-বাহুল্য। এই শেষ আলোক পাইলেন বন্ধু যোগেন্দ্রনাথের সাহায্য করা উপলক্ষে। এই আদেশের ফলে এবং পরীক্ষায় সর্ব্বসমেত ৫৯৲ স্কলারসিপ পাইয়াছিলেন। * ঈশ্বরের আদেশ বা বাণী পাইয়া বীরের ন্যায় প্রেমের পথে অগ্রসর হইলেন। প্রেমিকদিগের চক্ষু লজ্জা খুব বেশী, কিন্তু শাস্ত্রীর সে চক্ষু লজ্জা ছিল না, তিনি মানুষকে ভাল-

* আত্মচরিত ১২৮ পৃষ্ঠা।

বাসিতেন, মানুষের উপকার করিতেন, কিন্তু কথনও পবিত্রতাকে থর্ব্ব হইতে দিতেন না। এই জন্য—তাঁহার গুরু কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহের পর ভিন্নদলে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি পবিত্রতা-বাদী ছিলেন; কিন্তু পাপীকে সর্ব্বদা ক্ষমা করিতেন। তিনি দুর্জ্জয় প্রেমের শক্তিতে পাপীকেও ফিরাইতে পারিতেন। কিন্তু পিতৃ মাতৃ শাসনের কথা ভুলিতে পারেন নাই। অন্যায় কার্য্য করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে ত্রাস উপস্থিত হইত। তিনি সর্ব্বগুণের আধার হইয়াও সময় সময় ক্রোধের বশীভূত হইতেন, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই ক্ষমার অপরিসীম শক্তিবলে প্রকৃতিস্থ হইতেন। তিনি লিখিতেন প্রাণের ভাষায়, উপাসনা করিতেন প্রাণের ভাষায়, বক্তৃতা করিতেন প্রাণের ভাষায়। তাঁহাপেক্ষা কেশবচন্দ্র ও প্রতাপ-চন্দ্র ভাল উপাসনা আরাধনা করিতে পারিতেন, কিন্তু শাস্ত্রীর প্রাণের ভাষা শুনিলেই প্রাণকে স্পর্শ করিত। তাঁহাপেক্ষা ভাল বক্তৃতা অনেকে হয়ত করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় প্রাণস্পর্শী ভাষা যেথানে সেথানে শুনি নাই। তাঁহার কবিতাপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় অনেক ভাল কবিতা হইয়াছে ও হইবে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় প্রাণস্পর্শী সরল ভাসা বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। আর্ট তত সুন্দর নহে, প্রয়োগ তত মনোরম নহে, অথচ এরূপ সরল, প্রাঞ্জল, মধুময় ভাব অন্যের কবিতায় বড় পাওয়া যায় না। তিনি কিছু করিবার ও বলিবার সময় প্রাণ ঢালিয়া দিয়া করিতেন এবং বলিতেন। এই প্রাণ-ঢালা গুণ কেবল প্রেমিকেই মিলে—তাঁহার প্রেমমাখা, হৃদয়-ঢালা গাথা ও লেখা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, তৎসহ পবিত্র হয়। মানুষকে উঠাইতে এবং বসাইতে, তুলিতে এবং জাগাইতে এদেশে শাস্ত্রীর ন্যায় আর কেহ পারিয়াছেন কি না, জানি না। এই সব গুণই তিনি প্রেমের হাটে, ভালবাসার বাটে উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী প্রেমমন্ত্রে তিনি সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহধর্ম্ম ও আত্মচরিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এই আত্মচরিতে কেশবচন্দ্রের প্রতি যে ভক্তির অঞ্জলি দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। সেই কেশবচন্দ্রের প্রতি স্থানান্তরে ও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে কিরূপে তিনি কটূক্তি বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। বোধ হয়, তাহা প্রতিকূল মুহূর্ত্তের জল্পনার ফল। তাহা যেন চাঁদের কলঙ্ক। আত্মচরিতে প্রতাপ চন্দ্রের প্রতি যে কটূক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তদীয় জীবনালোচনায় তাহারও সমীকরণ করিতে পারি নাই। সেজন্য বড়ই কষ্ট পাই-য়াছি। প্রেমের ভাষা এই সকল অপেক্ষা মলায়েম ও কোমল হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যে হাতে নির্ব্বাসিতের বিলাপ, রামতনু লাহিড়ীর জীবনী বাহির হইয়াছে, ঐ সকল সেই হাতের কাজ কিনা, সময়ে সময়ে ভাবিয়াছি। তিনি নববিধানকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কিন্তু নববিধান তাঁহার জীবনে বিশেষ ভাবে ফুটিয়া-ছিল। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য, পশ্চিম এবং পূর্ব্ব, প্রাচীন এবং নবীন—জ্ঞানী এবং মূর্খ, রাজ-নীতি এবং ধর্ম্মনীতি, সমাজ-সংস্কার এবং সাহিত্য-চর্চ্চা—সব এক সমন্বয়-ক্ষেত্রে মিলিয়া-ছিল। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সে মিলন-স্থান শাস্ত্রীর জীবন। প্রেম এবং পুণ্য, কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম—একাসন পাইয়াছিল তদীয় জীবনে। ইহাই ত সমন্বয়। এই সমন্বয়কেই কেশবচন্দ্র নববিধান নাম দিয়াছেন। নামের বাহুল্য আমরা ভালবাসি না, কিন্তু দ্বৈতবাদের রাজ্যে ঈশ্বরকে মানিতে হইলেই ব্যক্তিগত বিধানকে মানিতে হইবে। বিধান প্রাণময়, জীবনময়। জগন্ময়—তাহাকে উপেক্ষা এবং পরিহার করিলে ধর্ম্ম টিকে না। তিনি নিশ্চয়ই ধর্ম্মের অমোঘ শক্তি বিধানকে মানিতেন। তবে কেন যে নববিধানকে অগ্রাহ্য করিলেন, তাহা আমরা জানি না। সে প্রহেলিকা আমরা পূরণ করিতে পারি নাই। তাঁহার ন্যায় প্রেমিকের নিকট ব্যক্তিগত বিদ্বেষ স্থান পাইবে, কথনও সম্ভব নয়। তবে কেন এরূপ হইল? তাহার উত্তর ত্রিকালজ্ঞ বিধাতা দিন। যে দ'লোভাব কত কত যোগী ঋষির ধর্ম্মনাশের কারণ, তাহা কি তাঁহাতে থাকা সম্ভব? প্রেমের স্বভাবই এই—তাহা বড় ছোট, পাপী পুণ্যাত্মা সকলকে সমান করিয়া দেথায়। তিনি সে রাজ্যে পৌঁছিয়াছিলেন, আমরা জানি। তবে কেন এরূপ হইল, বিধাতা উত্তর দিন। চাঁদেও

কলঙ্ক আছে, ফুলেও কণ্টক থাকে, প্রেমেও পাপ স্পর্শে। কিসে কি হইয়াছিল, শুধু তাহা বিধাতাই জানেন। তিনি এ প্রশ্নের সমীকরণ করুন।

আর একটা কথা। বাঙ্গালী (১৪ই আশ্বিন ১৩২৬) লিখিয়াছেন যে, "তিনি ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্যের একজন স্থষ্টিকর্ত্তা।" এই মন্তব্যে তাঁহাকে খাটো করা হইয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজের সাহিত্য বলিয়া এদেশে কোন পৃথক্ সাহিত্য নাই। রামমোহন ও তত্ত্ববোধিনী হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত, সাহিত্যের স্থষ্টিকর্ত্তা, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, প্যারীচাঁদ, মহর্ষি, কেশবচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র সেন, গোরা গোবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, কামিনী, ক্ষীরোদচন্দ্র, চণ্ডীচরণদ্বয়, আনন্দচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, শিবনাথ প্রভৃতিকে বাদ দিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের আর কি থাকে? "বঙ্কিমচন্দ্র ও ব্রাহ্মধর্ম্ম" নামক বহু প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছিলাম, "ধর্ম্মতত্ত্বে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মই প্রচার করিয়াছেন।" তিনি সেই সকল প্রমাণ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে তিনি পৃথক মনে করেন না। ঐ সকল ব্যক্তিগণের লেখা বাদ দিলে এদেশে বাঙ্গালা সাহিত্যের অবশিষ্ট কি থাকে? বাঙ্গালা সাহিত্যই ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্য—তাহার উৎকর্ষ সাধনের জন্যই সকলে চেষ্টা করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রবর্ত্তক। তাঁহার মেজবৌ, নয়নতারা, যুগান্তর তরল সাহিত্যের পরিপোষক হইলেও, তাঁহার গৃহধর্ম্ম, হিমাদ্রি-কুসুম, পুষ্পমালা, নির্ব্বাসিতের বিলাপ, প্রবন্ধাবলি, ধর্ম্মজীবন, রামতনু লাহিড়ীর জীবনী বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করি-য়াছে। তাঁহার দার্শনিক উপদেশে ৺ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি আচার্য্যগণ নবজীবন পাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পি, কে রায় মহাশয়ের প্রবর্ত্তনায়, তিনি, ঈশ্বরের স্বরূপ-সাধনে অসিদ্ধ আচার্য্য-বহুল সমাজের দায়িত্বপূর্ণ আচার্য্য পদ গ্রহণ করিয়া, যে অধ্যাত্ম-রাজ্যের গভীরতার সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। তাঁহার ভাষা-জ্ঞান অসাধারণ, রুচি মার্জ্জিত, লিপি-কৌশল মাধুর্য্যপূর্ণ ছিল। তাঁহাকে এক কোণে যিনি বা যাঁহারা ঠেলিয়া ফেলিবেন, তিনি বা তাঁহারা সত্যের অপলাপ করিবেন। কিন্তু এস্থলে ইহাও সত্যের খাতিরে লিপিবদ্ধ করা কর্ত্তব্য যে, তিনি ইংরাজিতে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস লিখিয়া ভাল করেন নাই। তিনি এক বিভাগের নেতা, কিরূপে নিজের কথা নিজে লিখিবেন? তাহা লেখা অসম্ভব। তিনি সমদর্শীর সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু এই ইতিহাস প্রণয়নে সমদর্শিতার অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই কাজে তাঁহার গভীর গবেষণা ও নিরপেক্ষ-তার অভাব দর্শনে আমরা মর্ম্মে মরিয়া গিয়াছি। দ'লো ভাব-অন্ধতা তাঁহাকে আচ্ছন্ন না করিলে এরূপ হইত কিনা, সন্দেহ। তাঁহার ন্যায় মনীষী ব্যক্তিকে আমরা সর্ব্বদাই নিষ্কলঙ্ক দেখিতে চাই। তাহার কিছু অভাব দেখিয়া আমরা যে কি ক্লেশ পাইয়াছি, বিধা-তাই জানেন। তিনি অনেকের প্রাপ্য অনেক কথাই বাদ দিয়াছেন এবং অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা ও তীব্রোক্তি প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় পুণ্যোজ্জ্বল ব্যক্তির পক্ষে ইহা বড়ই অশো-ভন-চিত্র। হায়, তিনি যদি এই মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন, তবে কত সুন্দর হইত।

শাস্ত্রী মহাশয়ের যদি কিছু বিশেষত্ব থাকে, তবে তাহা তাঁহার সরলতা এবং নিরহঙ্কার ভাব। এরূপ সরলতা ও অহমিকা-শূন্য জীবন আর দ্বিতীয় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি কামনা জয়, রিপু জয়, সাংসারিকতা জয় করিয়া নির্লিপ্ত ও অনাসক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায় বুঝা যাইত না, কত বড় লোকের সহিত কথা বলিতেছি। কথা বলিবার সময় সমস্ত হৃদয় প্রাণ ঢালিয়া কথা বলিতেন। কিন্তু তাঁহাতে বড়ত্বের ভাব থাকিত না। রাখিয়া, ঢাকিয়া কোন কথা তিনি বলিতে জানিতেন না। গভীর প্রেমে দীক্ষা না হইলে, সর্ব্বঘটে বিধাতার সন্দর্শন লাভ না হইলে এরূপ হইতে পারে না। তিনি নিজেকে সব সময়েই "অধম" বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন এবং এমারসনের ন্যায় বুঝিবা মনে করিতেন, যাঁহাকে বিধাতা সম্মুখে আনয়ন করেন, তিনিই কোন বিষয়ে গুরু। এরূপ উদার সরল ব্যবহার বড় কোথাও দেখা যায় না। তিনি উদারতা এবং সরলতার অবতার ছিলেন।

আর পবিত্রতা? তিনি পবিত্র হইতেও পবিত্র ছিলেন। তাঁহার তপস্যার ফলে অমূল্য চরিত্র লাভ হইয়াছিল। তাঁহার কথা-বার্ত্তায়, ব্যবহার-আপ্যায়নে তাঁহারই পরিচয় পাওয়া যাইত। তাহা দেখিয়া পরমহংস রামকৃষ্ণ মোহিত হইতেন, সাধু বিজয়কৃষ্ণ তন্ময় হইতেন, বিদ্যাসাগর এবং প্যারীচরণ অবাক্ হইতেন।

তিনি আজীবন কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন যে, বিষয়-বাসনা তাঁহার যেন না থাকে। সাধনার পথে চলিতে চলিতে তিনি অক্ষয় অচ্যুত শান্তি-রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। আত্মচরিতের উপসংহার এইরূপ—

"রোগ-শয্যাতে পড়িয়া অনেক আধ্যাত্মিক চিন্তা করিবার সময় পাইয়াছি। নবশক্তির সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভাব মনে আসিয়াছে। অবশিষ্ট যে কয়েক বৎসর জগতে থাকি, নূতন ভাবে কাটাইব মনে করিতেছি। ঈশ্বর এই শুভ সংকল্পের সহায় হউন।"

১৩২৫ সালে এই আত্মচরিত প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১২ই অক্টোবর (১৯১৯) ইণ্ডিয়ান্ মেসেঞ্জারে লিখিয়াছেন—"While it was still in the Press the Pandit one morning, on his way back home from the Sadhanasram, seeing me sitted in my office, entered it and asked me what I thought of the autobiography—"রামানন্দ আত্মচরিত কেমন লাগল।" I replied "আমি পড়ে খুব উপকৃত হয়েছি"। On hearing this, he was greatly moved and tears rolled down his cheeks as he said, "এই অধমের জীবনচরিত পড়ে তোমার উপকার হল" ইহাতে কিছু আত্ম-প্রশংসা প্রশ্রয় পাইয়াছে বটে, কিন্তু ধরিয়া লইতেছি যে, ইহাই তাঁহার চরম পাকা লেখা। কোন কোন বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, এই পুস্তক না দেখাইয়া ছাপানে শাস্ত্রী মহাশয় বিরক্ত হইয়াছেন, তাহাতে একটু বিরুদ্ধ ভাব হইয়াছিল। এবার বুঝিলাম, ইহাই পাকা লেখা। যিনি উপরোক্ত কথা কয়েকটী লিখিতে পারেন, নবসঙ্কল্পের বিশুদ্ধ মার্গে তিনি অধিরোহণ করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, তাহা সাম্প্রদায়িকতার অনেক উপরে। তাঁহার সম্বন্ধে হিন্দু সমাজের মহাজনেরা, তাঁহার জীবনের সকল গুহ্য কথা না জানিয়াও, সে সকল অমূল্য কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অসাম্প্রদায়িক লোকের প্রতিই প্রযুজ্য। তিনি তপস্যা করিতে করিতে, প্রেমের পথ ধরিয়া, ভক্তি মার্গে এবং তাহা হইতে ধর্ম্ম অর্থ, কাম মোক্ষ, জীবন মরণ, সকলের উপরে আরোহণ করিয়াছিনেন। তাঁহার বদন সুন্দর হইতেও সুন্দরতম হইয়াছিল; অতুল শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য ভাবের ঔজ্জ্বল্যে তিনি ভূষিত হইয়াছিলেন। সে মূর্ত্তি দেবতাদিগেরও বাঞ্ছনীয়, যোগী ঋষি কোন্ ছার। তদীয় নিরুপম নিষ্কলঙ্ক বদনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, শুধু কেবল ভাগবতী ভাব। তিনি সংসারের ত্রিসীমার অতীত হইয়াছিলেন, অথবা অক্ষয় পুণ্যময় পিতৃধামে স্থান পাইয়াছিলেন।

এরূপ নিষ্কাম মহাযোগীকে দেখিতে লোকেরা যাইত না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। এজন্য তিনি কোন বন্ধুর নিকট আক্ষেপ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর অনেকে গিয়াছিলেন, মৃত্যুর পরও অনেকে শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। কিন্তু তাঁহার প্রাপ্য যোগ্য সম্মান জীবিতকালে পাইয়া গিয়াছেন কিনা, সন্দেহের বিষয়। সাধু রামকৃষ্ণ ও বিজয় কৃষ্ণের মৃত্যু দিনে কত সাধু ভক্তের মহামিলন হয়, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের দুর্ভাগ্য, ব্রাহ্মসমাজের বিদেশী প্রাচীন সকল সাধুভক্ত তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধে সম্মিলিত হন নাই। ম্যাট্‌সিনি গ্যারিলডীর মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া মাত্র ইতালীর সকল কাজ বন্ধ হইয়াছিল,—থিয়েটার পর্য্যন্ত অভিনয় করিতে করিতে বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু শাস্ত্রীর মৃত্যু দিনেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন সভ্য বরযাত্রী হইয়া কোন ব্রাহ্ম-বিবাহে যোগ দিয়াছিলেন, এবং যিনি আচার্য্য হইয়াছিলেন, তিনিই শ্মশানেও প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পরন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, তিনিই দুই শ্রাদ্ধের দিনে উপাসনার ভার পাইয়াছিলেন! যিনি কাঙ্গাল দরিদ্রের মা বাপ ছিলেন, তাঁহার শ্রাদ্ধে কাঙ্গালী ভোজনে ১২৫ জনের অধিক লোক ডাকা হয় নাই। সাধারণ ব্রহ্মসমাজের তহবিল হইতে

এতোপলক্ষে কিছুই ব্যয় করা হয় নাই বলিয়া শুনিয়াছি। অন্ত্যেষ্টির ও ব্রাহ্মসমাজ সমূহে টেলিগ্রামের ব্যয়ও গৃহীত চাঁদা হইতে নাকি প্রদত্ত হইয়াছে। সভ্যদের আপত্তির ভয়ে তাহা হয় নাই, কেহ কেহ বলেন, কিন্তু অন্যান্য কাজ করার সময় সভ্যগণের মতামতের দিকে দৃষ্টি রাখা হয় কি? মোট কথা, যে শাস্ত্রী মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্য দেহ পাত করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যাঁহার জন্য এত বড় চাকরী পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছিলেন, তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধ যেন-তেন-প্রকারে সম্পন্ন হইয়াছে,ইহাতে আমরা যারপর নাই দুঃখিত। কখনও কখনও তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছিলেন এবং জন্ম তারিখে সম্মানিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার যোগ্য তেমন কিছুই হয় নাই বলিয়া আমাদের ধারণা। শাস্ত্রী মহাশয় গবর্ণমেণ্টের চাকরী ধরিয়া থাকিলে কালে কত বড় কাজ পাইতেন। তিনি কখনও গুরুগিরি করেন নাই, কখনও চাকরীর মায়া বা অর্থের আকর্ষণ হৃদয়ে রাখেন নাই। সমস্ত সেকালের "কৃষার্পণের ন্যায়" ভগবানে অর্পণ করিয়া ফকীরি লইয়াছিলেন। পুত্র কন্যাদের জন্য উল্লেখ-যোগ্য কিছুই রাখিয়া যান নাই। ধর্ম্ম সাধনায় কখনও কোন বুজরুকি অবলম্বন করেন নাই, কখনও গৈরিকধারী হন নাই, কখনও জটা, তিলক বা মাল্য গ্রহণ করেন নাই। সাধনায় সরল সোজা পথ, কর্ম্মে সরল সোজা পথ, লেখায় সরল সোজা পথ অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছেন। তিনি রসিক পুরুষ ছিলেন, তাঁহার রসিকতার কথা মনে হইলে এই নিদারুণ শোকের দিনেও হাস্য সম্বরণ করা যায় না। কিন্তু তাঁহার রসিকতা প্রেম ও পবিত্রতা-মূলক ছিল। তিনি হামবড় ভাব বা অসূয়া হৃদয়ে কখনও পোষণ করেন নাই, প্রশংসার জন্য কাঙ্গাল হন নাই, দীনভাবে, কাঙ্গালের বেশে সকলের পশ্চাতে পশ্চাতে থাকিয়াই কাজ করিতেন। এরূপ নিষ্কাম, নির্লোভী, নিঃসঙ্গ, নির্ভরশীল, বাসনারহিত, ভাবনাবর্জ্জিত ব্যক্তি এ যুগে আমরা আর দেখি নাই বলিয়া মনে হয়। তিনি সাধনাবলে অতুল চরিত্র, দেবদুর্লভ অচ্যুত পদলাভ করিয়া দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইলে দেহ মন পবিত্র হয়, আত্মা শুদ্ধ, জীবন ধন্য হয়। শিবনাথ শুধু জ্ঞানে নয়, শুধু প্রেমে নয়, শুধু ভক্তিতে নয়, শুধু পবিত্রতায় নয়, শুধু কর্ম্মে নয়, শুধু ধর্ম্মে নয়—সর্ব্বসমন্বয়ে এ দেশের মহামহিমান্বিত চিহ্নিত বিশেষ ব্যক্তি—যাহার তুলনা কুত্রাপি মিলে না। সদা প্রফুল্ল, সদা রসিক, সদা নির্ভীক, সদা নিরহঙ্কার, সদা নির্লিপ্ত, সদা পিতৃমাতৃভক্ত, সদা অনাসক্ত, সদা দয়ালু, সদা শান্ত,সদা সংযত, সদা কষ্টসহিষ্ণু, সদা উদার, সদা অসূয়াশূন্য, সদা সদ্ভাবপূর্ণ, এরূপ লোক আমরা আর দেখি নাই। তিনি অবতার নহেন, তিনি গুরু নহেন, তিনি নেতা নহেন, তিনি ধনী নহেন, তিনি রাজ্যেশ্বর নহেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বগুণ-সংমিশ্রণে এমন এক ব্যক্তি, যাঁহার যোগ্য দ্বিতীয় ব্যক্তি এদেশে আছে কিনা, তাহা জানি না। আমরা এহেন ব্যক্তির সংস্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। নব্যভারতের আদি যুগে তিনি ইহাতে লিখিতেন বলিয়া নব্যভারত ধন্য হইয়াছে। এই দেশে তিনি পাদচারণা করিয়াছিলেন বলিয়া এদেশ ধন্য হইয়াছে, চাঙ্গরিপোতা তাঁহার জন্মস্থান এবং মজিলপুর তাঁহার স্বগ্রাম বলিয়া ধন্য হইয়াছে, অম্বুগঙ্গ প্রদেশ তাঁহার আবির্ভাবে কৃতার্থ হইয়াছে—আর এই ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার অধিষ্ঠানে কত উন্নত হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। তিনি কত অসহায়ের মা বাপ ছিলেন, কত দুঃখী কাঙ্গালের সর্ব্বস্ব ছিলেন, কত পাপীর সান্ত্বনা ছিলেন,কত গৃহীর পরামর্শ-দাতা ছিলেন। কত কত হৃদয়ে আজ শোকের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, সে অলিখিত ইতিহাস কেহ জানে না, কেহ কখনও লিখিবে না—তাহা কালের অন্তরালে চির-লুক্কায়িত থাকিবে। হরানন্দ বিদ্যাসাগরের বংশের নাম উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হউক—শাস্ত্রীর বংশের গুণসৌরভে ধরা পূর্ণ হউক, এ জগতে তাঁহার তপস্যার ফলে শাস্ত্রীর চিরতৃষিত আত্মা অক্ষয় অনন্তধামে চিরশান্তি লাভ করুক। আজ বল—জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে।

সঙ্কলিকা।

(৪৬)

পার্লেমেণ্ট-কমিটীর সংশোধিত ভারত-সংস্কার বিল পাশ হইয়াছে। দশ বৎসরের জন্য এই আইন হইল। তৎপরে পুনঃ বিবেচিত হইবে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে এই আইন কার্য্যকরী হইবে। নির্ব্বাচনের জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। রাউলেট আইন ও পঞ্জাবের অত্যাচার ঢাকিবার জন্যই যেন শীঘ্র শীঘ্র এই আইন পাশের চেষ্টা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে লর্ড সিংহের এবং মণ্টেগুর নামে জয়-জয়কার হইতেছে। ভারত সম্রাটের ২২শে ডিসেম্বরের ঘোষণা পাঠ করিলে চক্ষে জল পড়ে। আমাদের এত সাধের সুরেন্দ্রনাথ এখন একটা বড় উপাধি পাইলেই হয়—তৎপরে মন্ত্রী হইয়া টাকার গদিতে বসিবেন। কেহ বলেন, ভালই হইয়াছে, কেহ বলেন, কিছুই ভাল হয় নাই। দুই পক্ষেরই যুক্তিতর্ক অনেক আছে। সে সকলের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা, রাজ্য শাসনের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। এই আইনে লাট-দিগেরই ক্ষমা বাড়িবে বলিয়া মনে হয়। তবে, একথা ঠিক, রাউলট বিলের ন্যায় বিল পাশ করা সহজ হইবে না। পরন্তু সকল বিধানই যখন লাটগণ পণ্ড করিয়া দিতে পারিবেন, তখন বেশী আশা নাই। মার্সেল ল জারির কোনই নিষেধ নাই। টাকা ও শস্যের অবাধ রপ্তানি, টেকস্ বৃদ্ধি ও মার্সল ল জারি বন্ধ না হইলে কিছুই হইবে না। নূতন অনুষ্ঠানে খরচ দশগুণ বাড়িয়া যাইবে। তর্ক বিতর্ক, চীৎকার আন্দোলন বহু বাড়িয়া যাইবে। প্রেসের স্বাধীনতা গিয়াছে, অসংখ্য পুস্তক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, অস্ত্র আইন কঠোরতর হইয়াছে, ১৲ টাকার নোট ও নিকেলের আধুলি, সিকি, দুয়ানী, আনী প্রচলিত হইয়াছে;—ভারত কোন্ অন্ধকারের পথে দিন দিন নীত হইতেছে, সহৃদয় ব্যক্তিগত তাহা জানেন। তোমরা বল, আশার আলোক দেখা যাইতেছে, আমরা বলি, আরো নিরাশার আঁধার ঘনাইয়া আসিতেছে।

(৪৭)

এক শ্রেণীর লোক কমিসন-নিয়োগের বড়ই পক্ষপাতী। কিন্তু বল ত, কোন্ কমিসনে ভাল ফল হইয়াছে? হণ্টার কমি-সনেও যাহা হইবে, তাহা বুঝা যাইতেছে। পঞ্জাবে যত অত্যাচার হইয়াছে,নূতন আইনবলে তাহার যখন বিচার হইতে পারিবে না, তখন আর কেন? কমিসন বলিয়া দিবেন—অরাজকতা হইয়াছিল, তাই অত্যাচার হইয়াছে। নচেৎ জেলমুক্ত নেতাদের সাক্ষ্য গৃহীত হইত। যে অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, তারা পড়িলে শীতল রক্তও উষ্ণ হয়। ওডেয়ার, ডেয়ার, জনসন প্রভৃতির অমানুষিক কাজের কোন প্রতিকার হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। কেন না, সেকালের বার্কওপিট নাই যে, ইমপিচমেণ্ট হইবে। কোনরূপে ঐ

কাজগুলির আইন-সিদ্ধতা প্রতিপন্নেরই চেষ্টা হইতেছে এবং হইবে। বিলাতের আন্দোলন থামাইবার ইহাই অমোঘ উপায়। লাট-দিগের ক্ষমতা যতদিন খর্ব্ব না হইবে, ততদিন কোনই আশা নাই। যখন-তখন এইরূপ কাজের আবার অনুষ্ঠান হইতে পারিবে। বন্ধু, তুমি বৃথা আশা করিতেছ!!

(৪৮)

আর ইক্‌জিকিউটিভ কমিটীর কথা? ঐ কথা না তুলিলেই ভাল হয়। এক শঙ্করণ নেয়ার ব্যতীত এ পর্য্যন্ত কোন্ সভ্য গতানুগতিকের পথ পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন? লাটগণ সঙ্কল্পানুসারে চলিবেনই,—তাহার অনুমোদনের জন্য তালপাতার সেপাই দাঁড় করাইয়া কোনলাভ নাই। খোসামুদির বাজারে, পাচাটার দলপুষ্টির আর কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। এই যে এত লোক দুর্ভিক্ষে মরিতেছে, গবর্ণমেণ্টের বিবরণে তাহা দেখিতেছ কি? তাহাতে রপ্তানি বন্ধ হইতেছে কি? এদেশের কত শস্য রপ্তানি হইতেছে, তাহার অনুসন্ধান কর, জানিয়া মর্ম্মাহত হইবে। এবার ক্ষেত্র হইতেই দাদন দিয়া সকল শস্য হস্তগত হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের পোষ্যপুত্র মাড়োয়ারীগণ এ দেশকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ছাড়িবে। এই যে খাদ্যদ্রব্য অগ্নিমূল্য হইতেছে, রপ্তানি বন্ধ না করিলে ইহা আর কমিবে না। কোন্ মন্ত্রী এদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন? সুখ-সেবা যাঁহাদের জীবনের মূলভিত্তি, তাঁহা-দের দ্বারা কিছু হইবে না। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের পোষকতা করিয়াই যাইবেন। দরিদ্রগণ বাঁচিল কি মরিল, সে সংবাদে তাঁহাদের প্রয়োজন কি? যে যায় লঙ্কায়, সে-ই হয় রাক্ষস। কমিটীর সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে কোন আশা নাই। দরিদ্ররক্ষার উপায় যদি ঐ রি-ফরম আইনে না হয়, বৃথা হুজুকে লাভ নাই।

(৪৯)

তাঁহারা বলেন, এত দুর্ম্মূল্যের দিনেও যখন লোক বাঁচিয়া আছে, তখন এ দেশের অবস্থা ভাল। ঘরে ঘরে হাহাকার আর্ত্তনাদ, শোকসন্তাপের ধ্বনি, কিন্তু তাঁহারা সুখসেবায় বিভোর, সে সব তাঁহাদের কর্ণে পৌঁছায় না। গবর্ণমেণ্ট অনাহারের মৃত্যু ঢাকিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করেন। এদেশের কোন কমিটী নাই, যাহারা অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যার গণনা করিতে তৎপর। আসামের কুলির অত্যাচার অপেক্ষা দরিদ্রের নিষ্পেষণ এ দেশে যে আরও বেশী, কেহই সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন না। দরিদ্রদের জন্য একটু সহানুভূতিও নেতাদের মধ্যে নাই। মহা সুষুপ্তিতে সকলে বিভোর। আমরা এবার আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে পুরীতে থাকার সময়ে প্রত্যহই অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ পাইতাম, কিন্তু সরকারী রিপোর্টে তাহার কথা নাই। ধন্য পুরীর পুলিস-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মহাশয়, তিনি যদি দাতাদিগকে ধরিয়া প্রত্যহ ৩০০০ দরিদ্রকে অন্ন দিয়া রক্ষা না করিতেন, পুরীতে সকল মৃতব্যক্তির সংস্কারও হইত না। এই পুরী হইতে কত চাউল যে অন্যত্র রপ্তানি হইয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। ইহারই নাম অবাধ বাণিজ্য! এদেশের মহাজনেরাই এই অবাধ বাণিজ্যের দ্বারা উদরবৃত্তি করিতেছেন, দেশের দিকে একবারও চাহিতেছেন না। আর মাড়োয়ারীগণ? তাঁহারা ত গবর্ণমেণ্টের পোষ্যপুত্র—সকল

পল্লীগ্রাম, নগর, উপনগর গ্রাস করিয়া, সকলকে উচ্ছেদ করিয়া তাঁহারা দিগ্বিজয়ী প্রতাপ বিস্তার করিতেছেন। খটমলকে পূর্ব্বে যে নরশোণিত পান করাইতেন, এখন নিজেরাই তাহা পান করিবেন। এই হতভাগ্য দেশ, তবুও সতর্ক হইবে না! এত দুর্ম্মূল্যতার কারণ শুধু রপ্তানি। যুদ্ধেই রপ্তানি বাড়িয়াছে, যুদ্ধের চুরি চামারিতে কোটী কোটী টাকার জিনিষ গিয়াছে, কেহ বড় মানুষ হইয়াছে, কেহ দরিদ্র হইয়াছে। সর্ব্বনাশ ঘনাইয়া আসিতেছে।

(৫০)

এবার আশ্বিনমাসের ঝড়ে, খুলনা, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি সহরের যে ক্ষতি হইয়াছে, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা অসাধ্য। শুধু ভাওয়ালেতের লক্ষ শালগাছ উন্মূলিত হইয়াছে। ইহাতেই ঝড়ের প্রকোপ বুঝা যায়। কত লোকের যে মৃত্যু হইয়াছে, সঠিক তাহা নিরূপিত হয় নাই। এরূপ ঝড় আর কখনও হয় নাই বলিয়া লোকেরা বলে। এই উপলক্ষে বঙ্গের লাট-মহোদয় সাহায্য-কল্পে যে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এরূপ সহৃদয় লাট এখানে আর আইসে নাই। আমরা যেন রামরাজ্যে বাস করিতেছি। লাট সাহেবের ধারে বসিতে পারেন, ফরিদপুরের সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জে, এন, রায় মহোদয়। তিনি ফরিদপুরের বিপন্ন লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যে সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলেও চক্ষে জলধারা বহে। গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় দারুণ কষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট ও লাট-সাহেবের জয় জয়কার হউক।

(৫১)

শান্তি উৎসবের আলোকের ব্যয় বাঁচাইয়া লাট-বাহাদুর বিপন্নদের বস্ত্রের জন্য ব্যয় করিয়াছেন। এরূপ সহৃদয়তার পরিচয় এদেশে আর দেখা যায় নাই। তবে ইডেন গার্ডেনে সৈন্য-সেবায় মদের স্রোত বহিয়াছিল, তাহাতে আমরা বড়ই দুঃখিত। দেশের চতুর্দ্দিকে হাহাকার, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যুদ্ধের প্রকোপ, পঞ্জাবের দারুণ অত্যাচার, তুর্কী-বণ্টনের প্রবল স্রোত থাকিতে কিসের যে উৎসব, আমরা বুঝি না। আমেরিকা মিত্র-পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইটালীও ইতস্ততঃ করিতেছেন। বলসিভিকদের প্রভাব শনৈঃ শনৈঃ বিস্তৃত হইতেছে, আয়র্লণ্ডে গৃহবিবাদ চলিতেছে, কিসের উৎসব? প্রাণ ভাঙ্গিয়া, মন ভাঙ্গিয়া, শরীর ভাঙ্গিয়া কি উৎসব হয়? যাহা হইতেছে, উহা অশান্তির ভেল্কী। ঠাট বজায় রাখিবার এ আয়োজনে বালকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এসব দেখিলে আমাদের শুধু হাসি পায়। হায় রে হায়!

(৫২)

গৃহ-বর্জ্জিত, আহার-বর্জ্জিত, পরিধেয়-বর্জ্জিত আমরা ত গিয়াছিই,—সব কৃতী লোক চলিয়া যাইতেছেন, আমরাও যাইতে বসিয়াছি। মরণই যেন এদেশের মহাকল্যাণ এবং শান্তির পথ। মিউনিসিপাল টেক্সের জুলুম, ইনকম্ টেক্সের অত্যাচার—চৌকীদারী টেক্সের ভ্রুকুটী, আরো নানা বক্র-টেক্সের অদম্য প্রভাবে আমরা সদা জর্জ্জরিত। যাওয়াই ভাল নয় কি? তবে কেন মডারেট ও ইকসট্রিমিষ্টদের দলাদলি! চল, চল—পাততাড়ি গুটাইয়া এখন বাড়ীর দিকে চল। দেশের ও

আমাদের যাহা হওয়ার, তাহা যথেষ্ট হইয়াছে। আর কেন? পা চাটচাটির মায়া বাড়াইয়া খাঁ কমাইয়া কোন লাভ নাই।

(৫৩)

স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

গত কার্ত্তিক মাসে প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবক, স্বদেশবৎসল, সুপণ্ডিত কর্ম্মবীর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মানব লীলার অবসান করিয়াছেন।

ত্রৈলোক্যনাথের আদিনিবাস ২৪-পরগণা জিলার শ্যামনগরের নিকটস্থ রাহুতা গ্রামে। বাঙ্গালা ১২৫৬ সালে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। বাল্য-কালে ত্রৈলোক্যনাথ অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। গ্রামের স্কুলে বা পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষার আরম্ভ। 'বঙ্গভাষার লেখক' পুস্তকে লিখিত হইয়াছে—"১৮৫৯খ্রী গ্রামের স্কুলটি উঠিয়া যায়। অতঃপর ত্রৈলোক্যনাথ হুগলী চুঁচুড়া ডফ সাহের স্কুলের ৭ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন; ৬০ খ্রী ডবল প্রমোশনপাইয়া ৫ম শ্রেণীতে উন্নীত হন; ৬১ খ্রী কিছুদিনের জন্য ভদ্রেশ্বরের নিকট তেলিনীপাড়া-স্কুলে পড়েন। পুনরায় ঐ ডফ সাহেবের স্কুলে আসিয়া ৩য় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রামে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া হয়। তাহাতে তাঁহার পিতামহীর পরলোক ঘটে; পরে মাতা এবং তৎপরে পিতারও পরলোক প্রাপ্তি হয়। ত্রৈলোক্যনাথ নিজেও প্লীহাজ্বরে আক্রান্ত হন। গ্রামের বহু বালক বালিকা এই রোগ আক্রান্ত হইয়া মারা পড়ে। এই খানেই ত্রৈলোক্যনাথের লেখাপড়া শেষ হইল।"

ইহার পর তিনি কুলীর আড়কাটীর পাল্লায় পড়িয়াছিলেন—অনাহারে—এক বস্ত্রে দিন কাটাইয়াছেন—অতি সামান্য বেতনে চাকরী করিয়া কোনরূপে জীবন যাপন করিয়াছেন। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন "কোন দিন আহার মিলিত, কোন দিন মিলিত না।" ইহার পর তিনি পুলিসে চাকরী করেন। কিন্তু সাহিত্যা-নুরাগ তাঁহার প্রকৃতিগত। তাই তিনি উৎকল-শুভকরীর সম্পাদন ভার লইলেন।

এই সময় ত্রৈলোক্যনাথের সহিত অতর্কিতভাবে স্যর উইলিয়ম হাণ্টারের সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। স্যর উইলিয়ম তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে চাকরী দিলেন—বেতন মাসিক ২৫৲ টাকা। ইহার পর তিনি উত্তর-পশ্চিম কৃষি-বাণিজ্য-বিভাগে চাকরী লইলেন। এই কার্য্যে থাকিয়া তিনি দেশের শিল্পোন্নতির উপায় করেন।

ভারতের শিল্প—বিশেষ শ্রমশিল্প সম্বন্ধে ত্রৈলোক্য বাবুর অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল —'Art Manufactures of India' পুস্তকে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। তিনি ইংরাজি, বাঙ্গালা, উড়িয়া, হিন্দি, পার্শী, উর্দ্দু, সংস্কৃতভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ভূতত্ত্ব, রসায়ন, জীবতত্ত্ব ও উদ্ভিদবিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। য়ুরোপে নানা প্রদর্শনীতে তিনি যাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং শেষে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের প্রদর্শনীতে গমন করেন। তাহার ফল—'A Visit to Europe' গ্রন্থ। ত্রৈলোক্য বাবু ও তাঁহার অগ্রজ রঙ্গলাল বাবু 'বিশ্বকোষ' অভিধানের প্রবর্ত্তক। তিনি Wealth of India ও জন্মভূমির নিয়মিত লেখক ছিলেন।

বিজ্ঞানের তত্ত্ব সরল ভাষায়—সহজ-বোধ্য করিয়া লিখিবার অধিকার ত্রৈলোক্য

বাবুর যেমন ছিল, তেমন আর কোন বাঙ্গালীর আছে কি না—সন্দেহ। 'বঙ্গবাসীর' স্তম্ভে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি বাঙ্গালীকে বিজ্ঞানের অনেক রহস্য বুঝাইয়াছিলেন। এক দিকে বৈজ্ঞানিক রচনা—আর একদিকে 'কঙ্কাবতী' 'ফোগলা দিগম্বর' 'ভূত ও মানুষ' প্রভৃতি পুস্তক ত্রৈলোক্য বাবুর অসাধারণ কৃতিত্ব-পরিচায়ক।

ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যুতে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ ক্ষতি হইল।

(৫৪)

স্বর্গীয় দেবেন্দ্রবিজয় বসু।

নব্যভারতের সুবিখ্যাত লেখক, বর্দ্ধমানের ভূতপূর্ব্ব প্রথম সবজজ, বর্দ্ধমানের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের শাখার প্রতিষ্ঠাতা, বর্দ্ধমানের অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রধান উদ্‌যোক্তা দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় আর ইহজগতে নাই। গত ৭ই কার্ত্তিক, রাত্রি ১২টা ১০ মিনিটের সময় তিনি কলিকাতার ২৯ নং মদন মিত্রের লেনস্থ ভবনে ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়ক্রম মাত্র ৬২ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহাকে কোন সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি করা হইল না, এ দুঃখ আমাদের মর্ম্মে বিঁধিয়া রহিল।

দেবেন্দ্রবিজয় বাবু ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বর্দ্ধমান হইতে সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তদবধি তিনি কলিকাতায় ২৯ নং মদন মিত্রের লেনস্থ ভবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

দেবেন্দ্রবিজয় বাবু দরিদ্রের কুটীরে জন্ম গ্রহণ না করিলেও, ঐশ্বর্য্যের অঙ্কে প্রতিপালিত হওয়া তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। আজন্ম নিজের চেষ্টায় ও উদ্যমে তাঁহাকে আত্মোৎকর্ষ সাধন করিতে হইয়াছিল। যে দুঃখ কষ্টে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের শিক্ষার স্থল।

দেবেন্দ্রবিজয় বাবু স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের বিধবা পত্নী এখনও বর্ত্তমান। দেবেন্দ্রবিজয় বাবু, তাঁহার বিধবা পত্নী, চারিটী পুত্র, একটী বিধবা কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন।

দেবেন্দ্রবিজয় বাবু সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার আসন বুঝি শূন্যই থাকিয়া যায়। নব্যভারতে গীতার সুবিস্তৃত টীকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। সে টীকা এত সুন্দর ও গবেষণাপূর্ণ যে, বহুপাঠক তাহা গ্রন্থকারে প্রকাশ করিতে বলেন। আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি ও তিনি ৬ ভাগ পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন। তাঁহার স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি আমরা দেখিতে পাইতেছি না। ১২শ পরিচ্ছেদ শেষ হইয়াছে। কিন্তু তিনি সমগ্রগ্রন্থ শেষ করিয়া যাইতে পারিলেন না! এরূপ দার্শনিক পণ্ডিত এদেশে সামান্যই আছেন।

দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর ন্যায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, স্বাধীনচেতা ও নির্ভীক বিচারপতি আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। বর্দ্ধমান রাজ্যের সহিত গবর্ণমেণ্টের চর-সংক্রান্ত মোকদ্দমায় দেবেন্দ্র বিজয় বাবু যেরূপ বিচার করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার স্বাধীন চিত্তের পরিচয় দিতেছে। মহামান্য হাইকোর্টের বিচারেও দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর মত অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

জন্মভূমির প্রতি দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর অগাধ ভক্তি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভের পর তিনি স্বদেশ-সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করিবার বাসনা করিয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসর অনন্যকর্ম্মা হইয়া তিনি স্বদেশ সেবায় ব্রতী ছিলেন, কিন্তু এই সুষুপ্ত জাতির চৈতন্য সম্পাদন করা একজনের কার্য্য নহে। তাই তাঁহার যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। তিনি বাক্যবীর ছিলেন না, কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাই তাঁহার এই মহৎ উদ্যোগ আয়োজনের বিষয় ঢকা-নিনাদে বিজ্ঞাপিত হয় নাই।

যাঁহারা দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর সংসর্গে আসিয়াছিলেন, তাহারই তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, উদার হৃদয় ও বিশ্বজনীন ভালবাসার পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহার পরিচিত সকলেরই বিশ্বাস, তিনি তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। আমরাও তাঁহার এই গভীর স্নেহ লাভে বঞ্চিত ছিলাম না।

রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করা অবধি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি ভগবৎ চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার পাদ-প্রান্তে বসিয়া, তাঁহার মুখে ভগবৎ কথা শুনিয়া কত লোক যে আনন্দ লাভ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। নির্লিপ্ত ভাবে জীবনযাত্রা কিরূপে নির্ব্বাহ করিতে হয়, দেবেন্দ্রবিজয় বাবু তাঁহার পরিচিত সকলকেই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা এরূপ নিষ্কাম যোগী-সুলভ বিশুদ্ধ জীবন আর কুত্রাপি দেখি নাই। একাধারে প্রেম, পুণ্য, পবিত্রতা, জ্ঞান, শিক্ষা, গবেষণা এমন শোভা পাইয়াছিল যে, তাঁহাকে দেখিলেই প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইত। সদা প্রফুল্ল, সদা অমায়িক, সদা প্রেমিক, সদা নিষ্কলঙ্ক, সদা সাধনা-নিরত, সদা দেশানুরাগী এরূপ ব্যক্তি এদেশে বড়ই বিরল। তদীয় চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল গুণগ্রাহিতা, তিনি সকলের নিকটই কিছু কিছু শিক্ষা করিতেন, —কখনও পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা করেন নাই। নিড়ারম্বর প্রকৃত যোগী এদেশে যদি কেহ থাকেন, তবে দেবেন্দ্রবিজয়ই তিনি। সদা নিষ্কাম, সদা অহেতুকী প্রেমে ঢল ঢল, তিনি সর্ব্বদাই নিজগুণে আমাদের প্রাণ মন কাড়িয়া লইতেন। এহেন ব্যক্তিও সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিত্ব পাইলেন না, গভীর পরিতাপের বিষয়। তাঁহার মাধুর্য্যপূর্ণ স্বভাবে তিনি সকলকেই মোহিত করিতেন। আদালতের পেয়াদা হইতে সকলের প্রতি সম ব্যবহার, বন্ধুদের প্রতি সমান স্নেহ, আত্মীয় পরিজনের প্রতি সম-কর্ত্তব্যপালন তদীয় জীবনকে এ সংসারে অচ্যুত পদবীতে উন্নীত করিয়াছিল। তাঁহার আবির্ভাবে বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছে।

(৫৫)

৺ যাত্রামোহন সেন।

স্বনামধন্য, সুপ্রসিদ্ধ যাত্রামোহন সেন ১৬ই কার্ত্তিক, ১৩২৬, কলিকাতায় দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি অতি হীন অবস্থা হইতে আত্মশক্তি-বলে দেশের শীর্ষস্থানে আরোহণ করিয়াছিলেন। ১২৫৭ সালের ৬ই শ্রাবণ পটিয়ার অধীন বরমা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন। তাই বাল্যকাল হইতে দুঃখের ক্রোড়ে লালিত পালিত হন। বাল্যে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের বুড় আঙ্গুল জলিয়া

যায়। তাহাতে পারা দেওয়ায় সমস্ত আঙ্গুল জড়াইয়া যায়। হাত নষ্ট হওয়ায় সকলেই মনে করিত, তাঁহার লেখাপড়া হইবে না। তজ্জন্য ৫ বৎসরে হাতে খড়ি হয় নাই। গুরুচরণ সেন মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার পিতামহ ৬ বৎসরে হাতে খড়ি দেন। ১॥০ বৎসরে পাঠশালায় পাঠ শেষ হয়। তৎপরে সাতকানিয়ার টোলে পড়েন। তৎপর পটিয়া এণ্ট্রান্স স্কুলে ভর্ত্তি হন। সেখানে ৮ বৎসর পড়িয়া পরে চট্টোগ্রাম আলবার্ট স্কুলের এণ্ট্রান্স ক্লাসে ভর্ত্তি হন। ৺ নীলকমল সেন তাঁহার বেতন দিতেন। ১৮৬৮ এণ্টান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১০৲ বৃত্তি পান। ঐ বৃত্তিবলে ১৮৭০খ্রী চট্টোগ্রাম হইতে এলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রফেসার বৈকুণ্ঠনাথ রায় মহাশয়ের উত্তেজনায় তাঁহার অগ্রজ ঋণ করিয়া বি-এ পড়িতে কলিকাতা প্রেরণ করেন। ১৮৭১ খ্রী কেথিড্রাল কলেজে ভর্ত্তি হন। এই সময় দারুণ রোগে আক্রান্ত হন। কোন রূপে বি-এ উত্তীর্ণ হন। তৎপরে চট্টোগ্রামের কমিসনার আফিসে ৩০৲ বেতনে কেরানীপদে গ্রহণ করেন। ১০ মাস কাজ করিয়া বিরক্ত হইয়া কাজ ছাড়িয়া বি-এল পড়িতে যান। এই সময় কেথিড্রেল মিশন স্কুলের হেড মাষ্টার হন। ১৮৭৬ খ্রী বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপর চট্টোগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ওকালতি আরম্ভ করেন। এই বৎসর ডাক্তার ৺অন্নদাচরণ খাস্তগিরির কন্যা বিনোদিনী দেবীকে বিবাহ করেন। ১৯০৬খ্রী পত্নী স্বর্গারোহণ করেন। ৫৮ বৎসর বয়সে ১৯০৯খ্রী. তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পর হইতে রাজনীতির চর্চ্চা আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ চট্টোগ্রামে মিউনিসিপালিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যান হন। বহু বৎসর চট্টোগ্রাম এসোসিয়েসনের সম্পাদক, পরে সভাপতি হন, তৎপর নোয়াখালির কন্‌ফারেন্সের সভাপতি হন। ১৮৯৮খ্রী চট্টোগ্রম হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। ১৯১৮খ্রী মৈমনসিংহ কনফারেন্সের সভাপতি হন। তিনি স্বগ্রামে তাঁহার পিতা ও মাতার নামে ব্রাহ্মি মেনকা ইংরাজি স্কুল সংস্থাপন করেন। চট্টোগ্রাম সহরে তাঁহার শ্বশুর অন্নদাচরণ খাস্তগিরির নামানুসারে বালিকাদের জন্য উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৬ খ্রী বালকদের জন্য নিজনামে Institute স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ৫০০০৲ টাকা মূল্যের একখণ্ড জমি টাউনহলের জন্য দান করেন। তিনি স্বীয় ক্ষমতাবলে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাহার সৎব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তৎপর ঢাকার পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্ম-কনফারেন্সের সভাপতি হন। এই সব প্রতিষ্ঠানে তাঁহার যোগ ছিল—(১) চট্টোগ্রাম এসোসিয়েসন (২) চট্টোগ্রাম হিতসাধন-মণ্ডলী (৩) বার এসোসিয়েসন (৪) সেণ্ট্রেল কো-ওপারেটিভ ব্যাঙ্ক। (৫) চট্টোগ্রাম ব্রাহ্মসমাজ (৬) মেলা-সংগঠন-সমিতি। (৭) যাত্রামোহন-ইনষ্টিটিউট। (৮) কার্পাস-সমিতি (৯) বরমা-ব্রাহ্মসমাজ (১০) বরমা-হিত-সাধন-মণ্ডলী (১১) বরমা-চেরিটেবল ডিসপেননারি (১২) বরমা-ব্রাহ্মি-মেনকা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় (১৩) বরমা-বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়। (১৪) চট্টোগ্রাম-কলেজ। (১৫) ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড (১৬) মাতার শ্মশানে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা (১৭) নিজগ্রামে বিশটী পুষ্করিণী খনন। (১৮) বরমা-ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ। (১৯) চট্টোগ্রাম-টাউনহল।

একবার কোন জামিনীতে ৫২০০০৲ টাকা বাজেয়াপ্ত হয়, কিন্তু তাহাতেও তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হন না। এই সময়েই টাউনহল প্রতিষ্ঠায় অর্থব্যয় করেন। চট্টোগ্রাম ও বরমার জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এমন প্রতিষ্ঠান নাই, যাহার সহিত তাঁহার যোগ ছিল না। তিনি কত লোকের যে পিতৃস্থানীয় ছিলেন, তাহার সংখ্যা হয় না। কর্ম্মস্থলে প্রবেশ করার পর হইতে জীবনের শেষপর্য্যন্ত কেবল স্বদেশের উন্নতির চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এমন পরোপকারী ব্যক্তি প্রায়ই দেখা যায় না। তাঁহার সংযম, তাঁহার নিষ্ঠা, তাঁহার কর্ম্মানুরাগ, তাঁহার কর্ত্তব্য-জ্ঞান, তাঁহার পরোপকার বৃত্তি তাঁহাকে ঋষি-জনোচিত পদে ভূষিত করিয়াছে। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব ছিলেন। চট্টোগ্রামের ঋষিতুল্য ব্যক্তিগণের নিকট তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাকে এবং তাঁহার জন্মভূমিকে কোটী কোটী প্রণাম করিতেছি।

(৫৬)

৺পরেশনাথ রায়চৌধুরী।

"আমরা অত্যন্ত শোক-দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, ডায়মণ্ডহারবারের খ্যাতনামা উকীল পরম স্বদেশভক্ত কর্ম্মবীর বাবু পরেশনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় আর ইহ জগতে নাই। গত ২১শে অক্টোবর তারিখে গোবিন্দপুরের ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় সভায় বক্তৃতা করিবার কালে সহসা তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন, আর তিনি জ্ঞান লাভ করেন নাই। দেশভক্ত সন্তান দেশের কল্যাণ করিতে করিতে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন ; ইহাই এ মহাশোকের সান্ত্বনা —এছাড়া এ শোকের আর সান্ত্বনা নাই।

ডায়মণ্ড হারবারস্থ সংবাদদাতা পরেশবাবুর মৃত্যু সম্পর্কে যে বিবরণ পাঠাইয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এস্থলে তাহাই পত্রস্থ করিলাম। সংবাদদাতা লিখিতেছেন, —"প্রবাসীর উপনিবেশ ডায়মণ্ডহারবারের এক চির হাস্যময় প্রবাসী আজ তাঁহার জীবনের খেলাধূলার সহচরদিগকে নিবিড় দুঃখান্ধকারময় ভবসমুদ্রের কূলে ফেলিয়া নিজের শান্তিময় নিকেতন স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন। পাছে তাঁহার পবিত্র নাম ডায়মণ্ডহারবারের স্মৃতিপথ হইতে বিলুপ্ত হয়, এই ভয়ে আজ আমাদের লেখনী সেই দেবনাম প্রকাশে সাহসী হইতেছে না। কিন্তু প্রবলকালের কঠোর কষাঘাতে কাহার না ধৈর্য্য বিলুপ্ত হয়? তাই আজ শোকের উত্তপ্ত নিশ্বাস সহ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি যে, ডায়মণ্ডহারবার দেওয়ানী আদালতের বার-লাইব্রেরীর সেক্রেটারী সদাশয় পরেশনাথ রায় চৌধুরী গত ২১শে অক্টোবর বুধবার হঠাৎ তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও ডায়মণ্ডহারবারের সর্ব্ব সাধারণকে কাঁদাইয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। গত ২১শে অক্টোবর ডায়মণ্ডহারবারের কিছু দূরে গোবিন্দপুর নামক গ্রামে ব্রাত্যক্ষত্রিয় জাতির ও সাধারণ ও অবনত জাতির উন্নতি কল্পে একটী মহতী সভা আহুত হয়, কলিকাতা হইতে মাননীয় মিঃ জে, চৌধুরী ও কর্ণেল ইউ, এন, মুখার্জ্জী-প্রমুখ দেশভক্তগণ তথায় আহুত হন। পরেশ বাবুও আহুত হইয়া ঐ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।" সভাস্থলে শিক্ষা সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইবার অব্যবহিত পরে হঠাৎ তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। তাঁহার

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সভাস্থল হইতে অন্যত্র লইয়া যাওয়া হয় ও ডাক্তার কর্ণেল মুখার্জ্জী তাঁহার রোগোপনোদনের চেষ্টা করেন। কিছুক্ষণ পরে কর্ণেল মুখার্জী প্রভৃতির কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হওয়ায়, স্থানীয় দুইজন ডাক্তারকে সাময়িক উপদেশ দিয়া তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু পরেশ বাবুর অসুখ না কমিয়া প্রতি আধঘণ্টা অন্তর ফিট হইতে থাকে। ফিটের সময় তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয় ও তিনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়েন। এইরূপ অবস্থা হওয়ায় ও পালকী অভাবে তাঁহাকে ডায়মণ্ডহারবারে আনা অসম্ভব হইয়া পড়ে। রাত্রি ১ টার সময় কামারপোল-নিবাসী ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ বসু আগমন করেন ও নানা উপায়ে তাঁহার ফিট অপনোদনে চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া প্রাতে পাল্কী যোগে তাঁহাকে ডায়মণ্ডহারবারে আনিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পথিমধ্যেই তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন। পরে তাঁহার প্রাণশূন্য দেহ ডায়মণ্ডহারবারে আনীত হয়। পূজার অবকাশহেতু ডায়মণ্ডহারবারে দুই একজন চিরপ্রবাসী ভিন্ন আর সকলেই অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রচার হইবামাত্র নিকটস্থ গ্রামসমূহ হইতে বহুলোক তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় যোগ দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। পরেশ বাবুর ন্যায় পরোপকারী, সৎসাহসী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ দেশভক্ত ডায়মণ্ডহারবারে কেহই নাই বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার গুণাবলী প্রকাশের বিশেষণ কি দিব, বঙ্গভাষায় যাহা কিছু আছে, তাহা দিলেও সমস্ত প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ডায়মণ্ডহারবারের প্রবাসীদিগের মধ্যে যদি কোন আত্মীয়-বিরহিত ব্যক্তি কলেরা বা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইত, পরেশ বাবু তাঁহাকে আপন পুত্রের ন্যায় সেবা করিতেন। ডায়মণ্ডহারবারের এমন কোন দেশহিতকর কার্য্য হয় নাই, যাহাতে পরেশ বাবুর আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা ছিল না। তিনি স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনের একজন উদ্যোগী ও তাহার সম্পাদক ছিলেন। কয়েক বৎসরের জন্য ডায়মণ্ডহারবারের লোক্যাল বোর্ডের ও ইউনিয়ন কমিটির সভ্য ছিলেন। তিনি বাঙ্গালার প্রত্যেক প্রাদেশিক সভায় (Provincial Conference) এবং সুরাট ও অন্যান্য কংগ্রেসে ডায়মণ্ডহারবারের প্রতিনিধি স্বরূপ উপস্থিত হইয়া স্বদেশ-সেবায় যোগদান করিয়াছিলেন। দেশহিতকর প্রত্যেক কার্য্যে তিনি নির্ভীক হৃদয়ে যোগদান করিতেন। দুঃস্থের দুঃখ অপনোদনে তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাঁহার গুণাবলী প্রকাশের ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাই না। এই মহাপুরুষ ডায়মণ্ডহারবারের প্রবাসী হইয়াও ডায়মণ্ডহারবারকে আপনার করিয়া তুলিয়াছিলেন। ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অধিবাসীগণ ডায়মণ্ডহারবারের উন্নতির জন্য যতটা চেষ্টা করিয়াছেন, পরেশ বাবু তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক করিয়াছেন। এই মহাপুরুষ পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার অন্তর্গত খালিয়া গ্রামের বিখ্যাত "রায়চৌধুরী" বংশে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরকিশোর রায় চৌধুরী। পরেশ বাবু ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল

মাদারীপুর স্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য করেন ও ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে আলিপুরে আইন-ব্যবসা আরম্ভ করেন। পরে বাঙ্গালা ১৩০৬ সালে ডায়মণ্ড-হারবারের বারে যোগদান করেন। এখানে আইন ব্যবসায়ে তিনি সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। কিন্তু নীরস আইন ব্যবসা অপেক্ষা তিনি দেশের কল্যাণকর কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করা উচিত মনে করিতেন ও প্রাণপণে তাহাই করিতেন এবং সেই কার্য্যেই জীবন উৎসর্গ করিলেন। এইরূপে ৫৪ বৎসর বয়সে, একটী রুগ্ন শিশু তনয় ও ৫টী কন্যা ও বিধবা স্ত্রীকে রাখিয়া তিনি মহাযাত্রা করিলেন। কন্যা ৫টীর মধ্যে তিনটী অবিবাহিতা।" প্রতিজ্ঞা।

(৫৭)

এবার বড়দিনের সময়, জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন, অমৃতসহরে এবং জাতীয় মহাসমিতির ভাঙ্গাহাট মডারেট কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন কলিকাতায় হইয়া গিয়াছে। জাতীয় মহাসমিতিতে এবার বহুলোক উপস্থিত হইয়াছিল, ভাঙ্গাহাটে তেমন লোক জমে নাই। জাতীয় মহাসমিতির মূল মন্ত্র—"বন্দে মাতরম্"ও মডারেট কন্‌ফারেন্সের মূল মন্ত্র—"হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।" জাতীয় হইতে এই কন্‌ফারেন্স অজাতীয় হইয়া উঠিতেছেন—শৈশবেই এই —না জানি পরে আরো কি হইবে! জাতীয় মহাসমিতি ভারতগত প্রাণ,—মডারেট কন্‌ফারেন্স টাকা ও ইংলণ্ডগত প্রাণ। মডারেট কন্‌ফারেন্সে উল্লিখিত হইয়াছে, এনিবেসেণ্টকে কলিকাতার জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি করায় ও ভারতসংস্কার আইনই তাঁহাদের দলাদলির মূল সোপান। অধিকাংশের মতে বেসেণ্ট সভাপতি হইয়াছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে কথা বলার কাহার অধিকার আছে? তোমরা নাকি খুব নিয়মতন্ত্র ভালবাস, তবে একি ভাব? এখনই নিয়মতন্ত্র মানিতে এত কুণ্ঠা,—যে ভারতসংস্কার আইন লইয়া এত নাচানাচি, তাহা পালনযোগ্য না হইলে কি করিবে? আমরা বলি, এত কর্ত্তাভজাগিরি ভাল নহে। এই সময়ও টাকার মায়া ছাড়া উচিত ছিল নাকি? দুইয়েরই লক্ষ্য আবেদন ও নিবেদন-মূলক ভিক্ষাবৃত্তি। ভিক্ষাবৃত্তিতেও দলাদলি সাজে কি? কেহ কেহ বলেন,—Party leadersদের দ্বারা ইংলণ্ডের উপকার হইয়াছে। সে যে স্বাধীন দেশ, সে কথাটী তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন। সে দেশের কথা স্বতন্ত্র-এ দেশে চাই শুধু একতা—হিন্দু মুসলমান এক হউক, জাতির বিচার উঠিয়া যাক্, বড় ছোটর ভেদ চলিয়া যাক্, সব এক হইয়া যাক্—নচেৎ এদেশের মঙ্গল নাই। তাঁহারা চান, Divide and rule করিতে। আমরা চাই, একপ্রাণ হইয়া চলিতে। বিভাগ-নীতি এদেশের সর্ব্বনাশের মূল। রাজার ঘোষণায় কতিপয় নেতা মুক্তি পাইয়াছেন, তাহাতে কে না আনন্দিত? কিন্তু মডারেট কন্‌ফারেন্স দ'লো ভাবে পুষ্ট হইতেছেন বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন নাই; কেননা তাঁহাদের দলে যে কেহ নাই! হরকিসন লাল, সকত আলী, মহম্মদ আলী প্রভৃতি যদি তাঁহাদের দলে থাকিতেন, না জানি তাঁহাদের কত উল্লাস হইত! বিভক্ত এই ভারতকে যিনি একপ্রাণ করিতে পারিবেন, তিনিই ধন্য

হইবেন। আবেদন নিবেদনের মূলনীতিতে দেখিতেছি, শেষে দলাদলিই আনয়ন করিল। কোন মহাকাজ হাতে নিলে বোধহয় এরূপ হইত না। আমরা বহুবার লিখিয়াছিলাম, দরিদ্রদিগকে রক্ষা করার উপায় কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করা। এই মহা কাজ যদি জাতীয় মহাসমিতি হাতে নিতে পারিতেন, ইহার ভিতর দিয়া জাতীয় একতা আসিত। যাহার কোন কাজ নাই, সে-ই কোন্দল করে। আমাদের হাতের কাজ গবর্ণমেণ্ট কাড়িয়া লইয়া ক্রেডিট-ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া এদেশে মহা কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, আমরা কেবল কোন্দল করিয়া মরিতেছি। জাতীয় মহাসমিতি যদি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ হাতে নিতেন, দরিদ্রদের শিক্ষার একটা উপায় হইত। কিন্তু কে সে জন্য প্রাণ, মন ও অর্থ দিবে? বরিশালের ব্রজমোহন ও কলিকাতার রিপণ কলেজ যদি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের হস্তে দিতে পারিতেন, এই প্রতিষ্ঠান জাতীয় একতা আনয়ন করিতে পারিত। জাতীয় শিক্ষালয় যায় যায় হইয়াছে. মহামতি শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় তেলামাথায় তেল ঢালিয়া বাহাবা লইতেছেন। জালীয়ানওয়ালা-বাগের স্মৃতিগঠনের ভার যদি সকলে এক প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিতেন, জাতীয় একতা এই পথ ধরিয়া নামিয়া আসিতে পারিত। কিন্তু দলে এবং বেদলে সে সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। তবে মহাত্মা মালবীয়ের প্রাণটা নাকি মহান, তাই তিনি কাঁদিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রাণটা বড় দরাজ, তাই তিনি বোলপুরের শিক্ষা লইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহাদের এই শিক্ষা-সৌকর্য্যের পথ ধরিয়া জাতীয় একতা আসিবে। মহাত্মা গান্ধি আফ্রিকাগত প্রাণ, কিন্তু তিনি আবেদন-নিবেদনে গা ঢালিতেছেন। দোহাই তোমাদের, তোমরা নিজেরা কিছু কর, নিজেরা কিছু কর, শুধু বক্তৃতাবাগীশ হইয়া ক্ষমতাপ্রিয় হইয়া পড়িও না। দোহাই তোমাদের, উপাধির মমতা ছাড়। দোহাই তোমাদের, তোমরা জাতীয় একতার জন্য সকল স্বার্থ পরিত্যাগ কর। দোহাই তোমাদের, তোমরা বিজ্ঞানশিক্ষার সৌকর্য্যার্থ অন্ততঃ একটা কাজের স্রোত প্রবাহিত কর। শুধু বৎসরান্তে ৩।৪ দিনের মাতামাতিতে কিছু হইবে না—এতদিনেও কিছু হয় নাই। এখনও বলি, সতর্ক হও। মনে রাখিও, জাতীয় একতার পূর্ব্বাভাস আত্মত্যাগ, স্বার্থত্যাগ, কার্য্য-তৎপরতা, অত্যাচার ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা।

(৫৮)

৬ই পৌষ, সোমবার, দিনাজপুরের মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় মহাশয় কলিকাতা মহানগরীতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিলেন, অবশেষে এই রোগেই দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার বয়স অধিক হইয়াছিল না, তবু নিয়তি তাঁহাকে ছাড়িল না! তাঁহার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তি এদেশে অধিক জন্মগ্রহণ করেন নাই। পঞ্চাশবৎসরের বাঙ্গালা ও দিনাজপুরের উন্নতির সহিত তাঁহার জীবন জড়িত। তিনি কায়স্থ সভার অকৃত্রিম সেবক ছিলেন। তাঁহার উদারতা, স্বদেশপ্রেম, ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সদয়-ব্যবহার, পরদুঃখকাতরতা, দয়া-দাক্ষিণ্য

তাঁহাকে আমাদের হৃদয়ে যে আদর্শের চিত্র মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে, তাহাই আমাদের শেষ-জীবনের সম্বল। তাঁহার দ্বারে ভিখারী কখনও ফিরিত না—কোন সৎকাজের জন্য সাহায্য চাহিলে কাহাকেও নিরাশ করিতেন না। এরূপ ধর্ম্মানুরত, সচ্চরিত্র ব্যক্তি ধনীগৃহে বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি ধন্য, দিনাজপুর ধন্য, তাঁহার আবির্ভাবে বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছে। তাঁহার আকস্মিক তিরোধানে আমাদের হৃদয় প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বিধাতা শোক-সন্তপ্ত পরিবারে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

গান।

(১)

কানাড়া—একতালা

আনন্দ-আশ্রমে এসেছিলে নেমে
দেবী না তুমি নারী ?
যত যাও দূরে তত প্রাণ-পুরে,
তত যে চিনিতে নারি।
কামনা বিলাসে দিয়ে বলিদান
কালের প্রবাহে চলিলে উজান ;
করিয়া শাসন আপনার মন
ঢালিলে অনলে বারি ॥
কিছু নাহি ঘরে তবু অকাতরে
করে গেলে অন্নদান,
দুহাত বাড়ায়ে যাইলে কুড়ায়ে
কেবলি ব্যাকুল প্রাণ।
চিনেছিলে নাম তাই অবিরাম
করে গেলে সুধাপান,
সেই সুধা পেতে সেই ধামে যেতে
কেমনে সাধ নিবারি ॥

(২)

সিন্ধু—ঠুংরি

সুখে স্বর্গ লোকে
(থাক) মগন পুলকে।
ধরার সেই ধূলাখেলা চলিতেছে সারাবেলা
সেই হাসি সেই কান্না সুখে রোগে শোকে,
নূতন আনন্দাশ্রম রচ নব তীর্থ সম।
হক তাহা আলোকিত ও প্রেম আলোকে,
আনন্দে আনন্দময়ী সকল পরীক্ষা-জয়ী,
কে আজি সাজালে তোমায় জয়-তিলকে।

৩০ কার্ত্তিক, ১৩২৬ ; ১৫।১১।১৯

স্বর্গগতা কমলকামিনী রায়চৌধুরীর বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে রচিত ও গীত।

(৩)

বাউলের সুর—খ্যামটা

এইত তোমায় ছুঁয়ে
উঠ্‌ছে জগৎ উড়্‌ছে জগৎ
একটী তোমার ফুঁয়ে।
(বল্লে) "হ'রে হল সৃষ্টি
একটি তোমার হুঁয়ে
শোভার পরে শোভা ঝরে
আঁধার হতে ছুঁয়ে।
রঙের পরে রঙ ফলারে
তুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ;
আঁকছ কবি কতই ছবি
আলো ছায়ার ঢেউয়ে।
সাজাও সাজি নাচাও নাচি
দিচ্ছ মুছে ধুয়ে ;
হলাম কত হব কত
তোমার কোলে শুয়ে।

শ্রীকালীনাথ ঘোষ।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন।

খ্রীষ্টীয় আদর্শবাদ (scholasticism)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রোম সাম্রাজ্যের পতন হইল বটে, কিন্তু পতনের পূর্ব্বে মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় সমাজকে প্রভূত শক্তিশালী করিয়া গেল। সাধারণের এইরূপই বিশ্বাস হইয়াছিল যে, সমাজের বাহিরে জ্ঞানও নাই, মুক্তিও নাই। সমাজের মূলমন্ত্রগুলিই একমাত্র সত্যের প্রতিনিধি হইয়াছিল। ইহার ফলে, সত্যানুসন্ধানের আর আবশ্যকতা রহিল না এবং দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য যদি তত্ত্ব নির্ণয় হয়, তবে সমাজ-গণ্ডীর ভিতরে সেই শাস্ত্রের অধিকারও রহিল না। মূলমন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য নিরূপণ ও যাথার্থ্য প্রমাণ করাই মধ্যযুগীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়াছিল। এইরূপে দর্শন ক্রমান্বয় ধর্ম্মশাস্ত্রের আসন গ্রহণ করে। যে যে স্থলেই ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, সেই সেই স্থলেই দর্শনশাস্ত্র নির্য্যাতিত হইয়াছে।

তত্ত্বচিন্তার সহিত পর্ব্বতবাহিনী স্রোতস্বতীর সাদৃশ্য দেখা যায়। পার্ব্বত্য নদীর যে স্থল যত সঙ্কীর্ণ, সেই স্থল তত গভীর। সত্যের উপরে নিয়মের চাপ যত অধিক হইয়াছে, নিয়মগুলিকে ব্যতিক্রম করিতে না পারিয়া সত্য প্রথমতঃ নিয়মের ভিতর দিয়া ততই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে এবং পরে, নিয়ম-শৃঙ্খলের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় দর্শন শাস্ত্র বা 'স্কলাষ্টিসিজম্' এইরূপে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করে। স্কোটাস্ ইরিগিনা (Scotus Erigena), এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা এবং সেণ্ট অ্যান্সেল্মাস্ (St. Anselmus), অ্যাবিলার্ড (Abelard), সেণ্ট্ টমাস্ (St. Thomas), এবং ডান্স্ স্কোটাস্ (Dans Scotus) ইহার পৃষ্ঠপোষক। 'স্কলাষ্টিসিজম্' আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রের ভ্রূণাবস্থা। সমাজ-নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়া যে সকল ইউরোপীয় জাতি আত্মোন্নতি-সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন, ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে এই মতই তাহাদের একমাত্র দর্শনশাস্ত্র। পূর্ব্বতন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ প্রাচীন মতাবলীর অবলম্বনে বা অনুকরণে যে সকল অভিমত প্রকাশ করিতেন, তাহার সহিত বক্ষ্যমাণ দর্শনমতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। রোমসাম্রাজ্যের পতনের পর পূর্ব্বোক্ত মত সমূহের সহিত স্কলাষ্টিসিজমের সম্পর্ক তিরোহিত হইয়াছিল। ধরিতে গেলে ইহা এক অভিনব মত। উর্ব্বরমস্তিষ্ক জর্ম্মান্-জাতি, নবলাটীন্ সম্প্রদায় এবং অপরাপর জাতিকর্ত্তৃক নবসভ্যতার ফলস্বরূপ এই মতের উদ্ভব হয় এবং ফ্রান্স, ইংলণ্ড, স্পেন, জর্ম্মাণি, সংক্ষেপে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ ইহার মাতৃভূমি। গ্রীসীয় তত্ত্বচিন্তার ন্যায় খ্রীষ্টীয় আদর্শবাদ বা স্কলাষ্টিসিজমেরও আদি, মধ্য ও অন্ত তিনটী কাল-বিভাগ আছে। প্রথমে প্লেটোনিক মতে সেণ্ট আগষ্টাইন্ কর্ত্তৃক ইহার উদ্বোধন হইয়াছিল, পরে ত্রয়োদশ হইতে ইহার উপর অ্যারিষ্টটলের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। এই জন্যই স্কলাষ্টিসিজমের

ইতিহাসে দুইটী প্রকৃষ্ট পর্য্যায় আছে। উহাদের একটী বা পূর্ব্বার্দ্ধ প্লেটোনিক যুগ, অপরটী বা উত্তরার্দ্ধ, পেরিপ্যাটিটিক যুগ। উত্তর ভাগের আবার দুইটী বিভাগ দৃষ্ট হয় এবং তাহাদের একটীতে অ্যারিষ্টটলের মত বাস্তব-অর্থে, অপর বিভাগে সেই মত নাম-অর্থে গৃহীত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে প্রকৃতপক্ষে বাস্তববাদ এবং নাম-বাদের বিরোধে স্কলাষ্টিসিজমের পরিচয় পাওয়া যায়। পরে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে নব জ্ঞানালোকের প্রবল তরঙ্গে ইহার গতি মন্দীভূত হওয়ায় পুনরায় ইহা চার্চ্চেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেই হইতে স্কলাষ্টিসিজম্ এপর্য্যন্ত চার্চ্চ-মত বলিয়াই গণ্য হইতেছে। অতঃপর প্রশ্ন এই, স্কলাষ্টিসিজমের মুখ্য আলোচ্য বা মূলমন্ত্র কি? স্কলাষ্টিসিজ্‌মের শেষ পৃষ্ঠপোষক প্রসিদ্ধ দার্শনিক হেগেল বর্ত্তমান যুগের লোক হইয়াও, এই মতের ব্যাখ্যাকল্পে সত্যই বলিয়াছেন যে, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের একই আলোচ্য, একই উদ্দেশ্য এবং একই হেতু। ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া দর্শন নিজেরই পরিচয় দেয় এবং আত্মপরিচয় কালে স্বয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রে পরিণত হয়। বাস্তবিক সর্ব্বদর্শনের মূল বা গোড়ার কথা এই। যাহা হউক, আমরা এখন যে যুগের পরিচয় দিতেছি, তাহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী কালের বিরুদ্ধ-মত সমূহের সামঞ্জস্যসাধনের এক মহতী চেষ্টা হইয়াছিল। দর্শন এবং ধর্ম্ম, জ্ঞান এবং বিশ্বাস, প্রাকৃতিক নিয়ম এবং ঈশ্বর,—উভয়ের মধ্যস্থাপনই 'স্কলাষ্টিসিজ্‌মে'র উদ্দেশ্য। প্রাচীন ধর্ম্মযাজকগণ এবং আদি-যুগের স্বাধীনচেতা ভাবুকগণ, যাঁহাদের দ্বারা আধুনিক দর্শনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই এই দুই শাস্ত্রকে পরস্পরের বিরোধী বলিয়া জানিতেন; কিন্তু খ্রীষ্টীয় আদর্শবাদীর (Schoolmen) মতে, অন্ততঃ প্রথম পর্য্যায়ের তিনজন দার্শনিকের মতে, ঐশ্বরিক পূর্ব্বনির্দ্দেশে এবং স্বভাবে, প্রত্যা-দেশে এবং বিচার বুদ্ধিতে মূলতঃ বিরোধ থাকা অসম্ভব। সে যাহাই হউক, মোটের উপর আমরা দেখিতে পাই যে, বিভিন্ন মত সমূহের বাহ্যিক বিরোধ আছে বলিয়াই কিরূপে সেই সকল মতের সামঞ্জস্য রক্ষা পায়, কিরূপে মূল তত্ত্বগুলির সত্যতা প্রকাশিত হয়, এবং কিরূপেই বা সমাজ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতকে যৌক্তিক ধর্ম্মের আসনে দাঁড় করান যায়, তৎকালে এমম্বিধ বিষয়ের বিচার এবং মীমাংসা লইয়া প্রবল বিতর্ক চলিয়াছিল। কুণো ফিশারের (Kuno Fischer) মতে খ্রীষ্টীয় তত্ত্ববিশ্বাসকে জ্ঞানানুপন্থী করাই স্কলাষ্টিসিজ্‌মের উদ্দেশ্য। সংক্ষেপে, দর্শনের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের অথবা জ্ঞানের সহিত ভক্তির যোগ লইয়াই এই মতের উৎপত্তি, এবং যখন হইতে একদিকে নামবাদী, অপর দিকে মানবতত্ত্ববাদীর দল প্রবল হইয়া উভয় শাস্ত্রের বিচ্ছেদ সাধন আবশ্যক মনে করেন, তখন হইতেই স্কলাষ্টি-সিজ্‌মের অবনতি হয়।

স্কোটাস্ ঈরিগিনা (Scotus Erigena)

মধ্যযুগীয় তাত্ত্বিকদিগের মধ্যে আয়র্ল‍ণ্ড-বাসী জন্ স্কোটাস্ ঈরিগিনা সর্ব্ব প্রথম ও পণ্ডিত-সমাজে সুপরিচিত। ইনি নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে চাল্‌স্ দি বল্ড্ (Charles the Bald) কর্ত্তৃক প্যালাটীন্ অ্যাকাডেমির ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গট্‌শক (Gottschalk)-প্রচারিত পূর্ব্ব-নির্দ্দেশবাদের বিরুদ্ধে 'ঐশ্বরিক পূর্ব্বনির্দ্দেশ' নামক একখানি গ্রন্থ (The Divine Predestinatione) রচনা করিয়া এবং ডিওনিস্যুস্ (The Areopagite) সঙ্কলিত প্রত্যাদেশমূলক ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের অনুবাদ করিয়া, তাহাতে পোপের সম্মতি-লাভে অসমর্থ হওয়ায় তিনি চার্চ্চের বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন। সম্রাট্ বল্‌ড কিন্তু তাঁহাকে পূর্ব্বাপর প্রীতির চক্ষেই দেখিতেন। ৮০০ হইতে ৮১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার জন্ম এবং আনুমানিক ৮৭৭ খ্রীঃ অঃ ফ্রান্স দেশে তাঁহার মৃত্যু হয়।

স্কোটাস্, ওরিগেনের তুল্যই প্রশস্তচিত্ত ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ তিনি চার্চ্চের কূটদৃষ্টিতে পতিত হইয়া ক্যানন্' (Canon) হইতে পারেন নাই, কিন্তু 'কার্লোভীয়'যুগে বা সার্লেমেন্-প্রমুখ সম্রাট্‌দিগের শাসনকালে জ্ঞানের যতদূর উৎকর্ষ হইয়াছিল, তদপেক্ষা তিনি বহু উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। স্কোটাস্ লাটীন্ ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তদ্ভিন্ন তিনি গ্রীক এবং আরবী ভাষাও জানিতেন। নিওপ্লেটোনিজম্ মত এবং গ্রীক পণ্ডিতদিগের মতাবলীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। জ্ঞানরাজ্যে তিনি বিশাল প্রান্তর-স্থিত এক আগ্নেয়গিরি সদৃশ। তৎপ্রণীত 'প্রাকৃতিক বিভাগ' বা (Natural Divisions) (De Division Naturae) গ্রন্থে তিনি যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা শুধু যে নিও-প্লেটোনিক মতের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা নয়; এই গ্রন্থকে আলেক্‌জান্দ্রিয়া প্রচারিত বিকাশবাদের (Emanation theory) একটী খ্রীষ্টীয় সংস্করণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে বিকাশতত্ত্বকে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের অনুকূল করিয়া পুনঃ প্রকাশ করা হইয়াছে। এস্থলে সংক্ষেপে উহার মত উদ্ধৃত করা হইল। ঈশ্বর পরম 'এক' বা সর্ব্বসামঞ্জস্যের মূল কারণ হইয়াও 'বহুতে' প্রকাশমান; 'বহু' বা দ্রব্যজাত তাহা হইতে তদীয় মঙ্গলময়ী সত্তার অংশরূপে, সাধারণ হইতে বিশেষে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ আদি বিভাগাপেক্ষা তন্নিম্ন স্তর বা বিভাগে বিশেষত্ব অধিক, সারবত্তা কম; তন্নিম্নতর বিভাগে বিশেষত্ব আরও অধিক, সারবত্তা আরও কম; এইরূপে বিবর্ত্তন-প্রণালীর ধারা ক্রমে সর্ব্বনিম্নবর্ত্তী স্তরে বা ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সমূহে পরম মঙ্গলময়ের অংশ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইলেও, তথায় তাঁহার অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। এবম্প্রকার বিবর্ত্তন প্রণালীকে স্কোটাস্ স্ফোটন বা বিশ্লেষণ প্রণালী বলিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিতেন যে, যাবতীয় দ্রব্য বিশেষ হইতে সাধারণে আবর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং সর্ব্বশেষ তাহারা দেবোপম শক্তি ও পবিত্রতা লাভ করত ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হয়; তদবস্থায় ঈশ্বর 'সর্ব্বৈব'রূপে প্রতিভাত হন। তৎকালে অর্থাৎ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে, পীরেনিজ্ পর্ব্বতের পশ্চিম প্রান্তে, বহুদূরে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্কোটাস্ কিরূপে যে প্লোটিনাস্ ও প্রোক্লেসের মতাবলী এমন সুন্দরভাবে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

স্কোটাসের বিবেচনায় দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বিবাদ নাই। ধর্ম্মবিশ্বাসের শাস্ত্রানুযায়ী বা বৈজ্ঞানিক মীমাংসাই দর্শনের উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম ও চিন্তা উভয়ের বিকাশভাব পর্ত্তই

হইলেও মূলতত্ব এক, উভয়ের মূলে একই ঐশী সত্তা নিহিত। ধর্ম্মাচরণে ভক্তির উদ্রেক হয় বলিয়া মানব ভাবরসে আপ্লুত হয় এবং ভগবানকে পূজা করিতে শিখে; আবার, দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় বিচার-সাহায্যে মানব সেই পূজার বস্তু ভগবানের স্বরূপ বুঝিতে পারে। ইহাতে নিরাসক্ত পরম পুরুষ বা ঈশ্বরই যে ক্রিয়াময়ী প্রকৃতি, তাহাই প্রমাণিত হয়।

মোটামুটি সৃষ্ট এবং অসৃষ্ট যাবতীয় পদার্থই প্রকৃতির অন্তর্গত। এই অর্থে সমগ্র প্রকৃতির চারিটী বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যথা (১) যাহা স্বয়ং অসৃষ্ট এবং সৃষ্টির কারণ, (২) যাহা সৃষ্ট এবং সৃষ্টির কারণ, (৩) যাহা সৃষ্ট কিন্তু সৃষ্টিসাধনে অপটু এবং (৪) যাহা সৃষ্টও নয়, সৃষ্টিসাধনে পটুও নয়।

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ আরও সংক্ষেপে বিবৃত হইতে পারে। প্রথম ও শেষ দুই বিভাগে বস্তুতঃ কোন পার্থক্য নাই, যেহেতু অসৃষ্ট বস্তুমাত্রই এই দুই বিভাগের অন্তর্ভূত এবং এই নিমিত্ত তাহাদের দ্বারা অনন্ত নিরপেক্ষ সত্তার বা ঈশ্বরেরই উপলব্ধি হয়। ঈশ্বর বস্তুমাত্রের আদি এবং উৎপত্তি কারণ বলিয়া প্রথম বিভাগে সেই কারণ যে পরিমাণে বিদ্যমান, ঈশ্বরের অস্তিত্বও তাহাতেই পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার, চতুর্থ বা শেষ বিভাগেও ঈশ্বর বর্ত্তমান, কেন না, এইস্থলেই তাঁহার অনন্ত পরিণতি বা মহান্ উদ্দেশ্যের পরিসমাপ্তি। এইরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগের আলোচনায় দেখা যায় যে, ইহাদের মধ্যেও পার্থক্য নাই; কেন না সৃষ্ট বস্তুমাত্রই ইহাদের অন্তর্গত, অর্থাৎ কেবল ঈশ্বর ব্যতীত সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি এই দুই বিভাগেরই নামান্তর। আদর্শ অবয়বগুলি (Idea Types) ব্যক্তিতে যাহাদের পরিণতি হয়, তাহারা ক্রিয়াশীল সৃষ্ট বস্তু (২য় বিভাগ)। আর, দ্রব্যজাত বা ব্যক্তিসমূহ ক্রিয়াবিমুখ সৃষ্টবস্তু; কারণ, পুনরুৎপাদনী শক্তি জাতিবাচক আদর্শেরই গুণ, ব্যক্তির গুণ নহে। অতএব পূর্ব্বে সৃষ্টির যে চারিটী বিভাগ কল্পিত হইয়াছিল, এইক্ষণে তাহারা মাত্র দুইটী বিভাগে পরিণত হইল; এই দুই বিভাগের একটী ঈশ্বর, অপরটী জগৎ। আবার, এই দুই বৃহত্তর বিভাগ বা সৃষ্টির প্রকারভেদও মূলতঃ এক। বাস্তবিক, ঈশ্বরেই জগতের অস্তিত্ব এবং ঈশ্বরই জগতের সার, আত্মা বা জীবনরূপে স্থিত। জগতের যে কিছু দৈবীশক্তি, যে কিছু জ্ঞান বা আলোক, সকলই ঈশ্বর, যিনি নিখিল জগতে অনুপ্রবিষ্ট এবং অন্তর্লীন। জগৎ তাঁহাতে নির্ভরশীল, অর্থাৎ জগৎ ঈশ্বর হইতে যতটুকু সত্তালাভে সমর্থ, সেই পরিমাণেই তাহার বিদ্যমানতা। ঈশ্বর পরিমাণ, সীমা বা বিভাগরহিত, অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপ; জগৎ বিভক্ত এবং সসীম সত্তা। ঈশ্বর অপ্রকটিত, জগৎ প্রকটিত বস্তু। জগৎ এবং ঈশ্বর একই বস্তু, এক অসীম সত্তার দুই ভিন্নরূপ, অথবা কেবল জগতই সত্তার বিকার, পরিবর্ত্তন বা সীমাবন্ধন; ঈশ্বর বিকার বা পরিবর্ত্তন-রহিত সত্তা।

প্লোটাস্ 'থীয়স্' (Theos) শব্দ হয় 'থীওরো' (Theoro), না হয় 'থীও' (Theo) অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। 'থীওরো'র অর্থ অনন্ত দৃষ্টি, অনন্ত জ্ঞান, আর 'থীও'র অর্থ, অনন্ত গতি। কিন্তু এই দুই শব্দের দুই অর্থই যে রূপকে গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, ঈশ্বর যদি নিরপেক্ষ ও একমাত্র সত্তাই হন, অর্থাৎ

তিনি এমন কোন বস্তু, যাহার পার্শ্বে বা যাহার অভ্যন্তরে অপর কোন সত্তার অবস্থিতি অসম্ভব, তাহা হইলে ঈশ্বর কাহাকেই বা দেখিতেছেন,আর কাহাকেই বা বুঝিতেছেন ? আবার, তাঁহার অনন্ত ব্যাপ্তির ফলেও অনন্ত ?র বিরোধ জন্মে। অনন্ত গতি বা ঈশ্বরিক গতি সম্বন্ধে তাহা হইলে আমরা বলিতে বাধ্য যে, এই গতি পার্থিব গতি সমূহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহার উৎপত্তি-স্থল ঈশ্বর এবং ঈশ্বরেই ইহার পরিসমাপ্তি। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে অনন্ত গতি এবং অনন্ত বিরাম, উভয়ই এক। পুনশ্চ, ঈশ্বর সর্ব্বপ্রকার বিভেদ ও প্রভেদের অতীত বলিয়া ভেদজ্ঞানসূচক কোন শব্দেই তাঁহার ব্যাখ্যা হয় না। আমরা তাঁহাকে মঙ্গলময় বলি, কিন্তু এরূপ বলা ভুল। মঙ্গল এবং অমঙ্গলের কোন পার্থক্যই তাঁহাতে নাই। তাঁহাকে যে আমরা ঈশ্বর আখ্যা দেই, তাহাতেও তাঁহার যথার্থ পরিচয় হয় না। তাঁহাকে 'পরম সত্য' বলিলেও ভুল হয়; কেন না, সত্য বলিতেই অসত্যেরও জ্ঞান আসে ; অনন্ত মহাসত্তায় সত্য ও অসত্যের ভেদ থাকা অসম্ভব। এইরূপে, অনন্ত জীবন, অনন্ত ঐক্য, অনন্ত আলোক,—যে কোনরূপেই তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করি, তাহাতে বিরোধের সৃষ্টি হয়। ঈশ্বরে কাল ও মহাকাল, জীবন ও মৃত্যু, আলোক ও আঁধার, প্রভৃতির বৈপরিত্য ভাব নাই বলিয়া —তাঁহার প্রতি এই সকল শব্দের প্রয়োগই সমীচীন নয়। এমন কি, 'সত্তা' শব্দও তাঁহার প্রতি প্রযুজ্য নয়, কেন না—'সত্তা' হইতে 'অসত্তা'র ধারণা জন্মে। তিনি সত্যের অতীত, মঙ্গলের অতীত, অনন্তেরও অতীত ; তিনি জীবন, আলোক, ঈশ্বর, এমন কি, সত্তারও অধিক। অতএব, ঈশ্বরের স্বরূপ অবক্তব্য এবং অজ্ঞেয়। অ্যারিষ্টটলের কোন শ্রেণীবিভাগেই তাঁহার স্বরূপ অবধারিত হয় না। হইবেই বা কিরূপে? বস্তুবিশেষের ধারণা করিতে হইলে সেই বস্তুটীকে তদীয় 'ব্যাপক' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এমন কোন ব্যাপক শ্রেণীই নাই, ঈশ্বরকেই যাহার অধীন করা যাইতে পারে। সুতরাং ঈশ্বরের কল্পনা হওয়াই অসম্ভব ; ঈশ্বর তাহা হইলে একেবারেই কিছু নহেন। এ এক আশ্চর্য্য রহস্য।

যেমন ঈশ্বর সম্বন্ধে দৃষ্ট হইল, আত্মা সম্বন্ধেও তেমনি। আত্মারও অস্তিত্ব রহস্যময় এবং সে রহস্য দুর্ভেদ্য। আত্মার বিষয় আমরা এইমাত্র অবগত আছি যে, ইহা শক্তির আধার এবং গতিশীল। অনুভূতি, বুদ্ধি ও বিচার,—ইহার তিনটী পর্য্যায় এবং ইহারাই ঈশ্বরের ত্রিগুণাত্মিক রূপের মানবীয় প্রতিরূপ। দেহ এবং আত্মা, উভয়ই সম-সাময়িক, অর্থাৎ আত্মার সহিতই দেহের সৃষ্টি হইয়াছিল, তবে দেহ এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় পবিত্র নাই। পাপাচরণের ফলে ইহা এখন আদর্শ দেহ হইতে বহুদূরে নীত হইয়াছে এবং জন্মান্তর গ্রহণই আদর্শ দেহের সৌন্দর্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হওয়ার একমাত্র উপায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

জজ-কবি বরদাচরণ মিত্র

মৃত্যু ২৮শে জুন, ১৯১৫।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে খুলনা জেলার জন্য স্বতন্ত্র জেলা-জজ হয়। তাহার পূর্ব্বে যশোহরের জজ আসিয়া খুলনার দায়রার কার্য্য করিয়া যাইতেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে যশোহরের তদানীন্তন জজ মিঃ বি, সি, মিত্র (শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম-এ, সি-এস,) যখন দায়রার কার্য্য করিতে খুলনায় আসিয়াছিলেন, তখন এক দিন আমি পিতৃদেবের সহিত খুলনায় গিয়াছিলাম। জজ মিত্র একজন বড় কবি, তাহা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম—তাই তিনি খুলনায় আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার সহিত একটু আলাপ করিতে ইচ্ছা হইল। আমার পিতৃদেব খুলনার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, জেলার হাকিম-মহলে তাঁহার যথেষ্ট সম্ভ্রম ছিল। সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন। ছেলেবেলা হইতে অনেকবার তাঁহার সহিত অনেক জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়াছি—তাই তাঁহাকে এ কথা বলিলাম। কিন্তু জজ মিত্রের সহিত তাঁহার কোন দিন আলাপ পরিচয় ছিল না বলিয়া তিনি প্রথমে যাইতে একটু আপত্তি করিতেছিলেন, কিন্তু আমার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে যাইতে সম্মত হইলেন। জজ মিত্র তখন খুলনার সারকিট্ হাউসে ছিলেন। আমরা সে দিকে যাত্রা করিলাম। আমাদের গাড়ী সদর রাস্তার উপর দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে নামিয়া আমরা সারকিট্ হাউসের সীমানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, জজ মিত্র ও খুলনার তদনীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, আমেদ সাহেব বারান্দায় বসিয়া কথা বলিতেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেখানে দেখিয়া পিতৃদেব বলিলেন—'ভালই হইয়াছে'। আমাদিগকে ঢুকিতে দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট যেন জজ মিত্রকে কি বলিলেন—বোধ হয়, পিতৃদেবের পরিচয় দিলেন। তাঁহারা উভয়ে উঠিয়া আসিয়া জজ পিতৃদেবের হস্তধারণ করিয়া লইয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট একটু স্মিত হাস্য করিয়া আমাকে অভিনন্দিত করিলেন—তিনি আমাকে পূর্ব্ব হইতেই চিনিতেন।

সারকিট হাউসের বারান্দায় উঠিয়াই পিতৃদেব জজ মিত্রকে বলিলেন—'আজ আমার এই ছেলের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। সেও আপনি জেলার জজ বলিয়া নহে, এক জন বড় কবি বলিয়া। এইটী আমার তৃতীয় পুত্র। ইহার বাঙ্গালা সাহিত্যের দিকে একটু ঝোঁক আছে। মাসিক পত্রিকাদিতেও প্রবন্ধ লিখিয়া থাকে।' পিতৃদেবের এই কথা শুনিয়া জজ-কবি প্রশংসমান দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'বেশ, তুমি সাহিত্য-সেবী জানিয়া বড় সুখী হইলাম কিন্তু, আজ তোমার বাবাকে পাইয়াছি, প্রথম ইঁহার সহিতই গল্প করিব, পরে তোমার সহিত কথাবার্ত্তা হইবে—তুমি আমার Studyতে গিয়া ব'স।'

আমি জজ-কবির Studyতে ঢুকিয়া দেখি, নানাবিধ আইন পুস্তকের মধ্যে নানা রকমের মাসিক পত্রিকা ও কবিতা পুস্তক শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বিরাজ করিতেছে। পিতৃ-

দেব, জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট বারান্দায় বসিয়া নানা আলাপ করিতে লাগিলেন; আমি অতি সন্তর্পণে জজ-কবির পুস্তক ঘাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। হঠাৎ তাঁহাদের তর্কের ঝঙ্কার আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি শুনিলাম, জজ-কবি উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'Yes. I say that the Public women are the safety valves of the society'—এই কথায় আমি তাঁহাদের তর্কে মনোযোগ দিয়া বুঝিলাম যে, তৎসময়ে খুলনা সহরের স্থান বিশেষ হইতে বারনারীদিগকে স্থানান্তরিত করিবার প্রার্থনায় সহরের শিক্ষিত সম্প্রদায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন, উঁহারা সেই বিষয়েরই আলোচনা করিতেছিলেন। জজ-কবি কোন যুক্তিতে বারনারীদিগের সম্বন্ধে এই মত পোষণ করিতেন, তাহা জানি না—পরে যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখনও এ সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সুবিধা হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বঙ্গের আর একজন বড় কবি 'সম্ভাবশতক'-রচয়িতা কৃষ্ণচন্দ্রও সমাজে বারনারীদিগের আবশ্যকতা বিষয়ে এইরূপ মতই পোষণ করিতেন।

ইহার একটু পরেই তাঁহাদের তর্ক থামিয়া গেল—আমি পিতৃদেবের আহ্বানে বারান্দায় আসিলাম। জজ-কবি আমার নিকটে আসিয়া একটু যেন কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন—'আজ অসময় হইয়া গিয়াছে, তোমার সহিত কথা বলিতে পারিলাম না, তুমি আগামী রবিবারে এখানে আসিও, আমরা কথাবার্ত্তা বলিব।'

সে দিন আমরা বাড়ী চলিয়া আসিলাম। জজ-কবির নির্দ্দেশ মত রবিবারে বেলা ঠিক ১১টার সময় তাঁহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন আরাম-কেদারায় সেই দিনের দৈনিক কাগজ পড়িতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং 'এস,' বলিয়া আমার হাত ধরিয়া নিকটস্থিত একখানা চেয়ারে বসাইয়া দিলেন। আমার হাতে সেই সপ্তাহের একটা 'খুলনাবাসী' ছিল। জজ বলিলেন—'ওটা কি কাগজ?'

আমি—'খুলনাবাসী'।

জজ—'ইহার গ্রাহক-সংখ্যা কত?'

আমি—'প্রায় ৫০০ শত।'

জজ—'Enough for a Muffuassil Paper, তুমি কি এই কাগজে লিখিয়া থাক?' 'হ্যাঁ'

জজ—'তুমি কি কবিতা লেখ?'

আমি—'না, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়া থাকি।'

'বেশ, ভাল কথা—দেশের ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধার করার মত কাজ আর নাই। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিও, শোনা কথার উপর নির্ভর করিয়া কখনও ইতিহাস লিখিতে যাইও না। যাহা কিছু লিখিবে, নিজে পুস্তক পড়িয়া, বুঝিয়া, অনুসন্ধান করিয়া, সম্ভব, অসম্ভব, তুলনা করিয়া, তবে তাহা লিখিবে। আর যাহা কিছু লিখিবে, নিরপেক্ষ ভাবেই লিখিবে। ঐতিহাসিকের পক্ষে পক্ষপাতিতা দোষ বড় মারাত্মক—বড় অনিষ্টকর।' জজ আবার বলিলেন—'খুলনাবাসীতে কি কবিতা বাহির হয়?" 'মধ্যে মধ্যে দুএকটা হয় বটে কিন্তু প্রতি সপ্তাহে নহে। এ সপ্তাহে একটী বাহির হইয়াছে। কবিতাটী "নব্যভারতে" প্রকাশিত হইয়াছিল। কবিতার লেখক মহিলা-কবি মান-

কুমারী—খুলনাবাসীর সম্পাদক চারুবাবুর শ্বশ্রূ। এই কবিতাটী তিনি তাঁহার শিশু দৌহিত্র চারুবাবুর পুত্র মিনুকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন বলিয়া সহঃসম্পাদক "নব্যভারত" হইতে ইহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।'

কবি—'কবিতাটী কি, পড় ?' আমি কবিতাটী নিম্নস্বরে পড়িতে লাগিলাম। কবি বলিলেন—'ও কি—কবিতা কি ঐরূপ করিয়া পড়ে ? গলা ছাড়িয়া ধীর স্থির ভাবে পড়িয়া যাও।' আমি উচ্চ কণ্ঠে যতদূর সম্ভব গম্ভীর স্বরেই কবিতাটী পাঠ করিলাম। আমি যত ক্ষণ কবিতাটী পড়িতেছিলাম, ততক্ষণ তিনি তন্ময় হইয়া উহা শুনিতেছিলেন, পড়া শেষ হইলে তিনি বলিলেন—'কবিতাটী আমার বড় ভাল লাগিয়াছে—আর উহার দ্বিতীয় Stanza—"দুজনে বসিগে চল শিমুল তলায়
প্রকৃতি গহনাগুলি ওখানে রেখেছে খুলি
তাই আলোকিত বন হেন রক্তিমায়,
অথবা কে দেববালা— খুলিয়া সিন্দুর ডালা
হাসিয়া রাখিয়া দেছে তরুর গায়।"

প্রভৃতি শুনিয়া বলিলেন, 'আমার নিজের একটী কবিতা মনে হইতেছে—গত বৎসর বসন্ত কালে যশোহর হইতে খুলনায় আসিবার সময় পথিপার্শ্বে প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজি-বিরাজিত অসংখ্য শিমুল বৃক্ষের অনুপম সুষমা দেখিয়া আমার মন মুগ্ধ হইয়া যায়—এখানে পৌঁছিয়া এই সারকিট হাউসে বসিয়া সেই দিনও সেই কবিতাটী রচনা করিয়াছিলাম।' আমি সেই কবিতাটী দেখিতে চাহিলে তিনি বলিলেন—'সে কবিতা ত এখানে নাই।' এই বলিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—'আচ্ছা, লেখ।' আমি সম্মুখস্থ টেবেল হইতে কাগজ পেনসিল লইয়া বসিলাম—তিনি বলিতে লাগিলেন—

"বসন্তে কিংশুক।

রাঙ্গা কিংশুকে ফুটেছে বিলাস কার এ ?
শুষ্কশাখায় ; নিয়ে উচ্চে,
সধূম বহ্নি পুষ্পগুচ্ছে
জ্বলিছে কাহার আকুল তপ্ত ;
অবসর কামনা রে ?
শিশির শীর্ণ রিক্ত তরুতে
কিবা এ দৃশ্য মলয় মরুতে,—
অস্থি বিদারি শোণিত উৎস,
দীপ্ত লালসাসারে।
তুমি কি বৃক্ষ সমাধি মগ্ন
পল্লব শেষ তাপস লগ্ন,
বাসব-অপ্সরা কেন্দ্র হয়েছ
সংহরি বাসনারে ?
মদিরা-অধীর ঘন-রঞ্জিত,
চুম্বন তরে মণ্ডলীকৃত
কাহার মত অধর ওষ্ঠ,
মথিছে, কুসুমাকারে ?
অ-সুরভি শুধু বর্ণে শেষ
এ বিলাসে নাহি প্রেম লেশ
কাহার ব্যঙ্গ নিঠুর রঙ্গে
সঁপিয়াছে আপনারে ?
বসন্ত-দেহা উর্ব্বশী কি এ,
শান্তি বিলাশি পরশে ঘিরিয়ে,
দহিতে সমাধি জ্বেলেছে শতেক
দাবানল-নিভ মারে ?"

কবিতাটী লেখা হইয়া গেলে আমি বলিলাম—'আপনি একবার পড়িবেন কি ?' তিনি হাসিয়া বলিলেন—'কেন ?' আমি,—'কোন বড় কবির মুখে তাঁহার লিখিত কবিতার আবৃত্তি শুনিবার সৌভাগ্য এপর্য্যন্ত ঘটে নাই, আজ যখন সুযোগ উপস্থিত

হইয়াছে, তখন তাহা উপেক্ষা করিব কেন!'

কবি একটু নড়িয়া স্থির হইয়া বসিলেন, পরে মুদিত নেত্রে, তাঁহার করিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। কি তাঁহার ধীর, গম্ভীর, উদাত্ত স্বর—কি তাঁহার উচ্চারণ-ভঙ্গী। তাঁহার আবৃত্তি শুনিতে২ কবিতার ভাব যেন মনের মধ্যে স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া উঠিল—আমার মনে হইল, আমি যেন কোন ঋষির শান্তরসাস্পদ আশ্রমে বসিয়া তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠ-নিঃসৃত বেদপাঠ-ধ্বনি শ্রবণ করিতেছি। কবি আবৃত্তি শেষ করিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বরলহরী তখনও যেন আমার কর্ণকুহরে লীলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আমি বলিলাম,—'কবিতাটী আমায় দিবেন?'—'কেন?' 'আমি "খুলনবাসী"র জন্য ইহা চাহিতেছি।' তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, এ কবিতাটী তোমারই। তুমি ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পার।"

আমি—'আর একটী অনুমতি—কবিতার সঙ্গে আমি কিন্তু ইহার উৎপত্তির ইতিহাস-টুকুও লিখিয়া দিব।' কবি পুনরায় হাসিয়া বলিলেন—'তুমি ঐতিহাসিক মানুষ, সুতরাং তোমাকে নিষেধ করিলেই বা তুমি তাহা মানিবে কেন? তবে একটা কথা, কোন কথা বাড়াইয়া লিখিও না'। আমিও হাসিতে হাসিতে বলিলাম—'ঐতিহাসিকেরাও বাস্তব ঘটনা লেখে—আমি-ত আর কবি বা ঔপন্যাসিক নহি যে নয়কে হয় করিয়া লিখিব।' আমার কথা শুনিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

তার পর কিছুক্ষণ তিনি চুপ করিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন, পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'তুমি ত কবিতা লেখ না, কিন্তু কবিতা কি পড়ও না?' আমি—'কেন পড়িব না? খুব পড়ি।' 'কোন্ কবির কবিতা তোমার ভাল লাগে?' আমি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম—'আপনি কি মনে করিবেন, জানি না, কিন্তু কবি কৃষ্ণচন্দ্রের 'সদ্ভাবশতকের' কবিতা গুলি পড়িয়া আমি যত উপকার পাইয়াছি—যত আমোদ পাই, তত আমোদ আর কোন কবির কবিতা পড়িয়া পাই নাই।' তিনি বলিলেন—'একথা তুমি অমন ভয়ে ভয়ে বলিতেছ কেন? কবি কৃষ্ণচন্দ্র সাধক পুরুষ, তাঁহার কবিতাগুলি অসার কবিতা নয় যেন এক এক খণ্ড জীবন্ত হীরক। তাঁহার কবিতাগুলি যে শিক্ষাপ্রদ, উপদেশপূর্ণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার কবিতার তুলনা আধুনিক কবিতার সহিত হইতেই পারে না। আচ্ছা মাইকেল মধুসূদন, হেম-চন্দ্র ও নবীন বাবুর কবিতা সম্বন্ধে তুমি কি মনে কর?' আমি—'ইঁহারা সকলেই মহা-কবি, ইঁহাদের কবিতা সম্বন্ধে কোন কিছু বলিতে যাওয়া বোধ হয় ধৃষ্টতা হইবে, কিন্তু যদি সরলভাবে নির্ভয়ে বলিতে দেন, তাহা হইলে আমি নবীনচন্দ্রকেই সকলের চেয়ে উচ্চে আসন দিব।' কবি হাসিয়া বলিলেন, 'কেন স্বজাতীয় বলিয়া নাকি?' 'আজ্ঞে, যাহাই বলুন, আমি কোন যুক্তি দেখাইব না, বা তর্ক করিব না, আমার ধারণা যাহা তাহাই বলিলাম।' 'আচ্ছা, রবি বাবু?' রবি কবির প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী সন্দেহ নাই। তাঁহার লেখা বড় মোলায়েম কিন্তু মেয়েলী ধরণের, ঈষৎ ব্রাহ্ম-গন্ধ-যুক্ত, একটু আহ্লাদে যুতের এবং অনেক স্থলে অস্পষ্ট বলিয়া দুর্ব্বোধ্য।' কবি বলিলেন -'তোমার সহিত সর্ব্বত্র আমি এক-মত না হইলেও

তোমার কথাগুলি আমার লাগিতেছে বেশ।' আমি বাধা দিয়া বলিলাম—'দেখুন, আমাদের মতামতের কোন মূল্যই নাই, তবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাই দু-এক কথা বলিলাম মাত্র। আচ্ছা, এই কবিদিগের সম্বন্ধে আপনার কি মত বলুন না?' কবি বলিলেন, 'আমার মত'—এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, এমন সময় ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবের আরদালি আসিয়া সেলাম দিয়া একখানা চিঠি দিল, সেই চিঠি পড়িয়া কবি বলিলেন—'বিশেষ কার্য্যবশতঃ আমাকে এখনই একবার বাহির হইতে হইবে, এ বিষয়ের আলোচনা তোমার সহিত আর এক দিন করিব, কিন্তু শীঘ্র তাহার সুবিধা হইবে না, কারণ আমি কয়েকদিনের মধ্যেই এখান হইতে যাইতেছি—যশোহর গেলে অবশ্য আমার সঙ্গে দেখা করিবে—আমি অত্যন্ত সুখী হইব।' এই বলিয়া কবি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গভীর স্নেহে করমর্দ্দন করিয়া আমাকে বিদায় দিলেন। আমি সশ্রদ্ধ হৃদয়ে কত কথা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

ইহার পর একবার যশোহরে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন বলিয়া দেখা হয় নাই—হায়! আর তাঁহাকে দেখিলাম না, এ দুঃখ আমার জীবনে যাইবে না। তবে এই গভীর দুঃখের মধ্যে এখনও যখনই তাঁহার সরলতা, অমায়িকতা ও তাঁহার তানলয়যুক্ত মধুর আবৃত্তির কথা মনে পড়ে, তখনই যেন তাঁহার প্রতিভাব্যঞ্জক সৌম্য মূর্ত্তি আমার চক্ষুর সম্মুখে সজীব হইয়া উঠে—আমি তাঁহার অভাব ভুলিয়া যাই—এই টুকুই আমার সান্ত্বনা।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

অনন্ত প্রেম।

মানুষ চায় এক গেলাশ প্রেম, ঈশ্বর দেন সমুদ্র ভরা প্রেম। মানুষ বলে, অমুক লোকটা আমায় একটু ভালবাসলে প্রাণটা জুড়িয়ে যেত। ঈশ্বর বলেন, অরে ভ্রান্ত, সান্ত ছেড়ে অনন্তের কাছে আয়, এত পাবি, যা প্রাণের ভিতর রাখতে পারবি না, উবছে পড়বে। যদি ডুবতে চাস্, আয়।

জীবনের একটা বহির্ম্মুখী ভাব আছে। সেই বহির্মুখী ভাবটা লইয়াই প্রায় আমরা জীবন আরম্ভ করি। তারপর একটা বিশেষ সময়ে একটা বিশেষ ডাক শুনে আমাদের বহির্মুখী জীবন অন্তর্মুখী হয়। একেই বলে Conversion বা মন ফেরা। Conversionটা এক মুহূর্ত্তে হয়, তবু মনের বহির্মুখী বৃত্তি গুলির টান এক মুহূর্ত্তে যায় না। সময়, সাধন ও সংগ্রামের দরকার হয়।

পিপাসাই যে পাপ, তাহা নয়। পিপাসার অন্যায্য চরিতার্থতার অভিলাষে পাপ। সে দিকে টান হওয়া উচিত নয়, সে দিকে টান হওয়ার নাম পাপ। যখন ন্যায় পথে টান হয়, তখন মানুষের মুক্তি হয়। মুক্তি

তত্ত্বটা যত জটিল বলে আমরা মনে করি, উহা তত জটিল নহে।

পিপাসা অনন্ত। অনন্ত ভিন্ন প্রাণের পিপাসা মেটে না। এটা পরীক্ষিত সত্য—যুক্তি তর্কের আবশ্যক নাই। পিপাসা মিটিবে বলে সান্তের দিকে ধাবমান হওয়া—সান্তকে প্রাণ ভরে আলিঙ্গন করার ইচ্ছা বা প্রয়াসের নাম মোহ। ইহারই অপর নাম পাপ।

যে সান্তের দিকে ধাবমান হয়, সে সান্তেই অনন্ত কল্পনা করে। এটাও জীবনের পরীক্ষিত সত্য। মনে হয় ঐ জিনিসটায় বা ঐ মানুষটায় কি মজাই পাব। ডুবে ডুবে পান করবো। সে পান—সে ভোগ শেষ হবে না। এই সান্তে অনন্তের কল্পনাই পৌত্তলিকতা। যারা পুতুল বানাইয়া পূজা করে, তারাই যে পৌত্তলিক, তাহা নহে। যারা সান্তে অনন্ত কল্পনা ক'রে তাতে ডুবতে চায়, তারাই প্রকৃত পৌত্তলিক।

সান্তে অনন্তের কল্পনা পৌত্তলিকতা বটে, কিন্তু সান্তের মধ্য দিয়াই অনন্ত প্রকাশিত, এটাও একটা পরীক্ষিত সত্য। শুধু দৃষ্টি-ভেদ। পিপাসিত পৌত্তলিক ঐ সান্তকেই সার ও অনন্ত মনে করে, একারণ সে মোহ-গ্রস্ত—মূঢ়। কিন্তু যে ডাক শুনেছে—যার চক্ষু খুলে গেছে—সে প্রতি অণু পরমাণুতে অনন্তকেই দেখে। ঘাট ছোট, কিন্তু সে ঘাটে যে সমুদ্র লেগে আছে, তাহা অপার, অতলস্পর্শী, অনধিগম্য।

সান্তে অনন্তের কল্পনা ও সান্তে অনন্তের প্রকাশ, এই দুই তত্ত্বের প্রভেদ যিনি জানেন, তিনিই তত্ত্বজ্ঞানী। যে সান্তে অনন্তের কল্পনা করিয়া চারদিকে দৌড়ায়, সে পাগল। যিনি সান্তে অনন্তের প্রকাশ দেখিয়া সে অনন্তে আপনার পিপাসা মিটান, তিনি জ্ঞানী। যিনি নিঝুম হয়ে ডুবে থাকেন, তিনি যোগী। যিনি অনন্তের মাঝে আত্ম অস্তিত্ব খুঁজে পান না, তিনি নির্ব্বাণী। ভক্তি, যোগ ও নির্ব্বাণ-তত্ত্ব ইহারই নাম।

সাধকের শিক্ষক হওয়া উচিত কিনা, তাহা আমি জানিনা। শাক্য মুনি সাধন ক'রে যা পেয়েছিলেন, তা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন; যীশুখ্রীষ্ট প্রাণে যে পিতার প্রেম উপলব্ধি করেছিলেন, জগতের সম্মুখে সে পিতার প্রেম ঘোষণা করে গেছেন; শ্রীচৈতন্য যে ভক্তির পেয়ারে ভাসতেন, তাতে "শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়" হয়ে পড়েছিল। যদি সাধকগণ শিক্ষক না হতেন, তবে আমরা সাধন-পথ কি করে জানতেম? এ কারণ সাধকেরা শিক্ষক হয়ে গেছেন, যা তাঁরা পেয়েছেন, তা জগতকে দিয়ে গেছেন, বা দিতে চেষ্টা পেয়ে গেছেন।

তবু অনেক সময় মনে হয়, চোখ বুজে বসে থাকতে যে সুখ, চোখ খুলে সে সুখ যেন পাই না। মৌনী হয়ে প্রেম জিনিসটা ভোগ করার যে সুখ, মুখ ফুটে পথে পথে প্রেমের ছড়া গাইতে সে সুখ যেন হয় না। ইহার কারণ কি? আমরা নিম্নস্তরের সাধক, তাঁহারা উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। নিম্ন-স্তরের সাধকের মুখ ফুটে কথা কওয়া উচিত নয়। তার গুরু হওয়ার অধিকার নাই। গুরু হতে গেলে সে আত্মপূজা করিবে ও আত্মপূজা চাহিবে।

আমি বড় ধার্ম্মিক হয়ে পড়েছি—আমি সান্তের আড়ালে অনন্তের দেখা পেয়েছি, এই অনুভূতির নাম আত্মপূজা। "অরে! তুই কেরে? যে তুই কিছু হয়েছিস্? তুই কিছু পেয়েছিস্? উপর থেকে ঝরণা বয়ে আস্‌ছে, মাথা পেতে চুপ করে তার নীচে

বসে থাক্, আমি আমি ক'রে চেঁচাসনে।" আত্মপূজা সাধকের পরম শত্রু। যেমন মেঘ এসে সূর্য্যকে ঢেকে ফেলে, তেমনি এই আত্ম-পূজা ব্রহ্ম-স্বরূপকে প্রাণের সম্মুখে প্রচ্ছন্ন রাখে। নিম্নস্তরের সাধক এ শত্রুকে হত না করিয়া প্রচারক, শিক্ষক বা গুরুরূপে জগতের সম্মুখে গিয়া কেবল আত্মহত্যা করে।

বেদী বা পুলপিটে চড়ে একটা উপদেশ বা সার্ম্মন্ দিয়ে যখন নেবে আসি, তখন প্রাণটা আইচাই করে, কখন কে এসে বল্‌বে, "মহাশয়! আপনার সার্ম্মন্‌টা আজ অতি চমৎকার হয়েছিল!" এই আকাঙ্ক্ষায় গম আত্ম পূজা। জগতের অধিকাংশ মন্দির, মস্‌জিদ ও গির্জ্জায় এই আত্ম-পূজা হইতেছে, তাই জগৎ পরিত্রাণ পাইতেছে না।

এ কারণ নিম্নস্তরের সাধকেরা গুরু হওয়ার অধিকার নাই। "আত্ম" জিনিসটা না মরিলে না অনন্ত প্রেমের স্বাদই পাওয়া যায়, না অনন্ত প্রেম প্রচারই করা যায়। মৃত্যুর নাম জীবন—ইহারই নাম নির্ব্বাণ-তত্ত্ব, ইহারই নাম ক্রুশ তত্ত্ব। বুদ্ধ গয়া ও যেরুশালেম তীর্থে না গেলে এ তত্ত্ব বোঝা যায় না।

সান্তে অনন্তের লীলা। প্রেম জিনিসটা সান্ত দ্বারাই অনন্ত বুঝাইয়া দিতেন। দিন কতক হ'ল একখানা ইংরেজী পুস্তকে পড়িতেছিলাম "one loving heart sets another on fire" কথাটা মহর্ষি অগষ্টিনের। কথাটা কাণের ভিতর প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। এই সময় একবার ভ্রমণে বার হ'বার সুযোগ হইল। কিন্তু সুযোগের সঙ্গেই আবার একটু জ্বর আসিল। জ্বর গায়ে দূরদেশে যাওয়া সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। কাজেই যে বন্ধুর কাছে যাবার কথা ছিল, তাঁকে তার-যোগে সংবাদ দিবার জন্য তার ঘর হইতে তারের কাগজ আনাইয়া লইলাম। তার লিখিতেই যাইতেছিলাম, এমন সময় বন্ধু প্রবরের একখানা কার্ড পেলেম "আমি গয়া ষ্টেসনে তোমার জন্য অপেক্ষা করিব।" বন্ধুপ্রবর ৩০।৩৫ মাইল ব্রাঞ্চ লাইন থেকে এসে দুপুর রেতে আমার জন্য ষ্টেসন প্ল্যাটফর্ম্মে অপেক্ষা করবেন। অমনি প্রেমের আগুন প্রাণে জ্বলে উঠলো। "one loving heart sets another on fire" জ্বর যেন পালিয়ে গেল। অমনি মেল ট্রেনে অসুস্থ দেহেই রাত্রি ১১টায় রওয়ানা হইলাম। রোহিলখণ্ড ও অযোধ্যা প্রদেশ দিয়া চলিলাম। কত বড় বড় নগর আসিল, কিন্তু মনটা গয়ায়। পরদিন অপরাহ্নে মোগলসরাই পৌঁছিলাম—তথায় গাড়ি বদলাইয়া রাত্রি ১২টার কিছু পরে গয়া পৌঁছিলাম। বন্ধু প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছেন। "one loving heart sets another on fire."

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

শ্রীহরিদাস ঠাকুর।

আজ ভাদ্র মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশী তিথি। প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে পুরী ধামে সিদ্ধ বকুল তলায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সম্মুখে শ্রীহরিদাস দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহারই পুণ্যস্মৃতি অনুসরণ করিয়া তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে বাসনা হইতেছে।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাকালে তাঁহার যে সমস্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীহরিদাস একজন প্রধান। এই ভক্ত প্রবরের জীবন-কাহিনী আলোচনায় পুণ্য আছে। প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসে পুরী-ধামে তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে বিশেষ সমারোহের সহিত উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে অনেক সাধু বৈষ্ণবের শুভাগমন হয়। বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষ পরিচিত প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজি তাঁহার মধুর কীর্ত্তন দ্বারা সকলকে মোহিত করিয়া থাকেন।

শ্রীহরিদাস বনগ্রামের নিকটবর্ত্তী বুঢ়ন-গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং কিছুকাল পরে নিজগৃহ ত্যাগ করিয়া বেনাপোলের বনমধ্যে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সাধন ভজন করিতে থাকেন। কেহ কেহ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু এসম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ আছে কিনা জানি না। যদি কেহ এবিষয়ে বিশেষ প্রমাণ জ্ঞাত থাকেন, তাহা প্রকাশ করা উচিত। আমার বোধ হয়, মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ বশতই হরিদাসের ন্যায় মহাভক্তের উক্ত বংশে উদ্ভব কল্পন করিতে কেহ কেহ কষ্ট পাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান বৈষ্ণবসমাজে উক্ত মতানুবর্ত্তী কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। কি কারণ তিনি মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহার বাল্যশিক্ষা ইত্যাদি কি ভাবে এবং কোথায় সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহাও জানা যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থদ্বয়ে তাঁহার সম্বন্ধে স্থানে স্থানে কিছু আলোচনা আছে, আহাই অবলম্বন করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলো-চনা করিতে বাসনা করি।

বেনাপোলের কুটীরে সাধন ভজনের সময় তিনি তন্নিকটস্থ ব্রাহ্মণপল্লী হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন এবং প্রতি রোজ ৩ লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। এই নাম জপ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার সাধন ক্রিয়া তাঁহার ছিল না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নাম সাধন করিতে করিতে ভগবানে প্রেম হইবে। এবং সেই প্রেম হইতেই মোক্ষ মুক্তি যাহা কিছু জীবের পুরুষার্থ, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। বস্তুতঃ মুক্তি পাপনাশ প্রভৃতি নাম সাধনের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র।

বেনাপোলে বাসকালে তথাকার সমস্ত লোক হরিদাসের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী হইয়াছিল। ইহাতে তথাকার দেশাধ্যক্ষ রামচন্দ্র খান হরিদাসের এই প্রকার প্রভাব দর্শনে অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাঁহার বৈরাগ্য-

ধর্ম্ম নাশ করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। শেষে এক যুবতী বেশ্যার সহিত যুক্তি করিয়া তাহাকে হরিদাসের নিকট প্রেরণ করিলেন। যুবতী নানাপ্রকার বেশ ভূষা ধারণ করিয়া হরিদাসের ধর্ম্মনাশ করিবার জন্য রজনীযোগে তাঁহার নির্জ্জন কুটীরে আগমন পূর্ব্বক নানাপ্রকার হাবভাব প্রদর্শন করিয়া বলিল "হে বৈষ্ণব চূড়ামণি, আপনার এই প্রথম যৌবন। এই বয়সে সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে হাস্য পরিহাস দ্বারা কালাতিপাত করাই সঙ্গত মনে করি। আমি আপনার সহিত সঙ্গম বাসনায় রজনীযোগে স্বইচ্ছায় সমাগতা হইয়াছি। আমার মনোভিলাষ পূর্ণ করতঃ আমাকে সুখী করুন এবং আপনিও পরমানন্দ লাভ করুন।" বেশ্যা এই প্রকার বলিয়া তাঁহার কুটীরের সম্মুখে উপবেশন করিল। হরিদাস উত্তর করিলেন "হে সুন্দরি, তুমি অপেক্ষা কর। আমি তিন লক্ষ নাম জপের ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, উহা সমাপ্ত হইলেই তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ করিব।" এই কথা বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বেশ্যা তথায় উপবেশন করিয়া নাম শ্রবণ করিতে লাগিল, কিন্তু সমস্ত রজনীতেও তাঁহার নাম জপ সমাধা হইল না। প্রাতঃকাল সমাগত দেখিয়া বেশ্যা দুঃখিতচিত্তে তথা হইতে উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিলে হরিদাস বলিলেন, "দেখ সুন্দরি, অদ্য রজনীতে আমার নাম সাধন ব্রত সমাধা হইল না, তুমি আগামী রজনীতে আগমন করিও।" বেশ্যা রাম চন্দ্র খানের নিকট গমন করিয়া সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিল এবং দ্বিতীয় রজনীতে সফলকাম হইবে বাসনা করিয়া পুনরায় হরিদাসের কুটীরে আগমন করিয়া উপবেশন করিয়া রহিল। কিন্তু সে রজনীতেও তাঁহার নাম সাধন সমাপ্ত না হওয়ায়, বেশ্যা সে বারেও হতাশ হইয়া প্রতিগমন করিল এবং তৃতীয় রজনীও ঐ প্রকারে গত হইলে বেশ্যার মনে মনে অনুতাপ আরম্ভ হইল। হরিনাম শ্রবণের গুণেই হউক বা হরিদাসের ন্যায় সাধুসঙ্গের প্রতাপেই হউক বেশ্যার সম্পূর্ণ বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তখন সে ক্রন্দন করিতে করিতে হরিদাসের পাদমূলে পতিত হইয়া বলিতে লাগিল "হে প্রভু, আমার গতি কি হইবে? আমি রামচন্দ্র খান কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াই ভবাদৃশ মহাভাগবতের প্রতি অতি গর্হিত আচরণ করিয়াছি। এক্ষণে আমার উদ্ধারের উপায় কি?" হরিদাস বলিলেন আমি রামচন্দ্র খানের এই দুরভিসন্ধির বিষয় পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছি। আমি প্রথম দিবসেই এস্থান হইতে প্রস্থান করিতাম, শুধু তোমার উদ্ধারের জন্যই এতদিন অবস্থান করিয়াছি, তুমি গৃহে গমন করিয়া তোমার যাহা কিছু দ্রব্য সামগ্রী আছে, সে সমস্ত ব্রাহ্মণকে দান কর এবং মস্তক মুণ্ডন করিয়া এখানে আগমন পুর্ব্বক এই কুটীরে বাস করিয়া সতত হরিনাম জপ ও তুলসী পূজা সম্পাদন কর।" এই কথা বলিয়া হরিদাস সেই বেনাপোলের নির্জ্জন কুটীর পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুরের নিকট ফুলিয়া গ্রামে গমন করিয়া গঙ্গাতীরে গুফা নির্ম্মাণ করিয়া বাস কবিতে লাগিলেন।

হরিদাস সদা সর্ব্বদাই উচ্চৈঃস্বরে নাম জপ করিতেন। এই কারণে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহারা হরিদাসের কার্য্যে নানা প্রকার দোষারোপ করিতে লাগিলেন। এক-

দিন এক ব্রাহ্মণ হরিদাসের এই প্রকার উচ্চনাম কীর্ত্তনরূপ ধৃষ্টতা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া তাহার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে হরিদাস! তোমার একি প্রকার ব্যবহার? তুমি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম জপ কর কেন? মনে মনে জপ করিলে কি সফলকাম হওয়া যায় না। উচ্চৈঃস্বরে নাম করিয়া সকলের অশান্তি উৎপাদন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। আর শাস্ত্রাদিতেও এপ্রকার ব্যবস্থা নাই, বরং নিষেধই আছে। উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন করিলে ভগবানের নিদ্রাভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা এবং তাহা হইলে দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারি প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া লোক ধ্বংস করিবে।"

ইহার উত্তরে শ্রীহরিদাস যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্যভাগবত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"উচ্চ করি লইলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ ত না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয়॥
শুন বিপ্র সকৃত শুনিলে কৃষ্ণ নাম।
পশু পক্ষী কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম॥
পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সবে তরে॥
জাপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর উপকার করে॥

*   *   *   *

কেহ আপনার মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় শুন উচ্চ সংকীর্ত্তনে॥"

হরিদাসের উপরোক্ত বাক্যগুলির মধ্যে যে মহৎভাব নিহিত আছে, তাহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। সাধন ভজনে এ প্রকার উদার ভাব অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। নামের প্রতি এতদূর দৃঢ় অনুরাগ পরম সৌভাগ্যের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফুলিয়াগ্রামে বাস কালে শ্রীহরিদাস শ্রীযুক্ত অদ্বৈত আচার্য্যের সহিত পরিচিত হন এবং ঘটনাক্রমে বৈষ্ণবধর্ম্মের আদি গুরু শ্রীযুক্ত মাধবেন্দ্র পুরী মহাশয় তথায় আগমন করিলে তাঁহারা উভয়েই পুরী মহাশয়ের নিকট দীক্ষিত হয়েন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য হরিদাসের অদ্ভুত ভক্তি ও নামকীর্ত্তনে দৃঢ় বিশ্বাস দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে, একদিন তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধপাত্র কোন বিশেষ বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে দান না করিয়া, হরিদাসকেই বেদবিৎ ব্রাহ্মণ জ্ঞানে উহা তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে সমস্ত সামাজিক ব্রাহ্মণ এবং অদ্বৈত আচার্য্যের আত্মীয় স্বজন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গৃহে ভোজন করেন নাই—সুতরাং ব্রাহ্মণ-ভোজন না হওয়াতে তিনিও সপরিবারে উপবাস থাকিতে বাধ্য হয়েন। তৎপর অনেক অনুনয় মিনতির পর ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধের দ্বিতীয় দিনে সিদা লইতে স্বীকৃত হয়েন। আচার্য্য মহাশয় তদনুসারে ব্রাহ্মণদিগকে সিদা প্রদান করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ব্রাহ্মণগণ অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সেই গ্রামে ও তাহার নিকটস্থ গ্রামসমূহে একটুকুও অগ্নি প্রাপ্ত হয়েন নাই। এই ব্যাপারটী আচার্য্য মহাশয়ের ঐশ্বর্য্য জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহার গৃহে আগমন পূর্ব্বক পূর্ব্বদিনের অন্ন ব্যঞ্জন আহার করেন। তৎপর আচার্য্য মহাশয় তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া হরিদাসের গুফায় গমন করেন এবং তথায় অগ্নি বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিয়া অতিশয়

আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন। এই ঘটনাটীর বিবরণ বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-শাস্ত্র নামক পুস্তকে লিখিত আছে। ইহা যে সত্য ঘটনা, তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ শ্রীহরিদাস দেহত্যাগ কালে পুরী-ধামে মহাপ্রভুর সম্মুখে বলিয়াছিলেন, যথা—

"অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া।
বিপ্রের শ্রাদ্ধ পাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইয়া॥"

ফুলিয়া গ্রামে অবস্থান কালে যবন রাজ কর্ত্তৃক শ্রীহরিদাস যে প্রকার লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, একটু তাহার উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করি। তথায় অবস্থান কালে তিনি অতি আনন্দের সহিত গঙ্গার তীরে তীরে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইতেন। হরিদাস যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দু দেবতার নাম করিতেছে দেখিয়া তত্রস্থ কাজি মহাশয় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার অধিপতির নিকট সমস্ত বিবরণ গোচর করিলেন। অধিপতি মহাশয় হরিদাসকে তাঁহার নিকট আনিতে আজ্ঞা প্রদান কারলেন।

যে সময়ে হরিদাস যবন কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া অধিপতির নিকট গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে বহু বন্দী তাঁহাকে দর্শন করিয়া অতি আনন্দিত হয়েন এবং তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে অবলোকন করিয়া ভক্তিভাবে নমস্কার করেন। কৃষ্ণভক্তের দর্শন মাত্রেই সেই সমস্ত বন্দিগণের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির উদয় হইল এবং ঠিক সেই সময়েই তিনি সকলকে—

"থাক থাক এখন আছহ যেনরূপে
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ করি হাসেন কৌতুকে"

হরিদাসের এই প্রকার আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিয়া বন্দিগণ মনে করিলেন, তাহাদিগকে চিরকাল বন্দিভাবেই থাকিতে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং অত্যন্ত বিপদ প্রাপ্ত হইলেন। তখন হরিদাস তাহাদিগের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া আশীর্ব্বাদের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "হে বন্দিগণ! আমি কখন কাহাকেও মন্দ আশীর্ব্বাদ করি না। তোমাদের হৃদয়ে এইক্ষণে যে কৃষ্ণ ভক্তির উদয় হইয়াছে, উহাই যেন চিরকাল বর্ত্তমান থাকে। বন্দিদশা হইতে মুক্ত হইয়া সংসারে গমন করিলে বিষয়-চিন্তাতে পুনর্ব্বার তোমাদের হৃদয় মলিন হইতে থাকিবে, সুতরাং—

"বিষয়েতে থাক কিবা থাক যথা তথা।
এই বুদ্ধি কভু না পাসরিহ সর্ব্বথা॥"

তদনন্তর হরিদাস অধিপতির নিকট আনীত হইলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই! তুমি অতি উচ্চ যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কেন কাফেরের ধর্ম্মাচরণ করিতেছ। ইহাতে তোমার পরকালে যে দুর্গতি হইবে, তাহা একটুও চিন্তা করিতেছ না? যাহা হউক, অজ্ঞানে এতদিন যাহা করিয়াছ, তাহা এক্ষণে কলমা পড়িয়া সংশোধন কর।" হরিদাস ইহার প্রত্যুত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিলাম—

বলিতে লাগিল তারে মধুর উত্তর।
শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর॥
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে।
পরমার্থ এক কহে কোরাণে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হইয়া বৈসে সবার হৃদয়॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেইমত কর্ম্ম করে সকল ভুবন॥

এতেকে আমারে সে ঈশ্বর যে হেন।
লওয়াইয়াছে চিত্তে করি আমি তেন॥
হিন্দুকুলে কেহ হেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনে আসিয়া হয় স্বইচ্ছায় যবন॥
হিন্দু বা কি করে তারে যার সেই কর্ম্ম।
আপনেই মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম্ম॥"

হরিদাসের উপরোক্ত সুযুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কোন ব্যক্তিই সন্তুষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং মুলুক পতি এবং অন্যান্য যবনগণ বিশেষ প্রীত হইলেন, কিন্তু কাজি মহাশয় কিছুমাত্রও সন্তুষ্ট না হইয়া অধিপতিকে বুঝাইয়া দিলেন যে, এক্ষণে হরিদাসকে যদি শাস্তি প্রদান করা না হয়, তবে অনেক যবন হয়তো তাহারই মত হিন্দু আচরণ অবলম্বন করিবে। কাজি বলিলেন, উহাকে বাইশ বাজারে এই প্রকার প্রহার করা কর্ত্তব্য, যাহাতে উহার জীবন শেষ হয়। যদি এই প্রকার প্রহারেও উহার জীবনান্ত না হয়, তবে বুঝিব, উহার কথা সত্য এবং ঐ ব্যক্তি একজন জ্ঞানী। তখন অধিপতি মহাশয় হরিদাসকে পুনরায় বলিলেন "ভাই! তুমি নিজের মুসলমান ধর্ম্ম আচরণ কর, নচেৎ তোমাকে কঠিন শাস্তি প্রদান পূর্ব্বক জীবনান্ত করিব এই ভয়ানক শাস্তির কথা শ্রবণ করিয়া হরিদাস নির্ভীকচিত্তে যে প্রকার উত্তর করিয়া। ছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া আমরা বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকি। তিনি উত্তর করিলেন—

"খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরি নাম॥"

আমরা অতি ক্ষীণ বিশ্বাসী মানব। ইহা আমাদের অনুমানেও আইসে না যে, ভগবানের প্রতি কতটা দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে মানুষ ঐ প্রকার দৃঢ়তার সহিত বাক্য বলিতে সক্ষম হয়। আমরা সামান্য স্বার্থের আশঙ্কায় পদে পদে ভগবানের প্রতি বিশ্বাসহীনতার পরিচয় দিয়া থাকি, আর শ্রীহরিদাস তাঁহার মৃত্যু আসন্ন জ্ঞাত হইয়াও অতি তেজের সহিত বলিলেন—

"খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

হরিদাস যখন কিছুতেই যবন ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে স্বীকৃত হইলেন না, তখন তাঁহাকে বাইশ বাজারে অতি কঠোরভাবে প্রহার আরম্ভ হইল। অবশ্য এই প্রহারে যে ফল হইয়াছিল, তাহা চৈতন্যভাগবতপাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। যে ব্যক্তি অনন্যগতি হইয়া ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে, তাঁহাকে ভগবান রক্ষা না করিলে জগতে কেহ ভগবানের অস্তিত্বও স্বীকার করিত না এবং তাঁহার শাস্ত্র-বাক্যও মিথ্যা হইয়া যাইত। সকল ধর্ম্মেই হরিদাসের ন্যায় মহাভক্তের জন্ম হইয়াছিল বলিয়াই জগতে ধর্ম্মের এতদূর প্রাদুর্ভাব বর্ত্তমান দেখা যায়। শাস্ত্রের উপদেশ অপেক্ষা শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত অধিক ফলপ্রদ, তাহাতে সন্দেহ নাই। হরিদাসকে বাইশ বাজারে কঠিন প্রহার করাতেও তাহার মৃত্যু হইল না। তিনি নামানন্দে মত্ত হইয়া একটুও দুঃখ প্রকাশ করিলেন না। এই প্রহারের সময়েও তিনি কি ভাবনা করিয়াছিলেন?

"এ সব জীবের প্রভু করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ॥"

যাহারা তাঁহাকে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিতেছে, তাহাদেরই মঙ্গলের জন্য ভগবানের

নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। এ প্রকার দয়ার আদর্শ হরিদাসে দেখিতে পাওয়া যায়; আর দেখা যায়, প্রেমাবতার খ্রীষ্টের জীবনে। খ্রীষ্ট যখন বধ্যস্থানে নীত হইলেন, তিনিও ঐ ভাবেই বলিয়াছিলেন—

"Father, forgive them for they do not know what they are doing".

আর দয়ার নিতাই যখন জগাই মাধাই কর্ত্তৃক প্রহারিত হইয়াছিলেন, তখন তিনিও বলিয়াছিলেন—

"মেরেছ ভাই কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না?" এই নিতাইয়ের সঙ্গে শ্রীহরিদাসও উপস্থিত ছিলেন, তবে তাঁহার কপালে কলসীর কাণা নিক্ষেপিত হয় নাই।

কঠিন প্রহারেও হরিদাসের মৃত্যু হইল না দেখিয়া প্রহারকারিগণ অত্যন্ত ভীত হইল। তাঁহারা তখন হরিদাসকে অবশ্যই একজন পীর বলিয়া অনুমান করিয়াছিল। হরিদাস তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সমাধিযুক্ত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকিলেন। প্রহারকারিগণ আনন্দিত হইয়া কাজির নিকট হরিদাসের মৃত্যু সংবাদ প্রদান করিল। কাজি মহাশয় তাহার মৃতদেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলে পাছে তাহার পরকালে গতি হয়, আশঙ্কা করিয়া উহা গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু লোকে বহু চেষ্টা করিলেও হরিদাসের দেহ উত্তোলন করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে পারিল না। তৎপর হরিদাস সমাধিভঙ্গ করিয়া পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা দর্শন করিয়া সকলেই অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ জ্ঞানে ত্যাগ করিলেন এবং যথেচ্ছা ধর্ম্মপালনে অনুমতি প্রদান করিলেন। হরিদাস পুনরায় ফুলিয়া গ্রামে গমন করিয়া শ্রীযুক্ত অদ্বৈত মহাপ্রভুর সহবাসে গঙ্গাতীরে উচ্চ হরিনাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে হরিদাস বৈষ্ণব দেখিবার ইচ্ছা করিয়া ফুলিয়া ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আগমন করিলেন। এ সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকাশ হয় নাই, তিনি তখন টোল করিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। হরিদাস নবদ্বীপের বৈষ্ণবসমাজে আদৃত হইলেন। শ্রীযুক্ত আচার্য্য গোঁসাই হরিদাসকে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং নিজ প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়জ্ঞানে তাঁহাকে যত্ন করিতে লাগিলেন। এই বৈষ্ণব-সমাজে আগমন করিয়া হরিদাস সকলকেই অত্যন্ত ভক্তি করিতে লাগিলেন এবং যবনগণ তাঁহাকে যে প্রকারে কষ্ট প্রদান করিয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া অতি সুখানুভব করিতে লাগিলেন।

হরিদাস নবদ্বীপে আগমনের পর শ্রীচৈতন্য গয়া গমন করেন। তথা হইতে পুনরাগমন করিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ইত্যাদি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল "কৃষ্ণরে, বাপরে, কোথা গেলিরে" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীনিমাই পণ্ডিতের ন্যায় মহা-মহোপাধ্যায় ব্যক্তিতে মহাভক্তির আবির্ভাব দর্শন করিয়া বৈষ্ণব সমাজ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। হরিদাসও এ সংবাদে সুখী হইলেন। কিছু দিন পরে শ্রীবাসের গৃহে শ্রীনিমাইয়ের মহাপ্রকাশ হয়, সেই সময়ে তিনি যে সমস্ত অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন,

তাহার বিবরণ লেখা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তবে সেই সময়ে হরিদাস সম্বন্ধে যে ঘটনাটুকু ঘটিয়াছিল, তাহাই আমরা এস্থানে প্রকাশ করিতে বাসনা করি।

মহাপ্রকাশের সময় মহাপ্রভু হরিদাসকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"হরিদাস! যে সময়ে পাষণ্ডগণ তোমাকে প্রহার করিতেছিল, সেই সময়ে তাহাদিগকে শাস্তিপ্রদান জন্য আমি আমার চক্র ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার চক্র পাষণ্ডদিগকে কিছুই করিতে পারে নাই; কারণ তুমি সেই সময়ে তাহাদিগের মঙ্গলকামনা করিয়া বলিয়াছিলে "হে প্রভু! এই সমস্ত জীবের মঙ্গল বিধান কর, আমাকে দ্রোহ করিয়া ইহাদের যেন কোন অপরাধ না হয়।" তোমার এই প্রকার প্রার্থনা হেতু আমার চক্র পাষণ্ডদিগকে কোন অনিষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই। তোমার পৃষ্ঠে যে সমস্ত প্রহার হইয়াছিল, সেই সমস্ত প্রহারের চিহ্ন তুমি আমার পৃষ্ঠে দর্শন করিতে পার। মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়া হরিদাস অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত আঙ্গিনায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে কিছু বর দিতে চাহিলেন, তিনি এই বর প্রার্থনা করিলেন—

"তোমার চরণ ভজে যে সকল দাস।
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস॥
সেই সে ভজন মোর হউ জন্ম জন্ম।
সেই অবশেষ মোর ক্রিয়া কুল ধর্ম্ম॥
শচীর নন্দন বাপ কৃপা কর মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত ঘরে॥"

তদনন্তর মহাপ্রভু তাঁহাকে বর দিলেন, যথা—

"মোর স্থানে মোর সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে।
বিনা অপরাধে ভক্তি দিল তোরে দানে॥"

এই বরপ্রদান করিয়া সমস্ত ভক্ত জয় জয় মহাধ্বনি করিয়া বলিতে লাগিলেন যথা—

"জাতি কুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমদর আর্ত্ত বিনা না পায় কৃষ্ণেরে॥
যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিও সর্ব্বোত্তম সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥
এই তার প্রমাণ যবন হরিদাস।
ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ দেখিল প্রকাশ॥"

বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল নীতি জগতের সর্ব্বজীব অপেক্ষা নিজকে অতি হীনজ্ঞান করা এবং এই নীতিটী হরিদাস ঠাকুরে অতি বিশিষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবধর্ম্মের এই ভাবটী কিন্তু সর্ব্ববাদীসম্মত নহে। কেহ কেহ আপত্তি উঠাইয়া বলেন, নিজকে অত হীন জ্ঞান করা অথবা সদাসর্ব্বদা নিজকে মহাপাপী জ্ঞান করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। উপনিষদে আছে—"শৃণ্বন্তি বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ" অর্থাৎ সমস্ত মানবজাতিকে অমৃতের পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে। অমৃতের পুত্র অবশ্য অমৃত, সুতরাং মানবজাতি মহাপাপী বা সর্ব্বপ্রাণী অপেক্ষা হীন নহে। অবশ্য এই প্রতিপাদটী জ্ঞানীর পক্ষে যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু বৈষ্ণবগণ জ্ঞান আদৌ গ্রাহ্য করেন না। তবে যে জ্ঞান দ্বারা কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্তির উপায় সমূহ জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই প্রকার জ্ঞানের বিরুদ্ধবাদী নহেন। যে জ্ঞান দ্বারা "সোহং" "তত্ত্বমসী" ইত্যাদি বাক্যসকল প্রতিপাদিত হয়, সেই জ্ঞান বৈষ্ণব মহাত্মাগণ আদৌ গ্রাহ্য করেন না।

মহাপ্রকাশের কিছুদিন পরেই মহাপ্রভু

সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক বৃন্দাবন যাইবার উপলক্ষ করিয়া শান্তিপুরে আনীত হন। তথায় বহু নৃত্যগীতের পর অদ্বৈত আচার্য্য মহাশয় সকলের আহারের যোগাড় করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই শ্রীনিত্যানন্দ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া জনৈক ভক্ত নবদ্বীপে গমন করিয়া শচীমাতা ও অন্যান্য ভক্তগণকে শান্তিপুরে লইয়া আইসেন। শ্রীহরিদাস তৎ-পূর্ব্বেই শান্তিপুরে আগমন করিয়া অদ্বৈতের সহবাসে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দকে আহারে আহ্বান করিলে মহাপ্রভু মুকুন্দ ও হরিদাসকেও আহারে আহ্বান করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

"দুই ভাই আইস তবে করিতে ভোজন॥
মুকুন্দ হরিদাস দুই প্রভু বোলাইল।
যোড় হাতে দুই জন কহিতে লাগিল॥
মুকুন্দ বলে মোর কিছু কৃত্য নাহি সারে।
পাছে মুই প্রসাদ পাইব তুমি যাহ ঘরে॥
হরিদাস বলে মুই পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিমু ভোজন॥"

উপরোক্ত প্রসঙ্গটী এইস্থানে উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, অনেকেই বলিয়া থাকেন, শ্রীমহাপ্রভু হরিদাসকে অত্যন্ত আদর যত্ন করিতেন বটে, কিন্তু তিনি যবনকুলোদ্ভব হওয়ায় তাঁহার সঙ্গে কখন পংক্তিতে ভোজন করিতেন না। আমরা সেই জন্য উপরি উক্ত পদ্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। মহাপ্রভু হরিদাসের সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন করিতে কখন অমত করেন নাই। হরিদাস তাঁহার স্বাভাবিক দৈন্যতা বশতঃ কখনই তাঁহার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিতে সম্মত হন নাই। হরিদাস চৈতন্যপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান জ্ঞান করিতেন, এবং নিজেকে অতি নীচ কুলোদ্ভব জ্ঞান করিতেন, এমতাবস্থায় তিনি তাঁহার সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন করিতে অস্বীকৃত হওয়াই স্বাভাবিক। এমন কি, তিনি দশজনের সম্মুখে—মহাপ্রভুর সঙ্গে এক বারান্দাতেও উপবেশন করিতেন না। তাহার আরও কারণ এই যে, বৈষ্ণবধর্ম্মে মর্য্যাদা লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারিতেন না। এমন কি, জগদানন্দ একদিন সানতনকে একটু উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই জন্য মহাপ্রভু জগদানন্দকে অত্যন্ত ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। তিনি সনাতনকে বলেন—

"জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে॥"

এই সমস্ত কারণেই মহাপ্রভু বার বার হরিদাসকে তাঁহার সঙ্গে আহারে আহ্বান করিলেও তিনি তা করিতেন না।

অদ্বৈত-গৃহে ভোজনাদির পর যখন শচীমাতার আদেশে স্থির হয় যে, মহাপ্রভু নীলাচলে বাস করিবেন, তখন হরিদাস কাঁদিয়া বলিলেন, যথা—

"নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন গতি।
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি॥
মুঞি অধম না পাইয়া তোমার দরশন।
কিমতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন।
প্রভু কহে কর তুমি দৈন্য সংবরণ
তোমার দৈন্যতে মোর ব্যাকুল হয় মন।
তোমা লাগি জগন্নাথ করি নিবেদন
তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম॥"

ক্রমশঃ—

শ্রীরতিকান্ত মজুমদার

উৎকলে শ্রীচৈতন্য।

(১)

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সময় ছত্রভোগ হইতে গঙ্গাপার হইয়া উড়িষ্যায় পৌঁছিতে হইত। ছত্রভোগে—

"শুভদৃষ্ট লোকেরে বিদায় দিয়া ঘরে
চলিলেন প্রভু নীলাচলে নিজ পুরে।
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমুকুন্দ মহাশয়
কীর্ত্তন করেন প্রভু নৌকায় বিজয়।

*　　*　　*

কূলে উঠিলে বাঘে লইয়া পলায়
জলে পড়িলে সে কুম্ভীরেই খায়।
নিরন্তর এ পানীতে ডাকাইত ফিরে
পাইলেই ধন প্রাণ দুই নাশ করে।
এতেকে যাবত উড়িয়ার দেশ পাই
তাবত নীরব হয় সকল গোঁসাই।"

শান্তিপুর হইতে যাত্রা করিয়া চৈতন্য প্রভু প্রথমতঃ আঠিসার গ্রামে অনন্ত আচার্য্যের গৃহে এক রাত্রি অবস্থিতি করেন; সেখান হইতে গঙ্গার ধারে ধারে গমন করিয়া ছত্রভোগ নামক গ্রামে উপনীত হইলেন। এই খানে গঙ্গা শতমুখী হইয়া সাগর-সঙ্গমে গমন করিয়াছে। এইস্থানে অম্বুলিঙ্গ নামক শিব-জলময় হইয়া গঙ্গার জলস্রোতে মগ্ন হইয়া আছেন। এখানে দক্ষিণ প্রদেশের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রামচন্দ্রখান মহাপ্রভুকে নৌকা যোগে উৎকলে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। নৌকাযোগে বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে গমন করিয়া চৈতন্যদেব উড়িষ্যা দেশস্থ প্রয়াগ ঘাট নামক স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন। সেখান হইতে নদী পার হইয়া নৌকা বিদায় দিয়া জলেশ্বর গ্রাম দিয়া সুবর্ণরেখা উত্তীর্ণ হয়ত বালেশ্বরের অদূরবর্ত্তী রেমুণানামক নগরে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করেন। রেমুণা হইতে কিয়দ্দূর ময়ূরভঞ্জ ও নীলগিরির বনপথে আসিয়া কটকে প্রবেশ করিলেন।

উড়িয়ার দেশ ওড্র বা উৎকল নামে বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রচারিত। তাহার পরে নীলাচল। তাহার পরে বিজয় নগর। তখন প্রতাপরুদ্র উৎকলের রাজা, কটক তাঁহার রাজধানী।

"যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে
তখন প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে॥
যুদ্ধরণে গিয়াছেন বিজয়নগরে
অতএব প্রভু না দেখিলেন সেইবারে॥"

মহাপ্রভু দ্বিতীয়বার নীলাচল আসিলে রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।—

"প্রতাপরুদ্রের স্থানে হইল গোচর
নীলাচল আইলেন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর
সেই ক্ষণে শুনি মাত্র নৃপতি প্রতাপ
কটক ছাড়িয়া আইলেন জগন্নাথ॥"

আর একটী কথা। হুসেন সাহ অনতিপূর্ব্বে উৎকল আক্রমণ করিয়া বিস্তর অত্যাচার করিয়াছিলেন।—

"যে হুসেন সাহ সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে
হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র
তথাপিহ এবে না মানহে যত অন্ধ।"

(২)

শ্রীচৈতন্যের সময়ে উৎকল খণ্ডে অনেক বিশিষ্ট উড়িয়া বৈষ্ণব ছিলেন।—

"যে যে পার্ষদের জন্ম উৎকলে হইলা

তাঁহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা।
মিলিলা প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রেমের শরীর
পরমানন্দ রামানন্দ দুই মহা ধীর।
দামোদর পণ্ডিত, শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত
কথোদিনে আসিয়া হইল উপনীত॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী নৃসিংহের দাস
যাহার শরীরে নৃসিংহ প্রকাশ॥
কীর্ত্তনবিহারী নরসিংহ ন্যাসীরূপে
জানিয়া রহিল আসি প্রভুর সমীপে॥
ভগবান আচার্য্য আইলা মহাশয়
শ্রবণেও যারে নাহি পরশে বিজয়॥

* * * *

কাশী মিশ্র পরম বিহ্বল কৃষ্ণরসে
আপনে রহিলা প্রভু যাহার আবাসে॥"

একদিন মহাপ্রভু রাজা প্রতাপরুদ্রকে বলিয়াছিলেন :—

"তুমি সার্ব্বভৌম অমর রামানন্দ রায়।
তিনের নিমিত্ত মুঞি আইনু হেথায়॥"

শিখী মিহান্তি ও মাধবী দাসীরও উল্লেখ আছে।

বাঙ্গালার নবাবদের তালিকায় হুসেনসাহের নাম দৃষ্ট হয় না। নিষ্ঠুর ও ঘৃণিত-স্বভাব মজঃফর সাহের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া বাঙ্গালার ওমরাওগণ মন্ত্রী সৈয়দ হোসেনকে সেনাপতি করিয়া গৌড় নগরের প্রান্তরে মজঃফরকে পর্য্যুদস্ত করিয়া সৈয়দ হোসেন বা হুসেন সাহকে দ্বিতীয় আলাউদ্দীন নামে বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। হোসেন সাহ নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন এবং হিন্দুমন্দির চূর্ণ করিতে তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্য তাঁহার ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সর্থম হইয়াছিলেন।—

"রাজা বলে এই মুই বলি যে সবারে,
কেহ যদি উপদ্রব করয়ে তাঁহারে।
যেখানে তাঁহার ইচ্ছা থাকুন সেখানে,
আপনার শাস্ত্র মত করুন বিধানে।
সর্ব্বলোক লই সুখে করুন কীর্ত্তন
বিরলে থাকুন কিম্বা যেথা লয় মন।
কাজী বা কোটাল কিম্বা অন্য কোন জন,
যে কিছু বলিবে তার লইব জীবন।"

(৩)

আচার্য্য উইলসন বলেন, প্রতাপরুদ্র উড়িষ্যার বাঙ্গালী নরপতি। মেদিনীপুর ও তমলুকের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থান হইতে গঙ্গাবংশের আদি পুরুষ উৎকলে প্রথম আগমন করিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্র বাঙ্গালীর অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার প্রধান সভাপণ্ডিত ও প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। প্রধান সভাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভটাচার্য্যের ক্ষমতা অদ্বিতীয় ছিল। নীলাচল হইতে দ্বিতীয়বার ফিরিবার সময় প্রভুর বিশেষ কষ্ট হয় নাই।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন উড়িষ্যারাজ ও বঙ্গেশ্বরে যুদ্ধ হইতেছিল। উৎকল সীমার পরপারে যবন রাজ্য। পথে দস্যুভয় ও যবন সৈনিকগণের প্রচুর অত্যাচার ছিল। বঙ্গদেশে যাইতে পথিমধ্যে চৈতন্যের কোন অসুবিধা না হয়, যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে বঙ্গদেশে পৌছিতে পারেন, এইজন্য রাজা প্রতাপ-রুদ্র প্রদেশস্থ ও বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগকে পত্র লিখিয়া দিলেন, এবং পথের দুইপার্শ্বে সামগ্রী সম্ভার প্রস্তুত থাকে ও জলপথে নৌকার সুব্যবস্থা হয়, এরূপ উপায় করিয়া দিয়া রামানন্দ রায় ও আপনার প্রধান অমাত্য শ্রীহরিচন্দন মহারাজকে তাঁহার সহিত পাঠাই-লেন। সচিবদ্বয় যাজপুর পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কিন্তু রামানন্দ রায় রেমুণা পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চৈতন্যের সঙ্গে বহুভক্তমণ্ডলী যাইতে লাগিলেন। যেখানে যান, রাজকর্ম্মচারীদিগের সুব্যবস্থায় সেখানে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে শ্রীগৌরাঙ্গ বহুভক্ত-সমাকীর্ণ হইয়া উৎকলের সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে উৎকল রাজের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে দুচারদিন অপেক্ষা করিতে বলিলেন ও তিনি যাহাতে নিরাপদে যাইতে পারেন, সে জন্য যবনরাজকর্ম্মচারীর সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

"দিন কত রহ সন্ধি করি তার সনে ;
তব সুখে নৌকাতে করহিব গমনে।"

এই সময় যবনরাজের এক অনুচর উড়িয়াদিগের কটকে আসিয়া মহাপ্রভুর ভক্তিভাব ও নাম-সংকীর্ত্তন দেখিয়া আপন প্রভুকে জানাইল। যবনাধ্যক্ষ তাহা শুনিয়া চৈতন্যকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া আপন বিশ্বাসী অনুচর দ্বারা আপনার অভিলাষ জানাইলেন। উৎকল-রাজাধ্যক্ষ মহাপাত্র প্রত্যুত্তরে এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি নিরস্ত্র হইয়া কেবল দুই চারিজন ভৃত্য সঙ্গে আসিতে স্বীকৃত হন, তবে আসিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে পারেন। যবনরাজ সেই প্রকারেই আসিয়া চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি চৈতন্যের স্বর্গীয় প্রেম ভক্তির ভাবালোকন করিয়া তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। তখন সেই দাম্ভিক যবন নিজ পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং বালকের ন্যায় পরিত্রাণের জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ সম্পূর্ণরূপ তাঁহার জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তখন যবনাধ্যক্ষ চৈতন্যের বঙ্গ গমনের সকল সুবিধা করিয়া দিলেন এবং জলপথায় উত্তম উত্তম নৌকা সজ্জিত করিয়া দিয়া জলদস্যুগণ তাঁহার প্রতি অত্যাচার না করিতে পারে, সেই জন্য পিছলদা পর্য্যন্ত স্বয়ং তাহার সঙ্গে আসিলেন। সেখান হইতে তিনি বিদায় হইয়া গেলে চৈতন্যদেব তাহার প্রদত্ত নৌকারোহণে নির্ব্বিঘ্নে পানীহাটী গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন।

"জলদস্যু ভয়ে সেই যবন চলিল,
দশ নৌকা ভরি সেই সৈন্য সঙ্গে নিল।
মণ্ডেশ্বর দুই নদী পার করাইল
পিছলিয়া পর্য্যন্ত সেই যবন আইল।
সেকালে তার প্রেম চেষ্টা না পারি বর্ণিতে
তারে বিদায় দিল প্রভু সে গ্রাম হইতে।"

উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

বাবু সারদা চরণ মিত্র-সঙ্কলিত এই নূতন প্রকাশিত গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষায় একখানা গাইড পুস্তক। এরূপ গাইড পুস্তক যে কোন ইংরাজী-অভিজ্ঞ বাঙ্গালী লিখিতে পারেন। ব্রাউন ও ষ্টর্কি সাহেবের ইংরাজী গাইড পুস্তক দুখানি, মুরারির করচা এবং চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত একত্র করিয়া এবং নিজে স্থানগুলি দেখিয়া এরূপ একখানি গ্রন্থ সহজে লেখা যায়। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রের নিকট হইতে আমরা অনেক অধিক আশা করিতে পারি। উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামটী শুনিয়া মনে হইয়াছিল যে, মহাপ্রভুর উৎকল-জীবনের পরিচয় এ গ্রন্থে পাওয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়ের উৎকলের পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক জীবনেরও সম্যক পরিচয় মিলিবে। এই দুই বিষয়ে লিখিবার অধিকার গ্রন্থকারের আছে—কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি আমাদের আশা পূর্ণ করেন নাই।

উড়িষ্যা ও দক্ষিণাপথের কতকগুলি মন্দিরের বহির্ভাগে অশ্লীল ভাস্কর-চিত্র দেখিতে

পাওয়া যায়। দেবমন্দিরে এ কলঙ্ক কেন? এ প্রশ্নের মীমাংসা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। শিল্পে নগ্নতা কোথাও কোথাও কারুকরের লেখনি-গুণে সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই সব চিত্র কেবল বীভৎস ভাবের উদ্রেক করে, মনুষ্যের পশুত্বের, নগ্ন পশুত্বের পরিচয় দেয়। দেবমন্দিরে এ বীভৎস পশুত্বের অনাবৃত নগ্নতার কারণ কি? বিদেশীয়েরা এই সব চিত্র দেখিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতির নামে নানা অপবাদ রচনা করিয়াছে। গ্রন্থকার তাহা অপনোদন করেন নাই। গ্রন্থকার বলেন, "চিত্রসমূহের মধ্যে অশ্লীলতার অসদ্ভাব নাই। তিন শত বৎসরে মানবরুচির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু অশ্লীল চিত্রের কারণ নিদর্শন করা কঠিন।" জিয়ড় নৃসিংহ দেবের মন্দির সম্বন্ধে গ্রন্থকার আর একস্থানে লিখিয়াছেন—"উড়িষ্যার অধিকাংশ মন্দিরের ন্যায় চারিদিকে আজ কালের রুচিবিরুদ্ধ অঙ্কিতমূর্ত্তি অনেকগুলি আছে। কি উদ্দেশ্যে ঐ সকল মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল, জানিতে পারি নাই, শাস্ত্রানুসন্ধানে উহার তথ্যও বুঝিতে পারি নাই।" গ্রন্থকার রুচির ঘাড়ে বোঝা চাপাইতে গিয়া দেখিলেন, মকর্দ্দমা প্রমাণ হইবে না। তাই সরিয়া দাঁড়াইলেন। তিন শত বৎসরের মানবরুচির কথা সাহিত্য-ফলক ভাস্করকার্য্যে লিপিবদ্ধ আছে। তিন সহস্র বৎসরের রুচির পরিচয় স্তম্ভ, দেহগোপ, মন্দিরে চিহ্নিত আছে। কিন্তু এরূপ অশ্লীলতা আর কোথাও নাই। আর পূর্ব্বপুরুষের কুরুচির কীর্ত্তি প্রচার করিয়া এই বিশিষ্ট বঙ্গ সন্তান বিশেষ সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

মানুষ পশু, মানুষ দেবতা। পশুত্ব হইতে ক্রম-বিকাশে মানুষ, মানুষ হইতে ক্রম-বিকাশে মানুষ দেবতা। যে মানুষ এক সময়ে জন্তু ছিল. সেই মানুষই অন্য সময়ে দেবতা হইয়াছে। দস্যু রত্নাকর হইতে ঋষি বাল্মীকি, সল হইতে পল, গার্হস্থ হইতে বানপ্রস্থ, আদি রস হইতে মধুর রস, পশুত্ব হইতে দেবত্ব, প্রতি জীবনে, প্রতি সমাজে এইরূপ ক্রমবিকাশ। দেবমন্দির-অন্তরে, মানব জীবন, মানব পরিবার, মানব সমাজের ও মানব ধর্ম্মের ইতিবৃত্তের প্রতিকৃতি। লালসা-প্রপীড়িত পশু-মানব অসুরের প্রতিকৃতি, ভক্তিবিনোদিত হনুমান দেবতার। মন্দির-চূড়ায় কৃতাঞ্জলি ভক্তি গদগদ অজিনাসন, মন্দির তলে কামনা-কাতর পশুচিত্র। চিত্রগুলির অর্থ গূঢ় হইলেও দুরধিগম্য নহে। এই পশুত্ব অতিক্রম করিয়া ঐ দেবত্বে মানবসন্তানকে আরোহণ করিতে হয়। দেব মন্দির এই মানব প্রকৃতির চিত্র এবং দেবত্বের উৎকর্ষের সহায়, সাধুত্বের সোপান।

(৪)

আর একটী গুরুতর প্রশ্ন গ্রন্থকার স্পর্শও করেন নাই। উড়িষ্যা পঞ্চক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, সকলই এই পুণ্যক্ষেত্রে বিরাজিত। বিরজা ও বিমলা শাক্তের, কোণার্ক সৌরগণের, মহাবিনায়ক গাণপত্যের, পুরুষোত্তম বৈষ্ণবের এবং ভুবনেশ্বর শৈবগণের উপাস্য দেবতা। বহু-দিন হইতে এই বিভিন্ন মতাবলম্বী হিন্দুগণ শান্তি ও সৌহার্দ্দে এখানে বাস করিয়াছে। গ্রন্থকার একথার বারবার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবিধ মূর্ত্তি তখনও অবস্থিত ছিল, এখনও আছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে সকল মূর্ত্তিই দেখিয়াছিলেন, সকলকেই সম্মান করিয়াছিলেন। তিনি যাজপুরে সঙ্গীগণকে ত্যাগ করিয়া একাকী বিরজা দেবী প্রভৃতি দেবতাসমূহ দর্শন করেন।

তিনি ভুবনেশ্বরে দেবাদিদেব ত্রিভুবনেশ্বর ও অন্যান্য লিঙ্গ দর্শন করেন। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে হরিনামামৃতরসোল্লাসে এবং ওঁকাররূপী জগন্নাথদর্শন সুখে সদা নিমগ্ন থাকিলেও অন্যান্য দেবদর্শন করিয়াছিলেন ও ভক্তি-রসে আপ্লুত হইয়াছিলেন, সহজেই অনুমান করা যায়। কেবল খণ্ডগিরির বৌদ্ধ মূর্ত্তি দর্শন করিতে তিনি যান নাই কেন?

গ্রন্থকার বলেন, অনেকেই মনে করেন, বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম্ম পরস্পরের বিদ্বেষী ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রচলিত মহায়ন বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মে এমন কোন প্রভেদ ছিল না যে, উভয় ধর্ম্মে বিশেষ বিদ্বেষ ভাবের সম্ভাবনা ছিল। খণ্ডগিরির ভাস্কর-চিত্রের মধ্যে দশভূজা ও সর্ব্বমঙ্গলা মূর্ত্তিও রহিয়াছে। পৌরাণিকেরাই যে এই সকল দেবমূর্ত্তি খোদিত করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। মহায়ন বৌদ্ধগণ হিন্দু দেবদেবী সমূহের পূজায় বিমুখ ছিলেন না। মহায়ন বৌদ্ধেরাই ঐ সকল মূর্ত্তিরই কারণ হইতে পারেন। দশভূজা গুম্ফের পরেই একটী গুম্ফায় বুদ্ধদেবের অনেকগুলি পদ্মপাণি মূর্ত্তি খোদিত আছে। নিম্নেই কয়েকটী মাতৃকামূর্ত্তি, পৌরাণিক ও বৌদ্ধ একত্রিত। এখানে মহায়ন বৌদ্ধমতের অনেক লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অন্ততঃ দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে কেন্দুবিল্ব-কবি জয়দেব মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর প্রথম স্তোত্রেই বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গিয়াছিলেন।

অজয় নদীর কূলে যে দশাবতার স্তোত্র প্রথম গীত হইয়াছিল, তাহা ভাগীরথীর কূলে নবদ্বীপে অনতিজ্ঞাবেই কত শতবার গীত হইয়া থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভৃতি মহাত্মাগণের সহিত সেই স্তোত্র কত শতবার কীর্ত্তন করিয়া ভক্তি ও আনন্দে অভিভূত হইয়াছিলেন। জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ তাঁহার প্রাণ ছিল। তথাপি তাঁহার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির উপর না উঠিয়া দেখাই সম্ভব। কেন? গ্রন্থকার বলেন, তৎকালে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ অবনতি হইয়াছিল এবং মহাপ্রভুকে তাড়াতাড়ি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাইতে হইয়াছিল, তিনি একদিনের অধিক একাম্র ক্ষেত্রে থাকিতে পারেন নাই, তাই তাঁহার খণ্ডগিরি দেখা হয় নাই।

এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম উড়িষ্যায় সম্যক্ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কুপারি, যাজপুর, ধবলী, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, কোণার্ক প্রভৃতি স্থানে বুদ্ধমূর্ত্তি, বৌদ্ধস্তম্ভ ও মন্দিরের সহস্র সহস্র ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে। ফাহিয়াং ও হুয়েনসাং আপনাপন ভ্রমণ-বৃত্তান্তে উৎকলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মাদলা পাঁজীতেও তাহার উল্লেখ আছে। এখনও কল্পবট, বিরজা-ক্ষেত্রে, একাম্রকানন, অর্কক্ষেত্রে এবং কূর্ম্ম-ক্ষেত্রে উপাসিত হইতেছে। কিন্তু কৃষ্ণচৈতন্য উৎকলে আসিয়া পঞ্চ পৌরাণিক ধর্ম্ম—শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত ও গাণপত্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কে প্রথম বৌদ্ধধর্ম্মকে আসনচ্যুত করিয়াছিল? সাধারণের বিশ্বাস বৈষ্ণবধর্ম্ম। আমাদের গ্রন্থকারও সাধারণ সংস্কারে সায় দিয়াছিলেন।

এই গুরুতর প্রশ্নের যথোচিত সমাধান হওয়া উচিত।

বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম কেন্দ্রান্তরে অবস্থিত। বৌদ্ধধর্ম্ম শ্রমণ পরিব্রাজকের ধর্ম্ম। বৈষ্ণবধর্ম্ম গৃহীর ধর্ম্ম। প্রভু নিত্যানন্দ সেই

জন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। এবং মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বিবাহ করিয়া গৃহস্থবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তথাগত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যশোধরার মুখাবলোকন করেন নাই। কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরেও মহাপ্রভু শচীমা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত সক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবৃত্তি-নির্ব্বাণ প্রয়াসী, বৈষ্ণবধর্ম্ম সৎপ্রবৃত্তি সুকুমার উৎকর্ষের অভিলাষী। বৌদ্ধগণ শূন্যতাবাদী, বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণকে রসস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করেন। এক কথায় বলিতে গেলে বৈষ্ণবধর্ম্ম ভোগের ধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগীর ধর্ম্ম।

এইরূপ আকাশ পাতাল ভেদ সত্ত্বেও বৈষ্ণব ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে স্থানান্তরিত করিবে, সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে শৈবধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় ত্যাগীর ধর্ম্ম। প্রজ্ঞার সাহায্যে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। প্রজ্ঞা শক্তিরূপিণী। মহাযন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রজ্ঞা ও বুদ্ধ, তারা ও অবলোকিতেশ্বর রূপে এবং পৌরাণিক ধর্ম্মে শক্তি ও শিব বা হরগৌরীরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। এত অনুমানের কথা। অন্য উপায়ে এ প্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টা করা যাউক।

উড়িষ্যায় এখন তিনটী মন্দির বিখ্যাত—ভুবনেশ্বর, কোণার্ক ও জগন্নাথ। ভুবনেশ্বর মন্দির ৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়—

গজাষ্টেষুমিতে জাতে শকাব্দে কৃত্তিবাষসঃ।
প্রাসাদমকোরৎ রাজা ললাটিন্দুশ্চ কেশরী॥

জগন্নাথের বর্ত্তমান মন্দির ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

শকাব্দে রন্ধ্রশুভ্রং স্বরূপ নক্ষত্র নায়কে।
প্রাসাদং কারয়ামাসনঙ্গভীমেন দেবতা॥

কোণার্ক মন্দির ভুবনেশ্বর মন্দিরের পরে এবং জগন্নাথ মন্দিরের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ভুবনেশ্বরে শৈবমন্দির, কোণার্কে বৌদ্ধমন্দিরে শৈবদেবতা। সুতরাং মন্দির দেখিলে শৈবধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্মের পূর্ব্বে উৎকলে আবির্ভূত হইয়াছিল। উড়িষ্যা রাজবংশের মধ্যে কেশরী রাজগণ প্রাচীনতম এবং তাঁহারাই শৈবধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্ত্তে উৎকলে প্রতিষ্ঠিত করেন। সুতরাং গ্রন্থকার যে বলিয়াছেন, "বুদ্ধের পরিবর্ত্তে বিষ্ণুর পূজা ক্রমশঃ লোকের অবলম্বন হইয়াছিল" একথা প্রামাণ্য নহে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাজপুরে "লিঙ্গশত" দেখিয়াছিলেন। এখনও এখানে অসংখ্য শৈব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মুরারি লিখিয়াছেন :—

"বভ্রাম তত্র ভগবান্ নগরীং নিরীক্ষ্য
ভূতেশ লিঙ্গমবলোক্য মহানুভাবঃ।
বাণাসীমীব সদাশিব রাজধানীম্
যত্র ত্রিলোচন মুখাঃ শিবলিঙ্গ কোঠিঃ॥"

"যে যাজপুর নগরে "ত্রিলোচন" প্রভৃতি কোটি সংখ্যক শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান, যে পুরী ভগবান ভবানিপতির অধ্যুষিত বারাণসীর তুল্য, মহানুভাব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই নগরীর মনোহর দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ভ্রমণ কালে "ভূতেশ লিঙ্গ" দর্শন করিয়াছিলেন।" ভুবনেশ্বরের ত কথাই নাই। একাম্রকানন শৈবক্ষেত্র—

একাম্র কানন বন স্থান মনোহর
তথায় হইবা তুমি কোটি লিঙ্গেশ্বর
সেহো বারাণসী প্রায় সুরম্য নগরী
সেই স্থান আমার পরম গোপ্যপুরী।

স্কন্দপুরাণেও কোটি লিঙ্গের উল্লেখ আছে—

"পূর্ব্বাহ্ন পূজাসময়ে কোটি লিঙ্গেশ্বরমবৈ
চর্ব্বরী শঙ্খকাহলি মৃদঙ্গ মুরজ ধ্বনিম্
ব্যাপ্নুবান মহারণ্যং দূরাৎশুশ্রাব ভূপতিঃ।"

প্রকৃত প্রস্তাবে একাগ্রকানন এক সময়ে শিবের মন্দিরে আবৃত ছিল। প্রবাদ আছে যে, কেশরী রাজগণ তথায় এক লক্ষ শিবমন্দির স্থাপন করিতে অভিলাষী হন, কিন্তু তাঁহাদের সে অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। কেশরী রাজাদিগের পরবর্ত্তী রাজবংশ চোরগঙ্গ বংশ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেও মহাদেবের প্রাদুর্ভাব অদ্যাপি অসামান্য। পুরীপথে কমলপুরের নিকটে কপোতেশ্বর মহাদেবের মন্দির অতি প্রাচীন। শ্রীজগন্নাথের প্রতিষ্ঠাতা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরী গমন পথে কপোতেশ্বর দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। অদ্যাপি অনেক তীর্থযাত্রী কপোতেশ্বর মহাদেবের পূজা না করিয়া উড়িষ্যার তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ মনে করেন না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রথমে চক্রতীর্থের চক্রেশ্বর মহাদেবকে পূজা করিয়া পরে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন। মুরারি বলেন—

"স্নাত্বা ততঃ শঙ্কর লিঙ্গমীশ্বরে।
জপন্ন ঘোরং প্রণনাম দণ্ডবৎ।
স্তুত্বা মহেশং স্তুতিভিঃ সুমঙ্গলৈ
র্জগাম যজ্ঞেশ মহালয়ং প্রভুঃ।"

যেস্থানে স্নান করিয়া মানব শিবলোক প্রাপ্ত হয়, উগ্রচণ্ডী ভগবান সেই চক্রতীর্থে স্নান করিয়া মহাদেব দর্শনপূর্ব্বক যথাবিধি কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তদনন্তর পরমেশ্বর যোগাদি অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শঙ্করলিঙ্গকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াছিলেন এবং মঙ্গলময় শিবস্তোত্রাদি দ্বারা স্তব করিয়া বৃহদায়তন যজ্ঞেশ্বর মন্দির দর্শনে গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্দিরের পশ্চিমে লোকনাথ মহাদেবের মন্দির। এখনকার উড়িয়্যা বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রধান। কিন্তু লোকনাথের মর্য্যাদা অসামান্য। সাধারণ লোকে বরং জগন্নাথের শপথ করিয়া মিথ্যা কহিবে, কিন্তু লোকনাথের শপথ করিবে না। তথায় লোক-সমাগম বিলক্ষণ, পণ্যজীবীরও অভাব নাই। দেবলিঙ্গ একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে দেবী পীঠের উপর অবস্থিত। প্রবেশ করিয়া লিঙ্গদর্শন করা একটু কষ্টসাধ্য। ভিতরে জলের প্রস্রবণ আছে এবং সর্ব্বদাই জলদেবী পীঠের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সাধারণ লোকে লোকনাথকে জগন্নাথের দেওয়ান বলে।

মহাদেবের এই লোকনাথ নামটী বড় রহস্যাত্মক। উড়িষ্যার বাহিরে ভূতনাথের এই লোকনাথ সংজ্ঞা আর কোথায়ও দেখি নাই। শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত নামাবলির মধ্যে লোকনাথটী পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেবকে বৌদ্ধগণ লোকেশ্বর বলিয়া অভিহিত করিত।

খ্রীষ্ট জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে বুদ্ধচরিতকার মহাকবি মহাপ্রজ্ঞ অশ্বঘোষ মহাযন শ্রাদ্ধোৎপাদ গ্রন্থ প্রচার করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে লৌকিক ধর্ম্মে পরিণত করেন। তাঁহার তিরোভাবের দুতিনশত বৎসর মধ্যে তুর্কিস্থান ও মঙ্গোলিয়া হইতে শ্যাম ও আনাম পর্য্যন্ত মহাযন বৌদ্ধ ধর্ম্ম লোকের মধ্যে প্রচারিত হয়। হীনায়ন বৌদ্ধধর্ম্মের মহাপ্রচারক অশোক, মহায়নের মহাপ্রচারক কণিষ্ক সেই সময়ে বজ্রপাণি, পদ্মপাণি, অবলোকিতেশ্বর, লোকেশ্বর, ত্রিকায়, ত্রৈনাথ, মৈত্রেয় ও অমিতাভ বুদ্ধের উৎপত্তি সঙ্গে সঙ্গে দিব্যা দেবী প্রজ্ঞাপারমিতা তারা নামে লোকনাথের পার্শ্বে।

লোকেশ্বর বা লোকনাথের পার্শ্বে লিঙ্গ স্থাপন যবদ্বীপ ও মলয়দ্বীপে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল।

বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্ম যে এক, দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ বৌদ্ধ দর্শন উপনিষদের অভিব্যক্তি হইলেও বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বুদ্ধ আত্মা মানিতেন না, যাগ যজ্ঞ জাতিভেদ মানিতেন না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম পাঁচ শত বর্ষ বৌদ্ধগণ নাস্তিক, চোর পাষণ্ড বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিল। বুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে দেব মন্দির ছিল না। বুদ্ধের অস্থি ও ভগ্নাবশেষ প্রথমাবস্থায় কৌটা মধ্যে রাখা হইত, তাহার পর স্তুপ ও দেহগোপে। বৌদ্ধমন্দিরে হিন্দুগণ প্রবেশ করিত না। প্রাচীন বৌদ্ধদিগের সামাজিক অবস্থার কিছু কিছু পরিচয় চট্টগ্রামের বর্ত্তমান বড়ুয়া বৌদ্ধের মধ্যে এখনও দেখা যায়। ইঁহারা হিন্দুদিগের অস্পৃষ্য ও ঘৃণিত। চট্টগ্রামের কলেজের পারিতোষিক বিতরণ সময়ে দুটী বৌদ্ধছাত্রকে আদর করিয়া অধ্যক্ষ নিজের পার্শ্বে বসাইলে হিন্দুছাত্রগণ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

বৌদ্ধমন্দির ও বুদ্ধমূর্ত্তির অনুকরণে ভারতবর্ষে হিন্দুমন্দির নির্ম্মিত ও প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দিরের ব্যাবৃতি-কথা পরে বলা যাইবে।

মহায়ন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইল, মহারাজ কণিষ্কের প্রশ্রয়ে, বুদ্ধ দেবতারূপে দেবসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শৈবেরা তাঁহাকে শঙ্করের অবতার ও বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মানিয়া লয়। মহারাজা হর্ষবর্দ্ধন অভেদে বুদ্ধ ও শঙ্করের পূজা করিতেন। দেবসিংহাসনে বসিলে বিভূতির অভাব রহিল না। শান্ত ত্যাগী শিব সন্ন্যাসী হইলেন, ত্রিলোকদর্শী ত্রিলোচন, বরাভয় মঙ্গলদাতা চক্রপাণি, মুচলিন্দের আশ্রয়দাতা নাগভূষণ, "সদয়-হৃদয় পশুঘাত" বৃষভবাহন, শূন্যতাবাদী দিগম্বর হইলেন। কালে তারা নামে প্রজ্ঞা আসিয়া ব্যাঘ্রাজিনের অংশ ভাগী হইলেন, মহা পণ্ডিত ত্রিতাপহারী ব্যাধি ভৈষজ্যের নিদান হইলেন। এই সঙ্গে আর একটী কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। গর্ভ্ভাবাস হইতে বুদ্ধের সহিত হস্তীর সংশ্রব ছিল। উড়িষ্যায় হস্তী যথেষ্ট আছে, কিন্তু কেশরী একটীও নাই, কখন ছিল না। অথচ প্রত্যেক দেব-মন্দিরের দ্বারদেশে কেশরী-পৃষ্ঠ আহত ও পরাভূত হস্তীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় কেন? শৈব কেশরী রাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মকে পরাভূত করিয়া থাকিবার ইহা কি নিদর্শন নহে?

ভিনসেণ্ট স্মিথ নেপালের বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বলেন—"In the seventh century the prevailing religion appears to have been a much modified Tantric variety of the Great Vehicle Buddhism doctrine allied so closely to the orthodox Hindu cult of Siva as to be distingnishable from it with difficulty."

গ্রন্থকার বলেন, জগন্নাথ মন্দিরস্থিত নীলমাধব বুদ্ধ মূর্ত্তি হইতে পারেন। কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধত্রিকায় বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ, জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। আমরা বলি, বুদ্ধই "শিবরূপ" হিন্দু সমাজে ও "ধর্ম্ম" রূপে নিম্নশ্রেণীতে যদ্যপি পূজিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও শৈব ধর্ম্ম যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের পূর্ব্বে উড়িষ্যা অধিকার করিয়াছিল এবং শৈব ধর্ম্মই যে বৌদ্ধধর্ম্মকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যাবার বৌদ্ধধর্ম্ম ও শৈবধর্ম্ম (Over de verminging van Siwaism en Buddhism of Java) নামক গ্রন্থে আচার্য্য কর্ণ দেখাইয়াছেন,যাবায় বৌদ্ধধর্ম্ম ও শৈবধর্ম্ম কিরূপে সমঞ্জসীভূত হইয়াছে। চম্পা ও কাম্বোডিয়ারও এইরূপ ঘটিয়াছিল। Buddhism in Indo-China নামক প্রবন্ধে লুই ফিনো বলেন, ৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের একটী খোদিত লিপি "commemorates not only the erection of an image of Lokesvar but also the erection of a Linga. We find here again that reciprocal penetration of Sivaism and Buddhism already pointed out by Mr. Kern in Java, and which more than one Indo-Chinese monument in Champa and Cambodia indicate." লোকেশ্বর যে বুদ্ধ, ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে মলক্কস দ্বীপে খোদিত এই লিপি হইতে বুঝা যাইবে--"Victory to Lokesvar, born for the welfare of the world, who manifesting in some way the four Holy truths and giving to the law a firm and extremely solid basis unfolded the splendour of his four arms for the prosperity of the earth."

কোণার্ক হইতে বুদ্ধমূর্ত্তি স্থানান্তরিত করিয়া জগন্নাথ-প্রাঙ্গণে লুকান হইয়াছে, অরুণ-স্তম্ভ সিংহদ্বারে দেদীপ্যমান। যাঁহারা কাশ্মীর হইতে চন্দ্রভাগা নদী স্থানান্তরিত করিয়া কোণার্ক পার্শ্বে এবং বড়মূল গিরিসঙ্কট মহা নদী কূলে অবস্থাপিত করিতে পারিয়াছিলেন, লোকনাথ-মন্দির হইতে লিঙ্গপার্শ্বস্থ বুদ্ধ মূর্ত্তি অপসরণ করা তাঁহাদের পক্ষে দুরূহ ছিল না। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

প্রকাশক শ্রীপ্রণবচন্দ্র রায়চৌধুরী।

ত্রিপুরার পাটিকাড়ারাজ্যের পুরাতত্ত্ব

(বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের ত্রিপুরা-শাখার অধিবেশন-বিশেষে পঠিত)।

ত্রিপুরার পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে নিবিষ্টভাবে আলোচনা করিলে ইহার পূর্ব্ব পশ্চিম দুই দিক স্মরণাতীত কাল হইতেই যে ঐতিহাসিক রঙ্গভূমিরূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহার আশ্চর্য্য প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্ব দিকে চন্দ্রবংশীয় দ্রুহ্যুতনয়েরা নায়ক হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের কীর্ত্তিকলাপ ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ হইয়া আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই লিপিবদ্ধ বিবরণ রাজমালা নামে পরিচিত। এইরূপে পূর্ব্বদিকের ইতিবৃত্ত আমাদের জন্য রক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পশ্চিমদিকের এরূপ কোন ইতিবৃত্তই রক্ষিত হয় নাই। অথচ পশ্চিমদিকের পুরাবৃত্ত যে পূর্ব্বদিকে অপেক্ষা কম গৌরবজনক, তাহা

মনে করিবার কোন কারণ নাই। আমরা এই প্রবন্ধে পশ্চিমদিকের একটী প্রাচীন রাজ্যের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইব। আমাদের অনুসন্ধানের ফলে এই রাজ্যের অধিকারিগণ যে ইতিহাসের সামান্য নায়ক ছিলেন না. তাহা বিশেষরূপেই প্রতীয়মান হইবে।

পাঠিকাড়া রাজ্যের প্রাচীন নাম 'মেহের কুল' ছিল বলিয়াই আমরা মনে করি। 'মেহেরকুল' নামটীর সহিত সুপ্রসিদ্ধ হুণরাজ মিহিরকুলের যোগ আছে বলিয়াই ইতিহাস নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। 'বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত-কার' পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "মিহিরকুল বঙ্গদেশে জয় করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে মিহিরকুল নামক একটী পরগণা আছে।" এই 'মিহিরকুল' নামটীই সামান্য রূপান্তরে মেহেরকুল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। মিহিরকুল ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং ষষ্ঠ শতাব্দীতেই পাটিকাড়া রাজ্যের প্রথম মূলপত্তন হয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। হুণাধিকারের পর পাটিকাড়াতে খড়্গ বংশ নামে এক রাজবংশের অভ্যুদয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বংশের এক রাজা "কমান্তি" হইতে একটী দান পত্র সম্পাদন করেন। সেই দান-পত্র সম্প্রতি ঢাকা জিলার রায়পুরা থানার অন্তর্গত আশ্রফপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দান-পত্রের উল্লিখিত "কমান্তি" পাটিকাড়ার (বড়) কামতারই সহিত অভিন্ন বলিয়া ঐতিহাসিকদিগের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। উল্লিখিত তাম্রশাসনে খড়্গবংশের চারিপুরুষের নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা যথাক্রমে খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ ও রাজরাজ। শেষরাজা রাজরাজের মঙ্গলার্থই তৎ পিতা দেবখড়্গ কর্ত্তৃক দানপত্র সম্পাদিত হয়। দান-পত্রে এতৎ সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে 'রাজরাজ ভট্টস্যায়ুষ্কামার্থম॥'

সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হুয়েন সাঙের পরবর্ত্তী একাধিক চৈনিক পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে খড়্গ বংশের প্রাগুক্ত শেষরাজার উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইৎসিং নামক চৈনিক পরিব্রাজক যে তদীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে রাজরাজ ভট্টের নাম করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদের ত্রিপুরা শাখার ১৩২৩ সনের কার্য্যবিবরণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—"হুয়েন সাঙের পর ইটসিং নামক অন্য একজন চৈনিক পরিব্রাজক এ দেশে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে রাজভট্টের নাম করিয়াছেন এবং তিনি যে একজন পরম ভক্ত বৌদ্ধ ছিলেন, একথাও লিখিয়াছেন। তাঁহার সময়ে রাজধানীর বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংখ্যা চারি সহস্র হইয়াছিল। এই পরিব্রাজক ৬৭৩—৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন। সুতরাং রাজভট্টও এই সময়ে রাজত্ব করিয়াছেন, অনুমান করা যাইতে পারে। সেঙ্গাচী নামক অপর এক জন চৈনিক পরিব্রাজকও ইৎসিংএর পর এদেশে পরিভ্রমণ করিতে আসিয়া রাজরাজ ভট্টকেই রাজা দেখিতে পাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে ঢাকার ইতিহাসে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় লিখিয়াছেন, "সপ্তম শতাব্দের শেষার্দ্ধে ইতিহাসে সেঙ্গাচী নামক একজন চৈনিক পরিব্রাজক সমতটে আগমন করেন। এই সময়ে রাজভট্ট সমতটের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন।" পৃষ্ঠা (৫১২—১৩। রাজরাজ ভট্টই যে ভ্রমণবৃত্তান্তে সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় রাজভট্ট ও রাজভট বলিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা সহজবোধ্য। রাজরাজ ভট্ট যে সপ্তম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্তও রাজত্ব

করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য প্রমাণই এখানে পাওয়া যাইতেছে। চৈনিক পরিব্রাজক সেঙ্গাচীর সাক্ষ্যদ্বারা আমরা রাজ-রাজ ভট্টকে সমতটের রাজা বলিয়াই জানিতে পারিতেছি। সুতরাং পাটিকাড়া যে সমতট প্রদেশেরই অন্তর্গত ছিল, তাহাই আমরা বুঝিতে পারি। এই খড়্গাবংশ কোথা হইতে কিরূপে সমতটে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তৎসম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। আমাদের অনুমান হয় যে, এই বংশের পূর্ব্ব পুরুষ খড়্গোদ্যম সম্ভবতঃ হুণরাজা মিহির-কুলেরই অন্যতম প্রধান সেনানীরূপে তাঁহার সহিত সমতটে আগমন করতঃ তাঁহারই সামন্তরূপে সমতট শাসন করিতে থাকেন, কালে মিহিরকুলের পরাভব ও রাজ্য নাশ হইলে, তিনি সেই সুযোগে আপনার স্বাতন্ত্র্য প্রখ্যাপিত করিয়া বসেন। মিহির-কুল ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পর যশোধর্ম্ম বা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক পরাজিত ও হৃতরাজ্য হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে পাল বংশের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত খড়্গাবংশ সমতটে রাজত্ব করিয়াছিলেন। খড়্গাবংশের চারিজনে রাজার নাম আমরা পাইয়াছি। গড়ে ৩ পুরুষে এক শতাব্দী ধরিলে, ইঁহাদের রাজত্বকাল প্রায় দেড়শত বৎসর হয়। মিহিরকুলের পরাজয়ের সময়ের সহিত এই সময় যোগ করিলে যোগ-ফল প্রায় দেড় শত বৎসর হয়। মিহিরকুলের পরাজয়ের সময়ের সহিত এই সময় যোগ করিলে যোগ-ফল প্রায় ৭০০ বৎসর পাওয়া যায়। পাল বংশের প্রথমাভ্যুদয়ের কাল ৭৭০ খ্রীঃ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহার সহিত খড়্গা বংশের রাজ্যকালের সুন্দর সামঞ্জস্যই হয়। বঙ্গে পাল বংশের আধিপত্য বিস্তারের সহিত সমতটে খড়্গাবংশের উচ্ছেদ সাধিত হইয়া পাল বংশেরই অধিকার বদ্ধমূল হয়। পাল রাজাদিগের দ্বিতীয় গোপালের রাজ্যকালে পাটিকাড়াতে একটী নূতন রাজ বংশের অধিষ্ঠানের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধাড়ি-চন্দ্র এই বংশের প্রথম রাজা। বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এতৎ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'ধাড়িচন্দ্র এই সময়ে বঙ্গে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজধানী পাটিকা বলিয়া উল্লিখিত আছে।' ২২৮ পৃঃ। এই পাটিকা যে পাটিকাড়ারই নামান্তর, তাহাতে কোনও সন্দেহই হইতে পারে না। 'বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে' দ্বিতীয় গোপালের রাজ্যকাল ৯৪৫ ৯৭০ খ্রীঃ এবং ধাড়িচন্দ্রের রাজ্যকাল ৯২০—৯৫০ খ্রীঃ লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ১০ম শতাব্দীতে যে এই নূতন বংশের অভ্যুদয় হয়, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। ধাড়িচন্দ্রের পুত্রের নাম সুবর্ণচন্দ্র। তিনি ৯৫০—৯৭০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মাণিক চন্দ্র ৯৭০—৯৯০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যকাল ১০০৫—১০৩০ খ্রীঃ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। মাণিকচন্দ্রের মহিষীর নাম ছিল ময়নামতী। তিনি গোবিন্দচন্দ্রের মাতা ছিলেন। ময়না-মতী বিশেষ শক্তিশালিনী ও তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। তদীয় অসাধারণ প্রভাবের নিদর্শন এখনও পাটিকাড়ার ময়নামতী পর্ব্বত নামে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল নামক সামন্ত রাজা তদীয় রাজ্য করতলগত করিয়া লয়। কিন্তু ময়নামতীর বুদ্ধি-কৌশলে ও সমর-নৈপুণ্যে পুনর্ব্বার হৃত রাজ্যের উদ্ধার সাধনে কৃতকার্য্য হন।

পরেশ বাবু ময়নামতী ও গোবিন্দ চন্দ্রের ইতিহাস এইরূপে সঙ্কলিত করিয়াছেন ;—'মাণিকচন্দ্রের মহিষী হাড়িপা বা হাড়িসিদ্ধ

নামক এক ডোম জাতীয় যোগীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাহার প্রসাদে একটী পুত্র লাভ করেন। এই পুত্রের নাম গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র। গোবিন্দ চন্দ্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাহার মাতা ময়নামতী মন্ত্রীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করেন, এবং ধর্ম্ম পালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তীস্তা নদী তীরে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হইলে ধর্ম্মপাল পরাস্ত হন, এবং ময়নামতী স্বামীর রাজ্য উদ্ধার করেন। অনুমান ১০০৫ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। গোপীচন্দ্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া, ময়নামতী রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন এবং হরিশ্চন্দ্রের কন্যা—অদুনা ও পদুনার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। গোপীচন্দ্র ক্রমে ভোগ বিলাসে উন্মত্ত হইয়া উঠেন এবং পত্নীগণের পরামর্শে মাতাকে উত্তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করিয়া তাহার বিনাশ সাধন করেন।" বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত ২০৪ পৃঃ।

গোবিন্দচন্দ্র এইরূপে উপাখ্যানের বিষয়ীভূত হইলেও তিনি যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। উড়িষ্যার সুবিখ্যাত রাজা প্রবল-পরাক্রান্ত রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপিতে গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গের রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এই শিলালিপি তিরু মলয়ের শিলালিপি বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই শিলালিপির প্রমাণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—"তিরু মলয়ের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাজেন্দ্র চোল উত্তর রাঢ়ের মহীপাল, দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর, দণ্ডভুক্তির ধর্ম্মপাল এবং বঙ্গের গোবিন্দ চন্দ্রকে পরাজয় করেন। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মগধরাজ মহীপাল, গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল, দক্ষিণ রাঢ়ের রণ-শূর এবং বঙ্গের গোবিন্দচন্দ্র সমসাময়িক ছিলেন, সুতরাং অনুমান হয় যে,১০১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল্ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া এই সকল রাজাকে পরাজয় করেন।" বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত ২৩৫ পৃঃ। এখানে বঙ্গ যে পূর্ব্ববঙ্গকে বুঝাইতেছে, গৌড়ের স্বতন্ত্র উল্লেখ দ্বারা তাহা স্পষ্টই প্রতীতি হয়। পূর্ব্ববঙ্গের মেহারকুল ও পাটিকাড়ার সহিতই যে গোপী চাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র ও তন্মাতা ময়নামতীর সবিশেষ যোগ রহিয়াছে, "ময়নামতীর গানে" গোপী-চাঁদের উপাখ্যানে তাহার নিঃসংশয়িত প্রমাণই বিদ্যমান রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে "ময়নামতীর গান" সঙ্কলয়িতা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত ভটশালী তদীয় তথ্য পূর্ণ ভূমিকায় এই রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—"মেহারকুল পাটিকারায়ই যে গোপী-চন্দ্রের রাজ্যছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন পুস্তকে মৃকুল এবং কোন কোন পুস্তকে পাটিকা নগর বলিয়া এই স্থান দ্বয়ের উল্লেখ হইয়াছে। সুকুর মহম্মদ মৃকুল লিখিয়াছেন। দুর্ল্লভ মল্লিক পাটিকা লিখিয়াছেন। রঙ্গ-পুরের গাথা গুলিতে শুধু বঙ্গ বলিয়া সারিয়া দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গ বলিতে যে প্রাচীন-কালে পূর্ব্বাঞ্চলকেই বুঝাইত এবং বাঙ্গাল বলিতে যে এখনও পূর্ব্বাঞ্চলবাসীকেই বুঝায়, ইহা সকলেই জানেন। ময়নামতী পাহাড়ের আশে পাশে বহু প্রাচীন ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। "ময়নামতীর গান" ভূমিকা ॥৵০ পৃঃ। রাণী ময়নামতী ধর্ম্মপালকে পরাজয় করিয়া এইরূপে তদীয় স্বামীর উত্তর বঙ্গের রাজ্য পুনরাধিকৃত করেন, এবং পূর্ব্ব বঙ্গের পাটিকাড়া রাজ্যের সহিত তাহা শাসন করিতে থাকেন। রঙ্গপুরের অন্তর্গত 'ময়না-মতীর

কোট’ নামক স্থান সেই অধিকারেরই স্মৃতি এখনও ধারণ করিতেছে। ময়নামতীর এই বিজয়-স্মৃতি রঙ্গপুরের গ্রাম্য সঙ্গীতে এখন পর্য্যন্ত কিরূপ জীবিত রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে :—

“ধর্ম্মপালের পত্নী বনমালার ভগিনী ময়নামতীর পরাক্রমের বিষয় অদ্যাপি রঙ্গপুর অঞ্চলের গ্রাম্য সঙ্গীতে গীত হইয়া থাকে।” রঙ্গপুর হইতে গোপী চন্দ্রের অধিকার যে কামরূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিশ্বকোষকার এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—“ধর্ম্মপালের পর মাণিকচন্দ্র, মাণিকচন্দ্রের পর গোপীচন্দ্র, গোপীচন্দ্রের পর ভবচন্দ্র কামরূপ শাসন করেন। এই সময়ে রঙ্গপুর কামরূপের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল।” গোপীচন্দ্র অনুমান ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। তৎপুত্র ভবচন্দ্র পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইনিই প্রবাদে পরিণত উপহাসাস্পদ ভবচন্দ্র রাজা। ইঁহার সম্বন্ধে বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে এইরূপ বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে :—“গোবিন্দচন্দ্রের পর উঁহার পুত্র ভবচন্দ্র সিংহাসন লাভ করেন। ভবচন্দ্রের গবচন্দ্র নামক এক মন্ত্রী ছিলেন। গবচন্দ্রের নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক নানা গল্প রঙ্গপুরে প্রচলিত রহিয়াছে। তাঁহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা সমগ্র বঙ্গদেশে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। কথিত আছে যে, তাঁহাদের সময়ে লোকে দিবসে নিদ্রা যাইত এবং রাত্রিতে কাজ কর্ম্ম করিত। রঙ্গপুর জেলায় পরগণা বাঘদুয়ারের অন্তর্গত উদয়পুর নামক স্থানে উদয় চন্দ্র নামক এক রাজার রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, উদয়চন্দ্র এবং ভবচন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি।” বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত ২৪২—২৪৩ খ্রীঃ। রঙ্গপুরে যেমন ভব চন্দ্রের রাজত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়, ত্রিপুরায়ও তেমনই তাঁহার রাজত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। কৈলাস বাবু তদীয় রাজমালায় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—“প্রবাদ অনুসারে আধুনিক চৌদ্দ-গ্রাম ও তৎসন্নিহিত স্থানে ভবচন্দ্র নামে এক নরপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। উক্ত নরপতির সম্বন্ধে বহুবিধ অলৌকিক গল্প শ্রুত হওয়া যায়।” ৬পৃঃ। এইরূপে এক দিকে ত্রিপুরা ও অন্যদিকে রঙ্গপুর ভবচন্দ্রের নামের সহিত সংযুক্ত হওয়াতে ভবচন্দ্রের পাটিকাড়া রাজ্য যে ত্রিপুরা হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। ভবচন্দ্র ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভবচন্দ্রের পরে আমরা পাটিকাড়ার আর কোন রাজার নাম প্রাপ্ত হই না। সুতরাং ভবচন্দ্রকেই আমরা পাটিকাড়ার শেষ রাজা বলিয়া ধরিতে পারি। ভবচন্দ্র নিজে ও তাঁহার মন্ত্রী যেরূপ অভূতপূর্ব্ব স্থূলবুদ্ধি ছিলেন, তাহাতে তাঁহার রাজ্য যে স্থায়ী হইবে না, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। *

এক্ষণে এই পাটিকাড়া রাজগণ কোন্ বংশীয় ছিলেন, তাহাই আমরা বিচার করিয়া দেখিব। বিশ্বকোষকার যে একটী পাশ্চাত্য মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গরাজ ধর্ম্ম

* শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র শীল ‘গোবিন্দ চন্দ্রের গীতে’র ভূমিকায় ভবচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—ইনি এই বংশের শেষ রাজা। বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে যে, ভব চন্দ্রের পর আর একজন মাত্র পাল বংশীয় রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার কামরূপের রাজ্য নীলধ্বজ নামে এক রাজা আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন।

পাল, পাটিকাড়ার রাজা মাণিকচন্দ্রের ভ্রাতা বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন। নিম্নে সেই মতটী উদ্ধৃত হইল। "মিঃ মার্টিন বলেন যে, বঙ্গেশ্বর ধর্ম্মপাল, পাল বংশীয় বঙ্গরাজগণের অন্যতম। ইঁহার মাণিকচন্দ্র নামে এক ভ্রাতা ছিলেন। মাণিকচন্দ্রের অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। মাণিক চন্দ্রের পত্নীর নাম ময়নামতী॥" বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে পরেশ বাবুও ধর্ম্মপাল ও মাণিক চন্দ্রের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উভয়ই এক পিতার ঔরসজাত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। যথা:— "সুবর্ণচন্দ্র এই সময়ে (৯৫০—৯৭০ খ্রীঃ] বঙ্গশাসন করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র — চন্দ্র এবং ধর্ম্মপাল॥" ২২৯ পৃঃ। চৈতন্য ভাগবতের এক স্থলের উল্লেখ হইলেও গোপী চাঁদকে পাল বংশ বলিয়াই জানিতে পারা যায়।

"যোগীপাল গোপীপাল মহীপাল গীত,
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত॥"
চৈতন্যভাগবত।

এখানে গোপীচাঁদ যে স্পষ্টই 'গোপী পাল' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু পালবংশের প্রসিদ্ধ রাজা মহীপালের সহিতও এক সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহাতে গোপীচাঁদ যে মহীপালেরই একবংশীয়, তাহা বুঝিতে তেমন কষ্ট হয় না। এইরূপে পাটিকাড়ার রাজগণ যে বঙ্গের প্রসিদ্ধ পাল রাজগণের কেবল বংশধর ছিলেন, তাহা নহে, পরন্তু তাঁহাদিগের বঙ্গরাজ্যের উত্তরাধিকারীও যে ছিলেন, তাহারই প্রমাণ আমরা পাইতেছি। পরেশ বাবু পাল রাজগণের মূল বংশ সম্বন্ধে একটী নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন; তিনি 'বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে' লিখিয়াছেন: "বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে পালবংশীয়গণ মিহিরকুল-সম্ভূত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন॥' ২০৭ পৃঃ। এইরূপে যে মিহিরকুলকে আমরা মেহারকুলের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা দেখিতে পাইয়াছি—তাঁহারই বংশধরদিগকে ইহার শেষ অধিষ্ঠাতাও দেখিতে পাইতেছি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

অকস্মাৎ যেন হিমাচলের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল, ব্রাহ্মসমাজের শেষ প্রদীপ নিবিয়া গেল! নিন্দিত ও শাপগ্রস্ত নাটক-সাহিত্য ও কবিওয়ালাগণের ক্রীড়া সামগ্রী হইলেও, গত১০০ বৎসরে ব্রাহ্মসমাজ যে মনীষীগণের জন্ম দিয়াছেন, এমন প্রকৃত মহাত্মাগণ কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিলে সে দেশ ধন্য হয়। রামমোহন, মহর্ষি দেব, কেশবচন্দ্র, ইহারা সকলেই এক এক যুগাবতার, তাঁহাদের সহিত লিখিয়া রাখ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। ইঁহারা নেতা, কাহারও কর্ত্তৃক চালিত নহেন, ইঁহাদের সমক্ষে কোন বাধা প্রতিবন্ধকই তাঁহাদের উন্নত মহৎ সঙ্কল্পের বিঘ্ন করিতে পারে নাই, প্রত্যেকে উজ্জ্বল বক্ষে 'আপন আপন কার্য্য

সিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, প্রতিরোধ, বাধা, বিঘ্ন কিছুই ইঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে নাই। ইঁহারা ঈশ্বরের পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বীরবীর্য্যে সত্যপথে অগ্রসর হইয়াছেন, এবং এই একশত বৎসরে দেশকে সহস্র বৎসর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ এই পরম মহাত্মা চতুষ্টয়ের শেষ পুরুষ।

যে কার্য্য ইঁহারা সম্পাদন করিয়াছেন, সামান্য রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, কি সংসার-পথ-গামী, কোন লোকের ইহা সাধ্য নহে। ধর্ম্ম জগতে বিরাট কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া, অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া, নরনারীকে পবিত্রপথে আনয়ন করা ও তাঁহাদের মুক্তির পথ পরিষ্কার করিবার জন্যই এসমস্ত মহাত্মার জন্ম। ইঁহারা অনুকূল স্রোতে ভাসমান হয়েন নাই, বন্ধু কি ইয়ার কর্ম্মচারীগণের সঙ্গে চলেন নাই, নিজের শক্তিবলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া, তাহার আলোক-প্রভাবে শত শত নরনারীকে আকর্ষণ করিয়াছেন। অন্ধকার-প্রান্তরে দাঁড়াইয়া ইঁহাদের জ্যোতিতে সকল দেশ আলোকিত করিয়াছেন, সেই আলোকে আপনা-আপনি, আকৃষ্ট পতঙ্গকুল অগ্নি মুখং বিভ্রক্ষু হইয়া, ইঁহাদের দল পুষ্টি করিয়াছে। ইঁহারা ভাবেন নাই, কি খাইব কি পরিব, পরিবারের কি হইবে। আবার সেই অনুযাত্রী-বর্গ মনে করেন নাই, কন্যকার কি হইবে। কিন্তু সেই পরমদিগের কার্য্যে আগমন করিয়াই, তাঁহাদের পতাকা হস্তে লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। বিশ্বরাজ বিশ্বপতির দাস কখনও পরাঙ্মুখ হইবেনা, এই তাঁহার পবিত্র বিধান। এই কথা জানিয়া তাঁহারা তাঁহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। শক্তিতে ও পাণ্ডিত্যে শিবনাথ এই মহাত্মা-গণের সহিত তুলনীয় ; তুলনা সর্ব্বাংশে সমান হয়না সত্য, কিন্তু এই তিন জন ব্যতীত আর কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁহার বক্তৃতা শক্তি যেমন হৃদয় উত্তেজক, তেমনি যুক্তিপূর্ণ, একবার শুনিলে তৃপ্ত হওয়া যায় না। শিবনাথ ও নগেন্দ্র নাথের বক্তৃতা ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্ততিতম যামে কলিকাতার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ভগ্ন ও উন্নতি, দুই এক সময়ে হয়না। তাই মনে হয়, ব্রাহ্মসমাজের গৃহ-বিবাদে ইহার পূর্ণতার অক্ষুণ্ণ প্রভাব কমিয়া যাওয়াতে, বর্ত্তমান নির্ব্বীর্য্যভাব আগমন করিয়াছে। অনেকেই আক্ষেপ করেন, এই গৃহ-বিবাদে ব্রাহ্মসমাজের যত লোক ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং ইহার প্রতি ভগ্নস্নেহ হইয়াছেন, এরূপ বিরাট আন্দোলন না হইলে সেরূপ হইত না। আমরা তখন পাঠ প্রায় সমাপ্ত করিয়াছি, এলবার্ট হলে সভা, আন্দোলন, বক্তৃতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি এমনভাবে চলিতেছিল যেন বঙ্গমাতার ক্রোড় উথলিয়া উঠিতেছে। একজনের কন্যার বিবাহে এরূপ বিরাট আন্দোলন যেন tempest in the tea-kettle. কেশবের বন্ধু ও অন্তরঙ্গ বিজয় কৃষ্ণ পর্য্যন্ত ছিন্ন হইলেন। কিন্তু তিনি সে গোলমালে তথায় টিকিতে পারেন নাই। তবে বলিতে হইবে, এই আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের গৌরব খর্ব্ব হয় নাই। শিবনাথ যেমন নিরহঙ্কার, সামান্য পরিচ্ছদ ধারী ক্লেশসহিষ্ণু ও বৈরাগ্য, পরায়ণ এমন ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় না। ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য লোক অপেক্ষা আমরা তাঁহার সহিতই অধিক মিশিতে পারিতাম। একবার, আমি বিপিন পাল, ত্রিগুণাচরণ, সুন্দরীমোহন, হরিচরণ সেন প্রভৃতি তাঁহার সহিত শিবপুরে নৌকায় গিয়া-ছিলাম, সেদিনের আলাপের মধ্যে আচার্য্য

কেশবচন্দ্রের প্রশংসাই অধিক ছিল। তখন কুচ-বিহারের বিবাহ হয় নাই। শিবনাথ বলিলেন, বাঙ্গালীর মধ্যে কেশবচন্দ্রের ও আনন্দমোহনের প্রকৃত শিক্ষা ও মনের উন্নতি হইয়াছে। পরে কেশব সম্বন্ধে কয়েকটী গল্প করিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার প্রতি সেরূপ অনুরাগ শিবনাথে আর দেখি নাই। কুচ-বিহারবিবাহের আন্দোলন সময়ে আমি শিবনাথ বাবুর নিকট এক দীর্ঘপত্র লিখিয়াছিলাম। তাহার ভাব এই যে, আপনারা যে বিষয় প্রচার করিতে-ছেন,তাহারই বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় তাহার ক্ষতি হইবে। মহাত্মা শিবনাথ আমার মেসের ঠিকানায় আসিলেন, আমি বাসায় ছিলাম না। আমার বন্ধুগণের সহিত তদ্বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। আমি তাহার সাক্ষাৎ না পাইয়া নিরাশ হইয়াছিলাম।

শিবনাথের বাক্য যেমন সুমিষ্ট, হাসি তেমনি মধুর, সময়ে সময়ে তন্মধ্যে রসিকতা হাস্যোদ্দীপন করিত। যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিলাসপরায়ণতার জন্য শিব নাথকে নিন্দা করেন, তাঁহারা যদি তাঁহার পরিচ্ছদ ও ব্যবহার দেখিতেন, তাঁহাকে কখন এজন্য দোষী করিতে পারিতেন না। শিবনাথ বিলাতফেরতাগণকে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচার,বিলাস-বাসনা, সাংসারিকতার জন্য তিনি দায়ী নহেন। অনেক সময়ে তিনি তীব্র ভাবে ব্রাহ্মযুবক এ মহিলাগণের সমা-লোচনা করিয়াছেন,তীব্র মন্তব্য পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু দেশের গতি যে দিকে,সেই দিকে এ স্রোত চলিয়াছে, শিবনাথ কি ব্রাহ্ম সমাজকে দোষ দিলে কি হইবে? আমরা যখন পড়িতাম ও পাঠ সমাপ্ত করিয়া বাহির হইয়াছিলাম,তখন কোন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হ্যাট কোট পরেন নাই। প্যাণ্টালুন চাপকান পরিতেন, আর ৩০ বৎসর পরে কলিকাতায় অবস্থিতিকালে দেখিলাম, সব হ্যাটকোট। ইহার নিবারণকল্পে ব্রাহ্মসমাজ চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। জাতীয় তরণী ধীরে ধীরে ইংলিস-খাড়িতেই চালিত হইবে!

জাতিকে দরিদ্র করিয়া, ব্রাহ্মসমাজকে অন্ধকার করিয়া,শিবনাথ তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গরাজ্যে গমন করিলেন। এখানকার দুঃখ-দারিদ্র্য,আন্দোলন আলোচনা এখানেই রহিল, পরলোকের অদৃশ্যমণ্ডলীর সহিত তিনি যুক্ত হইয়াছেন, তথায় কেশবচন্দ্র, মহর্ষি, বিজয়কৃষ্ণ আবার তাঁহার সঙ্গী হইলেন এবং দয়াময় পিতার অপার করুণা তাঁহার সকল দুঃখ দূর করিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রকৃত স্থানে লইয়া গেলেন। পরবর্ত্তী বংশাবলী শিবনাথকে কোথায় স্থান দিবে? রামমোহন অতি জ্ঞানী ও পণ্ডিত, মহর্ষি সাধক সমাজে গরিষ্ঠ, কেশব ঈশ্বর দর্শনে ও বাণী শ্রবণে পরম ভক্ত, বিজয় নেতৃত্ব-শক্তিহীন, শিবনাথ ভারতের কোন সাধকের সহিত তুলনীয় নহেন। তাঁহার তুলনা ইউরোপের মার্টিন লুথার সেইরূপ বীর, সেইরূপ ধর্ম্ম জগতের সংগ্রামপ্রিয়, দৃঢ়, তেজস্বী ও শক্তি-সম্পন্ন পাশ্চাত্য বীর্য্য ও শক্তি অনুকরণ তাঁহার আদর্শ। ভারতে এরূপ বীরের সকল স্থলে প্রয়োজন আছে। তাই বলি, এস শিবনাথ, তোমার কর্ম্ম শেষ হয় নাই। ভারত-জননী তোমার মত বীর সন্তানের ভিখারিণী।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

আত্মার অমরত্ব

মানব চাহে অনন্তকাল বাঁচিয়া থাকিতে; কিন্তু অনন্তকাল বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর কি না, এই প্রশ্নটীর উত্তর অনেকেই জানে না। জীবন চায় অমরত্ব; কিন্তু দেখা যায়, মৃত্যুতেই জীবনের সমাপ্তি। মৃত্যু দেখিয়া জীবন স্তম্ভিত হয়; যাহা আশার অনন্ত ফোয়ারা, যাহা ভবিষ্যৎকে জড়াইয়া ধরিয়া উৎফুল্ল গতিতে কর্ম্মস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়ে, যাহা আত্মরক্ষার জন্য অহর্নিশি প্রাকৃতিক প্রতিকূল শক্তিপুঞ্জের সহিত যুদ্ধ করিতেছে; সেই জীবনের অবসান কি মৃত্যুতে? কোথাও ক্রীড়োন্মত্ত বালক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কোথাও যৌবনোদ্দীপ্ত যুবক অতৃপ্ত প্রেম লইয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে। এমন কি

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দশনবিহীনং
জাতং তুণ্ডম্।
বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যা-
শাপিণ্ডম্॥

এই জীবন, জীবনের প্রবৃত্তি সমূহের উপভোগ, আশার পূর্ণতার জন্য কর্ম্ম, নব নব অভিজ্ঞতার সঞ্চয়—মানব বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য কোন অবস্থাতেই এই সকল পরিত্যাগ করিতে চাহে না। আশা ভবিষ্যতের দিকে ছুটিয়া যায়, পরিতৃপ্তির অস্ফুট সঙ্গীত প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে গাহিয়া বেড়ায়, আশা কি অমরত্বের প্রমাণ, না কি আশা কুহকিনী?

কঠোপনিষদে কথিত আছে, নচিকেতা যমরাজকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনু শিষ্টস্ত্বয়াহং
বরাণামেষ বরাস্তৃতীয়ঃ।"

হে মৃত্যো, মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কি না? ইহা আমাকে বলুন।

তখন যমরাজ নচিকেতাকে বলিলেন,—

"যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্ত্যলোকে,
সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা
ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব,
নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ॥"

দীর্ঘ জীবন, ধন, স্বাস্থ্য, অনিন্দ্যসুন্দরী রমণী এবং অন্যান্য দুর্লভ বিষয় সমূহ প্রার্থনা কর, আত্মার অমৃতত্ব বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা কি লাভ হইবে?

নচিকেতা বলিলেন, হে যমরাজ, যদি আত্মা নশ্বর হয় তবে ত আপনার উল্লিখিত বিষয় সমূহ "শ্বোভাবাঃ" কিয়ৎ দিন পরেই নষ্ট হইয়া যাইবে। জীবন যত শীঘ্রই হউক না কেন, আত্মা নশ্বর হইলে, উহার অবসান একদিন হইবেই। সেই অবসান সময়ে অতীত দীর্ঘজীবনব্যাপী ভোগ স্মরণ করিয়া বিন্দুমাত্রও সুখী হইব না, বরং ভোগের পূর্ব্বাবস্থাতে যেমন ভোগের জন্য লালায়িত হইয়াছিলাম, ভোগ অতীত হইয়া গেলেও তেমন পুনর্ভোগের জন্য লালায়িত হইয়া ভোগের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইব। নশ্বর ভোগ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আর দীর্ঘজীবনই বা কি? যাহা আমার পক্ষে অতি দীর্ঘ জীবন, তাহা হয় ত আপনার একক্ষণ; যাহা জীবাণুর একটী সাগর, তাহা আমাদিগের একবিন্দু

জল। কিন্তু আত্মা যদি অমর হয় তবেই ভোগ সার্থক। অতএব মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কি না, তাহাই আমাকে বলুন।

যাঁহারা বিজ্ঞানের উপাসক, তাঁহাদের নিকট উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা অতি সরল। যাহা এই দৃশ্যমান জাগতিক ব্যাপারের সহিত কার্য্যকারণ নিয়মাবদ্ধ নহে, যাহা ভূত (Matter) ও ভৌতিক ধর্ম্ম (Energy) দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় না, তাহা নাই। পরলোক নামক কোন প্রদেশই সৌরজগতে আবিষ্কৃত হয় নাই; এবং পরলোক-সঞ্চারী আত্মাও দূরবীক্ষণ কিম্বা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা কিম্বা অপর কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই, অতএব উক্ত প্রশ্নের মূলে কুসংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নাই।

কিন্তু বিজ্ঞান বলিতে পারিবে না যে, যাহা কিছু এই দৃশ্যমান জগতের সহিত কার্য্যকারণ নিয়মাবদ্ধ, তৎসমুদায়ই সে জানিয়াছে, তাহার জানিবার কিছুই বাকী নাই। বরং অসীম, অতল অজ্ঞান রাশির উপর তাহাদিগের সমগ্র জ্ঞান সমুদ্রে ভাসমান দুই একটী তৃণ খণ্ডের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর, সমুদ্রতীরস্থ অসংখ্য বালিকণার মধ্যে দুই একটী বালিকণার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর। বিজ্ঞান জানে না, একটী সামান্য তৃণ খণ্ড স্বরূপতঃ কি। তৃণখণ্ডের সহিত তাহাদিগের পরিচিত কয়েকটী পদার্থের কি সম্বন্ধ, বিজ্ঞান তাহা বলিতে পারে, তাহাদিগের অজ্ঞাত ভূত এবং শক্তি সমূহের সহিত, কিম্বা দৃশ্যমান প্রত্যেকটী পদার্থের সহিত, উহার কি সম্বন্ধ, তাহা বিজ্ঞান জানে না। কিন্তু বিজ্ঞান যদি মনে করে, সে যাহা জানে না, তাহা নাই, তবে তাহাকে উন্মত্ত বলিতে হয়। বিজ্ঞান কিছু সৃষ্টি করে না, যাহা আছে, তাহা স্বীকার করিয়া পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করে। আত্মা (Consciousness) পরমাণু সমষ্টি নহে, পরমাণুর ধর্ম্মও নহে, উহার অস্তিত্ব কোনও যন্ত্র দ্বারা প্রমাণিত হয় না—অতএব আত্মা কি নাই? কুসংস্কারের সকল বিষয়ই যে অসৎ, তাহা নহে, উহাদিগের কার্য্য কারণ নিয়ম জানা হয় নাই বলিয়াই ঐ বিষয়গুলিতে বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলা হয়। আমরা বিজ্ঞানকে অবমাননা না করিয়া, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে আত্মার অমরত্ব বিষয়ে কোন একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিব।

হিন্দু দর্শনে চার্ব্বাক ব্যতীত আর সকলেই পরলোক-সঞ্চারী আত্মাতে বিশ্বাস করেন। তাঁহারা Lencippus, Democritus, Hobbes, Cabanis, La Mettric, Holbach, Buchner প্রভৃতির ন্যায় আত্মাকে দেহেরই ধর্ম্ম মনে করেন। মৃত্যুতেই আত্মার শেষ। জড়বাদীরা বলেন, জগতে ভূত এবং ভৌতিক শক্তির পরিমাণ চিরকাল সমান থাকিয়া যায়, উহারা বিবিধরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু উহাদের ধ্বংস নাই। এবং ভূত ও ভৌতিক ক্রিয়া ব্যতীত অপর কোন পদার্থ বা ক্রিয়া নাই। চেতন প্রাণীগণের যখন জড় পরমাণু সমূহ হইতে উৎপত্তি এবং তাহাতেই লয় দৃষ্ট হয়—তখন ইহাই সিদ্ধ হয় যে, চৈতন্য জড়ধর্ম্ম। আরও দেখা যায় যে, প্রত্যেকটী চৈতন্য বৃত্তির সহিত একটী স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে, এবং স্নায়ুমণ্ডলীর অবস্থাভেদের সঙ্গে সঙ্গে মনোবৃত্তিরও পরিবর্ত্তন হয়। স্নায়ুমণ্ডলীর উন্নতি ও অবনতি, স্বাভাবিক অবস্থা ও বিকৃত অবস্থার উপর মানসিক অবস্থা নির্ভর করে। অতএব ইহা নিশ্চিত যে, চৈতন্যটি স্নায়ুমণ্ডলীর ধর্ম্ম।

এবং মৃত্যুতে যখন স্নায়ুমণ্ডলীর সহিত দেহ ধ্বংস হইয়া যায়, তখন দেহধর্ম্ম চৈতন্যও ধ্বংস হয়।

এতদুত্তরে সংক্ষেপে ইহাই বলা যায় যে, জড় বিজ্ঞান যাহাই বলুক না কেন, চৈতন্য পরমাণুর ক্রিয়া নহে, ইহার বিস্তৃতি কিম্বা পরিমাণ (weight) নাই। যখন জড়বাদীর সিদ্ধান্তানুযায়ী জড়শক্তি পরিমাণহীন চৈতন্য শক্তিরূপে পরিণত হইবে, তখনই জগতে জড়শক্তির পরিমাণ কমিয়া যাইবে, এবং যখন পুনর্ব্বার পরিমাণহীন চৈতন্যশক্তি (যথা, ইচ্ছা) জড়শক্তিতে (যথা, অঙ্গ-চালনা) পরিণত হইবে, তখনই জগতে শক্তির পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। জড়বাদী মস্তিষ্ককে বিশ্লেষণ করিয়া, পরমাণু এবং আণবিক ক্রিয়া ব্যতীত একটী মনোবৃত্তিরও দর্শন পাইবে না। মস্তিষ্ক-ক্রিয়া ও চৈতন্য-বৃত্তি অত্যন্ত ঘনিষ্টরূপে সম্বদ্ধ হইলেও উহারা পৃথক পদার্থ। যখন আমরা মনোবৃত্তি প্রত্যক্ষ করিতে থাকি, তখন কি আমরা কতকগুলি পরমাণুরও ইতস্ততঃ বিচরণ প্রত্যক্ষ করি? আমরা চিন্তা করি, ইচ্ছা করি, সুখ দুঃখ অনুভব করি, কিন্তু কোন দিন ত স্নায়ুমণ্ডলী কিম্বা পরমাণুর ক্রিয়া দেখি না।

চৈতন্য যদি দেহের ধর্ম্ম না হইল, তবে বলা যায় না যে, দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও নাশ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, আমরা দেহহীন চৈতন্য কোথাও দেখি নাই, দেহসম্বদ্ধ চৈতন্যই দেখিয়াছি, এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অভিভব, উত্তেজনা, বিকৃতি প্রভৃতির সঙ্গে মানসিক দুর্ব্বলতা, অভিভব, উত্তেজনা, বিকৃতি প্রভৃতি দেখিয়াছি। সুতরাং মৃত্যুতে দেহ নাশের পর আত্মা যে কি ভাবে থাকিতে পারে, তাহাও দুর্ব্বোধ্য।

যাঁহারা পরলোকগামী আত্মাতে বিশ্বাস করেন, তাঁহারাও দেহহীন সংসারী আত্মাতে বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মতে স্বর্গে বা নরকে দেহবিশিষ্ট আত্মাই গমন করে। স্বর্গ সুখ এবং নরক যন্ত্রণা ভোগ দেহহীন আত্মার পক্ষে সম্ভব হয় না। সেইজন্য পুরাণে, রামায়ণ, মহাভারতে এবং গ্রীক ও পাশ্চাত্য কবিকল্পিত Republic, Divine Comedy, Paradise Lostএ স্বর্গ ও নরক দেহবিশিষ্ট আত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। দেহ দ্বারাই আত্মার পরিচয় এবং দেহই ভোগের দ্বার; যদি দেহহীন আত্মা সকল পরলোকগামী হয়, তবে দেহমুক্ত হওয়াতে আত্মা সকল নির্ব্বিশেষ হইয়া পড়ে, সাধু অসাধু বিভাগ লোপ পায়, সুতরাং স্বর্গ নরক কল্পনাও ব্যর্থ হইয়া পড়ে। পর-লোকস্থ আত্মার দেহ দৃষ্ট হয় না, অথচ দেহহীন আত্মাও অপ্রসিদ্ধ, অতএব হিন্দুগণ উক্ত আত্মার একটী নাতিস্থূল দেহ কল্পনা করেন। দেহত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া পুনঃ দেহপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত আত্মা দেহহীন থাকে না, তখনও আত্মা দেহপরিবেষ্টিত থাকেন। এই দেহকে আতিবাহিক দেহ বলে, কারণ আত্মা সকল এই দেহে আরূঢ় হইয়া পুনর্জ্জন্মের জন্য অতিবাহিত বা চালিত হয়। যাঁহারা এই মর্ত্তালোকে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহা-দিগের আতিবাহিক দেহটী জলনির্ম্মিত। ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলেন, "অন্ত্যায়াঞ্চ শরীরাহুত্যাবগ্নৌ হুতায়ামগ্নিনা দহ্যমানে শরীরে তদুত্থা আপো ধূমেন সহোর্দ্ধং যজমানমাবেষ্ট্য চন্দ্রমণ্ডলং প্রাপ্য কুশমৃত্তিকা স্থানীয়া বাহ্যশরীরারম্ভিকা ভবন্তি, তদারব্ধেন

চ শরীরেণেষ্টাদিফলমুপভুঞ্জানা আপতে—যাবৎ তদুপভোগ নিমিত্তস্থ কর্ম্মণঃ ক্ষয়ঃ।” মৃতদেহ সৎকারের সময় শরীরোত্থিত জলসমূহ আত্মাকে বেষ্টন করিয়া ধূমের সহিত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে গমন করতঃ স্থূলশরীর উৎপাদন করে। কোন কোন আত্মা অর্চ্চিরাদি পথে চন্দ্রমণ্ডলের মধ্য দিয়া আমানব পুরুষ কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হন; এবং কোন কোন আত্মা ধূমাদি পথে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে এবং জলনির্ম্মিত স্থূলদেহ দ্বারা দেবগণের সহিত ক্রীড়া করেন। চন্দ্রমণ্ডলপ্রাপক কর্ম্মক্ষয়ের পর আত্মা সকল আকাশকে প্রাপ্ত হয়। যেমন ফলগ্রহণেচ্ছায় বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি, পতনকালে সংজ্ঞাহীন হয়, তেমন কর্ম্মক্ষয়ান্তে চন্দ্রলোকভ্রষ্ট আত্মাসকল সংজ্ঞাহীন হয়। কর্ম্ম ভাব বলিতে সর্ব্বকর্ম্মাভাব না বুঝিয়া স্বর্গপ্রাপক কর্ম্মাভাব বুঝিতে হইবে। “তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাথৈতমধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতমাকাশমাকাশাদ্ বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাভ্রং ভবতি।” সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আত্মা সকলের জলারব্ধ দেহ আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম, ধূম হইতে অভ্রভাব প্রাপ্ত হয়। “অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে, অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং, যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি।” অভ্র হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বৃষ্টিরূপে “গিরিতটদুর্গনদীসমুদ্রারণ্য মরুদেশাদি”র উপর পতিত হয়, এবং ব্রীহি যব ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাষ প্রভৃতির শরীরে রসরূপে প্রবেশ করে। কতকগুলি আত্মা বৃষ্টির জলস্রোতের সহিত নদীতে প্রবিষ্ট হইয়া মকরাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, তাহারা আবার অপর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, কতকগুলি পুনর্ব্বার বাষ্পের সহিত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া মেঘাকারে পরিণত হয় এবং বর্ষাধারার সঙ্গে মরুদেশে বা শিলাতটে বর্ষিত হয়। যাহারা শস্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পক্ষী ও মৃগাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, সর্ব্বাবস্থাতেই আত্মার জলময় শরীরটী বর্ত্তমান থাকে, উহাই শস্যাভ্যন্তরে রসরূপে পরিণত হয় এবং যখন কর্ম্মানুযায়ী ঐ শস্য মনুষ্য কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, তখন ঐ রসই রক্তাদিক্রমে শুক্ররূপ ধারণ করে। তখন চন্দ্রলোকভ্রষ্ট সংজ্ঞাহীন আত্মা ঐ শুক্রে প্রবিষ্ট থাকে, শুক্রই তাহার দেহ। মাতৃগর্ভে ঐ শুক্র পরিপুষ্ট হইলে এবং মানবদেহরূপে পরিণত হইলে, আত্মা সংজ্ঞা লাভ করে।

উক্ত মতটী বৈদিক, উক্ত মতে বিশ্বাস হিন্দুর অস্থিমজ্জাগত। সংসারী অর্থাৎ বদ্ধ আত্মা কখনও দেহবিযুক্ত অবস্থায় থাকিতে পারে না। কিন্তু আতিবাহিক দেহটী ত মস্তিষ্ক, স্নায়ুমণ্ডলীবিশিষ্ট নহে। আত্মা, অর্থাৎ চৈতন্য কি মস্তিষ্কহীন, স্নায়ুমণ্ডলীহীন দেহে বাস করিতে পারে? আমাদিগের অভিজ্ঞতা (Experience) বলিবে—না। কিন্তু ইহাও বলিতে পারা যায় না যে, যেহেতু আমরা মস্তিষ্কাদি বিশিষ্ট দেহে চৈতন্য দেখিয়াছি এবং মস্তিষ্কহীন দেহে চৈতন্য দেখি নাই, অতএব যে চৈতন্য মস্তিষ্কবিশিষ্ট দেহারূঢ় নহে, সেই চৈতন্য নাই। কারণ কাহারও মতে চৈতন্য সর্ব্বত্রই বিরাজমান। তাঁহারা (Panpsychists) বলেন, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুমণ্ডলীর আরম্ভক ধাতু জড় জগতেরই পদার্থ, সুতরাং যদি মস্তিষ্কে চৈতন্য থাকিতে পারে, তবে জড় জগতে কেন পারিবে না।

ইহার উত্তরে এই বলা যায়, প্রথমতঃ স্থির করিতে হইবে, কোন্ ধাতুর কিরূপ সংস্থান বিশেষ বা কার্য্যবিশেষের সহিত চৈতন্যের অব্যভিচারী সম্বন্ধ রহিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ যদি উক্ত ধাতু সমূহের উক্তরূপ সংস্থান সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়, তবে সর্ব্বত্রই চৈতন্যের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইবে। হইতে পারে যে সর্ব্বত্রই চৈতন্য বর্ত্তমান, কিন্তু "যথা স্পষ্টচৈতন্যানামপ্যাত্মনাং স্বাপমূর্চ্ছাদ্যবস্থাসু চৈতন্যং ন বিভাব্যতে এবং কাষ্ঠলোষ্টাদীনামপি চৈতন্যং ন বিভাবয়িষ্যতে।" * (cf. Spinoza, Leibniz and other Idealists). অভিব্যক্তির তারতম্যই চেতনাচেতন বিভাগের হেতু, এবং চৈতন্যের যে অভিব্যক্তির তারতম্য আছে, তাহা মনুষ্যের নিদ্রা, মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থা দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু ইহাও সত্য যে "ন চ কাষ্ঠলোষ্টাদীনাং চেতনত্বে কিংচিপ্রমাণমস্তি। প্রসিদ্ধশ্চায়ং চেতনাচেতনপ্রবিভাগো লোকে।" কাষ্ঠ, লোষ্ট্রাদি অচেতন বলিয়াই চিরপ্রসিদ্ধ এবং মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী বিশিষ্ট প্রাণীগণই সচেতন বলিয়া সর্ব্বস্বীকৃত। উক্ত সমস্যার একটী সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত দুর্লভ। কিন্তু ইহা স্বীকৃত যে, মস্তিষ্কহীন (Inverbeterata) এবং স্নায়ুমণ্ডলীহীন (Protozoa, Sporozoa and other microscopic organisms) প্রাণীগণ এবং উদ্ভিদগণ সচেতন। তথাপি নিশ্চিন্ত ভাবে বলা যায় না যে, চৈতন্য সর্ব্বদেহেই অতএব আতিবাহিক দেহেতে থাকিতে পারে।

আস্তিকগণ (যাঁহারা বেদ মানেন, কিন্তু প্রযুক্তস্থলে যাঁহারা নিত্য আত্মা স্বীকার করেন) বলেন, আত্মা নিত্য, অতএব উহার ধ্বংস বা পরিণাম অসম্ভব। স্মৃতি ব্যাপারটী ("অনুস্মৃতেশ্চ" *) আত্মার নিত্যত্বে একটী প্রসিদ্ধ প্রমাণ; আত্মা পরিণামী হইলে পূর্ব্বানুভূত পদার্থের স্মরণ অসম্ভব হইত, একই কর্ত্তার পক্ষে অতীতদৃষ্ট পদার্থের বর্ত্তমানে স্মৃতি সম্ভবপর হয়। ইহার উত্তরে বলা যায়, আমাদিগের আত্মা উক্ত প্রকার নির্ব্বিকার, অপরিণামী, নিত্য পদার্থ নহে। উক্ত প্রকার আত্মার অস্তিত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত নহে, কারণ, উহার স্বরূপ এবং উহার সহিত সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতির সম্বন্ধ দুর্নিরূপ্য। হিন্দুদর্শন বলে, আত্মার স্বরূপ অবাঙ্মনসোগোচর, পাশ্চাত্যদর্শন বলে, উহা Something we know not what † উহা Unknown and Unknowable ‡ উহা একটী Noumenon § এই প্রকার উক্তির কারণ এই যে, অপরিণামী পদার্থ মানবের ধারণার অতীত। ইহা যদি বিজ্ঞান-প্রবাহের অতিরিক্ত পদার্থ হয়, তবে বিজ্ঞান প্রবাহের সহিত উহার সম্বন্ধটী কি? জলের আশ্রয় ঘটের ন্যায় বিজ্ঞানসমূহ আত্মাতে আশ্রিত নহে, কারণ সসীম জড় ঘটের ন্যায় আত্মা সসীম কিম্বা জড় নহে। কিম্বা যেমন শ্বেত, পীতাদি বর্ণ দ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত হয়, তদ্রূপ বিজ্ঞান দ্বারা আত্মা রঞ্জিত নহে। নিরাকার আশ্রয় ধারণার অতীত। যেমন বৃক্ষ, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্পাদি প্রসব করে, আত্মা তদ্রূপ বিজ্ঞান-প্রবাহ প্রসব করে না, কারণ তাহা হইলে আত্মা একদিকে বৃক্ষাদির ন্যায় সাকার, অপরদিকে উহার ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল হইয়া পড়ে। নির্গুণ ব্রহ্মবাদিগণ মায়া, অবিদ্যা দ্বারা উক্ত সমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করেন।

* ব্রহ্মসূত্র, ২অ, ১পা, ৬সূত্র শাঙ্করভাষ্য।

* ব্রহ্মসূত্র, ২অ, ২পা, ২৫ সূত্র।

† Locke. ‡ Spencer. § Kant.

পরিবর্ত্তনই জীবনের চিহ্ন। অপরিণামী নিত্যপদার্থ, স্বল্প পরিণামী প্রস্তরখণ্ড অপেক্ষাও নির্জ্জীব। উক্ত নিত্য পদার্থ কখনও প্রিয় হইতে পারে না। নিত্য আত্মা সিদ্ধ হইলেও, আমাদিগের আত্মা নিত্য, নির্গুণ নহে। উহা অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় পরিণামী নিত্য। নিদ্রা, জাগরণ, ক্রিয়া, বিশ্রাম, জন্ম, যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি যুক্ত দেহের ন্যায়, আমাদিগের আত্মাও সুখী, দুঃখী, চিন্তান্বিত, বাসনাযুক্ত ইত্যাদি। অবস্থান্তরের মধ্যেও দেহ যেমন একই থাকিয়া যায়, তেমন আত্মাও বিজ্ঞানপ্রবাহযুক্ত। যেমন অবস্থাতিরিক্ত দেহ নাই, তেমন বিজ্ঞান প্রবাহাতিরিক্ত আত্মা নাই। পরস্পর একতাসূত্রে আবদ্ধ বিজ্ঞানসমূহই আত্মা। এই আত্মা কখন কখন এত বিকৃত * হয় যে, উহাতে বিজ্ঞানসমূহের একতা লক্ষিত হয় না। তখন ব্যক্তিত্ব (personality) পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যদি পরিণামী নিত্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তথাপি দেহ ধ্বংসের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া উহার অভিনব ব্যক্তিতে (person) পরিণত হওয়ারই সম্ভাবনা। James এর মতে অতীতে এবং বর্ত্তমানে একই পরিণামী নিত্য দেহের অবস্থিতিই, নিত্য ব্যক্তিত্বের (personal Identity)। কারণ, একই দেহে অনুভূত বৃত্তিসমূহের মধ্যে একটী আত্মীয়তা ("warmth and intimacy") জন্মে; তাহারই ফলে পরভবিক অহং অতীতের অহংকে আপন বলিয়া জানে। যেমন পুত্র মৃত পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয়, তেমন ক্রমাগত অহং অতীত অহংএর জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হয়। এইরূপে অদ্যকার অহং অতীতের অহং সমূহের জ্ঞানের উত্তরাধিকারী। অতীতে ও বর্ত্তমানে একই বিষয়জ্ঞত্বই আত্মার ইহজীবনে নিত্যত্ব (Continuity)। কিন্তু অতীতের আত্মা কি ভাবে বর্ত্তমান আত্মাকে নিজ জ্ঞান সমর্পণ করে, এবং বর্ত্তমান আত্মা উহা কি ভাবে গ্রহণ (appropriation) করে, তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। হইতে পারে যে, মস্তিষ্কের বর্ত্তমান ক্রিয়ার সহিত, অতীত ক্রিয়াসমূহের সংগৃহীত সংস্কার সমূহের উদ্বোধন এবং সংমিশ্রণই ঐ গ্রহণ প্রণালীর (process of appropriation) মূলভিত্তি। যদি তাহাই হয়, তবে ব্যাধি, কিম্বা অন্য কোন কারণে যদি অতীতের সংস্কার বর্ত্তমানের ক্রিয়ায় সহিত যোগদান করিতে না পারে, অর্থাৎ যদি মস্তিষ্ক বিকৃত হয়, তবেই অভিনব ব্যক্তির উদয় (mutation of Personality) হয়, চিকিৎসা দ্বারা মস্তিষ্ক রোগ দূর হইলে জীব পুনরায় সুস্থ হয়। বহিরিন্দ্রিয় ধ্বংস হইলে বহির্বিষয় গ্রহণ করিবার শক্তি লোপ (as physical blindness) হয়, মস্তিষ্ক ধ্বংস হইলে সর্ব্ববিষয়ক ভাবনাশক্তি লোপ (as psychical blindness) হয়। এরূপাবস্থায় মৃত্যুতে দেহ ধ্বংস হইলে আত্মা কি থাকিতে পারে? থাকিতে পারিলেও উহা অতীতকে ভুলিয়া, সর্ব্ববিষয়ক ভাবনাশক্তিহীন হইয়া, কিম্ভূতকিমাকার হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আত্মা দেহ ধর্ম্ম নহে, কিন্তু দেহসম্বন্ধ। সুতরাং দেহনাশকে আত্মনাশ বলা যায় না। হয় ত দেহ ও আত্মা একই পদার্থের দুইটী গুণ (attributes) *।

* See Binet's Alternations of Personality and Jame's Principles of Psychology.

* রামানুজ, Spinoza.

কিংবা দুইটী দিক্ (aspects) * দেহনাশ অর্থে দেহারম্ভক পরমাণুর ধ্বংস না বুঝিয়া উহার অবস্থান্তর বুঝিতে হইবে। অতএব দেহের যখন আত্যান্তিক ধ্বংস নাই, তখন আত্মারও আত্যান্তিক ধ্বংস না হইতে পারে।

এতাবৎ আলোচনার ভাবার্থ এই যে, আত্মা যদি দেহের ধর্ম্ম হয়, তবে আত্মা দেহের ন্যায় নশ্বর; আর যদি উহা স্বতন্ত্র পদার্থ হয়, তবে মৃত্যুতে উহার ধ্বংস না হইলেও, উহার স্ফূরণাভাব হয় এবং অতীতকে ভুলিয়া, বৃত্তিহীন হইয়া, উহা একটী অভিনব পদার্থ হয়। পূর্ব্ব পক্ষটী নিরাকৃত হইয়াছে।

প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ † এই বিষয়টীকে অন্য ভাবে বিবেচনা করেন। Weismann বলেন, প্রাণীগণ স্বভাবতঃ মরণশীল নহে, মরণ ধর্ম্মটী জাতির (species) মঙ্গলের জন্য প্রাণীগণকর্ত্তৃক অর্জ্জিত (acquired). আদিজীব Amœbaর স্বাভাবিক মৃত্যু নাই; এই এককোষ জীবাণু বিভক্ত হইয়া দুইটী জীবাণুতে পরিণত হয়; এই উৎপন্ন জীবাণুদ্বয় যথাসময়ে বিভক্ত হইয়া অপর জীবাণু উৎপন্ন করে। ইহাই ইহাদের সন্তানোৎপাদন প্রণালী (Process of Reproduction). অতএব দেখা যায়, উক্ত স্থলে মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই। Amœbaর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভাগ নাই। একটী কোষে সীমাবদ্ধ, একটী Nucleus সংকৃত একবিন্দু Protoplasmই ইহার নির্ব্বিশেষ অঙ্গ। এই অঙ্গ দ্বারাই উহার গতিবিধি, আহরণ, সন্তানোৎপাদন নিষ্পন্ন হয়। যখন Evolutionএর সঙ্গে জীবাণুর অঙ্গের বিভিন্নাংশ জীবন-নির্ব্বাহক বিভিন্ন ব্যাপারের জন্য বিশেষিত হইয়া উঠে (Differention of Division of Labour), তখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আবির্ভাব হয়। প্রত্যেকটী ব্যক্তিরই স্বজাতীয় ব্যক্তি উৎপন্ন করিবার শক্তিবিশিষ্ট কতকগুলি কোষ থাকে, ঐ কোষগুলির হিসাবে Amœbaর ন্যায় প্রত্যেকটী জীব অমর; ব্যক্তিগত জীবননির্ব্বাহক অংশগুলি সন্তানোৎপাদন এবং সন্তানের জীবনরক্ষার উপযোগী শক্তি বিকাশের পর জাতির পক্ষে নিষ্প্রয়োজন এবং কখন কখন অনিষ্টজনক হইয়া যায় বলিয়া মৃত্যু অর্জ্জন করে। বীজকোষগুলি আত্মবিভাগের ফলে সন্তানরূপে পরিণত হয়, সন্তান হইতে পুনরায় বীজকোষ উৎপন্ন হয়। এইরূপে পিতা পুত্ররূপে বাঁচিয়া থাকে। বোধ হয় এই কারণেই প্রতি প্রাণীনিহিত প্রাণশক্তি সম্মুখস্থ মৃত্যুর ভিতর দিয়া অমৃতত্ব লাভ অনিশ্চিত বা অসম্ভব মনে করিয়া, অন্ততঃ পক্ষে সন্তানরূপে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যৌবনে স্ত্রীসঙ্গের জন্য তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকে।

এই প্রকার অমৃতত্বে যদি মনস্তুষ্টি হইত, তবে মৃত্যুভয় অনেকটা দূর হইত। কিন্তু আমরা পুত্ররূপে এবং আত্মরূপে উভয় রূপেই অমর হইতে চাই। প্রাণীতত্ত্ব আত্মরূপে অমর হইয়া থাকিবার কোন সম্ভাবনা দেখেন না। যেমন নিদ্রার পর জাগিয়া উঠি, তেমন মৃত্যু-নিদ্রার পর যে জাগিয়া উঠিব, তাহা ত আমরা জানি না। শাস্ত্র বলেন—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

—কঠোপনিষৎ।

---

* See Leibniz, Kant, Schopenhauer and others.

† See Weismann's On Heredity.

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"
—ভগবদ্গীতা।

কিন্তু শাস্ত্রকে যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিতে না পারিলে, শ্রবণকে মনন দ্বারা দৃঢ় করিতে না পারিলে, বিচারশক্তিবিশিষ্ট মানবের মনস্তুষ্টি হয় না। অমরত্ব চিরবাঞ্ছিত বলিয়া অধিকাংশ দার্শনিকই উহাকে যুক্তি দ্বারা স্থাপন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ * বলেন, যেমন ব্যক্তি পরিবারে, পরিবার সমাজে, সমাজ জাতিতে অন্তর্ভুক্ত, তেমন আমাদিগের শরীরস্থ ব্যষ্টি কোষগুলির আত্মা সকল আমাদিগের বৃহত্তর আত্মার অন্তর্ভুক্ত এবং আমাদিগের আত্মাগুলি ততোধিক বৃহত্তর অর্থাৎ পরমাত্মা বা ভগবানের অন্তর্ভুক্ত। অতীত বিষয় যেমন আমাদিগের স্মৃতিতে থাকিয়া আমাদিগের চিন্তাপ্রবাহ নিয়মিত করে, তেমন আমাদিগের আত্মা বা সম্বন্ধ বিজ্ঞান:প্রবাহ ঈশ্বরেতে চিরকাল থাকিয়া যায়। অতএব আত্মা সকল ভগবানেতে অমর হইয়া থাকে। মৃত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও সমাজের মনে থাকিয়া যাওয়াতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অমরত্ব লাভ করে। কিন্তু এই অমরত্ব বাঞ্ছনীয় নহে। উক্ত ন্যায়ানুসারে বলা যায়, আমাদিগের ভক্ষিত মৎস্য অমর, কারণ উহা রক্ত মাংস রূপে আমাদিগের শরীরেই থাকিয়া যায়। আমরা চাই, দেহ ধ্বংস হইলেও অপর একটী মনোরম দেহ ধারণ করিয়া অতীত বিস্মৃত না হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে। কিন্তু উহা কি সম্ভব?

* See Paulsen's Introduction to Philosophy.

যদি পুনর্জন্ম বলিয়া কিছু থাকে, তবে পূর্ব্বজন্মের তুলনায় বর্ত্তমান জন্মটী পুনর্জন্ম। যদি আত্মা অমর হয়, তবে পূর্ব্বজন্মের আমি এবং ইহজন্মের আমি এক। সুতরাং পূর্ব্বজন্মে অনুভূত বিষয় সমূহ ইহজন্মে আমার স্মরণ পথে আসা উচিত। কিন্তু তাহা কেন হয় না। আমি কে ছিলাম, কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম কিছুই স্মরণ করিতে পারিতেছি না; কত জীব, কত স্থান, কত অবস্থা দেখিতেছি, পূর্ব্বজন্মের কোন একটী সংস্কারই ত উদ্বুদ্ধ হয় না। সুতরাং মনে হয়, আমার পূর্ব্বজন্ম নাই। Plato, Wordsworth প্রভৃতি যে মনে করেন, পূর্ব্বজন্মের অনুভূত বিষয় সমূহ স্মৃতিপথে উদিত হয়, তাহা কবিকল্পনা মাত্র। শঙ্করাচার্য্য বলেন "জাতমাত্রাণাঞ্চ জন্তূনাং স্তন্যাভিলাষভয়াদি দর্শনাচ্চ অতীত স্তন্যপান জন্মান্তরানুভূত-দুঃখানুভব-স্মৃতির্গম্যতে।" * নবজাত শিশুর স্তন্যাভিলাষ হয় এবং উহা অভিলাষানুরূপ স্তন্য পান করিতে সমর্থ হয়। এই সামর্থ্য কোথা হইতে আসিল? অনেক যত্ন ও সংস্কার সাপেক্ষ ঐ সমস্ত কার্য্য শিশুর পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না; অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, জীব পূর্ব্বজন্মে ঐ সমস্ত বিষয় অনুভব করিয়া যে সংস্কার লাভ করিয়াছিল, তাহাই নবজাত শিশুতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞান বলে যে স্তন্য পান এবং অন্যান্য Instinctive actsএর কারণ—শিশুতে পিতৃ মাতৃ স্বভাব অনুযায়ী গঠিত মস্তিষ্কের বর্ত্তমানতা।

আস্তিকগণ বলেন, পূর্ব্বজন্মের বিষয় সমূহের স্মরণ না হওয়ার কারণ বিস্মৃতি। অতীত কালের, বাল্যকালের, অধিকাংশ

* ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১১শ খণ্ড ভাষ্য।

বিষয়ই স্মৃতিতে থাকে না, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমিই ঐ সকল অনুভব করিয়াছিলাম না। অতএব বিস্মৃতি দ্বারা আমার পূর্ব্বজন্মে আস্তা প্রমাণিত হয় না। জ্ঞান দুই প্রকার—স্পষ্টজ্ঞান (Consciousness) এবং সংস্কার ভাবাপন্ন জ্ঞান (Sub-consciousness)। মন যে বিষয়ে ধাবিত হয়, তাহাই স্পষ্টজ্ঞানে থাকে; তখন অপরাপর জ্ঞাত বিষয় সমূহ Sub-consciousnessএ চলিয়া যায়। এই সংস্কাররাজ্যে তিরোভাবই বিস্মরণ (Forgetfulness) সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, যাহা আমার স্পষ্টজ্ঞানে নাই, তাহা আমার সংস্কার রাজ্যে থাকিতে পারে। যখন ব্যক্তিত্ব বিকৃত হইয়া অভিনব ব্যক্তি আবির্ভূত হয় (change of Personality), তখন স্বাভাবিক ব্যক্তির (Primary or Normal Self) জ্ঞাত বিষয় সমূহ অভিনব ব্যক্তির (Secondary Self) সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত থাকে। এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির (Secondary Self) জ্ঞাত বিষয় সমূহ, প্রথম ব্যক্তির অজ্ঞাত থাকে। সুতরাং পূর্ব্বজন্মের অনুভূত বিষয় সমূহের স্মরণ হয় না বলিয়া বলা যায় না যে, পূর্ব্বজন্ম নাই, কারণ উহারা আমার স্পষ্টজ্ঞানে না থাকিলেও, সংস্কাররাজ্যে থাকিতে পারে। কিম্বা হয় ত মৃত্যু দ্বারা ব্যক্তিত্ব বিকৃত হইয়া যাওয়াতে, উক্ত বিষয় সমূহ ইহজন্মের অভিনব ব্যক্তির অজ্ঞাত থাকে।

এখন আমরা উক্ত বিষয়ে আমাদিগের মন্তব্য প্রকাশ করিব। পূর্ব্ব জন্মের বিষয় সমূহ সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত নহে। পূর্ব্ব জাতিজ্ঞান আগম ও প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রমাণিত। আগম কতকগুলি অভিজ্ঞতার সন্নিবেশ, উহার ব্যাখ্যা অন্য প্রকার হইতে পারে; কিন্তু আগমে সন্নিবিষ্ট বিষয়গুলি যথার্থ (Facts). আগমে যদি গন্ধর্ব্বাবেশের (Possession, Mediumship) * এর কথা থাকে, তবে ইহা যথার্থ যে কোন ব্যক্তির মনে, কতকগুলি অভিনব চিন্তা, ভাব বা প্রবৃত্তি উদিত হইয়াছিল এবং তদবস্থায় সে তাহার স্বাভাবিক চিন্তা, ভাব প্রভৃতি বিস্মৃত হইয়াছিল। আগম গন্ধর্ব্বাবেশ দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অপর কোন ব্যক্তি হয়ত উহা অন্য প্রকারে ব্যাখ্যা করিবেন। কিন্তু উল্লিখিত ঘটনাটীর যাথার্থ্যে আমাদিগের সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

পাতঞ্জলদর্শন বলেন, "সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্" (বিভূতিপাদ) এক প্রকার সংযম অভ্যাস করিলে জাতিস্মর হওয়া যায়। স্থিরচিত্তে ভাবনা করিলে যেমন ইহজন্মের অনেক বিস্মৃত বিষয় মনে আবার জাগিয়া উঠে; ব্যক্তিগত বিকৃতি চিকিৎসা দ্বারা দূর হইলে যেমন বিস্মৃত স্বাভাবিক অবস্থা, ভাবসকল আবার প্রত্যভিজ্ঞাত (recognised) হয়, তেমন যোগাভ্যাস দ্বারা পূর্ব্বজন্মবিষয়ক জ্ঞান লাভ করা যায়। উক্ত সূত্রের ভাষ্যে মহর্ষি বেদব্যাস বলেন, মহর্ষি জৈগীষব্যের দশমহাকল্পের জন্মপরম্পরাক্রমের জ্ঞান উপজাত হইয়াছিল। তিনি ভগবান আবট্যকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি নরকজনিত এবং তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্তিহেতু দুঃখ সকল অনুভব করিয়াছিলেন; এবং দেবতা ও মনুষ্যযোনিতে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। জৈগীষব্যের মনে ইহজন্মের অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ কতকগুলি সংশ্লিষ্ট চিন্তা উদিত এবং প্রত্যভিজ্ঞাত হওয়াতে উহাদিগকে পূর্ব্বজন্মের অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ বলিয়া মনে করা হইয়াছে।

* বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩য় অ, ৭ ব্রা।

ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন
"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥"
—গীতা ৪র্থ অঃ।

আমি অতীত জন্মসকল জানি, তুমি জান না।

রামায়ণ, মহাভারতে পূর্ব্বজাতিজ্ঞানের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বর্ত্তমান কালেও উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এখনও অনেক যোগী পুরুষ আছেন, যাঁহারা "জাতিস্মর"। কিন্তু আগমে কিম্বা যোগে অনেকেরই বিশ্বাস নাই; সুতরাং আমরা অপর ভাবে এই বিষয়টীর বিচার করিব।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, বাঁচিয়া থাকে কাহারা। প্রাণীতত্ত্ববিদ Darwin, Weismann, প্রভৃতি বলেন, যাঁহারা সবল, তাঁহারাই বাঁচিয়া থাকে। যখন প্রকৃতি চতুর্দ্দিক হইতে প্রাণীগণকে আক্রমণ করে, তখন যাহারা বুদ্ধিবলে বা শারীরিক বলে তাহাকে পরাজিত করিতে পারে, তাহারাই বাঁচিয়া থাকে (Survival of the Fittest). আমরা যেমন ভাল জিনিষ রাখিয়া, মন্দ জিনিষগুলিকে পরিত্যাগ করি, তেমন যাহারা ক্ষুধায় খাদ্য সংস্থান, রৌদ্র বৃষ্টিতে গৃহে আশ্রয়লাভ, ব্যাধিতে ঔষধ সেবন করিতে পারে, তাহারাই বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রকৃতিকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত (Natural Selection) হয়; অর্থাৎ যাহারা প্রাকৃতিক প্রতিকূল ক্রিয়াগুলিকে পরাজিত করিতে পারে, তাহারাই জীবিত থাকে। আমরা মনে করি, সকল আত্মাই মৃত্যুর পর থাকিয়া যায় না; যে আত্মাগুলি সবল তাহারাই থাকিয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন যে, আত্মাগুলি যারা জগতের উপকার হইতে পারে, তাহারাই মৃত্যু অতিক্রম করে। আমরা এই মতটী সমীচীন মনে করি না; কারণ পরলোক ও ইহলোক একই নিয়ম দ্বারা পরিচালিত। ইহলোকে দেখা যায়, যাহারা জগতের উপকারী, তাহারাও অকাল মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যাহাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, তাহারাও অর্থাৎ শিশুগণও মরিয়া যায় এবং অসংখ্য দুষ্ট লোক বাঁচিয়া থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মের এই প্রকার অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় না যে, সাধু আত্মা সকল মৃত্যুর অধীন নহে।

একণে আত্মার মৃত্যুটী কি প্রকার হইতে পারে, তাহা বিচার্য্য। হইতে পারে, মৃত্যুর পর আত্মার ধ্বংস হয়, উহার লোপ হয়, উহার কিছুই মৃত্যুর পর অবশিষ্ট থাকে না। এই প্রকার মৃত্যু, এই দেহের জীবদ্দশায় কখনও হয় বলিয়া আমরা জানি না। সুষুপ্তি মূর্চ্ছাদি অবস্থায় অনুভূতির লোপ হয় না; স্বপ্নের ন্যায় একপ্রকার অনুভূতি তখন বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু উহা এত অস্পষ্ট ও অসম্বদ্ধ যে, জাগ্রদবস্থায় আমরা উহা বিস্মৃত হই। জাগ্রজ্জীবনের স্পষ্ট জ্ঞানালোকে, উহা অদৃশ্য হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যু পর্য্যন্ত অনুভূতির নিরবচ্ছিন্ন, অবিরাম (continuous) গতি অনুভূত হয়। সমগ্র অনুভূতির লোপ কখনই হয় না। অতীতের অধিকাংশ বিষয় বিস্মৃত হইলেও, আমরা প্রতিমুহূর্ত্তেই পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অনুভূত বিষয়ের সহিত নিরবচ্ছিন্নভাবে কোন একটী বিষয় অনুভব করিতে থাকি। এবং বিস্মৃতিবিষয়ের যে অস্তিত্ব লোপ হয়, এমত নহে। উহারা Sub-consciousnessএ থাকিয়া বর্ত্তমানে অনুভূত বিষয়কে নিয়মিত করে; কখনও বা স্মৃতির সাহায্যে স্পষ্টজ্ঞানালোকে দেখা দেয়, কখনও বা স্বপ্ন রাজ্যের অস্পষ্টা-

লোকে সম্বদ্ধ বা অসম্বদ্ধভাবে দৃষ্ট হয়। যেমন অতীতে ভক্ষিত বস্তু, বর্ত্তমান দেহে রক্ত মাংসরূপে থাকিয়া যায়, তেমন অতীতে জ্ঞাত বিষয় সমূহ, বর্ত্তমান অনুভূতির রক্ত মাংসরূপে অবস্থান করে। সুতরাং জীবদ্দেহে আত্মার উক্ত প্রকার মৃত্যু কখনও হয় না, এবং আমরা মনে করি, দেহ ধ্বংসের পরও হয় না। উক্ত সিদ্ধান্তের কারণ ক্রমশঃ উল্লিখিত হইতেছে।

দ্বিতীয় প্রকার মৃত্যু বিস্মৃতি হইতে উৎপন্ন হয়; এবং বিস্মৃতির পরিমাণের ন্যায় এই মৃত্যুরও পরিমাণ আছে। এস্থলে প্রথমতঃ দ্রষ্টব্য—আত্মাটী কি, আমি কি? জীবনের সম্বদ্ধ লক্ষ্যসমূহের সহিত সম্বদ্ধ ভাব, অনুভূতি, এবং প্রবৃত্তি-সমষ্টি ও দেহজাত (Organic) কিয়ৎ পরিমাণে স্থায়ী অনুভূতি ও বেদনা সমষ্টি লইয়াই আত্মা বা আমি। যে সকল অনুভূতি বা ভাব পূর্ব্বোক্ত অনুভূতি সমষ্টির সহিত সম্বদ্ধভাবে অনুভূত হইবে, তাহারাই আত্মার অন্তর্গত হইবে। এই বিজ্ঞান প্রবাহাতিরিক্ত বিন্দু পরিমিত নির্জীব কোন আত্মা আছে কি না, তাহা বলিতে পারি না; যদি আমি আমার অতীত ও বর্ত্তমান সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যাই, তবে আমার ব্যক্তিত্বে বিকৃতি ঘটিবে, আমি অপর ব্যক্তিতে পরিণত হইব। ইহাই পূর্ব্ব আত্মার বিনাশ। যদি কোন প্রকারে আমা হইতে আমার স্বাভাবিক অনুভূতি ও ভাবসমূহকে বিতাড়িত করিয়া, আমাতে বিতাড়িত ভাবসমূহের সহিত অসম্বদ্ধ কতকগুলি ভাব উৎপন্ন করা যায়, তবে আমি পূর্ব্ব ব্যক্তি হইতে পৃথক হইয়া পড়িব। দ্বিতীয় আমার নিকট, প্রথম আমাতে এবং অপর একটী মানবে কোন প্রভেদ থাকিবে না। আমি 'রাম' নহে; কারণ আমি রামের অনুভূত বিষয় সমূহ স্মরণ করিতে পারি না; রাম কর্ত্তৃক অনুভূত সুখ দুঃখ আমাতে অনুভূত হয় না, রাম কর্ত্তৃক অনুভূত বিষয় সমূহ, আমার অনুভূতির সহিত সম্বদ্ধ নহে। আমি যদি আমার পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হইয়া যাই, কোন প্রকারেই উহা স্মরণ করিতে না পারি, তাহা হইলে কাহারও নিকট আমার পূর্ব্বাবস্থার ইতিহাস শ্রবণ করিলে, আমি মনে করিব,রামের ইতিহাস শ্রবণ করিতেছি; পূর্ব্বের আমার প্রশংসা বা নিন্দায় আমি হর্ষযুক্ত বা দুঃখিত হইব না। ইহাই পূর্ব্ব আত্মার মৃত্যু। এই প্রকার ব্যক্তিত্বের বিকৃতি যে অসম্ভব নহে, তাহা স্বীকৃত। জীবদ্দেহেই আত্মার এই প্রকার মৃত্যু হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা একটী ঘটনার * উল্লেখ করিব। Dr. Mitchell, Pennsylvania-নিবাসিনী Mary Reynolds নাম্নী একটী অল্পবয়স্কা বালিকার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (Transactions of the college of Physicians of Philadelphia, April 4, 1888. Also less complete, in Harper's Magazine. May 1860), যে সেই বালিকা একদিন প্রায় অষ্টাদশ ঘণ্টার গভীর নিদ্রার পর জাগিয়া অতীতের কিছুই স্মরণ করিতে পারিতেছিল না। একটী নবজাত শিশুর ন্যায়, পিতা, মাতা, বন্ধুবর্গ, পূর্ব্বপরিচিত স্থান সমূহ, ভাষা প্রভৃতি সকলই তাহার নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত মনে হইতেছিল। সেই দিনই যেন সে পৃথিবীটী প্রথম দেখিয়াছিল। তখন তাহাকে পিতা, মাতা, প্রভৃতি কি

* See James Principles of Psychology. Vol. I.

এবং কে, লেখা পড়া, কথা বলা সকলই শিক্ষা দেওয়ার জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইল; কয়েক সপ্তাহ শিক্ষার পর পিতা মাতা কে, তাহা জানিল, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতি উহার স্বাভাবিক আন্তরিক ভক্তি জন্মিল না। এই অবস্থায় তাহার স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হইল; সে স্বভাবতঃ বিমর্ষা, কিন্তু এক্ষণে সে অত্যন্ত প্রফুল্লা, কৌতুকপ্রিয়া হইল। সে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইত, খেলিত ইত্যাদি। এই ভাবে পাঁচ সপ্তাহ অতীত হইলে পর, সে একদিন নিদ্রা হইতে উঠিয়া পূর্ব্বের জীবনকে স্মরণ করিতে পারিল, এবং পূর্ব্বজীবন প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে যে তাহার একটী অস্বাভাবিক অবস্থা হইয়াছিল, তাহা সে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইল। সে নিদ্রা হইতে উঠিয়াই, পাঁচ সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহার যে সকল কর্ত্তব্য ছিল, তাহা সম্পাদন করিবার জন্য প্রবৃত্তা হইয়া এক রাত্রিতে পৃথিবীর এতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইল। তাহার অস্বাভাবিক জীবনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, হাস্য কৌতুক, নব পরিচিত ব্যক্তিগণ সকলই তাহার মন হইতে দূর হইল। এই ভাবে কয়েক সপ্তাহ অতীত হইলে পর সে পুনরায় অস্বাভাবিক জীবনকে স্মরণ করিয়া স্বাভাবিক অবস্থাকে বিস্মৃত হইল, এবং আরও কয়েকবার এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থায় ব্যক্তিত্বের পরিণতি হওয়ার পর ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ৬১ বৎসরে মৃত্যু হওয়া পর্য্যন্ত সে অস্বাভাবিক অবস্থাতেই ছিল।

Mary Reynolds-এর নামটী উহার শরীরটী এক থাকাতেই এক ছিল, কিন্তু ব্যক্তিত্ব হিসাবে, ঐ শরীরে দুইটী পৃথক ব্যক্তি ছিল, একটী Mary Reynolds I. দ্বিতীয়টী Mary Reynolds II. বিজ্ঞান প্রবাহের যতটুকু অবিচ্ছিন্ন, ততটুকু লইয়াই একটী আত্মা। উক্ত দৃষ্টান্তটী দ্বিতীয় প্রকার মৃত্যুর একটী চরমস্থল। স্বল্পাধিক পরিমাণে ইহা প্রায় সকল আত্মাতেই দৃষ্ট হয়। আমরা প্রত্যেকেই অতীতের অনেক বিষয় বিস্মৃত হই; সেই বিস্মৃত বিষয়ের পরিমাণানুসারে আত্মারও কিয়ৎ পরিমাণে মৃত্যু হয়। আমাদের মনের ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, নূতন জ্ঞানালোক পাইবার সঙ্গে, নূতনভাবে বা সিদ্ধান্তানুসারে অতীতকে দেখিবার সঙ্গে, কোন প্রকার সঙ্কল্প করিবার সঙ্গে, পূর্ব্ব আত্মারও কিয়ৎপরিমাণে মৃত্যু ঘটে. নিদ্রাকালে জাগ্রদাত্মাকে বিস্মৃত হওয়াতে জাগ্রদাত্মার, এবং জাগ্রদবস্থায় নিদ্রাকালীন আত্মার সহিত জাগ্রদাত্মার সামঞ্জস্য না দেখাতে নিদ্রাকালীন আত্মার, তদ্রূপ সম্মোহিতাবস্থায় (in hypnotic trance) জাগ্রদাত্মার এবং জাগ্রদবস্থায় সম্মোহিতাত্মার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় নিদ্রোত্থিতাত্মা নিদ্রার পূর্ব্ববর্ত্তী ভাব সমূহকে অর্থাৎ আত্মাকে পূর্ব্ববৎ আবেগের সহিত স্মরণ করে বলিয়া, আত্মা এক প্রকার অমর থাকিয়া যায়।

সকল লোকই সমভাবে অতীতকে ভুলিয়া যায় না, প্রতিদিনই নূতন ভাবে জীবনকে দেখে না, একই অবস্থায় সমভাবে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হয় না। কেহ আত্ম-প্রশংসা শুনিয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া এক ভাবে ব্যবহার করে, কেহ অল্প পরিমাণে তুষ্ট হইয়া অপর ভাবে ব্যবহার করে, কেহ বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, কেহ বা প্রশংসা-কারীকে তোষামোদকারী মনে করিয়া উহার নীচতায় ব্যথিত হয়, কেহ বা বিরক্ত হয়। মৃত পুত্রের পার্শ্বে, কিম্বা পুত্রের

মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া কোন মাতা সংজ্ঞাহীন হইয়া থাকে, কোন মাতা উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে থাকে, কোন মাতা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকে, কোন মাতা স্থির-চিত্তে বসিয়া থাকে; এবং কখন কখন কোন মাতা উন্মাদিনী হইয়া যায়। যাহা ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে ক্রোধে অধীর করে, তাহা শান্ত স্বভাব ব্যক্তিকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, চিত্তের উপর অধিকার সকলের সমান নহে। সম্পদের সময় যাহা স্মরণে আসে, বিপদের সময় তাহা বিস্মৃত হই: অর্থাৎ বিপৎকালে হতবুদ্ধি হই। কখন কখন হতাশ ব্যক্তি আশাতিরিক্ত সফলতার সংবাদ শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে বা মরিয়া যায়, বা পাগল হয়। কেহ বা দুঃখে পড়িয়া অতীতকে ভুলিয়া যায়।

প্রত্যেকটী চঞ্চলতা বা আত্মার ভাব-পরিবর্ত্তনের অবস্থাই এক প্রকার মৃত্যু। সাধারণতঃ দেখা যায়, যাহারা তেজস্বী, সংযতচিত্ত, স্থিরস্বভাব, তাহাদিগের চিত্ত-চাঞ্চল্য কম হয়, অর্থাৎ তাহারা কিয়ৎ পরিমাণে অমর। আমরা মনে করি, কোন প্রক্রিয়া দ্বারা অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগাইয়া তুলিলে, এবং সেই শক্তির প্রভাবে অনুভূতি, ভাব ও প্রবৃত্তি সমূহকে দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলে, দেহ ধ্বংসের পরও আত্মার পূর্ণ বিকৃতি ঘটে না। যে যেই পরিমাণে বিজ্ঞান প্রবাহের প্রত্যেকটী বিজ্ঞানকে ধরিয়া রাখিতে পারে, সে সেই পরিমাণে অমর। অতএব আমাদের মতে যে আত্মা যত সবল, সেই আত্মা তত অমর; দুর্ব্বল আত্মা সকল বিকৃত হইয়া যায়। আমরা ইহজীবনে দেখি, অস্ত্রচিকিৎসকের হস্তস্থিত অস্ত্র দেখিবামাত্র কোন রোগী মূর্চ্ছিত হয়, আবার কেহ বা অস্ত্রাঘাতে অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইলেও বিচলিত হয় না; কেহ মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বেই সংজ্ঞা-হীন হয়, কেহ বা আহত হইয়াও অবিচলিত থাকে; আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, যে সবল, সে অমর (Survival of the Fittest).

যে সকল আত্মা ইহজীবনে অমর অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয় না, তাহাদিগের অধি-কাংশই দেহ ধ্বংসের সঙ্গে বিকৃত হইয়া যায়, কেহ বা সম্পূর্ণরূপে বিকৃত না হইয়া ইহলোকস্থ বন্ধু, বান্ধব, প্রিয়জনকে, কিয়ৎ-পরিমাণে স্মরণ করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই মায়া, মমতা হীন হয়; সেই কারণে বন্ধুগণের অভাবে দুঃখিত হয় না। কেহ বা অধিকাংশ বিষয়ই স্মরণ করিতে পারে এবং বন্ধুগণকে দেখা দিবার জন্য ও তাহাদিগের দেখা পাইবার জন্য অস্থির হয়। যাহারা পুনর্ব্বার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই পূর্ব্ব দেহ ধ্বংস ও নূতন দেহ প্রাপ্তির সঙ্গে অতীতকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া, অভিনব ব্যক্তিতে পরি-ণত হয়। যাহারা কোন উপায়ে পূর্ব্বজন্মের ব্যক্তিকে স্মরণ করিতে পারে, তাহাদিগকে জাতিস্মর বলে। আমি অতীতের যতটুকু স্মরণ করিতে পারি, ততটুকু হইতে আমার আত্মার আরম্ভ। আমি অতীত জীবনের কিছুই স্মরণ করিতে পারি না, অতএব ইহ-জীবনের আমি একটী নূতন ব্যক্তি।

ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিপ্রমাণ ব্যতীতও আমরা অপর ভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। আত্মার অমরত্ব বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। ছায়াদর্শন প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত বিষয়ে অসংখ্য

সত্য ঘটনার উল্লেখ আছে। আমরা Psychical Research Societyর Report * অবলম্বন করিয়া কয়েকটী ঘটনার আলোচনা করিব। এই সঙ্ঘের প্রসিদ্ধ সদস্যগণ অসংখ্য ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহা পারলৌকিক আত্মার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে। প্রথমতঃ দেখা যায়, আত্মা দেহ হইতে বহির্গত হইয়াও বর্ত্তমান থাকিতে পারে। যাঁহারা যোগশাস্ত্র মানেন, তাঁহারা জানেন, "বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ।" † যোগীগণ জীবদ্দেহ ত্যাগ করিয়া পরশরীরে প্রবেশ করিতে পারেন, এবং পুনরায় পূর্ব্বশরীরে প্রত্যাগমন করিতে পারেন। পূর্ব্বকালে অনেক লোক বিশ্বাস করিত এবং এখনও অনেকে বিশ্বাস করে, নিদ্রাবস্থায় আত্মা দেহত্যাগ করিয়া দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিতে চলিয়া যায়, তৎকালীন দৃষ্ট বিষয়সমূহ স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় বলিয়া গণ্য হয়। এই বিশ্বাসটীকে লক্ষ্য করিয়া গৌড়পাদাচার্য্য মাণ্ডুক্যোপনিষদের কারিকায় বলিয়াছেন,—

"অদীর্ঘত্বাচ্চ কালস্য গত্বা দেহান্ন পশ্যতি।
প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্ব্বস্তস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে ॥"
শ্লোক ২, বৈতথ্যপ্রকরণ।

উক্ত সভার সভাপতি Mr. F. W. H. Myers (late Fellow Trin. Coll, Camb.) আত্মার বহির্গমন বা "excursive action of the spirit" সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন। যে সকল ঘটনা দেখিয়া তিনি এবং অন্যান্য সদস্যগণ আত্মার বহির্গমন ব্যাপারটী সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, আমরা তাহার একটীমাত্র উল্লেখ করিব।

* See Barrett's Psychical Research.
† পাতঞ্জলদর্শন, বিভূতিপাদ, ৩৮শ সূত্র।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে Mrs. Blaikie বাটী ত্যাগ করিয়া Edinburghএ অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় তিনি ১০ই ডিসেম্বর অত্যন্ত অসুস্থা হইলেন। ১১ই ডিসেম্বর রাত্রি ১১টার সময় তাঁহার বাটীতে রন্ধনশালায় তিনটী পরিচারিকা অগ্নির পার্শ্বে বসিয়া, কক্ষ হইতে পুত্র কন্যার শয়নগৃহে যাইবার পথে, তাহাদিগের গৃহিণীর (Mrs. Blaikie) পদশব্দ শুনিতে পাইয়া, উক্ত শয়ন-গৃহাভিমুখে যাইয়া কিছুই দেখিল না। ঠিক সেই সময় শয়নগৃহে, শয়নোদ্যতা Frances (Mrs. Blaikieর কন্যা) গৃহদ্বারে মাতার পদধ্বনি শুনিতে পাইল, কিন্তু মাতা সেখানে নাই জানিয়া মনে করিল, উহা কোন পরিচারিকার পদশব্দ। তখন পরিচারিকাগণ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার মাতা তথায় আছেন কি না। কক্ষান্তরে অপর কন্যা Jeanicও মাতৃপদধ্বনি শুনিয়া ভীতা হইল।

Mrs. Blaikie লিখিয়াছেন—তিনি ১১ই ডিসেম্বর রাত্রি প্রায় ১১টার সময় অত্যন্ত অসুস্থা হইলেন, তাঁহার মনে হইল, যেন তাঁহার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল এবং তিনি আর বাঁচিবেন না। তখন গৃহে যাইবার জন্য তাঁহার একটী অতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। তখন তাঁহার যেন মনে হইল যে, তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুত্র কন্যার শয়নগৃহাভিমুখে যাইতেছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি যেন জাগিয়া উঠিলেন এবং দেখিলেন, Edinburgh স্থিত গৃহে তিনি অসুস্থাবস্থায় শায়িতা আছেন। Mr. Myers মনে করেন, Mrs. Blaikieর আত্মার বহির্গমন ব্যতীত ইহার অপর কোন ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয় না। আমরা মনে করি, অনে-

কেরই অভিজ্ঞতায় উক্ত প্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তাঁহারা উহাদিগকে Electricity বা অপর কোন উপায়ে ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া নিজদিগকে ভ্রান্ত মনে করেন। আমরা তাঁহাদিগকে বলিয়া রাখি যে, এই প্রকার ঘটনার সংখ্যা এত অধিক যে, উহাদিগকে ভ্রম (Hallucination) মনে করিলে, সত্য বলিয়া স্বীকৃত অভিজ্ঞতা সকলকেও ভ্রম বলিতে হয়। এই জাতীয় ঘটনা হইতে জানা যায় যে, জীবদ্দেহ ত্যাগ করিয়াও আত্মা থাকিতে পারে।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, Planchette এবং অন্যান্য Autoscopeএর ব্যাপার সমূহ, হয় মিথ্যা, অর্থাৎ প্রতারণাময়, না হয় প্রেতাত্মার অস্তিত্বজ্ঞাপক। যাঁহারা প্রথম মতাবলম্বী, তাঁহাদিগকে বলি, উহারা সকলই মিথ্যা নহে; দ্বিতীয় মতাবলম্বীদিগকে বলি, উহারা সকলই প্রেতাত্মার অস্তিত্বজ্ঞাপক নহে। স্বকৃত কর্ম্ম যে কর্ত্তার অজ্ঞাতভাবে হইতে পারে (Unconscious Muscular Activity) তাহারই পরিচায়ক। কিন্তু কখনও কখনও প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়। যাঁহারা প্রেতাত্মা বা অমর আত্মাতে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা প্রেতাত্মা বা ছায়া দর্শন প্রভৃতি ব্যাপার সমূহ দ্বারা উহার অস্তিত্বের সমর্থন করেন। ইহার স্বরূপ এই যে, ইহাতে কোন দূরদেশস্থিত মরণোন্মুখ প্রিয় ব্যক্তির অকস্মাৎ আবির্ভাব হয়; আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিব।

(১) Tasmaniaতে Miss Hervey. Lady H (নামটী বিশেষ কারণে উহ্য রহিয়াছে)এর গৃহে বাস করিতেছিলেন। তিনি সন্ধ্যার সময় অশ্বারোহণের পর সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক অবস্থায় চা পানের জন্য Lady Hএর কক্ষে প্রবেশ করিবার সময় দেখিলেন Dublin স্থিতা তাঁহার ভগ্নী (Cousin) সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া দ্বিতলে আসিতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে Lady Hএর কক্ষে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিয়াছেন, তাহা বলিলেন, এবং লিখিয়া রাখিলেন। "শনিবার ২১শে April, ১৮৮৮, ৬টা সন্ধ্যা, শুক্লবসনা ভগ্নীর দর্শন।" June মাসে Miss Hervey Tasmaniaতে সংবাদ পাইলেন যে, ২২শে April ১৮৮৮, ৪টা ৩০ মিনিটের সময় অপরাহ্নে Dublin হাঁসপাতালে তাঁহার ভগ্নীর মৃত্যু হইয়াছে এবং সেই সময় তিনি শুক্ল বসন-পরিহিতা ছিলেন। *

(২)। ২৪শে মার্চ্চ শনিবার সন্ধ্যার সময় Mr. S. কক্ষের একটী নিভৃত স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন; কক্ষেরই মধ্যস্থলে তাঁহার পত্নী অধ্যয়নে নিযুক্তা ছিলেন। Mr. S. হঠাৎ দেখিতে পাইলেন Mr. F. L. তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান, এবং ক্ষণকাল Mr. S. এর দিকে স্থিরনয়নে চাহিয়া অদৃশ্য হইলেন। রোমাঞ্চিত কলেবর Mr. S. Job হইতে একটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, "And to, a spirit passed before me, and the hair of my flesh stood up!"

Mr. S. স্ত্রীকে বলিলেন, F. L.এর মৃত্যু হইয়াছে, এবং দেখিয়া রাখিলেন, বারটা বাজিবার নয় মিনিট বাকী আছে। রবিবার অপরাহ্নে F. L.এর ভ্রাতা, A. ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ লইয়া Mr. Sএর বাটীতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনার নিকট আমি কি

* Proceedings of the Society for Psychical Research. Vol X.

সংবাদ লইয়া আসিয়াছি, আপনি বোধ হয় তাহা জানেন (Mr. Sএর সহিত F. L.এর গাঢ় বন্ধুতার কথা স্মরণ করিয়া A. উক্ত অনুমানটী করিয়াছিলেন) Mr. S. উত্তর করিলেন, "জানি, আপনার ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে।" * Mr. A. তাঁহাকে জানাইলেন, তাঁহার ভ্রাতা গত রাত্রি প্রায় ৯টার সময় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

উক্ত Societyর মতে প্রেতাত্মা ব্যতীতও উক্ত প্রকার ঘটনার অপর ব্যাখ্যা সম্ভব। তাঁহারা Telepathy বা পরিচিত জ্ঞানশক্তি দ্বারা ইহাদের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন। মরণোন্মুখ ব্যক্তি কোন প্রকারে দূরদেশ হইতে তাহার কোন প্রিয় ব্যক্তির মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়া করেন, তাহারই ফলে, সে ছায়া (hallucination) দর্শন করে। "The Committee found that, making amplest allowance for various sources of error, the proportion of veridical (i.e. coincedental cases) to the meaningless (i.e. non-coincedental cases) is 440 times greater than pure chance would give; a result which they stated in the following cautious words: "Between deaths and apparitions of the dying person a connection exists which is not due to chance alone. This we hold as a proved fact." "And in many cases the simplest explanation of this connection is that afforded by telepathy." "This suggests a general explanation of those visnal hallucinations or apparitions, at the moment of death, which are supported by abundant first-hand evidence." *

হিন্দুমাত্রই জানেন, "প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্।" †

অর্থাৎ এক প্রকার সংযম দ্বারা পরচিত্ত জানিবার শক্তি জন্মে। পূর্ব্বোক্ত Society ইহা স্বীকার করেন, কিন্তু কি প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ শক্তিটী জন্মে, তাহা তাঁহারা জানেন না। তাঁহারা ইহাকে Telepathy বলেন।

তাঁহারা ইহাও স্বীকার করেন যে, ছায়া দর্শনের সকল ঘটনাই Telepathy দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না। তথাপি তাঁহারা এই জাতীয় ঘটনার দ্বারা প্রেতাত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত করেন না। তাঁহারা বলেন, যেমন জীবিতাবস্থায় দেহত্যাগ না করিয়াও কোন ব্যক্তি দূরস্থিত অপর ব্যক্তির মনের উপর ক্রিয়া করিতে পারে (Telepathy) তেমন উক্ত দৃষ্টান্তস্থলেও মরণোন্মুখ ব্যক্তিগণ দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগের বন্ধুবর্গের মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়া করিয়া তাহাদিগের নিকট সত্য-বস্তুর ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু যেখানে মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে কোন নির্দ্দিষ্টস্থলে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা বিভিন্ন বা একই কালে বিভিন্ন লোক কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, সেখানে Telepathy দ্বারা ব্যাখ্যা চলে না। নিম্নে দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। ‡

(১) ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে Captain Morton (যথার্থ নাম গোপন করিয়া এই কল্পিত নামটীর উল্লেখ করা হইয়াছে) সপরিবার দুইটী রাস্তার সন্ধিস্থলে

* Phantasms of the Living, Vol. I.

* Barrett's Psychical Research.

† পাতঞ্জল দর্শন, বিভূতিপাদ।

‡ Barrett's Psychical Research.

ফুল এবং ফলের বাগান বিশিষ্ট একটী নিভৃত বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। এই বাটী ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং Mr. S. সপরিবারে ইহাতে ১৬ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর পর Mr. S. পানাসক্ত হইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে দ্বিতীয়বার দার গ্রহণ করিলেন। Mr. Sএর সংসর্গে Mrs. Sও পানাসক্তা হইয়া দুই জনে ঝগড়া করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে July মাসে Mr. Sএর মৃত্যু হইল এবং Mrs. S. Cliftonএ চলিয়া গেলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে Cliftonএ তাঁহার মৃত্যু হইলে পূর্ব্বোক্ত বাটীর কিয়দ্দূরে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইল। Mr. Sএর মৃত্যুর পর Mr L. সপরিবারে উক্ত বাটীতে ৬ মাস বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় ৪ বৎসর উহাতে কেহ বাস করে নাই। সেই সময় উহাতে দিবসে এবং রাত্রিতে Mr Sএর দ্বিতীয় পত্নী Mrs. Sএর ন্যায় রোরুদ্যমানা একটী রমণীমূর্ত্তি দেখা যাইত। Mrs. S গবাক্ষের পার্শ্বে যেস্থানে সচরাচর দাঁড়াইতেন, ঐ মূর্ত্তিটীও সেস্থানে দাঁড়াইত। কিন্তু Captain Morton এই জনশ্রুতিটী জানিতেন না।

জ্যেষ্ঠা Miss M প্রায়ই ঐ মূর্ত্তিটী দেখিতেন, উহার অনুসরণ করিতেন, এবং উহাকে প্রশ্ন করিতেন। মূর্ত্তিটী ফিরিয়া দাঁড়াইত, উত্তর দিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু পারিত না। উহাকে স্পর্শ করিলে স্পর্শজ্ঞান জন্মিত না, এবং হঠাৎ অন্তর্ধান হইত, যখন হাঁটিত তখন মৃদু পদ শব্দ হইত। ক্রমশঃ Miss Mএর অন্যান্য ভগ্নী, ভ্রাতা এবং বন্ধুবর্গ, সর্ব্বসমেত প্রায় বিশ জন লোক, উহাকে দেখিতে পাইল। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের পর উহাকে আর দেখা যায় নাই।

(২) ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে Miss Scott, Roxburghshireএ বাস করিতেন। এক দিন মে মাসে অপরাহ্ণে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি দেখিলেন, কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছেদ-পরিহিত একজন দীর্ঘকায় পুরুষ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; পুরুষটী কিয়দ্দূর যাইয়া অদৃশ্য হইল। Miss Scott অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, তাঁহার ভগ্নী হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন; তিনিও ঐ পুরুষকে দেখিয়া উহাকে একজন পাদ্রী মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা হঠাৎ অদৃশ্য হইয়াছিল। জুলাই মাসে Miss Scott এবং তাঁহার অপর ভগ্নী সেই স্থানেই আবার সেই পুরুষকে দেখিলেন। তাহাকে একজন বৃদ্ধ পাদ্রীর মত দেখাইতেছিল এবং অল্পকাল পরেই উহা অদৃশ্য হইল। পরের বৎসর জুন মাসে সেই স্থানেই Miss Scott আবার সেই পুরুষকে দেখিয়া উহার অনুসরণ করিলে, সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন Miss Scottএর মনে হইল যে, সে একজন প্রায় এক শতাব্দীর পূর্ব্ব সময়ের পাদ্রী। Miss Irvine নাম্নী অপর একটী মহিলা সেই স্থানেই সেই পুরুষকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়াছিল।

উক্ত Society এই স্থলেও প্রেতাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, মৃত ব্যক্তির জীবদ্দশায় যে সকল ঘটনা ঘটে, সেই সকল ঘটনা দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তু বা স্থান চিহ্নিত (Some kind of local imprint is left on material structures or places) হইয়া থাকে। সেই চিহ্নিত বস্তু বা স্থান কোন কোন লোককে

এরূপভাবে অভিভূত করে যে, তাহারা মৃত ব্যক্তির মূর্ত্তি দেখিতে পায়। দেখা যায়, মুগ্ধকারী বা Hypnotizer কোন বস্তুর উপর হস্তসঞ্চালন (passes) করিলে, কোন কোন ব্যক্তি (subject) গৃহে প্রবেশ করিবামাত্রই উক্ত বস্তুটীর অস্তিত্ব উপলব্ধি করে।

উক্ত ঘটনা সকলের প্রেতাত্মা ব্যতীত অপর ব্যাখ্যা সম্ভবপর হইলেও, কতকগুলি ঘটনা আছে, যাহার অপর ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয় না। যাঁহারা এই সকল ঘটনার সত্যত্বে সন্দিহান, আশা করি, তাঁহারা উক্ত Societyর Reports পাঠ করিবেন, এবং তথাপি যদি তাঁহাদের সন্দেহ দূর না হয়, আমরা তাঁহাদিগকে সমগ্র ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যতায় সন্দিহান হইতে অনুরোধ করি।

কতকগুলি আবেশের ঘটনা (mediumships or possessions) দ্বারা জানা যায়, কোন কোন আত্মা দেহ ধ্বংসের পরও অবিকৃত ভাবে থাকিয়া যায়। যদি সকল আত্মাই অবিকৃত ভাবে থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে তাহারা সকলেই প্রিয় বন্ধুগণকে দেখা দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত, এবং অনেকেই দেখা দিতে পারিত। কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক আত্মাই দেখা দেয়; এই কারণেও আমরা মনে করি, মৃত্যুতে অধিকাংশ আত্মাই বিকৃত হয়। আর যদি মৃত্যুর সঙ্গে সকল আত্মারই ধ্বংস হইত বা মৃত্যুর পর সকল আত্মাই বিকৃত হইয়া যাইত, তবে কোন প্রেতাত্মাই আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগের পরিচয় দিতে পারিত না। এই কারণেও আমরা মনে করি, মৃত্যুতে সকল আত্মাই বিকৃত হয় না। প্রেতাত্মার অস্তিত্বজ্ঞাপক কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) Watsekaতে Mr. Vennum সস্ত্রীক বাস করিতেন। তাঁহার চতুর্দ্দশ বয়স্কা কন্যা Lurancy প্রায়ই আবিষ্টা হইত। এক সময় সে প্রতিবেশী Mr. Roff-এর দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে মৃতা কন্যা Mary Roffএর প্রেতাত্মা দ্বারা আবিষ্টা হইয়া Mr. Roffএর বাটী যাইবার জন্য অত্যন্ত অস্থির হইল। Mr. Roff এই সংবাদ পাইয়া Lurancyকে নিজ বাটীতে আনয়ন করিলেন। তাহার ব্যবহারে বাটীস্থ সকলেরই মনে হইল, সত্য সত্যই Mary Roff ফিরিয়া আসিয়াছে। Maryর পরিচিত সকল লোককেই সে চিনিয়া প্রত্যেকের সঙ্গে Maryর মত ব্যবহার করিত, Maryর জীবনের ঘটনা সকল তাহার জীবনস্মৃতিতে পরিণত হইল। Lurancy, Mr. Vennum এবং তাহার স্ত্রী পুত্র, কন্যা কাহাকেও সেই সময় চিনে না। প্রায় নয় সপ্তাহ পরে Lurancy স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া গৃহে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইল। Mr. Roffএর সঙ্গে সে Mr. Vennumএর বাটীতে আসিয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী সকলকেই আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে চুম্বন করিল।*

(২) William James বলেন যে, তিনি অনেক আবেশের ঘটনা দেখিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, কোন কোন স্থলে আবিষ্ট ব্যক্তিতে অপর একটী আত্মা অবস্থান করে। "In the case I have in mind, it professes to be a certain departed French Doctor; and is, I am convinced, acquainted

* James Principles of Psychology Vol. I.

with facts about the circumstances, and the living and dead relatives and acquaintances, of numberless sitters whom the medium never met before and of whom she has never heard the names."

(৩) London University College Schoolএর শিক্ষক Rev. W. Stainton Moses M. A. প্রায়ই এরূপ ঘটনা সকল লিখিতেন, যাহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইত যে, তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট প্রেতাত্মা কর্ত্তৃক আবিষ্ট। তিনি বলিতেন যে, কেহ বলপূর্ব্বক তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে লিখিতে বাধ্য করিত, এবং কি লিখিত হইবে, তাহাও তিনি জানিতেন না। তাঁহার সঙ্গে কোন এক মহিলার পরিচয় হইয়াছিল। সেই মহিলা London হইতে দুই শত মাইল দূরে বাস করিত। কোন এক রবিবার রাত্রিতে Mr. Moses-এর অজ্ঞাতভাবে তাঁহার হাতটী লিখিল যে, পূর্ব্বোক্ত মহিলার মৃত্যু হইয়াছে। সত্য সত্যই সেই রবিবার সেই মহিলার মৃত্যু হইয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতে Mr. Mosesএর হাতের ভিতর দিয়া উক্ত মহিলার হস্তাক্ষর বাহির হইত, এবং লিখিত বিষয়ও সেই মহিলার জীবনের সহিত সম্বদ্ধ ছিল।

এই প্রকার সহস্র সহস্র ঘটনা দেখিয়া Dr. Hogson বলেন, "that the chief 'communicators' are veritably the personalities that they claim to be, and that they have survived the change we call death."

উক্ত Society মনে করেন, Myers, Henry Sedgwick প্রভৃতি বিজ্ঞ লোকদিগের প্রেতাত্মা পরলোক হইতে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন। কতকগুলি আবেশের ঘটনা হইতে তাঁহারা উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সেই ঘটনাগুলিকে লক্ষ্য করিয়া প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Sir Oliver Lodge বলেন, "He [The scientific explorer] feels secure and happy in his advance only when one and the same hypothesis will account for every thing—both old and new—which he encounters. The one hypothesis which seems to me most nearly to satisfy that condition in this case, is that we are in indirect touch with some part of the surviving personality of a scholar, and that scholar F. W. H. Myers." তিনি সম্পূর্ণ স্বীকার করেন যে, মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহবেষ্টিত আত্মা বাঁচিয়া থাকে। *

আমরা মনে করি, যাঁহারা উক্ত Societyর Proceedings পাঠ করিবেন, তাঁহারা প্রেতাত্মার অস্তিত্বজ্ঞাপক ঘটনার প্রাচুর্য্য দেখিয়া, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবেন।

উপসংহার।

হিন্দুশাস্ত্রে পুনর্জ্জন্ম দুঃখের মধ্যে গণ্য। Schopenhaur প্রভৃতি দার্শনিকগণ, জীবনকে দুঃখ পূর্ণ মনে করেন। তাঁহারা বলেন, আমরা অকাল মৃত্যুকে ভয় করি, কিন্তু যদি আমরা দী[illegible] হইতাম, তবে জীবন আমাদিগের পক্ষে অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক হইত। মৃত্যু বা আত্মধ্বংস তখন আমাদিগের প্রিয় হইত।

হিন্দুধর্ম্ম জন্মকে দুঃখপূর্ণ বলেন, কারণ এই মতে জীবন দুঃখপূর্ণ, কিন্তু আমাদিগের বাঞ্ছিত মুক্তি আত্মধ্বংস বা জীবনধ্বংস নহে, উহা দুঃখের ধ্বংস। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"অবিনাশি তু তদ্‌বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥

—গীতা ২অ, ১৭ শ্লোক।

শ্রীরত্নেশচন্দ্র সেন।

* Hibbert Journal Vol. XVI. No. 2 1919.

রঞ্জন-রশ্মি *

দুই জনে কথোপকথন হইতেছিল। স্থান, রঞ্জন সাহেবের লেবরেটারি। মিঃ ড্যাম্ প্রোফেসর রঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, আপনার আবিষ্কারের ইতিহাসটা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিবেন কি?" রঞ্জন বলিলেন, "ইহার কোন ইতিহাস নাই। অনেক দিন হইতেই ক্যাথোড্ রশ্মির আলোচনা আমার খুব ভাল লাগিত। হার্টজ ও লেনার্ড ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ ক্যাথোড্ রশ্মি লইয়া যে সকল পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি খুব আগ্রহের সহিত আলোচনা করিতাম। আমি স্থির করিলাম, সময় পাইলে নিজেই এ বিষয়ে পরীক্ষা করিব। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষে আমার অবসর হইল। কাজ আরম্ভ করিলাম এবং দিন কয়েকের মধ্যেই আবিষ্কারটা ঘটিল।"

"তারিখটা কি?"

"নবেম্বর ৮ই।"

"আর আবিষ্কারটা কি?"

"আমি ক্রুক্‌স্ সাহেবের কাঁচের নল লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। নলটা একটা কালো মোটা কাগজে ঢাকা ছিল। নিকটেই বেঞ্চির উপর বেরিয়ম প্লাটিনোসায়েনাইড্ নামক লবণ বিশেষ মাখান একখণ্ড কাগজ পড়িয়াছিল। কাঁচের নলটার মধ্যে আমি তাড়িত প্রবাহ সঞ্চালিত করিতেছিলাম। তখন নুন মাখান কাগজের উপর আমি একটা কালো দাগ দেখিতে পাইলাম।"

"কালো দাগ? তা'তে কি হ'ল?"

"আলোক ভিন্ন এরূপ ঘটনা।" দাগটা কোন দ্রব্যের ছায়ার মত দেখাইতেছিল। ছায়া, কাজেই আলো চাই। "কাঁচের নল হইতে আলো আসিবার পথ ছিল না, উহাত খুব মোটা কাগজ দিয়াই ঢাকা ছিল। সাধারণ আলোক এরূপ মোটা কাগজ ভেদ করিতে পারে না—না, বিদ্যুতের আলোকেও উহা ভেদ করিতে সমর্থ নহে।"

"বটে? আপনি কি অনুমান করিলেন?"

"আমি কিছু অনুমান করিলাম না—অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল যে, যে রশ্মি-সম্পাতে ছায়াটা উৎপন্ন হইয়াছে, উহা আলোক রশ্মিই হৌক বা অন্য কোন রকমের রশ্মিই হৌক, উহা ঐ কাঁচের নলটা হইতেই আসিতেছে। অন্য কোন দিক হইতে আলো আসিলে ঐরূপ স্থানে ছায়া পতন ঘটিতে পারে না। আমি ভাল রূপে অনুসন্ধান করিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম, আমার ধারণাটা ঠিক—কাঁচের নলটা হইতেই যে কতগুলি রশ্মি বাহির হইতেছিল, এ সম্বন্ধে আমার আর কোন সন্দেহই রহিল না। ঢাকনিটা ভেদ করিয়াই রশ্মিগুলি নুন মাখান কাগজের উপর পতিত হইয়াছিল। রশ্মির গুণে কাগজখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, আর মাঝখানে একটা অস্বচ্ছ পদার্থ থাকাতে রশ্মিগুলি উহাকে ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই। কাগজের উপর কালো দাগটা ঐ অস্বচ্ছ পদার্থেরই ছায়া মাত্র। প্রথমে আমি ইহাকে কোন একটা নূতন রকমের আলোক বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম, তবে—হাঁ, ইহা যে নূতন কিছু তাহাতে সন্দেহ নাই।"

---

* ১৩২৫ সালে কার্ত্তিক মাসে গৌহাটি-সাহিত্য-পরিষদে পঠিত হইয়াছিল।

"ইহা কি আলোক ?"

"না।" সাধারণ আলোক যেরূপে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, ইহা সেরূপ হয় না, আলোক রশ্মি এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে যাইবার কালে বাঁকিয়া যায়, ইহা তেমন বাঁকায় না।

"তবে এটা কি বিদ্যুৎ ?"

"না, আমাদের পরিচিত কোন রকমের বিদ্যুৎও ইহা নহে।"

"তবে ইহা কি ?"

"আমি জানি না। নূতন রশ্মি আবিষ্কারের পর ইহা দ্বারা কি কি কার্য্য হইতে পারে, আমি তাহাই দেখিতে লাগিলাম। পরীক্ষার ফলে শীঘ্রই দেখিতে পাইলাম যে, এই রশ্মিগুলি অনেক পদার্থকেই অক্লেশে ভেদ করিয়া যাইতে সক্ষম। ভেদ করিবার ক্ষমতা ইহাদের অসাধারণ। কাগজ, কাপড়, কাঠ, এই সকল দ্রব্য এই নূতন রশ্মির পক্ষে একান্তই স্বচ্ছ। ইহা ধাতব পদার্থকেও ভেদ করিতে সক্ষম, তবে ধাতুগুলি সেরূপ স্বচ্ছ নহে। হাল্‌কা ধাতুগুলি যত স্বচ্ছ, ভারি ধাতুগুলি তত স্বচ্ছ নহে।"

অধ্যাপক রঞ্জন তাঁহার আবিষ্কার সম্বন্ধে নিজমুখে যে বর্ণনা দিয়াছিলেন, উপরে তাহা বিবৃত হইল। অধ্যাপক সিল্‌ভেনাস্ টম্‌সন্ উক্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া উহা তাঁহার "দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোক" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এখানে ভাষান্তরিত করিয়া তাহাই উদ্ধৃত হইল।

উক্ত বিবরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, রঞ্জন-রশ্মির উৎপত্তি স্থান হইতেছে ক্রুক্‌স্ সাহেবের কাঁচের নলটা। ক্রুক্‌স্ নলের ভিতর তাড়িত প্রবাহ সঞ্চালিত করিলে, ঐ নলটা হইতে অথবা উহার স্থান বিশেষ হইতে রঞ্জন রশ্মি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, রঞ্জন-রশ্মির একটা গুণ হইতেছে, উহা যদি বেরিয়ম প্লাটিনোসাএনাইড্ নামক দ্রব্য মাখান এক খণ্ড কাগজের উপর পতিত হয়, তবে ঐ কাগজটা উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইহাতেই রঞ্জন-রশ্মির আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে।

উক্ত বিবরণে আমরা আরও দেখিতে পাই—আর এইটাই হইতেছে রঞ্জন-রশ্মির প্রধান ধর্ম্ম—যে সাধারণ আলোক রশ্মি যে সকল পদার্থ ভেদ করিতে সমর্থ নহে, এইরূপ অনেক পদার্থকেই রঞ্জন-রশ্মি অক্লেশে ভেদ করিয়া যায়। কাগজের ঢাক্‌নিটাত এই রশ্মির পক্ষে নিতান্তই স্বচ্ছ। কাগজ, কাপড়, কাঠ, চর্ম্ম, মাংস প্রভৃতি পদার্থ সাধারণ আলোকের পক্ষে অস্বচ্ছ হইলেও রঞ্জন-রশ্মির পক্ষে বেশ স্বচ্ছ। ধাতুগুলি সাধারণ আলোকের পক্ষেও স্বচ্ছ নহে, আর রঞ্জন-রশ্মির পক্ষে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ হইলেও কাগজ বা কাঠের মত অত স্বচ্ছ নহে।

রঞ্জন-রশ্মির এই ভেদ করিবার ক্ষমতা প্রকৃতই অদ্ভুত। বিগত ২৩ বৎসরের মধ্যে রঞ্জন-রশ্মির আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা শ্রুতিগোচর হয় নাই, এরূপ ব্যক্তি বিরল। যাহার সাহায্যে বাক্স না খুলিয়া ভিতরকার টাকাকড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, চামড়া না চিরিয়া হাত পাএর হাড় দেখিতে পাওয়া যায়, বিনা অস্ত্র প্রয়োগে শরীরের কোন স্থানে গুলি বিদ্ধ হইয়াছে, অথবা শারীরযন্ত্রের কোথায় কোন বিকৃতি ঘটিয়াছে, ইহা নিরূপণ করিতে পারা যায়, এরূপ রশ্মির আবিষ্কারে যে বিজ্ঞান জগতে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই। অদৃশ্যকে দেখানই রঞ্জন-রশ্মির প্রধান গুণ। যাহা কল্পনারও অতীত ছিল, রঞ্জন-রশ্মি তাহা সম্ভব করিয়াছে।

এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে হইলে বিশেষ কোন আয়োজনের প্রয়োজন হয় না—চাই কেবল একখানা চুন বিশেষ মাথান কাগজ ও তড়িত-প্রবাহ-সমন্বিত বায়ুশূন্য একটা কাঁচের নল। অবশ্য ইহা যোটানও আমাদের পক্ষে তেমন সহজ নহে, তবে একটা সহজ রকমের উদাহরণ দ্বারাই ব্যাপারটা বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে।

অন্ধকার গৃহে ল্যাম্প জ্বালিলে সাদা দেওয়ালগুলি যে বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, ইহা আমরা প্রত্যহই দেখিয়া থাকি। ল্যাম্প ও দেওয়ালের মাঝখানে একটা টাকা বা পয়সা রাখিলে দেওয়ালের উপর উহার একটা কালো ছায়া পড়ে, কিন্তু একখণ্ড কাঁচ রাখিলে তাহার সেরূপ স্পষ্ট ছায়া পড়ে না। টাকার ছায়া পড়ে, কেন না টাকাটা অস্বচ্ছ পদার্থ—আলোক রশ্মি টাকার ভিতর ঢুকতেই আটকা পড়িয়া যায়, উহাকে ভেদ করিয়া বাহির হইতে সমর্থ হয় না। ফলে টাকাটার পিছনে দেওয়ালের যে অংশটা থাকে, ঐ স্থানে আলো পড়িতে পায় না। আশে পাশে আলো পড়ে, কিন্তু টাকাটার ঠিক পিছনেই থাকে অন্ধকার; ইহাই টাকার ছায়া। অস্বচ্ছ পদার্থেরই ছায়া পড়ে, স্বচ্ছ পদার্থের পড়ে না। কাঁচ খুব স্বচ্ছ, এজন্য টাকা পয়সার মত, কাঁচের অত স্পষ্ট ছায়া পড়ে না।

যদি অস্বচ্ছ টাকাটার একটা স্বচ্ছ আবরণ দেওয়া যায়—যদি উহাকে একটা কাঁচনির্ম্মিত বাক্সে পুরিয়া বাক্সটাকে ল্যাম্প ও দেওয়ালের মাঝখানে রাখা যায়, তবে কি দেখা যাইবে? দেখা যাইবে, দেওয়ালের উপর কাঁচের বাক্সের একটা অস্পষ্ট ছায়া পড়িয়াছে এবং এই অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে টাকার ছায়াটা গাঢ় মসীবর্ণে অঙ্কিত রহিয়াছে।

এখন আমরা ভাষা বদলাইয়া ফেলি। ল্যাম্পের চিমনিটা হইল যেন একটা তাড়িত-প্রবাহ-সমন্বিত ক্রুক্‌স্ সাহেবের কাঁচের নল, প্রদীপ রশ্মি হইল যেন রঞ্জন-রশ্মি, চুণমাখা দেওয়ালটা হইল যেন একখানা চুনমাখা কাগজ, আর টাকার বাক্সটা কাঁচের না হইয়া হইল যেন, যেরূপ হইতে হয়—কাঠের! এখন কি দেখা যাইবে? দেখা যাইবে এই চুনমাখা কাগজখানা বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, আর উজ্জ্বল কাগজখানার উপর ঐ কাঠের বাক্সটায়—যাহা আলোক রশ্মির পক্ষে অস্বচ্ছ হইলেও রঞ্জন-রশ্মির পক্ষে কাঁচের মতই স্বচ্ছ—উহার একটা অস্পষ্ট ছায়া পড়িয়াছে এবং বাক্সটার অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে টাকাটার একটা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাক্সটা সরাইয়া ঐ স্থানে একখানা হাত রাখিলে কি দেখা যাইবে? দেখা যাইবে, হাতখানার স্বচ্ছ চামড়া ও মাংসের অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে অস্বচ্ছ হাড়গুলির সুস্পষ্ট ছায়া বিদ্যমান। আর ঐ স্থানে একটী চঞ্চল বালককে ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইবে, যেন সমাধিক্ষেত্র হইতে একটী গলিত দেহ নরকঙ্কাল সমুত্থিত হইয়া উহার শীর্ণ দেহযষ্টির বিকট ভঙ্গী দ্বারা একটা বিভীষিকাময় পৈশাচিক নৃত্যের অভিনয় করিতেছে!

প্রশ্ন হইতে পারে, রঞ্জন-রশ্মির পরীক্ষায় একখানা চুনমাখা কাগজের আবশ্যক কি? উহার উপর ছায়াপাতই বা কেন? অদৃশ্য যদি দেখাই যায়, তবে সহজ দৃষ্টিতে দোষ কি? কাঁচের বাক্সে টাকা আছে কি না, ইহা ত বাক্সটা আলোর দিকে তুলিয়া ধরিলেই দেখা যায়, দেওয়ালের উপর ছায়া ফেলিবার ত কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। তবে

রঞ্জন-রশ্মির বেলায় অত আড়ম্বর কেন? নুনমাখা কাগজই বা কেন, উহার উপর ছায়াপাতই বা কেন? ইহার উত্তর এই যে, রঞ্জন-রশ্মি ঠিক সাধারণ আলোক রশ্মির মত নহে। এইরূপ অনেক রশ্মি আছে, যাহারা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া অবিরত যাওয়া আসা করিলেও চক্ষু তাহাতে কোন সাড়া দেয় না। রঞ্জন-রশ্মি এইরূপ একটা অদৃশ্য রশ্মি। অদৃশ্য বলিয়াই এই রশ্মিপথে হাত রাখিলে সহজ দৃষ্টিতে হাতের হাড় দেখা যায় না। রঞ্জন-রশ্মি প্রত্যক্ষগোচর হয় যখন উহাকে নুনমাখা কাগজে অথবা বিশেষ বিশেষ গোটাকয়েক পদার্থের উপর ফেলা যায়। এই জন্যই নুনমাখা কাগজের প্রয়োজন। এই রশ্মিগুলি যদি সাধারণ আলোকের ন্যায় সহজ দৃষ্টিতে দেখা যাইত, তাহা হইলে প্রত্যেক রঞ্জন-রশ্মি প্রদর্শনী গৃহ কি ভয়ঙ্কর প্রেতের সভাতেই না পর্য্যবসিত হইত!

দেখা যাইতেছে যে, রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে ভিতরকার জিনিষ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে বাহিরটা স্বচ্ছ,—অর্থাৎ রঞ্জন-রশ্মির পক্ষে স্বচ্ছ এবং ভিতরকার দ্রব্যগুলি অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছ হওয়া আবশ্যক। বাহিরের আবরণটা অস্বচ্ছ হইলে ভিতরকার পদার্থের ছায়াপতন ঘটিবেনা। ধাতুগুলি নিতান্ত পাৎলা না হইলে রঞ্জন-রশ্মির পক্ষেও অস্বচ্ছ। রঞ্জন-রশ্মির পথে একটা লোহার সিন্দুক রাখিলে পার্শ্বস্থ নুন মাখা কাগজের উপর ভিতর-কার দ্রব্যের কোনরকম ছায়াই পড়িবে না—প্রদীপের রশ্মিতে যেমন শুধু সিন্দুক-টারই ছায়া পড়ে, অভ্যন্তরস্থ পদার্থের ছায়া পড়ে না, রঞ্জন-রশ্মিতেও ঠিক তাহাই ঘটিবে। ফলে প্রদীপ রশ্মিই হোক বা সূর্য্য রশ্মিই হোক বা রঞ্জন-রশ্মিই হোক, মোটা লোহার সিন্দুক যে সকল ক্ষেত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান, তাহাতে ভুল নাই।

তার পর ফটোগ্রাফির কথা। রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে যে ফটো তোলা যায়, ইহা অনেকেই দেখিয়াছেন। সাধারণ আলোতে আমরা যে ফটো তুলি, উহা হইতেছে বাহিরের আবরণটায় ফটোগ্রাফ মাত্র, উহা হইতে আমরা ভিতরকার খবর পাই না; আর রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে যে ফটো তোলা হয়, উহা হইতেছে ভিতরকার ফটোগ্রাফ—জীবিত ব্যক্তির অস্থি পঞ্জরের ফটোগ্রাফ। ফটো তোলাও কিছু কঠিন কার্য্য নহে। যাহার ফটো তুলিতে হইবে, উহার ছায়াটা নুন মাখান কাগজের উপর না ফেলিয়া একখানা কাঁচের প্লেটের উপর ফেলিতে হয়। সাধারণ ফটো-গ্রাফিতে যে আরক মাখান কাঁচের প্লেট ব্যব-হৃত হয়, ঐ প্লেটের উপরই ছায়া ফেলিতে হয়, এবং বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য সাহায্যে একই প্রণালীতে ছায়াটাকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। রঞ্জন-রশ্মিও যে সাধারণ আলোকের মত আরক মাখা কাঁচের প্লেটে একটা রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটাইতে সক্ষম, তাহা রঞ্জনই আবি-ষ্কার করেন এবং এই রশ্মির সাহায্যে স্বীয় হস্তের অস্থিমালার ফটো গ্রহণে সমর্থ হইয়া রঞ্জনই প্রথমে অদৃশ্যের ফটো তুলিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন।

রঞ্জন-রশ্মির আর একটা ধর্ম্ম এই যে, গ্যাস সমূহ এই রশ্মি প্রভাবে বিদ্যুৎ পরি-চালন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বায়ু স্বভাবতঃ তাড়িত-অপরিচালক; এই জন্যই বায়ুর মধ্যে কোনও দ্রব্যকে তাড়িত বিশিষ্ট করিয়া রাখা চলে। কিন্তু যে স্থানে রঞ্জন রশ্মি উৎপন্ন করা যায়, উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু লোহা বা তামার ন্যায় বেশ তাড়িৎ-

পরিচালক হইয়া উঠে, এবং নিকটে যদি একটা তাড়িদ্দর্শক যন্ত্র (অথবা অন্য কোন তাড়িত বিশিষ্ট দ্রব্য) রাখা যায়, তবে উহা অবিলম্বে তড়িন্মুক্ত হইয়া পড়ে—যেন হস্ত দ্বারা বা একটা ধাতু দণ্ড দ্বারা তাড়িদ্দর্শক যন্ত্রটাকে স্পর্শ করা গিয়াছে।

রশ্মিগুলি খুব প্রখর হইলেই চারি পাশের বায়ু বেশ ভাল রকমের তাড়িত-পরিচালক হইয়া উঠে এবং তাড়িদ্দর্শক যন্ত্রটাও অবিলম্বে তাড়িত শূন্য হইয়া পড়ে; আর রশ্মিগুলি তেমন প্রখর না হইলে বায়ুর পরিচালন ক্ষমতাও অল্প হয়, তড়িদ্দর্শক যন্ত্রটার তাড়িতও ধীরে ধীরে লোপ পাইতে থাকে। এইরূপে বায়ুর তাড়িত পরিচালন ক্ষমতা মাপা চলে এবং এই পরিচালন ক্ষমতাটা মাপিয়া রঞ্জন-রশ্মির প্রখরতাও মাপা চলে।

শরীরস্থ স্নায়ুমণ্ডলীর উপর রঞ্জন-রশ্মির বিশেষ ক্রিয়া দেখা যায়। অধিক দিন রঞ্জন-রশ্মিতে আনাগোনা করিতে থাকিলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ফুলা ও বেদনা জন্মে, যা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহা দেখিয়া চিকিৎসকগণ এই রশ্মির সাহায্যে বিভিন্ন রোগের বীজাণু নাশের চেষ্টা পাইতেছেন। ক্যান্সার রোগে এখন রঞ্জন-রশ্মি ব্যবহৃত হইতেছে। চর্ম্ম-রোগেই রঞ্জন-রশ্মি বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা সর্ব্বদক্রহুতাশন; সর্ব্বজ্বর গজ সিংহ কিনা, তাহা এখনও বলা যায় না, তবে প্লীহা ও যকৃত্তের বিবৃদ্ধিতে ইহা প্রযুক্ত হইতেছে। লোম-নাশক সাবানের পরিবর্ত্তে রঞ্জন-রশ্মির ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত, তবে ডোজ হিসাব করিয়া চলিতে হইবে,—মাত্রাধিক্য হইলে বিনষ্ট ক্লেশের পুনরুদ্গম ঘটিবে না।

আমরা দেখিয়াছি, অস্বচ্ছ পদার্থকে ভেদ করিয়া যাওয়াই হইতেছে রঞ্জন-রশ্মির প্রধান গুণ। তবে ভিন্ন ভিন্ন ক্রুক্‌স্ নল হইতে যে সকল রশ্মি পাওয়া যায়, তাহাদের সকলের ক্ষমতা সমান নহে। ক্রুক্‌স্ নলে অতি সামান্য পরিমাণেই বায়ু থাকে, উহার চাপও সামান্য। বায়ু-নিষ্কাষণ যন্ত্র সাহায্যে নল-মধ্যস্থ বায়ুর পরিমাণ কমান বাড়ান যায়। এইরূপে বায়ুর চাপের ইতর বিশেষ ঘটাইলে রঞ্জন-রশ্মিরও প্রকার ভেদ ঘটিয়া থাকে। চাপের মাত্রা নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলে যে রশ্মিগুলি পাওয়া যায়, উহাদেরই ভেদ করিবার ক্ষমতা অসাধারণ। উহাদিগকে বলা যায়, 'তীক্ষ' রশ্মি। আর বায়ুর পরিমাণ খুব না কমাইলে যে রশ্মিগুলি পাওয়া যায়,উহারা তত প্রখর নহে। উহারা হইতেছে 'কোমল' রশ্মি।

আবার একই জাতীয় রশ্মির পক্ষে সকল পদার্থ সমান পরিমাণে স্বচ্ছ নহে। পুরু কাগজ, পুরু কাঠ৭ সকল রশ্মির পক্ষেই বেশ স্বচ্ছ, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। কাঁচ স্বচ্ছ হইলেও অত স্বচ্ছ নহে। খাঁটি হীরক স্বচ্ছ, নকল হীরক অস্বচ্ছ। এইরূপে রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে খাঁটি ও নকল হীরক চিনিতে পারা যায়। মোটা ধাতুর পাত অস্বচ্ছ কিন্তু সকল ধাতুরই খুব সূক্ষ্ম পাত বেশ স্বচ্ছ। রঞ্জন দেখিয়াছিলেন যে, পদার্থ যত হাল্‌কা, উহা সেই অনুপাতে স্বচ্ছ। লিথিয়ম, এলুমিনিয়ম ইহারা খুব হালকা ধাতু, ইহারা বেশ স্বচ্ছ। সীসক, ইউরেনিয়ম ইহারা খুব গুরু ধাতু, ইহারা খুবই অস্বচ্ছ।

কিন্তু কোন দ্রব্যই কোন রশ্মির পক্ষে পূর্ণ মাত্রায় স্বচ্ছ নহে। স্বচ্ছ কাঁচখণ্ডও খানিকটা আলো শোষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ধাতু বা অধাতু সমস্ত দ্রব্যই অল্পাধিক পরিমাণে রঞ্জন-রশ্মি শোষণ করিয়া থাকে।

একখানা প্লেটের উপর খানিকটা রঞ্জন-রশ্মি ফেলিলে উহার কতকটা মাত্র প্লেটখানা ভেদ করিয়া বাহির হইতে পারে, বাকী অংশটা প্লেটখানা শুষিয়া লয়। রঞ্জন-রশ্মির একটা নির্দ্দিষ্ট ভগ্নাংশ (প্রায় ½ অংশ) শোষণ করিতে হইলে, যে প্লেটখানা যত পাতলা হইলে চলে, তাহা দ্বারা ঐ প্লেটের শোষণ-ক্ষমতা মাপিবার প্রণালী প্রচলিত আছে। এইরূপে বিভিন্ন দ্রব্যের শোষণ-ক্ষমতা তুলনা করা যায়। তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অধ্যাপক রঞ্জনের সিদ্ধান্ত মোটের উপর ঠিক। যাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী তাহার শোষণ-ক্ষমতাও সেই অনুপাতে বেশী হইয়া থাকে। এ কথা কেবল 'তীক্ষ্ণ' রশ্মিগুলি সম্বন্ধেই খাটে।

রঞ্জন-রশ্মির প্রধান ধর্ম্মগুলির উল্লেখ করা গেল, এখন ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতে পারে।

আমরা দেখিয়াছি, রঞ্জন-রশ্মির আবিষ্কার ঘটে ক্যাথোড্ রশ্মির পরীক্ষা ব্যাপারে, আর রশ্মিগুলি উৎপন্ন হয়, ক্রুক্‌স্ নলের স্থান বিশেষ হইতে। কাজেই প্রথমে ক্রুক্‌স্ নল ও ক্যাথোড্ রশ্মি সম্বন্ধে ২।৪টা কথা জানিবার দরকার হয়।

ক্রুক্‌স্ নলে বিশেষ কোন জটিলতা নাই—একটা ফাঁপা কাঁচের নল, ভিতরটা প্রায় বায়ুশূন্য এবং উহার দুই দিকে, কিঞ্চিৎ দূরে দূরে দুইটা সূঁচ বসান। সূঁচ দুটার ছিদ্র মুখ থাকে বাহিরে, অপর প্রান্ত থাকে নলের ভিতরে। সকল নলের একরকম চেহারা থাকে না; বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন আকৃতির নল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোনটা বেশ লম্বা, কোনটা মোটা, কোনটা বা খুব আঁকাবাঁকা চেহারার হইয়া থাকে। সূঁচ দুটাও নানা আকারের থাকে। লোহার সূঁচ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না, প্লাটিনাম বা এলুমিনিয়মের সূঁচই অধিকতর উপযোগী। কখন কখন সূঁচের যে প্রান্তটা নলের মধ্যে থাকে, ঐ প্রান্তে এলুমিনিয়মের একটা ছোট বাটী বসাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু মোটামুটি ব্যবস্থা সকল নলেই এক প্রকার। এইরূপ একটা ক্রুক্‌স্ নল লইয়াই রঞ্জন সাহেব পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এই ক্রুক্‌স্ নলের মধ্যে তাড়িত প্রবাহ সঞ্চালিত করিলেই ক্যাথোড-রশ্মি উৎপন্ন হইয়া থাকে। নলের সূঁচ দুটাকে তামার তার দ্বারা তাড়িতোৎপাদক যন্ত্রের দুই প্রান্তে সংযুক্ত করিয়া দিতে হয়। তাহাতেই নলের ভিতর প্রবাহ উৎপন্ন হয়। যে সূঁচটা তাড়িতোৎপাদক যন্ত্রের ধনপ্রান্তে সংযুক্ত থাকে, উহাকে বলা যায়, ধন সূচি বা অ্যানোড্, আর যে সূঁচটা উহার ঋণ-প্রান্তে সংযুক্ত থাকে, তাহাকে বলা যায় ঋণ-সূচি বা ক্যাথোড্। প্রবাহ জন্মে উভয় তাড়িতেরই; ধনের প্রবাহ ঘটে অ্যানোড্ হইতে ক্যাথোডে, আর ঋণের প্রবাহ ঘটে তাহার উল্টা দিকে—ক্যাথোড্ হইতে অ্যানোডে।*

ধনেরই হোক বা ঋণেরই হোক, প্রবা-

* এখানে বিজ্ঞানের ভাষা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনসহ। প্রবাহ দুইটা না বলিয়া একটা বলিলেও চলে। ধনদান ও ঋণ মোচন একই ব্যাপার। বলা চলে, দুইটা প্রবাহই ধন তাড়িতের এবং দুইটাই অ্যানোড্ হইতে ক্যাথোডে, অথবা বলা চলে, দুইটা প্রবাহই ঋণ তাড়িতের, দুইটাই ক্যাথোড্ হইতে অ্যানোডে। হয় ত ধনই আসল জিনিষ, ঋণটা ধনের অভাব মাত্র; অথবা হয় ত ঋণ চাই খাটি, ঋণের অভাবই ধন। আধুনিক বিজ্ঞান ঋণেরই প্রাধান্য দিতেছেন, তবে ধনটাকে যে বাহুল্য জ্ঞানে সহজেই বর্জ্জন করা যাইবে, তাহারও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

হটা জন্মে যখন নলের ভিতরকার বায়ুর পরিমাণ খুব কমাইয়া ফেলা যায়। তখন ঐ সূঁচ দুটার মাঝখানে—বিদ্যুৎ প্রবাহ পথে—একটা আলোক রশ্মি দেখা যায়। বায়ুর পরিমাণ ক্রমে কমাইতে থাকিলে এই রশ্মিটা স্তম্ভাকার ধারণ করে এবং স্তরে স্তরে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তার পর দেখা যায়, আলোক-স্তম্ভটা ক্যাথোড্ সূচি হইতে ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতেছে, আর ক্যাথোডের সম্মুখে একটা অন্ধকারময় স্থান ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। বায়ুর পরিমাণ খুবই কমাইলে এই অন্ধকার রাজ্যটা শেষে সম্মুখস্থ কাঁচের আবরণটাকে স্পর্শ করে। তখন কাঁচ-নলের ঐ অংশটা বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। অন্ধকার হইতে আলোকের উৎপত্তি, আশ্চর্য্য কথা বটে! আমরা জানি, আলোক-রশ্মি-সম্পাতেই যাবতীয় পদার্থ আলোকিত হইয়া থাকে, কিন্তু ক্রুক্স্ নলের এই অন্ধকারময় প্রদেশে এমন কোন্ রশ্মি রহিয়াছে, যাহার প্রভাবে সম্মুখস্থ কাঁচের দেওয়ালটা এরূপ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে? ক্রুক্স্ ইহার নাম দিলেন, অন্ধকার-রশ্মি। ক্রুক্সের এই অন্ধকার-রশ্মি সম্পাতেই কাঁচের নলটা আলোকিত হয়। এই রশ্মিগুলি ক্যাথোড্ সূচির ঠিক সম্মুখেই উৎপন্ন হইয়া থাকে; এজন্য উহারা এখন ক্যাথোড্-রশ্মি নামেই বিশেষ ভাবে পরিচিত।

ক্যাথোড্-রশ্মির কতগুলি বিশিষ্ট ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা:—(১) ইহারা আলোক রশ্মির ন্যায় সোজা পথে চলে। (২) চুণ, হীরক প্রভৃতি কতগুলি দ্রব্য এই রশ্মি পথে থাকিলে উহারা ক্রুক্স্ নলের কাঁচের আবরণের মত অথবা তদপেক্ষা অধিকতর জ্যোতিষ্মান্ হয়। (৩) ক্রুক্স্ নলের উজ্জ্বল অংশটাকে বেশ উত্তপ্ত হইতেও দেখা যায়। রশ্মি পথে একটা ধাতুদ্রব্য রাখিলে উহা এত উত্তপ্ত হয় যে, কখনও কখনও উহা গলিয়া যায়। (৪) নলের ভিতর একটা ছোট লাইন বসাইয়া উহার উপর একখানা ছোট গাড়ী রাখিয়া দিলে গাড়ীখানা রশ্মিপথে ছুটিয়া চলে, যেন রশ্মি মুখে গুলি বর্ষণ হইতেছে। (৫) নলের অন্ধকারময় দেশে একখানা এলুমিনিয়মের চাকৃতি বা অন্য কোন ধাতুদ্রব্য রাখিলে সম্মুখস্থ কাঁচের দেওয়ালে উহার একটা কালো ছায়া পড়ে। ইহাতে বুঝা যায়, ক্যাথোড্ রশ্মি সরল পথে চলে, এবং ধাতুগুলি এই রশ্মির পক্ষে অস্বচ্ছ। (৬) ক্রুক্স্ নলের নিকটে একখানা চুম্বক আনিলে নলের উজ্জ্বল অংশটা এক পাশে সরিয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায়, চুম্বকের প্রভাবে ক্যাথোড্-রশ্মি বাঁকিয়া যায়—তাড়িতপ্রবাহযুক্ত একটা তামার তার যেরূপ বাঁকায়, ঠিক সেইরূপ বাঁকিয়া যায়।

এই সকল পরীক্ষা হইতে ক্রুক্স্-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করিলেন, ক্যাথোড রশ্মি এক প্রকার কণার প্রবাহমাত্র। এই কণাগুলি জড়কণা, কিন্তু ইহারা ঋণ-তাড়িত বিশিষ্ট ও অত্যন্ত সূক্ষ্ম। ইহারা অণু হইতে সূক্ষ্ম, পরমাণু হইতেও সূক্ষ্ম। এই অতি ক্ষুদ্র তাড়িত কণাগুলিই বর্ত্তমান কালে ইলেকট্রন নামে পরিচিত।

ইলেকট্রনের সহিত প্রথম পরিচয় ক্রুক্স্ নলের মধ্যে এবং ইহাদের উৎপত্তি তাড়িত শক্তি প্রভাবে; কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, ইহারা সর্ব্ব ঘটে বিরাজমান। বর্ত্তমান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক স্যর জে, জে, টম্সন্ অনুমান করেন, জড় মাত্রেরই একটা মূল উপাদান হইতেছে, এই ইলেকট্রন্। ইহাদের বেগ

অতি ভীষণ—প্রায় আলোকের বেগের সমান। ক্রুকস্ নলের ক্যাথোড্ প্রান্ত হইতে সহস্র সহস্র ইলেক্‌ট্রন্ ভীম বেগে ছুটিতে থাকে। ইলেক্‌ট্রনের এই ভীষণ স্রোতই ক্যাথোড্ রশ্মি।

রঞ্জন-রশ্মির উৎপত্তি এই ক্যাথোড্-রশ্মি বা ইলেক্‌ট্রন প্রবাহ হইতে। কাঁচ-নলের যে স্থলে ক্যাথোড্-রশ্মি পতিত হয়, উহাই রঞ্জন-রশ্মির উৎপত্তি স্থান। ঐ স্থানটা যে বেশ উজ্জ্বল হয় ও তপ্ত হয়, ক্রুকস্-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ তাহা দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ স্থান হইতে যে একটা নূতন রকমের রশ্মি নির্গত হইয়া থাকে, যাহা কাঠ, কাগজ, রক্ত, মাংস অক্লেশে ভেদ করিয়া যাইতে পারে, ইহা আবিষ্কার করিলেন রঞ্জন। ক্রমে দেখা গেল, যখনই ক্যাথোড্ রশ্মি কোন কঠিন পদার্থে বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ স্থান হইতে রঞ্জন-রশ্মি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্যাথোড্ রশ্মির আবিষ্কার অনেক পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল এবং সুরু হইতেই এই রশ্মিগুলি কাঁচের দেওয়ালে বাধা পাইয়া আসিতেছিল, কিন্তু রঞ্জন-রশ্মির আবিষ্কার ঘটিল বহুদিন পরে।

বর্ত্তমান কালে রঞ্জন-রশ্মি উৎপাদন জন্য কাঁচের নলের পরিবর্ত্তে ফাঁপা কাঁচের গোলক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গোলকের ভিতরটা থাকে প্রায় বায়ুশূন্য। ক্যাথোড্ সূচির আকৃতিটা থাকে একটা ছোট বাটির মত। ফলে ক্যাথোড্-রশ্মিগুলি, গোলকের মাঝখানে, বাটিটার ঠিক কেন্দ্রস্থলে আসিয়া মিলিত হয়। ঐ স্থানে প্লাটিনাম ধাতুর একখানা ছোট প্লেট থাকে। এই প্লেটের উপর ইলেক্‌ট্রন্‌গুলি দলবদ্ধ হইয়া ধাক্কা দিতে থাকে এবং এইখানেই রঞ্জন-রশ্মির উৎপত্তি ঘটে। রশ্মিগুলি প্লাটিনাম প্লেটের সামনের দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং কাঁচের গোলকের যে অর্দ্ধাংশ উহার সম্মুখে থাকে, উহা হেম কিরণে রঞ্জিত হইয়া উঠে। এই স্ফাটিক চন্দ্রটীর নিষ্কলঙ্ক চেহারাই অদৃশ্য রঞ্জন-রশ্মির অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে।

ক্যাথোড্-রশ্মি বাধা প্রাপ্ত হইলেই রঞ্জন-রশ্মি উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু কেন হয়, কি ভাবে হয়, তাহারও মীমাংসার আবশ্যক। রঞ্জন-রশ্মি আসলে জিনিষটা কি? ইলেক্‌ট্রনের ধাক্কা হইতে যাহার উৎপত্তি, উহা কোন্ জাতীয় রশ্মি? উহা ক্যাথোড্-রশ্মি নহে, কেন না ক্যাথোড্-রশ্মির অত ভেদ করিবার ক্ষমতা নাই, আর ক্যাথোড্-রশ্মির মত উহার উপর চুম্বকের প্রভাব নাই। উহা আলোক রশ্মিও নহে, কেন না উহা অদৃশ্য। সাধারণ আলোক রশ্মি অত তীক্ষ্ণ নহে, আর আলোকের যেগুলি বিশেষ ধর্ম্ম—প্রতিফলন, তির্য্যকবর্ত্তন, সমতলীভবন—ইহার কোনটাই রঞ্জন রশ্মিতে পরিস্ফুট নহে। উহা ক্যাথোড্ রশ্মিও নহে, আলোক রশ্মিও নহে, -ধারাবাহিক কণাপ্রবাহও নহে, ধারাবাহিক তরঙ্গপ্রবাহও নহে, তবে উহা কি?

এ পর্য্যন্ত যত প্রকার রশ্মি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সকলকেই হয় কণাবাদের অথবা তরঙ্গবাদের অন্তর্গত করা চলে। রঞ্জন-রশ্মিকেও ইহার একটার ভিতর না ফেলিতে পারিলে বৈজ্ঞানিকের স্বস্তিলাভ ঘটে না।

অধ্যাপক ষ্টোক্‌স্ একটা মতবাদ প্রচার করিলেন। ষ্টোক্‌স্ বলিলেন, কণাবাদে চলিবে না, খাঁটি তরঙ্গবাদেও সুবিধা হইবে না—একটা বিশিষ্ট তরঙ্গবাদের আবশ্যক। ইলেক্‌ট্রনের ধাক্কায় যাহা উৎপন্ন হয়, যাহাকে রঞ্জন-রশ্মি বলা যায়, তাহা কণা জাতীয়

নহে—তরঙ্গ জাতীয়। কিন্তু উহারা ঠিক আলোক তরঙ্গ নহে, আলোক তরঙ্গের তুলনায় ক্ষুদ্র। আরও পার্থক্য এই যে, আলোক তরঙ্গের ন্যায় উহারা একটীর পর একটী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলে না, উহারা খাপছাড়া তরঙ্গ। এই জন্যই আলোক তরঙ্গের প্রধান ধর্ম্মগুলি রঞ্জন-রশ্মিতে তত প্রকট নহে।

ষ্টোক্‌স্ সাহেব এই মত প্রচার করিলেন, স্যর জে,জে, টম্‌সন্ যুক্তি দ্বারা এই মত প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কি রূপেই বা ইলেক্‌ট্রনের ধাক্কা হইতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎপন্ন হইতে পারে, কেনই বা এই খাপছাড়া তরঙ্গগুলি এত শক্তির আধার হয়, এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অধ্যাপক টম্‌সনের অন্যতম কীর্ত্তি। এ সকল কথা বারান্তরে আলোচনা করা যাইতে পারে। এখানে ইহাই বক্তব্য যে, রঞ্জন-রশ্মির মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তের জন্য আমাদিগকে এখনও অপেক্ষা করিতে হইবে। আর ততদিন পর্য্যন্ত যদি এই অদ্ভুত চরিত্র রশ্মি, উহার আবিষ্কারক প্রদত্ত ডাক-নামে—রঞ্জন লেবরেটরির সূতিকাগারে প্রাপ্ত X' Ray নামে—অভিহিত হইতে থাকে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বিজয়ের বিজয়-স্তম্ভ। (শেষ)

আরও শুনিয়াছি, গোস্বামী মহাশয় যখন আমাদের দেশে থাকিয়া নির্জ্জনে সাধন ভজন করিতেন, সেই সময় নাকি স্বপ্নযোগে একটী অপূর্ব্ব ঘটনা দর্শন করিয়াছিলেন। স্বপ্নবিবরণ এইরূপ ;—"আমি যেন একটী ভীষণ অরণ্য মধ্যে বাস করিতেছি, তাহা ঘোর অন্ধকারে ও নানাবিধ হিংস্র জন্তুগণের বিকট চীৎকারে পরিপূর্ণ। আমার সাথের সাথীও কেহই নাই। সে অরণ্য হইতে বাহির হইবারও কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না, যতই চলিয়া যাইতেছি, পথহারা হইয়া কেবলই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি এবং কণ্টকাঘাতে সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত হইতেছে। শ্বাপদগণ যেন প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, আমি একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া দিশাহারা ও ভয়ে ভীত হইয়াছি। এমন সময় উপর দিকে একটী অপূর্ব্ব আলোক দেখিতে পাইলাম। রাস্তার পার্শ্বে ও দোকানের সাইনবোর্ডের কোণে যেমন একখানা হাত আঁকা থাকে, সেই আলোকের ভিতরেও সেইরূপ একখানা হাতের মত অঙ্কিত দেখিতে পাইলাম। সেই হাতের তর্জ্জনী আঙ্গুলটী যেন আমাকে যাইবার জন্য সঙ্কেতে একটা দিক্ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে ; আমিও সেই সঙ্কেত অনুসারে অঙ্গুলি যে দিক্ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে, সেই দিকে চলিতে লাগিলাম। হাতখানি আমার মাথার উপরে উপরে থাকিয়া আমার অগ্রে অগ্রে যেদিকে চলিল, আমিও ঐ হাতের সাহায্যে চলিতে চলিতে অনায়াসে ও অল্প সময়ের মধ্যে অরণ্য পথ অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিলাম। অরণ্যের বাহিরে আসিয়া সম্মুখে প্রকাণ্ড তরঙ্গাকুল এক নদী দেখিতে পাইলাম, আমি সভয়ে নদী তীরে দাঁড়াইলাম, কিন্তু আমার

পথপ্রদর্শক হস্তখানি না থামিয়া সেই ভাবে আমার মাথার উপর থাকিয়া নদীর উপর দিয়া চলিল. ইহা দেখিয়া আমিও সাহসের সহিত নদীতে অবতরণ করিলাম। প্রকাণ্ড নদী, অগাধ জল, প্রবল স্রোত, ভীষণ তরঙ্গ; কিন্তু কিছুতেই আমার কিছু করিতে পারিল না, আমারও কোন ভয় হইল না; আমি আমার রক্ষাকর্ত্তা হাতখানির পশ্চাতে পশ্চাতে হাঁটিয়া নদী পার হইয়া গেলাম। সেই দিন হইতে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমাকে এই অপার্থিব হস্তের ইঙ্গিত অনুসারে চলিতে হইবে। মানুষের মতে আর চলিতে হইবে না।”

তাহার অনেক দিন পরে যখন কেশব বাবুর কন্যার সহিত কোচবেহার মহারাজের বিবাহ লইয়া কলিকাতায় মহা গোলযোগ আরম্ভ হয়, এবং নানা স্থানে নানা প্রকার আপত্তিও উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং তাহা আমার বলিবার বিষয় নহে। সেই আন্দোলনের সময় বিজয় বাবু ও মাজিলপুরের শ্রদ্ধেয় কালীনাথ দত্ত মহাশয় আমাদের গ্রামে থাকিয়া সাধন ভজনাদি করিবেন বলিয়া গমন করেন। এই স্থানে থাকিয়া নানা স্থানের নানা আপত্তি দেখিয়া ও শুনিয়া বিজয় বাবুও কেশব বাবুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন ও তাঁহাদের দল হইতে বিদায় গ্রহণ করেন এবং এই আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁহাকে এই বিবাহের প্রতিবাদী হইতে দেখিয়া তাঁহার একজন ব্রাহ্ম-বন্ধু কলিকাতা হইতে তাঁহার স্ত্রী যোগমায়া দেবীকে বাগআঁচড়ার ঠিকানায় এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছিলেন :—“আপনি গোস্বামী মহাশয়কে বুঝাইয়া বলিবেন, তিনি যেন কেশব বাবুর বিপক্ষে কিছু না লেখেন, অথবা তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন না করেন। এরূপ করিলে আপনারা নিরুপায় হইয়া পড়িবেন।” গোস্বামী মহাশয় এই পত্রখানি পাঠ করিয়াই হাসিয়া বলিলেন, “ইঁহারা কি পাগল হইয়াছেন? কেশব বাবু কি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা না পালনকর্ত্তা? আমি কি তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি? যে সত্যের আলো দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি, সেই সত্যের অবমাননা আমি কখনও সহ্য করিতে পারিব না।” (অন্তরের কি তেজ!)

কোচবেহারের বিবাহ ও তদুপলক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা লইয়া যে বিবাদ ও মহা আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন আমি (লেখক) মহলানবিশ মহাশয়ের ডাক্তারখানায় কার্য্য করিতাম। সেই সময়ে এই বিবাহ ও মন্দির লইয়া নানা স্থান হইতে নানা আপত্তি কলিকাতায় আসিতে লাগিল, কলিকাতায়ও ব্রাহ্মসমাজ লইয়া ব্রাহ্মগণের মধ্যে মহা বিপ্লব উপস্থিত। বিপক্ষ দল স্বতন্ত্র আর একটী নূতন ব্রহ্ম মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য মহা উৎসাহের সহিত তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উদ্যোগকারগণ এই ব্যাপার লইয়া সভা সমিতি, বাদানুবাদ ও লিখালিখি আরম্ভ করিলেন। মহলানবিশ মহাশয়ের ১৪নং কলেজ স্কোয়ার বাটীর দ্বিতল গৃহে দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মহলানবিশ মহাশয় ও অন্যান্য অনেক ব্রাহ্ম মিলিত হইয়া পরামর্শ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেন। আমার যতদূর মনে হয়, মাঘোৎসবের পরে তাঁহাদের সকলের পরামর্শে গোস্বামী মহাশয়কে বাগআঁচড়া হইতে কলিকাতায় আনা স্থির সিদ্ধান্ত হয়। তাহার পর

মহলানবিশ মহাশয় একখানি পত্রসহ তাঁহাকে আনিবার জন্য আমাকে বাগআঁচড়ায় পাঠাইয়া দেন; আমি তথায় যাইয়া উক্ত পত্রখানি দেখাই, ও গোস্বামী মহাশয় এবং কাশীনাথ দত্ত মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। তাহার কিছুদিন পরেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে এক নূতন ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত হইল। গোস্বামী মহাশয়ও তথা হইতে আসিয়া ইঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন; এবং জ্বলন্ত উৎসাহ ও মহা তেজের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় হইতে গোস্বামী মহাশয় ক্রমে বাগআঁচড়ায় বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং দেশে ম্যালেরিয়াও প্রবল আকারে প্রবেশ করিতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয় স্থান পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু আমাদের পরিত্যাগ করেন নাই। আমাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও ভালবাসা অক্ষুণ্ণ রহিল। আমাদের কল্যাণ কামনা তাঁহার অন্তর হইতে কখনও অন্তর্হিত হয় নাই। যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কার্য্য করিতেন, তখনও মধ্যে মধ্যে আমাদের ওখানে যাইতেন। আমাদের সঙ্গে যখন তাঁহার দেখা হইত, স্নেহে ও মধুর ভাষায় আলাপ করিতেন এবং কত উপদেশ দিতেন, যাহাতে প্রাণে নব বলের সঞ্চার হইত। আমাদের কোন দুঃখ কি অভাবের কথা শুনিলে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইত ও চোক দিয়া জল পড়িত; তাহা মোচন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। একে একে আমাদের গ্রামের সকলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন। এমন ব্যথার ব্যথী আমাদের জীবনে দেখি নাই, এ জীবনে আর পাইবও না, পাইবারও সম্ভব নাই!

আমার বাল্যজীবনে দেখিয়াছি যে, ধর্ম্মপরায়ণ ভক্ত, উদারচেতা ও সাধু মহাত্মার উন্নত ও পবিত্র ধর্ম্মজীবনের সংস্পর্শে ও আদর্শে পিতা, মাতা ও প্রতিবেশী গুরুজনগণ ধর্ম্মজীবনের উৎকর্ষতা ও পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন এবং সাংসারিক জীবনকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অসত্যের ভয়ে আদালতে যাইতেও ভয় পাইতেন। গ্রামস্থ লোকদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ, কি বৈষয়িক কাজে কোন প্রকার অসত্য ব্যবহার করিতে নিরস্ত থাকিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন; ক্রয় বিক্রয়স্থলে ক্রেতা বিক্রেতায় জিনিষের মূল্য লইয়া দর দস্তুর করিতে ভালবাসিতেন না। কেহ কোন জিনিষ ক্রয় করিতে আসিলে সরলভাবে তাহার যাহা উচিত মূল্য তাহাই চাহিতেন। বলিতেন, তোমার যদি লইতে ইচ্ছা থাকে, লইতে পার না হয় লইও না, আমরা দর করিয়া বেচিব না। তাঁহারা বেশী বিদ্বান ছিলেন না, সামান্য রকম বাঙ্গালা লেখা পড়া জানিতেন মাত্র। অবস্থাও তত ভাল ছিল না, সামান্য ব্যবসায় দ্বারা ও শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া কোন প্রকারে কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। এই দুরবস্থার ভিতরে থাকিয়াও সাধু সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে তাঁহাদের মনের কুসংস্কার, পাপ মলিনতা ও পৌত্তলিকতা যে বিনষ্ট হইয়াছিল, সে কেবল বিশ্বাসী, ধর্ম্মবীর, সাধু গোস্বামী মহাশয়ের জীবন্ত উপাসনা ও ধর্ম্ম উপদেশ, এবং ধর্ম্মপ্রাণতা ও পরদুঃখ মোচনের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে। যেমন অগ্নির সংস্পর্শে সমস্ত পুতিগন্ধ বিনষ্ট হয়, ইহাও যেন আমাদের পক্ষে তদ্রূপ হইয়াছিল।

আবার আমার এই বৃদ্ধ বয়সে আমাদের ও দেশের দুরবস্থা ও দুর্গতি যাহা হইয়াছে,

ও হইতে দেখিতেছি, তাহা লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে ও চক্ষে জল আসিতেছে, এবং গোস্বামী মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ-পথে উদিত হইতেছে। যে সময়ে গোস্বামী মহাশয় সপরিবারে আমাদের গ্রামে ছিলেন, সেই সময়ে আমাদের ভাবী মঙ্গলের জন্য গুরুজনদিগের নিকট সর্ব্বদা বলিতেন, তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়া বাস কর; নতুবা তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতি সাধিত হইবে না। তাহার কারণ একস্থানে বহু পুরুষ বহুদিন বাস করিতে নাই, ও করাও উচিত বলিয়া মনে করি না, এবং করিলেও তাহাদের উন্নতি হয় না বরং অবনতিই হয়। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, আমার যেন মনে হইতেছে ৫০ বৎসরের মধ্যেই হউক বা উহার কিছু পরেই হউক, এই স্থান জনশূন্য শ্মশান ক্ষেত্রে পরিণত হইবে। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে যাঁহারা আমাদের গ্রামের অবস্থা দেখিয়াছিলেন, এখনকার অবস্থা দেখিলেই তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের কথার সত্যতা সহজে প্রতীতি করিতে পারিবেন।

আমি সত্যের অনুরোধে ও কর্ত্তব্য বোধে ভগ্ন হৃদয়ে সজল নয়নে কিঞ্চিৎ লিখিতে বাধ্য হইলাম। মহাত্মা শ্রীচৈতন্যের অন্তর্দ্ধানে তাঁহার বিশুদ্ধ ভক্তিময় ধর্ম্ম যেরূপ অধিকাংশ নিরক্ষর মূর্খ লোকের হাতে পড়িয়া কলঙ্কিত হইয়াছে, গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও পক্ষে ঠিক যেন তাহাই ঘটিয়াছে। আরও যেন মনে হইতেছে, ভক্তের গৌরব ও ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণিত করিতে দুর্দ্দান্ত ম্যালেরিয়া ভীষণ মূর্ত্তিতে করাল বদন বিস্তার করিয়া আপনার আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক সকলকে গ্রাস করিয়াছে ও করিতেছে।

আমরা এমন পবিত্র ও উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম পাইয়াও নিজেদের অজ্ঞতায় তাহা কলঙ্কিত করিয়াছি। যাঁহার জীবন্ত ধর্ম্মভাব ও জ্বলন্ত অগ্নিময় উপদেশে আমাদের হৃদয়ের পাপ ও ব্যভিচার-রূপ পূতিগন্ধ বিনষ্ট হইয়া পবিত্রতার সুবাস আনিয়াছিল; সেই সাধু, পবিত্রাত্মা গোস্বামী মহাশয়ের প্রচার কার্য্য পরিত্যাগ ও দেহ অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই এক দিকে যেমন আমাদের পতন আরম্ভ হইল, অপর দিকে তেমনি ম্যালেরিয়ায় দেশ উৎসন্ন হইতে লাগিল। আরও গভীর পরিতাপ, লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, বিজয়বাবুর তিরোভাবের পরই আমাদের গ্রামস্থ কয়েক জন এই ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া বিষয় বাসনা চরিতার্থ ও নিজেদের স্বার্থ সাধনের জন্য ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও পবিত্র ভাব বিস্মৃত হইয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অধীন হইয়া নানা প্রকার কপটতা ও অসত্য প্রভৃতি যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই অবলম্বন পূর্ব্বক পবিত্র ব্রাহ্মসমাজকে কলুষিত ও ধর্ম্মজীবনে উন্নতির পথ কণ্টকিত এবং অত্রস্থ ব্রাহ্মসমাজকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। মেদিনী পাপ ভার আর বহিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে এ জগত হইতে সরাইয়া দিয়াছেন। সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাগণ! আমাকে ক্ষমা করিবেন, বলিতে লজ্জা ও ক্ষোভে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তাঁহাদের অন্যায় ব্যবহারে ও কার্য্যদোষে আমাদিগকেও বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের নিকট সর্ব্বদা কুণ্ঠিত ও লজ্জিত ভাবে মস্তক অবনত করিয়া থাকিতে হইতেছে; অধিক কি বলিব, বাগআঁচড়ার নাম শুনিলেই বর্ত্তমান ব্রাহ্মভ্রাতাগণের মধ্যে অনেকেই শিহরিয়া উঠেন ও ঘৃণায় কপাল কুঞ্চিত ও অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া

থাকেন। কিন্তু ঘোর দুঃখ ও বিষাদের মধ্যেও ভগবানের দয়া ও মঙ্গল হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়; সর্ব্বসন্তাপহারিণী, পাপতাপ-বিনাশকারিণী জগজ্জননী তাঁহাদিগকে তাঁহার শান্তি ক্রোড়ে চির আশ্রয় দান করিয়াছেন। এখন প্রার্থনা এই, তিনি তাঁহাদের প্রাণে শান্তি প্রদান করুন।

আমার জীবনে পূজ্যপাদ গোস্বামীর বাণীবলী যাহা শুনিয়া ও দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে আমার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইতেছে। শাস্ত্রে কথিত আছে, পূর্ব্বতন ঋষিরা ও ব্রহ্মজ্ঞ ভক্ত সাধকগণ, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘটনা সকল নখ-দর্পণে দেখিতে ও অন্তরে জানিতে পারিতেন; আরও দেখুন,ভগবানের কৃপায় বধিরে শোনে, মূকে কথা কয়, খঞ্জ গিরি লঙ্ঘন করে, যদি এ কথা বিশ্বাস করিতে পারা যায়, তাহা হইলে পবিত্রাত্মা, সাধক ও ভগবদ্ভক্ত গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে এরূপ সম্ভব না হইবারই বা কারণ কি?

আমি আরও দেখিতেছি, আমাদের মধ্যে যাঁহারা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে আছেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় সুস্থ শরীরে থাকিয়া আর্থিক উন্নতি এবং জ্ঞানে ও ধর্ম্মে মানসিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহাও সেই ভক্তিভাজন ও আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী গোস্বামী মহাশয়ের উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর অন্যতম জীবন্ত নিদর্শন নহে কি? তাঁহার কথানুসারে হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, আমি অনেক বৎসর যাবৎ কলিকাতায় আছি এবং অন্যান্য অনেকেই আছেন; কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এত কাল ব্রাহ্মসমাজে ও পবিত্র উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের শীতল ছায়ায় আশ্রয় পাইয়াও আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের নিকট প্রাণের সরল ভালবাসাও পাইলাম না, ইহার কারণ যে কি, তাহা আমার সামান্য জ্ঞানের অতীত। তবে আমার দুঃখপূর্ণ সাংসারিক জীবনের অভিজ্ঞতায় এই মনে হয়,একমাত্র দরিদ্রতাই ইহার প্রধান কারণ।

এইখানেই আমার লেখা শেষ করিব। গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াও কিন্তু আমাদিগকেও পরিত্যাগ করেন নাই; তিনি নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া যখন কলিকাতায় আসিতেন, দেখা হইবামাত্র তন্ন তন্ন করিয়া প্রতিজনের মঙ্গলামঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেন। আমাদের ওখানে বাসকালীন প্রসন্ন জেলেকে পক্ষাঘাত অবস্থায় শুইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন; এত দীর্ঘকাল পরেও কিন্তু তাহার কথা ভুলেন নাই; তিনি কেবল আমাদের নহেন, সকলেরই গোঁসাই ছিলেন। তাঁহার কথা মনে হইলে এখনও লোকের চক্ষে জল আসে। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, এক দিনের জন্যও আমাদের মঙ্গল চিন্তা তাঁহার হৃদয় হইতে তিরোহিত হয় নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হরিদাস ঠাকুর। (২)

শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলে বাস কালে প্রতি বৎসর রথের পূর্ব্বে, নদীয়া হইতে সমস্ত ভক্তগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে পুরী গমন করিতেন। সেই সঙ্গে হরিদাসও তথায় গমন করেন। সমস্ত ভক্তগণ পুরীতে উপস্থিত হইলে শ্রীচৈতন্যদেব অন্যান্য সমস্ত ভক্তগণের সহিত মিলিত হইবার পর হরিদাসের সঙ্গে মিলিত হইতে তাঁহার নিকট আগমন করেন।—

"তবে প্রভু আইলা হরিদাসের মিলনে,
হরিদাস করে প্রেম নাম সংকীর্ত্তনে॥
প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবৎ হঞা
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে উঠাইঞা॥"

হরিদাস সমস্ত ভক্তগণের সঙ্গে প্রভুর সহিত মিলিত হইতে কাশীমিত্রের গৃহে গমন না করিয়া পৃষ্ঠ হইতেই রাস্তায় অতি দীনভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন—

"হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্ব তীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হইতে তুমি পরম পাবন॥"

তদনন্তর তাহাকে কাশীমিশ্রের বাড়ীর নিকটে একটী পুষ্পোদ্যানে লইয়া গিয়া বলিলেন "তুমি এই নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বদা জপ করিতে থাক। গোবিন্দ প্রতিরোজ তোমার জন্য প্রসাদ আনিয়া দিবে এবং আমিও প্রতিরোজ সমুদ্রে স্নান করিতে যাইবার সময় তোমাকে দেখিয়া যাইব। সেই পুষ্পোদ্যানই বর্ত্তমান সিদ্ধবকুল মঠ এবং কাশীমিশ্রের বাড়ীই বর্ত্তমান রাধাকান্ত মঠ বা মহাপ্রভুর গম্ভীরা লীলার স্থান।

উক্ত পুষ্পোদ্যানে কিছুকাল অবস্থিতির পর একদিন গোবিন্দ প্রসাদ লইয়া যাইয়া দেখিতে পাইলেন, হরিদাস শয়ন করিয়া আছেন এবং মৃদুস্বরে নামকীর্ত্তন করিতেছেন। গোবিন্দ বলিলেন, হরিদাস উঠ, এক্ষণে ভোজন কর।

হরিদাস। আজি আমি লঙ্ঘন করিব, কারণ আমার সংখ্যাকীর্ত্তন শেষ হয় নাই। যাহা হউক, তুমি মহাপ্রসাদ লইয়া আসিয়াছ—উহা উপেক্ষা করা মহাপাপ।

এই কথা বলিয়া তিনি অতি অল্পমাত্র প্রসাদ লইয়া প্রণাম পূর্ব্বক ভোজন করিলেন। গোবিন্দের নিকট বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পর দিবস মহাপ্রভু তাঁহার নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হরিদাস কেমন আছ?"

হরিদাস শ্রবণ করিয়া বলিলেন "প্রভু, শরীর অসুস্থ নাই, তবে আমার বুদ্ধি ও মন একটু অসুস্থ হইয়াছে বটে, কারণ সংখ্যানাম কীর্ত্তন পূর্ণ হয় নাই।

প্রভু কহিলেন, হরিদাস! তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ এবং সিদ্ধদেহ ধারণ করিয়াছ—এক্ষণে সংখ্যাকীর্ত্তন অল্প কর। তুমি নামের মহিমা প্রচার করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ

হরিদাসের সমাধিক্ষেত্রটী একবার দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। আমি তাঁহাকে আমার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, কিন্তু কি কারণে জানিনা, আমার তথায় অবস্থিতিকালে তাঁহার আগমন হয় নাই।

ধন্ত হরিদাস! তুমি জগতে যে ধর্ম্মের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছ, তাহা স্মরণ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইতেছি। আজ তোমার সমাধিক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া তোমার উদ্দেশে তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম জ্ঞাপন করিতেছি। শাস্ত্রে দেখিতে পাই—

"নমে ভক্তঃশ্চতুর্ব্বেকী, মদ্ভক্ত শ্বপচ প্রিয়"

ঋষি-প্রণীত এই শাস্ত্র জীবনে প্রতিফলিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল নীতি—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা
অমানিনা মান দেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ।

এই শ্লোকার্দ্ধের প্রত্যেক বাক্য তোমার জীবনে বর্ণে বর্ণে প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীরতিকান্ত মজুমদার।

শ্রদ্ধাশ্রু।

(বঙ্গবরেণ্য চট্টল-নেতা যাত্রামোহন সেন মহোদয়ের পরলোক গমনোপলক্ষে আহূত সভায় পঠিত।)

১

চট্টলামায়ের মোর স্নেহাঞ্চল হতে
খসে গেল উজ্জ্বল রতন,—
ভগ্ন মন্দিরের চূড়া, অস্ত অকস্মাৎ
মধ্যাহ্ন-তপন!
শূন্যজনীর বক্ষ—স্তব্ধ দশদিক্—
মাতৃ-যজ্ঞে নাই হোতৃরাজ,—
অন্ধ আঁখি অশ্রুজলে—তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
হানে মর্ম্মে বাজ!

২

দুর্ভাগ্য স্বদেশ মোর! বহ্নি চাপি' বুকে
কাঁদ আজি কাঁদ প্রাণ ভরে,—
কে হইবে অগ্রসর তোমারি সেবায়
জয়-ধ্বজা করে!
পীড়িতে অর্পিতে শান্তি—দীনে দিতে জ্ঞান—
মুক্ত কার হইবে ভাণ্ডার,—
উদার প্রশান্ত চিত্ত সাগরের প্রায়
কোথা হেন আর!

৩

হে শ্রদ্ধেয়! সহৃদয়! স্বদেশনায়ক!
ধৈর্য্যে বীর্য্যে মহাকর্ম্মবীর!
পুরুষকারের দীপ্ত জীবন্ত বিগ্রহ!
হে সৌম্য, সুধীর!
সুখে দুঃখে হিতাকাঙ্ক্ষী তোমারি মতন
সুদুর্লভ নির্ম্মম ধরায়,—
হের অন্তরের ব্যথা হে পিতৃসুহৃদ্!
ফুটে না ভাষায়!

৪

হে দুর্জ্জয়! জগতের মৃত্যু-অধিপতি!
শুনি মৃত্যু অমৃত-সোপান,—
সে অমৃত কর দান নবীন যাত্রীর
পূর্ণ করি প্রাণ!
তাঁর মন্ত্রে দাও দীক্ষা—মাতৃ অঙ্কে মোর
জ্ঞানী কর্ম্মী উঠুক্ জাগিয়া,—
তাঁহারি পদাঙ্ক স্মরি' অশ্রু জননীর
দিক্ মুছাইয়া!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

শাস্ত্রী বিয়োগে।

বিশ্বমাতা আবাহনে, পুলক-পূরিত প্রাণে,
'বন্দে মাতরম্' গানে বঙ্গ মুখরিত।
জলহারা মেঘপাশে, খণ্ড চন্দ্রকর ভাসে,
তরল শেফালী বাসে দিক আমোদিত।
ঝরা বকুলের গন্ধে, পাপিয়ার গীতিছন্দে,
শরতের বাহুবন্ধে শুভ আগমনী,
ঐ ঐ গায় নিশীথিনী।
শুভ্র জাহ্নবীর কূলে, কার ঐ চিতা জ্বলে,
কোমলকরুণ কণ্ঠে, কাঁদে পরিজন।
সে যে ছিল বঙ্গের ভূষণ!
ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, সরল, বিনয়ী, ধীর,
তেজস্বী, নির্ভীক, বাগ্মী, অকপট-চিত্ত,
ব্যথিত বিপন্নবন্ধু, করুণার সুধাসিন্ধু,
উপাসক উপাস্য যে ভাবুকের নিত্য,
ধরায় যে সাপভ্রষ্ট, ষড়ৈশ্বর্য্যে যে গরিষ্ট,
ব্রহ্ম-ঋষি ব্রহ্মনাম-সুধাপানে ভোর,
ছিঁড়ি শত বন্ধনের ডোর!
যাঁর
বাণী মৃত-সঞ্জীবনী, স্নেহসুধা প্রসবিনী,
প্লাবিত পতিত প্রাণে,—পতিতে তারিত,
প্রেমের আলোক রেখা, দেখাত জগতে মাখা,
প্রেমে সে বিশ্বাস ভক্তি প্রেমে সে বাঞ্ছিত,
সত্য অগোচর তিনি ঈপ্সায় ঈপ্সিত।

সেই প্রেম শিখাবারে, বুঝি, শতবর্ষ পরে,
এলে "নদীয়ার চাঁদ" লীলার নায়ক—
ধর্ম্মগুরু—হয়ে প্রচারক।
জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, জীবের করিলে ছেদ,
হে অদ্বৈত জ্ঞানগুরু বিশ্ববরণীয়,
অলৌকিক কর্ম্ম—করণীয়!
বঙ্গমাতা পাদপীঠে, মনীষিতা ফুটে উঠে,
বাণীর চরণে দিলে শত পুষ্পাঞ্জলি,
"মেজবৌ" প্রেমের পুতলী!
গেছ'—যাও অশরীরী, জ্যোতির্ম্ময় দেহধারী,
মরতের মহাযোগী—মহা আত্মত্যাগী,
হে নমস্য বিরাগী,
আত্মাজন্ম মৃত্যুহীন, পরিবর্ত্ত চিরদিন,
দেহাকাশে উদয়াস্ত ঘটে প্রতিক্ষণে
চক্র আবর্ত্তন বিবর্ত্তনে;
হৃদয়ের সিংহাসনে, কোটী তব ভক্তজনে,
মানবীয় মূর্ত্তি করি চির-প্রতিষ্ঠিত,
পূজিবে সতত।
পুনঃ হবে অভ্যুদয়, গাইব প্রেমের জয়,
বহিবে প্রেমের বন্যা পতিততারণে,
প্রেম' খুলে দেয় যে নয়নে।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়।

অনন্ত-প্রেম। (২)

আমি খ্রীষ্টান্, বন্ধু ব্রাহ্ম। কিন্তু ধর্ম্ম-রাজ্যের যে প্লাটফর্ম্মে আমরা পৌঁছিয়াছি, সেখানে ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান্ নাই। সে রাজ্য প্রেমের রাজ্য—সেখানে ক্ষুদ্রত্ব ও সঙ্কীর্ণত্বের দেয়ালগুলো ভেঙ্গে গেছে। সেখানে হৃদয় হৃদয়ে ডুবে অনন্তত্বের স্বাদ আছে। "God is love" খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের এই মহত্তত্ত্ব সেখানে অনুভূত হইতেছে। সান্তে অনন্তের প্রেম ফুটে উঠছে—সান্তে অনন্ত অবতার গ্রহণ করেছেন। যে সান্তে অনন্তের স্বাদ পায় নাই, সে অবতারবাদ বুঝিতে অক্ষম।

বন্ধুর ছোট ভাই গয়ায় কাজ করেন,

দুজনা মাইল খানেক পায়ে হেঁটে সেই গভীর রাত্রে তাঁর বাসায় পৌঁছিলাম। বেচারি ছেলে পিলে নিয়ে শুয়েছিলেন, উঠে দ্বার খুলে আমাদের ভিতরে নিলেন। কিন্তু পর্ব্ব শেষ হ'ল না। হাত মুখ ধোবার পর অনুরোধ হ'ল, চারটী খেতে হবে। তখন রাত্রি প্রায় দুটো। খিদেও ছিল না, আবার জ্বর গায়ে এসেছিলাম বলে মুখেও বড় একটা স্বাদ ছিল না। তবু "one loving heart sets another on fire"— পেটে ক্ষুধা হোক্ না হোক্, সেই সর্ব্বগ্রাসী প্রেমের খাতিরে সেই দুটো রাত্রে চারটী খেতে বসলাম। ভাত খেলেম কি অমৃত খেলেম, জানি না—প্রতি গ্রাসে সে পরিবারের প্রেম আস্বাদ করিলাম। ইহারই নাম সান্তে অনন্তের আস্বাদ—সান্ত মানুষে অনন্ত প্রেমের অনুভূতি।

রাত্রি অল্পই ছিল—ঘুম আর আসলো না—কথায় বার্ত্তায় কেটে গেল। প্রাতে প্রাতঃকৃত্য ও প্রাতরাশ সমাপন পূর্ব্বক দুই বন্ধু একখানা টমটমে চড়ে বুদ্ধগয়ায় যাত্রা করিলাম। আমি বুদ্ধগয়ার বর্ণনা করিতে বসি নাই। কাজেই এদিক উদিকের পাহাড় ও ফল্গু নদীর রজতনিভ আঁকা বাঁকা সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিব না। বুদ্ধ গয়ার সেই প্রকাণ্ড মন্দির ও ভূমি হইতে উৎখাত বৌদ্ধ-কীর্ত্তি সকলেরও বর্ণনা করিব না। যে নৈরঞ্জনা জলে স্নান পূর্ব্বক ও যে বোধিদ্রুম তলে উপবেশন পূর্ব্বক শাক্যসিংহ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, তাহারও কথা বলিব না। কেবল একটা কথা বলিব, শুনুন। শাক্য মুনি কপিলবস্তুর সিংহাসন, নবীনা নারী, নবজাত পুত্র ও নিদ্রিত পিতাকে ছাড়িয়া সন্ন্যাসীর বেশে বাহির হইয়াছিলেন, তাহা আপনারা জানেন। সে কাহিনী পড়িতে কাহার চক্ষে জল না আসে? তিনি ছয় বৎসর যাবৎ কঠিন তপস্যা করিলেন—শরীরকে কষ্ট দিলেন, কিন্তু নির্ব্বাণ লাভ হইল না। অবশেষে যেদিন সুজাতা নাম্নী এক ধনাঢ্যের মেয়ে পরম শ্রদ্ধায় তাঁহাকে সোণার থালে পরমান্ন দান করিলেন, আর তিনি নৈরঞ্জনায় স্নান করিয়া সেই অশ্বত্থ গাছের তলায় বসিয়া সেই পরমান্ন খাইতে বসিলেন। অমনি তাঁহাতে বোধি সম্বোধি প্রবেশ করিল, তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন।

বুদ্ধত্বের অর্থ জাগর্ত্তি। সেকালের ঋষিরা যজ্ঞার্থ অগ্নিকে উদ্বুদ্ধ করিতেন। এখনও উত্তর-ভারতে আগুন জ্বালাকে "আগ্ জাগান্" বলে। অতএব বুদ্ধত্বের অর্থ সুপ্তবৃত্তির জাগর্ত্তি। কঠিন তপস্যায় সে জাগর্ত্তি লাভ হইল না, কিন্তু একটী মেয়ের প্রদত্ত পায়স খেয়ে সে জাগর্ত্তি লাভ হইল! কি আশ্চর্য্য কথা! কিন্তু কথাটা সত্য। One loving heart sets another on fire. সেই সোণার থালে যে পরমান্ন ছিল, তাহার অন্য নাম সুজাতার প্রেম। শাক্য সিংহ সন্ন্যাসী হবার সময় সে জিনিষটাকে চেনেন নাই। ছয় বৎসর কঠিন তপস্যার সময় সে জিনিষটার দর্শন পান নাই। এখন সেই জিনিষটা দেখে তাঁর প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইল—তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন—সান্তে অনন্তের দর্শন পাইলেন—সত্য সত্যই One loving heart sets another on fire. সুজাতাকে মানুষ ভুলে গেছে। কিন্তু ঐ যুবতীর প্রেম বুদ্ধে অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক ভারতে বুদ্ধবতারের অপূর্ব্ব লীলা দেখাইয়া গিয়াছে! সান্তে অনন্তের লীলা।

বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু ইহার রহস্য বুঝিতে পারি নাই। এবার বুদ্ধগয়ায় গিয়া সে রহস্য বুঝিলাম। আমি পণ্ডিত নই—সাধক নই,—তত্ত্বদর্শী নই। আমার ভুল হইতে পারে—আমার বুদ্ধত্বের ব্যাখ্যা পণ্ডিত ও সাধক-সমাজে গৃহীত নাও হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্ব রাত্রে যে প্রেমের লীলা দেখাইয়াছিলাম, তাহাতে সুজাতার শ্রদ্ধা ভরা প্রেমকে বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের বলায় আমি কি ভুল করিয়াছি? সান্ত ত সান্ত, তবু ক্ষুদ্র সান্ত দ্বারাই অনন্ত অনন্ত-লীলা দেখাচ্ছেন।

আমার বাগানে অনেকগুলো গাছ আছে—অনেক ফুল ফোটে। আমি যখন বাগানে বেড়াই, তখন তারা আমার সঙ্গে কথা কয়। আমি কি তবে পাগল? নিশ্চয়ই নহে। তাদের অব্যক্ত ভাষা আমি শুনি—তাদের রূপে আমি অরূপকে দেখ্‌তে পাই। সান্তে অনন্তের প্রকাশ—সান্তে অনন্তের প্রেম।

বুদ্ধগয়ার ন্যায় যেরুশালেম তীর্থেও ঐ লীলা—বরং আরও স্পষ্টতর লীলা। "পিতঃ! ইহাদিগকে ক্ষমা কর, ইহারা জানে না যে কি করিতেছে।" এ কাহার উক্তি? যিনি অনন্তের দর্শন পেয়েছেন, তাঁর উক্তি। সেই অগণ্য জনসঙ্ঘ তাঁহাকে ক্রুশে চড়াইয়া ঈশ্বরদ্রোহী হইয়াছে—পাপপুরুষের হাতে তাহারা আপনাকে বেচিয়া আত্মঘাতী হইয়াছে—তাহারা যেরুশালেমের ঐ মহাশ্মশানে ঈশ্বরনন্দনকে ক্রুশারোপিত করিয়া পিশাচের ন্যায় অট্টহাসি হাসিতেছে। সে শ্মশানে সুজাতার সোণার থালে দুধের পায়স নাই। খ্রীষ্ট ক্রুশ যাতনায় পিপাসিত হইয়া জল চাহিতেছেন—তাহারা তাঁহার পানার্থে পিত্তমিশ্রিত সির্কায় স্পঞ্জ ভিজাইয়া তাঁহার মুখের কাছে ধরিতেছে—তাহারা কতরূপে তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। অথচ ঐ নর-পশুগণের জন্য খ্রীষ্ট প্রার্থনা করিতেছেন "হে পিতঃ! ইহাদিগকে ক্ষমা কর—এরা অবোধ, জানে না যে কি কচ্ছে।" আমরা হলে নিশ্চয়ই প্রার্থনা করতেম, হে পিতঃ, এই দুর্ব্বৃত্তগণকে অনন্ত নরকে নিক্ষেপ কর—যেন সে নরকে চিরকাল এরা জ্বলে মরে। কিন্তু খ্রীষ্টের প্রার্থনা অন্যরূপ ছিল। সে প্রার্থনায় অনন্ত নরক নাই, অনন্ত ক্ষমা—অনন্ত প্রতিহিংসা নাই, অনন্ত প্রেম। ইহার কারণ কি?

সান্তে অনন্ত দৃষ্টি। সুরূপ সুগন্ধি পুষ্পে অনন্তকে দেখা সহজ। সুজাতার শ্রদ্ধামাখা সোণার থালায় সুমিষ্ট পরমান্নে অনন্ত প্রেমের সুস্বাদ গ্রহণ করাও সম্ভব। আমার যে বন্ধু দুপুর রেতে আমার জন্য ষ্টেসন প্লাটফর্ম্মে এসেছিলেন, তাঁর অকৃত্রিম প্রেমে ও তাঁহার ভ্রাতৃগৃহের অকৃত্রিম আদরেও অনন্ত প্রেম প্রতিফলিত হইতে দেখিতে পারি। কিন্তু যে লোকটা প্রেত-বিনিন্দিত উৎকট উল্লাসে আমার সর্ব্বনাশ চাহিতেছে,—নগ্ন তরবারি হস্তে আমাকে কাটিতে আসিতেছে, তাহাতেও কি সেই অনন্তের দৃষ্টি সম্ভব?—তাহাতেও কি এমন কোন জিনিষ আছে, যাহাতে দ্রষ্টার চক্ষে অনন্ত প্রেম স্ফূর্ত্ত হয়?

তুমি আমি যাহা দেখি না, খ্রীষ্ট তাই দেখেছেন, তাই তাঁর এত মাহাত্ম্য। ঐ জনসঙ্ঘে তিনি আর একটা জনসঙ্ঘ দেখেছিলেন। ঐ জন-সঙ্ঘের প্রতি মানুষ

ঈশ্বরের রূপ। সে রূপ পাপের সেবায় বিগড়ে গেছে বটে, তবু তার রূপটা তাঁহারই রূপ। বাইবেলের প্রথম পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে কথাটা লেখা আছে। ঈশ্বর স্ব রূপে মানুষকে গড়িয়াছেন। সান্ত মানুষে অনন্তের রূপ—পাপী মানুষে পবিত্র ঈশ্বরের রূপ—বিদ্রোহী মানুষে পুত্রত্বের প্রতিচ্ছবি। তাই ঈশ্বরনন্দন ঐ সকল পতিত ঈশ্বরনন্দনে নিজ প্রতিকৃতি দেখিয়া তাহাদিগকে ভালবাসিলেন—তাই তাদের জন্য পূর্ব্বোক্ত রূপ প্রার্থনা করিলেন।

আমরা যদি এই মহাদৃষ্টি পাই, তবে শত্রু মিত্র সর্ব্ব-সাঙ্গে অনন্তের প্রতিকৃতি দেখিব—দেখিয়া সকলকে ভালবাসিব ও সকলের আড়ালে অনন্তের অনন্ত প্রেমে ডুবিয়া যাইব। যতদিন ঐ স্থানে না পৌঁছিব, ততদিন ভেদজ্ঞান থাকিবে—স্বার্থ থাকিবে আত্মপূজা থাকিবে। ততদিন শিক্ষক, প্রচারক বা গুরু হবার অধিকার নাই। ওখানে পৌঁছে গেলে কেবল "তুমি" "তুমি" জপিব—তোমার রূপ দেখিব—তোমার গুণ গেয়ে তোমার প্রেমে ভেসে যাব। আমি থাক্‌বো না। আমি ক্রুশে মর্‌বো, বা বুদ্ধগয়ায় বোধিদ্রুম বলে নির্ব্বাণ হয়ে যাবো। থাকবে কেবল প্রেম। ঈশ্বর প্রেম—প্রেমই ঈশ্বর।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

গোবিন্দচন্দ্র দাস।

১

তুমি জন্মদুখী লক্ষ্মীছাড়া অতুল ভাগ্যধর,
গরলভরা-কণ্ঠ তুমি শ্মশান মহেশ্বর।
জাগে তোমার অধীর ধ্বনি,
বয় করুণা মন্দাকিনী,
তুমি আপান মনে বিষাণ বাজাও পাগল দিগম্বর।

২

অভ্রভেদী গর্ব্ব তোমার নাই ভাবনা ডর
বিনম্রেরি চেতন তুমি বিন্ধ্য গিরিবর।
রোষে তোমার কম্পে ধরা
মমতা, প্রেম বক্ষ ভরা,
কণ্ব এবং দুর্ব্বাসারি নিবাস একত্তর।

৩

বরুণ তোমার নয়ন নিল ললাট বৈশ্বনর
জীবন নিল আপন করি দারুণ শনৈশ্চর।
নিভলো আশা নিভলো আলো
প্রমোদ কানন ঝলসে গেল,
দিগ্ধ বিষহরির বিষে চন্দ্র সদাগর।

৪

আঙ্গুর এবং আমলকীতে ভরা তোমার বন,
প্রণয় এবং প্রলয় তোমায় করলে আলিঙ্গন।
মুছলে মরণ দুখের রেখা
লক্ষ্মীছাড়ায় দিলেন দেখা,
কণ্ঠেতে বৈকুণ্ঠ রচি লক্ষ্মী নারায়ণ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সমাধি-সঙ্গীত।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

(আমার) প্রাণে প্রাণ মিশায়ে দাও,
আমার চারু-রাণি!
(আমার) পরাণে মিশায়ে রাখ ঐ
ভাবের তনুয়া-খানি।
(এস) গঙ্গা-যমুনার মত মিশে
যাই লো সোহাগিনি!
(এস মোর) মনোময়ি! প্রাণময়ি!
আদর-মাখা আদরিণি!
আঁখিতে আঁখিতে,
সুধা পি'তে পি'তে,
মোহে মোহি দুঁহু দোঁহা
এস মোর নয়ন-মণি!
(এস) প্রেমের সমাধি সাধি
মর-ধামে রতন-মণি!
(শেষে) অনন্ত পীরিতির ধামে
যাব দোঁহে লো ভাবিনি!
(কেহ) দেখ্‌বেনাক, শুন্‌বেনাক,
কাঁদ্‌বেনাক লো মোহিনি!

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সত্য প্রকাশে কুণ্ঠা।

বিগত আশ্বিন মাসের "সওগাত" নামক মাসিক পত্রে মৌলবী আবদুল করিম সাহেব "প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য প্রসঙ্গ" শীর্ষক প্রবন্ধে সর্ব্বপ্রথমে "উদাসীর বারমাস" নামক এক-খানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমার এ বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া আমি যথাসময়ে "সওগাতে"র কর্ম্মকর্ত্তাকে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তাহা প্রকাশ করিবেন বলিয়া আমাকে পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি দিয়াও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। অধিকন্তু বর্ত্তমানে করিম সাহেব "সওগাতে"র অন্যতম সম্পাদক রূপে প্রকাশিত হওয়ায় আমার পূর্ব্বোক্ত বক্তব্য আর তথায় প্রকাশের সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া আজ সত্যনিষ্ঠ "নব্যভারতে"র আশ্রয় লইতেছি। ভরসা করি, সত্য প্রকাশে যে সৎসাহসের প্রয়োজন, এবার আর তাহার অভাব ঘটিবে না।

বহু বৎসর পূর্ব্বে আমার জনৈক বন্ধুর নিকটে আমি এই "উদাসীর বারমাস" পুঁথি-খানি পাইয়া তাহার ভূমিকাদি লিখিয়া কোন মাসিকপত্রে প্রেরণের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলাম। এমন সময় একদিন মৌলবী আবদুল করিম সাহেব আমার কাছে বেড়া-ইতে আসেন এবং আমার লিখিত ভূমিকাসহ পুঁথিখানি দেখিতে লইয়া যান। তারপর হঠাৎ একদিন দেখিলাম, আমার সেই "একটী প্রাচীন সন্দর্ভ" (উদাসীর বারমাস) "কোহি-নুর" নামক মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। (৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩১১ সাল।) শুধু ইহাই নহে—আমার লিখিত সন্দর্ভে আমার নামের শিরোদেশে করিম সাহেবের নামটীও শোভা পাইতেছে। আমি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ইহাই অকৃত্রিম বন্ধুত্বের নিদর্শন বলিয়া আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন।

পুনরায় এত কাল পরে করিম সাহেব আমার সেই "উদাসীর বারমাস" খানি আমার লিখিত ভূমিকার দুই একটী স্থানে ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া নিজনামে "সওগাতে" প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এবারে তাঁহার 'অকৃত্রিম বন্ধুত্ব' এত দূর গড়াইয়া আসিয়াছে যে, প্রবন্ধের কুত্রাপি আমার সামান্য একটু নামোল্লেখ করাও আবশ্যক মনে করেন নাই। কি অপূর্ব্ব সত্যপ্রিয়তা !!

ইতিপূর্ব্বে এরূপ বিচিত্র ব্যাপার আরও দুই এক স্থলে ঘটিয়া গিয়াছে। আমি নামের কাঙ্গাল কিম্বা যশের ভিখারী নহি। তাই সর্ব্বদা করিম সাহেবের এ বিসদৃশ ব্যবহার উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তিনি সর্ব্বদা আমার নাম-গোপনে উৎসুক থাকি-লেও "কোহিনুরে" তাঁহার আত্মজীবনী আমার নামে প্রকাশ করিতে কার্পণ্য করেন নাই। এজন্য আজ আমি যদি তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করি, তবে আমাকে নিশ্চয়ই প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য যে, করিম সাহেব "প্রাচীন পুঁথি সম্রাট" হইলেও "উদাসীর বারমাস" খানি তাঁহার নিজস্ব বলিবার অধিকার কিছুই নাই। পক্ষান্তরে আমি সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছি, উক্ত পুঁথিখানি কোন নব্য কবির রচনা। সুতরাং তাহা তাঁহার মূল্যবান প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হইবার গৌরব রাখে না।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

চাঁদসীর চিকিৎসা।

সস্ত্র ব্যবহার প্রণালী ও কর্ম্মবিধি।

সস্ত্র কর্ম্ম আট প্রকার—ছেদ ক্রিয়া, ভেদ ক্রিয়া, লেখন ক্রিয়া, বেধ্য ক্রিয়া, এষণ ক্রিয়া, আহরণ ক্রিয়া, বিস্রাব্য ক্রিয়া এবং সিব্য ক্রিয়া। অস্ত্র ক্রিয়া করিবার পূর্ব্বে, যন্ত্র, সস্ত্র, ক্ষার, অগ্নি, শলাকা, জম্বোষ্ঠ শলাকা, শৃঙ্গ জলৌকা, তিতলাউ, তুলা, বস্ত্র সূত্রা, পাট, মধু, ঘৃত, বসা, দুগ্ধ, তৈল তর্পণ দ্রব্য, কষায় দ্রব্য, আলেপন দ্রব্য, কল্ক, পাখা, শীতল জল, উষ্ণ জল, কটাহ ইত্যাদি দ্রব্য সমূহ ও বলবান, ধিমান পরিচারক অগ্রে সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। সস্ত্র পাত করিবার পূর্ব্বে রোগীকে লঘু ভোজন করাইয়া, শুভক্ষণে দেবতা ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া রোগীকে পূর্ব্ব অভিমুখে এবং বৈদ্য পশ্চিম অভিমুখে উপবেশন করতঃ, মর্ম্মস্থান, নাড়ী, অস্থি, শিরা, সন্ধিস্থান, সিবনি যাহাতে অহিত না হয়, এমত ভাবে সস্ত্রপাত করিবে। পূঁজ স্থান পর্য্যন্ত অস্ত্র প্রবিষ্ট করিয়া যদি অস্ত্র দেখিতে না পাওয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ অস্ত্র তুলিয়া লইবে। আর পূঁজ থাকিলে ২।৩ অঙ্গুলী পরিমিত স্থান অস্ত্র চিহ্নিত করিবে। এই বিষয় বিস্তারিত প্রত্যেক রোগ বর্ণন কালে বলা যাইবে। সস্ত্র ব্যবহার প্রণালী —বৃদ্ধি পত্র সস্ত্রের বৃন্ত ও ফলাকার মধ্য স্থলে ধারণ করিবে। ভেদন ক্রিয়া কালে সকল অস্ত্রই এই ভাবে ধারণ করিতে হয়। বৃদ্ধি পত্র এবং মণ্ডলাগ্র এই দুই অস্ত্রই হস্ত উত্তোলন অর্থাৎ কনুই কিছু তুলিয়া ধরিতে হয়। লেখন ক্রিয়া কালে অনেক অস্ত্রই এই ভাবে ধারণ করিবে। স্রাব করাইতে হইলে বৃন্তের অগ্রভাগ ধারণ করিতে হয়। বালক বৃদ্ধ কোমলাঙ্গির নাড়ী ও ভারাবিনের স্রাব ক্রিয়া কালে ত্রিকূর্চ্চ ব্যবহার করিতে হইবে। করতল মধ্যে বৃন্তের অগ্রভাগ রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা ব্রীহিমুখ অস্ত্রধারণ করিবে। কুঠার অস্ত্র বাম হস্তে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মধ্যম অঙ্গুলী চাপিয়া রাখিয়া, সেই মধ্যম অঙ্গুলী দ্বারা কুঠারিকার উপর আঘাত করিবে। আরা, কর পত্র ও এষণি এই তিন সস্ত্রের মূলে ধরিতে হয়। অপরাপর সস্ত্র কার্য্যের সুবিধা অনুসারে ধারণ করিতে হইবে।

সস্ত্রকর্ম্ম বিধি—ভগন্দর, গ্রন্থি, শ্লেষ্মজ—ব্রণ, তিন কানক ব্রণবর্ত্ত, অর্ব্বুদ, অর্শ্ব চর্ম্মকিলক অস্থিগত বা মাংসগত শৈল্য, মাংস সংঘাত জতুমণি গল শুণ্ডিকা, অস্থিজাত মাংসজাত বা শিরা জাত শোথ বল্মিক শতোজনক। অধ্রুস উপদংশ বা মাংসকন্দি ও অধিমাংস এই সকল রোগে ছেদন কার্য্য করিবে। সান্নিপাতিক ব্যতীত সকল বিদ্রধি রোগে, বাতপিত্ত শ্লেষ্মা রোগে, শুক্র শোণিত দূষিত বিসর্প রোগে বৃদ্ধি রোগে পিড়কা প্রমেহে, শোথ অথবা শূল রোগে, অবমন্থ রোগে, অবতশয়া, নাড়ীব্রণ, বৃন্দ অজনা প্রভৃতি প্রায় সকল ক্ষুদ্র রোগে, তালু পুট-পুট ও দন্ত পুট-পুট তুণ্ডাকেরী বা গিনাবু রোগে অথবা যে সব ব্রণ পূর্ব্বে পাকিয়া পরে বাহিরে প্রকাশ পায়, সেই সকল ব্রণ রোগে মলাশয় বা মূত্রাশয়জাত অশ্মরী বা সর্ব্ব প্রকার মেদজ রোগে ভেদন ক্রিয়া করিবে। চারি প্রকার রোহিণী কিনাম, উপজিহ্বা সকল প্রকার মেদজাত রোগে এবং দন্ত—

বেদউ ও গ্রন্থি রোগে, চক্ষুপাতাগত রোগ, অধিজিহ্বা ও সকল প্রকার অর্শ, মণ্ডন-মাংসকাদি ও মাংসস্রোতি রোগে লেখন ক্রিয়া করিবে। সকল প্রকার শিরাগত রোগে, মূত্রবৃদ্ধি ও জলোদর রোগে ভেদন ক্রিয়া করিবে। নাড়ীব্রণ হইলে বা নাসামধ্যে শৈল্য থাকিলে বা ব্রণ পার্শ্ব ভাগে শেষ হইলে এষণ কার্য্য করিবে। অশ্মরী বা দন্তশর্করা জন্মিলে কোন প্রকার শাল্য বিদ্ধ বা বদ্ধ হইলে অথবা গর্ভ মধ্যে সন্তান নষ্ট হওয়া প্রযুক্ত বা বিপরীতভাবে থাকা প্রযুক্ত প্রসব ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইলে, অথবা মলদ্বারে কঠিন মল আবদ্ধ হইলে আহরণ ক্রিয়া আচরণীয়।

শ্রীকেশবচন্দ্র দাস।

অর্ঘ্য।

(মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয়ের পরলোক গমনোপলক্ষে)

জন্ম, শ্রাবণ—১২৬৪—বরিশাল।

মৃত্যু, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬—গিরিদি।

বরষার ধারা-স্নাত দীন অর্ঘ্য নিয়া
দরিদ্র দাঁড়ায়ে হেথা তোমারে চাহিয়া।
হে দেশ-দেবতা, তুমি আছ কোন্ দেশে
কোন্ মধুময় পুরে, কি সুন্দর বেশে
কিছুই না জানি, কিছু বুঝিতে না পারি,
ভাবিতে না পারি আমি দীনতা আমারি।
তবু তব জন্মভূমি "বরিশাল" বুকে
দিতেছে মাতায়ে মোরে কাঁদায়ে পুলকে।
দু'টি রূপ দু'টি জ্যোতি, দু'টি দিবাধারা
যেথা আজি হলো সম্মিলিত, আত্মহারা
আমি সে অজ্ঞাত পুণ্যধাম পানে চেয়ে
আছি,—দগধ ব্যথিত চিতে। বক্ষ ছেয়ে
সে ব্যথার আজি মোর রেখেছে বিভোর
তাঁ'র ছায়ে রচিত এ অর্ঘ্য লহ মোর।

শ্রীঅনাথবন্ধু সেন।

সঙ্গণিকা।

(৫৯)

বিগত ৫ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ফরিদপুরের কৃতি সন্তান, কৃষ্ণনগরের সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ, এম-এ, মহাশয় মেহেরপুর উপনগরে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি পরিদর্শনোপলক্ষে মেহেরপুরে গিয়াছিলেন, সেই থানেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং পরে তদনীন্তন কালের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই পদ লাভ করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, সহৃদয়তা, দেশানুরাগ সর্ব্বদাই আমাদের প্রাণে জাগিতেছে। তিনি 'নব্যভারতে' পূর্ব্বে যে সকল গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কার্য্যোপলক্ষে তিনি যেখানে যাইতেন, সর্ব্ব স্থানেই সকলের হৃদয় ও প্রাণ আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার তিরোধানে আমাদের প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বিধাতা প্রাণে শান্তি দিন।

(৬০)

ঘোষিত হইয়াছে, রাউলাট আইন ও প্রেস আইন উঠিবে না। কতিপয় স্থানে

তের কৃতী সন্তানকে অন্তরীণ হইতে খালাস দেওয়ায় আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি বটে, কিন্তু বহু বাজেয়াপ্ত পুস্তক এবং কালে বিলীন সংবাদপত্র ও প্রেস সকলের পুনরুদ্ধার না হইলে এদেশের উন্নতির কোন আশা নাই। এদেশে এমন সম্ভ্রান্ত পরিবার নাই, যে পরিবার কোন না কোন রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। আমরা ত সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। প্রেস যাওয়ায় নব্যভারত প্রকাশে ঘোরতর কষ্ট পাইতেছি। ঘোর বিষাদের কালিমায় এখন দেশ ঢাকিয়াছে—সকল আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি চিরতরে নির্ব্বাণ হইয়াছে। তদুপরি দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতায় দেশের চতুর্দ্দিকে হাহাকার!! তাহার অভিব্যক্তি নানা ঘটনায় প্রকাশিত। এই দুর্দ্দিনে বিধাতা ভারতের সহায় হউন।

(৬১)

কেহ কেহ রিফরম্ আইনের ভেল্কিতে আত্মহারা হইয়া দিগ্বিজয়ী প্রতাপ বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন! মডারেট দল চাঁই হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম আপনাদের গণ্ডীভুক্ত করিবার চেষ্টায় আছেন। এই আইনে কত খরচ যে বাড়িয়া যাইবে, কেহই তাহা নির্দ্ধারণ করিতে তৎপর নহেন। আমাদের মনে হয়, ভারত যে তিমিরে, সেই তিমিরে। "গোলামের জাতি, শিখেছে গোলামী, আর কি ভারত সজীব আছে," সর্ব্বকাজে এই কথারই পরিচয় পাইয়া বিষাদে নিমগ্ন হইতেছি। স্বায়ত্ত শাসনের পূর্ব্বে প্যাটালের সামান্য বিবাহ বিল উপলক্ষে যে তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, তাহাতেই অবাক্ হইতেছি। টাকার জোরে কত সীতানাথ যে নেতৃত্ব পাইবেন, কে জানে? যে কলিকাতায় মহাত্মা নগেন্দ্রনাথ ঘোষ নির্ব্বাচনে মিউনিসপালিটীতে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, সে দেশের আশা কোথায়? টাকা যার, মুলুক তার—এ কথার আবার মহা পরীক্ষার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে।

(৬২)

হিন্দু-মুসলমানের একতা সন্দর্শনে আমরা বড়ই পুলকিত হইতেছি। যে সকল নেতা মুসলমানকে বাদ দিয়া দেশোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতি গতি ফিরিতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত। কিন্তু ইহা দীর্ঘকাল থাকিবে কি না, জানি না। যে ঘটনায় ইহার উত্থান হইতেছে, সে ঘটনার সুব্যবস্থা হইলেই ইহা হয় ত যাইবে! কিন্তু আমাদের বিশ্বাস—হিন্দু মুসলমান ভারতের দুই সন্তান, অঙ্গাঙ্গীভাবে তাহাদের মিলন এই ভারতের উন্নতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। বিধাতা এই করুন—এই দুই ভ্রাতার মধ্যে যেন বিচ্ছেদ-অগ্নি আর প্রজ্বলিত না হয়।

(৬৩)

বোলসিভিজম জগতের ভাবী সমস্যা। এই সমস্যা-পূরণে পণ্ডিতবর্গ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। অধিকার অনধিকার, ন্যায্য অন্যায্য, ধনী নির্ধন, জ্ঞানী মূর্খ, সকল সমস্যার পূরণের জন্য ধরায় এই দল অবতীর্ণ। সোসিয়ালিজম, কমিউনিজম, নিহিলিজিম, সাম্যবাদ—সকল বাদ লইয়া এই দল শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছেন। জগতের উন্নতি কোন্ দিকে, বুঝিতেছি না। পরিণামে কি হইবে, কে জানে?

(৬৪)

মুসলমান-শক্তিকে খর্ব্ব করিতে খ্রীষ্টীয় শক্তি সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টিত। ইসলাম, না খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম জয়লাভ করিবে? ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তিগণ রক্তপাত সমর্থন করেন, এ দুঃখ আমাদের রাখিবার ঠাঁই নাই। যাহার যাহা

প্রাপ্য, তাঁহাকে তাহা দিতে সকলের এত কুণ্ঠা কেন? এ ধরায় শোণিতপাত কি থামিবে না?

(৬৫)

মহাত্মা শ্রীনাথ পাল সর্ব্বজন-সম্মানিত এবং মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার তিরোধানে আমরা যারপর নাই বেদনা পাইয়াছি। তাঁহার গৌরব-মণ্ডিত সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত এই। এই সকল কথাই আমরা অনুমোদন করিতেছি।

"রায় বাহাদুর স্বর্গীয় শ্রীনাথ পাল বি-এ, বি-এল মহাশয় বাঙ্গালা ১২৬৪ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ তারিখে, যে বৎসরে সিপাহী বিদ্রোহ হয়, জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রধানতঃ কলিকাতা সহরেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি-এল পরীক্ষাও তিনি এই কলেজ হইতে দিয়াছিলেন এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই বৎসরেই অর্থাৎ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি বহরমপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন। তিন চারি বৎসর ওকালতি করিবার পর তিনি কাশিমবাজারের স্বনামপ্রসিদ্ধা মহারাণী স্বর্ণময়ী সি-আই মহোদয়ার বিশাল জমিদারীর পরিচালক-সংঘের সদস্য নিযুক্ত হন। পুণ্যবতী মহারাণী স্বর্ণময়ী পাল মহাশয়ের মাতৃস্বসা ছিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর নাম বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইনি মূর্ত্তিমতী করুণারূপিণী ছিলেন। ইনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। ইঁহার নিকট হইতে প্রার্থী বিমুখ হইয়া ফিরিত না। বাঙ্গালা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা ইঁহার নাম সসম্ভ্রমে উচ্চারণ করিত। এক কথায় বলিতে গেলে ইনি প্রাতঃস্মরণীয়া মহীয়সী রমণী ছিলেন। শাস্ত্রোচিত ক্রিয়াকাণ্ড ও সদনুষ্ঠান ইঁহার জীবনের ব্রত ছিল। কিছুদিন পরে মহারাণী রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুরকে স্বীয় এষ্টেটের ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করেন। ইনি ছয় বৎসরকাল বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন। ইনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং একাকী বিচার করিবার ক্ষমতা ইঁহার ছিল। কাশিমবাজার রাজ-ষ্টেটের কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালন করায় এবং জনহিতকর কর্ম্মে নিযুক্ত থাকায় গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দানে সম্মানিত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় বহরমপুরে জলের কল স্থাপিত হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মহারাণী স্বর্ণময়ী পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইনি কাশিমবাজার রাজ-ষ্টেটের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করেন। তাহার পর হইতে ইনি কলিকাতায় বসবাস করিতে থাকেন।

বাঙ্গালার কয়েকটী প্রধান জেলায় ইঁহার জমিদারী আছে। ইনি কয়েকটী কয়লা ও অভ্রের খনির স্বত্বাধিকারী। ইঁহার মাল আমদানী রপ্তানীর ব্যবসায় আছে। প্রসিদ্ধ মেসার্স ওয়াই আরটিন কোম্পানীর মালিক ইনি। প্রতি বৎসরই ইনি জনহিতকর অনুষ্ঠানে অর্থ দান করিয়া থাকেন। ইঁহার গুপ্ত দানও যথেষ্ট ছিল। কলিকাতায় একটী বৃহৎ বীমা কোম্পনীর ইনি ডিরেক্টর। ইনি বেঙ্গল ন্যাশান্যাল চেম্বার্স অফ কমার্সের অন্যতম ভাইস প্রেসিডেণ্ট। রায় বাহাদুর শ্রীনাথ পাল সাত্ত্বিক-প্রকৃতি ছিলেন; এজন্য তাঁহার দানও সাত্ত্বিক ছিল। তিনি জাতিবর্ণানির্ব্বিশেষে দান করিতেন। ব্যবসায় কর্ম্মে ইঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল এবং ব্যবসায়ের জন্য গুরুতর পরিশ্রম করিতেও ইনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। ইঁহার স্বভাব অতি নির্ম্মল ছিল। ইনি বিনয়ী ও শিষ্টাচারসম্পন্ন ছিলেন। ইনি পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া পদগৌরব ইঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। ইনি সকল শ্রেণীর লোকের সহিত দেখাশুনা করিতেন। ইঁহার দ্বার সকলের জন্য অবারিত ছিল। ইনি বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সাহায্যকারী ও পরমোপকারক ছিলেন। রায় বাহাদুর শ্রীনাথ পাল বাহাদুর গৌরচরণ নন্দীর পৌত্রীকে বিবাহ করেন। গৌরচরণ কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথের পিতৃব্য-পুত্র ছিলেন। রাজা কৃষ্ণনাথ মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের মাতুল। রায় বাহাদুরের দৌহিত্রীর সহিত রাণাঘাটের

জমিদার শ্রীযুত সরোজনাথ পাল চৌধুরীর বিবাহ হইয়াছে। রায় বাহাদুরের এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রের নাম শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ পাল। ইনি ১৩০২ সালের ১৬ই কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের জামাতা। ইনি এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। রায় বাহাদুর শ্রীনাথ পাল বাহাদুর সকল শ্রেণীর লোকেরই প্রিয় ছিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি লোকান্তর গমন করেন।"—প্রজাপতি।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ষষ্ঠ ভাগ। শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু প্রণীত, মূল্য ২৲। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়। ইহাই দেবেন্দ্রবিজয়ের শেষ কীর্ত্তি। এরূপ গবেষণাপূর্ণ পুস্তক এদেশে অতি অল্পই আছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ২৲। ১২৲ টাকা খরচ করিলে এই অমূল্য গ্রন্থখানি হস্তগত হইবে। প্রতি খণ্ডই সুবিস্তৃত, কাগজ ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট। কাগজ ও ছাপার মূল্যের তুলনায় পুস্তকের মূল্য সামান্য বলিয়া মনে হয়। দেবেন্দ্রবিজয়ের পবিত্র নাম এই গ্রন্থের দ্বারা এদেশে অমরত্ব লাভ করুক, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

২। চাঁদরাণী। শ্রীবিপিনমোহন সেন প্রণীত, মূল্য ১।০। দ্বিতীয় সংস্করণ। মুসলমান রাজ্যের শেষ সময় এবং ইংরাজাধিকারের প্রথম ভাগের কতিপয় ঘটনা সমাবেশে এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উপন্যাস-বহুল দেশে এই সত্য ঘটনামূলক কাহিনী পাঠে সাধারণের উপকার হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। ভাষার পারিপাট্যে ও বর্ণনার চাতুর্য্যে এই গ্রন্থখানি মনোজ্ঞ হইয়াছে।

৩। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ—জ্ঞান-প্রচার-সমিতির কার্য্যবিবরণী। শিক্ষার একটী কথা। মূল্য ।০। সদুদ্দেশে এই সুচিন্তিত পুস্তকখানি লিখিত। পড়িয়া সুখী হইলাম।

৪। মহাত্মা গান্ধী—শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১।০। এই পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণে আমরা অনেক প্রশংসা করিয়াছি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। ইহাতে প্রকৃত হিতৈষীর সম্মান বর্দ্ধিত হইয়াছে।

৫। কল্যাণী। শ্রীশশিভূষণ সেন, মূল্য ১।০। ছোট ছোট গল্প। লেখা ভাল।

৬। মায়ে পোয়ে। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পরিব্যক্ত। মূল্য ।৶০। ক্ষিতীন্দ্র বাবু ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি। সেই পিপাসার অভিব্যক্তি এই পুস্তকে পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম।

৭। সংখ্যাসার বা সাহিত্যাঙ্কুর। শ্রীবিপিনমোহন সেন গুপ্ত প্রণীত; দ্বিতীয় সংস্করণ। ভাষা বুঝিতে হইলে সংখ্যাসারে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই পুস্তক ভাষা শিক্ষার সহায়তা করিবে।

৮। জাতীয় শিক্ষার অধিকার। দ্বিতীয় পুস্তিকা, শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত কর্তৃক পঠিত, মূল্য ।০। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যে সব মহৎ কার্য্য হাতে নিয়াছেন, ইহা তাহার অন্যতর অভিব্যক্তি। ভাল লেখা, ভাল কাজ।

৯। সাম-সন্ধ্যা-গাথা। কিরণচাঁদ দরবেশ অনূদিত, মূল্য ।৴। সাধনার পাত্র-

স্পর্শ্য এই গ্রন্থে বিষদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার সরল পদ্যানুবাগে চিত্তকে আকর্ষণ করে। সাধক মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন।

১০। শান্তিধারা। মহম্মদ এয়াকুব আলি চৌধুরী প্রণীত। ইসলাম ধর্ম্মের গূঢ়-তত্ত্ব প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মুসলমান বন্ধুগণের বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ দেখিলে মোহিত হইতে হয়। এরূপ সুন্দর ভাষা সমন্বিত পুস্তক বাঙ্গালা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

১১। শ্রীবৃন্দাবন শতক। দরবেশ অনূদিত। শ্রীশ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত। মূল্য ৷৷০। ইহাতেও সংস্কৃত শ্লোক ও বিশদ পদ্যানুবাদ আছে। অনুবাদ প্রাঞ্জল এবং সুন্দর।

১২। তিমির-প্রভা। শ্রীসুধীরকুমার গোস্বামী বি-এ প্রণীত, মূল্য ৷৷০। কবিতা পুস্তক। চলন-সই লেখা।

১৩। জীবন-বেদের পরিচয়। শ্রীঅরুণ-প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ। মূল্য ৵০। জীবনবেদ কেশবচন্দ্রের অমূল্য জীবনের অভিব্যক্তি। সে পুস্তক যতবার পড়া যায়, পুরাতন হয় না, বাইবেল ও গীতার ন্যায় মধুময় বলিয়া বোধ হয়। এ হেন অমূল্য গ্রন্থের অনুশীলনে এই পুস্তক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভালই হইয়াছে।

১৪। বেদ মাতার সেবা। শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, মূল্য ।৵০। দ্বিজদাস বাবুর অসাধারণ পাণ্ডিত্য এই পুস্তকের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে অনুস্যূত হইয়াছে। পাঠে অনেক শিক্ষা পাইলাম।

১৫। ব্রাহ্মণ্য প্রজানীতি। শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর, রায় বাহাদুর লিখিত। মূল্য ৵০। ব্রাহ্মণ্য নীতির সহিত সোসিয়ালিজম ও বোলসিভিজমের তুলনায় সমালোচন। সুচিন্তিত পুস্তক।

১৬। উইলিয়ম টেল বা সুইজরল্যাণ্ডের স্বাধীনতা। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সেন, বি-এ, মূল্য ৷৷০। টেলের ন্যায় মহাপুরুষের জীবনী বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। এরূপ মহাত্মা এদেশে অভ্যুদিত হইলে এদেশের মুখ ফিরিত। ইটালীতে যেমন ম্যাটসিনি, সুইজরল্যাণ্ডেও তেমনি টেল। এই পুস্তকখানি এত সুন্দর হইয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়। ঘরে ঘরে এই পুস্তক প্রচারিত হউক। উপন্যাস-বহুল দেশে এরূপ সুন্দর পুস্তক প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন।

১৭। বেদমাতা। মানবমণ্ডলীর আদিম ধর্ম্মমাতা। মূল্য ৵০। এই গবেষণাপূর্ণ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। দ্বিজদাসবাবুর জীবন ধন্য, লেখনী ধারণ সার্থক হইয়াছে।

১৮। চুনার। শ্রীনিখিলনাথ রায়, বি-এল প্রণীত, মূল্য ৷৷৵০। নিখিলনাথ এদেশের অন্যতর অমর ঐতিহাসিক। এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে তাঁহার গবেষণা খুব প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ লেখা যে কোন দেশের সাহিত্যকে উজ্জ্বল করিতে পারে। নিখিলনাথের লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক। অতি মনোজ্ঞ পুস্তক।

১৯। চরিতমাধুরী। প্রথম ভাগ, শ্রীরজনীকান্ত দে প্রণীত, মূল্য ।/০। ছয়জন ব্রাহ্মিকা সাধ্বীর জীবনাভাষ। পড়িয়া সুখী হইলাম।

২০। গান। দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস। শ্রী বিহারি-

লাল সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ॥০। আজ কালকার দিনে বিহারিলালই বোধ হয় বাঙ্গালার সঙ্গীত রচকদিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। তাঁহার লেখার বাঁধনি দেখিলে মোহিত হইতে হয়। আমরা বিহারিলালের গানের একান্ত পক্ষপাতী। মনে হয়, এই পুস্তক যিনি পড়িবেন, তিনিই পক্ষপাতী হইবেন। ইহা যেন ভক্তিরসের অনন্ত ফোয়ারা।

২১। ভারত-গৌরব। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য সাধারণ সংস্করণ ২৲। সুরেন্দ্রমোহন নব্যভারতের পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত ব্যক্তি। সংক্ষেপে জীবন-চরিত লেখায় তিনি সিদ্ধ-হস্ত। এই পুস্তকে বাঙ্গালার বহু জেলার রাজবংশ ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট বংশের গৌরব-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকখানি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। সঙ্কলনে এত বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে যে, গ্রন্থকার কিরূপে এই অসাধ্য সাধন করিলেন, বুঝিতে পারিতেছি না। সুরেন্দ্রনাথ এই পুস্তক প্রকাশে প্রভূত ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।

২২। কার্পাস আবাদ। শ্রীগুরুগোবিন্দ পাট্টাদার বি-এল। সুরাজ প্রেস, পাবনা। কার্পাস আবাদ ভিন্ন এদেশের মঙ্গল নাই। এই কার্পাস আবাদের প্রণালী প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পুস্তকখানির বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

২৩। The Ninth Annual Report of the Society for the improvement of the Backward classes, Bengal and Assam 1918-19 এদেশে যত ভাল কাজ হইতেছে, তন্মধ্যে এই কাজটী প্রধান। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজমোহন দাস মহাশয়ের কর্ম্মদক্ষতায় এই সমিতির কাজ অতি সুন্দরভাবে চলিতেছে।

২৪। গোপীচন্দ্র। শ্রীশিবরতন মিত্র সঙ্কলিত, মূল্য ১।০।

এই গ্রন্থে মহারাজা মাণিকচন্দ্র ও রাণী ময়নাবতীর পুত্র রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় "সাহিত্য-সেবক" পুস্তক লেখায় শিবরতনের যে ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এই গ্রন্থে তাহার সম্যক পরিস্ফূর্ত্তি হইয়াছে। অতি নিরপেক্ষভাবে এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি উপন্যাসের ন্যায় সরস হইয়াছে। পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। এ হেন পুস্তকের যে প্রসার ও প্রতিপত্তি হইবে, আমরা আশা করিতেছি। এই পুস্তক প্রচারে বাঙ্গালা ভাষার গৌরব-বৃদ্ধি হইয়াছে।

২৫। তোমরা এবং আমরা। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ।৵০। নব্যভারতে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু গ্রন্থকার তাহা উল্লেখ করারও আবশ্যক বুঝেন নাই, অনুমতি লওয়া ত দূরের কথা। ইহা বে-আইনী কাজ। প্রবন্ধটী যে কত মূল্যবান, নব্যভারতের পাঠকগণ অবশ্য তাহার পরিচয় পাইয়াছেন।

২৬। চিত্র। ১ম খণ্ড। শ্রীভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত, মূল্য ১।০। ৭টী গল্পে এই পুস্তক শোভিত। লেখকের ক্ষমতা অসাধারণ, ভাষা প্রাঞ্জল, রুচি মার্জ্জিত।

২৭। মাধুরী। শ্রীমতী সরোজিনী দত্ত এম-এ। স্বামীহারা পত্নী, কন্যাহারা মাতার গভীর মর্ম্মবেদনার গভীর উচ্ছ্বাস। যাহার জীবন ইহাতে পরিব্যক্ত হইয়াছে, সে কন্যা ছিল, স্বর্গের পারিজাত, দেবদুর্লভ রত্ন। যেমন জীবন, তেমনি অভিব্যক্তি। পাঠে আমাদের দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু পড়িল। বিধাতার আশীর্ব্বাদ মাতার জীবনে বর্ষিত হউক।

অর্থবিজ্ঞান

লোকস্থিতি ও বৃদ্ধির সহিত উৎপত্তি-হ্রাস-নিয়মের সম্বন্ধ।

ভূমির উৎপত্তি-হ্রাস নিয়ম (The law of Diminishing Return of Land) একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের কার্য্যে উৎপাদনের তিন সাধনাঙ্গ ভূমি, ধন ও জন, মধ্যে তুইটীকে স্থির ধরিয়া অপর একটীকে পর পর ভাবে বর্দ্ধিত করিলে, প্রথম কয়েক মাত্রা পর্য্যন্ত উৎপন্ন সামগ্রীর পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া, তৎপর ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে। ইহা যে কেবল ভূমি সম্বন্ধে সত্য, তাহা নহে; প্রত্যেক সাধনাঙ্গের উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে এই নিয়ম সমভাবে প্রযুক্ত হয়। এই অর্থ-শাস্ত্রের অন্যান্য নিয়মের ন্যায় পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থাকে স্থির ও নিশ্চল ধরিয়া, এই নিয়মের ফলাফল পরীক্ষা করিলেই তাহার প্রামাণ্য সত্যোপলব্ধি হয় এবং তদ্দ্বারা এই সকল সাধনাঙ্গের উৎপাদিকা শক্তির উৎপত্তি-গতিক্রম কি, তাহা জানা যায়। এইরূপে পর পর ভাবে কোন এক সাধনাঙ্গের বৃদ্ধি করিলে, প্রথম কয়েক মাত্রা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হারে উৎপন্ন হইয়া শেষ এমন এক সীমায় আসিয়া পড়ে যে, তাহার শেষ মাত্রায় উৎপাদিত বস্তুর বাজার মূল্যে সেই শেষ বৃদ্ধির মূল্য মাত্র উঠিয়া আসে, কিছুই উদ্বৃত্ত হয় না। বিভিন্ন সাধনাঙ্গের উৎপাদিকা শক্তির এই নিয়মকে Law of Diminishing Productivity বা উৎপাদিকা শক্তির উৎপত্তির ক্রমিক-হ্রাস-নিয়ম কিম্বা সংক্ষেপে উৎপত্তি-হ্রাস-নিয়ম বলা যাইতে পারে।

কিন্তু লোকস্থিতি ও বৃদ্ধির সহিত ভূমির উৎপত্তি-হ্রাস-নিয়মের যে সম্বন্ধ, তাহা একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব। পৃথিবীতে ভূমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। মানুষের কোন কর্ম্ম-চেষ্টার ফলেই তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভব নহে। অথচ এই ভূমিই তাহার অবস্থিতি ও সংস্থিতির একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং দেশে কখনও নিরতিশয় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া মানুষের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইতে পারে কিনা, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া লোকের চিত্ত সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়া একান্ত অস্বাভাবিক নহে। কোন অপরিমিত মাত্রায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া পড়িলে, ভূমির অনটন প্রযুক্ত উৎপত্তি-হ্রাস-নিয়মের অধীনে যাইয়া অপ্রচুর শস্যোৎপন্ন করার ফলে লোকের অন্নকষ্ট উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা যে একান্ত অমূলক, এরূপ মনে করা যায় না। সত্য সত্য এইরূপ একটা অনিমিত্ত উপস্থিত হইলে, একে অন্যের হাতের গ্রাস কাড়িয়া ও আত্মসাৎ করিয়া মারামারি জুড়িয়া দেওয়া অসম্ভব নহে। তখন হয় দেশে লোকসংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য চেষ্টা চলিবে, না হয়, কোন উপায়ে এই অন্ন সমস্যার সমাধান হয় কি না, সে চেষ্টা হইবে। এই চেষ্টার ফলাফল যে কি হইবে বা হইতে পারে, তাহাই অতীত ও বর্ত্তমান অভিজ্ঞতা ধরিয়া বিজ্ঞান প্রকট করিতে চেষ্টা করে। এই উৎপত্তি-হ্রাস-নিয়মের সহিত জনস্থিতি ও বৃদ্ধির প্রকৃত সম্বন্ধ কি, তাহাই আমাদের বর্ত্তমানে আলোচ্য।

এই নিয়মের কোন অননুভূত অভিজ্ঞতা প্রভাবে পৃথিবীব্যাপী মানবের বিস্তৃতি ঘটি-

য়াছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করা অতীব দুরূহ। তথাপি মানবের কার্য্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য করিলে এই রূপ একটা অস্পষ্ট ও অননুভূত অভিজ্ঞতা দ্বারা যে উহা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, এই রূপ অনুমান করা কঠিন নহে। ফলতঃ যদি সেরূপ কোন বোধ না থাকিত, তবে কোন উর্ব্বর ও স্বাস্থ্যকর ভূমির চতুর্দ্দিকে লোকের অতি ভিড় হইয়া উঠা অস্বাভাবিক ছিল না। ইতর প্রাণীদিগের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে স্থানে প্রচুর আহারীয় বস্তু পাওয়া যায়, সেরূপ স্থান বাহির করার জন্য তাহারা অন্বেষণ করিয়া করিয়া বেড়াইতে থাকে। এই রূপ এক খণ্ড নিরাপদ স্থান মিলিলে, তথায় স্থায়ী হইয়া পড়ে। মানুষ কর্ম্ম-চেষ্টা করিয়া আহারীয় সামগ্রী উৎপন্ন করিতে শিক্ষা লাভ করার পর এই রূপ একটা অস্পষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করা আশ্চর্য্য নহে। যে ভাবেই হউক, পৃথিবীব্যাপী এই লোক-বিস্তৃতির ফলে ভূমির অনটন ও অপ্রাচুর্য্য ঘটিয়া লোকের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল, এই রূপ সংখ্যা বৃদ্ধির অভ্যুদয় যে কখনও ঘটিয়াছিল, এরূপ কোন প্রামাণ্য বিবরণ বর্ত্তমান নাই। কোন কোন বিশিষ্ট স্থানে ও সীমায় সাময়িক ভাবে যে লোকের উৎকট অন্নকষ্টের এবং তাহার অনিবার্য্য ফল স্বরূপে অকাল মৃত্যুর কারণ উপস্থিত হইতেছে না, এমত নহে। এই সকল নির্দ্দিষ্ট স্থানগত সাময়িক ফল মাত্র। সমগ্র পৃথিবীর হিসাবে এই রূপ দুরন্ত কোন অভাব যে কখনও উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কোন প্রামাণ্য বিবরণ আছে বলিয়া জানি না। বরং এইরূপ না থাকারই যথেষ্ট অনুকূল অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের এদেশের প্রাচীন কাব্য সাহিত্যে কিম্বা ইতিহাস-পুরাণে জনসংখ্যার অতি বৃদ্ধিতে লোকের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইতে পারে, এই রূপ ভীতি দ্বারা লোকের চিত্ত একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ার কোন নিদর্শন আছে বলিয়া বোধ হয় না। আর পূজ্যপাদ ঋষিগণ যখন "আহারোঽপি মনুষ্যাণাং জন্মনা সহ জায়তে" বলিয়া অভয় বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তখন এই সন্দেহটা যে নিরাকৃত হইয়াছিল, এইরূপই অনুমিত হয়। ফলতঃ এদেশের আপামর জন-সাধারণ চিরকাল ধরণীকে অন্ন-প্রসবিত্রী মাতা বলিয়া পূজার অর্ঘ্য দান করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল; কিন্তু সে সুখস্বপ্ন বুঝি আর থাকে না!

প্রাচীন ইউরোপ খণ্ড যে কখনও এই ভীতি দ্বারা অভিভূত হইয়াছিল, তাহারও কোন নিদর্শন নাই। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যে লোকসংখ্যার আলোচনা হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাহাও রাষ্ট্র প্রয়োজনে বিহিত হইয়াছিল। তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বা City Stateএর মধ্যে কি পরিমাণ লোক থাকা আবশ্যক; তাহার নিম্ন বা ঊর্দ্ধসীমা কি হইতে পারে, সে মীমাংসারই তাহাদের মনীষিগণের চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছিল। কিন্তু কত লোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইলে, সেই রাষ্ট্রসীমার মধ্যে জনমণ্ডলীর অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবে না, সে বিষয়ে তাহাদের কাব্য-সাহিত্যে কোন উল্লেখ থাকা দৃষ্ট হয় না। সুতরাং তাঁহাদের এই লোকসংখ্যার আলোচনায় এই অন্ন সংস্থানের দুরূহ প্রশ্নের কোন স্থান হয় নাই।

বিগত সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড প্রদেশে লোকসংখ্যার অতি বৃদ্ধির লক্ষণ অনুভূত হয়। ভার্জ্জিনিয়ার (Vergenia) উপনিবেশ সংস্থাপন জন্য দেশের বহু নরনারী তথায়

প্রবহমান হয়। দেশ ছাড়িয়া এত লোক চলিয়া যাওয়া নিরাপদ কি না, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে কেহ অনুকূলে, কেহ বা প্রতিকূলে অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু তখনও লোকসংখ্যার বৃদ্ধিতে দেশে আকস্মিক অন্নকষ্ট উপস্থিত হইতে পারে, সেই চিন্তা আসিয়া জনমণ্ডলীর চিত্তকে উন্মথিত করিয়া তোলে নাই।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইয়োরোপে অতিশয় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়। তখন এই বৃদ্ধির কথা লইয়া তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে একটা কৌতুকাবহ মতবাদের সৃষ্টি হয়। তখন পৃথিবীতে বিশেষতঃ ইয়োরোপ খণ্ডে যত লোক বর্ত্তমান ছিল, তৎপূর্ব্বে অন্য কোন সময়ে সেরূপ লোকবৃদ্ধির অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল কি না, এই লইয়া দুইটী প্রবল দলের আবির্ভাব হয়। এক পক্ষ তাহার অনুকূলে এবং হিউম (Hume) প্রমুখ চিন্তাশীল মনীষিগণ প্রতিকূলে অভিমত প্রকাশ করেন। দুই পক্ষই নানা যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া স্ব স্ব মতের পোষকতা করেন; তন্মধ্যে ১৭৫৩ খ্রীঃ রবার্ট ওয়ালেস (Robert Wallace) এক সন্দর্ভ রচনা করিয়া নওয়ার জল-প্লাবনের সময় হইতে আলেকজেণ্ডার দি গ্রেটের (Alexander the Great) সময় ১২৩৩ বৎসর মধ্যে দুই জনের সন্তান-সন্ততি হইতে প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার কোটি লোকের অভ্যুদয় ঘটিতে পারে, এইরূপ একটা কাল্পনিক হিসাব প্রদর্শন করেন। প্রত্যেক বিবাহিত জীবনে গড়পরতা ছয়টী করিয়া সন্তান জন্মিলে এবং তন্মধ্যে দুই জন করিয়া অকৃতদারাবস্থায় পরলোক গমন করিলে, এই হিসাব মত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারিত। কিন্তু তিনি এইরূপ বৃদ্ধি না হইবার দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করেন। তন্মধ্যে একটী প্রাকৃতিক বা ভৌতিক কারণ; তাহার উপরে মানুষের হাত নাই। পক্ষান্তরে মানব-চরিত্রের দুর্ব্বলতা—ভুল ভ্রান্তি ও পাপাচরণ প্রভৃতি কারণে যে লোকসংখ্যা চাপিয়া থাকে, তাহার উপর বহুল পরিমাণে মানুষের হাত আছে। যথাযোগ্য রূপে শিশুদেগের লালন-পালন ও যত্ন হয় না বলিয়া সর্ব্বদেশে বালমৃত্যুর সংখ্যা বেশী। আদর্শ রাষ্ট্র শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে, এইরূপ অকাল মৃত্যু বহুল পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। এই আলোচনার ফলে, লোকের চিত্ত মূল মতবাদ পরিহার করিয়া, কিসে দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়—কি করিলে বালমৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস হইবে—এই চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের অভিনয় হয়। তাহাতে ইয়োরোপের প্রত্যেক রাষ্ট্রের বহু লোক নষ্ট হইয়া যায়। শেষ ফরাসী বিপ্লবের বহ্নিমুখে তাহাদের উৎকৃষ্ট জন-শক্তি ভস্মীভূত হইয়া গেলে, দেশের জনবল বৃদ্ধি করিবার জন্য একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়। তখন প্রত্যেক দেশের চিন্তাশক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া যাহাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে, সে দিকে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে। তখনও লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে দেশে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইতে পারে, এইরূপ কোন চিন্তার স্থান হয় নাই।

১৭৯৮ খ্রীঃ মেলথাস্ (Malthus) তাঁহার Essay on the Principles of Population নামক সন্দর্ভ রচনা করেন। তাহাতে তিনি দুইটী কাল্পনিক হিসাব প্রদর্শন

করিয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তির এবং সম্ভাবিত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে একটা বিষম পার্থক্য প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার মতে মানুষের কষ্ট চেষ্টার ফলে ভূমি হইতে যে অনুপাতে বর্দ্ধিত হারে শস্যোৎপন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তদপেক্ষা অনেক গুণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের দেশের উৎপন্ন সমগ্র ফসলকে একটা ব্যষ্টি মাত্রা বলিয়া কল্পনা করিলে, প্রতি পঁচিশ বৎসরে সেই মাত্রার যৌগিক বৃদ্ধিতে ফসলের হার বৃদ্ধি করিয়া লওয়া যাইতে পারে অর্থাৎ ১, ২, ৩, ৪, ৫,... প্রভৃতি স্বাভাবিক সংখ্যাক্রমে বা Arithmetical ratioতে ফসলের উৎপত্তি বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের বর্ত্তমান জন-সমষ্টিকে একটা ব্যষ্টি মাত্রা ধরিলে তবে ক্রমে দ্বিগুণিত ভাবে অর্থাৎ ১, ২, ৪, ৮, ১৬... প্রভৃতি Geometrical ratioতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া আসিবে। উত্তর আমেরিকায় যাইয়া যে সকল লোক উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, ২৫ বৎসরে তাহাদের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। মেলথাস মহোদয় ইহাকেই সম্ভাবিত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির প্রামাণ্য ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু ভূমির উৎপত্তি-বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেন, কোন প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া সে মত সমর্থন করিবার কোন প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তিনি ইহাকে একটা সহজ অভিজ্ঞতা-লব্ধ প্রামাণ্য তত্ত্ব স্বরূপে গ্রহণ করিয়াই এই পার্থক্য প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার এই আলোচনার ফলে লোকের চিত্তে একটা ভীতির সঞ্চার হয় এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের দৃষ্টিও সেই দিকে আকৃষ্ট হয়।

অন্য দিকে ফরাসী বিপ্লবের ঘূর্ণাবর্ত্তে ইয়োরোপের অন্যান্য প্রদেশের সহিত ইংলণ্ডের আদান-প্রদান এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিন্ন হইয়া পড়ে। দেশে গোধূমের চাষ বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে ইহার উপরে উৎকট আমদানী মাশুল ধার্য্য হয়। তাহার ফলে তথায় গোধূমের মূল্য অতিমাত্রায় মহার্ঘ হইয়া উঠে। এই সুযোগে অনেক অনোৎপাদিকা ভূমি ক্রমে আবাদে আসিয়া পড়ে। গোধূমের এই বর্দ্ধিত মূল্য স্থায়ী না করিলে, এই সকল অনোৎপাদিক ভূমি সমূহ চাষ হইতে খসিয়া পড়ার সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে, ১৮১৪ ইং সনে তাহার উপরে আরও আমদানী মাশুল বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য কি না, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। দেশের এই দুর্ম্মূল্যতা স্থায়ী করিয়া, এই সকল অপকৃষ্ট ভূমির যোগান বহাল রাখিতে হইলে মণকরা প্রায় পাঁচ টাকা করিয়া মাশুল বৃদ্ধি করিতে হয়। তখন এই সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টি উৎপাদন ব্যয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, এই দুর্ম্মূল্যতার প্রধান কারণ অপকৃষ্ট ভূমি আবাদে আনা। এই সকল ভূমি হইতে শস্যোৎপন্ন করিতে অত্যন্ত ব্যয়-বাহুল্য পড়িয়া যায়। উৎপাদন ব্যয় পোষাইয়া এই সকল ভূমির উৎপন্ন শস্যের আয়োজন বহাল রাখিতে হইলে দেশের এই মহার্ঘ স্থায়ী করিতেই হইবে। সুতরাং বিদেশ হইতে শস্য-সরবরাহ বন্ধ করিতে হইলে, এরূপ একটা মাশুল ধার্য্য করাও অনিবার্য্য। পরন্তু কৃষকগণ তাহাদের এই নূতন আবাদী ভূমির চাষ রক্ষা করিবার জন্য এই মাশুল বৃদ্ধির অনুকূলে আন্দোলন জুড়িয়া দেয়। তখন Malthus, Recardo এবং

Sir Edward West-প্রমুখ কৃতবিদ্য ও চিন্তাশীল মনীষিগণ এই মাশুল বৃদ্ধির প্রতিকূলে ও বিদেশ হইতে আমদানীর অনুকূলে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাঁহারা নানা যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া প্রমাণ করিয়া দেন যে, বিদেশ হইতে অপেক্ষাকৃত সস্তায় শস্য আমদানী করিলে, দেশের অনেক অপকৃষ্ট ভূমি চাষ হইতে ঝরিয়া পড়িবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু উৎকৃষ্ট ভূমি সমূহ হইতে কম ব্যয় উৎপন্ন করার ফলে দেশের এই দুর্মূল্যতা বিদূরিত হইয়া যাইবে। রিকার্ডো মহোদয় স্বাভিমত সমর্থন করিবার জন্য ভূমির উৎপাদন ব্যয় ও উৎপন্ন ফসলের মধ্যে যে এক কাল্পনিক হিসাবের অবতারণা করেন, তাহাই পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় বিশেষভাবে সমর্থিত হইয়া এই উৎপত্তি-হ্রাস-নিয়মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইহাকেই ভিত্তি করিয়া এই বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্বের আলোচনা হয়।

এক দিকে রাষ্ট্র কারণে দেশের জন-বল বৃদ্ধি করিবার গুরুতর প্রয়োজন, অন্য দিকে উৎকট দুর্মূল্যতার সহিত দেশের লোকসংখ্যা অতিবৃদ্ধিতে এই হ্রাস-নিয়মের ফলে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবার ভীতি, এই সকল বিরুদ্ধ কারণ ও শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে, জাতির কল্যাণ কল্পে কর্ত্তব্য কি, তাহা অবধারণ করিবার জন্য স্থির, ধীর ও চিন্তাশীল মনীষিদিগের চিত্ত প্রকৃত তত্ত্বের অনুসন্ধানে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে। এই শতাধিক বৎসরের গভীর গবেষণার ফলে যে সকল তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তন্মধ্যে জীবের স্থিতি ও বৃদ্ধির হেতুভূত কারণ সমূহকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ দৈহিক কারণ। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ও মর্য্যাদা আয়ুর্ব্বেদ বিস্তায় আলোচিত হয়। কি কি কারণে মানব দেহের সন্তানোৎপাদিকা শক্তির উপচয় ও অপচয় ঘটে, কিম্বা ঘটিতে পারে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাহার বিস্তৃত আলোচনা হয়। এতদ্ভিন্ন জীবের আয়ু, বল, বীর্য্য, কান্তি, পুষ্টি, এবং সংক্ষেপতঃ স্বাস্থ্য ও আরোগ্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় তত্ত্ব এই বিজ্ঞানে আলোচিত হয়। তথাপি আর্থিক স্বচ্ছলতার উপরে লোকের দৈহিক কল্যাণ সর্ব্বাংশে নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ সামাজিক সম্বন্ধ। সামাজিক প্রথা—নিয়ম, আচার-আচরণ মধ্যে কোনগুলি মানব সমাজের সংস্থিতি ও বৃদ্ধির অনুকূল, কোনগুলিই বা প্রতিকূল, তাহার আলোচনা সমাজ-বিজ্ঞানে হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যৌন সম্বন্ধের আলোচনা আয়ুর্ব্বেদেরই বিশেষ প্রতিপাদ্য। দেশের আর্থিক অবস্থার সহিতও এ সকলের বিশেষ নিকট সম্বন্ধ আছে। তৃতীয়তঃ আর্থিক কারণ। ইহার সহিতই এই অর্থ বিজ্ঞানের বিশেষ সম্বন্ধ। সর্ব্বপ্রকার আর্থিক কারণই মানুষের কর্ম্ম চেষ্টার ফলে উৎপন্ন সামগ্রীর সহিত ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত আছে। জীবের স্থিতির এবং বৃদ্ধির অনুকূলে যত প্রকার যে বস্তুর আবশ্যক হয়, তন্মধ্যে যেগুলি শ্রমলব্ধ,—পরিশ্রম করিয়া যে সকল উৎপন্ন করিয়া লইতে হয়, তাহাদের সম্যক যদি মানুষ উৎপন্ন করিয়া লইতে পারে, তাহার যদি কোন প্রকার কোন অপ্রাচুর্য্য না ঘটে, তবে আর্থিক কোন কারণ যে স্থিতি ও বৃদ্ধির প্রতিকূল, এইরূপ বলা যায় না। দেশের অতি নিম্নস্তরের লোকেরও অন্ন বস্ত্রের ও আরামে থাকিবার কোন অভাব না থাকিলে, তবে দেশের আর্থিক অবস্থা লোকস্থিতি ও

বৃদ্ধির অনুকূল, এইরূপ নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। এই উৎপত্তি-হ্রাস-নিয়ম এইরূপ অবস্থা লাভের প্রতিকূলে কার্য্য করিতে থাকে। সুতরাং তাহার সহিত ইহার প্রকৃত সম্বন্ধ কি, তাহাই বর্ত্তমান সমস্যা।

মেলথাস যে ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাই নূতন ভাবে এবং সম্প্রসারিত আকারে পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক জগতে আলোচিত হইয়া আসিতেছে। মেলথাসের সময়ে দেশের লোকবৃদ্ধির সহিত বার্ষিক ভূমি হইতে কতটা বর্দ্ধিত পরিমাণে কৃষিজাত সামগ্রী উৎপন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহাই বিশেষ প্রতি-পাদ্য ছিল। এই সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া তিনি যে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহাকেই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক ভাষায় এইরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ দেশের প্রয়োজনের হিসাবে শ্রমজীবীর সংখ্যা অনেক প্রবর্দ্ধিত আকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেশের প্রয়োজনে কোন সামগ্রীরই অপরিমিত পরিমাণ আবশ্যক হয় না। সেই সময়ের জন্য প্রত্যেক সামগ্রীরই একটা পরিমিত পরিমাণের আবশ্যকতা উপস্থিত হয়। তাহাদের পরিমাণের একটা স্থিরতা আছে। লোকে সচরাচর যাহা ব্যবহার করে, যাহা তাহাদের অভ্যস্ত জীবনের উপজীব্য, তাহার উপরেই তাহাদের বর্ত্তমান জীবন-যাত্রা (Place of living) নির্ভর করে। তাহাতেই তাহাদের প্রয়োজন। মানুষের ভোগ্যাদর্শ বা Standard of living তখনও অনেক উপরে থাকিতে পারে; কিন্তু ইহা তাহাদের মানসকল্পিত বস্তু, তদ্দ্বারা বর্ত্তমান প্রয়োজন (demand) নিয়োজিত বা নির্দ্ধারিত হয় না। বর্ত্তমান শিক্ষা দীক্ষা অনুসারে মানুষ যতটা আয়োজন করিয়া উঠিতে পারে, তাহার উপরেই তাহার বর্ত্তমান অভ্যস্ত জীবন বা plan of living সম্পূর্ণ নির্ভর করে। দেশের এই শিক্ষা দীক্ষানুসারে ভূমি হইতে যতটা সামগ্রী উৎপন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তদপেক্ষা বহু বেশী লোকের অভ্যুদয় ঘটিতে পারে, ইহাই মেলথাসের অভিমত।

দ্বিতীয়তঃ যদি এই প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তবে নিম্নস্তরের মধ্যেই ভিড় হইয়া উঠিবে, এবং তাহার ফলে তাহাদের মধ্যে নিদারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবে। কেন না, বর্ত্তমান অবস্থায়ই এই শ্রেণীর লোকের গ্রাসাচ্ছাদন অতি কষ্টে নির্ব্বাহ হয়; তাহার উপরে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে, তাহা যে অতি ভীষণ আকার ধারণ করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং দেশে প্রয়োজনাতিরিক্ত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, দেশে মহামারী ইত্যাদি উপস্থিত হইয়া, প্রকৃতির চাপ আরম্ভ হইবে।

মেলথাস একমাত্র কৃষিকার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কৃষিকর্ম্মই মানবের একমাত্র উপজীব্য নহে। কৃষিক্ষেত্র হইতে সাক্ষাৎ ভাবে যে সকল সামগ্রী উৎপন্ন করিয়া লওয়া হয়, তাহাই যদি জীবের একমাত্র উপভোগ্য সামগ্রী হইত, তবে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত যে অনেকটা যুক্তিযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভূমি হইতে সাক্ষাৎ ভাবে যাহা পাওয়া যায় এবং তন্মধ্যে তাহার যে অংশে মানবের আহার্য্য কি ব্যবহার্য্য নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইত, শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহারও অনেক সামগ্রী ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কত শত শত

নূতন ও উপাদেয় সামগ্রী যে উদ্ভাবিত হইয়া আসিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ মেলথাসের এই সকল অসম্পূর্ণতা ও একদেশদর্শিতা অবলোকন করিয়া সমগ্র ও সম্প্রসারিত আকারে দৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা বর্ত্তমান উন্নতিশীল দেশ সমূহ যেভাবে কৃষি শিল্পকলা ক্ষেত্রে উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই উৎপত্তি-হ্রাস-নিয়মের সহিত লোকস্থিতি ও বৃদ্ধির মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ কি, তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মেলথাসের সিদ্ধান্ত মত এই নিয়ম লোকবৃদ্ধির প্রতিকূলে একটা বড় চাপ বা check। ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই নিয়মের প্রভাব একান্ত অপরিহার্য্য,তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে অপরিমিত পরিমাণে ধন ও জন লইয়া বর্দ্ধিত হারে কৃষিজাত শস্যাদি কিম্বা শিল্পজাত সামগ্রী উৎপন্ন করিয়া লওয়া যায় না। যত প্রকার যে ক্ষেত্রে মানবের কর্ম্ম চেষ্টার ফলে কোন প্রকার বস্তু উৎপন্ন করিয়া লওয়া যাউক না, সর্ব্বক্ষেত্রেই এই নিয়মের প্রভাব অনুভূত হইবে। তাই Dr. Cannan বলিয়াছেন "Mankind cannot produce an unlimited amount of caleco any more than an unlimited amount of wheat." ফলতঃ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন কিছুই অপরিমিত মাত্রায় উৎপন্ন করা সম্ভব নহে। আর যে সকল সমাজ তথাকথিত পিতৃপিতামহের আচরিত পন্থা মাত্র অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে, যে সকল সমাজে লোকের উদ্ভাবনী শক্তি শিথিল ও নিষ্প্রভ হইয়া সমগ্র সমাজকে একটা অবসাদের মোহ তমিস্রায় সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, সেই সকল সমাজে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই এই প্রাকৃতিক অভিসম্পাতের সম্মুখীন হইতেই হইবে।

কিন্তু যে সকল সমাজে লোকের কর্ম্মশক্তি নিয়ত প্রবুদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ থাকে, নিয়ত কৃষি শিল্পের উন্নতি বিহিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের অবস্থা অন্যরূপ। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ উন্নতিশীল দেশে যে ভাবে উত্তরোত্তর শিক্ষা দীক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তার ও উৎকর্ষ সাধিত হইয়া আসিতেছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই এই প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত লোকস্থিতি ও বৃদ্ধির মধ্যে একটা নূতন ভাবে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে জাতির কর্ম্ম-শক্তি প্রবুদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ থাকিলে, এই নিয়মের প্রভাবানুযায়ী কার্য্য ফল বিস্তারের ক্ষেত্র উত্তরোত্তর দূরে নিক্ষেপ করিয়া জীবস্থিতি ও বৃদ্ধির অনুকূল ভাবে কৃষিশিল্পজাত সামগ্রী উৎপন্ন করিয়া লওয়া যায়। বর্ত্তমান সমস্যাই এই যে, কত অল্প স্থানে অধিক লোকের অন্ন সংস্থান করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহার উপায় সকল উদ্ভাবন করিয়া লওয়া। উন্নতিশীল দেশসমূহ এই ভাবেই উন্নতির দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। এই সকল সমাজে উত্তরোত্তর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলেও লোকের অন্নকষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং বর্ত্তমান অভ্যস্ত জীবন (place of living) ক্রমাগত উন্নত হইতে উন্নততর গ্রামে লইয়া যাওয়া যায়। এই সকল সমাজেও উন্নতি করিতে করিতে আকস্মিক এক একবার অবসাদ আসিয়া তাহার অগ্রগতি মন্দীভূত হইয়া না আসে, তাহা নহে। কিন্তু তখনই কোন প্রয়োজন

উপস্থিত হইলে, পুনরায় তাহার কর্ম্মশক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া অভিনব উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহাই উন্নতিশীল সমাজের গতিক্রম। এই গতিক্রমেই বর্ত্তমান উন্নতিশীল জাতি সমূহ বৈষয়িক জীবনে উন্নতি বিধান করিয়া আসিতেছে।

এই সম্বন্ধটাই Prof. Geddings তাঁহার Sociology নামক গ্রন্থে এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। "The statement of the Malthusian law therefore must include both a cause recognizing man's desire to improve his material condition and a limiting condition, like that which is always included in the formula of the diminishing return of land. So long as agricultural methods and machinery are improving, land may yield increasing return, *but in any given state of industry and arts*, increasing applications of labour and capital beyond a certain limit fail to bring forth proportional rewards. In like manner the corrected Malthusian formula is: In any state of given industry and the arts population tends to increase faster than it is possible to raise the general plane of living. Or to put it in the technical phasiology of the latest economics: As long as a industry is kinetic (as it can only be under the regime of private initiative and free competition) a population may indefinitely increase while indefinitely bettering its material condition and the prophets of a socialistic Millinium may sneer at Malthus, when industry is static, as socialism would make it for ever, the full vigour of Malthusian law must be felt and socialism must prove to be only the negative complement of the perpetual motion delusion." (p 336)। সুতরাং তাঁহার মতে ব্যক্তিগত সহজ ও স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দেশের কর্ম্মশক্তি নিয়ত প্রবুদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ থাকিয়া ক্রমাগত উন্নত হইতে উন্নততর পথ অবলম্বনে কৃষিশিল্প কার্য্য সমূহের অনুশীলন ও পরিচালন করিলে, দেশে উত্তরোত্তর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলেও লোকের ক্রমিক উন্নতির বিরাম হয় না, তাহাদের বৈষয়িক জীবন ক্রমাগত উন্নত হইতে থাকে। কিন্তু যে সকল সমাজের গতিক্রম "যথা পূর্ব্বং তথা পরঃ" ভাব অর্থাৎ সমতা (Static condition) প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহাদের পক্ষে মেলথাসের এই নিয়মের কার্য্যফল অনুভূত হওয়া স্বাভাবিক; সেই সকল সমাজে উৎপন্ন খাদ্য দ্রব্যাপেক্ষা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া, লোকের পূরামাত্রায় কষ্টের কারণ উপস্থিত হইবে। ইহাই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত এই উৎপত্তি-হ্রাস-নিয়মের প্রকৃত সম্বন্ধ।

শ্রীদ্বারকানাথ দত্ত।

বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু বিধবা।

"যে ফুল না ফুটিতে, ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।"
—রবীন্দ্রনাথ।

বিধবা রমণীর জীবন!—তাহার সমগ্র-টুকুই ত ঘোর অন্ধকার। তাহার বর্ত্তমান অবস্থা নয়ন দেখিয়াও দেখিতে চাহে না; ভবিষ্যতের বিষয়ে কষ্টকল্পনাও স্পন্দহীন; তবে একমাত্র অতীতের কথা—তাহাও কেবল মর্ম্মন্তুদ যাতনারই স্মৃতি আনিয়া দেয়। বিধবার জীবনে আশা নাই, বাসনাও চির-দিনের জন্য হৃদয় হইতে মুছিয়া গিয়াছে। এ জীবন প্রলয়ঙ্করী অট্টলীলার এক শোকা-বহ শেষ চিহ্ন—এক অনাবশ্যক অস্তিত্ব। এবম্প্রকার জীবনের প্রয়োজন কি? ইহা না থাকিলে কি ভাল হইত না? বিধবার সকলই যখন পুড়িয়া গিয়াছে, তখন অসার অস্তিত্বে ধরিত্রীর ভার বৃদ্ধি করিয়া কাজ কি? মানবের চিন্তার আবেগ অপ্রতিহত বিহ্বলতায় অধীর হইয়া বিধবাকে স্বামীর চিতানুগমনে সম্মতি প্রদান করিলেও বিধবার জীবনে বিধাতার প্রয়োজন ছিল।

"A dew-drop does the will of God,
As much as a thunderstorm."

মানুষ বিধবাকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করি-লেও ভগবান্ অনন্তকাল ধরিয়া সকলের কর্ণে যে কথা বলিয়া আসিতেছেন, তাহা ইংরাজ কবি টেনিশনের ভাষায়

"That nothing walks with aimless feet;
That no one life shall be destroyed,
Or cast as rubbish to the void."
—*Tennyson*.

অথবা

"সকলি সৃজেছে, ভাই, প্রিয়তম বিধি,
সকলি তাঁহার কাছে হৃদয়ের নিধি।"

মহাত্মা লর্ড বেণ্টিঙ্ক-নিবারিত সতীদাহ ভারতের অন্ধযুগের বার্ত্তা জ্ঞাপন করে। পতনের শেষ সীমায় আসিয়া মানুষ এমনি করিয়াই পথ হারাইয়া বসে। অজ্ঞানতাকে জ্ঞান বলিয়া ধরিয়া লয়, বিধাতার জন্য অর্ঘ্য আনিয়াও দানবের পায়ে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায়। মানবের এবম্বিধ মোহ নিপীড়-নের সময়ই প্রবোধয়িতার প্রয়োজন হয়। যে আচার কেবলমাত্র বীরযুগে সম্ভবপর ছিল, বিলুপ্ত শৌর্য্য ও পরপদপীড়িত ক্ষুদ্র-প্রাণতার দিনে বলপ্রয়োগে তাহা বাঁধিয়া রাখিলে কখনই সুফল প্রসব করিতে পারে না। অসংযত স্বার্থের আসুর তাড়নে ভারত-বাসী এই সময়ে সতীদাহের প্রচার স্থির রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। সতীদাহের অন্তরালে অনাবিল ও স্বর্গীয় পাতিব্রত্য প্রকাশমান থাকিলেও, মহাত্মা বেণ্টিঙ্ক যে সতীদাহের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন, তাহা এক বীভৎস স্বার্থান্ধতা—তৎকালীন মানব সমাজের একটী মহা স্ফোটক। সক-লেই অবগত আছেন, ইউরোপের মধ্যযুগে বহুবিধ কুসংস্কার তদ্দেশীয় সমাজের হৃদয়-শোণিত পান করিয়াছিল; Heresy Act-এর প্রতি অক্ষরই ইউরোপের পৈশাচিক ধর্ম্মান্ধতার পরিচয় প্রদান করে সত্য—তথাপি মূক ও বধিরগণের আত্মা নাই—এই ভ্রান্ত কুসংস্কার এক সময়ে ইউরোপীয় সমাজের স্নেহ ও প্রীতির বন্ধন পর্য্যন্ত একে-বারে উৎসন্ন করিতে বসিয়াছিল। কিন্তু

জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল পাপাচার তিরোধান করিয়াছে। সেইরূপ ভারতেও অন্ধযুগ বিগত হইলে, জ্ঞানোদয়-যুগ বা Renaissance নবপ্রবেশ করে। মহাত্মা লর্ড বেণ্টিঙ্কের সৌজন্যে বিধবার ললাটের কালিমা মুছিয়া গিয়াছে, জীবনের উদ্দেশ্য অনেকটা স্থিরীকৃত হইয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজে নূতন যুগের প্রবর্ত্তনা।

অতীতের কোন্ বিস্মৃত কাল হিন্দু বিধবার চিন্তায় প্রথম ক্ষোভিত ও অনুপ্রাণিত হয়, তাহা পুরাতত্ত্ববিৎ নির্ণয় করিবেন, কিন্তু এ বিষয় সত্য যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিধবার জীবন মানবের চিন্তারাশিকে আকর্ষণ করিয়াছিল। অতি প্রাচীন কালেই মৈত্রেয়ী গার্গী আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্রের সন্ধান পাইয়া জগতের সমক্ষে তত্ত্ববিচারে সাহসিনী হইয়াছিলেন। বিধবার নৈতিক ও পারত্রিক জীবন-যাপন-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্র চির জাগরিত। আদি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা মহর্ষি মনু হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বিজ্ঞানেশ্বর জিমূতবাহন পর্য্যন্ত, যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাকে সাধারণ মানবমণ্ডলীর সহিত উপেক্ষিতা বিধবাকুলের কথাও ভাবিতে হইয়াছিল। এই সকল বিষয় হইতে আমরা নির্ভয়ে অনুমান করিতে পারি যে, প্রাচীন ভারতে হিন্দু বিধবা নারী শুধু অনাদর ও উপেক্ষার জীবনই যাপন করেন নাই। বিধবাগণ যদি বিশ্বপ্রপঞ্চে চিতানলের ভস্মকণা হইয়াই জীবনের চরম সদ্গতি লাভ করিতেন, তাহা হইলে শাস্ত্রকারগণ কখনই সহস্রাব্দীর পর সহস্রাব্দী ধরিয়া বিধবাকুলের কথা ভাবিতেন না। তৎকালে আর্য্য বিধবা নারী আপন আপন কর্ম্মাসনে আসীন হইয়া কেন্দ্রচক্র রূপে সমগ্র হিন্দু সমাজকে পরিচালিত করিতেন এবং সেই কারণেই প্রাচীন সমাজের ঋদ্ধি ও সিদ্ধির মোহন ধ্বনি আমাদের কর্ণকুহরে আজও প্রবেশ করিতেছে।

হিন্দু জাতির ধর্ম্ম যেরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সমাজ যেমন কাল ও পারিপার্শ্বিক সমবায়ে গঠিত, আচার-ব্যবহার যেরূপ স্বাস্থ্যের প্রতি সুতীব্র দৃষ্টি রাখিয়া স্থিরীকৃত, তাহাতে অন্ধযুগে অন্যায় রূপে বিড়ম্বিত হইলেও, বিধবার জীবন আজও হিন্দু সমাজের স্থিতিস্থাপকতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বঙ্গবিধবা বাঙ্গালার একান্ন পরিবারের গৃহিণীরূপে অবস্থান করিয়া সংসারে শান্তি ও সমন্বয়ের পীযুষ উৎস সৃষ্টি করিয়াছে। এই দগ্ধাদৃষ্ট নারীকুলের জীবনই বঙ্গের চিন্তা-প্রবাহে নবীন যুগ আনয়ন করিয়াছে। সাহিত্যের দৃষ্টি স্পষ্টতর করিয়া দিয়াছে। এই সকল নারী জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, সর্ব্বশূন্যা বিধবার জীবনে কত কর্ম্মশক্তি, কত স্নেহ, ও কত স্বর্গীয় পবিত্রতা নিহিত আছে। হিন্দুর সমাজে বিধবার জীবন এখন এত স্বাভাবিক, এত অনুদ্‌ঘাতী যে, তাহাদের জীবনের—বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতার বিষয় চিন্তা করাকেই আমাদের নিকট সত্যের অতি অনুসন্ধান বলিয়া মনে হয়। এই নারী জাতির প্রভাব আমাদের লক্ষ্যের অন্তরালে সমাজ-শরীরে প্রবিষ্ট হইতেছে বলিয়াই আজ আমরা বঙ্গের কাব্যকলার মধ্য দিয়া জ্যোতিঃ-চ্ছটা ফুটিয়া বাহির হইতে দেখিতে পাইতেছি।

চিন্তাশীল সমালোচক মহাত্মা টেন (Taine) বলিয়াছেন যে, বস্তুতঃ সাহিত্য জিনিসটি যুগধর্ম্ম বা Spirit of the time, বা Zeitgiest, জাতীয় চিন্তারাশির সারাংশ

সাহিত্যের মধ্য দিয়া চিরস্থায়ী অক্ষয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। দেশের বা সমাজের সুখ দুঃখ কবি-হৃদয়ে এক বিক্ষোভের তরঙ্গ তুলিয়া দেয়, সেই বিক্ষোভ তরঙ্গই তাহাদের কবি-হৃদয়ের তন্ত্রীগুলিকে বাজাইয়া থাকে। কবির কাব্যকলায় কোন বিষয় স্থান পাইলে, তাহাকে আকস্মিক বলা যাইতে পারে না— দেশের বা সমাজের সুখসঙ্গীতি বা বিলাপ বাণী কবির কাব্যেই ব্যক্ত হইয়া থাকে। কারণ কবিগণই দেশের বা সমাজের যুগ-বার্ত্তা বিঘোষণের বসন্ত দূত। শুধু তাহাই নহে, কোন সাময়িক ঘটনার যথার্থ ইতিহাস আলোচনার বাসনা থাকিলে, কবির কাব্যেই তাহার পূর্ণতা লাভের সম্ভাবনা, যেহেতু কোমল হৃদয়ের সহজ, নিরপেক্ষ, ও স্বাভাবিক নিঃস্পন্দ এখানেই স্থান লাভের প্রকৃত অধিকারী। মর্ম্মর-মঞ্চে খোদিত ইতিহাস অথবা মেঘস্পর্শী কীর্ত্তিমন্দির কালে বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু কবির কাব্য মনুষ্য হৃদয়ে যে স্বপ্ন তরঙ্গ তুলিয়া দেয়, অনন্ত কালও তাহা ধ্বংস করিতে পারে না। ময়বিরচিত ইন্দ্রপ্রস্থের সভামণ্ডপ নাই; কিন্তু কবির মানস সৃষ্টি মহাভারতকে মানবের স্মৃতি ভুলিতে পারিতেছে কি? ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন—

"A toiler dies in a day,
The dreamer lives for ever."
—*Old Ballads.*

অথবা

"দানবী শক্তি গড়িয়া তুলিল বিচিত্র তোরণ,
কাল তাহা করিল ক্ষয়
ভাবুকের চির প্রীতি করে স্বপ্নরাজ্য সৃজন
ধরাতে রহিবে অক্ষয়।" *

ভগবান কৃষ্ণচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম বঙ্গ-সাহিত্যে অরুণোদয় সূচনা করে। তৎকালীন বঙ্গসাহিত্য এই অনাবিল প্রেমের বার্ত্তাই আমাদিগকে জ্ঞাপন করে। এ সময়ের সাহিত্যকে বঙ্গসাহিত্যে ধর্ম্ম জাগরণ বা Religious movement in Bengali Literature বলা যাইতে পারে। এই বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে মহাকবি চণ্ডীদাসের কাব্যেই আমরা বঙ্গবিধবার প্রথম সাক্ষাৎকার লাভ করি। এক রজক বিধবা এই মহাকবির জীবনে কবিত্ব-ধারা খুলিয়া দেয়। বর্ত্তমান রুচির মানদণ্ড বা criterion পরিত্যাগ করিলে, আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয় যে, রজকিনী বিধবার প্রেমাণু-প্রাণনা না থাকিলে হয়ত আমরা আজ বাণীর বরপুত্র চণ্ডীদাসের মধুর মধুপগুঞ্জন শুনিতে পাইতাম না এবং বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীন গৌরবের বিষয় অনুভব করিতে পারিতাম না। কবির নিজ ভাষায়—

"তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও পিতৃমাতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারই ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥"

আর সেই নিরক্ষরা রজকিনীর জীবনেও সে এক ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত। নিরক্ষরা বিধবার কণ্ঠেও বাণীর অধিষ্ঠান হইল—

"আমি অতি হীন পীরিতি অধীন,
পীরিতি আমার গুরু।
এ তিন আখর হৃদয়ে যাহার
সে জনা কল্পতরু॥"

* 'The modern French critic Ramaine Rolland is furiously up against such a proposition. He says—'National literature is diabolical falsehood. Concealment of facts and exaggeration of circumstances are easily passed as national truths through the hands of literatuer,'

ইটালীর মহাকবি দান্তের (Dante) কাব্যেতিহাসেও এইরূপ ঘটনারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দান্তের মানসী-প্রতিমা বিয়াত্রিচের (Beatrice) পবিত্র স্মৃতিই মহাকবির কাব্যনন্দন রচনা করিয়াছিল। ইহা মতিভ্রম নহে, কাব্যমায়ার স্বপ্ন-প্রহেলিকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, কৃত্তিবাস ও কাশীরাম তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের রুচি ও নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই মহাকাব্যদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন। এ কারণে তাঁহাদিগকে অনেক স্থল পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র নূতন করিয়া কিছু কিছু জুড়িয়া দিতে হইয়াছিল। মহাকাব্যদ্বয়ে বিধবা-জীবনের সুন্দর সুন্দর আলেখ্য চিত্রিত থাকিলেও, উহা অনুবাদ মাত্র। সুতরাং এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অনুসন্ধান সমীচীন হইবে না। কবি ক্ষেমানন্দের—"মনসা মঙ্গলে"ই বঙ্গের বিধবা-জীবনের নিখুঁত তথ্য কিছু অবগত হওয়া যায়। বঙ্গের আদর্শ সতী বিধবা বেহুলার স্বামীর জন্য কি কঠোর সাধনা। সংসারের সহস্র প্রলোভন—বিভীষিকার অনন্ত ফনা উত্তোলন করিয়াও তাহাকে স্বামীর পদানুধ্যান হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। কবির অনুপম আখ্যান স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে যে, সতীত্ব তেজের নিকট দেবতার বাদও হীনতা স্বীকার করে। আরও দেখিতে পাই, চাঁদসওদাগরের অপর ছয়টী বিধবা পুত্রবধূ শ্বশুর গৃহেরই অলঙ্কার। পুত্রশোকাতুরা শ্বশুর শ্বশ্রূর শোকের সান্ত্বনা, বার্দ্ধক্যের শ্রান্তি অপনোদনে ভক্তিমতী সেবিকা। একান্নভুক্ত পরিবারের ছয়টী বিভিন্ন রক্তসম্বন্ধহীন রমণী কুৎসা কলহ বিরত হইয়া কি আদর্শ জীবনই যাপন করিতেছেন। বিধবা হইয়াও হিন্দু পুরঙ্গনাগণ অনাবিল হৃদয়ে সংসারের সুখশান্তি স্থির রাখিতে পারে কি না, কবিবর এ সন্দেহও নিরসণ করিয়াছেন। কবি ক্ষেমানন্দ সম্বন্ধে বলিতে হয় যে, তিনি বঙ্গের অর্দ্ধ শিক্ষার যুগে আবির্ভূত হইয়াও এমন একটী আদর্শ লোকশিক্ষার জন্য গড়িয়াছিলেন যে, সভ্যতার কোন অবস্থাই ইহার প্রতি অবজ্ঞার হাসি হাসিতে পারিবে না।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, এটী সাহিত্যে ধর্ম্মজাগরণের যুগ। এ যুগের সাহিত্যে সমাজের অন্যান্য বিষয়ক চিন্তার বড় একটা সাড়া পাওয়া যায় না। বঙ্গসাহিত্যে বিধবার প্রকৃত প্রভাব অনুসন্ধান করিতে হইলে, জ্ঞানোদয় যুগের সন্ধান লইতে হইবে। এই যুগেই জগন্মান্য রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। মহাপ্রভু চৈতন্যের যুগকে ধর্ম্ম জাগরণে অভিহিত করিলে, রামমোহন-বিদ্যাসাগর যুগকে ধর্ম্ম ও সামাজিক জাগরণের যুগ বলা যাইতে পারে। কাজেই এ যুগের সাহিত্যকে আমরা Socio Religious movement in Bengali Literature আখ্যা প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মাগণের প্রাণপণ চেষ্টায় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে উদারচেতা বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করিয়া দেন। সতীদাহের ভয়াবহ দৃশ্য বঙ্গসাহিত্যে শরীর পরিগ্রহ না করিলেও, এ ব্যাপার সুদূর ইংলণ্ডবাসীর হৃদয়ে কি বিক্ষোভ তুলিয়াছিল, তাহা কবিবর Southeyএর Curse of Kehama কাব্য পাঠ করিলেই উপলব্ধি হয়—

"The young Neahin !
They strip her ornaments away,
* * *

Oh sight of misery !
You cannot hear her cries, their sound
In that wild dissonance is drowned ;
But in her face you see
The supplication and agony,
Her arms contracted now in fruitless strife,
Now wildly at full length
Towards the crowd in vain for pity spread,
They force her on, they bound her to the dead."—*Southey.*

ইউরোপের নবীন আলোক আসিয়া বাঙ্গালী হৃদয়ে নব নব ভাব সন্দীপন করিতে লাগিল, চিন্তার ধারা ফিরিয়া গেল, জীবনের লক্ষ্য নবীন পথের সন্ধান পাইল। এটী যুগ পরিবর্ত্তনের কাল। ওদিকে রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার জগৎ সাম্রাজ্যের বসন্ত প্রয়াণ। ইউরোপীয় বিবুধমণ্ডলীর নব নব জ্ঞানমালা অংশুজাল বিস্তার করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে সমুদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। সে জ্ঞানের অমৃতাস্বাদে ভারতবর্ষও বঞ্চিত ছিল না। দেশে একটী ঐন্দ্রজালিক শক্তির তরঙ্গ বিন্যাস ঘটিয়াছিল। হিন্দুগণ তাঁহাদের সংস্কারগুলি কালোপযোগী করিয়া লইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় ও প্রচার আরম্ভ হইল, খ্রীষ্টীয় মিশনারী সম্প্রদায় মহা আড়ম্বরে স্বধর্ম্ম প্রচারে যত্নশীল হইলেন। এরূপ সময়ে দেশে যে একটী চিন্তাসজ্ঘাত উপস্থিত হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি ? এ যুগধর্ম্ম স্থিতিশীল ও উন্নতিকামী উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরই মানসিক গতির পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিল। উভয় দলের মধ্যে ভয়ানক তর্কযুদ্ধ চলিয়াছিল। বঙ্গের বরেণ্য জ্যোতিষ্ক মহাত্মা বিদ্যাসাগর ১৮৫৬ অব্দে হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য আবেদন করিলেন, অমনি সমগ্র দেশে যুগপৎ এক আনন্দ ও বিভীষিকার রোল পড়িয়া গেল।

বিধবা বিবাহ আইনের আবেদন পত্রে সহস্র ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল, কিন্তু ইহার প্রতিকূল আবেদন পত্রে রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর-প্রমুখ ৩৬৭৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, অথচ বিদ্যাসাগরই বিধবা বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ করাইয়া লইলেন। সহজেই অনুমান হয়, তখন দেশে কি তুমুল আন্দোলন, কি অসাধ্য সাধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা, ধ্রুবসিদ্ধির কি অমানুষিক সাধনা চলিতেছিল। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের "সোমপ্রকাশ" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "তত্ত্ববোধিনী" প্রভৃতি পত্রিকা উন্নতিকামী উদার নৈতিক দলের জয় ঢক্কা বাজাইতেছিল, আবার অপর পক্ষে "পাষণ্ডদলন", "প্রভাকর" প্রভৃতি পত্রিকা প্রতিবাদের অত্যুগ্র কর্ণকুহরভেদী শিঙ্গা ফুঁকিতেছিল। বহুদিন ধরিয়াই মসীযুদ্ধ চলিয়াছিল—বিধবা বিবাহ আইনের ভবিষ্যৎ সকলেই অবগত আছেন ; কিন্তু এই আন্দোলনই বঙ্গভাষাকে নবজীবন দান করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে মহা শক্তিসম্পদে ভূষিত করিয়াছিল। এই বিচিত্র আন্দোলন ঘটিয়াছিল বলিয়াই আজ আমরা বঙ্কিম, রমেশ, হেমচন্দ্রের গৌরবে সমগ্র জাতিকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি। মানবের স্থির সংকল্প দেবতার আশীষ মাথায় লইয়া কি অসাধ্যই সাধন করিতে পারে, বিদ্যার সাগর ঈশ্বরচন্দ্রের করুণাপ্রসূত কার্য্যাবলী চিরকালই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

"ভারত শ্মশান মাঝে আমি রে বিধবা

বালা"—বালবিধবার এই হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ একদিন সমগ্র ভারতবর্ষকে অসহনীয় যাতনায় ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। তাই রাজপুরুষগণ পর্য্যন্ত ক্রন্দনের গভীরতায় ও মর্ম্মপীড়নে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ পর্য্যন্ত কাপড়ের পাড়ে "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে" প্রভৃতি কবিতাংশ বয়ন করিয়া শ্লাঘ্য মহাপুরুষের যশোগীতি প্রচার করিয়াছিল। ফলতঃ তৎকালীন আন্দোলন আলোচনামূলক সংবাদপত্রগুলিই বঙ্গসাহিত্যকে এমত দ্রুত উন্নতির শিখরে আরূঢ় করিয়াছে। যাহা শতাব্দীর চেষ্টায় সম্ভব হয় না, দশ বৎসরে অধ্যবসায় ও আকুল অনুপ্রাণনা তাহা নিষ্পন্ন করিল। ধন্য তুমি মা বিধবা রমণী! মনীষী ইমারসন (R. W. Emerson) বলিয়াছেন—

"So nigh is our grandeur to our dust,
So near is God to man,
When duty whispers low. "*Thou must*"
The youth replies *I can.*"
—*R. W. Emerson.*

নবপর্য্যায়ের কবিগণের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তই সমধিক প্রতিভাবান্। তাঁহার জীবনের অণুতে অণুতে বিলাতী ভাব প্রবেশ করিয়াছিল—এবং তিনি সেই সমস্ত বিলাতী ভাবগুলিকেই জাতীয় ভাষায় আনয়ন করাতেই জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। স্বকীয় বাসনাবলের আহুতি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ও বিদেশিনী বিবাহ ব্যতীত অন্য কোন সামাজিক আন্দোলন তাঁহাকে বিচলিত করে নাই—তিনি সাহিত্যের চিন্তাতেই বিভোর ছিলেন। সেই কারণে কবি "ইন্দ্রজিতকে জয়ডালি" ও "লক্ষ্মণের মুখে কালি দিলেও" চিরন্তন প্রথামতে প্রমীলাকে স্বামীর চিতায় আরোহণ করাইয়াছিলেন—

প্রমীলা—

"কহিও মায়েরে মোর এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এতদিনে। যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতামাতা, চলিনু লো আজি তাঁর
সাথে;—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?"

ইহা বেণ্টিঙ্ক-নিবারিত সতীদাহ নহে,—দানববালার জহরব্রত।

নবজাগরণ যদি কোন কবি-হৃদয়ের উপর কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা কবিপ্রবর হেমচন্দ্র সম্বন্ধেই সমধিক প্রযোজ্য। তিনিই হতভাগ্য স্বদেশবাসীর সহস্র অঙ্গের পতন ও নির্য্যাতন অবলোকন করিয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাই অজস্র সংগীত-ধারায় হৃদয়ের যাতনা প্রকাশ করেন এবং তাহাই সকলের নিকট আজও মধুর লাগে। "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought." "এ দুঃখের ভূমণ্ডলে, শোকে পরিপূর্ণ হলে, মধুর সঙ্গীত হয় কতই মধুর"—হেমচন্দ্র। কবি হেমচন্দ্র কিন্তু জাতীয় জাগরণের মধ্যে নিরাশার ধ্বনিই শ্রবণ করিয়া শুধু আক্ষেপের গানই গাহিয়াছিলেন; ভারত-বিধবার বিষয়ে—

"বাঁধিয়া রেখেছ বামা রাশি রাশি,
অনাথা করিয়া গলে দিয়া ফাঁসী,
কাড়িয়া লয়েছ কবরী, কঙ্কণ,
হায়! বাজু বালা দেহের ভূষণ
অনন্ত দুঃখিনী বিধবা নারী।"

* * *

"এ হেন স্তুকাণ্ড মহীখণ্ড মাঝে,
নাহি কিরে কোন বীরাত্মা বিরাজে,

এখনি উঠিয়া করে খণ্ড খণ্ড,
সমাজের জাল করাল প্রচণ্ড,
স্বজাতি উজ্জ্বল করিয়া ভবে।"

আবার অন্যত্র গাইয়াছেন—

"ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি ওই রে!
না হ'লে এমন দশা নারী আর কই রে!"
ইত্যাদি

"হায় রে আমার যদি থাকিত সম্পদ
মিটাতাম চিরদিন মনের সে সাধ;
সোণার প্রতিমা গড়ি বিধবা নারীর,
রাখিতাম স্থানে স্থানে ভারতভূমির;
বিদেশের স্ত্রীপুরুষ এদেশে আসিত,
পতিব্রতা বলে তারে নয়নে হেরিত।"
ইত্যাদি

তৎকালের নবীন যুবকগণ ইউরোপীয় ভাবস্রোত দ্বারা যে যেরূপ ভাবে উদ্বোধিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেই ভাবেই চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। কবিবর হেমচন্দ্রের নিকট নিম্ন প্রকার ছবিই যেন আদর্শের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল।

যথা—"দেখ্ চেয়ে দেখ হোথা একবার,
প্রফুল্ল কোমল কুসুম আকার,
যুনানী মহিলা হয় পারাপার
অকূল জলধি অকুত ভয়ে।
ধায় অশ্বপৃষ্ঠে অশঙ্কিত চিতে
কানন কন্দর উন্নত গিরিতে
অপ্সরা আকৃতি পুরুষ সেবিতা
সাহিত্য বিজ্ঞান সঙ্গীত ভূষিতা
স্বাধীন প্রভাতে পবিত্র হয়ে॥"
—হেমচন্দ্র।

বিষাদের বাস্তব কারণ সহস্রপুঞ্জে পৃথিবীতে বর্ত্তমান। যুবকগণের চিন্তাস্রোত এখানে বাধা পাইলে দুর্ব্বার হইয়া উঠে। তখন তাহা গঠন অপেক্ষা সংহারের মূর্ত্তিতেই স্পষ্টতররূপে দেখিতে পায়। তাই কবিবর নবীনচন্দ্রের যৌবনের কবিতায় বৈদেশিক শিক্ষাপ্রভাব যেন আরও একটু তীব্রাকার ধারণ করিয়াছিল; যথা—

"নিরাশ্রয় অবলার জীবনের তরী,
পড়ে দেশাচার ঝড়ে নিরাশা সাগরে
বিনা কর্ণধার আহা বাঁচিল কি করি,
নিশ্চয় ডুবিবে পূর্ণ যৌবনের ভরে।

* * *

ইচ্ছা করে একেবারে জ্ঞান অসি ধরি,
দাসত্ব শৃঙ্খল একা করি বিমোচন,
কিন্তু আমি অসহায়, তাহে শত অরি;
একেশ্বর কে কোথায় জিনিয়াছে রণ?"
—নবীনচন্দ্র।

কিন্তু কবিবরের প্রৌঢ় বয়সের কাব্যে ভাবের তীব্রতা অনেকটা লঘু হইয়া উন্নতিমুখী হইয়াছে। তাঁহার "কুরুক্ষেত্রে" বিধবা জীবনের আদর্শ ছবিটী বড়ই মনোরম হইয়াছে। যথা—

উত্তরা—"মা, যাই।"
মাতা—"কোথায়?"
উত্তরা—"মা, উত্তরার এক ভিন্ন স্থান
নাই—
পতির জ্বলন্ত চিতা।"
মাতা—"পতির চিতায় প্রাণ সমর্পণ হ'তে আর
নাহি কি রমণীব্রত উচ্চতম মা আমার?"
"আছে" স্থিরকণ্ঠে কহি বামা দাঁড়াইল
ধীরে—
"পালিব তা, মাখিয়া, মা, পতিপদ ভস্ম
শিরে।"

এতক্ষণ নবীন যুগের সাহিত্যসেবীর ভাবোদ্দীপনাই আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি; সমস্ত ঝঞ্ঝা, সমস্ত আলোড়ন শুদ্ধভাবে পরিগ্রহ করিলে বিধবা জীবনের কিরূপ

শান্ত ও পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ঠিক সন্ধান প্রাপ্ত হই নাই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয় বিধবার যথার্থ শান্ত ও সহজ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন,—

"বরষায় হৃদি অতি গুরুভার
মেঘে মেঘে গেছে আকাশ ভরি ;—
এস গো স্বামিন্ এস গো বাহিয়া—
মরণ-সাগরে সোণার তরী !
এস তুমি নাথ জন্মান্তর ছায়া
বারেক দেখিব নয়ন ভরি।
বারেক কাঁদিব চরণে পড়িয়া
যে দুটি চরণ স্বপনে গড়ি।"
—অক্ষয়কুমার বড়াল।

বঙ্গের কবিকুলের হৃদয় বিধবার চিন্তায় কিরূপ ক্ষোভিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বলা হইল সত্য, কিন্তু গদ্য সাহিত্যিকগণও বিধবার চিন্তায় বিরত নহেন। বর্ত্তমান যুগে উপন্যাস-সাহিত্যেরই কিছু প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এই উপন্যাস-সাহিত্যে বিধবা নারীর প্রভাব অপরিবর্জ্জনীয় হইয়া উঠিয়াছে। অতি অল্পসংখ্যক উপন্যাস আখ্যায়িকাই রচিত হইয়াছে, যাহার পরিপূরণ কল্পে একটী না একটী বিধবা রমণী অবস্থান করেন না। তবে সাহিত্যসেবীর রুচি ও প্রয়োজন সিদ্ধির বিনিময়ে কেহ বা রাজ্ঞী, কেহ বা অবজ্ঞার বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কালে, অবশ্য বহুসংখ্যক গদ্য গ্রন্থ বিধবা রমণীর বিষয় পর্য্যালোচনায় গৌরবান্বিত হইয়াছে। তথাপি এই age of controversy বা বিতণ্ডার যুগের কথা পরিত্যাগ করিলেও, পরবর্ত্তীকালের বহুবিধ গদ্যগ্রন্থে বিধবা রমণী স্থান লাভ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় দীনেশচন্দ্র, জলধর, সুরেন্দ্রমোহন, পাঁচকড়ি, প্রভাতকুমার প্রভৃতি লেখকগণ হিন্দুবিধবার পবিত্র আলেখ্যে বহু গ্রন্থ উজ্জ্বল করিতেছেন। নিম্নে দুই একখানি গ্রন্থের বিষয় সামান্য আলোচিত হইল, তাহা হইতেই বোধ হয়, আমাদের বক্তব্য বিষয় বিশদ হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানি উপন্যাসের উপাদানই বিধবার জীবন হইতে গৃহীত হইয়াছে। তবে এ গ্রন্থদ্বয়ে গ্রন্থকার হিন্দু বিধবা জীবনের সহজ ভাব না দেখাইয়া বিকারই দেখাইয়াছেন। তাহার একটু কারণও আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন ; তাই প্রতিপক্ষকে একটুকু কটাক্ষপাত করিবার উদ্দেশ্যেই বিধবা বিবাহের Parody করিয়াছিলেন। তাঁহার এ প্রতিকূলাচরণের জন্য তিনি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতির নিকট "কাঁটালের ডালে বসি বঙ্কিম বাঁদর" প্রভৃতি শ্রুতিকটু বিদ্রূপও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"কৃষ্ণকান্তের উইল"—কি কুক্ষণেই কৃষ্ণকান্ত রায় উইল করিয়াছিলেন। তিনিও উইল করিলেন, দুষ্ট কোকিলও বাল বিধবা রোহিণীর মাথার উপর দিয়া মুকুলিত আম্রকুঞ্জে কুহু রবে ডাকিয়া উঠিল।

"বিষবৃক্ষ"—নগেন্দ্রনাথ সাধ করিয়া বিষবৃক্ষের চারা নিজ উদ্যানে রোপণ করিলেন। সূর্য্যমুখীর মানস শোক বর্দ্ধিত কলেবর—বিষতরু আর একটু হইলেই সোণার সংসার ছারখার করিত।

রমেশচন্দ্র দত্ত—সমাজ সংস্কারে বিশেষ আগ্রহবান্ ছিলেন, তাঁহার "সমাজে" অসবর্ণ বিবাহ প্রশংসিত, তথাপি বিধবা বিবাহের নজীর "সংসারে" লিখিবার সময়ই লিপি-

কুশলতা অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। বাল বিধবা সুধাকে পুনর্ব্বার উদ্বাহসূত্রে গ্রথিত করা হইল ; কিন্তু তাহাতে সংসারের স্থিতি-স্থাপকতা বা শান্তির কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই, বরং এই নবীন সুখদ্বেষিগণের মস্তকেই বজ্রাঘাত হইয়াছিল। এ স্থলে রমেশচন্দ্রকে বঙ্কিমচন্দ্রের antiphonal voice বলিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি"—বিধবা বিনোদিনী চোখের বালি নামের সম্পূর্ণ সার্থকতা করে নাই, তাই রক্ষা। মহেন্দ্রের জীবনের শ্রেষ্ঠতম অংশেই লুকোচুরি খেলিয়াই মহেন্দ্রকে নিস্তার দিয়াছিলেন। মহেন্দ্রের জননী কিন্তু পাকা গৃহিণী হইয়াও সংসারের হাল ঠিক রাখিতে পারেন নাই।

অনুরূপা দেবীর "অন্নপূর্ণার মন্দির"—বিধবা বালিকা সতী উদ্দেশ্যহীন বিশ্বেশ্বরের জীবনের কক্ষ রেখা স্থির করিয়া দিল। আর বঙ্গের অপুত্রক বিধবা জমিদার-গৃহিণী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা দেবী স্বর্গীয় করুণার কি অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি—আদর্শের কি অনঘ আলেখ্য।

উদাহরণ সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া প্রবন্ধ-কলেবর দ্বারা শ্রোতার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে ইচ্ছা করি না। তবে সাহিত্যের কথা ক্ষণেকের জন্য স্থগিত রাখিয়া হিন্দুবিধবার জীবনের বাস্তব মূর্ত্তি অনুধ্যান করিয়া দেখি। আমাদের সাহিত্যের মধ্যে হিন্দু-বিধবার প্রভাব এতাদৃশ বলবৎ থাকিলেও, কর্ম্ম-প্রাঙ্গণে তাঁহাদের স্থান কোথায়? তাঁহারা আজও উপেক্ষিত এবং প্রকৃত কর্ম্ম-শক্তি রহিত। প্রাচীন কালে রমণীকুলের শিক্ষা দীক্ষার তাদৃশ সুব্যবস্থা ছিল না, লক্ষ নারীর মধ্য হইতে একজন মাত্রও বিদ্যালাভ করিত কিনা সন্দেহ, অথচ তখনই আমরা মৈত্রেয়ী গার্গীর সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু অধুনাতন কালে নারীশিক্ষা অপেক্ষাকৃত অধিক ও সহজ হইলেও, আমরা একজন মাত্র খনা বা গার্গীর সহিত পরিচিত হই না। এরূপ ঘটিবার কারণ কি? আমাদের কর্ম্মশক্তি ও উৎসাহ যথার্থ পথে চালিত হয় নাই বলিয়া আশানুরূপ ফলোপধায়ক হয় নাই। আমরা বিধবাকে চিতা হইতে অবতরণ করাইয়া পুনর্বার বিবাহ দিয়াই ক্ষান্ত ; তাহাদের বিষয় আর চিন্তা করিবার অবসর পাই না। দুঃখ এই যে, যে দেশের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম্ম-চত্বরে অবতীর্ণ হইয়াছি, সে সকল দেশে আজও ম্যাডাম কুরি (Madam Curi) প্রভৃতির অভ্যুদয় হইতেছে। ইউরোপের কর্ম্ম-শক্তি ভারতে আসিয়া সিলেটের কমলা বাঙ্গালার গোঁড়া লেবু হইবার ন্যায় পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে।

নৈরাশ্যের নিষ্ঠুর ধ্বনি যদিও আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে উদ্গ্রীব, তথাপি আমরা আশাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত নহি। মনে হয়, আবার বাত্যান্তে প্রকৃতির সহজ মূর্ত্তির ন্যায় এই ভারতেই গার্গী মৈত্রেয়ীর সাক্ষাৎলাভ করিয়া বঙ্গের ধনী জমিদার গৃহে এখনও এমন অনেক মহাপ্রাণা বিধবা রমণী বিরাজমানা, যাঁহাদের পবিত্র চিন্তা স্মরণ-পথে আসিলেও জীবন ধন্য হয়। সৌভাগ্য, বঙ্গের প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গীয়া রাণী ভবানী, রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি দেবীগণ বিশ্ব-মানবের চিরস্তুত, চিরবন্দিত। ভক্তির নীরব অঞ্জলীই সেই সকল মানবী রূপে অবতীর্ণা দেব জননীগণের চরণ অনুধ্যান করুক। মহাকবি Goetheএর ভাষায় বলিতে পারি—

"Names are but shadows,
Clouding the glory of Heaven"

মোট কথা, বঙ্গসাহিত্যের নবোন্মেষ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যাবতীয় সাহিত্যেই হিন্দু বিধবার প্রভাব লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। তথাপি বঙ্গ-সাহিত্যে হিন্দু বিধবার প্রকৃত প্রভাব যথার্থ কৃতবিদ্য ব্যক্তির অনুসন্ধানের বিষয়। মাদৃশ পল্লবগ্রাহী ব্যক্তির এ বিষয়ের প্রকৃত চিত্রাঙ্কণের চেষ্টা ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। আশা করি, যথার্থ অধিকারিগণ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া বঙ্গের সাহিত্য-বেদীতে বিধবা রমণীর প্রকৃত আসন নির্ণয় করিয়া দিবেন।

"পুরাণ মিত্যেব ন সাধু সর্ব্বম্
ন চাপি কাব্যং নব মিত্য বদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে
মূঢ়ঃ পর-প্রত্যয়নেয় বুদ্ধিঃ॥"

—মালবিকাগ্নিমিত্রম্।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চৌধুরী, বি-এল।

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণচন্দ্র দে

জন্ম—বারদি, ঢাকা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬২ খ্রীঃ
দীক্ষা—১১ই মাঘ, ১২৯০, বৃহস্পতিবার।
মৃত্যু—২৬শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩২৬।

"যাদের হরি বল্‌তে নয়ন ঝরে
তারা দু'ভাই এসেছে রে।"

"জীবন-সম্বল, জুড়াবার স্থল,
চিনে লও তারে মন,
হৃদয়-দুয়ারে, ডাকিছে আমারে,
দেখ ফিরায়ে নয়ন।"

(অবোধ মনরে আমার)
কৃষ্ণচন্দ্র, ৩০৬, তরঙ্গ-হরি।

(১)

একটী বালক, তার আকৃতি বড়ই মধুর। সৌন্দর্য্য বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা নয়, কিন্তু কমনীয়তা, মাধুর্য্য, সদ্ভাব, সহৃদয়তা তাহার আকৃতিতে ফুটিয়া বাহির হইত। যে তাহাকে দেখিত, সে-ই মোহিত হইয়া যাইত। সে শৈশবে শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্ত্রীর সহিত খেলা করিত। কোথায় তার বাড়ী, অবস্থা কেমন, বড় কেহ জানিত না। বাল্যেই তাহার মাতার মৃত্যু হয়। ১২৮৫ সালের ৮ই পৌষ রবিবার পিতার মৃত্যু হয়। ঢাকা তাঁতিবাজারে তারানাথ পেসকারের বাসায় থাকার সময়ে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, রামকুমার বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্তের সংস্পর্শ-লাভ করে। ১২৮৯ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ১২৮৯ সালের ২৯শে ফাল্গুন ঢাকা কলেজে এলে পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হয়। কিন্তু সেখানে সুবিধা না হওয়ায়, ১২৯০ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, কলিকাতা যাত্রা করে এবং ১১ই জ্যৈষ্ঠ পৌঁছে। ৫ই আষাঢ় সোমবার সিটী কলেজে ভর্ত্তি হয়। এই বালকের নাম ছিল কৃষ্ণচন্দ্র দে।

১২৯০ সাল কলিকাতার পক্ষে বিশেষ বৎসর। এই বৎসর সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী ও নব্যভারত প্রকাশিত হয়। এই বৎসর ১৬ই পৌষ রবিবার মহর্ষি-দেব সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের বেদিতে বসিয়া উপাসনা করেন। এই বৎসর ২৫শে পৌষ মঙ্গলবার ভক্ত কেশব-চন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন। লর্ড রীপন তখন বড়লাট, বাঙ্গালায় নবযুগের সূত্রপাত হয়। সুবিখ্যাত কলিকাতার জুবেনার সাহেবের মেলা হয়। এই বৎসর কলিকাতায় আসিয়া তিনি

বিষম আন্দোলনের মধ্যে পড়েন। ৪ঠা জানুয়ারি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে প্রোমোসন পান। এই সময়ে থোববরণ সাহেব, ড্যাল সাহেব, রামকুমার বিদ্যারত্ন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রভৃতির বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার ভিতরে ধর্ম্মের উন্মেষ হয়। এই বৎসর ১১ই মাঘ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র আতুর্থী মহাশয়ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। যাঁহারা দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই দুজন আমাদের প্রাণকে বিশেষ ভাবে কাড়িয়া লইয়াছিলেন। সে মিলন এক অপূর্ব্ব মিলনের পূর্ব্বাভাস।

ইহার পর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে মহা আন্দোলন উপস্থিত করেন। এই সময়ে কলিকাতায় নগেন্দ্রবাবুর সহিত তাঁহার যে বাক্‌যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহা ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সময়ে বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন, রামকুমার বিদ্যারত্ন, আনন্দচন্দ্র মিত্র, প্রমদাচরণ সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ঘটিয়াছিল।

তাঁহার স্বহস্তলিখিত ডায়েরীতে এই সময়কার দুই বৎসরের বিবরণ পাওয়া যায়। কঠোর দারিদ্র্য-সংগ্রামের কথা পাঠ করিলে চক্ষে জলধারা বহে। কলিকাতায় অবস্থানের সময় দরিদ্র কৃষ্ণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের কষ্ট স্মরণে বড়ই ব্যথিত হন। দরিদ্রের যাতনা দরিদ্রই বুঝে। ৬ই বৈশাখ, ১২৯১ সাল কিছু দিন বারদিতে থাকেন। তিনি লিখিয়াছেন—"১১ই শ্রাবণ, শুক্রবার, প্রাতে শিবনাথ বাবুর নিকট ছাত্র সমাজের বক্তৃতার বিষয় জানিতে গিয়াছিলাম, তাঁহাকে বাড়ী পাইলাম না। তাঁহার স্ত্রী গত কল্যের শিবনাথবাবুর জাতিভেদ সম্বন্ধে বক্তৃতার বিষয় উল্লেখ করিলেন এবং শিবনাথবাবু যে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বক্তৃতার পর কি খাইয়াছেন? বোধ হয় দুধ খাইয়াছেন? তিনি উত্তর করিলেন, হাঁ, আমাদের দুধ রাখা হয় না, তবে অন্যের বাড়ী হইতে দুধ আনিয়া দিয়াছিলাম। পরে তিনি তাঁহার গলা দিয়া রক্তপড়ার কথা বলিয়া বলিলেন, দুধ না খাইলে কখন কি হইবে, জানি না।" এই সব শুনিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বড় ক্লেশ পাইলেন এবং দুধ মাখনের জন্য চাঁদা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অনেক দিন এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। ৯জন সহৃদয় বন্ধু এই পবিত্র কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন।

তৎপর রামকুমার বাবুর জন্যও চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। একটী দুটী নয়, এরূপ সহৃদয়তা, পরোপকারের শত শত দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করিলাম না।

এই সময়ে কলিকাতায় যে নবযুগের বাতাস বহিয়াছিল, তাহার সংস্পর্শ লাভ করিয়া এবং বহু মহাজনের সংসর্গে কৃষ্ণচন্দ্র এক অপার্থিব জীবন লাভ করিলেন।

১২৯১ সালের ১০ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যু হয়। কৃষ্ণচন্দ্র শ্মশান পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সহৃদয়তা, মহানুভবতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, পবিত্রতা এইরূপে কৃষ্ণচন্দ্রকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। অবস্থার পীড়নে পাঠ ছাড়িয়া ফরেষ্টার হইয়া আসামে যান, কিন্তু নীতির খাতিরে তাহা ছাড়িয়া শিক্ষক হইয়া মাণিকদহে গমন করেন।

(২)

আর একটী বালিকা, তাহার নাম হেমলতা। হেমলতা বাপ-আছড়ার মেয়ে। হেমলতার মাতা এক রাত্রে আনন্দ-আশ্রমকে তাহার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন। হেমলতা সোণার মেয়ে, আনন্দ-আশ্রমে থাকিয়া আপনার গুণগ্রামে সকলকে মোহিত করিল। এখানে থাকিয়াই সুশিক্ষিতা হইয়া, নবজীবন লাভ করিয়াছিল। মেয়ের অশেষ গুণ, যেমন চেহারার পারিপাট্য, তেমনি অন্তরের সৌন্দর্য্য—ষোলকলা বিস্তার করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আনন্দ-আশ্রম লালন পালন ও সুশিক্ষিতা করিয়া হেমলতাকে ১২৯৬ সালের বৈশাখ মাসে কৃষ্ণচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সংক্ষেপে সব কথা বলিতে হইবে বলিয়া অনেক কথা বাদ দিতে হইল। এই আশ্রম অন্য মেয়ে বিনোদাকে মহেশচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ও হেমলতার মিলন এক অপূর্ব্ব মিলন। ইহা একটী আদর্শ বিবাহ। উভয়ে উভয়ের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মজীবনের উৎকর্ষতা লাভ এবং অবস্থার উন্নতি করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইঁহাদের মিলনের ফলে, জ্ঞানাঙ্কুর, প্রেমাঙ্কুর এবং সুধাঙ্কুরের উদয়। ইঁহারা জীবনে শোকের কোন তীব্র কষাঘাত সহ্য করেন নাই। আমি উত্তর কালে জগন্নাথপুরে পুত্রদের নামকরণের সময় জ্ঞানাঙ্কুরকে দেখাইয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে বলিয়াছিলাম, "এই ছেলে কালে বড়লোক হইবে, বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে।" জ্ঞানাঙ্কুরের বিলাত হইতে আসার পর কৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "আপনার কথাই সত্য হইল।" আমি, হেমলতা ও বিনোদার ছেলেদিগের এক নামই দিয়াছিলাম। উভয়ের জীবনের সৌসাদৃশ্য দেখিয়াই এরূপ করিয়াছিলাম। বাল্য হইতেই কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গীতের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তন্ময় হইয়া যখন গান করিতেন, প্রাণ উদাস হইয়া যাইত। আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। এই দুইয়ের মিলনে সঙ্গীত এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। আনন্দচন্দ্রের "মাতৃমঙ্গল" ও কৃষ্ণচন্দ্রের "তরঙ্গ-তরি" অপূর্ব্ব সঙ্গীতগ্রন্থ। আনন্দ-চন্দ্রের "গাও রে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্মের জয়", "ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী" প্রভৃতি গান ব্রাহ্মসমাজের অতুল সম্পত্তি। কৃষ্ণচন্দ্র এই সব গান করিবার সময় ভাবে তন্ময় হইয়া যাইতেন, দুনয়নে ধারা বহিত। সঙ্গীত করিতে করিতে একদিন সাহাপুর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সঙ্গীতের কথা আর একটু পরে বিবৃত করিব।

(৩)

তার পরের কথা আমাকে একটু সঙ্কুচিত ভাবে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে। আমার অপরাধ হইলে সকলে মার্জ্জনা করিবেন।

মাণিকদহ ফরিদপুরের একটী গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামে মহা প্রেমিক বিপিনবিহারী অভ্যুদিত হন। তাঁহার সহিত আনন্দ-আশ্রমের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। অবশ্য তিনি কখনও আনন্দ-আশ্রমকে একটী পয়সাও সাহায্য করেন নাই, কিন্তু আনন্দ-আশ্রমে আসিতে ও থাকিতে বড়ই ভালবাসিতেন। এই আনন্দ-আশ্রমে কৃষ্ণচন্দ্র ও হেমলতার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। মাণিকদহকে আদর্শ ষ্টেটে পরিণত করা আমাদের একটা বিশেষ ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল। এজন্য সাধু ভক্তদিগকে মাণিকদহে লইয়া যাইতে আমাদের বড়ই আগ্রহ ছিল। প্রাতঃস্মরণীয়

শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাণিকদহের অভ্যুদয়ের কারণ; দ্বিতীয় কারণ জগৎলক্ষ্মী-ঘোষ। ধাত্রী জগৎলক্ষ্মীকে আমরাই মাণিকদহে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তৎপর কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, রামগোপাল বিশ্বাস, অবিনাশচন্দ্র সরকার, শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকা-চরণ মুখোপাধ্যায়, মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়, হরিদাস রায়, কালীচরণ সেন, শ্রীশশধর রায়, শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ, শ্রীমথুরানাথ দাস, শ্রীমহেশচন্দ্র আতুর্থী, শ্রীরজনীনাথ সরকার, আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রভৃতিকে মাণিকদহের সহিত যোগ স্থাপনে আমরা চেষ্টা করিয়াছিলাম। বিশ্বাস ছিল, সাধুভক্তের সহবাসে দেশ পবিত্র হইবে। এই মাণিকদহে কৃষ্ণ-চন্দ্র পূর্ব্বে ছিলেন, বিবাহের পর আনন্দ-আশ্রম নবদম্পতিকে আবার বিপিনবাবুর আশ্রয়ে পাঠাইলেন। প্রথমত কৃষ্ণচন্দ্র শিক্ষক হইয়া যান, শেষে জমীদারীতে কাজ করেন। সেখানে যেমন ছিলেন, শ্যামাকান্ত-কালী-প্রসন্ন, হরিদাস-রামগোপাল, চণ্ডীচরণ-অম্বিকা-চরণ, আনন্দচন্দ্র-প্যারীমোহন *, গগনসুন্দরী-মোক্ষদায়িনী, তেমনি ছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র ও অবিনাশচন্দ্র। শারদীয় উৎসবের সময় মাণিক-দহ ভক্তসমাগমে তোলপাড় হইয়া যাইত। বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ, নগেন্দ্রনাথ, ভুবনমোহন, গোবিন্দচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, সাধ্বী মনোরমা, দ্বারকানাথ ঘোষ, কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার, সাধ্বী কমলকামিনী, রজনীকান্ত ঘোষ, আদিনাথ, নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রভৃতি কত সাধু ভক্তের মহা মিলন হইত। সে সব কথা মনে পড়িলে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়। কিন্তু এখন, একে একে প্রায় সকলেই গিয়াছেন—বিপিনবিহারী, প্যারীমোহন, গগন-সুন্দরী, শ্যামাকান্ত, জগৎলক্ষ্মী, কালীপ্রসন্ন, অম্বিকাচরণ, হরিদাস, সতীশচন্দ্র, কালী-চরণ, আনন্দচন্দ্র, অবিনাশচন্দ্র, নৃপেন্দ্র-নারায়ণ, সুপথপ্রকাশ, সুপ্রসন্ন, সুরেন্দ্রলাল —একে একে প্রায় সবই গিয়াছেন !! মাণিক-দহের আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়াছে, পরলোকে সে হাট জমিয়াছে। শেষ স্মৃতিচিহ্ন ছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র, এবার তিনিও সেখানে গেলেন !! ভক্তগণের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ, নগেন্দ্রনাথ, শিবনাথ, দ্বারকানাথ, রজনীকান্ত, কাঙ্গাল হরিনাথ—গিরিশচন্দ্র সবাই গিয়াছেন—আছেন কেবল নবদ্বীপচন্দ্র, ভুবনমোহন, আদিনাথ, গোবিন্দচন্দ্র প্রভৃতি। মাণিকদহের মহা অভ্যুত্থান ব্যাপারে পবিত্রতার মহা কীর্ত্তি ছিলেন—অবিনাশচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র। এই ষ্টেটের সমস্ত হাট বাজার হইতে বেশ্যাগণকে উঠাইয়া দিতে এবং আর আর সকল প্রকার দুর্নীতি দমনে ইঁহারাই আমাদের প্রধান সহায় ছিলেন। অবিনাশচন্দ্র পূর্ব্বেই গিয়াছেন, এবার কৃষ্ণচন্দ্রও অস্তমিত হইলেন !! হায়, বিধাতা মাণিকদহের শেষ স্মৃতি বিলুপ্ত করিলেন!

*

আনন্দ-আশ্রমের মহা কীর্ত্তি হেমলতা-কৃষ্ণচন্দ্র; বিপিনবাবুর ধর্ম্মোন্নতির মহা সহায় —কৃষ্ণচন্দ্র-হেমলতা। এই নবদম্পতি বিপিন বাবুর জীবনে যে অলৌকিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। একবার জগন্নাথপুর হইতে আসিয়া বিপিন-বিহারী আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—"কি উপাদানে যে ইঁহাদের জীবন গঠিত, আমি ব্যাখ্যা করিতে পারি না। এমন দিন নাই, যেদিন হেমলতা আমাকে কিছু না কিছু খাওয়াইয়াছেন এবং এমন দিন নাই, যেদিন

* প্যারীমোহন মাণিকদহ পরিত্যাগ করিতে-ছিলেন, আমরাই রাখিয়াছিলাম।

কৃষ্ণচন্দ্র কিছু না কিছু মনের আহার দিয়াছেন।" ধন্য এই দম্পতি—যাঁহাদের জীবন অগণ্য ছাত্র এবং অগণ্য প্রজার উপর চরিত্র-বল প্রতিষ্ঠার কারণ হইয়াছে।

মাণিকদহের উৎসবে আনন্দচন্দ্র গান রচনা করিতেন, কৃষ্ণচন্দ্র গাহিতেন। গাহিতেন আর দুনয়নে জলধারা বহিত। অবিনাশচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিয়া আমাদের মনে হইত,

"যাদের হরি বল্‌তে নয়ন ঝরে,
তারা দু ভাই এসেছে রে।"

মাণিকদহের উৎসব ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের অক্ষয় ঘটনা।

এই সময়ে 'তীর্থযাত্রী' প্রকাশিত হয়। কিন্তু মুঙ্গেরের ভক্তির আন্দোলনের ন্যায়, মাণিকদহেও একটা আন্দোলন উঠিয়াছিল। সাধু বিজয়কৃষ্ণ শেষ জীবনে একবার মাণিকদহে যাইয়া অনেককে দীক্ষিত করেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র, অবিনাশচন্দ্র, রামগোপাল, প্যারীমোহন সে দীক্ষা গ্রহণ করেন না। যদিও সে দীক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই বটে, কিন্তু মাণিকদহে একটা অবসাদ আনয়ন করিয়াছিল। এই অবসাদের ফলে প্রতিবাদকারী প্যারীমোহন এবং কৃষ্ণচন্দ্রকে বিপিনবাবু শেষে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমাদের জীবনে সে দুঃখ ঘুচিবে না।

(৪)

তার পর এই দম্পতি আবার আনন্দ-আশ্রমে আসিয়া কিছু দিন রহিলেন। এই সময়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয়ের কার্য্য গ্রহণ করেন। বসু মল্লিক মহাশয় দয়ার অবতার। তিনি এই পরিবারের প্রতি যে সদয় ব্যবহার করিয়াছেন, এ পরিবার কখনও তাহা ভুলিবে না। কখনও কখনও কোন কোন অত্যাচারীর দুর্ব্যবহারে কৃষ্ণচন্দ্র কাজ ছাড়িতে ইচ্ছুক হইতেন, কিন্তু এই মহাপুরুষের সদ্ব্যবহারে সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হইত। এই ষ্টেটের মিরপুরের নিকটবর্ত্তী খন্দেকবাড়িয়া কাছারীতে কৃষ্ণচন্দ্র থাকিতেন। এই ষ্টেটে থাকার সময়ই জ্ঞানাঙ্কুরকে বিলাতে পাঠান হয় এবং সে I. C. S. হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টের কাজ করিতেছে এবং প্রেমাঙ্কুর ডাক্তারী পাশ করিয়া রাউলপিণ্ডিতে I.M.S. হইয়াছে। সম্প্রতি সে কাপ্তান হইয়াছে। সতীশচন্দ্রের উপর কৃষ্ণচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। পাঁচু বাবু তাহার সাক্ষ্য দিতে বর্ত্তমান আছেন। তিনি সতীশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় ছিলেন। কত সাধুভক্ত ও প্রজার উপর যে তাঁহার পবিত্র চরিত্রের ছায়াপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইতিহাস অলিখিত, চিরদিনই অলিখিত থাকিবে।

পূর্ব্বেই অর্শ রোগ ছিল। এবার অসুখ লইয়াই তথায় যান। মিরপুরে দারুণ অর্শে শরীর রক্তশূন্য হয় এবং দুর্ব্বল হইয়া শয্যাশায়ী হন। সংবাদ পাইয়া তাঁহার পত্নী যাইয়া তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করেন। এখানেই তাঁহার জীবন শেষ হয়। মৃত্যুর ৫ দিন পূর্ব্বে যে অজ্ঞান হইয়াছিলেন, সে জ্ঞান আর ফিরিয়া আইসে নাই।

(৫)

এইরূপে কৃষ্ণচন্দ্রের কর্ম্মময় জীবন শেষ হইল। নব্যভারতে বিষ্ণুচরণের জীবনী পড়িয়া তিনি লিখিয়াছিলেন,—"বড় সংক্ষেপ হইয়াছে।" এবারও তাহাই হইল। আমাদের বিশ্বাস, বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে বলাই ভাল, নচেৎ শ্রোতা ও পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। তাঁহার জীবনের কথা অতি অল্পই

বলা হইল—কাহারও জীবনের সকল কথা সংক্ষেপে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। যত লোকের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছে, সকলেই জানেন, তিনি কাজ করিতে করিতেই জীবনপাত করিয়াছেন। নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে বাল্য হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া, স্বাবলম্বনের পথ ধরিয়াই দেহপাত করিয়াছেন। যে পুত্রদিগের শিক্ষার জন্য জীবনপাত করিয়াছেন, তাহাদের সাহায্যও গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মনের কষ্ট কেহ জানিত না। তাঁহাকে এবার কার্য্যস্থলে যাইতে না দিলে ভাল হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই। এবার কলিকাতাতেই শরীর দুর্ব্বল হয়, সে অবস্থায় তাঁহাকে একাকী মিরপুরে যাইতে না দিলেই ভাল হইত। তিনি যেন এবার বিরাগী হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, একমাত্র পৌত্রের জাতকর্ম্মও তাঁহাকে আটকাইতে পারে নাই। মহাযোগী কোন কঠোর পরীক্ষার অবস্থাতেও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। আজীবন যে সাধনা ধরিয়াছিলেন, নিত্য কর্ম্মসেবার পথ ধরিয়া, সে সাধনায় নিত্য-উপাসনা-যোগে যুক্ত হইয়াছিলেন। যে সময় হইতে তাঁহার জীবনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, সেই সময় হইতেই তাঁহার নিত্য উপাসনার পরিচয় পাইয়াছি। নিত্য উপাসনা, নিত্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম, নিত্য চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধন করিতে করিতে শেষে যোগী জ্ঞান-বিমুক্ত অন্তর্দর্শনে ডুবিলেন। শেষে আর কাহারও দিকে চাহিলেন না। নিষ্কাম নীরব জীবন-লীলা এইরূপে পরিসমাপ্ত হইল। হায়, হায়, হায়!!

তিনি চরিত্রে অটল, সাধনায় অটল, কর্ম্মে অটল, এই সংসারের সর্ব্বপ্রকার আটপৌরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কোন আড়ম্বর নাই, বেশভূষার কোন পারিপাট্য নাই, —যেমন দরিদ্রের বেশে কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, পুত্রদের শিক্ষার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সেই দরিদ্রের বেশেই চলিতেন, ফিরিতেন এবং পুত্রদের অবস্থা ভাল হইলেও, সেই দারিদ্র্যের ব্রতই আহারে বিহারে পালন করিতেন। দরিদ্র বলিয়া কেহ তাঁহাকে কখনও লজ্জা দিতে পারে নাই। তাঁহাকে অপমানিত হইতে দেখিয়াছি, তাঁহাকে নির্য্যাতিত হইতে দেখিয়াছি, তাঁহাকে বিদ্রূপবাণে ক্ষত বিক্ষত হইতে দেখিয়াছি—কিন্তু তাঁহাকে কখনও চঞ্চল হইতে দেখি নাই—সর্ব্বদাই অবিচলিত, নির্ব্বিকার-চিত্ত। ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও তিনি সংযত। সংযম তদীয় জীবনের উজ্জ্বল ভূষণ, বিনয় তদীয় জীবনের স্বোপার্জ্জিত অলঙ্কার, চরিত্র-বল মহা তপস্যার মহাফল। জমীদারী কার্য্যে জীবনপাত করিয়াছেন, কিন্তু কেহ কখনও তাঁহাকে ঘুষ নিতে বা ঘুষ দিতে দেখে নাই। মিতব্যয়িতা তাঁহার নিত্য সাধনার বিষয় ছিল। এই মিতব্যয়িতার গুণে তিনি পুত্রদের শিক্ষার জন্য এত অর্থ ব্যয় করিতে পারিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার পত্নী তাঁহার প্রধান সহায়। এই দম্পতি পুত্রদের শিক্ষার জন্য যাহা করিয়াছেন, এমন আর দেখি নাই। তিল তিল করিয়া পুত্রদের উন্নতির জন্য এই দম্পতি জীবন ঢালিয়া দিয়াছিলেন। জ্ঞানাঙ্কুরের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত কখনও একটী ভৃত্যও রাখেন নাই। এরূপ যোগসাধন বন্ধুদের মধ্যে আর কেহ করিতে পারিয়াছেন কি না, তাহা জানি না। তিনি যেন সাধনাবলে মার্টার সাজিয়াছিলেন। জীবনার্পণ তদীয় জীবনের মহা বিশেষত্ব।

আর বিশেষত্ব—সহজ-সিদ্ধতা। তিনি

ধর্ম্মে কোন বুজরুকি অবলম্বন করেন নাই, কিন্তু এমন দৃঢ় সাধক বন্ধুদের মধ্যে অতি অল্পই দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, কোন বাহ্যাড়ম্বর নাই—কিন্তু নির্ব্বিকারে অতলে ডুবিয়া যাইতেছেন। হরিনামে এমন বিহ্বল-চিত্তের লোক অতি অল্পই দেখা যায়। তাঁহার মুখের জ্যোতিতে সেই বিহ্বলতা, তাঁহার চক্ষের ঔজ্জ্বল্যে সেই তন্ময়তা, তাঁহার ব্যবহারে সেই ঐকান্তিকতা, তাঁহার আহারে বিহারে সেই দৃঢ়তা। তিনি আজীবন ধর্ম্মসাধক, ধর্ম্মই তাঁহাকে অচ্যুত চরিত্র ধনের অধিকারী করিয়াছিল। একদিনও তাঁহার চরিত্র-স্খলিত হয় নাই, একদিনও পাপসংগ্রামে পরাজিত হন নাই, একদিনও আত্মমত পরিত্যাগ করেন নাই—তিনি সদা দৃঢ় হইতেও দৃঢ় হইয়া জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। এহেন জীবন-কথা স্মরণে পুণ্য, কীর্ত্তনে পুণ্য, সাধনে পুণ্য। তিনি যেন নিত্যসিদ্ধ মহাযোগী ছিলেন। তাঁহার ৩০৬ সংখ্যক কীর্ত্তনে এই সব কথারই প্রতিধ্বনি, তাঁহার তীর্থযাত্রীর পংক্তিতে পংক্তিতে এই কথারই পুনরুক্তি। তরঙ্গ-তরির গান যখন একতন্ত্রী হস্তে লইয়া তিনি গান করিতেন, তখন তাঁহার চিত্ত বিহ্বল হইয়া যাইত, দুনয়নে ধারা বহিত। এ এক আশ্চর্য্য পুস্তক। তিনি কর্ম্মী ও যোগী;—কর্ম্ম ও ধর্ম্ম তাঁহাকে অনাবিল নিত্যসিদ্ধি প্রদান করিয়াছিল। তাঁহার নিত্যসিদ্ধি তদীয় পরিবারের চিরমন্ত্র হউক, এবং আমাদের চির আদর্শ হউক। তাঁহার পুত্রদের চরিত্রে তাঁহার এই নিত্যসিদ্ধির অবস্থাকে পুনরুত্থিত দেখিলে আমরা ধন্য হইয়া যাইব। বিধাতা তাহাই করুন, বিধাতা তাহাই করুন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নরহরি ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীর প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর।

নব্যভারতে গত আশ্বিন সংখ্যায় পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদ পাঠ করিয়া আমার মনে হইতেছে, লেখক মহাশয়ের হিন্দুশাস্ত্রে ও জাতিতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান অতিশয় পরিমিত। তাঁহার যদি শাস্ত্রে বা জাতিতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকিত, তাহা হইলে কদাচ বৃথা প্রতিবাদ করিতেন না।

নরহরি ঠাকুরের জীবনী লিখিতে গিয়া বাঙ্গালার অম্বষ্ঠ বৈদ্য জাতির গৌরব ঘোষণা করা আমার কোন গূঢ় অভিসন্ধি ছিল না, কারণ আমি নিজে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের জাতি বিভাগের পক্ষপাতী নহি। বিশেষতঃ আমার মত লেখক বৈদ্য জাতির কি গৌরব ঘোষণা করিবে? যাঁহাদের কল্যাণময় হস্ত কিবা পুরাণে, তন্ত্রে, কিবা ব্যাকরণে, কিবা দর্শনে, কিবা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে, কিবা উদার ধর্ম্ম শিক্ষায় আবহমানকাল নিযুক্ত, যে জাতি এতাবৎ আত্ম-গৌরবে সদা স্ফীতবক্ষ—যে জাতি কখন সমাজে অন্য জাতির ন্যায় কখন নীচ বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই, তাঁহাদের গুণ কীর্ত্তন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। তবে যখন প্রতিবাদকারী বৈদ্য সমাজ বা জাতির উপর অযথা কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, আর যখন তিনি উড়িষ্যা দেশীয় ব্রাহ্মণ,

তখন আমাকে তাঁহার প্রতিবাদের সাধ্যমত সংক্ষিপ্ত প্রত্যুত্তর দান করা পাঠক পাঠিকাগণের নিকট ন্যায়সঙ্গত মনে করি। ভরসা করি, সম্পাদক মহাশয় এই মহার্ঘ কাগজের দিনে দয়া করিয়া তাঁহার পত্রিকায় স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

প্রতিবাদকারী বলিয়াছেন, "উক্ত সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ যখন জাতিভেদ মানেন না, অধিকন্তু নরহরি ঠাকুরকে তাঁহারা দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করেন, তখন তাঁহাদের নিকট ঠাকুরের জাতি পরিচয় ইদানীং নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও নিষ্প্রয়োজন ইত্যাদি"। ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই, কাহারও জীবনী লিখিতে বসিলে লেখক যে তাহার বংশ পরিচয় দিবেন না বা তিনি কোন্ জাতিতে সম্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা লিখিবেন না, এ নিয়ম কোথাও আছে কি না, তাহা জানি না। পাঠক পাঠিকাগণ মনে করুন, কেহ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জীবনী লিখিতে বসিয়াছেন, কিন্তু মহাত্মা কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন বলিয়া কি জীবনলেখক উল্লেখ করিবেন না যে, ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ অমুক অমুক ছিলেন? আরও কথা এই, নরহরি ঠাকুরের ন্যায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনেক অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সেবক বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও তাঁহাদের অনন্তর বংশীয়েরা আজও পর্য্যন্ত স্বজাতির মধ্যে রহিয়াছেন, যথাঃ—কাচড়াপাড়া নিবাসী সেন শিবানন্দ বংশজ, যশোহরের অন্তঃপাতী বোদখানা নিবাসী কানু ঠাকুরের বংশীয় বৈদ্য গোস্বামীগণ, ঢাকার বড় গোঁসাই (কমলকৃষ্ণ গোস্বামী), ভাজনঘাট নিবাসী বৈদ্য গোস্বামীগণ। অতএব সুধী পাঠকগণ বিবেচনা করুন, আমি নরহরি ঠাকুরকে বৈদ্য বংশোদ্ভব বলায় কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি? এতাবৎ কাল দেখিয়া আসিতেছি যে কোন মহানুভব বা মহাত্মাকে যে কোন জাতি সম্ভূত বল, তাহার কোন কথা নাই, কেবল বৈদ্য জাতি বলিলেই হিন্দু সমাজের সমান সর্ব্বনাশ! বৈদ্য জাতি যেন বঙ্গসমাজের চক্ষুশূল! এমনি অকৃতজ্ঞতার দিন আসিয়াছে!

প্রতিবাদকারী প্রথম প্রতিবাদ, আমি কেন নরহরি ঠাকুরের বীজীপুরুষ পন্থদাশের সকার তালব্য শ লিখিয়াছি। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য, নরহরি ঠাকুরের বীজীপুরুষের নাম পান্থদাশ নহে পরন্তু পন্থদাশ। লিপিকর প্রমাদে অথবা ছাপার দোষে পন্থদাশ পান্থদাশ হইয়াছে, উহার নাম পান্থ (পথিক) নহে, পরন্তু "পন্থ"। আর দাশ শব্দ নামৈক দেশ নহে, পরন্তু বংশ পরিচয় দ্যোতক মাত্র "দাসার্থ" সেবক বাচী নহে।

যথা বৈদ্যকুলপঞ্জিকা চতুর্ভুজ লিখিতেছেন—
মৌদ্গল্যাখ্যমুনির্নাম য কোশল নিবাসকঃ
উপযেমে তৃতীয়াং স সুন্দরীং গুহ ভদ্রিকাং
তস্যা জাতৌ সুতৌ দ্বৌচ আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকৌ
মৌদ্গল্যস্য গোত্রসম্ভূতৌ সেন দাশাভিধানকৌ।

পুনশ্চঃ—
বৈদ্যানাং পদ্ধতি স্তেষাং কথয়ামি বিশেষতঃ
সেন দাশশ্চ গুপ্তশ্চ দেবঃ দত্তঃ করঃ ধরঃ
কুণ্ডশ্চন্দ্রো রক্ষিতশ্চ রাজ সোম তথৈবচ
নন্দি পঞ্চতমঃ সর্ব্বা কথিতাশ্চ ত্রয়োদশঃ
(ইতি স্কন্দপুরাণ রেবাখণ্ড)

পূর্ব্বোক্ত দাশের বংশেই মহাত্মা চান্থু ও পন্থ প্রসূত হন। দাশ আদি বীজীপুরুষ বলিয়া চান্থু ও পন্থের পূরা নাম "চান্থুদাশ" ও "পন্থদাশ"। প্রতিবাদী যদি দাস শব্দের বৈয়াকরণিক প্রভেদ জানিতেন তাহা হইলে

তিনি কদাচ ব্রাহ্মণ হইয়া নিজের নামের শেষে "দাস" শব্দ ব্যবহার করিতেন না, ইহা তালব্য শকারান্ত লিখিতেন। উৎকল কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দাশ এম-এ মহাশয় পূজ্যপাদ পণ্ডিত উমেশ-চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে বলিতেন, "আমাদিগের উৎকল ব্রাহ্মণদিগের এই দাশ কথাটা নিত্য শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ ভিন্ন শূদ্রগণ ইহার ব্যবহারে অধিকারী নহেন।" (জাতিতত্ত্ববারিধি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) প্রতিবাদী মহাশয় দয়া করিয়া পাণিনি ও কলাপ ব্যাকরণের "দাশগোঘ্নৌ সম্প্রদানে" ইত্যাদি সূত্রাদি পাঠ করিয়া দেখিবেন।

প্রতিবাদ-লেখক মহাশয়ের গাত্রদাহ, আমি বাঙ্গালার বৈদ্যগণকে একতর ব্রাহ্মণ (অম্বষ্ঠ) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। ইনি অম্বষ্ঠ (বৈদ্য)গণকে যেন শূদ্রশ্রেণী ভুক্ত করিতে ইচ্ছুক। কাজেই বৈষ্ণবংশোদ্ভব নরহরি ঠাকুরকে অন্ততঃ শূদ্র বলিতে চান, কারণ তাঁর গলায় পৈতা দেখিতে পান নাই, কেবল ফুলের মালা দেখিয়াছেন। প্রথমতঃ লেখকের জানা উচিত যে, পৈতা আর্য্য জাতির চিহ্নমাত্র (badge), ইহার মধ্যে কোন আধ্যাত্মিকতা নাই। যে সব মহাত্মারা এ সামাজিক গণ্ডির বহির্ভূত, ব্রহ্মপরায়ণ, তাঁহাদের গলায় পৈতা লম্বমান রাখার আবশ্যকতা থাকে না। একারণ বশতঃ আমরা মহাত্মা পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের গলদেশে (ছবিতে) লম্বমান পৈতা দেখিতে পাই নাই। এই সব মহাত্মাদের গলদেশে পৈতা রাখা না রাখা তাঁহাদের ইচ্ছাধীন—কারণ তাঁহারা "পৈতে পুড়িয়ে ভগবান" হইয়াছেন। বিবেচক পাঠক পাঠিকাগণ মনে করুন, প্রতিবাদকারীর মতে বাঙ্গালার অম্বষ্ঠ বৈদ্যরা শূদ্র, কাজেই আমাদিগকে বলিতে হইবে, বৈদ্যদের বেদে অধিকার নাই, কেন না কতকগুলি ইদানীন্তন পুরাণ ও উপপুরাণের মতে স্ত্রী ও শূদ্রগণের বেদ পাঠ নিষিদ্ধ—আর আমরা জানি, ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময়াবধি—শূদ্রদিগের সংস্কৃত পাঠ নিষিদ্ধ ছিল, কারণ উহাঁর ভ্রাতা ৺শম্ভুনাথ বিদ্যারত্ন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীর ৯০ পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেন, "তৎকালে সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতির সন্তানগণ অধ্যয়ন করিতেন * * * শূদ্র বালকের পক্ষে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন নিষেধ ছিল।" কিন্তু সমাজে আমরা কি দেখিয়া আসিতেছি ও এখনও দেখিতেছি? আমরা কি দেখিতেছি না যে, সংস্কৃতের অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণবৎ * পূর্ণ অধিকারবান, বৈদ্যজাতি আবহমান কাল ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় টোল করিয়া ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণকে ব্যাকরণ, দর্শন, অলঙ্কার, কাব্য, আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। লেখক মহাশয় যদি কবি ঈশ্বরগুপ্তের জীবনী পাঠ করেন ত দেখিতে পাইবেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বিজয়রাম দাশ নিজের টোলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ছাত্রগণকে পড়াইতেন, পণ্ডিত তারানাথ বাচস্পতি তাঁহার ছাত্র ছিলেন, আর "কাব্যপ্রকাশ" গ্রন্থখানি যদি পড়েন ত দেখিতে পাইবেন (৪র্থ অধ্যায়) শুদ্ধ প্রকৃত জ্ঞানী ব্রাহ্মণ মম্মটভট্ট বৈদ্য অভিনবগুপ্তের ছাত্র ছিলেন "ইত্যভিনবগুপ্তাচার্য্যপাদা" তখন অন্য পরে কা কথা। আবার বলি, প্রতিবাদী কি জানেন না যে, বাঙ্গালার বৈদ্য

* অধীয়ীরং স্ত্রয়োবর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
প্রব্রুয়াদ্ব্রাহ্মণস্ত্বেষাং নেতরা বিতিনিশ্চয়ঃ॥
(মনুঃ ১—১০অ)

মহিলারা নামান্তে "দেবী" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আর মহামহোপাধ্যায় পূজনীয় পাণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় মল্লিখিত (১৩২৬ আষাঢ় সংখ্যা ভারতবর্ষ) ও পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখিত মহামহোপাধ্যায় ভাগবত পুরাণ ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ-প্রণেতা বৈদ্য বোপদেব গোস্বামীর জাতি ও বংশ শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) ব্রাহ্মণের ঊঢ়া ভার্য্যা বৈশ্য কন্যার গর্ভজাত, সুতরাং বেদে অধিকার আছে * * * আমি বোপদেবকে ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্গত করিয়া (মুখ্য ব্রাহ্মণ) ব্রাহ্মণ সমাজের গৌরব ঘোষণায় অসমর্থ হইতেছি। সত্যের অনুরোধে নিরতিশয় দুঃখের সহিত বলিতেছি—তিনি ব্রাহ্মণ নহেন, জাতিতে বৈদ্য ছিলেন" (অর্চ্চনা পত্রিকা) প্রতিবাদকারী জানেন যে, মহামহোপাধ্যায় শিরোমণি বিদ্যাভূষণ বাচস্পতি বিদ্যারত্ন ও সার্ব্বভৌমাদি উপাধি ব্রাহ্মণ জাতির নির্ব্যূঢ় সম্পত্তি, যদি ইহাই সত্য হয়, তবে ব্রাহ্মণ সমাজে কেমন করিয়া বৈদ্যগণকে এতাবৎ কাল উক্ত উপাধিতে ভূষিত করিয়া আসিতেছেন? উহার প্রমাণ স্বরূপ কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

রমানাথ সার্ব্বভৌম
কলাংতস্য ব্যবাহচ
(কুলপঞ্জিকা কণ্ঠহার ৩৪ পৃঃ

কর্ণপুরাৎ সুতঃ জজ্ঞে
রামচন্দ্র শিরোমণি ১১০ পৃঃ ঐ

সার্ব্বভৌম নরহরি
ভরদ্বাজ কুলোদ্ভব ১১ ঐ

সার্ব্বভৌম জগন্নাথ *পল্লী যশোরাজ্ঞনী
চাধু শ্রীপতি দাশস্য

বিদ্যাভূষণ সাজ্ঞন (২০৬ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা)
পুত্রো বিশ্বেশ্বকোৎ ভবৎ

বাচস্পতি ইতি শ্রুতঃ ১৫৯ ঐ

পুত্র রুদ্রাক্ষ দাশস্য
শিরোমণি রিতিশ্রুতঃ ৩৭২ ঐ

ভূপনারায়ণ জ্যেষ্ঠ
যশচূড়ামণি সংজ্ঞক

ইহা ছাড়া বৈদ্যদের মিশ্র, দোবে, পাড়ে, বিদ্যার্ণব প্রভৃতি উপাধি ছিল, যথা—

নিরোলে * শ্যাম সেনায়
মিশ্রায় চ কনীয়সী (৪৩৫ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা)

হরিসেনস্য মিশ্রস্য
কন্যকা গর্ভসম্ভব } ৪৩৬ পৃঃ „

রঘুসেনেন জগৃহে
নিজ দুর্দৈববশতঃ ১৯২ পৃঃ
শ্যামদাশস্য মিশ্রস্য
কন্যকা কটকস্থিতঃ

বর্ত্তমান কালের মহামহোপাধ্যায়
৺দ্বারকানাথ সেন কবিরাজ
৺বিজয়রত্ন সেন „
শ্রীগণনাথ সেন „
শ্রীযামিনীকান্ত সেন „ এম-এ, এম-ডি
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন „ এম-বি
শ্রীশ্যামাদাস গুপ্ত „ বাচস্পতি বিদ্যাভূষণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রতিবাদকারী জানেন যে, এমন কি, ইংরাজ আমলেও এখনও পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ বৈদ্যাতিরিক্ত অপর কোন জাতি এই মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে অলঙ্কৃত হইতে পান নাই। এই সমুদায় জাজ্বল্য প্রমাণ সত্ত্বেও কি বলিবেন যে, বৈদ্যেরা শূদ্র। গায়ের জোরে মানুষ সব বলিতে পারে, কিম্বা লিখিতে পারে, কিন্তু সুধী পাঠক পাঠিকা তাহা গ্রহণ

* বর্ত্তমান শ্রীখণ্ড সমাজের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম।

করিয়া সত্যের অপলাপ করিবেন, মনে হয় না। বাঙ্গালার অম্বষ্ঠ (বৈদ্য বা কবিরাজী পেশাজীবী) যে একতর মিশ্র ব্রাহ্মণ, তাহা আমি নব্যভারত পত্রিকায় "মহাকবি কালিদাস" শীর্ষক প্রবন্ধে ও অন্যান্য নানা প্রবন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণিত করিয়াছি। প্রতিবাদকারী যদি আরও কিছু দেখিতে চান ত জাতিতত্ত্ববারিধি গ্রন্থের ১ম ভাগটা ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। আশা করি, কোন প্রকৃত ব্রাহ্মণ-সন্তান বৈদ্যগণকে আর শূদ্র বলিতে ক্ষান্ত হইবেন।

প্রতিবাদ-লেখক লিখিয়াছেন, ঢাকার রাজা রাজবল্লভের পূর্ব্বে বৈদ্যজাতির উপনয়নের কোন প্রসঙ্গ ছিল না, ইদানীং আবার পৈতা লইতেছেন ও আপনাদিগকে এক প্রকার ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে সাহসী হইতেছেন !!! ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া এ সব কথা লিখিতে তাঁর হস্ত কাঁপিল না, ইহাই বড় আশ্চর্য্যের কথা! রাজা রাজবল্লভ ইংরাজ আমলের প্রারম্ভ সময়ের লোক—লেখকের লেখার উদ্দেশ্য,ইহার পূর্ব্বে বৈদ্যজাতির গলায় দড়ি ছিল না, একমাত্র ব্রাহ্মণ (মুখ্য)দের গলায় দড়ি ছিল! পাঠক পাঠিকাগণ জানেন বা শুনিয়া থাকিবেন, নুনো পঞ্চাশ প্রায় ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় প্রাদুর্ভূত হন। ৺লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় সম্বন্ধ নির্ণয় গ্রন্থে ব্রাহ্মণ নুনোর যে কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এই—

বল্লাল লয় যদা পদ্মিনী জাতিহীনা
লক্ষ্মণ কহে দ্বিজে এ প্রথা দেখিনা।
তাই বল্লাল ত্যজে কুপুত্র বলি সুতে
লক্ষ্মণ ত্যজে পৈতা বৈদ্যকুল রক্ষিতে।
(৭৩৫ পৃঃ)

রামজীবন শর্ম্মাকৃত বৈদ্যকুলপঞ্জিকা ২২০ পৃঃ

লক্ষ্মণ বলিল বৈদ্যে ডাক দিয়া সবে
ঘুচাও ঘুচাও পৈতা বল শূদ্র সবে।
লক্ষ্মণ অনুগত বৈদ্য পৈতা ঘুচাইল
সেই হতে বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল।
দ্বিজের আজ্ঞায় বৈদ্য পুনঃ উপনীত
পুনরায় দ্বিজ ভাব যথা পূর্ব্বরীত।

গোপালভট্ট লিখিয়াছেন—

"দুরাচার বৈদ্যাকো পৈতা ছিন লিয়া।"

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে কি পাঠক পাঠিকাগণ ইহাই বুঝিবেন না যে, যে সকল বৈদ্য-সন্তান লক্ষ্মণের অমতে পদ্মিনীর পাকস্পর্শে গমন করেন, লক্ষ্মণসেন রাজা হইয়া সেই সেই বৈদ্যের পৈতা ফেলিয়াছেন এবং রাজা রাজবল্লভ বিক্রমপুর, বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি দেশের সেই সেই বৈদ্যের পৈতা দেওয়াইয়াছিলেন, আর যাঁহারা নেন নাই, তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত মাসাশৌচা ও অনুপবীতী আছেন। ব্রাহ্মণ বল্লাল-ঘটিত ব্যাপার পূর্ব্ববঙ্গেই সংঘটিত হইয়াছিল, রাঢ়ীয় বৈদ্য সমাজের উপর উভয়েই কোন হস্তার্পণ করেন নাই বা রাঢ়ে ঐ বিপ্লব ঘটে নাই।

প্রতিবাদকারী লিখিয়াছেন "অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া কোন জাতি ভারতবর্ষে কখন বিদ্যমান ছিল, ইহার প্রমাণ নাই।"

লেখক মহাশয় যদি একবার বাঙ্গালার গণ্ডীর বাহির হইতেন, কূপমণ্ডুকবৎ না থাকিতেন ত দেখিতে পাইতেন যে, মহারাষ্ট্র, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এখনও অম্বষ্ঠ নামে ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান রহিয়াছেন। প্রথমোক্ত দেশে উহারা বৈদ্যোপাধিক যজন যাজন ক্রিয়াশীল ও কেহ কেহ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, দ্বিতীয়োক্ত দেশে উহারা চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, কেবল উহাদের মধ্যে যাহারা কেরাণি বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অজ্ঞান সন্ততিগণ

আজকাল অম্বষ্ঠ কায়স্থ নামের বিষয়ীভূত হইয়াছেন। অমরকোষে এই সকল অম্বষ্ঠগণ শূদ্র পর্য্যায়ে গৃহীত হইয়াছেন। বাঙ্গালার অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) গণ যে স্বধর্ম্মে থাকিয়া (অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতঃ) যজন যাজন ও সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যায়ন-পরায়ণ ছিলেন ও আজও অনেকে আছেন, তাহা পারশব অমরের জানা ছিল না, তাহা না হইলে আয়ুর্ব্বেদ-কৃতাভ্যাসো ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ

অধ্যায়োঽধ্যাপনঞ্চৈব চিকিৎসা বৈদ্য লক্ষণম।

সমগ্র অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) জাতিকে শূদ্র পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া—সত্যের অপমান করিতেন না। চন্দ্রপ্রভা হইতে জানা যায় যে, অম্বষ্ঠগণ অনেকে আর্য্যাবর্ত্তের পথে কেহ বা দাক্ষিণাত্য হইয়া বাঙ্গালায় আসিয়া বনবাস করেন ; যথা—

অর্য্যাবর্ত্তাৎ সমাগত্য বঙ্গদেশে মহাবলাঃ
অম্বষ্ঠাঃ সরন্ রাজন স্বাধিপত্যং বাভবত।

প্রতিবাদী আরও বলিয়াছেন, বাঙ্গালার বৈদ্যরা বর্ণ-সঙ্কর। যদি লেখক মহাশয়ের বর্ণ-সঙ্কর শব্দের প্রকৃতার্থ জানা থাকিত, তাহা হইলে চেনা বৈদ্যগণকে একথা বলিয়া গালি দিতে পারিতেন না। তিনি কি "স্ত্রীষুদুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণশঙ্করঃ (গীতা) অথবা "স্বকর্ম্মানাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণশঙ্করা (মনু) এই দুটী বচনও পড়েন নাই। আমার মনে হয়, লেখকের মনুসংহিতা মহাভারতাদি গ্রন্থ পড়া নাই, থাকিলে—

"ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্য কন্যায়াং—
অম্বষ্ঠঃ নাম জায়তে (মনু সং)
বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ
জাতোহ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে (উশনা)
যেন জাত স এবহি (মহাভারত)

—বৈদ্যগণকে বর্ণশঙ্কর বলিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিতেন না। লেখক মহাশয় স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের দোহাই দিয়াছেন। রঘুনন্দন একজন অমুনি, অঋষি ও অবেদাধ্যায়ী ও একদর্শী স্বার্থপরায়ণ ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন, তিনি কেবল বাঙ্গালার বৈদ্য জাতির আচার ভ্রষ্টতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাই উঁহাদিগকে শূদ্রবৎ বলিয়া গিয়াছেন। পাঠকগণ বিবেচনা করুন, আদিশূরের বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ আনয়ন কি বাঙ্গালার তৎকালীন ব্রাহ্মণগণের আচারভ্রষ্টতার কারণ নহে? কিন্তু সেই সপ্তশতী বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ দলে মিশিতে পারিয়াছিলেন, কেবল যত দোষ নন্দ ঘোষ!! আর যে আচারভ্রষ্টতা দোষে বাঙ্গালার বৈদ্যরা পতিত হইয়াছিল (সকলে নয়) সেই দোষে কি বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ জাতিও পতিত নয়? বেদজ্ঞানহীন, আচারবিহীন ভারতের ১৫ আনা ব্রাহ্মণগণ মনু বচনানুসারে শূদ্রত্ব পায় নাই? সেখানে রঘুনন্দনের স্মৃতি কি বলে, লেখক মহাশয় বলিয়া দিলে ভাল হয়। আর যদি মনুর পূর্ব্বোক্ত নিয়ম সত্য হয়, তবে বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মণ রাজা, মহারাজা, জমীদার, ব্যুটওয়ালা, জুতাবিক্রেতা, উকিল প্রভৃতির দশা কি হইবে, তাঁহারাও কি বৈদ্যদের মত শূদ্র পদবাচ্য নহেন?

প্রতিবাদকারী চন্দ্রপ্রভার "কনৌ শূদ্র সক্ষমতা" উক্তি অস্বীকার করিয়া বলিতে চান, যখন মহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক বৈদ্য হইয়া স্বজাতিকে শূদ্রসম বলিয়া গিয়াছেন, তখন আর কি আছে। ভরতমল্লিক মহাশয় বৈদ্যজাতির নিয়ন্তা ছিলেন না, আর দ্বিতীয়তঃ এ উক্তি তাঁহার গ্রন্থে অধ্যাহৃত হইয়াছিল মাত্র, তাঁহার অভিমত ছিল না। দ্বিতীয়তঃ তৎকালীন বৈদ্যদের আচারহীনতা দর্শন করিয়া সত্যানুরোধে (রঘুনন্দনের ন্যায়

সত্যলোপী না হইয়া) নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়া যান। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে কিরূপে তিনি স্বগ্রামে টোল খুলিয়া ব্রাহ্মণ বৈদ্যদিগকে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতেন, আর নিজেই বা কিরূপে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন ?

প্রতিবাদীর অপর জিজ্ঞাস্য, আমি "করশর্ম্মা ভরদ্বাজ ধরশর্ম্মা পরাশর মোদগল্য দাশশর্ম্মা গুপ্তশর্ম্মাশকাশ্যপঃ।" এই কারিকা কোথা হইতে পাইয়াছি। এ কারিকা আমাদের বাটীর প্রাচীন পুস্তকে লিখিত ছিল, আর আছে জাতিতত্ত্ব-বারিধি গ্রন্থের ১৮৭ পৃষ্ঠায়। লেখক মহাশয়ের যদি ইহাতে অবিশ্বাস হয় ত তিনি বেদাচার্য্য পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (মানবের আদি জন্মভূমি-গ্রন্থ-প্রণেতা) মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়া জানিতে পারেন।

আর লেখক মহাশয় ৺লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থ হইতে যে কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, (৩য় সংস্করণ ৩৬৫ পৃঃ) উহা বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে প্রযুজ্য। এবং ঐ সকল উপাধিমান্ ব্রাহ্মণগণ যেমন ব্রাহ্মণ কর ধর নন্দী রক্ষিত দাশ প্রভৃতি উপাধিবান, বৈদ্য সন্তানগণও তদ্রূপ একতর ব্রাহ্মণ।

প্রতিবাদকারী বলিয়াছেন, বৈদ্যরা কখন শর্ম্মা উপাধি ব্যবহার করেন নাই। অবশ্য বহুদিন যাবৎ বাঙ্গালার বৈদ্যজাতি নামান্তে শর্ম্মাশব্দ ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু বহু প্রাচীন কালে যে তাঁহারা ব্যবহার করিতেন, ক্রমশঃ তাহার নিদর্শন আজ কাল পাওয়া যাইতেছে। প্রতিবাদকারী যদি অনুগ্রহ করিয়া ১৩২০ সালের ভাদ্র মাসের সাহিত্য পত্রিকার রাজসাহী কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক কর্তৃক প্রকাশিত তাম্রশাসন খানি পাঠ করেন ত দেখিতে পাইবেন, উহাতে গুপ্ত শর্ম্মা উপাধি তদানীন্তন কালে কোন কোন বৈদ্য-সন্তান ব্যবহার করিতেন, পরে কালের কুটিল গতিতে ও সর্ব্বগ্রাহী ব্রাহ্মণগণের অত্যাচারে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। আমি পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির জন্য উক্ত তাম্রশাসনের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা—

"মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমান চন্দ্রদেবঃ কুশলী শ্রীপৌণ্ড্রভুক্ত্যান্তর্পাতিনান্ধমণ্ডলে নেহকাষ্ঠি গ্রামে পাঠকভূমৌ সমস্তরাজভোগ কর হিরণ্য প্রত্যায় সহিতা শণ্ডিলা (শাণ্ডিল্য) স (স) গোত্রীয় এষিপ্রবরায় মকরে গুপ্তস্য প্রপৌত্রায় বরাহগুপ্তপৌত্রায় সুমঙ্গলগুপ্তস্য পুত্রায় শান্তিবারিক শ্রীপীতবাসঃ গুপ্তশর্ম্মণে বিধি পূর্ব্বক তাম্রশাসনাকৃত্য প্রদত্তা স্মাভিঃ।" অর্থাৎ মহারাজাধিরাজ শ্রীমান চন্দ্র দেব মকরগুপ্তের প্রপৌত্র বরাহগুপ্তের পৌত্র সুমঙ্গলগুপ্তের পুত্র শান্তিবারিক শ্রীপীতবাস গুপ্ত শর্ম্মাকে যথাবিধি জলস্পর্শ করিয়া পৌণ্ড্রভূমির অন্তর্পাতি নান্ধমণ্ডলস্থিত নেহকাষ্ঠি গ্রামে পাঠক পরিমিত ভূমি দান করিয়াছিলেন।

এ বিষয়ে আমার আর অধিক বক্তব্য কিছুই নাই, সংক্ষিপ্ত ভাবে যাহা উক্ত হইল, উহাতেই সুধী পাঠক পাঠিকাগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, আমি ঠাকুর নরহরি সরকারের জীবনীতে ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিয়াছি কিম্বা কেবলমাত্র সত্য কথা লিখিয়াছি কি না ? প্রতিবাদ লেখক মহাশয় ব্যবহারোপজীবী, মক্কেলের কথা বেচিয়া খান, কাজেই তাঁর শাস্ত্রাদি বিষয়ে জ্ঞান অল্প, কাজেই অযথা ও অনেক অবান্তর কথার

প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বেশ জানেন, কোন জাতির গৌরব বৃদ্ধি করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। পরমপিতা পরমেশ্বরের নিকট সকল জাতিই সমান ও সমাজে সকল জাতির সমান উপকারিতা আছে, ধ্বংসপ্রায় হিন্দু জাতির মধ্যে জাতীয় বিদ্বেষের বহ্নি প্রধূমিত করা আমার আদৌ ইচ্ছা নাই, কারণ তাহাতে আমাদের অশেষ অকল্যাণ সাধিত হইবে। আশা করি, প্রতিবাদকারী প্রত্যুত্তর পাঠে শান্ত হইবেন ও সত্যের খাতিরে কোথাও কোথাও অপ্রীতিকর কথা বলায় আমাকে ক্ষমা করিবেন। *

শ্রীরাজকিশোর রায়।

প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষা।

বাগানের শত গাছে শত ফুল ফুটে আছে
সুরভিতে সুরভি ঢালিয়া ;
কুঞ্জবনে শত পাখী শত ডালে বসে থাকি
ঐকতানে গাহিছে মাতিয়া।
নির্ঝরেরা ঝর ঝর প্রেমে ভরা কলেবর
ঢালে জল সরিতের বুকে ;
প্রকৃতির ঘরে ঘরে বিচিত্রতা বাস করে,
তবু সবে মিলে আছে সুখে।
বহু প্রাণ এক ঠাঁই মিলে যেন ভাই ভাই,
এক উক্তে কহে যেন কথা,
অকরুণ আঁখি লয়ে কারো পানে কেহ চেয়ে
দেয় নাকো মরমেতে ব্যথা।
কিন্তু হায়! ধরাতলে মুক্তিদাতা-ক্রুশতলে
একত্র মিলেছে কহে যারা,
কেন তারা রুক্ষ মুখে এক অপরের দুখে
ফেলে নাকো নয়নের ধারা?
কেন তারা রুদ্ধ প্রাণে এক চায় অন্য পানে?
হৃদয়েতে নাই যেন স্থান?—
পর পর, দূর দূর, শূন্য যেন শান্তি-পুর,
মনে মনে মহা ব্যবধান।—
কখন বা ছুরি-করে ভ্রাতৃ-হিয়া বিদ্ধ করে
প্রতিহিংসা অনলে জ্বলিয়া,—
মুখে জীবনের গান, প্রাণহীন মহা পাপ,
বিষ আছে হৃদয় ভরিয়া।—
ঐ দেখ রক্ত-ধার বহিতেছে দেহে কার?
কারে তুমি দিতেছ বেদন?
তোমাদের নিপীড়নে মুক্তিদাতা সঙ্গোপনে
মুখ ঢাকি করেন রোদন!

যৌবনে যখন পথিক-বেশে দেশে দেশে ঘুরে ফিরে প্রেমাবতার খ্রীষ্টের চরণে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তখন খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী মধ্যে শুষ্কতা দেখে এই কবিতাটী লিখিয়াছিলাম। এখন যাত্রা শেষে শ্রান্ত পথিক পান্থশালায় বসে "আর কত দূর," "আর কত দূর" বলে সম্মুখের পথাবশিষ্টের পানে চেয়ে আছে। কিন্তু কাণে এখনও যেন ঐ কবিতাটীর সুর বাজছে। প্রাণ যেন কি চায়, কি যেন পায় না। ইচ্ছা করে বুকে জড়িয়ে ধরে নিঝুম হয়ে বসে থাকি। কিন্তু কাকে জড়াই—কেই বা আমার বুকের ভিতর ধরা পড়ে? শূন্য—শূন্য—মহাশূন্য— মায়া মরীচিকা! ধূ ধূ—ধূ ধূ—ধূ ধূ!

জীবনটা কি তবে "ধূ ধূ" লইয়াই শেষ হইবে? যিনি তৃষ্ণা দিয়াছেন, তিনি কি জল দেন নাই? জল আছে, কিন্তু যেখানে খোঁজা উচিত, সেখানে খুঁজিনা বলে পাই

* এ সম্বন্ধে আর বাদ প্রতিবাদ নব্যভারতে ছাপা হইবে না। ন, স।

না। সাহারা মরুতে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীকে খুঁজি, কিন্তু সেখায় তারা কোথায়? জলের আশায় বালুতে বুক পুড়ে যায়। অমৃত বলে গরল সাগরে ঝাঁপ দিই।

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু,
অনলে পুড়িয়া গেল;
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।"

ঐ মেয়েটা বুক খুলে একটা মানুষকে ভালবাসতে গেল, মানুষটা লাথি মেরে তার বুকটা ভেঙ্গে দিল। কিন্তু ঐ ভাঙ্গা বুকের মাঝখান থেকে যে প্রেমের নদী বেরিয়ে আসছে, তাকি কখনও দেখেছ? যদি না দেখে থাক, তবে তুমি অন্ধ। যদি ঐ পুরুষটা ঐ মেয়েটাকে বুকে চেপে ধরত, তাহলে ঐ বুকের ভিতর প্রেমটা কৌটায় বদ্ধ হয়ে থাকত। যে ফুলটা ফুটল না, তার আবার সৌন্দর্য্য কি? যে বুকটা ভাঙ্গল না, তার আবার মাধুর্য্য কি? বৈথনিয়ার ভোজ-বাসরে মার্থার বোন মরিয়ম শ্বেত পাথরের কৌটা ভেঙ্গে যীশুর চরণে আতর ঢেলে অমর হয়ে গেছেন। ঐ নারীর যথা সর্ব্বস্ব ঐ কৌটায় ছিল। কৌটা না ভাঙ্গলে সে আতরকে জানত? নারী-হৃদয়ের অহেতুকী প্রেমের কে খবর পেত?

অতএব ভগ্নেই সুখ। ঐ যে ভাঙ্গা হৃদয় কাঁদছে, তার ঐ ক্রন্দনেই সুখ। তার ঐ বুকের ভিতর প্রবেশ করে দেখ, সেখানে কি সুখের লহরই উঠছে। তার হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি মুগ্ধ হয়ে বাজছে। মরুভূমির বালুর ভিতর কুঁয়া খুঁড়ে নীচে চলে যাও। গঙ্গা নাই, যমুনা নাই, পদ্মার উত্তাল তরঙ্গ নাই। নীরবে, নিঝুমে সেই কুঁয়ার নীচে অজস্র প্রেমের উৎস উঠছে—অসংখ্য প্রেমের ফোয়ারা ছুটছে। শ্রান্ত পথিক প্রেম খুঁজে খুঁজে সারা হচ্ছে। বাড়ি বাড়ি ভিখারীর মতন ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। খালি ঝুলি কাঁধে করে সন্ধ্যাবেলায় পান্থ-শালায় ফিরছে। তৃপ্তি নাই—তৃপ্তির স্থানে যাও নাই, তাই পাও নাই।

আমরা পরের কাছে প্রেম চাই, কিন্তু নিজের প্রাণটা খুঁড়ে প্রেমের নদী বার করতে জানি না। জগতে অল্প নদীই উপরে উপরে বয়। অধিকাংশ জলধারা অন্তঃসলিলা। যে মাটীর উপর দাঁড়িয়ে আছ, একটু খুঁড়ে দেখ, কত স্রোত নীরবে বয়ে যাচ্ছে। গঙ্গা, যমুনা ও পদ্মার জল অতি অল্প ক্ষেত্রেই পৌঁছে। কিন্তু ঐ অন্তঃসলিল স্রোতগুলিই ধরাটাকে হরিৎ পোষাক পরাইয়া রেখেছে। কজন মানুষ কটা গাছের গোড়ায় জল দেয়? প্রকৃতি নিজেই নীচের জল উপরে তুলে জগতের তরু লতাদের পালন কচ্ছে—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রান্তর সবুজ ঘাসে ঢেকে রেখেছে। উপরের জল, দৃশ্যমান জল, উত্তাল তরঙ্গ তুলে সাগরের পানে ধায় বটে, কিন্তু যে জল জগতে প্রাণ যোগায়, তার স্রোতটা মাটীর নীচে নীচে বয়। এ তত্ত্ব যে জানে, সেই প্রেমিক—সেই প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত।

এ কালে অনেকে মনে করেন, খ্রীষ্ট যীশু ভগ্ন-হৃদয় হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছেন। কথাটা সত্য; ইহুদীরা তাঁকে বুঝল না—শিষ্যরাও তাঁকে বুঝল না। তিনি প্রেম প্রেম করে হস্তদ্বয় প্রসারিত করলেন, সেই প্রসারিত হস্তদ্বয়ে লোহার প্রেক ঠুঁকে মানুষ তাঁকে ক্রুশ দিয়ে বধ করল। তবু তাঁর বুকখানা মানুষের দিকে খোলা রইল। সেই খোলা বুকে তিনি মানুষকে ডাকলেন,

আয়—আয়—আয়। কিন্তু মানুষ কি এল? ঐ মহা জনতা তাঁর ক্রুশ-তলে দাঁড়াইয়া কেহ ব্যঙ্গোক্তি কচ্ছে—কেহ তাঁহার দেহ হতে উত্তারিত কাপড়খানা লইয়া টানাটানি কচ্ছে—কেহ বা একটা বল্লম দিয়া তাঁহার স্থগিত হৃদ্‌পিণ্ডটা বিদ্ধ কচ্ছে। তিনি বলছেন "প্রেম"—তারা বাড়াচ্ছে বল্লম। তিনি ভগ্ন হৃদয় হয়ে মারা গেলেন।

কিন্তু ঐ মৃত্যুই জগতের জীবন হ'ল। কৌটা ভাঙ্গল, আতর বেরুল, বিশ্বময় তার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। প্রাচীন খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর ইতিহাস পড়, এ প্রেমের আশ্চর্য্য লীলা দেখবে। সহস্র সহস্র নরনারী ঐ প্রেমের খাতিরে পাগল হয়ে অগ্নিকুণ্ডে—অ্যাম্ফিথিয়েটারে—ঘাতকের কুঠার তলে প্রাণার্পণ করতেন। পরিত্রাণের আর কোনও অর্থ থাক্ আর না থাক্, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের আর কোনও ব্যাখ্যা হতে পারুক আর না পারুক, খ্রীষ্টের এই আত্মঘাতী প্রেমই খ্রীষ্টানের পূজ্য পদার্থ। "আত্মঘাতী" শব্দটা শুনতে ভাল শুনায় না। কিন্তু প্রকৃত প্রেম আত্মঘাতীই বটে। কৌটাটা আছাড় মেরে ভূমিতলে ভেঙ্গে ফেল—আত্মঘাতী হও—আতরের গন্ধে জগৎ মাতিয়া যাইবে। আত্মহত্যা পাপ; কিন্তু প্রেমের অভিধানে আত্ম বা আমিত্বের হত্যাই প্রেমের জীবন। তাই খ্রীষ্ট দারুণ ক্রুশকাষ্ঠে আত্ম বা আমিত্ব বলিদান করে প্রেমে জীবন সঞ্চার করলেন।

দাউদের বংশধর, ইহুদিদের রাজনন্দন এবার নব সাজে জগৎ জয় করতে বেরুলেন। সশরীরে নয়, অশরীরে। কন্দর্পের কনক কায়া ভস্ম হইয়া গিয়াছে, তাই তো তার এত বল। ভস্ম না হলে বল পাবে না—মৃত্যু না হলে জীবন পাবে না—বুক না ভাঙ্গলে বুক খুলবে না। খ্রীষ্টের বুক ভাঙ্গল, কোটী বুক খুলে তাঁকে গ্রহণ করল। প্রেম তাঁর সেই প্রেমে ঈশ্বরত্বের ছটা অনুভব করে তাঁকে অবতার বলে পূজা করল। সেই মানুষটা ক্রুশে না মরলে কখনও অবতার বলে পূজিত হতেন না।

মানুষকে ঈশ্বর বলা পাপ। আমি বলি, শুধু পাপ নয়, মহাপাপ। কিন্তু ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। যে হৃদয়ে প্রেম, সে হৃদয়ে ঈশ্বর। যে হৃদয়ে যতটা প্রেম ফোটে, সে হৃদয়ে ততটাই ঈশ্বরের অরূপ রূপ চোখে পড়ে। খ্রীষ্টের সেই বুকভাঙ্গা প্রেমে মানুষ যদি ঈশ্বরকে দেখে থাকে, তবে তাকে অবতারবাদী বলে ঘৃণা করোনা।

অপরের সমালোচনা করে, অপরকে গালাগালি দিয়ে কি লাভ? প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে একবার জগতে যাও। প্রেম পাবে বলে আশা করোনা। জগতের শুষ্ক পথে উছোট খেয়ে পড়বে। পথকে গালাগালি দিও না। যে ইটখানা পায়ে লাগায় উছোট খেয়ে পড়ে গেছ, সে ইটখানাকেও গালাগালি দিও না। বরং সে ইটখানাকে চুম্বন করো'। পড়ে গিয়ে বুকখানা যখন ভেঙ্গে যাবে, তখনই প্রেমতত্ত্ব শিখবে। ভালবাসা পাওয়ার কোন মূল্য নাই। ভাল বাসতে পারায় মূল্য। যে ভাল বেসেছে, সে জগৎকে অমূল্য ধন দিয়েছে। জগতের মুক্তি ভালবাসা দানে। প্রচারে—বক্তৃতায়—মত মতান্তরের খণ্ডনে জগৎ মুক্তি পাবে না। খ্রীষ্ট যখন প্রচার বন্ধ করে ক্রুশে গিয়া চড়লেন—তাঁর হাত পা বিদ্ধ হ'ল—রসনা আড়ষ্ট হ'ল—রোমক সৈনিক বড়শাঘাতে তাঁর ভাঙ্গা বুক চিরল, তখনি জগৎ তাঁ দ্বারা মুক্তি পেল। বোবা হয়ে আছাড় খেয়ে পড়, বুকটা ভেঙ্গে যাক, জগৎ মুক্তি পাবে।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

অভিভাষণ *

সম্মিলিত মহোদয়গণ,

আপনারা যে অপরিসীম স্নেহ পক্ষপাত দেখাইয়া, আমাকেই এ সভার নেতৃত্ব করিতে আহ্বান করিয়াছেন, তাহার জন্য আপনাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইদানীং বাঙ্গালা দেশে সাহিত্য-সভা একটা বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান রূপে পরিব্যাপক হইয়া পড়িতেছে; এবং সাহিত্যিক সম্মিলনও একটা জাতীয় উৎসব রূপে দাঁড়াইয়া যাইতেছে, আমরা যে বাক্‌দেবীর প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং আমাদের জাতীয় জীবন সাধনার ক্ষেত্রে তাহার বিস্তারিত প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতাও উপলব্ধি করিতেছি, তাহা এইরূপ সম্মিলনের বাহুল্য হইতেই ধারণা করা যায়।

আমরা যে যুগধর্ম্মের সত্যপথে এবং অপরিহার্য্য গন্তব্যের পথেই চলিতেছি, তাহাতে সন্দেহ হয় না। আমাদের সমাজে সকল দিক হইতেই সম্মিলন বলিয়া ব্যাপারটীর যত আবশ্যকতা আছে, উহার সঙ্গে অন্য কোনও অভাবেরই তুলনা হয় না। আমাদের অভাব নানামুখী এবং অসংখ্য হইলেও উহাদের অনেকটাই যে এই সম্মিলন শক্তির অভাব হইতেই অত্যাহিত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং সর্ব্ব প্রথম এই দিক হইতেই যে চেষ্টা আরম্ভ করিতে হইবে, তাহা এদেশের চিন্তাশীল মাত্রই বুঝিতেছেন। আমাদের সমাজ এতকাল কেবল মর্ম্মতঃ এবং বাহ্যতঃ ভেদকেই স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক মনুষ্যের জন্মগত ভেদ আদর্শ প্রবল করিয়া এবং ওই রূপে বাহ্যিক প্রতিযোগিতা নিবারিত করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে স্বাধীন করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। উহার ফলেই আমরা ক্রমান্বয়ে অন্য জাতির সঙ্গে সাংসারিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অসমৃদ্ধ, পরাজিত এবং পরাহত হইয়া আসিতেছিলাম। কিছুকাল এই বিষম জাতিগত দৈন্য এবং দুর্ব্বলতার দিকে আমাদের দৃষ্টি গিয়াছে। এই নিদারুণ রাজযক্ষ্মার ঔষধ কি? অনেকে উহা দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া, এবং আমাদের মৃত্যুই নিশ্চিত এবং কালধর্ম্মে অপরিহার্য্য জানাইয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন, অনেকে সনাতন ধর্ম্মের দোহাই পাড়িয়া আমাদিগকে কেবল ভেদনিষ্ঠ এবং মৃত্যুশীল আধ্যাত্মিক মানুষ বলিয়া আত্মপ্রসাদ উপার্জ্জনে চেষ্টিত আছেন। তবে ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ, এজন্য এই বিশাল জাতিমধ্যে এমন লোকেরও অভাব নাই, যাঁহারা এই দুঃখ শোকাময়প্রদ হলাহল ধর্ম্মী এবং মৃত্যুপ্রদ ভেদ-তন্ত্রকে সার্ব্বজাতিক সম্মিলন মন্ত্রে চিকিৎসা করিতে চাহিতেছেন। এ ক্ষেত্রে কেবল মন্ত্র চিকিৎসায় কাজ দেখিবে কিনা, কে জানে, তবে কিনা যে ভাবেই হউক, শ্মশানাস্তং চিকিৎসয়েৎ।

আমরা সাহিত্যকে কেবল সম্মিলনের অছিলাতেই গ্রহণ করিয়াছি, এমন নহে, যাঁহারা ইতিহাস জানেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, এই ভারতবর্ষে সমাজ-তন্ত্রে আবহমান কাল হইতে সাহিত্যই সর্ব্ব প্রধান

* "কধুরখীল সাহিত্য-সভা"র একাদশ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ।

ক্রিয়াশক্তি। যাঁহারা এদেশে বর্ণাশ্রম আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সাহিত্যের সাহায্যেই করিয়াছিলেন। ইতিহাস পুরাণের বক্তৃতা এবং কথকতার সাহায্যেই প্রচার নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। সাহিত্যের ন্যায় সম্মিলনের জন্য এমন সমভূমি, বিস্তারিত ক্ষেত্র, অথবা স্থায়ী কর্ম্মভিত্তি মনুষ্যের পক্ষে আর হইতে পারে না। সাহিত্যের আদি অন্তে এবং মধ্যে কেবল সম্মিলন আদর্শেরই নানামুখী লীলা। সহিতের ভাব হইতেই সাহিত্য। সাহিত্যে যেমন বর্ণমালার সম্মিলন, যেমন শব্দ ও অর্থের সম্মিলন, যেমন রস ও ভাবের সম্মিলন, যেমন ভাব ক্রিয়া ও বাক্যের সম্মিলন, তেমনি লেখকের সহিত পাঠকের, গুরুর সহিত শিষ্যের, বক্তার সহিত শ্রোতার, যুবার সহিত বৃদ্ধের সম্মিলন। আবার সহানুভূতির পথে এবং সমভাবে সমাজে সমাজে, জাতিতে জাতিতে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে মিলন করিতে পারে, কেবল এই সাহিত্যে। অতীত ও বর্ত্তমান, দূর ও নিকট, জন্ম ও মৃত্যু, সসীম ও অসীম, সম্মিলিত, একত্রিত এবং ওতপ্রোত হইয়া থাকিতে পারে, তাও সাহিত্যে। সুতরাং আমাদের সর্ব্বপ্রকার আশা ও উত্তম, জ্ঞান ও কর্ম্ম,সাধনা ও সিদ্ধির মূল শক্তি এবং সফলতার রহস্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে আছে জানিয়াই ইদানীং তদনুসারে চলিতেছি, আপাততঃ সাধারণের দৃষ্টিতে বেশী দূর প্রতিভাত না হইলেও,দূরদর্শী মাত্রেই আমাদের প্রতি কথার সারবত্তা অনুভব করিবেন।

এখন জাতীয় জাগরণের নবযুগ উপস্থিত, সমস্ত বিশ্বে নব উদ্বোধনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীকে সর্ব্বপ্রথম তাহার সাহিত্যের দিকেই সচেতন হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, যাহার যেমন শক্তি, পূজা এবং তপস্যা, তাহাকে সেই অনুপাতেই জাতীয় বাণী-যজ্ঞে উপঢৌকন দিতে হইবে, না করিলে তিনি জাতিদ্রোহী, দেশদ্রোহী এবং অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে পতিতই হইবেন। প্রত্যেককেই এই যজ্ঞ-তন্ত্রে শিক্ষিত এবং দীক্ষিত হইয়া, অন্ততঃ পাঠক এবং শ্রোতা হইয়া, অথবা শক্তি থাকিলে কর্ত্তা, হোতা এবং তন্ত্রধার হইয়া, অথবা উৎসাহে বা অর্থ সামর্থ্যেও উহার পরিপোষক হইয়া যোগ দিতে হইবে।

বাঙ্গালীর ঘরের মধ্যেই যে তাহার বাণী-যজ্ঞ সমাধার প্রধান দানবী বাধা লুকাইয়া আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। প্রধান যজ্ঞ হিংসক আমাদের শিক্ষা-মন্দিরকেই দুর্গ করিয়াছে। আমাদের শিক্ষা গৃহগুলি, উচ্চ-অঙ্গের বিদ্যাগৃহগুলি এতকাল কেবল ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা গৃহরূপেই প্রধানভাবে দাঁড়াইয়াছিল। উহারা কেবল অবিদ্যার গৃহরূপেই পরিণত হইয়া এতকাল সমস্ত দেশের তরুণ রক্তমাংস চোষণ করিতেছিল। এখন সৌভাগ্যযোগে স্রোত ফিরিতেছে। অপ-দেবতার বড় বড় উৎপাত কাটিয়া যাইতেছে। গত দশ বৎসরের মধ্যেই প্রকৃত নেতৃ-সঙ্গমে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় তাহা কেরাণীখানা হইতে প্রকৃত শিক্ষালয় হইবার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। বঙ্গের সমস্ত জ্ঞানীগুণীগণ, উন্নত শ্রেণীর শিক্ষার্থীগণ, শক্তিমান্ কর্ম্মী এবং পিপাসুগণ একই ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইতেছেন, সম্মিলিত সাধনায় সুযোগও লাভ করিয়াছেন। ইতোমধ্যেই এতদ্দেশের জ্ঞানকর্ম্মের ক্ষেত্রে প্রকৃত কর্ষণ এবং শক্তি প্রচেষ্টার আলোড়ন, জাগিয়াছে। বাঙ্গালী এতকাল সারস্বত জ্ঞান কর্ম্মের বিষয়েও বিশ্বের অন্য জাতির কেবল দ্বারস্থ

থাকিয়াই ভিক্ষাবৃত্তি করিতেছিল—কেবল প্রতিগ্রহ করিয়াই সুখী ছিল; এখন দান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এত বড় একটা বিশাল জাতির পক্ষে স্বয়ং অদাতা থাকিয়া কেবলই প্রতিগ্রহ! উহা অপেক্ষা বীভৎসতর নরকবাস আর কি হইতে পারে?

বাঙ্গালীর সাহিত্যে এবং তাহার জাতীয় স্বানুভূতির অন্তর্গতেও যুগান্তর উপস্থিত। আমরা জানি, প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে, রামমোহনের দীক্ষায় বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক এবং বাচকের পরিচালন-পথে বাঙ্গালীর হৃদয় যে হোতৃকর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, মধুসূদন, হেম, নবীন, বঙ্কিম, কালীপ্রসন্ন ও রবীন্দ্রনাথ তাহারই বিশ্রুত-কণ্ঠ উদ্‌গাতা হইয়াছেন। বাঙ্গালীর বাণী-যজ্ঞে অমৃত বিধায়িনী আহুতি চলিতেছে। উহার দরুণেই এমন আত্মবুদ্ধিতে সচেতন এবং রসনাশীল বাঙ্গালী মাত্রেই বলিতে পারিতেছেন, "অপাম সোমমমৃতা অভূমঃ।" সেই যে যজ্ঞ আরব্ধ হইয়াছিল, উহার ত শেষ নাই। উহা নিত্যযজ্ঞ, ভগবান করুন, যতকাল বাঙ্গালী জাতি এই ধরাপৃষ্ঠে বর্ত্তমান আছে, ততকাল যেন উহার জীবন-যজ্ঞে নব নব সুধা অর্জ্জনের এবং সুধা দানের ক্ষমতা কুত্রাপি ক্ষীণ না হয়। তবে এই যজ্ঞকুণ্ড হইতে সময়ে সময়ে যে হলাহলও উঠিয়া আসিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বঙ্গসাহিত্য এখন বিশ্ব-সমুদ্রকেই মন্থন করিতেছে বলিয়া উহাতে অমৃতের সঙ্গে সঙ্গে হলাহলও না উঠিয়া যায় না, কেন না, বিশ্বের মধ্যে উভয় তত্ত্বই আছে। তবে বাঙ্গালার অমৃতপায়ী অমর নীলকণ্ঠ সমস্ত বিষধর্ম্মকে অনায়াসেই প্রতিষিদ্ধ করিয়া এবং জীর্ণ করিয়া ফেলিবেন।

এতকাল পরেই বঙ্গ সাহিত্যের মাহেন্দ্র যোগ উপস্থিত। বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয় এই যজ্ঞকে রাজসূয়ে পরিণত করিয়াছেন। যেমন গ্রীক্, লাটিন, ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মেণ, আরবী, পার্শী, চীনা, জাপানী ও তিব্বতী আমাদের সভাসদ্ হইয়া উপস্থিত, যেমন প্রত্যেকেই নব নব উপঢৌকন এবং আশীর্ব্বাদ লইয়া উপস্থিত, তেমনি পালি, প্রাকৃত, আসামী, উড়িয়া, হিন্দী, মৈথিলী, মারাঠী, গুজরাটী, তামিল, তেলেগু, কাণাড়ী, মলয়ালম্ এবং সিংহলীও আমাদের করদ ও মিত্ররূপে আসন্ন হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্য কেবল দশটী বৎসর সাক্ষাৎভাবে ইহাদের সঙ্গে দান প্রতিগ্রহের সম্বন্ধ রাখিতে পারিলে, কি ফল পরিদৃশ্যমান হইবে, ভাবিয়া দেখুন। এই মহাযজ্ঞে প্রত্যেক শক্তিমান সাহিত্য-সেবী এবং সাহিত্য-প্রেমিককেই, প্রত্যেক বাঙ্গালীকেই নিজ নিজ সামর্থ্য উপযোগী কর্ম্মস্থান বরণ করিয়া লইতে হইবে। এক্ষেত্রে কত সুকর্ম্মণ্য, যশস্য এবং দায়িত্বযুক্ত কর্ত্তব্য আছে! কোথাও কেবল অবিশ্রান্ত ভাবে, ক্ষুধা নিদ্রা বিস্মৃত হইয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। বিদেশের রত্নজাতকে যথাবৎ ভাণ্ডার-গত করিয়া, যথাস্থানে শৃঙ্খলা করিয়া কর্ম্মী-গণের সত্তঃ ব্যবহারের উপযোগী করিয়াই রাখিতে হইবে। কোথাও কেবল অবিরত অশেষ বিশেষে দান এবং পরিবেশনের কার্য্যই সমাধা করিতে হইবে। বাগ্দেবীর এই মহা মন্ত্রে কত শ্রম-বিভাগের, কত অধিকার-ভেদের, কত অভাব সম্পূরণের কত কাজ আছে! উহাতে গ্রহণ ও বর্জ্জন, অনুবর্ত্তন, অনুসাধন এবং সমীকরণের কত কর্ত্তব্য! নির্ম্মাণ, অলঙ্করণ এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচালন এবং পরিবাহনের কত দায়িত্ব! নিজের

বুদ্ধিশক্তি এবং অর্থসামর্থ্যের অবারিত এবং অকার্পণ্য দান দক্ষিণা এবং বলি উৎসর্গের কত অবসর! উহা জাতির পক্ষে, সাধক মাত্রের পক্ষেই সর্ব্বস্ব দক্ষিণ মহাযজ্ঞ।

প্রত্যেক বাঙ্গালীই এই মহাযজ্ঞের কর্ত্তা, ভোক্তা এবং শাশ্বতীসিদ্ধির অধিকারী। বাঙ্গালার প্রত্যেক ডিভিসন, জেলা, গ্রামের, ভুক্তি মণ্ডল মণ্ডলের প্রত্যেক ধনী দরিদ্র, বিদ্বান, বুদ্ধিমান বা যে কোনরূপ শক্তিশালী ব্যক্তির ইহাতে কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব আছে। বাঙ্গালার প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে সাহিত্যকর্ম্মী এবং সাহিত্য প্রেমিকগণের এইরূপ সভা সম্মিলন হইয়া বাঙ্গালীর এই জাতীয় আদর্শ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সচেতন করিতে চেষ্টিত হওয়া আমাদের কর্ত্তব্যরূপে দেদীপ্যমান হইয়াছে! বিশ্ববিত্যালয়ের কৃপায় এখন বাঙ্গালার প্রত্যেক ভদ্র গ্রামেই উচ্চশিক্ষার প্রবেশিকা বিত্যাগার স্থাপিত হইয়া জ্ঞানদায়িনী সরস্বতীর অমৃত ধারাকে প্রত্যেক গৃহস্থের দ্বারদেশে লইয়া যাইতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আপনাদের এই গ্রামটীও বঙ্গদেশে সেই নব জাগরণে জ্ঞান-বাপীর পূর্ত্তকার্য্য স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই গ্রামমণ্ডলীর সকলেই আপনারা বঙ্গভারতীর এই নব যজ্ঞ কার্য্যেও যথাশক্তি দীক্ষা গ্রহণ করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা রহিল।

বলা বাহুল্য, আমরা এস্থলে সাহিত্যের অর্থকে কোনও বিশেষ শিল্প পরিভাষায় সঙ্কুচিত করিতে চাহিতেছি না। সাহিত্য-সভা এবং সাহিত্য-সম্মিলন প্রভৃতির ইষ্ট দেবতা সরস্বতী বীণাপুস্তকধারিণী, নিখিল শিল্পকলা এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিশ্বরী। মানুষের মনুষ্যত্ব যাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই কাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন, কৃষি, বাণিজ্য এবং সঙ্গীত প্রভৃতি ললিতকলা এবং কারুকলা সমস্তের সহস্র দল আশ্রয় করিয়া এই দেবতা বঙ্গদেশের মনোনেত্রে মূর্ত্তিমতী হইয়াছেন! এই মহাশক্তি জগতে জ্ঞান এবং কর্ম্ম উভয় ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্ঞীরূপে দাঁড়াইয়াছেন। এই ক্ষেত্রে যে কোনও বিভাগেই আপনারা উপযুক্ত বুদ্ধিযোগ এবং প্রতিভার সংঘটন করিতে পারেন, অথবা সামাজিকের মধ্যে যে কোন দিকে প্রতিভাশালীর আবিষ্কার করেন, প্রাণপণে সমাজের প্রধান ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানে—তাহাকেই তুষ্টি, পুষ্টি এবং বুদ্ধিদান করিতে চেষ্টা করিবেন, ইহাই অত্রকার সম্মিলনের প্রধান দীক্ষারূপে গ্রহণ করুন। এই গ্রামমণ্ডলী হইতে স্বজাতির উন্নয়ন সমর্থ কোনও ব্যক্তিকে সমুচিত প্রবেশিকা শক্তি দান করিয়া, আপনারা বাঙ্গালী জাতির ঐ মহা যজ্ঞস্থলে প্রেরণ করিতে পারিলেই ঋণমুক্ত হইতে পারেন। প্রত্যেক গ্রামেরই প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত, যাহাতে স্বকীয় মণ্ডলীর কোনও কৃতী পুরুষ কোন দিকে প্রতিভা প্রমাণিত করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশের অধিবাসী হইতে পারেন। এই সৌভাগ্য ঘটনার পূর্ব্বে কোন গ্রামখণ্ডই স্বদেশের, স্বজাতির নিকট অঋণী হইতে পারে না। বঙ্গদেশ প্রত্যেক গ্রামের নিকট হইতে এইরূপ কৃতী পুত্রের কামনা করিতেছেন। দেশমাতার নিকট সেই ঋণ দায়িত্বে সচেতন হইয়া আপনারা সমাজের সর্ব্বসাধারণের মধ্যেই শিক্ষাভ্যাস বিস্তার পূর্ব্বক সর্ব্ববর্ণ হইতে সহজাত প্রতিভা বুদ্ধিকে ছাঁকিয়া তুলিয়া বঙ্গদেশে উদ্বর্ত্তিত করুন। জাতীয় বিত্যামন্দিরের এবং শিক্ষা সাধনার ইহাই শ্রেয়স্কর এবং যশস্কর লক্ষ্য।

বলা বাহুল্য, এই গ্রামই ভারতীয় সভ্য-

তার প্রাচীনতম কেন্দ্র। গ্রামকেন্দ্রের অঙ্কুরিত বীজই চিরকাল নগরকেন্দ্রে গিয়া প্রতিরোপিত এবং প্রতিষ্ঠিত হইয়াই বিপুল ফলফুল-সমন্বিত ছায়াতরু রূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে। আমাদের ব্যাস বাল্মীকি, কপিল কনাদ, শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল কৃতী পুরুষই গ্রামকেন্দ্র হইতে মস্তকোন্নমিত করিয়াই সমগ্র ভারতের পরিদৃশ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে তপোবনই সাহিত্য চর্চ্চার প্রকৃষ্ট স্থান ছিল। প্রাচীন কালের সেই তপোবনই এখন কাল ধর্ম্মে গ্রামকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। নগরের প্রভাব একালে সর্ব্বজয়ী হইয়া পরিস্ফুট হইলেও এখন যাবৎ ভারতবর্ষে গ্রামকে একেবারে নির্ষিত করিতে পারে নাই। গ্রামই সমগ্র দেশে নগরবক্ষবাহী নাড়ীমণ্ডলীর প্রধান প্রধান রক্তাধার রূপে কার্য্য করিতেছে।

এই সারস্বত আদর্শে আমরা বঙ্গভাষা এবং বঙ্গ সাহিত্যকেই সমগ্র পৃথিবীর বাক্যবৈভব এবং শক্তি-ধারণায় সমর্থ এবং কৃতার্থ করিয়া তুলিতেই আশা রাখি। ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রদেশ ভাষার বিশেষ বিশেষ উপার্জ্জিত সম্পত্তিতে এবং তাহাদের রীতি প্রণালীতেও স্বাধিকার প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করি। বাঙ্গালার নব্যন্যায় যেমন সমগ্র ভারতের গৌরব পদবী লাভ করিয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছে, তেমন বঙ্গসাহিত্যকে এবং বাঙ্গালীর দেশমাতাকেও নবীন মহাভারতের নব জীবনের "প্রাকজ্যোতিষ" রূপেই প্রতিষ্ঠাদান করিতে আমরা আশান্বিত হই। বাঙ্গালার প্রত্যেক গ্রাম, জনপদ, বিদ্বান বুদ্ধিমান, ধনী দরিদ্র সকল ব্যক্তি এই দিকে স্ব স্ব অধিকারের সামর্থ্য সঙ্গম করিয়া আপনার ধর্ম্ম অর্থ কামকে এই মহাশক্তি সাধনায় নিয়োজিত করুন।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

কৃষি

"Whoever could make two ears of corn or two blades of grass grow where only one grew before, would serve mankind better than the whole race of politicians put together." (যেখানে পূর্ব্বে শস্যের একটী শীষ কি ঘাসের একটী পাতা জন্মিত, সেই স্থানে যিনি দুইটী শীষ কি দুইটী পাতা জন্মাইতে পারেন, তিনি একত্রীকৃত সমস্ত রাজনীতিজ্ঞমণ্ডলী অপেক্ষা মনুষ্য জাতির অধিকতর উপকার সাধন করেন)।

এক কবি বলেন, "A stout peasantry is the country's pride" (হৃষ্টপুষ্ট কৃষক শ্রেণীই দেশের গৌরব) অন্য এক কবি বলেন, (When ploughman will be statesman) যখন কৃষক রাজনীতিজ্ঞ হইবে, অর্থাৎ শিক্ষিত লোক কৃষি অবলম্বন করিবেন, তখন সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। এতদ্দেশে প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা অর্থাগমের যে তিনটী উপায় নির্দ্দেশ করেন, কৃষি তাহার দ্বিতীয় উপায়। কৃষিই উত্তর আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বিপুল অর্থের ও কানাডার উন্নতির একটী প্রধান কারণ। জাপানের

অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিরও উন্নতি দেখা যায়। জার্ম্মাণীর সর্ব্বতোমুখী বৈষয়িক উন্নতির মধ্যে কৃষিও প্রধান। তথায় কৃষকগণ নিজেরাই ভূস্বামী বা আবাদকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদার। তথাকার ভূমি ইংলণ্ডের ভূমি অপেক্ষা কৃষিকার্য্যের অনুকূল নয়; তথাপি তথাকার কৃষকগণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য চালানে, বিশেষতঃ ব্যবহারিক কেমিষ্ট্রী ও বিজ্ঞানের সাহায্যে নানাবিধ সার প্রয়োগে, ইংলণ্ডের অপেক্ষা প্রতি "একরে" (১ একর=৩/॥ কাঠা) অনেক গুণ ফসল অধিক জন্মায়। এই কৃষির উন্নতি-মূলে তথায় সাধারণ শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, ও রাজকীয় সাহায্য আছে। ভারতবর্ষে কৃষিজীবী লোকসংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, শতকরা ৭০টীর অধিক ভিন্ন ন্যূন নয় এবং কৃষিকার্য্যের দ্বারাই এদেশের অধিকাংশ ধন উৎপন্ন হয়। তজ্জন্য সর্ব্বপ্রথমে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনে সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত। যেমন পরিবারস্থ অন্যান্য সকল ব্যক্তিই উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির মঙ্গল কামনা করে, সেইরূপ, দেশবাসী অন্যান্য সকল লোকেরই কৃষক শ্রেণীর মঙ্গল কামনা করা কর্ত্তব্য, কারণ তাহারাই আমাদের জন্মভূমির জাতীয় অর্থ উপার্জ্জনকারী; অন্যান্য ব্যক্তিগণ কেবল তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থ ভোগ করে। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণও কৃষির গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। গ্রীস্ দেশের এক পণ্ডিত বলিয়াছেন, "এক জন দার্শনিক পণ্ডিত অপেক্ষা বিনামা-নির্ম্মিতা একটী চর্ম্মকারই পৃথিবীর অধিকতর উপকার সাধন করে।" যদ্দ্বারা পৃথিবীর লোকের আহারীয় দ্রব্যের সংস্থান হয়, এরূপ কৃষিকার্য্যের গৌরব ঘোষণা কে না করে? কৃষিকার্য্য অর্থকর, স্বাস্থ্যকর, পবিত্র ও শান্তিপ্রদ। প্রাচীন রোম রাজ্যের কোনও সম্রাট্ পুত্র হস্তে রাজ্য ভার দিয়া রোমের অনতিদূরে বাগানবাড়ীতে শাকসব্জির আবাদে প্রফুল্ল চিত্তে কালযাপন করিতেছিলেন; এমত সময়ে, নূতন সম্রাটের অত্যাচারে প্রপীড়িত লোকদের অনুরোধে একটী প্রাচীন মন্ত্রী তাঁহাকে পুনর্ব্বার রাজ্যভার গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করায়, তিনি তদুত্তরে তাঁহাকে বলেন যে, "আমি এখানে যে সকল বাঁধাকপী আবাদ করিয়াছি, তাহা তুমি আসিয়া দেখিলে কখনই আমাকে রোমে ফিরিয়া যাইয়া পুনঃ রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে না।" মহাত্মা জেনারাল গারিবল্ডী, স্বাধীনতার যুদ্ধাবসানে, ইটালীর রাজপদ উপেক্ষা করিয়া নিজের জন্মভূমি দ্বীপে ফিরিয়া যাইয়া কৃষি অবলম্বন করেন। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ অনেকে কৃষিকার্য্য করিতেন। রাজর্ষি জনকও হলচালনার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এদেশেও বর্ত্তমান সময়ে কোনও কোনও স্থানে ব্রাহ্মণেরা কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন এবং বিগত স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে বঙ্গদেশে অনেক ভদ্রসন্তান কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন।

কৃষিকার্য্যে—ভূমি, কৃষক চাকর, গো মহিষাদি পশু, লাঙ্গল প্রভৃতি যন্ত্র, সার, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য চালানের উপযুক্ত শিক্ষা, ও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অন্যান্য কার্য্যের ন্যায়, কৃষিকার্য্যেও মূলধন, পরিশ্রম, শিক্ষা, তত্ত্বাবধান, পরীক্ষা, ভবিষ্যদ্ দৃষ্টি, চরিত্র, মিতব্যয়িতা, সমবেত চেষ্টা ইত্যাদি অত্যাবশ্যক।

মূলধন ও অন্যান্য অবস্থা অনুকূল হইলে, বিশেষতঃ বৃহদনুষ্ঠানে, কৃষিপরিচালনে, কৃষি-

কার্য্যের সঙ্গে, অন্যান্য কয়েকটী আনুসঙ্গিক কারবারও চালান যায় এবং তাহার কতকগুলি আবশ্যক হইয়াও উঠে। (ক) (১) বাজে ফসল, (২) শাক তরকারী; (৩) পশুখাদ্য; (৪) ফলের বাগান; (৫) ফুলের আবাদ। (খ) (১) গো, মহিষ, ছাগ, মেষ, অশ্ব প্রভৃতি পশু পালন; (২) দুগ্ধ, দধি, ঘৃত প্রভৃতির কারবার; (৩) মুরগী, হাঁস, প্রভৃতি খাদ্য পক্ষী পালন; (৪) রুই, কাতলা, মৃগাল, কালবাউশ প্রভৃতি মৎস্য পালন; (৫) মৌমাছি ও গুটীপোকা পালন; (গ) কৃষিজাত ও এই সকল আনুষঙ্গিক কারবার জাত দ্রব্যাদি হইতে, কুটীর শিল্প স্বরূপ অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত করণ, প্রভৃতি আনুষঙ্গিক কারবার মধ্যে গণ্য করা যায়। ভাল চাকর শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত করিতে ও অধিক বেতন দিয়া রাখিতে হয়, কখনই কর্ম্ম হইতে বিনা বেতনে অল্প দিনের জন্যও বিদায় দেওয়া শ্রেয় নয়। আনুসঙ্গিক কারবারের অনুষ্ঠান থাকিলে, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, প্রবল বন্যা, ঝড়, কি অন্য কোনও কারণে কৃষি কার্য্যের ক্ষতি হইলে, তাহা অনেক পরিমাণ সংশোধন করা যাইতে পারে।

এ স্থানে যাহা বলা হইতেছে, তাহা বঙ্গদেশ সম্বন্ধে। বঙ্গদেশে, ধান্য, পাট, রবিশস্য, ইক্ষু, তামাক, মরিচ প্রভৃতি প্রধান ফসল। স্থানীয় অবস্থানুসারে, যে স্থানের ভূমি যে যে ফসলের উপযোগী এবং যাহা অধিক পরিমাণে জন্মে, সে স্থানে সেই সকল ফসলই প্রধান, তদ্ব্যতীত অন্যান্য গুলিকে বাজে ফসল বলা যায়। প্রত্যেক গৃহস্থেরই, বিশেষতঃ কৃষিজীবীর অন্ততঃ পারিবারিক কার্য্যের জন্য কোনও কোনও বাজে ফসল আবাদ করা কর্ত্তব্য এবং পারিবারিক ব্যবহারে যাহা লাগে, তদতিরিক্ত উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করা যাইতে পারে। বেগুন, হলুদ, আদা, গোলআলু, পেয়াজ, রসোন, শকরকন্দ আলু ও অন্যান্য আলু, কচু, মানকচু, ওল,—চীনা, অরহর, ভুট্টা, দেওধান, কার্পাস, চীনাবাদাম, শোণ পাট, মিঠাকুমড়া, তরমুজ, খরমুজা, ফুটী, শশা, চালকুমড়া, লাউ, কলা, সজিনা, পটল, উচ্ছে, করলা, ঝিঙ্গা, ফুলকপী, বাঁধাকপী, গাজর, মূলা, পালংশাক, পুইশাক, বেতোশাক, নটেশাক, প্রভৃতি দেশী ও বিদেশীয় শাক-তরকারী; কালাজিরা, ধনিয়া, মৌরী, মেথী, রান্ধনী, জোয়ান প্রভৃতি পাক মসলা, পান, খেজুর, বাঁশ, আম, কাঁঠাল, কলা, নারিকেল, গুপারি, তাল, পেপে, গ্যাওয়ারী, বোম্বাই প্রভৃতি খাদ্য ইক্ষু, কমলা, আনারস, লিচু, পেয়ারা, আতা, জাম, বেল, কাগজি ও নানা জাতীয় লেবু, তেঁতুল ইত্যাদি; গোলাপ, বেলা, চামেলী, যুই, চাঁপা, কেওয়া, হেচনা হানা, শেফালিকা, গন্ধরাজ, প্রভৃতি নানা জাতীয় সুগন্ধি ফুল, নানা জাতীয় সুগন্ধি তৃণ; গো মহিষাদির খাদ্য জন্য "গিনি"ঘাস, "লুসারণ", "ম্যানগোল্ড", নটা, দেওধান, ও অন্যান্য কয়েক প্রকার ঘাস ও অন্য কোনও প্রচলিত কি নূতন ফসল। বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা কার্ত্তিক মাসেই অধিকাংশ সময়ে জানা যায়। তখন হইতেই গম, যব, আলু, চীনা প্রভৃতি খাদ্য শস্যের আবাদ করায় উদ্যোগ আবশ্যক।

সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে, ফল, ফুল শাক, তরকারী, বাঁধাকপী, ফুলকপী প্রভৃতি নানাবিধ অন্য তরিতরকারী, দুগ্ধ, ছানা, দধি, মাখন, ঘৃত প্রভৃতি গোব্য দ্রব্য, মুরগী, ছাগ, ডিম, পাঁঠাদি, বোম্বাই প্রভৃতি খাদ্য

ইক্ষু, নানা জাতীয় কলা, ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণ বিক্রয় হইয়া লাভজনক হয়। ফল দ্বারা নানা প্রকার আচার, মোরব্বা, ইত্যাদি প্রস্তুত হয়; ফুল ও সুগন্ধি তৃণ চোয়াইয়া নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য, যেমন আতর, গোলাপ জল, ফুলাল তৈল, গ্র্যাস্ অয়েল, এসেন্স প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়। ফ্রান্সের দক্ষিণ ভাগে নানা প্রকার সুগন্ধি ফুলের ও বুলগেরিয়া দেশে গোলাপ ফুলের, বহু লক্ষ টাকার কারবার হয়, তাহার তুলনায় গাজিপুর প্রভৃতি স্থানের ফুলের কারবার অতি সামান্য বলিয়া গণ্য হয়। কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত পশুর পানের জন্য এবং শাক সব্জিতে, ফুল ও ফলের বাগানে জল দেওয়ার জন্য, অল্লায়তন একটী পুষ্করিণীর আবশ্যক। তাহাতে উপরোক্ত কয়েক প্রকারের মৎস্য পালন করা যাইতে পারে; ডিম্বের জন্য হাঁস পুষিলে তাহারও সুবিধা হয়। উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভী ও ষাঁড় থাকিলে উৎকৃষ্ট বৎস জন্মে ও প্রচুর দুগ্ধ হয়। ঘৃত, মাখন ও দধির পক্ষে মহিষ পালনও অধিকতর লাভজনক। পশু পক্ষীর (এবং মনুষ্যের) মল মূত্র, ফসলের উত্তম সার। মৌমাছি পালনে মধু পাওয়া যায়; তদ্ব্যতীত আর একটী উপকার এই হয় যে, মৌমাছি ফসলের ও ফলের বাগানের পুং জাতীয় উদ্ভিদের মুকুলের পরাগ রেণু বহন করিয়া স্ত্রীজাতীয় উদ্ভিদের গর্ভ-কেশরে নিহিত করে, তাহাতে ফলন অধিক হয়। প্রতি গৃহস্থ নিজ নিজ বাড়ীতে অল্প পরিমাণ গাছ কার্পাস ও কিছু বার্ষিক কার্পাস আবাদ করিলে, পূর্ব্বের ন্যায় বঙ্গদেশে চরকার সাহায্যে পারিবারিক বস্ত্রের সংস্থান হইতে পারে। উন্নত প্রণালীর চরকা আবিষ্কার হইলে পুরুষেরাও সূতা প্রস্তুত করিতে পারিবে। উন্নত প্রণালীর নানা প্রকার তাঁত প্রচলিত হওয়ায় তন্তুবায়দের অনেক পরিশ্রম লাঘব হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশ হইতে গত ৬০।৭০ বৎসর মধ্যে কার্পাস আবাদ উঠিয়া যাওয়ায় লোকের এখন এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে। সূতা কাটা ও বস্ত্রবয়ন বঙ্গদেশের প্রধান দুইটী কুটীর শিল্প কার্পাসের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়াছে; বহু লোক নিষ্কর্ম্মা হইয়া অন্যের গলগ্রহ হইয়াছে, দেশের প্রচুর অর্থ বিদেশে যাইতেছে। কার্পাস আবাদ পুনঃ প্রচলিত হইলে ঐ দুইটী প্রধান কুটীর-শিল্প পুনর্জ্জীবিত হয় এবং কেবল এক বঙ্গদেশেই বার্ষিক ১৫।১৬ কোটী টাকা দেশে থাকিয়া যায়। তুঁতের আবাদ এখনও পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটী দেশে (যেমন, জাপান, চীন ইত্যাদি) বিশেষ লাভজনক। এদেশেও পূর্ব্বে তাহা ঐরূপ ছিল এবং এখনও পুনর্ব্বার তাহা লাভজনক হইতে পারে। চীনাবাদামের আবাদও বিশেষ বাঞ্ছনীয়; বিশেষতঃ, ইহাও ডিম্বের ন্যায় অন্য একটী পুষ্টিকর খাদ্য; তদ্ব্যতীত ইহার তৈল নানা কার্য্যে লাগে; খইল গোখাদ্য ও ক্ষেতের সার। দুগ্ধ, মৎস্য, ঘৃত ও বিশুদ্ধ সর্ষপ তৈলের অভাব হইয়াছে এবং তাহা যে স্বাস্থ্যরক্ষার্থ বিশেষ আবশ্যক, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। অধিকাংশ খাদ্য সামগ্রীই এখন ভেজালপূর্ণ এবং তাহা ব্যবহারে স্বাস্থ্যহানি ঘটে, তাহাও বলা বাহুল্য। পূর্ব্বে গৃহস্থেরা অধিকাংশ খাদ্যসামগ্রীই নিজেরা বাড়ীতে প্রস্তুত করিতেন ও নিজ গ্রামে সংগ্রহ করিতেন; তখন বরফের মাছ, কলের ২নং তৈল, কি "কণ্ডেন্সড্ মিল্ক্" ও এইরূপ অন্যান্য অনেক খাদ্য এদেশে প্রচলিত ছিল না। পাট ও অন্যান্য কৃষিজাত ফসলের জন্য

গোচারণ স্থান, প্রশস্ত গ্রাম্য হালট, বিশাল বটবৃক্ষ, গ্রাম্য ভাগাড়, সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে; জল আনয়ন ও জল নিষ্কাসন জন্য পূর্ব্বে গ্রামালোকেরা মিলিয়া যে সকল পয়ঃ-প্রণালী খনন করিত, তাহাও অনেক খাল, বিল প্রভৃতি প্রায় সমভূমি হইয়া নিশ্চিহ্নিত হইয়াছে। লোক সংখ্যাও বিগত ৫০।৬০ বৎসর মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ হইত; কেবল ম্যালেরিয়া জ্বর, ওলাউঠা, বসন্ত, প্লেগ্ ও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতির জন্য দ্বিগুণ অপেক্ষা কিছু ন্যূন আছে। শিশুমৃত্যু সংখ্যা, ক্ষয়কাশ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইতেছে। যখন মনুষ্যেরই এইরূপ অবস্থা, গো-মহিষাদি পশু যে দুর্ব্বল ও অল্পসংখ্যক হইবে, তাহা বিচিত্র কি? এই সকলের অনেক কারণ আছে; তন্মধ্যে দরিদ্রতা এবং পুষ্টিকর টাট্‌কা বিশুদ্ধ খাদ্যের অভাবই প্রধান। পুষ্টিকর উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য আহার না করিলে শরীরের রোগাক্রমণ নিবারণ-ক্ষমতা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম ও প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্যাভাব—এই দুই কারণে শ্রমজীবীদের, এবং শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, অতিরিক্ত চিন্তা, ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হেতু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে। এই সকল চিন্তা করিলে বুঝা যায়, আধুনিক উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য পরিচালন দ্বারা কৃষি ও তৎসংক্রান্ত পূর্ব্বোল্লিখিত আনুষঙ্গিক কারবার সকলের উন্নতি সাধন স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি-মাত্রেরই একটী প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষির উন্নতিকল্পে, গবর্ণমেণ্ট্ যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার কতক-গুলি অনুষ্ঠানে সাহায্য ও যোগদান করিলেও অনেক কাজ হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের অধীন প্রত্যেক জেলায় এক একটী "ডিষ্ট্রিক্‌ট্ এগ্রিকালচারাল্ অফিসার" ও তাঁহার অধীনে কয়েকজন "ডিমনষ্ট্রেটার" আছেন। তদ্ব্যতীত কয়েক জেলায় গবর্ণ-মেণ্টের পরিচালিত কৃষিক্ষেত্র আছে। বীজ ও বিশেষ সার সরবরাহেরও ব্যবস্থা আছে। ভাগলপুরের নিকট "সাবুর" নামক স্থানে একটী কৃষি কলেজ, এবং দ্বারভাঙ্গা জেলার পুষা নামক স্থানে একটী "কৃষি কলেজ ও ইম্পিরিয়াল্ এগ্রিকাল্‌চারাল্ রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টি-টিউট্" এবং কলিকাতার নিকট একটী ভিটারিণারি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক জেলার সদরে একজন ভিটারিনারী সার্জ্জন নিযুক্ত হইয়াছেন। কৃষকদিগকে গ্রাম্য মহাজনদের হস্ত হইতে রক্ষাকরণার্থ, "কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট্ ব্যাঙ্ক্" সকল স্থাপিত হইয়াছে। কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে অনুষ্ঠিত কার্য্যে অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। দেওয়ানী আদালতের দেন ডিক্রী জারিতে কৃষকের বসতবাটীর ঘর, কৃষিকার্য্যের আবশ্যকীয় গো-মহিষাদি পশু, বীজ ও কৃষিজোত ক্রোক হইতে পারে না, এইরূপ আইনের বিধান আছে। বিদ্যালয়ে বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষায় কৃষি ও স্বাস্থ্য-নীতি শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব চলিতেছে। "বিলেজ লোকাল্ সেলফ্ গবর্ণমেণ্ট্ এ্যাক্‌ট" বা গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন নামক আইনের বিধানমত কার্য্য চলিলে গ্রাম্য স্বাস্থ্যের উন্নতিরও আশা করা যায়। কিন্তু আমরা ঐ সকল বিষয়ের উপকারিতা বুঝিয়া সফলতা সম্পাদনে কৃত-সংকল্প না হইলে শীঘ্র কোনও সুফল আশা করা যায় না।

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি পীড়ায় লোক সংখ্যা হ্রাস হওয়ায় এবং দেশব্যাপী দারিদ্রতা নিবন্ধন বঙ্গদেশের অনেক স্থানে বালক কার্য্যক্ষ

কৃষকের অভাবে অনেক জমি পতিত পড়িয়া রহিয়াছে। ঐরূপ স্থানে, দূরবর্ত্তী স্থান হইতে কৃষক চাকর সংগ্রহ করিয়া আনিয়া কার্য্য করিতে হয় এবং তজ্জন্য অধিক মূলধনও আবশ্যক। পরিশ্রম লাঘব জন্য এবং আকস্মিক অনুকূল কি প্রতিকূল অবস্থায় শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যকরণ জন্য আধুনিক নানাপ্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়; ঐ সকল যন্ত্রের মূল্য অধিক। এই সকল কারণে "জয়েন্ট্-ষ্টক্ কোম্পানী" গঠন করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা কার্য্যকর হইবে কি না, তদ্বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান। এমন কি, তাঁহাদের মতে, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের পক্ষে, খামার জমি বর্গাইত (আধিয়া) দ্বারা চাষ আবাদ করানই সমধিক লাভজনক। কিন্তু উপযুক্ত পর্য্যবেক্ষণাভাবেই যে বেতনভোগী চাকর দ্বারা ভাল ফল পাওয়া যায় না, তাহার সন্দেহ নাই। বিলাতী একজন কৃষকের ক্ষেতে, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত সকল অপেক্ষা অধিকতর ভাল ফসল জন্মিত। তাহা দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী একজন কৃষক তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, প্রথমোক্ত কৃষক তদুত্তরে বলে যে, The reason is that you say "go" and I say "come" (তাহার কারণ এই যে, তোমরা বল "যাও" এবং আমি বলি "এসো")। তজ্জন্য, স্থানীয় অবস্থানুসারে বর্গাইত (আধিয়া) দ্বারা কৃষি চালাইতে বাধ্য হইলে, গো-মহিষ পশু, সার, বীজ, যন্ত্রাদি, আবাদ-প্রণালী ও অন্যান্য সমস্ত কর্তৃত্ব ক্ষেত্রস্বামীর নিজের হস্তে রাখিতে এবং সর্ব্বদা বর্গাইতের কার্য্য মাঠে যাইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি কোনও কার্য্যেই, উপযুক্ত পর্য্যবেক্ষণ না থাকিলে লাভবান হওয়া যায় না। সচ্চরিত্র, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, কর্ম্মদক্ষ লোকের উপর কার্য্যভার দিয়াও, মালিকের অনেক সময়ে সমস্ত কার্য্য নিজে পর্য্যবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য। কৃষক চাকর-দিগকে কৃষি সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান তথ্য সম্বন্ধে উপদেশ ও শিক্ষা প্রদানে প্রস্তুত করিতে পারিলে বিশেষ সুবিধা হয়। কাহা-কেও কোনও কার্য্য, বিশেষতঃ কোনও নূতন প্রণালীতে কার্য্য করিতে বলিয়া তৎসঙ্গে যুক্তি প্রদর্শন করিলে, লোকে বিনা আপত্তিতে তাহা করে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই কেবল "হুকুম জারি" করিলে, অভ্যাস বশ-তঃ হউক কি অন্য কোনও কারণেই হউক, ভৃত্য হুকুম মত কার্য্য করিতে ত্রুটী করিলে, প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে যে ভাল ভাব থাকা বাঞ্ছনীয়, তাহা দূর হইয়া যায়। ক্ষমা ও সদয় ব্যবহার প্রভুর পক্ষে বিশেষ সদ্গুণ। বলা বাহুল্য, অসচ্চরিত্র লোককে চাকর কি বর্গাইত রাখা উচিত নয়।

কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত গো মহিষাদি পশুর পরিশ্রমের উপর চাষ আবাদ অনেক পরি-মাণে নির্ভর করে; তজ্জন্য, যাহাতে তাহারা হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা উচিত। অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় ও উপ-যুক্ত খাদ্য পানীয়ের অভাবে ও অযত্নে তাহারা দুর্ব্বল, রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়; তাহাতে তাহাদের দ্বারা ভাল কাজ পাওয়া যায় না এবং অনেকগুলি মরিয়া যায়। পশুগুলি মরিয়া গেলে যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সুতরাং তাহাদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য ও পরিষ্কার পানীয় জলের, রৌদ্র বৃষ্টি, হিম হইতে রক্ষায়, মশক, ডাঁস ইত্যাদির উপদ্রব নিবারণের, ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

স্থানে রাখার বন্দোবস্ত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পরিশ্রমের পর বিশ্রাম, রোগ হইলে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা, এবং সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার, যেমন চাকরদের পক্ষে আবশ্যক, সেইরূপ, গো-মহিষাদি পশুর পক্ষেও সেই সকল অধিকতর আবশ্যক, কারণ তাহারা স্ব স্ব অভাব ও অভিযোগ জানাইতে অপারক। সময়ে সময়ে দেশব্যাপী সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইয়া অনেক গো-মহিষ নষ্ট করে। তজ্জন্য কৃষিকার্য্যের মূল্যবান পশুগুলি "ইন্সিওর" করিতে পারিলে ঐ আকস্মিক ক্ষতি নিবারণ হয়।

মূলধন অধিক থাকিলে, আধুনিক উন্নত প্রণালীর যন্ত্র ব্যবহার করা সুবিধাজনক। সাধারণ কৃষকেরা সকলে মিলিয়া একত্র হইয়া, অবস্থা বিশেষে তাহার দুই একটী যন্ত্র খরিদ কিম্বা ভাড়া করিয়া, পালাক্রমে, যে ব্যবহার করিতে পারে, ইক্ষু মাড়াই কলই তাহার একটী প্রধান দৃষ্টান্ত।

অনেক স্থানে কৃষি কার্য্যে উপযুক্ত সার ব্যবহারের অভাব দেখা যায়; লোকে অজ্ঞতা, অভ্যাস ও কুসংস্কার বশতঃও অনেক মূল্যবান্ সার ব্যবহার করে না, কিম্বা নষ্ট করিয়া ফেলে। গোবর একটী মূল্যবান্ সাধারণ সার; কিন্তু অনেক স্থানে, জ্বালানি কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে, তাহা লোকে শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করে। হাড়চূর্ণও উত্তম সার; কিন্তু লোকে তাহার মূল্য না জানায় কি তাহা অস্পৃশ্য জ্ঞান করায়, চামারেরা পল্লীগ্রামের মাঠ হইতে অনেক হাড় সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় চালান দেয়; তথায় তাহা কল সকলে নিষ্পেষিত হইয়া বিদেশে রপ্তানী হয়, ও কতকটা অস্থিচূর্ণ চাবাগানের ব্যবহার্থেও এদেশে ব্যয় হয়। খইলও অনেক ফসলের পক্ষে উত্তম সার; কিন্তু, অনেক পরিমাণ তৈল বীজ বিদেশে রপ্তানী হওয়ায় তৎসঙ্গে ঐ খইল সারও বিদেশে চলিয়া যায়। মনুষ্যের মল মূত্র জাপান, চীন ও অন্যান্য দেশে মূল্যবান সার বলিয়া সমাদৃত, কিন্তু বঙ্গদেশে সেই কথা শুনিয়াই লোকে চমৎকৃত হয়। এ দেশের কৃষকেরা বীজ নির্ব্বাচন ও বীজ সংরক্ষণ সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ উদাসীন ও অনভিজ্ঞ। উৎকৃষ্ট বীজের উপরই উৎকৃষ্ট ফসল নির্ভর করে। পরীক্ষিত ও উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহ করণ জন্য অনেক সভ্য দেশে গবর্ণমেণ্টের কি বেসরকারী কোম্পানী কি "ফারম" সকলের বীজাগার আছে। এদেশেও গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ বীজের "ডিপো" বা গুদাম স্থাপন করিতেছেন।

কৃষি ও তাহার আনুষঙ্গিক কারবারজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় এবং কৃষিকার্য্যে আবশ্যকীয় বীজ, সার, আধুনিক উন্নত প্রণালীর যন্ত্রাদি সংগ্রহ ও খরিদ জন্য কৃষকদের মধ্যে "কো-অপারেটিভ সোসাইটী" সকল স্থাপিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। যাহাদের মূলধন অল্প, তাহাদের পক্ষে সমবেত চেষ্টায় কার্য্য করাই শ্রেয়। এ্যাডাম্ স্মিথের শ্রম বিভাগের নিয়ম আবিষ্কারে যেমন শিল্পশ্রম বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, "কো-অপারেটিভ সোসাইটী"র মূল নিয়ম আবিষ্কারও তদ্রূপ একটী মহৎ কল্যাণকর ঘটনা। ইহা সর্ব্বপ্রথমে ফ্রান্স দেশের কোনও এক কেমিষ্ট্রীর প্রফেসার, কৃষিকার্য্যে বৈজ্ঞানিক সার ব্যবহার উপলক্ষে আবিষ্কার করেন; তৎপর জার্ম্মাণিতে ইহা প্রচলিত হয়; এবং এখন ইহার সমাদর, সকল সুসভ্য দেশেই দৃষ্ট হয়। "কো-অপারেটিভ ষ্টোর" সকলের কার্য্যপ্রণালীর সঙ্গে যদিও ইহার কতকটা সাদৃশ্য

আছে, তথাপি তাহার কার্য্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, কিন্তু ইহার কার্য্যক্ষেত্র ও প্রসার সুবিস্তৃত। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে "কো-অপারেটিভ ষ্টোর" স্থাপনে অনেক স্থলে খরিদদারদের বিশেষ উপকার হইয়াছে। "কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক" সকল দ্বারাও প্রভূত উপকার সাধিত হইতেছে। রাজসাহী জেলার নওগাঁ মহকুমায় "নওগাঁ গাঁজা কাল্টিভেটার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটী"র কার্য্যে আশাতিরিক্ত ফল লাভ, কো-অপারেটিভ সোসাইটীর মাহাত্ম্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ফড়িয়া, পাইকার, দাদনকারী মহাজন প্রভৃতি মধ্যবর্ত্তী লোকেরা কৃষকদের নিকট সুলভ মূল্যে কৃষিজাত দ্রব্যাদি খরিদ করত আড়তদারদের নিকট বিক্রয় করে; আড়তদারেরা তাহা পুনঃ বড় বড় "ফারম" বা "হাউসে" বিক্রয় করে। বলা বাহুল্য, ইহারা সকলেই লাভ করে, এবং লাভ-সমষ্টি নিতান্ত কম নয়। কৃষিকার্য্যে আবশ্যকীয় বীজ, সার, যন্ত্র ইত্যাদি খরিদ সম্বন্ধেও মধ্যবর্ত্তী দোকানদার, দালাল, ফড়িয়া, প্রভৃতি তদ্রূপ লাভ করে। কিন্তু কো-অপারেটিভ সোসাইটী স্থাপিত হইলে মধ্যবর্ত্তী লোকেরা এখন যে লাভ করিতেছে, সেই লাভ কৃষকেরাই পাইবে; এবং তাহাদের সোসাইটী পাইকারী দরে বড় বড় হাউসওয়ালাদের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে খরিদ বিক্রয় করিতে পারিবে এবং বাজারেও ঐরূপ সোসাইটীর মাতব্বরী স্থাপিত হইবে। যদিও ঐ শুভদিন এখনও দূরবর্ত্তী, তথাপি দূর হইতে তাহার ধ্বজা দৃষ্ট হওয়ায় হতাশ হৃদয়েও আশা ও উৎসাহ সঞ্চার হইতেছে।

কৃষির উন্নতি জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য পরিচালনের উপযোগী শিক্ষা আবশ্যক। তজ্জন্য কৃষিপল্লী সমূহে পাঠশালা স্থাপন ও তাহাতে মাতৃভাষায় কৃষি, স্বাস্থ্যনীতি, অর্থনীতি, কেমিষ্ট্রী, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিষয় ঘটিত মূল তত্ত্ব সকল শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে, গ্রাম্য স্বাস্থ্যোন্নতি, পরস্পর মিলিত হইয়া সমবেত চেষ্টায় কার্য্যকরণ-ক্ষমতা, শালিশ দ্বারা বিবাদ মীমাংসা, কুসংস্কার দূর করণ, নৈতিক উন্নতি প্রভৃতির পথ প্রশস্ত হইয়া, কৃষকদের ও তৎসঙ্গে দেশের সাধারণ উন্নতির আশা করা যায় এবং তৎসম্বন্ধে শিক্ষিত লোকদের বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহাও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

শ্রীগুরুগোবিন্দ পাট্টাদার।

আসামে বঙ্গ-সাহিত্য চর্চ্চা।*

প্রজ্ঞা রূপেণ সর্ব্বেষাং যা সদা হৃদি তিষ্ঠতি।
সা মে প্রসীদতাদ্দেবী শুভায় জগদম্বিকা॥

জীবন-স্রোতে এখন ভাটা পড়িয়াছে—আর সভায় সদর্পে দাঁড়াইবার শক্তি বা উৎসাহ তেমন নাই—তথাপি বন্ধু বান্ধবের অনুরোধ এড়াইতে পারা গেল না। আশা করি, মাননীয় সভ্য মহোদয়গণ আমার অক্ষমতা-জনিত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

সাড়ে দশ বৎসর হইল, আসামে বঙ্গ-সাহিত্যের অনুশীলনার্থে এই সভাটী সংস্থাপিত হইয়াছে। যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, কোনও রূপে টিকিয়া থাকাটাই এখন একটা

* গৌহাটী শাখা সাহিত্য-পরিষদের দশম বার্ষিক উৎসব সভায় সভাপতির অভিভাষণ।

আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। সভাটী যে কেবল টিকিয়াই আছে, এমন নহে; ইহার দ্বারা কিছু কাজও হইয়াছে।

সভার প্রথম অধিবেশনে তদানীন্তন সভাধ্যক্ষের "নিবেদন" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার উদ্দেশ্যাদি বিবৃত হইয়াছিল। যদিও নিয়মাবলীতে ছিল "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে যাহাতে বঙ্গভাষানুরাগী ব্যক্তিগণের আসক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং যাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি হয়, তদর্থে যত্ন করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য," তথাপি উক্ত "নিবেদন" প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে ইহাও বলা হইয়াছিল যে, আসাম সম্বন্ধে বঙ্গীয় সমাজে যে রূপ অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত সংস্কার লক্ষিত হইতেছিল, তাহার দূরীকরণার্থে প্রয়াস করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; অর্থাৎ সাহিত্য চর্চ্চা ব্যপদেশে বাঙ্গালার সমাজে আসামের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

নিয়মাবলীতে উল্লেখিত "মুখ্য উদ্দেশ্য" কতদূর সংসাধিত হইয়াছে, দেখা যাউক। যখন দেখা যায় যে, ইতঃপূর্ব্বে যাঁহারা কোনও দিন কোনও বাঙ্গালা প্রবন্ধ লেখেন নাই, এতাদৃশ কেহ কেহ বঙ্গ ভাষায় সারবান্ প্রবন্ধ লিখিয়া এই সভায় পাঠ করিয়াছেন; বাঙ্গালা যাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, তাঁহাদের মধ্যে শক্তিমান্ সুপণ্ডিত ব্যক্তিবিশেষ বঙ্গভাষায় প্রবন্ধ রচনা করিয়া সভায় আসিয়া তাহা পড়িয়াছেন; ইতঃপূর্ব্বে সম্যক্ আলোচিত হয় নাই। এমন অভিনব বিষয়ে প্রবন্ধাবলী লিখিত হইয়া এই সভায় সমালোচিত হইয়াছে; এখানে পঠিত সুবহু প্রবন্ধ, 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' 'নব্যভারত,' 'প্রবাসী' প্রভৃতি অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় সাদরে প্রকাশিত হইয়াছে; এবং এই সভায় অংশতঃ আলোচিত সভা কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ বিশেষ * এমন এক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। যাহাতে এযাবৎ কোনও বাঙ্গালা পুস্তক প্রবেশ লাভের অধিকারী হইয়া সম্মানিত হয় নাই—তখন এ কথা কি কেহ বলিতে পারেন যে, সভার মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে লোকের আসক্তি বর্দ্ধন, তথা বঙ্গ সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন বিষয়ে সভার প্রযত্ন কিয়ৎ পরিমাণেও সফলতা লাভ করে নাই?

তারপর বঙ্গীয় সমাজে আসামের কথা—ইহার গৌরব কাহিনী প্রচার সম্বন্ধে এইটুকু বলিলে অন্যায় হইবে না যে, সভা এ বিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিয়াছে। দুইটী মাত্র উদাহরণ দিতেছি—উভয়টী একই ব্যক্তির কাজ বলিয়াও উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে সতী-শিরোমণি জয়মতীর নামটীও বাঙ্গালা দেশে কেহ শুনে নাই; পরন্তু এই সভার তৃতীয় অধিবেশনে "জয়মতী কুঁয়রী" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পঠিত হইবার পরে 'জয়মতী'র আখ্যান অবলম্বনে বঙ্গভাষায় বহু প্রবন্ধ এবং পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে—এমন কি, তদীয় করুণ কাহিনী অভিনয়ের বিষয়ীভূতও হইয়াছে। "চরিতাভিধান" নামক সুবৃহৎ একখানি জীবনকোষের প্রথম সংস্করণে আসাম অঞ্চলের একটী প্রাণীরও নাম স্থান পায় নাই; কিন্তু সভার পঞ্চম অধিবেশনে "আসামের গৌরব চরিতাবলী" বিষয়ক প্রবন্ধ পঠিত হইবার পরে, সেই "চরিতাভিধানের" দ্বিতীয় সংস্করণে ষোল জন অসমীয়া প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত স্থান লাভ করিয়াছে।

---

* "তর্কাবিজ্ঞান"—শ্রীযুক্ত গুরুনাথ [illegible] প্রণীত।

এইরূপ আরো উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারিত, বাহুল্য ভয়ে প্রদত্ত হইল না। ফল কথা, 'আসাম' এখন আর অপরিচিত রহে নাই, বরং বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে ইহার সমাদর লাভই হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহাদেরও সমাদর হইয়াছে। সভার জন্মের কিছুকাল পর হইতেই উত্তর-বঙ্গ-সম্মিলনে তথা বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে ইহার প্রতিনিধি-গণ সাদরে আহূত হইয়া সাহিত্যিক ভাবে সমুচিত সম্মানিত হইয়াছেন।

এই সভার দ্বারা গৌণ ভাবেও নানা হিতকর ব্যাপারের সহায়তা হইয়াছে। সভার প্রতিনিধিগণ উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে সোৎসাহে যোগদান করাতে উক্ত সম্মিলনের পরিধি বঙ্গভাষার গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া এই কামরূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারিয়াছে। তাহার ফলে ৺ কামাখ্যা ক্ষেত্রে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন হইয়াছে —ইহাতে বঙ্গীয় ও অসমীয়া সাহিত্যসেবি-গণের মধ্যে পরস্পর ভাব-বিনিময়ের এক অপূর্ব্ব সুযোগ ঘটিয়াছিল, তদ্দ্বারা বাঙ্গালী ও অসমীয়ার মধ্যে সৌহার্দ্দেরও আধিক্য ঘটিয়াছে। এই সম্মিলনের উপলক্ষেই কাম-রূপ অনুসন্ধান সমিতির জন্মলাভ হয়, কিন্তু ইহারও বীজ এই সভাতেই উপ্ত হইয়াছিল — সে কথা এস্থলে বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। সভার প্রথম দুই বৎসরের কার্য্যবিবরণী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার তৎকালীন নেতৃস্থানীয় কেহ কেহ ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে আসামের প্রাচীন তথ্যের অনু-সন্ধান করে নানাস্থানে অভিযান করিয়া-ছিলেন। কিন্তু অতঃপর সভার অধিনায়ক-গণের তৎপক্ষে যত্নবান্ হইবার প্রবৃত্তির অভাব লক্ষিত হওয়াতে, প্রত্নতত্ত্বানু-সন্ধানার্থ একটা স্বতন্ত্র সমিতি গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল—৺ কামাখ্যায় উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন উপলক্ষে তাহাই কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে। গৌহাটিতে মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুতি লাভ এবং তদর্থে কতকটা সরকারি জমি চিহ্নিত করিয়া তাহাতে একটী গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি যে এক অতি বৃহৎ অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন—কালে তাহা সুসম্পন্ন হইলে আসামের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়া সমধিক ব্যাপিত হইবে—তখন এই সভারই একতম উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ সফলতা সংসাধিত হইবে।

এই সভার দ্বারা আসামীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে সাহিত্যিক জাগরণের সহায়তাও কম হয় নাই। প্রাগুল্লেখিত "নিবেদন" প্রবন্ধটী সভার নিয়মাবলী সহ মুদ্রিত হইয়া সমগ্র আসাম উপত্যকায় ১০০০ খণ্ড বিতরিত হইয়াছিল; তাহাতে সকলেই সভার উদ্দেশ্যাদি অবগত হইতে পারিয়া-ছিলেন। সভার অধিবেশনে স্থানীয় অসমীয়া ভদ্রলোক প্রায় সকলেই—এমন কি, আসাম ও অসমীয়ার পরম সুহৃদ ভূতপূর্ব্ব কমি-শনর কর্ণেল গর্ডন বাহাদুর পর্য্যন্ত—সভাস্থ হইয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন; অনেকে বঙ্গভাষায় আবৃত্তি ইত্যাদি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াও সভাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। কলেজের অসমীয়া ছাত্রগণ সাগ্রহে সভায় উপস্থিত থাকিয়া আলোচিত প্রবন্ধাদি হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে অসমীয়া ভ্রাতৃগণ সকলেই দেখিতে পাইলেন যে, ইতঃপূর্ব্বে যাঁহারা তাঁহাদের দেশ, ভাষা, ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে ঔদাসীন্য,

এমন কি, অবজ্ঞার ভাবও দেখাইয়া আসিতেছিলেন, এখন তাঁহারাই শতমুখে আসামের গৌরব খ্যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ফলে এই হইল যে, তাঁহাদের মনে আত্মাদর জাগিয়া উঠিল—তাঁহারাও সমধিক অভিনিবেশ সহকারে আপন মাতৃ ভাষার সেবায় লাগিয়া গেলেন। যেখানে একমাত্র "উষা"র ক্ষীণালোক লক্ষিত হইতেছিল এবং অচির-সঞ্জাত "বাঁশী"র স্বর সুদূর হইতে মৃদু শ্রুত হইতেছিল, সেই স্থানে 'আসাম বান্ধব' ও "আলোচনী" নামক আরো দুইখানি পত্রিকার যুগপৎ আবির্ভাব হইল, এবং সকলগুলিই প্রবন্ধ-সম্ভারে সুশোভিত হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। অসমীয়া ভাষার উন্নতি-সাধিনী সভাটী এতদিন ছেলেদের হাতে ছিল, বর্ষীয়ান্‌গণ তাঁহাদের উদাসীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহার কার্য্যভার নিজেরাই গ্রহণ করিয়া ইহার গৌরব বর্দ্ধন করিলেন। একদিন অসমীয়া সাহিত্য-সম্মিলনের প্রস্তাব করিয়া হতাশ হইতে হইয়াছিল—ক্রমে তাহারও অনুষ্ঠান সম্ভাবিত হইল। এই সভায় যে সকল ছাত্র নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহাদের অগ্রণী শ্রীমান্ ইন্দ্রেশ্বর বড় ঠাকুর প্রভৃতি উদ্‌যোগী হইয়া সতী জয়মতীর মৃত্যু তিথিতে তদীয় নামপূত জয় সাগরের তীরে বার্ষিক মহোৎসবের অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাতে দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও পুরমহিলারা আসিয়া যোগদান পূর্ব্বক ইহাকে এক অতি অসাধারণ গৌরব প্রদান করিয়াছেন, বাঙ্গালা প্রদেশেও এতাদৃশ 'জাতীয়' উৎসবের কথা শুনা যায় না।

অতএব দেখা গেল, বঙ্গের কেন্দ্র-স্থল হইতে সুদূরবর্ত্তী স্থানে, বঙ্গীয় সমাজের বহির্ভাগে, ভিন্ন ভাষা-ভাষী জনতার মধ্যে সুধীমের কতিপয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইলেও, সভাটীর কৃতকার্য্যতার নিমিত্তে শ্লাঘা করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। তবে চিরদিন অবস্থা এক প্রকার থাকে না, ইহা জগতেরই নিয়ম; অধুনা ইহার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু মন্দ দেখা যাইতেছে,—ইহারও কারণ আছে। বহু উৎসাহী সভ্য স্থানান্তরিত হইয়াছেন—তন্মধ্যে সভার আজন্ম "পরিপোষক এবং ইহার ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালি বেদান্ততীর্থ ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহ মহোদয় দ্বয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁহারা দূরে থাকিয়াও ইচ্ছা করিলে প্রবন্ধাদি পাঠাইয়া সভাকে উৎসাহিত করিতে পারেন। পরন্তু সভার দুর্ভাগ্য বশতঃ উৎসাহদাতা কয়েক জন পরলোকগামী হওয়াতে ইহা তাঁহাদের পোষকতা হইতে চিরবঞ্চিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৺চন্দ্রমোহন গোস্বামী মহোদয়ের এবং ৺রামদাস ব্রহ্ম মহাশয়ের নামোল্লেখ একান্ত কর্ত্তব্য। গোড়ায় ইহারা উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক তদানীন্তন পরিচালকগণের পশ্চাতে না দাঁড়াইলে, সভার জন্ম হইত কি না, সন্দেহ, জন্মিলেও বোধ হয় সূতিকা-গৃহেই ইহার বিনাশ ঘটিত। যাহা হউক, এই সকল বিয়োগ বিচ্ছেদেও সভাটী চলিতেছে; এবং পরিষদের অন্যান্য শাখার তুলনায় নেহাৎ মন্দ চলিতেছে, এ কথা বলিতে পারি না। ইউরোপীয় মহাসমরের অবান্তর ফলে অন্ন বস্ত্রাদির দুর্ম্মূল্যতা বশতঃ লোকের চিত্ত উদ্বেগগ্রস্ত, এই অবস্থায় সাহিত্যালোচনার সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ অসম্ভব; সাহিত্য সম্মিলনাদির বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। এতাদৃশ অবস্থায় সভার নিয়মিত "মাসিক অধিবেশনগুলির সম্পাদন

পূর্ব্বক বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিতে পারিতেছেন বলিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য-প্রমুখ সভার বর্ত্তমান নেতৃবর্গ অশেষ ধন্যবাদার্হ, সন্দেহ নাই।

উপসংহারের পূর্ব্বে একটী পবিত্র কর্ত্তব্য করা আবশ্যক। আমাদের বিবাহাদি উৎসবের সময়ে আভ্যুদয়িক কৃত্যে স্বর্গগত অব্যবহিত তিন পুরুষের নাম গ্রহণ করিয়া শ্রাদ্ধোপহার প্রদানান্তে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে হয়। তাই অদ্যকার এই উৎসব-ব্যাপারেও অচির স্বর্গত পুরুষত্রয়ের নামোল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনাদি কর্ত্তব্য মনে করি—কেন না, এই সভা যাহার শাখা, সেই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ইঁহারা পোষণ বর্দ্ধনাদি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমতঃ পুণ্যশ্লোক স্যর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের নাম স্মরণ করিতেছি। অধুনা যে ভাবে বঙ্গভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে, ভাইস্ চান্সেলার ভাবে, আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কন্ভোকেশন বক্তৃতায় তিনি ইহার বীজ বপন করেন, পরে সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি হইলে, সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাতে যোগদান পূর্ব্বক অপর কয়েকজন প্রধান সদস্যের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বঙ্গ ভাষার সম্যক্ প্রবর্ত্তনার্থে এক প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করেন—তাহাতে আংশিক ফললাভও হইয়াছিল। পরিশেষে লর্ড কর্জ্জনের নিযুক্ত ইউনিভার্সিটি কমিশনের সভ্য রূপে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গ ভাষার—তথা অন্যান্য দেশীয় ভাষার—বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রসার লাভের—এমন কি, এম-এ পরীক্ষায় বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবারও বিধান এই মহাত্মাই করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, পণ্ডিতবর রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুরের নাম গ্রহীতব্য। পরিষদের শৈশবাবস্থায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে ইনি ইঁহার সম্পাদকীয় গুরুভার বহন করিয়াছিলেন। তার পর যখন পরিষৎ জন্মস্থল ছাড়িয়া গেল, তখন ইনি অভিমানী ভক্তের ন্যায় উহার জাতক-গৃহ পরিত্যাগ করিতে কিছুতেই রাজি হইলেন না—পরন্তু তথায় 'সাহিত্য-সভা' স্থাপন করিয়া আমরণ যথাশক্তি সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, মৃত্যু-পর্য্যায়ে সর্ব্বশেষ যাঁহার নাম লইতেছি, তিনি পরিষদের জন্মাবধি নিজের দেহত্যাগ পর্য্যন্ত নানা ভাবে সেবা করিয়া ইহাকে বর্ত্তমান আকারে দাঁড় করাইয়া গিয়াছেন। বঙ্গ-ভারতীর একনিষ্ঠ সাধক—আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকটে পরিষৎ তথা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য যে কি পরিমাণে ঋণী, সে কথা বলিয়া কুলাইতে পারিব না—তাই এস্থলে বলা হইল না। তাঁহাদের বিয়োগে আমরা অতীব সন্তপ্ত হইলেও, শোক সন্তাপ প্রকাশের জন্য আজ এ স্থলে তাঁহাদের নাম উল্লেখিত হয় নাই—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই উৎসবের দিনে অভ্যুদয়ার্থ তাঁহাদের নাম গ্রহণ করা হইল। তাঁহারা আচারপূত সদ্‌ব্রাহ্মণ ছিলেন—বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া আরাধ্যা দেবী সরস্বতীর সালোক্য লাভ করিয়াছেন; সেখান হইতে এই ক্ষুদ্র সভাটীর উপর তাঁহারা আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন—যেন ইহা সুদীর্ঘ কাল গৌরবের পথে পরিচালিত হইতে থাকে।

পরিশেষে সভ্যমহোদয়গণ যে এই নীরস কর্কশ বাগ্ ব্যাপার ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ করিয়াছেন, এবং সভার কর্ত্তৃপক্ষীয় মহাশয়গণ যে উৎসব-সভায় সভাপতিত্বে বৃত করিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত

সবিনয় ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। অপিচ যাঁহার পবিত্র ক্ষেত্রে এই সভা জন্মলাভ করিয়া স্থান-মাহাত্ম্যেই যেন এতাবৎকাল নিরাপদে বাঁচিয়া থাকিয়া উদ্দেশ্য সাধনেও কথমপি কিঞ্চিৎ চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিয়াছে, সেই সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যা জগন্মাতা ভগবতী কামাখ্যা এই সভার ও সভ্যগণের সর্ব্ববিধ কল্যাণ বিধান করুন—সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

ভক্তের অনাদর।

(১) ভক্ত বিশ্বল।*

[সত্য ঘটনা-স্মৃতি]

সে আজ ২৫।২৬ বৎসরের কথা। এক দিন বৈশাখের অপরাহ্নে শনিবার বিদ্যালয়ের ছুটী হইল। আমরা দুইজন শিক্ষক আমি আর গড়গড়ি মহাশয় গঙ্গার ঘাটে আসিলাম। প্রত্যহই আমরা নৌকা করিয়া যাতায়াত করিতাম। সস্তা হইবে বলিয়া আমরা একটী ক্ষুদ্র নৌকা মাস হিসাবে ভাড়া করিয়াছিলাম। একটী মাত্র মাঝি কষ্টে চালাইয়া নৌকা লইয়া যাইত।

স্রোতের মুখে সেদিন নৌকা ছাড়িয়া দিল। রৌদ্র ছিল না, মেঘ উঠিয়াছিল। গড়গড়ি মহাশয় বাহিরে বসিলেন। নির্ম্মল গঙ্গাজলের দিকে ও আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভায়া হে, এমন জল ও এমন আকাশ যে দেখেছে, সে কি কল্পনায়ও অবিশ্বাস আনতে পারে?" আমি চুপ করিয়া রহিলাম। গড়গড়ি মহাশয়ের ভাব সর্ব্বদাই উথলিয়া উঠিত ও প্রাণে ব্রহ্ম চিন্তা আসিলেই চক্ষু দিয়া জ্যোতি বাহির হইত। ব্রাহ্মণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আত্মস্থ হইলেন। আমি নৌকায় একখানি ছিন্ন চৈতন্যচরিতামৃত লইয়া পড়িতে লাগিলাম।

"পহি লহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল"

এবং কি করিয়া এই অনুরাগ উৎপত্তি হইল, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এ অনুরাগ "অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল" তবে কি এই অনুরাগেই আমরা বাঁচিয়া আছি। জীবনের অনেক বিশুষ্ক মুহূর্ত্তে এই অনুরাগই কি আমাদের জীবন দেয় না। কবি গাহিয়াছেন—

"পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে
জনম দিয়েছ জননী ক্রোড়ে
বেঁধেছ সখার প্রণয় ডোরে
তুমি ধন্য ধন্য হে।"

এই অনুরাগই কি সংসারের মূল নয়?

অল্পক্ষণ পরে মাঝি বলিল "বাবু, মেঘটা আজ বড় ভারি উঠেছে, নৌকা ভিড়িয়ে দিই।" আমি বলিলাম "হরি, তুমি যখন শক্ত বুঝেছ তো ভাঙ্গা ঘাটের পাশেই ভিড়িয়ে দাও।" গড়গড়ি মহাশয় ভাবে ভোর ছিলেন, চমকিয়া উঠিয়া মেঘের দিকে দেখিলেন। ঘন কালো মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। প্রকৃতি গম্ভীর নিস্তব্ধ। ঝড়ের প্রারম্ভের নিস্তব্ধতা। মাঝি ঘাটে নৌকা লাগাইল। আমি ঘাটে

* "এই সম্প্রদায়ী বৈষ্ণববীর বা ভক্ত বিশ্বল নামে অভিহিত। ইহাদের বৌদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করিলে অসঙ্গত হয় না। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পুত্তলিক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ছিলেন। ইহারা উপাস্য দেবের প্রতি উপাসকের প্রীতিকে উপাসনার প্রধান অঙ্গ বলিয়া অঙ্গীকার করে। এবং উপাস্য উপাসকে পরস্পর প্রেম বিনিময় হয়, এরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে"—উপাসক সম্প্রদায় ২৩৩ পৃঃ।

অবতরণ করিলাম। গড়গড়ি মহাশয় বলিলেন, "ভয় কি, ঘাটে আসিয়াছি, নামিলেই হইবে, সত্যই কি তিনি ডুবাইয়া মারিবেন, তা হইতেই পারে না।" আমি একটু দূরে উঠিয়া একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, গড়গড়ি মহাশয় আবার ধ্যানস্থ হইলেন। দূর হইতে ঝড়ের আগমন শব্দ শুনা গেল। দূরে নদীর জল আন্দোলিত হইল। নিকটে জল স্থির। পাখীরা উড়িতে লাগিল। একটা কলরব ধ্বনি দূর হইতে আসিল। স্নিগ্ধা প্রকৃতি চঞ্চলা হইলেন। কি যেন একটা ঘোর আর্ত্তনাদ উঠিল। মাঝি নৌকা শক্ত করিয়া বাঁধিল ও কহিল, "গড়গড়ি মহাশয়, উঠুন আর সময় নাই" বলিয়া তীরে দাঁড়াইল। গড়গড়ি মহাশয় বলিলেন "এই উঠছি"। তখনও গড়গড়ি মহাশয়ের চক্ষু হইতে ব্রহ্মানন্দের আবেগ সম্পূর্ণ রূপে ছুটিয়া যায় নাই। সন্ধ্যার প্রারম্ভে দিবার শেষ জ্যোতি তখনও অপসারিত হয় নাই। প্রচণ্ড বাত্যা বীভৎস রবে সন্নিহিত হইল। ছোট নৌকাখানি উল্টাইয়া গেল। গড়গড়ি মহাশয় অসাবধানে জলে পড়িলেন। তরঙ্গের পর তরঙ্গ তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। মাঝির যথাসাধ্য সাহায্যে সমস্ত কাপড় জামা ভিজাইয়া যখন তীরে উঠিলেন, তখন তরঙ্গের আঘাতে নিম্নখোদিত তটভূমি তাঁহার ভারে তাঁহাকে লইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই ঘটনা ঘটিল, আমি 'কি হইল' বলিয়া দৌড়িলাম, তাহারই পূর্ব্বে মাঝির সাহায্যে গড়গড়ি মহাশয় উন্নীত হইয়াছেন। গড়গড়ি মহাশয় বৃদ্ধ ও আমি যুবা। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি এরূপ নমনীয় ছিল যে, তিনি সমান ভাবেই আমার সহিত মিশিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে লইয়া সেই বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইলাম। একটী বৃদ্ধা সেই সময়ে কোন অজ্ঞানিত কারণে ঘাটে আসিয়াছিলেন। তিনিও উঠিতেছিলেন। নীচ কুলোদ্ভবা বৃদ্ধা আমাদের উপদেশ দিলেন "বাবা, ঝড়ের সময় গাছের তলায় দাঁড়াতে নাই, বাজ পড়তে পারে, গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়তে পারে।" গড়গড়ি মহাশয় বলিলেন "ভগবান এত কষ্ট দিয়াছেন, আবার এমনিই কি করিবেন?" আমি শুনিলাম না। তাঁহাকে একরূপ ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। উপরেই গ্রাম। তবে তটভূমি সুউচ্চে। বৃদ্ধা উপরে উঠিয়া বামদিকে চলিয়া গেলেন। ঠিক সেই সময়ে ভীষণ ধ্বনির সহিত বজ্রাঘাত হইল। আমরা পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, সেই অশ্বত্থ বৃক্ষে বজ্রপাত হইয়াছে ও একটী প্রকাণ্ড ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আর অল্প মাত্র কাল অপেক্ষা করিলে আমাদের কি হইত, জানি না। গড়গড়ি মহাশয় হাত জোড় করিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন ও উপর দিকে দেখিলেন। তিনি যেন কিছুই জানেন না যে, তাঁহার কর্দ্দমাক্ত শরীর জলে ভিজিয়া গিয়াছে ও ঝড়ের তীব্র শৈত্যে কম্পমান হইতেছে। আমি মনে মনে ভাবিলাম, ভগবান নিশ্চয়ই নির্ভরতার সহিত মানুষকে আত্মরক্ষার জ্ঞান বুদ্ধি দিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা নিকটবর্ত্তী গোপালজীর মন্দিরে আশ্রয় লইলাম। বৃদ্ধ পূজারী ঠাকুরের বিগ্রহে ঘন ঘন বাতাস করিতেছে ও কাঁদিতেছে। আমি ঔৎসুক্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ঠাকুর কি হয়েছে, কাঁদছ কেন?" তিনি বলিলেন "মশাই আমার গোপালের আজ বড়ই কষ্ট হয়েছে, মশারি ফেলে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, কত মশাই কামড়েছে!" পরে জানিলাম, পূজারী ঠাকুর গোপালজীকে সেবা করিয়া শয়ন করাইয়া যাইবার সময় ঠাকুরের মশারী ফেলিয়া দিয়া যান নাই। একাহারী বৈষ্ণব আহার করিতে বসিয়া

দুই গ্রাস অন্ন মুখে দিতে না দিতেই তাহার গোপালের প্রতি ক্রটী স্মরণ হয়। আর সেবা-অপরাধ স্মরণ মাত্র আহার পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসেন। ক্রন্দনে আকৃষ্ট জননীর ন্যায় শিশুর দিকে ধাবিত হন। হাত ধুইবার অবকাশ হয় নাই। আসিয়া কাঁদিয়া আকুল। তার পর হাত ধুইয়া আসিয়া এই বাতাস করিতেছেন আর কাঁদিতেছেন "গোপালের কত কষ্টই হইয়াছে!" প্রাণে গোপাল-ভালবাসা উথলিয়া উঠিয়াছে। সবেগে ও আবেগে বিভোর হইয়া এই সেবা কার্য্য করিতেছেন, বাহিরে ঝড় হইতেছে, লক্ষ্য নাই। প্রকৃতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ নাই। তাঁহার সমস্ত প্রাণ গোপালের কষ্টের দুঃখে অভিভূত হইয়াছে।

আমি যখন তাঁহাকে ডাকি, তখন তাঁহার চৈতন্য হয় যে, দুইজন জলসিক্ত অতিথি তাঁহার গোপালজীর দ্বারে উপস্থিত। গড়গড়ি মহাশয় সমস্ত দেখিতেছিলেন ও তীক্ষ্ণ ভাবে সমস্ত বুঝিতেছিলেন, পরে বলিলেন "ওহে বাপু, তোমার বয়স তো আমার সমান দেখছি, তোমার ভ্রম কবে যাইবে, এত বড় বিশ্বসংসারে যিনি বর্ত্তমান, ঐ জলে আকাশে বৃক্ষে বনস্পতিতে যিনি আছেন, যিনি ঐ অনন্ত সৌরজগতের চালনা করিতেছেন, তাঁহার কি আবার কষ্ট হয়, তাঁহাকে কি ক্ষুদ্র মশা কামড়াইতে পারে?" বলিতে বলিতে গড়গড়ি মহাশয়ের দেহ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চক্ষু দিয়া জ্যোতিঃ বাহির হইল। মনে হইল, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আকাশের দিকে চাহিয়া আত্মহারা হইয়াছেন। কর্দ্দমাক্ত জলসিক্ত ছিন্ন বস্ত্রাচ্ছাদিত শৈত্য-কম্পমান দেহ বিশ্বাসে অটল ও ব্রহ্মানন্দে অধীর। বৃদ্ধ পূজারী সংযত নেত্রে এক একবার গোপালের দিকে চাহিতেছেন ও মনে মনে ভাবিতেছেন, এরূপ শুনিলেও যেন অপরাধ হয়। তিনি বলিলেন ঠাকুর "সেই তো তোমার জগৎ চালান ঠাকুরই তো আমার গোপাল; আমি তাঁহাকে ননী সর খাওয়াইয়া দিই, তিনিই তো আমার গোপাল, তোমার এত বড় গোপাল তো আমি বুঝি না।" গড়গড়ি মহাশয় বলিলেন "এতে আবার বোঝবার কি আছে! জলে স্থলে, নভে পর্ব্বতে তুমি বিশ্বনিয়ন্তাকে দেখিতে পাও না। ওই প্রবল ঝড়ে ঠাকুর কি নাই?" পূজারী আস্তে আস্তে বলিল "আমার গোপালকে কেন মশাই তুমি তবে দেখতে পাওনা?" গড়গড়ি মশায় পূজারীকে বুঝিলেন না। পূজারী গড়গড়িকে বুঝিলেন না। আমি বৈকালিক প্রসাদ লাভে পূজারীকে বলিলাম "ঠাকুর, তিনটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে, ঝড়ের আওয়াজে গোপালজীর ঘুম ভেঙ্গে গেছে, বৈকালিক আয়োজন করুন।" পূজারী আমার দিকে চাহিলেন, ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্র নারায়ণের অনুরোধে গোপালের প্রসাদের আয়োজন করিতে গেলেন। তাঁহার কিন্তু সেদিন আহার হইবে না, কেন না, আহার করিতে করিতে উঠিয়াছেন।

গড়গড়ি মহাশয়কে আমার চাদরখানি পরাইয়া দিলাম। এখানি অপেক্ষাকৃত কম ভিজা ছিল। ঝড় প্রায় থামিয়া আসিয়াছিল। কোণের দিকে গোপালজীর কলাগাছ তিনটা পড়িয়া গিয়াছে। বাবাজি সেদিকে একবার দেখিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন। এ নিঃশ্বাস হর্ষ বিস্ময় পূর্ণ। মা যশোদার গোপাল বাঁধা বৃহৎ গাছ দুটার মুক্তির আনন্দের হর্ষ এবং এই এতটুকু গোপালের এই কীর্ত্তি, এই বিস্ময়।

গড়গড়ি মহাশয় যখন আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, "লোকটা কি বিট্‌কেল ভক্ত পাগল না কি?" আমি বলিলাম, "পাগল ও না আপনি?"

খানিক পরে প্রসাদ আসিল। আজও সুদূর এই বিদেশে বসিয়া মাতা বঙ্গভূমির বৈশাখ বৈকালির স্নিগ্ধ প্রসাদ স্মরণে ব্যাকুল ও লোলুপ হই। পূজারী উজ্জ্বল নয়নে হাসি হাসি মুখে প্রসাদ লইয়া আসিলেন। তাঁহার মনের কষ্ট গিয়াছে, গোপাল জলখাবার খাইয়া খুশী হইয়াছেন। আমি প্রসাদ লইয়া মাথায় রাখিলাম ও খুব আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম। গড়গড়ি মহাশয় লইলেন না। কাজেই তাঁর ভাগটাও আমার হইল।

বিদায়ের পূর্ব্বে পূজারী আসিয়া হাতযোড় করিয়া দাঁড়াইল, ইহার অর্থ—আমাদের যদি কষ্ট হইয়া থাকে, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা। গড়গড়ি মহাশয় উদাসীন ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া যেন তার প্রত্যুত্তর দিলেন। নৌকায় আর উঠিতে ভরসা হইল না। পদ-ব্রজেই চলিলাম। গড়গড়ি মহাশয় ব্রহ্মানন্দে বিভোর—একবার কেবল বলিলেন "প্রসাদ আবার কি, পুত্র-পত্নী পিতা প্রত্যহ যত কিছু আনন্দ পাই, সবই তাঁহার প্রসাদ। লোকটা বাতুল না কি?" আমি বলিলাম, "এরূপ একটা বাউলের দল দেশের কাজে লাগাইতে পারিলে ভারত-মাতার মুখ উজ্জ্বল হয়, পাগল ও না আপনি?" *

শ্রীপ্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্কলিকা

(৬৬)

কলিকাতার বাড়ী ভাড়ার বিল আইনে পরিণত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানের মহারাজার জয়-জয়কারে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইয়াছে। ইহাতে বাড়ী ভাড়া কমিলে আমরা সুখী হইব। ভেজাল আইনের ন্যায় ইহা অকর্ম্মণ্য আইনে পরিণত হইবে কি না, দেখিবার জন্য আমরা সোৎসুক নয়নে চাহিয়া রহিলাম। বোধ হয়, ঘুষের আর একটা কল খুলিল।

কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধির কারণ কি? প্রথম কারণ, ভবানীপুরের রসা রোড্ এবং কলিকাতা সেণ্ট্রাল এভিনিউ রাস্তার জন্য অনেক বাড়ী ভাঙ্গা হইয়াছে। অনেক জমী অল্প মূল্যে আত্মসাৎ করিয়া ইমপ্রুভমেণ্ট-ট্রাষ্ট প্রভৃত অর্থোপার্জ্জন করিয়া জমীর দর বাড়াইয়া দিয়াছেন। এই দুই রাস্তার লোকেরা কোথায় যাইবে? যাঁহাদের অর্থ আছে, তাঁহারা অন্যত্র বর্দ্ধিত হারে বাড়ী ভাড়া নিতেছে। মাড়োয়ারীদের টাকার ভাবনা নাই, নিকটবর্ত্তী বাড়ী সকল চারি গুণ ছয় গুণ বর্দ্ধিত হারে ভাড়া দিয়া তাহারা বাড়ী নিতেছে। দ্বিতীয় কারণ, মিউনিসিপাল টেক্স বৃদ্ধি। প্রতি ৬ বৎসর অন্তর কলিকাতায় টেক্স বৃদ্ধি হয়। কোন স্থলে শতকরা ৫০৲, কোন স্থলে ৬০৲ কোন স্থলে শতকরা ১০০৲, কোন স্থলে শতকরা ১০৪৮৲ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। † বাড়ীওয়ালারা এত টেক্স কোথা হইতে দিবে? কাজেই তাঁহারা ভাড়ার উপর এই টেক্স বসাইতেছেন; আর পৈতৃক বসত্-বাড়ী-ওয়ালারা হাহাকার করিতেছেন। তৃতীয় কারণ, ইনকম-টেক্স। মিউনিসিপালিটীর বর্দ্ধিত হারের টেক্স অনুসারে কলিকাতার বাড়ীর ইনকম টেক্স ধার্য্য হইতেছে। তাহাতেও বাড়ী ভাড়া বাড়িতেছে। তাহা ছাড়া দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতা আছে। এই সব কারণ বিদূরিত না হইলে বাড়ী ভাড়া কমিবে বলিয়া মনে হয় না। বাড়ীর সংখ্যা বাড়ান একান্ত উচিত। ট্রাষ্ট, মিউনিসিপালিটী ও ইনকম টেক্সের এসেসরদিগকে সংযত করা উচিত। কিন্তু কে তাহা করিবে? এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট উদাসীন। তাঁহারা আয় ছাড়িতে পারেন না, তবে ভাড়া কমিবে কেন? এই সকল মহা সমস্যার পূরণ এই আইনে হয় নাই। বৃথা গোল বাড়ান হইয়াছে। নূতন ঘুষের কল প্রতিষ্ঠার কি লাভ?

(৬৭)

রিফরম আইনের নির্ব্বাচন আসিতেছে, সুতরাং এই সময়ে চতুর্দ্দিকে প্রজাদিগকে হাত করার চেষ্টা হইতেছে। প্রজার দুঃখে দুঃখী হন, ভালই। কিন্তু এত দিন সকল হিতৈষী উদাসীন ছিলেন কেন? আমাদের

* গড়গড়ি মহাশয় স্বর্গে, তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুরোহিত। প্রাণধন, প্রকাশক শ্রীযুক্ত মন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতা। সত্য ঘটনা। ন, স।

† Daily News, April, 10, 1920.

মনে হয়, নির্ব্বাচন হইয়া গেলেই আবার সব নীরব হইয়া যাইবে। যেমন মিউনিসিপাল কমিসনার নির্ব্বাচনে, যেমন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বা লোকাল বোর্ডের সভ্য নির্ব্বাচনে দেখা যায়, নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে খুব ধূমধাম,—"ইহা করিব, তাহা করিব" বলিয়া প্রতিশ্রুতি-দান, নির্ব্বাচনের পরে আর কাহারও প্রতি তাকাইয়াও দেখেন না, মনে হয়, নূতন লাট সভার সভ্য নির্ব্বাচনের পরেও সেই প্রকার হইবে। আমরা কত ঘটনা জানি, আমরা কত খোসামুদের কথা জানি, নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে তাঁহারা কত দয়ালু, কত সদাশয়, তৎপর কত নিষ্ঠুর, কত অভদ্র, কত দুর্ব্বিনীত। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে যাঁহারা দ্বারস্থ হয়, নির্ব্বাচনের পর ঘুষের পর ঘুষ দিলেও তাহাদের মন পাওয়া যায় না, অত্যাচারিতদের প্রতি তাকাইয়াও দেখেন না। যে সকল ব্যারিষ্টার আজ আসরে নামিয়াছেন, তাঁহারা কখনও কোন হিতকর কার্য্যে একটী পয়সা চাঁদা বা ভিক্ষা দিয়াছেন কি? তাঁহারা কোন অত্যাচারিতের বা বিপন্নের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন কি? ইতিহাস বলে, কখনও না। তবে আজ হিতৈষী সাজিলে হইবে কি? ভারত যে তিমিরে, সেই তিমিরেই ডুবিবে। মানুষ প্রকৃত মানুষ না হইলে, দেশ-জাগরণের কোন সম্ভাবনা নাই। ফরিদপুরে বড় রায়ত সভা হইল, কিন্তু বিপন্ন রমণীর আর্ত্তনাদ কেহ শুনিলেন না! সভাপতি আশা দিয়া শেষে পলায়ন করিলেন!! কোন্ সভাপতি, কোন্ বক্তা, কোন্ বিপন্নের কথা শুনিয়া তাহার প্রতিকার করিয়াছেন? রায়তদের গায়ে গন্ধ, কাপড়ে গন্ধ, তাহাদের ছায়ায় ছায়ায় দুর্গন্ধ ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের সহিত মেলা মেশা করা যায় কি? কি বল, তাহাদের সহিত ট্রেনের এক গাড়ীতে ভ্রমণ করা চলে কি? সকলেই দূরে দূরে থাকেন, আর আজ তাঁহারা দ্বারস্থ। অবস্থা বুঝিয়া সকলে কাজ করেন, বিনীত প্রার্থনা। ভূঁইফোড় হিতৈষীদের দ্বারা কখনও কিছু প্রতিকারের আশা নাই।

তবে দুই চারিজন প্রকৃত হিতৈষী থাকিতে পারেন, তাঁহারা সর্ব্বকালেই উপেক্ষিত হইবেন। কি লাট সভায়, কি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে, কি মিউনিসিপাল করপোরেসনে, কোন কালেই তাঁহাদের কোন আশা নাই। নগেন্দ্র ঘোষেরা চিরদিনই আঁধারে থাকিতে বাধ্য। দেশের আশা কোথায়? ঘুষের মাত্রা, নব নির্ব্বাচনে কিরূপ প্রশ্রয় পায়, কেহ জানেন কি? যদি না জানেন, তবে একটু অনুসন্ধান করুন।

(৬৮)

গবর্ণমেণ্ট দিবেন কি, তাঁহারা দিতে পারেন না। চাহিলেই সব পাওয়া যায় কি? চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া এ পর্য্যন্ত কি পাইয়াছি? জোর করিয়া চাও, জালিয়ানওয়ালাবাগের আবার পুনরভিনয় হইবে, আবার মার্শাল ল, আবার বোমা, আবার কত কি আসিবে? ১৮১৮ সালের ৩ আইন, ভারত-রক্ষা আইন, রাজদ্রোহ সভা-ভঙ্গ আইন, প্রেস আইন, অস্ত্র আইন, নানা শুল্ক, নানা টেক্স, নানা অন্তরীণ, নানা অত্যাচার আবার আসিবে!! ভিক্ষায় বড় কিছু হয় না। কোন ব্যারিষ্টার পিতৃঋণ শোধ দিয়াছেন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু যতদূর জানি, প্রকৃতপক্ষে অনেক ঋণই বাকী; তদ্রূপ অনেক আন্তরীয়গণ মুক্তি পাইয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও কত কত বাকী। তাঁহাদের কাহিনী পাঠ করিলে চক্ষে জলধারা বহে। আর যাঁহারা মুক্তি পাইয়াছেন, তাঁহাদের দুর্দ্দশার কথা কেহ জানেন কি? প্রেস আইনের প্রবর্ত্তক কত সম্মান পাইতেছেন, জানেন কি? বন্ধনদশা বরং তাহাদের ভাল ছিল, মুক্ত হইয়া তাহারা কোথাও চাকরী বা সম্মান, আশ্রয় বা সাহায্য পায় না, তাহাদের পশ্চাতে সিপাই ঘুরে, তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া নিতান্ত হীনাবস্থায় উপনীত! বাঘে ছুঁইলে আর কি উপায় থাকে? অপিচ আইন-প্রবর্ত্তকেরা মহা সম্মানে আজ সম্পুজিত! বলিহারী ব্যবস্থা! নিম্নলিখিত বিবরণ পড় এবং নীরবে অশ্রুপাত কর!

বরিশাল হিতৈষী (২৩শে চৈত্র, ১৩২৬) বলেন,

"দেখরে জগৎ মেলিয়ে নয়ন।"

পরম দয়ালু সম্রাটের আদেশ সত্ত্বেও এখন কত ভারতবাসী রাজনৈতিক অপরাধে কারাবদ্ধ আছে, তাহার তালিকা পাঠ কর—আর সলজ্জ নয়নে চাহিয়া দেখ।

রাজনৈতিক আসামীদের নাম।

• আবদ্ধদের নাম।

১ অমৃতলাল সরকার, ২ যোগেন্দ্র দাস ভট্টাচার্য্য, ৩ রবীন্দ্র সেন, ৪ বীরেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি, ৫ মনোরঞ্জন গুপ্ত, ৬ আশুতোষ কাহালী, ৭ ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী, ৮ চন্দ্রকুমার ৯ বিজয় চক্রবর্ত্তী, ১০ জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ, ১১ সুধীন্দ্র রায়, ১২ মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য, ১৩ নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১৪ নরেন্দ্র বানার্জ্জী, ১৫ জিতেন্দ্র মুখার্জ্জী, ১৬ শরৎ গুহ, ১৭ হারাণ রক্ষিত, ১৮ নিশি পাইন, ১৯ অরুণ-চন্দ্র গুহ, ২০ শিশিরকুমার দত্তগুপ্ত, ২১ শ্রীশ পাল, ২২ ভগবান দাস, ২৩ হরেন্দ্র মৈত্র, ২৪ সুরেন্দ্রমোহন গুহ রায়, ২৫ সুরেন্দ্র-মোহন ঘোষ, ২৬ সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ২৭ লালমোহন দে, ২৮ গিরীন্দ্র বানার্জ্জী, ২৯ সতীশ পাকরাসী, ৩০ প্রবোধ দাস গুপ্ত, ৩১ যোগেশচন্দ্র চাটার্জ্জী, ৩২ ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, ৩৩ ভূপতি মজুমদার।

রাজনৈতিক দণ্ডপ্রাপ্তদের নাম।

১। প্রয়াগপুর কেস্।

১ গোপেন্দ্রলাল রায়, ২ ক্ষিতীশচন্দ্র সান্ন্যাল, ৩ ফণীভূষণ, ৪ আশুতোষ লাহিড়ী।

বালেশ্বর-কেস্।

১ জ্যোতিশচন্দ্র পাল।

বরিশাল রাজদ্রোহের মামলা।

১ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, ২ খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ৩ মদনমোহন ভৌমিক।

বেনারস-কেস্।

১ নরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জী, ২ প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য।

সিরাজগঞ্জ-কেস্।

১ নিকুঞ্জ পাল, ২ গোবিন্দ কর।

রাজাবাজার বোমা কেস্।

১ অমৃতলাল হাজরা।

ঢাকা ষ্টেসন-কেস্।

১ প্রফুল্ল রায়, ২ সতীশচন্দ্র সিংহ।

শিবপুর কেস।

১ সত্যরঞ্জন বসু, ২ নরেন্দ্র ঘোষ চৌধুরী, ৩ নিখিলেশ্বর রায়চৌধুরী, ৪ হরেন্দ্র কাব্য-তীর্থ, ৫ শচীন্দ্র দত্ত, ৬ সুরেন্দ্র বিশ্বাস, ৭ সানুকূল ভট্টাচার্য্য, ৮ ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।

রাজেন্দ্রপুর কেস্।

১ সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

গৌহাটি কেস।

১ নলিনী ঘোষ, ২ মণীন্দ্র রায়, ৩ প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, ৪ তারাপ্রসন্ন।

ভাগলপুর কেস্।

২ জীতেশচন্দ্র লাহিড়ী।

করপোরেশন ষ্ট্রীট কেস্।

১ হরদয়াল সিং ঠাকুর।

হাবরা খুনের চেষ্টার কেস্।

১ যুগোল কিশোর সোম।

বেলগাছিয়া গুলিমারা কেস্।

১ সুরেশচন্দ্র ভরদ্বাজ।

ঢাকা অশোক লেন কেস্।

১ অতুলচন্দ্র দত্ত, ২ মথুরা চক্রবর্ত্তী, ৩ সুধীর রায়।

১৬। ঢাকা কলতাবাজার কেস্।

১ হরিচৈতন্য দে।

১৭। ব্রাহ্মণবাড়িয়া অস্ত্র আইনের মামলা।

১ আনন্দ চক্রবর্ত্তী।

১৮। কুমিল্লা কেস্।

১ তারাপদ ভট্টাচার্য্য।

১৯। মানিকগঞ্জ কেস্।

১ ললিত ঘোষ, ২ ভুবন দাসগুপ্ত, ৩ অনিল ঘোষ, ৪ অরবিন্দ, ৫ প্রফুল্ল এবং আরও দুইজন।

২০। বেনারস কেস।

১ প্রতাপ সিং, ২ লক্ষ্মীনারায়ণ, ৩ নলিনী মুখোপাধ্যায়, ৪ কালীপদ মৈত্র, ৫ দামোদর স্বরূপ।

২১। মৈনিপুরী রাজদ্রোহের মামলা।

২২ আরা ও কোটা মন্দিরে খুনের মামলা।

২৩ টিনাভেরী রাজদ্রোহের মামলা।

২৪ নাসিক রাজদ্রোহের মামলা।
২৫ লাহোর ,, ,,
২৬ মান্দালয় ,, ,,
২৭ দিল্লী ,, ,,
২৮ মালদহ খুনের মামলা।
১ মহেন্দ্র দাস।
২৯ গোয়ালিয়র রাজদ্রোহের মামলা।
৩০ সাতারা রাজদ্রোহের মামলা।
৩১ ডালহউসী স্কোয়ার বোমার মামলা।
১ ননীগোপাল বানার্জ্জী।
৩২ (ঙ) উল্লাসকর দত্ত আলীপুর বোমার মামলার আসামী।

(চ) অতুল মুখোপাধ্যায় হাবরা বোমার কেসের আসামী বাঁকীপুর পাগলা গারদে আবদ্ধ।

৩৩ রাজসাহী জামনগর ডাকাতী কেস্।

৩৪ সৈন্য ফুসলানের জন্য বেনারস রাজদ্রোহ মামলার ৩ জন এবং পিংলের গ্রেপ্তারের সময় ৪ জন।

এতগুলি যুবক মুক্তি পায় নাই, তথাপি সুরেন্দ্রনাথ বড়লাট সভায় ধন্যবাদ দানে গদগদ-কণ্ঠ হইয়াছিলেন—তাহার বেঙ্গলী অমৃতবাজারকে অসহিষ্ণু ও অসন্তুষ্ট বলিয়াছিলেন —সুরেন্দ্রনাথ বলিতেন Who set the ball rolling (কে গোলা চালাইয়াছিল) সেই সুরেন্দ্রনাথের দল এতগুলি বিধবার ও অন্ধ বৃদ্ধের নয়নমণিগুলিকে অশেষ কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতে দেখিয়া খুব মনানন্দে আহার বিহার করিতেছেন, আর ধন্যবাদের স্রোত বহাইতেছেন—নির্লজ্জতা আর কাহাকে বলে ?"

(৬৯)

সে দিন ভারত সভার অভিনন্দনে লর্ড সিংহ দলাদলি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, (সে সম্বন্ধে বোম্বে যাইয়া তিনি, নামতঃ কার্য্যতঃ নহে, ভিন্ন মত প্রকাশ করিলেও) তাহাও কি আমাদের চক্ষু ফুটাইবে না ? এক্ষেত্রে লর্ড সিংহ অপেক্ষা ভূপেন্দ্রনাথ বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছেন। মডারেট্ বা ইক্স্‌ট্রিমিষ্ট—সবই ত আমরা, সবই ত আমাদের ভাই—তবে আর বিবাদ কিসের ? সকলেরই উদ্দেশ্য দেশের উন্নতি, যে যেরূপে পার, উপকার কর, দলাদলিতে কি লাভ ? তুমি বড় হইয়া থাক, বড়ই থাক ; তুমি ছোট হইয়া থাক, ছোটই থাক। বড় ভাইও ভাই, ছোট ভাইও ভাই। সকলে মিলিয়া মিশিয়া যাও। লর্ড সিংহ দুই দলকে পৃথক থাকিতে বলেন, আমরা তাহা অনুমোদন করিতে পারি না। তবে তিনি প্রেস-অ্যাক্টের পিতা, তাঁহাকে অধিক আর কি বলিব ? তিনি পুষ্প-মালায় ভূষিত হইতে থাকুন, ইত্যবসরে আমরা ছোট বড় সব মিলিয়া এক হইয়া যাই। Divide and rule নীতির মূল উচ্ছেদ করিতে হইবে। দলাদলি ইংলণ্ডের উপকার সাধন করিয়া থাকিলেও, এদেশের করিবে না! চতুর্দ্দিকে আগুন লাগিয়াছে, ঘর পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, এখন কি দলাদলি সাজে ? এখন সকলে কোমর বাঁধিয়া অগ্নি নির্ব্বাণের জন্য সচেষ্ট হও। বোঝা পড়া পরে করিও। দেখনা খলিফা প্রশ্নের কি শোচনীয় মীমাংসা হইতেছে ? চক্ষু থাকিতে অন্ধ হইও না। দোহাই ধর্ম্মের, দোহাই দেশের, দোহাই মনুষ্যত্বের, দলাদলি ছাড়িয়া এই দুর্দ্দিনে ভাই ভাই এক হইয়া একবার দাঁড়াও। "দাঁড়া দেখি, তোরা আত্মপর ভুলি,—হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজলি।

*   *   *

আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে,
আপনার ভা'য়ে হৃদয়ে রাখিলে
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে,
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।"

কবির এই মহাবাক্য সার্থক হউক।

(৭০)

আজকাল এদেশে অনেক ব্যাঙ্ক ও অনেক কোম্পানি সংস্থাপিত হইতেছে। ইহা দেশের পক্ষে পরম মঙ্গলের পথ। অল্প অল্প করিতে করিতে এই সব কৃতকার্য্যতায় পথে অগ্রসর হইলে দেশের গতি ফিরিবে। কিছু দিন ক্ষতি হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা গণনা না করিয়া যাঁহারা লাগিয়া থাকিবেন, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বিধাতার মহা ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

শিক্ষার আবশ্যকতা

এবং

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন।

মনুষ্য-জীবনে শিক্ষার আবশ্যকতা নিশ্চয়ই আছে। শিক্ষালাভ ক'রে মানুষ সভ্য পদবী পেয়ে থাকে। আমাদের চোখের উপরেই পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা শিক্ষার প্রভাবে সভ্যতা অর্জ্জন ক'রে মানুষ ব'লে গণ্য হচ্ছে। ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, মার্কিণ, জাপানী, সুইস, রাশীয়ান্, বেলজিয়ান ও অষ্ট্রেলিয়ান প্রভৃতি জাতিরা শিক্ষার বলেই বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান শাসন কচ্ছে, এবং পৃথিবীর ধন সম্পদ ভোগ কচ্ছে। অন্য পক্ষে এই শিক্ষার অভাবেই পৃথিবীর অধিকাংশ জাতি যুগ-যুগ ধরে পর-পদলেহন কচ্ছে, দুঃখ দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হচ্ছে, রোগ শোকের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ কচ্ছে, আর দলে দলে মৃত্যুর কোলে আশ্রয়লাভ করে জাতিকে ধ্বংসের পথে অগ্রসর ক'রে দিচ্ছে। শিক্ষার প্রসাদে একদিকে যেমন নন্দন-কাননের সৃষ্টি হচ্ছে, শিক্ষার অভাবে তেমনি আর একদিকে মহাশ্মশানের সূত্রপাত হয়েছে। শিক্ষার আলোক পৃথিবীর একাংশকে যেমন নয়ন-প্রীতিকর উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভরে দিচ্ছে, তেমনি শিক্ষার অভাব পৃথিবীর অপরাংশকে ভয়াবহ অন্ধকারে নিমজ্জিত করে দিচ্ছে। তাই স্বীকার কর্ত্তে হয়, শিক্ষার আবশ্যকতা নিশ্চয়ই আছে। শিক্ষার সঞ্জীবন স্পর্শেই শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, মহাবীর, কনফিউসিয়াস, শঙ্করাচার্য্য, লুথার, নানক, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন ও বিবেকানন্দের ন্যায় যুগাচার্য্যগণ,—ব্যাস, সক্রেটীস, প্লেটো, সলোমন ও টলষ্টয় প্রভৃতির ন্যায় মহাজ্ঞানীগণ, অরিষ্টটল, বেকন, এমার্সন, কাণ্টে, ষ্টুয়াট মিল, রাসকিন্ ও ব্রজেন্দ্র শীল প্রভৃতির ন্যায় দর্শন-বেত্তাগণ,—কালিদাস, সেক্সপিয়ার, মিল্টন, ভার্জ্জিল ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির ন্যায় সাহিত্যাচার্য্যগণ,—অর্জ্জুন, নেপোলিয়ন, আলেকজাণ্ডার ও অশোক প্রভৃতির ন্যায় দিগ্বিজয়ীগণ—নিউটন, গ্যালিলিও, জেমসওয়াট, জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় বিজ্ঞানবীরগণ—চাণক্য, বিসমার্ক, গ্লাডষ্টোন প্রভৃতির ন্যায় রাজনীতি-বিশারদগণ—ওয়াশিংটন, গ্যারিবল্ডী, ম্যাটসিনী, উইলিয়ম টেল, প্রতাপসিংহ ও জোয়ান-অব-আর্ক প্রভৃতির ন্যায় স্বদেশহিতৈষিগণ—বুকার ও মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় স্বজাতি-হিতেচ্ছুগণ আবির্ভূত হয়েছিলেন ও হয়েছেন, শিক্ষার আলোক প্রজ্বলিত ক'রেই এসিয়াখণ্ডে অধুনা একমাত্র জাপানীজাতি বিশ্ব-সভায় সম্মানের আসন লাভ করেছেন, শিক্ষার আলোক প্রজ্জ্বলিত করেই পৃথিবীর মধ্যে নগণ্য ক্রীত দাস নিগ্রোজাতি আমেরিকার সুসভ্য শ্বেতাঙ্গদিগের সভ্যজাতি-সুলভ সুবিধা উপভোগ কচ্ছেন। জগতের যত সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জ্যোতিষ, যত মন্দির, মসজেদ, গির্জ্জা,

সহর, নগর, সকলই শিক্ষার সুফল। রেলওয়ে, ষ্টিমার, টেলিগ্রাফ, ফনোগ্রাফ, জেপলিন ও এরোপ্লেনকে শিক্ষাই প্রসব করেছে। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় অশন-বসন সবই সুলভ হয়েছে। শিক্ষারই কল্যাণে। আমরা যে মানুষ,তা কেবল শিক্ষা দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে, এমন যে সুবর্ণফল-প্রসবিনী শিক্ষা, তার আবশ্যকতার সম্বন্ধে কি প্রশ্ন উঠতে পারে? তাই বলি যে, শিক্ষার আবশ্যকতা নিশ্চয়ই আছে। অশিক্ষার দ্বারা জগতের যে মহা অনিষ্ট হয়ে থাকে, তাকে দূরীভূত কর্ত্তে এক-মাত্র শিক্ষাই সক্ষম। শিক্ষার শক্তিতেই মানুষ অশিক্ষা-রাক্ষসীর কবল-মুক্ত হয়ে সুখ শান্তির স্বর্গরাজ্যে বিচরণ কর্ত্তে পারে। শিক্ষার দ্বারা আমাদের জড়ত্ব' পশুত্ব ও হীনত্ব ঘুচে যায়, এমন কি, দেবত্ব পর্য্যন্ত লাভ হয়। শিক্ষার শক্তি অমোঘ। মনুষ্য-জীবনের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থিত বস্তু শিক্ষা। সুতরাং বলতে হয় যে, শিক্ষার আবশ্যকতা আছেই।

শিক্ষার আবশ্যকতা কেন আছে, এসম্বন্ধে কিছু বলিলাম,এখন ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চেষ্টা করিতেছি।

এ সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ দাঁড়িয়েছে, সেটা একবার আলোচনা ক'রে দেখা উচিত, মনে করি। যে ভারত পৃথিবীর সভ্যতার আদর্শ জননী, যার পাদমূলে বসে মিসর,গ্রীস,রোম ও আরব প্রভৃতি দেশ প্রাচীন কালে সভ্যতা ও শিক্ষা অর্জ্জন করেছিল, যার যোগী ঋষি ও মুনি ও তপস্বীরা বেদ বেদান্ত ও ষড়দর্শনকে জন্মদান করেছিলেন, যার বীর সন্তানগণ সমগ্র বসুন্ধরাকে শাসন করেছিল, যার গীতা মহা-গ্রন্থ আজিও পৃথিবীর ধর্ম্মজগতের শীর্ষ-মণি রূপে বিরাজিত, যার ধন সম্পদ লুণ্ঠন ক'রে পৃথিবীর বহু দেশই সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল, যার প্রত্যেক ধূলিরেণু স্বর্ণরেণু প্রসব করে আসছে, যার কোহিনুর কত রাজ-রাজ্যেশ্বরের মস্তককে সুশোভিত করেছে, যার দিল্লী নগরী পৃথিবীর শতশত নৃপতির লোভনীয় ছিল, যার বক্ষে ষড় ঋতু পূর্ণভাবে বিরাজিত, যার নদ নদীর জল পুণ্যময়, যার শস্যক্ষেত্র উর্ব্বরতার আকর, যার বায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ ও যার আকাশ অপূর্ব্ব শোভাময়, সেই পুণ্যভূমি ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ দাঁড়িয়েছে? আমরা প্রতি সপ্তাহেই খবরের কাগজে পড়ি যে, ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর করাল-কবলে কবলিত. ভারতের ঘরে ঘরে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, ভারতের নর নারী রোগে শোকে জর্জ্জরিত, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি মৃত্যুর নিত্য সহচর লক্ষ লক্ষ লোককে মরণের দ্বারে পৌছে দিচ্ছে; ভারতের কোটী কোটী লোক অশিক্ষিত, পৃথিবীর সভ্য জাতিদের সভায় ভারতবাসীর বসিবার স্থান নাই ভারতবাসী অসভ্য ও বর্ব্বর, এইত ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা। এইত ভারতের বর্ত্তমান প্রকৃত চিত্র। কোথায় সেই আদি যুগের সভ্যতা-প্রসূতি ভারত, আর কোথায় এই অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিতা, উপেক্ষিতা ভারত! কোথায় সেই বীরপ্রসবিনী ভারত, আর কোথায় এই মৃত্যুর আবাসভূমি ভারত! কোথায় সেই ধনসম্পদপরিপূর্ণ ভারত, আর কোথায় এই অন্ন-বস্ত্রের হাহাকারে রোরুদ্যমানা ভারত? কোথায় সেই অমরার নন্দন কানন, আর কোথায় এই প্রেতনিবাস মহা শ্মশান! কোথায় সেই সুরগণ বাঞ্ছিত স্বর্গ আর কোথায় এই পূতি-গন্ধময় নরক! যার দিব্যদৃষ্টি আছে, একবার চেয়ে দেখুক, সেই সোণার ভারতের আজ কি

অবস্থা! যায় চিন্তা শক্তি আছে, একবার চিন্তা করে দেখুক, ভারতের ভবিষ্যৎ কি ভয়াবহ! যার দিব্যদৃষ্টি ও চিন্তাশক্তি উভয়ই আছে, একবার অনুভব করুক, আমাদের সেই গৌরব-কিরীটিনী ভারত-জননীর বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ ঘোরতররূপে শোচনীয়! আমাদের নিজের ঘরে আমরা অনেক দিন থেকে পরবাসী হয়েছি, আমাদের জননীর বুকের স্তন্য আমরা পেট ভরে পান করতে পাইনা, আমাদের পুকুরের জল পঙ্কিল ও শুষ্ক হয়ে গিয়েছে, যে ভারতের দ্বারে একদিন ভিক্ষা-পাত্র হস্তে করে সমগ্র পৃথিবী দাঁড়াত, আজ সেই ভারত কাঙ্গালিনীর ন্যায় ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে সকলের দ্বারে দ্বারে কৃপা-প্রার্থিনী, লাঞ্ছিতা ও উপেক্ষিতা হয়ে ফিরে বেড়াচ্ছে! দক্ষিণ আফ্রিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায় ও আমেরিকায় আজ ভারতের নর নারীর দিন-মজুরী করবার জন্যও প্রবেশাধিকার পর্য্যন্ত নাই! ভারতের স্বর্ণভাণ্ডার বিদেশীয়দের ভোগের উপকরণ যোগাচ্ছে, কিন্তু ভারতের উপবাসী লোকেরা তাদের কাছে উদরান্নের জন্য গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসছে। এইত ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা। এই অবস্থাকে ভারতের উন্নতাবস্থা বলা চলে না। এই অবস্থা ভারতের পূর্ব্বাবস্থার তুলনায় নিতান্তই হীনাবস্থা, একথা স্বীকার করতেই হবে।

এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন,তার নির্দ্দেশ করবার পূর্ব্বে, ভারতের প্রাচীন কালের শিক্ষার ধারা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা সঙ্গত ,মনে করি। পরবর্ত্তী যুগে শিক্ষার প্রচলন সহর ও নগর থেকে হয়েছিল, কিন্তু সেই বৈদিক যুগে ভারতবর্ষের অরণ্যকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষার স্রোত চারিদিকে প্রবাহিত হয়েছিল, তখনকার ঋষিরা কোলাহল-মুখরিত, সৌধ-সজ্জিত ও বিলাস-বাসনা-প্লাবিত নগর পরিত্যাগ ক'রে শীতল নির্জ্জন বনভূমিতে দেবী সরস্বতীর বেদী রচনা কর্ত্তেন। সহস্র সহস্র শিষ্য লোকালয় পরিত্যাগ ক'রে সেখানে গিয়ে গুরুর পাদমূলে বসে বিদ্যা অর্জ্জন করত। উন্মুক্ত আকাশ-তলে অনবরুদ্ধ আলোক ও বাতাস সেবন করে, চারিদিকের প্রকৃতির সঙ্গে বেড়ে উঠতে উঠতে তাঁহারা জ্ঞানোন্নতি সাধন করিতেন। ব্রহ্মচর্য্য পালনের দ্বারা একযোগেই বিদ্যা, স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতেন। বিদ্যালাভ শেষ না করিয়া কোন শিষ্যেরই বাড়ী আসিবার অধিকার ছিল না। পূর্ণ দ্বাদশ বর্ষকাল গুরুগৃহে বাসস্থান করিয়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সকল বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া গার্হস্থ্যশ্রমে প্রবেশ লাভ করিতেন। তখনকার গুরুরা অর্থগ্রহণ করিয়া বিদ্যাদান করিতেন না। পুরাকালে বিদ্যা বিক্রয়ের প্রথা ছিল না। রাজ্যের রাজা ছাত্রদের সকল ব্যয়ভার বহন করিতেন। ঋষিদের আশ্রম কেবলই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার মধুর গুঞ্জনে নিনাদিত হইত; পবিত্র হোমাগ্নির আলোক-চ্ছটায় উজ্জ্বলীকৃত হইত, সুললিত সামগানে ধ্বনিত হইত। সেখানে গুরু শিষ্যের মধ্যে আর্থিক ব্যাপারের কোন সংশ্রবই ছিল না। গুরুর সকল গুণ গুরুতে ও শিষ্যের সকল লক্ষণ শিষ্যের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। গুরুর লক্ষণ ছিল, নির্লোভ অবস্থায় অকপটে পুত্রবৎ স্নেহে বিদ্যাদান করা, আর শিষ্যের লক্ষণ ছিল সংযমের সহিত একাগ্রচিত্তে বিদ্যা গ্রহণ করা। এই দান-গ্রহণের মধ্যে এমন একটা পবিত্র ও স্বর্গীয় ভাব ছিল, যাহাতে গুরুর বিদ্যাদান ও শিষ্যের

বিদ্যাগ্রহণ উভয়ই সার্থক হইত। নদী যেমন অরণ্যের মধ্যে পর্ব্বত-গাত্র হইতে জন্মলাভ করিয়া, তার পুণ্য সলিলে ধরণীকে বিধৌত করে, তাকে ফলফুলে ও শস্য-সম্ভারে সুশোভিত ক'রে তুলে, তেমনি, অরণ্য-মধ্যস্থ ঋষি-আশ্রম হ'তে জন্মলাভ করিয়া, ভারতের বিদ্যা, জ্ঞান ও ধর্ম্ম ভারতবাসীকে মনুষ্যত্বে ও দেবত্বে ভূষিত করে তুলেছিল। জটাজুট-মণ্ডিত, গৈরিক-বসন-পরিহিত ঋষিগণের মুখ নিঃসৃত অমৃত-মাখা উপদেশাবলীই সমগ্র জগতের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করেছিল। ভারতের এই শিক্ষাই বিশ্ব-মানবের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা। জগতের ইতিহাসে ভারতীয় নর-নারীর এই শিক্ষা-সাধনা মহোচ্চ আসন লাভ করে রয়েছে।

কিন্তু সে পুরাতন কথার আলোচনায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতের কোন উপকারের সম্ভাবনা না থাকলেও, যে শিক্ষার [illegible] ভারতের শিরায় শিরায় ও হাড়ে মাংসে বিজড়িত, তার স্মৃতিতে গর্ব্বভরে মনের যে অবস্থা দাঁড়ায়, তার ধাক্কায় আমাদিগকে নিশ্চয়ই অনেকখানি এগিয়ে দিতে পারে। প্রাচীনের স্মৃতি অনেক সময়ে নূতনকে গড়ে' তুলবার পক্ষে সহায়তা করে। একটা ঘর ভেঙ্গে পড়লে তার ভাঙ্গা দেওয়ালের উচ্চতা যে নূতন-তৈরি ঘরটার স্বাস্থ্যের সাহায্য করে থাকে, সে কথা ভুললে চলবে না। তাই আমি, আমাদের ভারতের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর সম্বন্ধে অতি সামান্য রকমের আলোচনা করিলাম।

যাহাই হ'ক্, বর্ত্তমান সময়ে ভারতের কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, তা' বলতে গেলে কয়েকটা কথা আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে। প্রথমে স্মরণ করিতে হবে যে, বহুশত বৎসর ধরে' ভারত পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিলেও, এখন সুসভ্য ও ন্যায়পর ব্রিটিশ শাসন ভারতের পক্ষে বিধাতার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ এসেছে। বিধাতা যেন ভারতবাসীকে অত্যাচার ও অশিক্ষার হস্ত হ'তে নিষ্কৃতি দিবার জন্য, দয়া পরবশ হ'য়ে, ইংরাজ জাতিকে প্রেরণ করেছেন। ভারতের পক্ষে অসীম গৌরবের কথা এই যে, বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্য ও শক্তিশালী ইংরাজ জাতি তার ভাগ্যনিয়ন্তার পদে প্রতিষ্ঠিত। যে জাতি ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করে, বিশ্বমানবের শক্তির জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই এবং যে জাতি বিগত মহাসমরে নেতৃত্ব করে বিজয় মুকুট মস্তকে পরিধান করেছে, সেই ন্যায় ও সাম্যের উপাসক, প্রজারঞ্জক ইংরাজ এখন ভারতের শাসনকর্ত্তা। দ্বিতীয়তঃ স্মরণ করিতে হবে যে [illegible] ভারত [illegible] হিন্দু [illegible] নয়। [illegible] ভারতবর্ষ হিন্দু পার্শী, জৈন বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমান প্রভৃতি বহু ধর্ম্মাবলম্বীর বাসভূমি। ভারতক্ষেত্র এখন পুণ্যক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রের সমতুল্য। শ্রীক্ষেত্রে যেমন ছত্রিশ জাতির সমান অধিকার, ভারতেও তেমনি ভিন্নধর্ম্মী কতকগুলি ভ্রাতার সমান স্বার্থ বিদ্যমান। তৃতীয়তঃ স্মরণ রাখিতে হবে যে, এটা বৈশ্য যুগ, অর্থাৎ অর্থোপার্জ্জন ও উপভোগের যুগ। কি উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন হবে, এই চিন্তা নিয়েই এ যুগের মানুষেরা অতিশয় ব্যস্ত। "ভারতবর্ষ যদিও কোন দিন অর্থের মাহাত্ম্য স্বীকার করেনি," চিরকালই বৈরাগ্যের মহিমা কীর্ত্তন করে এসেছে, তথাপি এযুগে ভারতকে অন্যপথে যেতে হবে। যদিও ভারত-জননীর জামাতা দেবাদিদেব মহাদেব

দরিদ্র ও শ্মশানচারী ছিলেন, তথাপি ভারতের কবিরা দেখাইয়াছেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার পূজা করেন, ধনাধিপতি কুবের তাঁহার ভাণ্ডারী, গৃহিণী তাঁহার অন্নপূর্ণা, তিনি মহাদেব, তিনি শিব, শঙ্কর।" ভারতের ভাণ্ডারে এমন উচ্চ আদর্শ থাকিতেও আজ ভারতকে অর্থের পশ্চাতে ধাবিত হতে হবে। চতুর্থতঃ স্মরণীয় বিষয় এই যে,ভারতবর্ষ সুসভ্য ও প্রজারঞ্জক ইংরাজের দ্বারা শাসিত হলেও পরাধীন। পরাধীন-জাতি-সুলভ দুর্ব্বলতা ও ত্রুটী যাতে না সংক্রামিত হতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। পঞ্চম কথা এই স্মরণীয় যে ভারতবর্ষে—নানা সম্প্রদায় ও জাতি বিদ্যমান। একমাত্র হিন্দু জাতির প্রায় চারি হাজার শাখা। তাও আবার উচ্চ নীচ ভেদে বিভক্ত। এই সকল জাতির মধ্যে সহানুভূতি ও ভালবাসার একান্ত অভাব। এই সহানুভূতি ও ভালবাসার অভাব জাতীয় জীবন গঠনের পথে প্রধান অন্তরায়। ষষ্ঠ কথা এই যে লোকশিক্ষার অপ্রাচুর্য্য। জগতের, এমন কি, ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির তুলনায়, ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষার প্রচার নিতান্তই অল্প। মহীশূর, বরোদা ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে যেরূপ বন্দোবস্ত হয়েছে, ব্রিটিশ ভারতের প্রজাসাধারণের মধ্যে তদ্রূপ হয় নাই।

তাহলে এখন একথা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি যে, যেরূপ শিক্ষা দ্বারা ভারতের আর্থিক উন্নতি হয় এবং জাতীয় জীবন গঠনের সাহায্য হয়, আর এই পরাধীন অবস্থায় থেকেও তার পক্ষে এই পরাধীনতা অভিশাপরূপে গণ্য না হ'য়ে আশীর্ব্বাদ বলে গণনীয় হয়, সেইরূপ শিক্ষারই আবশ্যক।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, এই প্রশ্ন এখন সমগ্র দেশের মনস্বীবৃন্দের আলোচনার বিষয়ীভূত হয়েছে। আমাদের শাসক সম্প্রদায় দেশের শিক্ষার জন্য পাঠশালা থেকে আরম্ভ করে কলেজ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন, তবুও এ প্রশ্ন উঠে কেন? প্রশ্ন যখন উঠেছে, তখন অবশ্য তার কারণও আছে। কারণগুলি কি, তাই এখন দেখা যাক্।

প্রথমে দেখতে পাই যে, বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্কুল কলেজ থেকে যে সব ছাত্র বেরোয়, তাদের অধিকাংশই কেরাণীগিরি ছাড়া আর কোন কাজেরই উপযুক্ত হয়ে বেরোয় না। কেরাণীগিরি দ্বারা যে সামান্য অর্থ উপার্জ্জন হয়, তাতে সংসারযাত্রাই নির্ব্বাহ হয় না। কেরাণীর জাতও কখন জগতে বড় হ'তে পারে না। দিনের মধ্যে ১০ দশ ঘণ্টা খেটেও যারা পেট পুরে খেতে পায় না, তাদের কাছে আর কি আশা করা যায়? স্বাস্থ্য নষ্ট ক'রে পড়াশুনা করবার পর, অল্পমাত্র আয়ের উপর নির্ভর ক'রে পরিবার প্রতিপালনের চিন্তায় শীঘ্রই তাদের অকাল বার্দ্ধক্য ধরে। এর উপর আবার দাসত্বের লাঞ্ছনা আছে। কিন্তু উপায় নাই। স্কুল-কলেজের চৌকাঠ পেরিয়ে সংসারে এসে দাঁড়ালে, আর কোন যোগ্যতাই যে তারা খুঁজে পায়না। না জানে ব্যবসা, না জানে শিল্পকর্ম্ম, না জানে কৃষি, না জানে আর কিছু। এমন ব্যর্থ-জীবন নিয়ে কেরাণীগিরি ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তারপর দেখা যায়, অনেকে আইন পড়েন। কিন্তু আজ কাল আইনের বাজারেও এত ভিড় হয়েছে

যে, বার-লাইব্রেরী ও মোক্তার-লাইব্রেরীতে বসিবার স্থান সঙ্কুলান হয় না। তাও সকলেরই কি প্রভূত উপার্জ্জন হয়? অনেকেরই যে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, তা তাঁরা না বল্লেও বাহির থেকে লোকে টের পায়। যাঁরা খুব প্রতিভাবান, তাঁদের মতই দু'দশ জন বা' যথেষ্ট রোজগার করেন। বাকী সব প্রতিযোগিতায় পরাজিত হ'য়ে নীচেই পড়ে থাকেন। কিন্তু কি ভয়ানক ভুল, তবুও রোজ রোজ আইন-ব্যবসায়ী হওয়ার মোহ যাচ্ছে না। আর এই আইন ব্যবসাটা বড় ভাল ব্যবসাও নয়। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেছেন — "A nation of lawyears would starve in as much as they are consumers, not producers." অর্থাৎ আইন-ব্যবসায়ীর জাত না খেতে পেয়ে কষ্ট পাবে, যেহেতু তারা কেবল খেতেই পারে, উৎপন্ন কর্ত্তে পারে না। কথাটী একান্তই সত্য। কেননা উকীল, মোক্তার ও ব্যারিষ্টাররা দেশের লোকের শ্রমজাত অর্থই শোষণ করেন, নিজেরা উৎপন্ন করিতে পারেন না। দেশের কৃষক ও শিল্পীরা নিজেদের পরিশ্রম থেকে নিত্যই অর্থ উৎপন্ন করে, কিন্তু আইন-ব্যবসায়ীদের যে অর্থ, তা' দেশেরই কৃষক ও শিল্পী প্রভৃতির অর্থ। এখন যদি এরূপ সম্ভব হয় যে, দেশের শিক্ষিত লোক সকলেই উকীল, মোক্তার ও ব্যারেষ্টার হ'তে চান, তখন কাজেই অর্থ উৎপাদন করবার মত উপযুক্ত সংখ্যক লোক থাকবে না, সুতরাং অর্থদাত্রী মক্কেলের অভাবে ওঁদের অন্নকষ্ট হবেই। আইনব্যবসায়ীর জগতের ভবিষ্যৎ যে কি ভয়াবহ, তা' ইহা হইতেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু কেন লোকে এপথে যায়? কারণ কি? কারণ কিছুই নয়, কেবল শিক্ষার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ বোলে বি-এ, এম-এ প্রভৃতি পাশ করবার পর কার্য্যকরী অন্য কোন বিদ্যা শিখবার তেমন সুব্যবস্থা দেশে নাই। যদিও ডাক্তারী ও ইন্‌জিনিয়ারীং প্রভৃতির পথ খোলা হয়েছে, তাও যথেষ্ট নয়, দেশের যাঁরা লেখাপড়া শিখ্‌ছেন, তাঁদেরত এই দুর্দ্দশা, আর যারা অশিক্ষিত, তারাও কি কম ভুগছে? অশিক্ষিতের দলে দেশের যত কৃষক ও শিল্পী। তারা উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কৃষি ও শিল্প না জানায়, ব্যবসায়ের উন্নতি করতে পারিতেছে না। ভারতে শিল্পীরা অন্যান্য সভ্যদেশের শিল্পীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠ্‌ছে না; কল কারখানার কাছে তারা হার মেনে যাচ্ছে। ভারতের কৃষকেরা, ইংলণ্ড, জার্ম্মানি ও আমেরিকা প্রভৃতির কৃষকের চাইতে ঢের কম শস্য উৎপন্ন করে থাকে। বিদেশী বণিকেরা ভারতের দ্রব্যজাত কিনে নিয়ে গিয়ে নানা প্রকার জিনিষ তৈয়ারী করে এনে ভারতের বাজারেই দশগুণ মূল্যে বিক্রয় করে। ভারতের নিত্য প্রয়োজনীয় কাপড়, সুতা, ছাতা, জুতা প্রভৃতি সবই বেশীর ভাগ বিদেশ হতে আসে। এর গতিরোধ করবার সাধ্য ভারতের নাই, কারণ ভারত পরপদানত। গবর্ণমেন্টও এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছুক, কেননা তা'হলে অবাধ বাণিজ্য নীতিকে প্রতিহত করা হয় এবং ইংরেজ বণিকদের অন্ন মারা যায়।

ভারতের জনগণকে এই দুর্দ্দশার হাত থেকে বাঁচাতে হলে বর্ত্তমান সময়ে ভারতে কার্য্যকরী শিক্ষার প্রয়োজন। যাতে স্কুল-কলেজ থেকে বাহির হয়ে, ছাত্রেরা কার্য্যকরী শিক্ষা পেতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সেদিন Statesman কাগজে দেখা গেল, একজন ফোরম্যানের (Foreman) জন্য

৫০৲ টাকা, কিন্তু একজন এম-এ পাশ প্রাইভেট মাষ্টারের জন্য ১৫৲ টাকার বেতনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। কলিকাতায় এক একজন কুলি বা ফেরিওয়ালা মাসে প্রায় ৩০৲ টাকা রোজগার করে। ইহার তুলনায় ভারতের চাকুরী-প্রত্যাশী শিক্ষিতের কি শোচনীয় পরিণাম! দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ও দেশের জনসাধারণের এই নিরুপায় ও অসহায় অবস্থায় কার্য্যকরী শিক্ষাই আগে দরকার। যদি দেশের লোক কাজ না শিখেও যথেষ্টরূপ উপার্জ্জন করিতে না পারে, তা'হলে দারিদ্র্য ক্রমেই বেড়ে চলবে। এই জন্য আগেই দরকার, যাতে কার্য্যকরী শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়। শিল্প ও কৃষি, এই দু'টাই কার্য্যকরী, উন্নত প্রণালীতে বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ধান, পাট, তুলা, গম, প্রভৃতি শস্য সকল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করবার শিক্ষা সকলকে দিতে হবে। কাঠের কার্য্য, রংএর কার্য্য ও মাটীর কার্য্য, অর্থাৎ সংসারের প্রয়োজনীয় যা কিছু জিনিষ, সকল প্রকার কার্য্যই সকলকে শিক্ষা দিতে হবে। মোট কথা, এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যেন কোন লোক কর্ম্মে অপটু না থাকে এবং তার কর্ম্মের দ্বারা যেন তার যথেষ্ট উপার্জ্জনও হয়। কোন কাজ জানিনা, এই কথা বলে যেন কাহাকে উদরান্নের জন্য অপরের গলগ্রহ হতে না হয়, অথবা মাথায় হাত দিয়ে বসে' হা'হুতাশ কর্ত্তে না হয়, কিম্বা তুচ্ছ চাকরীর পেছনে ছুটে ছুটে জীবনটা নষ্ট করতে না হয়।

কার্য্যকরী শিক্ষার জন্য সকল সভ্যদেশে ও স্বাধীন দেশেই সুব্যবস্থা আছে। সে সব দেশের লোককে কাজের অভাবে কোন চাকুরীর পশ্চাতে দৌড়াতে হয় না। আমাদের চোখের উপর আমরা দেখিতে পাই যে, জার্ম্মাণী, বেলজীয়ম, ইংলণ্ড, জাপান ও মার্কিণ প্রভৃতি দেশের শিল্পজাত দ্রব্যে ভারতের বাজার ছেয়ে রয়েছে। তার মানে এই বুঝতে হবে যে, আমাদের দেশের শিল্পজাত দ্রব্য প্রচুর ও উৎকৃষ্টতর জন্মাচ্ছে না। বিদেশীরা এসে আমাদের বাজারে জিনিষ বিক্রয় করে দিন দিন ধনী হোয়ে উঠছে, অথচ আমরা নিতান্তই গরীব। আমাদের লর্ড সিংহ লণ্ডনে তাঁর বক্তৃতার মধ্যে সম্প্রতি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলেছেন — "Half the population never had a full meal in the day, and means must be found to remedy this state of things." অর্থাৎ ভারতের অর্দ্ধেক লোক দিনের মধ্যে একবেলাও পেটভরে' খেতে পায় না; এই দুরবস্থার প্রতিকার কর্ত্তে হবে। অনেকেই জানেন যে, ভারতের জ্ঞান-বৃদ্ধ সুসন্তান পরলোকগত মিষ্টার দাদাভাই নৌরজী "Poverty and un-British Rule in India" নামক একখানা বই লিখে গিয়েছেন। পরলোকগত গোখেল, পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত ও পরলোকগত পণ্ডিত সখারাম প্রভৃতি মনীষিগণ এসম্বন্ধে অনেক আলোচনাও করেছেন। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কার্জ্জন একটা আন্দাজ ক'রে বলেছিলেন যে, ভারতবাসীদের মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয় ৩০৲ টাকা। ভারতীয় অর্থনীতিজ্ঞ মহামতি দাদাভাই নৌরজী প্রভৃতি এবং ডিগ্‌বী-প্রমুখ ইংরেজ অর্থনীতিজ্ঞেরা বলেছিলেন যে, কার্জ্জন ভারতবাসীদের আয় বেশী কোরে ধরেছেন। স্যর রবার্ট গিফেনও ভারতবাসীদের প্রত্যেকের গড় বার্ষিক আয় ৩০৲ টাকা ধরেছিলেন, কিন্তু অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হয় যে, ১৮৲ আঠার টাকাই প্রকৃত আয়। তাহা হইলে

প্রত্যেক ভারতবাসীর গড় দৈনিক আয় দাঁড়ায় অড়াই পয়সার কিছু বেশী। যাদের দৈনিক আয় আড়াই পয়সা, তাদের অবস্থা যে কি ভয়ানক, তা সহজেই বুঝা যায়। ভারতবাসীদের এই আয়ের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের লোকদের আয়ের তুলনা করা যাক্। বিলাতের লোকদের প্রত্যেকের গড় বার্ষিক আয় ৫৮৩৲ টাকা। কানডাবাসীদের প্রত্যেকের গড় বার্ষিক আয় '৫০৲ টাকার উপর। তাহা হইলে বিলাতের লোকদের প্রত্যেকের গড় দৈনিক আয় প্রায় ১৷৵০,আর কানাডার লোকদের আয় ২৲ টাকারও উপর। কোথায় ৴১২॥ পয়সা আর কোথায় ১৷৵০ ও ২৲ টাকা! ভারতবাসার আয় অপেক্ষা যথাক্রমে প্রায় পঞ্চাশ গুণ ও চৌষট্টি গুণ অধিক। (যে হিসাব দেওয়া গেল তাহা বর্ত্তমানের হিসাব নয় কিছুদিন পূর্ব্বের হিসাব) ভারতবাসীর বর্ত্তমান আয় বার্ষিক ১০ ডলার অর্থাৎ ৩১৷০ টাকা।

এইযে জাতীয় দুর্দ্দশা—দারিদ্র্য, যার ফল হচ্ছে অল্লাহার, অনাহার, দুর্ব্বলতা, দেহের নগ্নতা, গৃহহীনতা বা জীর্ণগৃহে বাস, অথবা দেশে দেশে ভ্রমণ, অসুস্থতা ও রোগ, অজ্ঞতা, অকালমৃত্যু, ভীরুতা, আজীবন ঋণে জড়িত থাকা, মনুষ্যত্বলোপ, আজীবন অপরের গলগ্রহ থাকা বা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ এবং অবশেষে চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি দুষ্কৃতির দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহের চেষ্টা এবং এই প্রকারে জীবনকে ব্যর্থ ও কলঙ্কিত করা, তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় ঐ কার্য্যকরী শিক্ষা, কৃষি শিল্পের বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষা। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কন্‌ভোকেশনে মাননীয় বিচারপতি-স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় যথার্থই বলেছেন, যদি আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই, যদি আমরা বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রামের দিনকে অতিবাহিত করিয়া জীবিত থাকিতে চাই, তবে আমাদিগকে অন্তরে বুঝিতে হইবে যে, অশিক্ষাকেই শ্রমশিল্পের প্রধান বিধান করা সাংঘাতিক ভ্রম; কায়িক শ্রমকে সম্মান করিতে হইবে, সে বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে।

এই শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট ও শিক্ষিত দেশবাসিদের সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। এস্থলে গবর্ণমেণ্ট ভারতের লোক শিক্ষার জন্য কিরূপ আগ্রহ প্রকাশ কচ্ছেন, তার বিষয় আলোচনা করে দেখা যাক্।

শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্ট হতে জানা যায় যে, ১৯১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের পাঠশালা হতে আরম্ভ করে স্কুল কলেজ সমূহে ছাত্র সংখ্যা ছিল শতকরা মাত্র ৩ জন্ত। কিন্তু দেখা যায়, স্কুল কলেজ ছাড়া কেবলমাত্র পাঠশালায়ই ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড—ওয়েল্‌সে শতকরা—১৬'৮৪, অষ্ট্রিয়ায় শতকরা ১৫'৩০, জার্ম্মানিতে শতকরা ১৬'৩৬, স্কটলণ্ডে—শতকরা ১৭'১৪,আয়ার্লণ্ডে শতকরা ১৬'১৬, হল্যাণ্ডে—শতকরা ১৫'৫২, জাপানে—শতকরা ১৩'১৬, নরওয়েতে শতকরা—১৫'৬।

ভরেতের ছাত্রসংখ্যা অন্যান্য দেশের ছাত্র সংখ্যা অনেক কম, দেখা গেল। এখন দেখা যাক্ স্কুলের সংখ্যা কত। ইংরাজ-শাসিত ভারতে ১৯১১-১২সালে ১,৭৬,৪৪৭টী—শিক্ষালয় ছিল। এই স্কুলগুলি দ্বারা ৫,৮২,৭২৮টী গ্রাম এবং ১৫৯৪টী সহরের শিক্ষাকার্য্য চলতো। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রাম ও সহর ৫,৮৪,৩২২টী, আর স্কুলের সংখ্যা হচ্ছে ১,৭৬,৪৪৭টী। অর্থাৎ গ্রাম ও সহরের ৫টীতে গড়ে ১টী স্কুল রয়েছে। কিন্তু জাপানে সহর ও গ্রামের সংখ্যা ১৪, ৫৮০

এবং সকল প্রকার বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩০, ৪২০টী। এথেকে বুঝা যাচ্ছে যে, জাপানে স্কুল-বিহীন গ্রাম বা নগর নাই। এই ভারতেরই দেশীয় রাজ্য বরোদাতে ১৯১১-১২ সালে ৩০৯৫টী গ্রাম ও নগরের মধ্যে ২১১৯ টীতে স্কুল ছিল। স্কুলগুলির সমগ্র সংখ্যা ২৯৬১টী।

ইং ১৯১৪–১৫ সালে ভারতের সমুদায় অধিবাসী শতকরা ৩·০৬ জন শিক্ষা পাচ্ছিল। ১৯১৫–১৬ সালে ৩·১ জন শিক্ষা পাচ্ছিল। অর্থাৎ এক বৎসরে শতকরা .০৪ বালক বেড়েছে। আমেরিকার ১৯১৪ সালে শতকরা ২১·৪ বালক শিক্ষা পেয়েছিল। তা'হলে আমেরিকা ও ভারতের শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের শতকরা তফাৎ পড়ছে ১৭·৩। বৎসরে যদি ·০৪ করে' বাড়ে, তবে ১৮·৩ বাড়তে ৪৫৭ বৎসর ৬ মাস লাগবে। অর্থাৎ আমেরিকার ন্যায় শিক্ষার বিস্তার কর্ত্তে ভারতকে আরও সাড়ে চারি শতাব্দ অপেক্ষা কর্ত্তে হবে, এখন ভারতবর্ষের শতকরা ৫ জন মাত্র লিখতে ও পড়তে পারে। বাকী ৯৫ জন মূর্খ।

শিক্ষার ব্যয়ের সম্বন্ধে বৈষম্যও গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট করে' থাকেন। যে সকল স্কুলে প্রধানতঃ ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় ছাত্র পড়ে, সেই সকল স্কুলের ছাত্রের শিক্ষার জন্য ১৯১৪-১৫ সালে গবর্ণমেণ্ট গড়ে জন প্রতি ১১৮৲ টাকা দিয়েছিলেন।

এখন দেখা গেল যে, গবর্ণমেণ্ট ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের ন্যায় সুব্যবস্থা কর্ত্তে পারেন নি। এমন কি, শিক্ষা রিপোর্টে প্রকাশ যে শিক্ষার ব্যয় কমিয়েছেনও। বড়-লাটের মন্ত্রী-সভার অন্যতম সদস্য ও শিক্ষা-মন্ত্রী স্যর শঙ্করণ নায়ার তাঁর শিক্ষা বিষয়ক মন্তব্যে দেখিয়েছেন যে, শিক্ষা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কোন উদার নীতি নেই এবং শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বাপর একাগ্র চেষ্টা করে' আসছেন না। ভারতের আবকারীর আয় যথেষ্ট বেড়েছে। প্রায় ১৩তের কোটী টাকা। মাথা পিছু ।।০আট আনা ট্যাক্স। অথচ শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট টাকা খরচ কর্ত্তে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। এজন্য মাথা পিছু ৵০ দুই আনা খরচ করেন মাত্র। তারপর ভারতবর্ষে কার্য্যকরী শিক্ষার প্রতি গবর্ণমেণ্ট তেমন ঝোঁক দেন নি, ভারতে যে ১, ৭৬, ৪৭৭টী স্কুল আছে বল্লুম তার পনর আনা স্কুলে কেবল সাধারণ শিক্ষাই দেওয়া হয়। একটা দৃষ্টান্ত দি। গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসরে কেবল বাঙ্গালা দেশেই ২৫০০ হাজার স্কুল বেড়েছে, কিন্তু তার ১টীও খাঁটি শিল্প শিক্ষার জন্য নয়। সুতরাং এরূপ অবস্থায় যাতে কার্য্যকরী শিক্ষা বাড়ে, তার জন্য গবর্ণমেণ্টের কাছে আমাদের প্রার্থনা জানাতে হবে। কিন্তু শুধু গবর্ণমেণ্টের কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়ালে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেনা। ভারতের শিক্ষিতসম্প্রদায়কে ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, শিক্ষিত সম্প্রদায় অগ্রণী হয়ে—সাধারণের মধ্যে কার্য্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে উপায় নাই। যাতে সাধারণ শিক্ষা ছাড়া কাপড় বুনা, ছুতারের কাজ, সূঁচের কাজ, লোহার কাজ, চামড়ার কাজ, কৃষির কাজ, পশু-পক্ষীপালন, ফলরক্ষা প্রভৃতিরও শিক্ষা হয়, তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই কার্য্যকরী শিক্ষাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। আগে দেশের দারিদ্র্য নিবারণের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে আর কোন কাজই হবে না। ভালরূপ না খেতে পেয়েইত ভারতের লোকের স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপ হ'তে যাচ্ছে। সভ্য গবর্ণমেণ্ট-শাসিত

পৃথিবীর সমুদায় জাতির মধ্যে ভারতের লোকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা গরীব ও অসুস্থ। ভারতে ক্রমাগত বাইশ বৎসরের উপর দারিদ্র্য-জনিত প্লেগ প্রভৃতি মহামারী আড্ডা গেড়ে বসে আছে। দেশের সাধারণ লোকই দেশের মেরুদণ্ড। তাদেয় বাঁচিয়ে রাখবার বন্দোবস্ত আগে না করলে জাতটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ানরা ধ্বংস হয়ে গেছে, নিউজিলণ্ডের মাওরী জাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আগে বাঁচা দরকার। জাতিকে বাঁচিয়ে রাখা মানে নিজে নিজে বেঁচে থাকা। 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ'। জীবন-সংগ্রাম দিন দিন কঠিনতর হয়ে পড়ছে। যাতে বাঁচা যায়, সেই শিক্ষাই আগে প্রয়োজন। কার্য্যকরী শিক্ষাই সেই শিক্ষা।

এই কার্য্যকরী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবন-গঠনের শিক্ষাও নিতান্ত দরকার। এই শিক্ষার অভাবে ভারতীয় জাতিটা দিন দিন 'জাহান্নমে' চলে যাচ্ছে। সমগ্র বিশ্বে সকল জাতির মধ্যে জাতীয়তা-বোধটা পরিপূর্ণ মাত্রায় জেগে উঠেছে, কিন্তু এই বোধটা ভারতে পরিপুষ্ট হতে পারছে না।

জাতীয়তা বা জাতীয় জীবন বলতে এই বুঝায় যে, সমগ্র দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ভাব জেগে উঠা যে,তারা সকলেই একই দেশ-জননীর সন্তান, তাদের সকলেরই স্বার্থ এক। এই একত্ব ভাবটা না জাগলে দেশের কোন কাজই হতে পারে না—হচ্ছেও না। এই যে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় আজ পঁচিশ বৎসরেরও উপর 'দেশ দেশ' বোলে চেঁচামেচি করছেন, ভারতীয় কংগ্রেস যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, কত দলাদলি, বিদ্বেষ ও অপমান সহ্য করছে, কিন্তু দেশের সকল সহানুভূতি লাভ করতে পেরেছেন কই? আজ বাঙ্গালা দেশে নমঃশূদ্র ভ্রাতারা প্রকাশ্য সভা ক'রে কেন প্রতিবাদের তরঙ্গ তুলছেন? মান্দ্রাজের পঞ্চম জাতিরা কেন এই একই ধুয়া ধরেছেন? এসব কথা চিন্তা করবার কথা, ভাববার কথা। ভারতবর্ষের মত বিচিত্র দেশ পৃথিবীতে নাই। এখানে নানা ধর্ম্ম, নানা সম্প্রদায় রয়েছে, এখনকার কোন দেশে শস্য জন্মায়, কোন দেশে খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, কোন দেশ শিল্প-প্রধান, কোন দেশ ভয়ানক গরম, কোন দেশে শীত ঋতুর আধিক্য। এখানকার হিন্দু সমাজে প্রায় ৪০০০ হাজার জাতি বিগুমান এবং শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়। এত ভেদ ও বৈচিত্র্য যেখানে, সেখানে দেশাত্ম-বোধকে জাগরিত করতে হলে এই সব ভেদ ও বৈচিত্র্যকে ভুলে যেতে হবে।

এখানে আমি কেবল হিন্দু সমাজের কথাই বলিব। এই যে হিন্দুসমাজে ৪০০০জাতি আছে, ইহায় মধ্যে কে অনাচরণীয়, কেউবা অস্পৃশ্য। হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ৬জন ব্রাহ্মণ,আর বাকী ৯৪ জন শূদ্র! ৬ জন ব্রাহ্মণের মধ্যে ৩ জন ব্রাহ্মণীও শূদ্র মধ্যে গণ্য, কেননা তাদের দেব-সেবা প্রভৃতিতে অধিকার নাই। কোটী কোটী হিন্দুর মধ্যে জন কয়েক মাত্র ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁরা বিরাট সমাজ-শরীরে গোষ্পদ তুল্য বল্লেও চলে। তাঁরাই কিন্তু বিপুল জনসমুদ্রকে অব্রাহ্মণ করে' রেখেছেন। তাঁরা উচ্চ আর সকলে তাঁদের নীচে। তাঁরা নৈবেদ্যের সন্দেশের মত উপরে বসে আছেন। থাকুন, ভাল কথা। কিন্তু নৈবেদ্যের অস্তিত্ব যতক্ষণ থাকে, ঐ সন্দেশের উচ্চাসনে স্থিতিও যে ততক্ষণই। নৈবেদ্য ভেঙ্গে গেলে সন্দেশকে নীচে মাটীতে এসে গড়াতে হয়। ৭০০ বৎসরে প্রায় ৬ কোটী হিন্দু লোপ পেয়েছে। বিপত্তি

২০ বৎসরে প্রায় ১ কোটী হিন্দু লোপ পেয়েছে, নৈবেদ্য ধসে যাচ্ছে। হিন্দুজাতির সংখ্যা ক্রমে কমে যাচ্ছে। মুসলমান ও খ্রীষ্টানের দল পরিপুষ্ট হচ্ছে। কি ভয়ানক সর্ব্বনাশের কথা! হিন্দুসমাজ ও সমাজপতিগণ একথা একবার চিন্তা ক'রে দেখিবেন কি? জগতে জীবনের ভেরী বেজে উঠেছে। সকল জাতিই জীবনের লক্ষণ দেখাচ্ছে। আর ভারতে বাজছে কালের ভেরী, ধ্বংসের ভেরী। ভারতের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে দেখতে পাচ্ছি? দেখছি ধ্বংস আর লাঞ্ছনা। কানাডায় আর অষ্ট্রেলিয়ায় যাই, অথবা দক্ষিণ আফ্রিকায় যাই, সর্ব্বত্রই ভারতবাসীর জন্য অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা রয়েছে. সেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, কায়স্থ, পৌণ্ড্রক, নমঃশূদ্র, মাহিষ্য, সুবর্ণবণিক, কিছুরই বিচার নাই। সকলকেই গলা ধাক্কা খেতে হয়। যাঁরা দেশের প্রকৃত সুসন্তান, চিন্তাশীল ও মনস্বী, তাঁরা একথা চিন্তা করে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন কচ্ছেন। যাঁরা মহাপ্রাণ, যেমন মহাত্মা গান্ধী, তাঁদের মত লোক এই জাতীয় অপমানের গতিরোধ করবার জন্য নিজেদের পদগৌরব, সম্মান ও স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে অম্লান বদনে দারুণ যন্ত্রণা সহ্য কচ্ছেন। এর অপেক্ষা ক্ষোভের কথা আর কে হতে পারে যে, ভারতবর্ষকে এই সেদিনকার জাপানী জাতি দেশ বলেই গণ্য করতে চায় না। কথাটা খুলে বল্লেই বুঝা যাবে। আমেরিকার সম্মিলিত-রাষ্ট্রে এশিয়ার লোকে যাতে অবাধে যেতে না পারে, তার জন্য সেখানে একটা আইনের খশড়া প্রস্তুত করা হয়। তখন তাতে অন্যান্য নিষিদ্ধ জাতির মধ্যে জাপানীদেরও নাম ছিল। জাপানী-দূত চিন্দা মহাশয় তাতে আপত্তি করেন এবং এই বলে ক্রোধ প্রকাশ করেন যে, "এটা অত্যন্ত অপমানের বিষয় যে. ভারতবর্ষের সঙ্গে জাপানের নাম যোগ করা হয়েছে।" ডাক্তার দাঞ্জো এবিনা নামক একজন জাপানী পাদ্রী "শিঞ্জিন" নামক কাগজে লিখেছিলেন, "To attempt to classify Japan with India is a mistake. for Japan is to be classed only with such countries as Britain, Germany and France; that is, with modern nations." জাপানকে ভারতবর্ষের শ্রেণীতে ফেলা ভুল, "জাপানকে কেবল ব্রিটেন, জার্ম্মেনী এবং ফ্রান্সের মত দেশের অর্থাৎ আধুনিক জাতিদের সঙ্গে এক শ্রেণীতে ফেলা উচিত।" একবার জাপানের একখানা খবরের কাগজে লেখা হয়েছিল যে, পৃথিবীর মধ্যে লোক সংখ্যায় জাপান পঞ্চম স্থানীয় দেশ। প্রথম চীন, দ্বিতীয় রুশিয়া, তৃতীয় আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্র এবং চতুর্থ জার্ম্মেনী। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে চীনের নীচেই লোক সংখ্যায় ভারতবর্ষের স্থান, ভারতবর্ষের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব নাই বলেই জাপানীরা ভারতকে গণনার মধ্যে আনেনি। এইত সভ্যজগতে ভারতের স্থান। ভারতের পূর্ব্ব গৌরব ভারতকে বিশ্বসভায় কিছুমাত্র সাহায্য করতে পার্চ্ছেনা। বাহিরে যার এত লাঞ্ছনা, অসম্মান ও অপমান, তার ভিতরের ভুয়া সম্মানে কি হবে? পৃথিবীর সভ্যসমাজে যার সম্মান নাই, অসভ্য, অশিক্ষিত, অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় ভ্রাতাদের নিকটে সম্মানলাভ করে তার কি হবে? এ সম্মানের মূল্যই বা কতটুকু? পশুর কাঁধে চড়লে রাজা বলে সম্মানিত হয় না, রাজার সম্মান পেতে হলে সিংহাসনে চড়তে হ'ব। হাজার হাজার বছর ধরে যাদের পশুরও অধম করে রাখা

হয়েছে, যাদের বেদপাঠ বন্ধ ক'রে, এমন কি বেদ শুনলেও কাণে গলিত ধাতু ঢালবার ব্যবস্থা দিয়ে মূর্খ ক'রে রাখা হয়েছে, পশুর চাইতেও হীন ক'রে রাখা হয়েছে, তাদের গড় নিয়ে কি হবে? ওদিকে যে গলাধাক্কা! ভেবে দেখতে হবে কোন্‌টা বাঞ্ছনীয়, কোন্‌টা স্পৃহনীয়। বিদেশের পূজা গ্রহণ করতে হবে। বিদেশীর কাছে সম্মান আদায় করতে হবে। যখন বিদেশে যাব, তখন যেন পূজনীয় অতিথি রূপেই গৃহীত হ'তে পারি। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও জাপান প্রভৃতি যেন সসম্ভ্রমে আসন দেয়। রাষ্ট্রীয় অধিকার না লাভ করাত পারলে এই সম্মান ও সম্ভ্রম সভ্যজাতিরা কখনই দেবে না। তাই যাঁরা প্রকৃত শিক্ষিত ও দেশহিতৈষী, তাঁরা রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন। কিন্তু এই অধিকার লাভের পক্ষে মস্ত বাধা রয়েছে, আমাদের ঘরের ভিতরেই। ঘরের ভিতরে অধিকার দিতে না পারলে বাহিরের অধিকার মিলবে না, সমাজের অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় ভাইদের ঠেকিয়ে রাখলে, তাদের সামাজিক অসুবিধা দুরীভূত না কল্লে, বাহির থেকে স্বায়ত্ব-শাসন-লাভের প্রস্তাবটাই নিতান্ত বিসদৃশ দেখায়। সমাজের রক্ষণশীল নেতার দল কুসংস্কারের মায়ায় মিথ্যাকে সত্য বোলে আঁকড়িয়ে ধ'রে ব'সে আছেন, তাঁরা আচারে ব্যবহারে পনর আনা তিন পয়সা সমাজ-বহির্ভূত আচরণ কচ্ছেন, অথচ সংস্কারের প্রভাব এড়াতে পাচ্ছেন না। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র, এই দুটো জাতের কথা লিখে গিয়েছেন, কিন্তু এখন বাঙ্গালায় কজন ব্রাহ্মণ আছেন? মহামহোপাধ্যায় থেকে আরম্ভ ক'রে সকলেই শূদ্রাচারী, শত করা ৮০ জন ব্রাহ্মণ জাত-ব্যবসা ছেড়ে অন্য ব্যবসা করেন। ম্লেচ্ছ-দেশে বাস কল্লে শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কজন কটা প্রায়শ্চিত্ত করছেন? কিন্তু আমরা কাহাকেও প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে বলি না। হিন্দুর এটা দুর্ভাগ্য। এই কথা বলতে চাই যে, শাস্ত্রের সংকীর্ণতার দিক্‌টা পরিহার করে উদারতার দিকটা, বিশালতার দিকটা গ্রহণ করা হউক। দেশাচার, লোকাচার, অত্যাচার, ও অবিচারের দিক্‌টা ভুলে গিয়ে সুবিচারের পথে চলা যাক্। 'পৃথ্বীরাজ' নামক মহাকাব্যের প্রণেতা বলেছেন—"হিন্দুর দুর্গতি মূলে দুর্ম্মতি হিন্দুর।" কথাটা নিতান্তই সত্য। আমাদের দুর্ম্মতি না গেলে দুর্গতি ঘুচবেনা। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'. 'একএব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিত,' 'বিদ্যা বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিণঃ॥' এই সব মহাবাক্য আমরা একেবারে ভুলে গিয়েছি। শুধু ঘৃণা, অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য নিয়ে আছি। আমরা সমাজকে, দেশকে তুলতে পার্চ্ছিনা, খালি দাবিয়ে রাখছি। 'আমরা উচ্চ, ওঁরা নীচ,' আমরা পবিত্র ওঁরা অপবিত্র,' এই মন্ত্র জপ করছি, আর পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছি, এতে কি করে ঐক্য আসবে? গত বৎসর কলিকাতার ব্রিষ্টল হোটেলে মহারাষ্ট্রের লিম্বড়ি রাজ্যের রাজকুমার কয়েকজন বন্ধুকে ভোজ দিবার জন্য হোটেলের ম্যানেজার সাহেবকে স্বতন্ত্র একটা বন্দোবস্ত করতে বলেন। ম্যানেজার সাহেব পাগড়ীপরা লোকদিগকে হোটেলে ভোজ দিবার ও খাবার সুবিধা দিতে অসম্মত হয়েছিল। তবুও আমরা মুখে বলে বেড়াই 'বড় জাতি।' সমস্ত পৃথিবী আমাদিগকে ছোট জাতি বলে অবজ্ঞা কচ্ছে, আর আমরা তবু ভাবছি বড়। কি ভয়ানক আত্মবিস্মৃতি! কি শোচনীয় আত্ম-প্রবঞ্চনা!

বলছিলাম, জাতীয় জীবন-গঠন-শিক্ষার কথা,—জাতীয়তা শিক্ষার কথা। আমাদিগকে জাতীয়তা শিক্ষা কর্ত্তে হবে। জাতীয়তা না শিখলে শীঘ্রই আমাদের অস্তিত্ব লোপ পাবে। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য দেশেও স্পৃশ্য—অস্পৃশ্য, আচরণীয় অনাচরণীয়ের বিচার ছিল। ইহুদীদের দেশে সামারিটানরা অনাচরণীয় বিবেচিত হইত। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাপানের হীনিন্ বা এতা জাতি অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় ছিল, গ্রামের মধ্যে বাস কর্ত্তে পেত না। এই সকল অস্পৃশ্য জাতি স্পৃশ্য ব'লে গণ্য হয়েছে, জাপানের যোদ্ধা জাতি সামুরাইরা তাদের সব অধিকার ছেড়ে দিয়েছে। এই প্রকার সামাজিক নীতির জন্যই জাপানীদের প্রচুর কার্য্যশক্তি বেড়েছে, এবং সেইজন্য দুই পুরুষের মধ্যেই অজ্ঞাত ও অবিখ্যাত অবস্থা হ'তে এরূপ শক্তিশালী ও গণ্য হয়েছে। এই সেদিনকার অর্থাৎ গত ২২ শে ফেব্রুয়ারির একটা কথা বলি। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগীয় মন্ত্রী হচ্ছেন মিষ্টার ফিশার। বিলাতের সমগ্র জন-সাধারণকে ক্রমশঃ এক পর্য্যায়ে তুলিবার কথায় তিনি বলেছেন যে, অভিজাত ও সাধারণের মধ্যে ভেদ তুলে দিতে হবে, অভিজাতকে তার অধিকারে বঞ্চিত করা হবেনা। কিন্তু সর্ব্বসাধারণকে সেই অধিকার দিতে হবে। কি উদার ও মহৎ নীতি! উন্নতির শিখরে থেকেও কত সাবধানতা! সকলকে এক পর্য্যায়ে আনতে চাচ্ছেন। ভারতবর্ষে স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের বিচার খুব প্রবল। ইহা জাতীয় ঐক্য ও শক্তি লাভের পক্ষে প্রধান বাধা। ভারতের ৩১ কোটী লোকের মধ্যে ৫ পাঁচ কোটী লোক অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয়। মহামতি বাল গঙ্গাধর তিলক বোম্বাইয়ের এক সভায় বলেছিলেন যে, "হিন্দুশাস্ত্র অস্পৃশ্যতার সমর্থক নয়। মনুতে অস্পৃশ্যতার যে সকল অনুকূল ব্যবস্থা দেখা যায়, তা' প্রক্ষিপ্ত বোলে মনে করার কারণ আছে।" কথাগুলো নিতান্তই ঠিক। কেবল দেশাচার, লোকাচার, অবিচার ও অত্যাচার, এই ভেদকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

সুতরাং জাতীয়তা শিক্ষা কর্ত্তে হ'লে আমাদিগকে এই ভেদ ভুলে যেতে হবে। ভেদ না ভুলিলে জাতীয় ঐক্য হ'তে পারে না। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ "তাঁর কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" নামক প্রবন্ধে বলেছেন,—"যেখানে দুই পক্ষ লইয়া কারবার, সেখানে দুইপক্ষের শক্তির যোগেই শক্তির উৎকর্ষ, সেখানে দুইপক্ষের দুর্ব্বলতার যোগে চরম দুর্ব্বলতা। অব্রাহ্মণ যখনি যোড়হাতে অধিকার হীনতা মানিয়া লইল, ব্রাহ্মণের অধঃপতনের গর্ত্তটা তখনি গভীর করিয়া খোঁড়া হইল।" তাই বলি যে, ভারতের অধঃপতন বলতে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণের অধঃপতন বুঝায়। এখন এই অধঃপতনের যে গর্ত্তটা ব্রাহ্মণেরা নিজের হাতে খুঁড়েছেন, সেই গর্ত্তটা তাঁদের নিজদিগকেই বুজাতে হবে। অব্রাহ্মণের অধিকার কেড়ে নিয়ে এই অধঃপতন আরম্ভ হয়েছিল, এখন অব্রাহ্মণগণকে অধিকার দিয়ে এই অধঃপতনের গর্ত্তরোধ কর্ত্তে হবে। এ ভিন্ন আর উপায় নাই। এই শিক্ষাও এখন দরকার। এই শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করে আমাদের কবি-বাণীকে সফল কর্ত্তে হবে। কবি গাচ্ছেন,—

"হোক জগতের বৃহৎ ক্ষেত্রে,
　　বাঁচিয়া জন্ম আমা সবার।
"হোক দ্বিজ আজ নিখিল হিন্দু,
　　দাও খুলে দাও সকল দ্বার॥"

"এসেছে সুদিন, উঠ ওরে দীন্ !
তোরে প্রসন্ন আজি বিধাতা'
হের নেশনের প্রসব ব্যথায়
আতুরা বিধুরা ভারতমাতা ॥"

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা বলতে গিয়ে আমি কার্য্যকরী শিক্ষা এবং জাতীয়তা শিক্ষার কথাই বিশেষ ক'রে বল্লুম। এ শিক্ষা দুটী খুব জরুরী, তাই এদের কথা বিশেষ করেই বলেছি। কিন্তু এ গুলি ছাড়া যে আর কোন প্রকার শিক্ষারই আবশ্যক নাই, তা' বলছিনা। উপরের শিক্ষাগুলি বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রাম থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আশু দরকার। এ ব্যতীত সাধারণ শিক্ষা অর্থাৎ স্কুল-কলেজে বর্ত্তমান সময়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা' চলবেই। কারণ, সাধারণ শিক্ষা না হ'লে জ্ঞানের কোন শাখাতেই প্রবেশ কর্ত্তে পারা যায় না। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি হচ্ছে সাধারণ শিক্ষার অন্তর্গত। কিন্তু সাধারণ শিক্ষা এখন যে ভাবে দেওয়া চলছে,তার পরিবর্ত্তন কর্ত্তে হবে। আমাদের দেশে যখন ইংরাজী শিক্ষার প্রথম পত্তন হয়েছিল, তখন তার লক্ষ্য ছিল এই যে, ব্রিটিশ-ভারতের রাজ্য-শাসন ও বাণিজ্য পরিচালনের জন্য ইংরেজি-জানা দেশী কর্ম্মচারী তৈয়ারী করা। অনেক দিন হ'তে সেই গড়নের কাজ চলছে। এখন প্রয়োজন চাইতে আয়োজন খুব বেশী হচ্ছে। ইংরাজী শিক্ষিত ছাত্রদের শুধু চাকুরীতে কুলিয়ে উঠ্ছে না। তা' ছাড়া এ শিক্ষায় ছাত্রদের উদ্ভাবনী শক্তি বাড়ছে না। এ জন্যে শিক্ষা-প্রণালী বদলাতে হবে।

এইহেতু আজকালকার শিক্ষা-বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, ভারতের স্কুল-কলেজে যে প্রণালীতে শিক্ষা চলছে,তাতে তেমন সুফল হচ্ছে না,—শিক্ষা ভাল হচ্ছে না। সে দিন স্যর প্রফুল্লচন্দ্র বালিগঞ্জের "কস্‌বা লাইব্রেরিতে বার্ষিক উৎসব-সভায় বলেছেন যে, আজকালকার অনেক পাশকরা ছাত্র বার্লিন ও কন্‌ষ্টান্টিনোপল প্রভৃতি জায়গা মানচিত্রে দেখাতে পারে না। ভূগোল শিক্ষা কিছুই হচ্ছে না। আবার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বলেছেন যে, ইংরাজী ভাষায় পরীক্ষা দিয়ে কলেজের ছাত্রদের যা' সহজে শেখাতে পারেন নি, বাঙ্গালা ভাষায় তা' বুঝিয়ে দেবার পর তারা তা' বেশ ভাল করে লিখতে পেরেছিল। তিনি বলেন, "বিদেশী ভাষায় শিক্ষা দেবার চাইতে স্বদেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কল্লে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে এবং সহজে ছেলেরা শিখতে পারবে" অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়-প্রমুখ শিক্ষা-সম্পর্কিত বহু লোকেরই এইরূপ অভিমত। শিক্ষার এসকল ত্রুটীর কথা ভাববারও সময় আমাদের এসেছে। সুতরাং সাধারণ শিক্ষার এ সকল দোষ যাতে দূর হয় এবং স্বদেশীয় ভাষাতেই দেওয়া হয়। তারও প্রয়োজন। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই তাদের নিজদের ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হয়। ভারতে তা' হবে না কেন?

সর্ব্বশেষে শিক্ষা সম্বন্ধে আর একটু কথা এখানে বলবো। সেটা হচ্ছে, লোক-শিক্ষার কথা। লোকশিক্ষার নানারকম উপায় আছে, যেমন পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ, কথকতা, যাত্রা, কীর্ত্তন, শিলালিপি প্রভৃতি ছিল। আজকাল সকল সভ্যদেশে লাইব্রেরী স্থাপন করে লোকশিক্ষার খুব প্রচার চলছে। ইংলণ্ড, জর্ম্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের স্থানে-স্থানে লাইব্রেরী আছে।

সেখান থেকে ৵০ কি ।০ আনা পয়সা জমা দিয়ে লোকে বই নিয়ে পড়ে, আর জ্ঞান উপার্জ্জন করে। আমেরিকাতে চলন্ত লাইব্রেরী আছে। সেই সব লাইব্রেরী ঠেলে ঠেলে মাঠের মধ্যে কৃষকদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা মাঠের মধ্যেই বই নিয়ে পড়ে। আমাদের ভারতেও এই রকম সব লাইব্রেরীর প্রয়োজন। লাইব্রেরী থেকে বই, সংবাদপত্র প্রভৃতি নিয়ে সকলে যাতে পোড়ে জ্ঞানলাভ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। বই যতই পড়া যাবে, ততই প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় হবে। বিলাতেব জন্‌সন বলে একজন লোক ছিলেন। তাঁর পিতার বইয়ের দোকান ছিল। তিনি অনবরতই দোকান থেকে বই নিয়ে পড়তেন, এই করে তিনি মহাজ্ঞানী হয়েছিলেন। তাই বলছি যে, লাইব্রেরী করে ভাল ভাল বই আনিয়ে তা'দ্বারা লোক শিক্ষার প্রচার হওয়া দরকার। একখানা সংবাদপত্র পড়লে আমাদের কত বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। পৃথিবীর খবর আমরা আধঘণ্টার মধ্যে আয়ত্ত করে ফেলি। আমাদের দেশে সংবাদপত্র পড়ে খুব কম লোকে। সংবাদপত্র যে কি জিনিষ, তা অনেক লোকেই জানেনা। কিন্তু বিলাত প্রভৃতি সভ্যদেশের লোকের সংবাদপত্রের উপর কি আগ্রহ। আমাদের দেশে লোকের তেমনিতর আগ্রহ বৃদ্ধি করতে হবে। খবরে কাগজ তাদের ধরাতে হবে। খবরের কাগজ দ্বারা লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপনা দ্বারাও লোক শিক্ষার কাজ চালাইতে হবে। আর একটা কথা। শিক্ষাটীকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করাও প্রয়োজন, এই রকম নানা উপায়ে লোক শিক্ষার ব্যবস্থা করাও ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রয়োজন।

উপসংহারে এই কথা বলি যে, ভারতের ন্যায় পরাধীন দেশকে সুসভ্য এবং ন্যায় ও সাম্যের উপাসক শাসনকর্ত্তার অধীনে থেকে, নানা ধর্ম্মাবলম্বী ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিল রেখে, বর্ত্তমান সময়ের ঘোরতর দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশার কবল হ'তে রক্ষা পেতে হ'লে উন্নত প্রণালীর সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত কার্য্যকরী শিক্ষা, লোকশিক্ষা এবং জাতীয় জীবন-গঠনের শিক্ষা আবশ্যক। এইরূপ শিক্ষাই ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রয়োজন।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল।

বিষ্ণুপদ।

গয়াত্রী ঘাটের অল্প দূর দক্ষিণে বিষ্ণুর পদাঙ্কিত হিন্দুর জগৎবিখ্যাত গয়াক্ষেত্র ও মন্দির। ভগবানের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নিত পদচিহ্ন প্রস্তরোপরি খোদিত আছে। তাহার উপর বিখ্যাত প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাই-নির্ম্মিত প্রস্তর-মন্দির বিরাজ করিতেছে। প্রাচীন গয়ার সুন্দর আর্কিওলজিক্যাল রিপোর্ট ১৮৭১-২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তৃতীয়

ভাগে বিশদরূপে বিবৃত আছে। এই মন্দির নির্ম্মাণে ১৬ লক্ষ সিক্কা টাকা ব্যয় হয়; তন্মধ্যে ৯ লক্ষ টাকা ব্রাহ্মণগণকে বিতরিত হয়। মন্দিরের উর্দ্ধের গুম্বজটি প্রায় ৮০ ফিট উচ্চ হইবে, এবং মন্দির-চূড়াটী ১০০ উর্দ্ধ হইবে। তাহা পরে বিবৃত করিব। মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী মণ্ডপ বা নাটমন্দিরটীর সানটী বেশ সুন্দর এবং ৫৮ ফিট চতুষ্কোণ পরিমাণ হইবে। গয়া নগরের মধ্যে ইহা একটী প্রধান দর্শনোপযোগী বস্তু !!! তাহা ছাড়া গয়া নগরের স্থানে স্থানে অনেকগুলি দেখিবার স্থান আছে। "ওলড্‌হ্যাম্ ক্লক টাওয়ার" ভূতপূর্ব্ব গয়ার কালেক্‌টার Mr. C. E. A. D. Oldham সাহেবের প্রতি গয়া নগরবাসীর আন্তরিক ভালবাসার পরিচয় দিতেছে। কাছারির সন্নিকট "গ্রীয়ারসন ওয়েল" এবং ম্যাজিষ্ট্রেট কাছারির দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে একটী প্রাচীন স্তম্ভ ইংরাজ রাজের পূর্ব্বেকালের ইতিহাসের পরিচয় দিতেছে। ন্যাঙ্গা বাবার আশ্রমের পার্শ্বেই ৺কপিলেশ্বর শিবস্থান। তাহার উত্তরে যে সর্ব্বোচ্চ উচ্চ চূড়াযুক্ত পাহাড় দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে কতকগুলি "পঁয়তাল্লিশ" বেদীর অন্তর্গত তীর্থস্থান আছে। এই চূড়ার শীর্ষদেশে একটী তালগাছ বহুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়, এবং তাহারই সন্নিকট ৺গোপাল মিশ্রের মন্দির বহুদুর হইতে আগন্তুক পথিককে তীর্থ স্থানে আহ্বান করিতেছে বলিয়া মনে হয়। "স্বর্ণ দীর্ঘিকা," (বর্ত্তমান দীঘি পুষ্করিণী) "রামসাগর", "বিশালহ্রদ" (বর্ত্তমান বিশারতালাব) প্রভৃতি হিন্দুর প্রাচীন তীর্থ বেদীগুলি এক এক করিয়া গয়ালীদের অনাস্থা, ধর্ম্মহীনতা, কলহপ্রিয়তা, অসাবধানতা প্রভৃতির দোষে হস্তচ্যুত হইয়া গয়া মিউনিসিপালিটীর আয় বৃদ্ধি করিতেছে। কোন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু কি তাহা উদ্ধার করিতে পারেন না? পূর্ব্বকথিত "পঁয়তাল্লিশ বেদী" খাপরাইল গয়া শ্রাদ্ধ বিধির অন্তর্গত স্থানের যে উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে ৪০টীর আরও বৃত্তির অধিকারী গয়ার গয়ালী সম্প্রদায় হইতেছেন; বাকী ৫টী অর্থাৎ ব্রহ্মকুণ্ড, প্রেতশীলা, রামশীলা, রামকুণ্ড এবং কাকবলি, এই পঞ্চতীর্থ বেদীর বৃত্তিভোগী গয়ার "ধামী ব্রাহ্মণগণ হইতেছেন। ইহাদের সংগৃহীত বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে।

মন্দিরাভ্যন্তরস্থ চত্বরটী অষ্টকোণবিশিষ্ট এবং তাহার মধ্যে সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি বর্ত্তমান। এই মণ্ডিরের অভ্যন্তরে বিষ্ণুর পদের উপর মুমুক্ষু পিতৃগণের হিতকল্পে হিন্দুমাত্রই পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। মন্দিরের সমক্ষেই নাটমন্দির এবং তাহার নিম্নেই "ষোল বেদী" পিণ্ডদানের বেদী। তাহার পার্শ্বেই গয়ার প্রাচীন প্রস্তরফলক এবং শিলালিপি বিরাজমান। এই সকলের কথা পরে যথাস্থানে বিবৃত হইবে। বিষ্ণুর মন্দিরের একটু উত্তর দিকে অহল্যাবাইর মন্দির। এই মহীয়সী গুণসম্পন্না ধার্ম্মিকা হিন্দুরমণী মহারাষ্ট্র কুলতিলক পেশোয়াবংশাবতংশ ঐতিহাসিক "রাঘোবার" পত্নী ছিলেন!!! অহল্যাদেবীর মন্দিরের পার্শ্বেই গদাধর এবং তৎপরে ৺গয়েশ্বরী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সকল মন্দির পরিদর্শন করিলে বেশ বুঝা যায় যে, অতি প্রাচীন বৌদ্ধ যুগে এই সকল স্থান এবং প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি সকল বৌদ্ধ দেবদেবী ছিল; কালের কঠোর শাসনে, ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিতাড়িত হইলে এবং শৈব এবং ব্রাহ্মণ্য-জয়-বিঘোষিত হইলে এই সকল দেবালয় স্থান এবং দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি গুলি হিন্দুর দেব দেবীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আর্য্যগণ পরাজিত অনার্য্য-

উত্তরচরিত সমালোচনা।

শ্রীরামচন্দ্রের উত্তর-চরিতই বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া ইহার নাম উত্তররামচরিত। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের মতানুসারে এই নাটকখানি বিপ্রলম্ভ করুণাখ্য আদিরসের অন্তর্গত। বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণতঃ ইহা করুণ-রসাশ্রিত নাটক বলিয়া পরিগণিত। আদিরসের স্থায়িভাব রতি, করুণরসের স্থায়িভাব শোক। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে ট্রাজিডি বা বিয়োগান্ত নাটক প্রণীত হওয়ার রীতি নাই। উত্তররামচরিত নাটক বিয়োগান্ত নহে। মহাকবি ভবভূতি আপনার প্রণীত নাটকখানিতে রাম সীতার মিলন দেখাইয়া অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া গিয়াছেন। শেষ যখন মিলন, তখন শোক ত স্থায়িভাব হইল না, রতিই স্থায়িভাব হইল। অথচ বিপ্রলম্ভ করুণভাব (শোকাত্মক করুণভাব) ফুটানই এই নাটকের প্রধান কার্য্য। কাজেই সাধারণ আদি রস হইতে কতকাংশে ভিন্ন প্রকৃতিক। কারণ বিপ্রলম্ভাখ্য আদি-রসাশ্রিত বলিয়া উত্তররামচরিত অভিহিত-হইয়া থাকে।

ভবভূতির তিনখানি নাটকের মধ্যে উত্তর-চরিতই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। করুণ রসই সহজে শ্রোতার মনে আধিপত্য করে, করুণ-রসাশ্রিত বলিয়া উত্তরচরিত নাটক অভিনয়ে খুব জমিয়া যায়। অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের পরই ইহার স্থান। কিন্তু অভিনয়ে ইহাই ঝটিতি আধিপত্য বিস্তার করে। অভিজ্ঞান শকুন্তল কেবল কোমল ও মধুর, উত্তরচরিত কোমল ও মধুর ত বটেই, উপরন্তু কঠোর। আদি, করুণ, বীর, রৌদ্র ও বীভৎস প্রভৃতি সকল রসগুলিই উত্তরচরিতে স্থান পাইয়াছে বলিয়া ইহা পড়িতে বিশেষত অভিনয় দেখিতে ভাল লাগে। রামচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী চরিত্র লইয়া ভবভূতি প্রথমে আর একখানি নাটক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম মহাবীর-চরিত।

রাবণ বধের পর সীতাসহ অযোধ্যায় প্রত্যাগত রামচন্দ্রের জীবনের ঘটনা উত্তর-চরিতে বিবৃত হইয়াছে। কবি মহাবীর-চরিত প্রণয়নের অনেক দিন পরে উত্তরচরিত নাটক প্রণয়ন করেন। উত্তরচরিতই ভবভূতির সর্ব্বস্ব।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইয়াছে। অযোধ্যার সিংহাসনে তখন তিনি উপবিষ্ট হইয়াছেন। রাক্ষসাধিপতি বিভীষণ, বানররাজ সুগ্রীব প্রভৃতি বন্ধুবর্গ, পুণ্যপাবন ঋষিবৃন্দ, দিগন্ত-বিশ্রুত-কীর্ত্তি রাজর্ষিগণ এবং সমাগত সামন্ত নরপতি সমূহ রাজ্যাভিষেকে উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। যে অযোধ্যা নগরী [illegible] উৎসব কোলাহলে মুখরিত, আমোদ প্রমোদে। আনন্দোচ্ছ্বাসে মোদিত, বীরবৃন্দের অস্ত্র ঝঞ্ঝনায় ঝঙ্কৃত ছিল—আজ তাহা স্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে।

ওদিকে দশরথের ঔরসজাতা লোমপাদের পালিতা কন্যা শান্তার স্বামী ঋষ্যশৃঙ্গ দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী পুরঃসর কৌশল্যাদি রাজ্ঞীগণ সেই নিমন্ত্রণে তথায় উপনীত হইয়াছেন। সীতা বিসর্জ্জন কালে কবি তাঁহাদিগকে অযোধ্যা হইতে সরাইয়া রাখিয়া বেশ সূক্ষ্মবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছেন। যেভাবে কবি রামচন্দ্রের চরিত্র

অঙ্কিত করিয়াছেন—তাহাতে তাঁহার পক্ষে বশিষ্ঠারুন্ধতী কৌশল্যাদির উপস্থিতিতে সীতা বিসর্জ্জন ব্যাপারটি সম্ভবপর হইয়া উঠিত না। হইলেও সেই সেই কোমলপ্রকৃতি ক্রন্দন-পরায়ণ সীতা-বল্লভের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইত না। বাল্মীকির কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ নরপতি রামচন্দ্রে যাহা মানাইয়াছিল, ভবভূতির কোমলমনা স্নেহার্দ্র সীতাপতি রামচন্দ্রে তাহা মানাইত না। বাল্মীকির রামচন্দ্রের কঠোর কর্ত্তব্যের সম্মুখে বশিষ্ঠদেবের উপদেশ, অরুন্ধতীর ভৎর্সনা ও কৌশল্যাদির রোদন কোন ফল উৎপাদন না করিতে পারে, কিন্তু ভবভূতির রামের পক্ষে এই সকল উপেক্ষা করিয়া সীতা নির্ব্বাসনরূপ দুষ্কর কর্ম্ম করা কখনই সম্ভবপর হইত না। এই অভিনব চরিত্রের এই স্থানটী বড়ই সঙ্কটময়। এইস্থলে চরিত্রের রক্ষা নাশের সম্ভাবনা। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে এরূপ দুপ্রবৃত্তি শক্তিসকল উপস্থিত করা অপেক্ষা তাহাদের অন্তরালে রাখাই কবি সমীচীন মনে করিয়াছেন। সীতান মত রামকে এই নূতন অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইলেও তাঁহার এই চরিত্রগত বিশিষ্টতা নষ্ট হইত, রক্ষা পাইত না।

রাজর্ষি জনক আদর্শ সাত্ত্বিক গৃহস্থ। যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-সমন্বয়রূপ সেবক সীরধ্বজ জনক এক্ষণেই নিবৃত্তিধর্ম্মী। "অনুষ্ঠান নিত্যত্ব" হেতু তিনি, কন্যা ও জামাতার নিকটে বিদায় লইয়া নির্জ্জনে প্রস্থান করিয়াছেন। স্নেহার্দ্রহৃদয়া পিতৃবৎসলা সীতা দেবীর চিত্ত তজ্জন্য দুঃখিত। আর সেই কারণে পত্নীবৎসল রামচন্দ্র প্রিয়তমা পত্নীর দুর্ম্মনায়মান চিত্তের সন্তোষ জন্য অন্তঃপুরেই উপবিষ্ট।

রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াও রাজার অন্তরে বিন্দুমাত্র গর্ব্ব স্থান পায় নাই, বিনয়-মাহাত্ম্য পূর্ব্ববৎ সমানই আছে। কঞ্চুকিসহ কথনোপকথনেই ইহা জানিতে পারা গেল। পিতার আমলের পরিজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কঞ্চুকির উপর সম্ভ্রমের ভাবটী বাস্তবিকই সুন্দর। "আর্য্য, ননু রামভদ্র ইত্যেব মাংপ্রতি উপচার শোভতে তাতপরিজনস্য।" আর্য্য, আপনি পিতার আমলের পরিজন, আপনাদের মুখে "রামভদ্র" এই ছেলে বেলাকার ডাকটীই মানায় ভাল। আপনিও তাই ডাকিবেন।

ঋষিগণের গতি সর্ব্বত্রই অবারিত। রাজান্তঃপুরে রামসীতার সম্মুখে অষ্টাবক্রের আগমন হইল। রাজদম্পতী ঋষিগণের সহিত কথা কহিতেন, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিতেন। ঋষ্যশৃঙ্গের সকাশ হইতে অষ্টাবক্র ঋষি আসিয়াছেন শুনিয়া ননদাই ও ননদী সংবাদ জানিবার জন্য সীতার আর ত্বরা সহে না। কি কৌতূহল। "এইখানেই আসুন না"। স্ত্রীচরিত্র সর্ব্বত্রই সমানই। "তাঁরা কি আমাদিগকে মনে করেন?"—এই জিজ্ঞাসায় ননদীর উপর ভালবাসার পরিচয় পাওয়া গেল, আর যজ্ঞে যাইতে না পারায় যে একটু কষ্ট হইয়াছিল, তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া গেল। এ কষ্টে অকিঞ্চিৎ অভিমান মিশ্রিত। স্নেহকোমলা নারীর হৃদয়ে উপযুক্ত কারণ থাকিলেও উপজাত দুঃখ বা অভিমানের সূক্ষ্ম কণিকা লোপ পায় না। অষ্টাবক্র জানাইলেন—"তোমার ননদীর স্বামী ঋষ্যশৃঙ্গ তোমাকে ইহা বলিতে পাঠাইয়াছেন যে, বৎসে, তুমি পূর্ণগর্ভা, এই জন্য তোমাকে আনিতে পারিলাম না। বৎস, রামভদ্রকে তোমারই বিনোদনার্থ রাখিয়া আসিয়াছি। আয়ুষ্মতি, একেবারে তোমাকে পুত্রক্রোড়ে দেখিবার বাসনা করিয়াছি।" লজ্জাশীলা সীতাদেবী গুরুজনকে এ কথার কি

উত্তর দিবেন? রামচন্দ্র এই কথাটীকে ঋষিবরের এই আশীর্ব্বাদটীকে ইষ্টদেবতার নির্ম্মাল্যের মত মাথায় পাতিয়া লইলেন। তিনি জানিতেন, "ঋষীনাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি।" বাল্মীকি রামায়ণে পাঁচ মাস গর্ভাবস্থায় সীতা বিসর্জ্জন হয়। ভবভূতি পূর্ণ দশ মাসেই তাঁর ব্যবস্থা করিলেন। পরিস্ফুট গর্ভিণী অবস্থায় অধিকতর কারুণ্যের উদ্দীপক বলিয়া যে [illegible] পূর্ণ গর্ভাবস্থায় বিসর্জ্জনা [illegible] তাহা নহে ইহার কারণটী পরে [illegible] হইতেছে।

সীতাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে ভবভূতির "আসন্নপ্রসব-বেদনা" সীতা তৎকালে তীব্র শোকদুঃখের সংবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দিল। আত্মহত্যা করিতে যাইতেছি, এ প্রকার জ্ঞানও সে সময় তাহার ছিল না। তীব্রশোক দুঃখসংবেগে জ্ঞানহীনা উন্মত্তা সীতার এই কার্য্যটী অস্বাভাবিক নহে। তৎক্ষণাৎ যমজ পুত্র প্রসূত হইল। [illegible]-দেবতা ভাগীরথী দেবী সেই সন্তানদ্বয়কে রক্ষা করিলেন। স্নেহময়ী জননী ধরিত্রী [illegible] কন্যাকে কোলে করিয়া লইলেন। সীতা মায়ের কাছেই রহিল। স্তন্যত্যাগের পর ভাগীরথী দেবী যমজ পুত্র কুশলবকে বাল্মীকির নিকট শিক্ষার্থ অর্পণ করিলেন। সীতাকে পতিবিরহের সহিত পুত্রবিরহও ভোগ করিতে হইল।

ভবভূতি এই স্থানে বাল্মীকির অনুসৃত পথ ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন। বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণে লক্ষ্মণের প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার পর সীতা কুররীর ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিল, কিন্তু আত্মহত্যার উদ্যম করে নাই। রামের সন্তান নষ্ট করিবার তার অধিকার নাই বলিয়া সে আপনার প্রাণ জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। সেই পাঁচমাস গর্ভাবস্থায় মহর্ষি বাল্মীকি আসিয়া তাহাকে নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন। সেই আশ্রমেই যমজ পুত্র প্রসূত হইল। কুশলব [illegible] থাকিত। সীতা বাল্মীকির আশ্রমেই [illegible] তপস্বিনীর [illegible] প্রত্যক্ষের [illegible] নাই।

[illegible] ভবভূতির [illegible], তদ্রূপ [illegible] ভবভূতির সীতাও [illegible] যৌবনে [illegible]। বাল্মীকির সীতা তেজস্বিতাও [illegible]। ভবভূতির সীতা তেজস্বিতা [illegible] বলিলেই হয়। ভবভূতির সীতা [illegible] ও কোমলপ্রাণা ছিল। [illegible] মনের বল [illegible], সে [illegible] সীতা গভসহিষ্ণুতা [illegible] সীতার বনে বিসর্জ্জনের [illegible] হইয়াছে। আর দুর্ব্বলমতি [illegible] সীতার পক্ষে গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ [illegible] স্বাভাবিক হইয়াছে।

[illegible] মৃগরূপী মারীচ রাক্ষসের [illegible] রামেরই অন্তিমকালীন কাতর [illegible] মনে করিয়া সাহায্যার্থ গমনে [illegible] লক্ষ্মণকে যেরূপ তীব্র কটূক্তি করেন, ক্রোধে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যা হইয়া তেজস্বিনী মুখরা রমণীর মত যেরূপ অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করেন, ভবভূতির সীতা সেরূপ কিছু করিয়াছিল—তাহার নিদর্শন আমরা পাই নাই। আর এই ছাঁচে তাহা একেবারে খাপও খাইত না। মহাবীরচরিতে কিম্বা উত্তরচরিতের চিত্র দর্শনে ঐরূপ মনোভাবের

অস্পষ্ট ছায়াও দেখা যায় নাই। অসহায় অবস্থায় পাইয়া একাকিনী সীতাকে সেই নির্জ্জন অরণ্যে রাবণ যখন প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করে, আপনাকে সুরাসুরবিজয়ী লঙ্কেশ্বর বলিয়া সগর্ব্ব পরিচয় দেয়, তখন বাল্মীকির সীতা সিংহীর মত গর্জ্জিয়া, হংসীর মত গ্রীবা উন্নত করিয়া যেরূপ গর্ব্বিত ও জ্বলন্ত ভাষায় তীব্র ভৎসনা করিয়াছিল, আপনার স্বামীকে স্বর্গের দেবতা, রাবণকে পশুর অধমরূপে দাঁড় করিয়া যেরূপ স্পষ্ট মনের ধারনা ব্যক্ত করিতে পারিয়াছিল—ভবভূতির সীতা সেরূপ করে নাই বা করিতে পারিত না, ভবভূতি যেমন আপনার রামকে প্রাণে কোমল, করুণবিপ্রলম্ভে দুর্ব্বল করিয়া নরপতিরূপে সীতাপতিরূপে দাঁড় করাইয়াছিলেন, তদ্রূপ সীতাকেও তিনি সামান্যরূপা, মুগ্ধা, প্রেম-বিহ্বলা "[illegible]" করিয়া লোকসমাজে ধরিয়াছেন; [illegible] করিয়া [illegible] কাব্যরসের [illegible] রসেরই উপযুক্ত করিয়া গড়িয়াছেন। [illegible]-জনিত অত বড় [illegible] তাহার কোমল প্রকৃতি সীতার ঠিক [illegible] না বলিয়াও কবি তাঁহাকে গঙ্গার গর্ভে ঝাঁপ দেওয়াইলেন, সঙ্গে সঙ্গে নূতন ছাঁচে ঘটনাটিকে ঢালিবার মত অবস্থা গড়িয়া তুলিলেন। দশ মাস গর্ভাবস্থায় বনবাস ব্যবস্থা না করিলে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য ও বর্ত্তমান বিশেষত্বটুকু রক্ষা করা চলিত না।

কবিবর মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে সীতার মুখ দিয়া লক্ষ্মণকে রামায়ণস্বরূপ অশ্রাব্য কটূক্তি করেন নাই বলিয়া সমালোচকের পূজা পাইয়াছেন। এ পূজা ভবভূতিরই প্রাপ্য। প্রথম যিনি এই নূতন পথের যাত্রী, তাঁহাকে এই পূজা না দিয়া বাঙ্গালার কবিকে দেওয়ায় ন্যায়ের সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। ভবভূতির অনুকরণে মধুসূদনের সীতা সবিতা বলিয়া ঐ কটূক্তি তাহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

ঋষি অষ্টাবক্র গর্ভদোহন প্রকাশে কুণ্ঠিতা সীতার কুণ্ঠাভাব নাশ করিয়া প্রজানুরঞ্জনই রাজার প্রধান ধর্ম্ম, ইহা বুঝাইয়া সীতাবিবাসন-রূপ বীজটীর নষ্ট হইবার সম্ভাব্যমান শঙ্কা দূর করিয়া দিলেন। সীতা-বিসর্জ্জন যে রামচন্দ্রের আকস্মিক প্রবল আঘাত জন্য বেদনার ফল নহে, দুর্দ্দমনীয় সাময়িক উত্তেজনার পরিণাম নহে—তাহা অষ্টাবক্রের কথার উত্তরে রামের মুখ দিয়াই শুনিতে পাওয়া গেল।

স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥

স্নেহ দয়া সৌখ্য এমন কি জানকীকে পর্য্যন্ত লোকারাধনার জন্য ত্যাগ করিতে আমার বাধা নাই। রামের এই প্রজানুরঞ্জন প্রকৃতই লোকারাধনা, ব্রত ও তপস্যা বিশেষ। ইহাকে মাত্র প্রজানুরঞ্জনীবৃত্তি বলিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিতে পারি না। এমত সম্পূর্ণ অনুত্তেজিত ও অবিকৃত অবস্থায়, সীতার সম্মুখে এমন সুদৃঢ়ভাবে অম্লানবদনে হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস এমনভাবে যিনি বলিতে পারেন—তাঁহার এই সীতা-বিসর্জ্জন কার্য্যটী সাময়িক বেদনা বা উত্তেজনার ফল হইতেই পারে না। ভবভূতি কোমল রসের পক্ষে পাছে এই ধারণা কাহারও জন্মিয়া যায়—তজ্জন্য কবি অগ্রেই সাবধান হইলেন।

দুর্ব্বলায়মানা জানকীর চিত্তবিনোদনের জন্য লক্ষ্মণ চিত্র দর্শনের প্রস্তাব লইয়া প্রবেশ করিলেন। ইহাই সে সীতার একমাত্র প্রকৃষ্ট বিনোদনোপায়, তাহা রামই বিলক্ষণ অবগত

ছিলেন। যে বনভূমি সীতার এত প্রিয়, যথায় ঋষিপত্নী সখী অনুসূয়া, অভিন্ন-হৃদয় বনদেবী বাসন্তী বিরাজমানা, যেখান-কার তরুলতার সঙ্গে জীবনের সুখদুঃখ গ্রথিত, যে স্থলে কপোত, হরিণ শিশু, ময়ূর-শাবক পুত্রস্নেহে লালিত পালিত—সে স্থলের চিত্র সীতার আনন্দজনক হইবারই কথা। রামের কথা, রামের ভালবাসা, এমন কি, বিরহ জন্য রামের দুঃখও সীতার বড় প্রিয়, বড় মনোজ্ঞ। রাম তাহার সহিত কোন্ স্থানে কিরূপভাবে বিহার করিয়াছিলেন, কি অতুল অপূর্ব্ব আনন্দে তথায় দিনগুলি, রাত্রি গুলি কি রকমে কাটাইয়াছিলেন—সীতা তাহা জানে। আর সেই তাহার বিহনে সেই রামের দিন-গুলি রাত্রিগুলিই বা কিভাবে কাটিয়াছিল, তাহার মত অনুরাগিণীর বিরহ রামকে কি অবস্থায় উপনীত করাইয়াছিল—তাহা জানিতে পতিপ্রাণা সীতার কৌতূহল হইবার কথা। এই মিলনে ও এই বিরহে রামেরই ভালবাসা ঘুরিয়া ফিরিয়া মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিবে। অথচ সঙ্গে সঙ্গে সেই পূর্ব্ব-পরিচিত তরুলতা ও পশু পক্ষী দর্শনও হইবে—ইহাই ত কম লাভ নহে।

ভবভূতি তাঁহার স্বপ্রণীত মহাবীরচরিত নাটকে অনেকস্থলেই বাল্মীকির অনুসৃত পথ ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন পথেই চলিয়া-ছিলেন; আর তজ্জন্য কতকগুলি সাংঘাতিক দোষ ও অসামঞ্জস্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আর কবি চিত্র দর্শন প্রস্তাবে সেই পূর্ব্বকৃত দোষের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া গেলেন। মহাবীরচরিতে কৃত দোষগুলিকে কিভাবে সংশোধন করেন—তাহার দুই চারিটী স্থল আমরা যথাস্থানে দেখাইব।

লবকুশের [illegible] কেন জন্মসিদ্ধ? ভাগীরথীর অনুগ্রহ লাভ কুশলবের অদৃষ্টে ঘটিল কিরূপে? তাহারও কারণটী বুঝা যাইবে।

এই চিত্রদর্শনেই রাম সীতার অলৌকিক প্রণয় বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রণয় কিরূপ ছিল, তাহা না জানিলে সীতা নির্ব্বাসন দুঃখের স্বরূপটী বুঝা যাইবে না, প্রতিকারক্ষম দৈবসম্পন্না পরিচিত সীতা-হরণজ দুঃখ যদি এমন মর্ম্ম-পীড়াদায়ক, তাহা হইলে অপ্রাক্ত-কারা নিরবধি আশাশূন্য স্বকৃত সীতা নির্ব্বাসনজ যন্ত্রণার তুলনা কোথায়? এই সীতা-নির্ব্বাসন-জনিত কারুণ্যের সম্যক্ অনুভব করিতে হইলে প্রথম রাম সীতার মিলন দর্শনও যেমন আবশ্যক, তাহাদের সাময়িক বিরহ দেখানও তদ্রূপ প্রয়োজন। মিলনের পার্শ্বে বিরহ চিত্রিত না হইলে মিলন ও বিরহ, কোনটীই ভাল খোলে না। সুখের পার্শ্বে দুঃখের ছবি, পুণ্যের নিকটে পাপের চিত্র না দেখাইলে সুখের ঠিক উপলব্ধি হয় না, পাপের কুৎসিত মূর্ত্তিও ঠিক চোখে পড়ে না। মিলনের পর বিরহ বড় তীব্র। আলোকের আগমনেই অন্ধকারের রাজত্ব। মিলনের আনন্দের পর বিরহের দুঃখ বড়ই অসহ্য।

আগে সুখ পরে পীড়া,
আগে যশ পরে ব্রীড়া
জীবিতের অসহ্য দহনে (বৃত্রসংহার)

চিত্রদর্শন দ্বারা কবি প্রকারান্তরে রামের বাল্যচরিত সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া পূর্ব্ব ও উত্তর চরিতের মধ্যে একটী সংযোগ-সূত্র বাঁধিয়া দিলেন। চির-পরিচিত প্রীতিবিশ্রম্ভ সাক্ষী বনস্থলীর বর্ণনার দ্বারা কবি অতীতকে বর্ত্তমানের মধ্যে ধরিয়া রাখিলেন, স্মৃতিকে অনুভূতির আকারে দাঁড় করাইলেন। ক্রমশঃ

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

রাণীগাথা

কণ্টকিতা জাহ্নবী রেণা কণ্টকিতা অঙ্গনা।
মন্দ আবেগ পরশে লতিকা প্রকাশে ভাবের ব্যঞ্জনা,
কাশ কুসুম উপারে মুকুতা ফুকারি উঠিছে চন্দমা,
প্রকৃতি আজিকে বন্ধ ভাষায় করিছে কাহার বন্দনা?
কিসলয় হ'তে কান্তি ঝরিছে ধরণীতে ক্ষরে রাগিণী,
প্রাণেপ্রাণে আজ ছুটিছে"ললিত"গাহিয়া কাহারকাহিনী?
পুষ্পে পুষ্পে ছুটে সফরী করিছে পরাণ চঞ্চল,
কাহার বীণার ঝঙ্কারে আঁধা উঠিছে হইয়া উজ্জ্বল?
পিক বধুর কুহরণে আজ, বহে মরন্দের ঝরণা.
কে আমার ওই মন্দহাসিনী মোহন রাতুল চরণা?
পল্লবকুঞ্জ বসিছে মুকুন্দ, সুবাসে পুরিছে বিশ্ব,
নূতন জগতে, প্রাণ মাতোয়ারা কে দেখেছে হেন দৃশ্য?
গোঠে গোঠে কিবা শোণ কুসুম মাধুরী দিতেছে ঢালিয়া,
বকুলের কোলে পুষ্পিত লতা মধুরে উঠিছে হাসিয়া
পুলকে পূর্ণ করিয়া ধরণী ওই বীণাপাণি আসেরে।
সুষমার সনে সুষমার যেন হ'তেছে মধুর মরণ,
আকাশ, কানন, পুষ্প, পবন করিতে অমৃত বর্ষণ;
মধুর অঞ্জনে চোখের দীপ্তি দিব; দৃষ্টি লভিছে,
মানসের মাঝে মানসী মূর্ত্তি ধীরে ধীরে ওই ফুটিছে।
পদ্ম বনেতে পদ্মবাসিনী শোভিছেন বীণাপাণি
সুরভিত ফুলে পূজিছেন ওঁরে দীপ্ত প্রকৃতি রাণী।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

মফঃস্বলস্থ জনৈক ডেপুটির দর্পোক্তি।

১

ঘটিরাম ডেপুটি আমি ভারতের সার,
আমার মতন ভবে কেবা আছে আর?
আমি খুব বড়লোক, জানিস্ তোরা তিনলোক।
আমার মতন অত ক্ষমতা কাহার?

চালিতা বিক্রমকর্ত্রী রমণীর প্রায়,
চড়েছি ডেপুটি-গিরিস্বরূপ দোলায়।
পিতা ছিল কাটিমোল্লা, কাটিতে জীবের গলা,
এ কথাটি ভুলে গেছি পদ-গরিমায়।

৩

পাব্‌লিক সার্ভেণ্ট মোরে বলে সর্ব্বজন,
ইহাতেই রাগে আমি কাঁপি অনুক্ষণ।
যদি অর্থ কর্ত্তে হয়, সার্ভেণ্ট কি গোলাম নয়,
গোলাম কা-দের আমি গোলাম কা-দের?

৪

বদ্‌মাস্ ইত্যাদি যত দুর্বৃত্ত দুর্জ্জনে,
ছেড়ে দিব উপযুক্ত শাসন-বিহনে!
বানর মারিয়া তার, কিচির মিচির সার;
শুধু শাস্তি দিব যত সাধু ভদ্রগণে,
নতু মোরে বাহাদুর কবে কয়জনে?

৫

"মোর কন্‌ভিক্‌সন আর মোর প্রমোশন,"
এই নীতি ধরি আমি করিব শাসন।
অতএব তার ফলে, দলিব নেটিব দলে।
এতে আমি 'নেগেটিভ' ল'ব না কখন।

৬

প্রভু কালেক্‌টর মোর প্রিয়তম স্বামী,
বিভাগীয় অধ্যক্ষের ভ্রাতৃবধূ আমি;
তবে আর এ সংসারে, ডরাইব আমি কারে?
নমস্কার কর মোরে যত রামী বামী।

৭

আতুরে দেবর মোর পোলিস প্রবর,
অমেতেই রাগে সেই কাঁপে থরথর।
ননির পুতুল যেন, উনাইয়া পড়ে তেন,
স্বামীরা করে তবে অতি সমাদর।

৮

স্বামীর নয়নমণি দেবর যখন,
আমিও তাঁহারে ভালবাসি অনুক্ষণ ;
সদা তাঁর আব্দার, হয় মোর রক্ষিবার ;
পতির সন্তোষে মাত্র পত্নীর জীবন।

৯

ডিষ্ট্রিক্ট-শাসন-জজ শ্বশুর আমার,
মোর তিলমাত্র দোষে মহারোষ তাঁর।
কভু তিরস্কার করে, কভু মোর দোষ ধরে,
কিন্তু পতিগুণে আমি পাই তবে পার।

১০

বুড়ো দাদা হাইকোর্ট দূরেতে রহিয়া,
রসিকতা করে মোরে নাতিনী বলিয়া ;
কভু চোক মেজে চায়, দেখে মোর হাসি পায়,
বুড়োর কথায় কোথা টলে কার হিয়া ?

১১

শাশুড়ী ননদী কত পত্রিকার দল,
সতত আমার দোষ ঘোষণে প্রবল ;
জটিলা কুটিলা প্রায়, সদা মোর দোষ চায়,
কিন্তু পতি সদা মোর বিপদ-সম্বল।

১২

যদিও কাহারে আমি ডরিনা কখন ;
তবু একজনে ভয় সমনে যেমন।
শ্বেতপদ-বুটাবৃত, দেখে আমি হই ভীত ;
তার হাত হ'তে মোরে কে করে রক্ষণ ?
স্বামীও যে তার ডরে কাঁপে অনুক্ষণ !

১৩

শ্রীলক্ষ্মণ মজুমদার কহে, বার বার,
পতিপদ [illegible] তুমি শ্রেষ্ঠা সুন্দরী,
তব নাম [illegible] মোরা [illegible] কৈঙ্গণ মঙ্গি।

শ্রীলক্ষ্মণ মজুমদার।

ফাল্গুনে।

হে সখা ! সুহৃদ্বর ! এ মধু ফাল্গুনে,
তোমারি মোহন ছবি জাগে সদা মনে।
প্রকৃতি সুন্দরী আজি খুলেছে দুয়ার !
কত ফুল ফুটে আছে কি সৌন্দর্য্য তার।
আম্র মুকুলের বাসে আনন্দিত বন।
আগুন অশোক বনে—সুন্দর কেমন।
গাছে গাছে সেজে আছে বন-বৈচী ফুল,
নব বধূ হাসি মুখে মনে হয় ভুল।
অসীম সৌন্দর্য্য ধরে বাসন্তী প্রান্তর !
উষার কিরণ জালে শোভে মনোহর !
কৃষক চষিতে ভূমি ঊর্দ্ধে উঠে ধূলি,
রবির কিরণে গড়ে স্বর্ণ রেণুগুলি !
মধুর বিকাল বেলা মলয় বাতাস !
বিলায় আতর-গন্ধ চন্দনের বাস !
গগন তরঙ্গময় পাপিয়ার তানে !
মুহু মুহু "কুহু কুহু" কোকিলের গানে।
সন্ধ্যাবেলা সুধাকর ছড়াইলে হাস,
নন্দনের গন্ধ হয় ধরায় বিকাশ।
তখন—
তোমার নন্দন বন সদা মনে পড়ে,
যে নন্দনে পারিজাত ফোটে থরে থরে !
গন্ধে তার কি আনন্দ ! জানে শুধু প্রাণ,
মলয় উড়ায়ে আনে তোমাদেরি গান !
ছত্রিশ রাগিণী আর ছয় রাগ নিয়া,
সঙ্গীত মোহিত করে আমার এ হিয়া !
অবশেষে তোমারি সে মধু আলিঙ্গনে,
জীবনে "বসন্ত" আনে মধুর ফাল্গুনে !

শ্রীজগদীশচন্দ্র [illegible]।

স্পর্শমণি

পরশে তোমার হে পরশমণি,
[illegible]

পাষাণে কমল ফুটে ওহে নাথ,
শ্মশান সুষমাময়।
সতত বসন্ত তোমার পরশে
বিরাজে ধরণী পরে,
অমৃতের ঢেউ খেলে প্রতি ভূতে
সকলি অমিয় ক্ষরে।
নিবিড় তামসে পরশে তোমার
মোহন কৌমুদী হাসি।
রহে মরুভূমে আনন্দ হিল্লোলে
শীতল সলিল রাশি।
বেলা অবসান রবি ডুবু ডুবু
সায়াহ্নে নদীর তটে—
ভাবনা বিধুর অদূরে যামিনী,
যদি না পরশ ঘটে।
চির শক্তিময় পরশ তোমার
না আছে তাহার ভুল।
পূজিতে তোমায় হৃদয়-পাষাণে
কবে বা ফুটিবে ফুল?
শ্রীরেবতীমোহন কাব্যতীর্থ।

জন্মোৎসব।

(ক)

"তাই তোমার আনন্দ" গানের সুর।

আজ যে আমি এসেছি,
প্রথম—আলো দেখেছি;
আজ যে জীবন অমূল্য ধন
তোমার হাতে পেয়েছি।
আলোর মুকুট পরালে আকাশ,
চামর দুলালে বাতাস;
ধরা দিল যা তার ছিল,
(সব) পেয়ে ধন্য হয়েছি।

পিতার প্রাণে স্নেহ-নীর,
মাতার বুকে দিলে ক্ষীর;
স্নেহের টানে কতই প্রাণে
কতই স্থান পেয়েছি;
আমারি আসার তরে,
সাজালে সব এত করে;
(তাই) প্রাণের ডালি দিতে ঢালি
চরণ-তলে পড়েছি।

(খ)

ঐ সুর—ঐ তাল।

নূতন শোভা দেখব বলে
ডাকলে তুমি "আয়রে ছেলে,"
(তাই) এলাম ছুটে নিতে লুঠে
তোমার গোপন ধন।

তোমার ভাণ্ডার মাঝে
আমার যে অংশ আছে;
কে নিবারে আর আমারে
মিটাতে সাধ এখন।

তোমার মনে কত আছে
জান কেবল তুমি;
ভাঙ্গবে তুমি, গড়বে তুমি,
এইত জানি আমি;
(তবে) আশার বাতি জ্বাল জ্বাল,
ভাসায় ভাসায় আলোয় আলোয়,
(কর) জীবনের লক্ষ্য পূরণ।
শ্রীকালীনাথ ঘোষ।

ব্যর্থ জীবন।

ভক্ত করে ও চরণে প্রাণ সমর্পণ;
কর্ম্মী তব কর্ম্ম মাঝে ঢালিছে জীবন,
তব পতিরূপ হেরি সতী অনিবার
নীরবে সেবিছে নাথ, চরণ তোমার!
বিশ্বাসী তোমারে সদা জানি কৃপাময়
গাইছে নিয়ত তব করুণার জয়!
জ্ঞানী তব জ্ঞানরশ্মি নেহারি নয়নে
করে বিশ্ব উদ্ভাসিত বিস্মিত পরাণে।
জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তিহীনা সন্তান তোমার
আমি, দেব, কি সাধিব বল একবার,
তোমার সন্তান বলি' লভি' পরিচয়,
আমারি জীবন ব্যর্থ হ'বে দয়াময়?
শ্রীহিরণবালা সেনগুপ্তা।

জন্মোৎসব।

(গ)

"তাই তোমার আনন্দ" গানের সুর।

একটি জীবনের ভিতরে
দিয়াছ ব্রহ্মাণ্ড ভ'রে ;
(আমি) কারে এখন করি বরণ ?
কারেই বা পরিহরি ?
দিয়েছ যে দুটি চোখ,
দেখ্‌তে দিলে কোটী লোক ;
দুটি কাণে গানে গানে
কত আর শিহরি ?
শোভাযাত্রা যায় বয়ে ;
পথের দুধার ছেয়ে ;
তীর্থে চলে যাত্রী দলে
আনন্দ গান গেয়ে ;
একলা বসে ঘরের কোণে
কি হবে আর ঢেউ গুণে ?
(আজ) নূতন জীবন করব বরণ
ঐ দলে ঝাঁপিয়ে পড়ি

(ঘ)

বাউলের সুর—আড়খ্যামটা।

ভেসে আসি নাই। (আমি ত)
(আমায়) তোমার যখন প্রয়োজন,
যে যা বলে সহে যাই।
অনন্ত জ্ঞান আগে পাছে,
অনন্ত জ্ঞান মাঝে ;
সৃষ্টি প্রলয় হঠাৎ ত নয় ;
(হেথায়) বৃথায় কিছুই নহে।
কালের ডোরে বাঁধা পড়ে
কোটী জগৎ ঘুরে ;
বিন্দু আমায় ছেড়ে
থাক্‌ ত দেখি তাই।
আমায় নিয়ে তোমার খেলা,
আমার তরে এ মেলা ;
(কতই) গড়ছ শোভা মনোলোভা,
(যাতে) আমি সুখ পাই।
তোমার ইচ্ছা-চক্র মাঝে
এ জীবন-বিন্দু নাচে ;
(এখন) তোমায় সুখী করব ব'লে
তোমারি গান গাই।

শ্রীকালীনাথ ঘোষ।

বীণার তান।

(১) সুখের স্বপন ভেঙ্গে গেছে হায় !
সুখের যামিনী হয়েছে ভোর।
কুয়াশায় দিক ঘেরিয়াছে সব ;
নিরাশায় হৃদি ভেঙ্গেছে মোর॥

(২) যা' ছিল আপন চলে গেছে সব,
নিভে গেছে দীপ দ্বিতীয় যামে।
হৃদয় আঁধার করিয়া আমার ;
ত্রিদিবের ধন ত্রিদিব ধামে॥

(৩) গিয়াছে চলিয়া হৃদি শান্তি আশা,
জনমের মত—সকল সুখ।
হুতাশ আগুনে দহি'ছে অন্তর ;
নয়নের নীরে—ভাসিছে বুক॥

(৪) যে বীণা বাজিত হৃদয়ের তানে,
ছিঁড়ে গেছে তা'র কোমল তার।
বাজে না সে আর পরাণ মাতায়ে ;
ভগ্ন বীণা—শুধু হৃদয় ভার॥

(৫) আশার ছলনে প্রলুব্ধ হইয়ে,
মিছে কেন তবে ঘুরিয়া মরি।
ক্রমে আয়ু ক্ষীণ আঁখি জ্যোতিহীন ;
বিকল হৃদয়—কেমনে ধরি॥

(৬) যে দিকে নয়ন দেখি ফিরাইয়া,
অনিত্য সকলি—আঁধারে ভরা ;—
মানবের মন, মানবের প্রাণ।
প্রহেলিকাময় সংসার, ধরা ॥

(৭) কেহ নহে কা'র সকলি অসার,
ছায়া বাজী যথা, ক্ষণেক তরে।
জলবিম্ব সম যায় মিলাইয়া ;
ভাসিয়া ভাসিয়া সলিল' পরে ॥

(৮) অকূলে কাণ্ডারী তুমি দয়াময়,
নিরাশ হৃদয়ে আশার জ্যোতি।
দাও শান্তি সুখ টুটি মায়া ডোর ;
অনাথ-বান্ধব—দীনের গতি ॥

(৯) তোমার চরণে লইনু শরণ,
দীন হীন বলে করোনা হেলা।
অন্তিম সময়ে হইয়া সদয় ;
দিও হে রাজীব চরণ-ভেলা ॥

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

শিবাজী।

ঐতিহাসিক মহাকাব্য। পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের চরিতলেখক কবিভূষণ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি-এ প্রণীত, মূল্য ২॥০।

মহাকাব্য হিসাবে ইহা যোগীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গ্রন্থ। 'রাজ-উদাসীন' নামক ক্ষুদ্র পদ্য গ্রন্থ যখন আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম, যোগীন্দ্রনাথের অসাধারণ কবিতা-লেখার ক্ষমতা আমরা তখনই উপলব্ধি করিয়াছিলাম। ধূর্জ্জটি নামক ব্যঙ্গ কাব্যে সে ক্ষমতা সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছিল। পৃথ্বীরাজ এবং শিবাজীতে সেই ক্ষমতা চরম স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। রাজ-উদাসীনের মলাটে লিখিত ছিল, "অর্পিব জীবন কিম্বা মিটাব পিপাসা।" এতদিনে, বোধ হয়, গ্রন্থকারের পিপাসা মিটিয়াছে। ১২৮৮ সালে রাজ-উদাসীন প্রকাশিত হয়। রাজ-উদাসীন যে অমিত্রাক্ষরে বিরচিত, সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ শিবাজীতে কত উজ্জ্বল হইয়াছে, ভাবিলে অবাক্ হইয়া যাই। রাজ-উদাসীনের ৩০ পৃষ্ঠায় আছে—

"উঠিছে প্রাসাদ শত ভারতের মাঝে,
সুবর্ণ অক্ষর তার লেখা শিরোদেশে
পবিত্র ব্রহ্মের নাম। দেব মূর্ত্তি যত
ডুবিতেছে ক্রমে, কাল সাগরের জলে।
সমস্ত ভারতবাসী সমস্বরে মিলি
গাইতেছে ব্রহ্মনাম। নর নারী যত
খুলি হৃদয়ের দ্বার, একতান মনে
আরাধিছে পরব্রহ্মে ; প্রতি গৃহে গৃহে
উঠিছে আনন্দ রব, ব্রহ্মনাম সনে।
গায় কুমারীকা, গায় দূর হিমালয়
"জয় ব্রহ্ম জয় ব্রহ্ম জয় ব্রহ্ম" বলি।
"নহে এ স্বপন বৎস" (কহিলা জননী)
সত্যই ভারতবাসী অতল সলিলে,
পাষাণ দেবতা মূর্ত্তি দিবে বিসর্জ্জন।
সত্যই ভারত, বাছা, মহামন্ত্র জ্ঞানে
শুনিবে বচন তোর। হিমাচল শিরে
বিজয় পতাকা শত্রু ব্রহ্মনাম লেখা
উড়িবে ... তোর পুথিবে স্তুতি।

যেই মহাবীজ আজি তোমার অন্তরে
সবে অঙ্কুরিত মাত্র, মহা তরু তায়
জন্মিবে কহিনু কালে ; সেই তরুমূলে
তাপিত ভারতবর্ষ লভিবে আশ্রয়।
নশ্বর জগতে তব এই পুরস্কার।"

আর শিবাজীতে ৩৭ বৎসরের পরে লিখিয়াছেন—

"পাপে ধ্বংস, পুণ্যে স্থিতি, বিধি বিধাতার ;
করে পাপ হিন্দু নাহি পা'বে অব্যাহতি ;
করে পাপ মুসলমান না পা'বে নিস্তার।"
কত উচ্চ, কত মহান, কত সুন্দর, কত সরস।

"শিবাজী" মহাকাব্য যে সময়ে প্রকাশিত হইল, ১৩২৫ সাল, এই সাল বিশেষ স্মরণীয়। মহাত্মা লর্ড সিংহ নানাস্থান হইতে সাদর অভ্যর্থনা পাইয়া (১৩২৬—চৈত্র) কৃতার্থ হইতেছেন, তিনি প্রেস আইনরূপ [illegible] মাতৃবক্ষে বিদ্ধ করিয়াছেন, তাহা দেখিতে কোন্ সহৃদয় মাতৃভক্ত ব্যক্তি তাঁহার প্রতি সদয় দৃষ্টি করিতে পারেন? যে দেশের সাহিত্য নাই, সে দেশের কিছুই নাই ; এ দেশের সাহিত্য গেলে আর থাকিবে কি? সাহিত্যকে নাশ করিয়া তাঁহারা দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। ভারতের শত শত অমূল্য গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, কত প্রেস শ্মশান হইয়া গিয়াছে, কত পত্রিকার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। "শিবাজী" মহাকাব্য এই দুঃসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। "দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন" নামক চণ্ডীচরণের রক্তে লেখা যে পুস্তক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, তাহার শোক ভুলিতে না ভুলিতে, এই রক্তে লেখা সোণার পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। যদি [illegible] এই [illegible] কিন্তু তাহা কি হইবে? দস্যুগণ যে সর্ব্বদাই ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে!!

খেলাফৎ প্রশ্নে আজ হিন্দু-মুসলমান একাত্মক, এই সময়ে এই পুস্তক কি বলিতেছেন, শুনুন।

রামদাস বলিতেছেন—

"দুর্জ্ঞেয় বিচিত্র বিধি, কিন্তু লক্ষ্য তাঁ'র
চরম কল্যাণ। বৎস! দেখ বুঝি' তুমি
অধর্ম্মে, অসদাচারে, জাতি-জাতি-দ্বেষে
মগ্ন হেরি' হিন্দুগণে বিশ্বপতি দেব
পাঠাইলা মুসলমানে ; অভিপ্রায় তাঁর
জ্ঞানে, প্রেমে, ধর্ম্ম তাঁ'রা করিবে প্রচার ;
হ'বে শিষ্য, হ'বে গুরু আদানে, প্রদানে।
শিখিবে মাধুর্য্য, প্রেম, ঔদার্য্য হিন্দুর,
শিখাইবে মানবের ত্রাতা, পাতা যিনি,
প্রচারিলা যাঁ'র কথা পূর্ব্ব-ঋষিগণ
এক অদ্বিতীয় তিনি, অরূপ, অব্যয়।
বুঝাইবে তাঁ'র কাছে চণ্ডালে, ব্রাহ্মণে
নাহি ভেদ, জাতি দর্প ধর্ম্ম বিঘ্নকর।
কিন্তু মোহ বশে ভুলি' কর্ত্তব্য আপন ;
পঞ্চশত বর্ষ তারা বহি' হিন্দুস্থানে
না পড়িল হিন্দুশাস্ত্র, না লভিল জ্ঞান
না পারিল শিখাইতে, না শিখিল নিজে ;
প্রচারিল ধ্বংসে, ভঙ্গে সিদ্ধ হবে কাজ ;
প্রভুত্ব, ঐশ্বর্য্য লভি' মজিল ব্যসনে,
অবজ্ঞায়, অত্যাচারে, পীড়িল হিন্দুরে।
প্রচারিল জাতিভেদ, জেতাজিত [illegible]
শত গুণ মর্ম্মন্তুদ। পূর্ণ পাপভার,
তাই সেই ন্যায়বান বিচারক দেব
প্রেরিলেন তোমা হেথা। তা'র শক্তি লভি'
যুঝি' এই মহাবল আরংজীব সনে
হিন্দুর হিন্দুত্ব ধ্বংসে করি' প্রতিরোধ,
স্থাপিয়াছ রাজ্য তুমি। তোমা বিনা কেহ
এ কার্য্যের উপযুক্ত না ছিল ভারতে।

বসাইতে নিজ পুত্রে সিংহাসন পরে
পাঠাননি ধাতা তোমা। সৃজন তোমার
সঞ্চারিতে নবশক্তি হিন্দুর জীবনে।
থা'ক কিম্বা লুপ্ত হ'ক বংশধর তব
নাহি ক্ষতি, কিন্তু তুমি মহারাষ্ট্র-প্রাণে
করেছ যে বল দান, রাজ্য যবনের
সমূলে বিধ্বস্ত তাহে হইবে নিশ্চিত।
ধ্বংস শেষে নব সৃষ্টি বিধির বিধান,
তোমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়াছ তুমি,
অন্য কেহ না করিত সাধিত তা' কভু ;
সিদ্ধ তব কর্ম্ম নহে নিষ্ফল কদাপি।"
কি উদার মত, কি মহান শিক্ষা।

অন্যত্র ব্রাহ্মণ বলিতেছেন,

"ভূপ ! দস্যুবৃত্তি আমি
শিখাইনি পুত্রে তব। শিখায়েছি তা'রে
কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়-সংযম,
ভোগে অনাসক্তি। আমি শুনায়েছি তা'রে
পুণ্য রামায়ণ-মহাভারতের কথা।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত নিজ সংস্কারে যদ্যপি
এবে সে গন্তব্য পথ করি' লয় স্থির।
দোষ গুণ তা'র ; নহে আমার কদাপি।
অসুরপীড়িত বিশ্ব হেরি' মহা ঋষি
দধীচ অর্পিলা অস্থি ; শুনি' পুত্র তব
যবনপীড়ন হ'তে উদ্ধারিতে দেশ
চাহে যদি প্রাণ দিতে, দোষ কি আমার ?
বনচরে, গুহাচর বানরে, ভল্লুকে
প্রেমমন্ত্রে মুগ্ধ করি' ত্রেতায় শ্রীরাম
উদ্ধারিলা নিজ কার্য্য ; শুনি শিব যদি
অসভ্য মাবলীগণে করে বশীভূত,
সে কি তিরস্কার-পাত্র ? কি যে আমি তারে
শিখায়েছি, সাক্ষী তার রাজমাতা এই।
কহিয়াছি আমি তাঁরে রাখিতে স্মরণে,
নির্ব্বাসিতা কুন্তীদেবী একচক্রা মাঝে,
রক্ষিতে আশ্রয়দাতা নিজ-পরিবারে,
প্রেরিলেন নিজ পুত্রে রাক্ষসের মুখে।
বিজ্ঞ, দূরদর্শী তুমি ; পারিবে বুঝিতে
পিতঃ, দীক্ষা হ'তে মোর কি ফলেছে ফল ;
নহে পুত্র দস্যু তব, মহাপ্রাণ বীর।"

হিন্দু-মুসলমানের একতা স্থায়ী হইলে ভারতের মহা কল্যাণ সাধিত হইবে।

যোগীন্দ্রনাথের দুই খানি মহাকাব্য এবং নবীনচন্দ্রের পলাসীর যুদ্ধ সময়োপযোগী গ্রন্থ—দেশোদ্ধার মহামন্ত্র এই সব গ্রন্থে পরিস্ফুট হইয়াছে। যেমন রাণী ভবানী, তেমনি জিজাবাই—ইঁহারাই ভারতের উদ্ধারের মহাশক্তি।

"কোথা যাও ফিরে চাও, সহস্রকিরণ,
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি,
তুমি অস্তাচলে দেব করিলে গমন,
আসিবে ভারতে ঘোর বিষাদ রজনী।"

এরূপ উক্তি 'শিবাজী'র কোথাও নাই বটে, কিন্তু রামদাস বলিতেছেন—

"ধন্য জন্ম তব,
সাধিয়াছ মহাকার্য্য, দেখায়েছ তুমি
লুপ্তবীর্য্য নহে হিন্দু ; লাঞ্ছনা, পীড়ন,
বহু বর্ষব্যাপী, করে নাই তা'র
শক্তিলোপ, মহারাজ্য স্থাপনে, রক্ষণে।
পালি' হিন্দু, মুসল্মানে বুঝায়েছ তুমি
স্বধর্ম্মানুরাগ নহে পরধর্ম্মদ্বেষ।
ছিলে রাজা কিন্তু দীন, সংসারী সন্ন্যাসী ;
কর্ম্মী কর্ম্মফলত্যাগী। কুলিস-কঠোর ;
কুসুম-কোমল ; যুগ-অবতাররূপী।"

এই শেষ কয়েক পংক্তি সর্ব্বতোভাবে উহার যোগ্য।

মহাপ্রাণতা এই দুই কাব্যে সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছে।

শিবাজীপত্নী সয়ীবাইর উক্তি সকল এই গ্রন্থে যেরূপভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহার

তুলনা মেঘনাদবধের প্রমীলার চিত্রের আভাসে কতক পাওয়া যায়।

"রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী
আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে ?"

ইহার তুলনা দেখ সখীরাই বলিতেছেন—

"কি আর বলিব আমি ? তুলনা প্রাণেশ।
কোটী অনিমেষ আঁখি চাহি' তোমাপানে ;
দেব, দ্বিজ, ধেনু ডাকে পরিত্রাণ তরে ;
তুলনা তা'দেরে তুমি। অচিরে যখন
বন্দী পূজ্য পিতৃদেব, অরিও অমনি
বন্দী মাতৃভূমি তব যবনের করে।'

অন্যত্র—"ধীরে উত্তরিলা আকা,

"সত্য নারী মোরা, কিন্তু জন্ম আমাদের
মহাশক্তি-অংশে ; পারি সঞ্চারিতে বল
প্রেমে, স্নেহে, আশীর্ব্বাদে, আশ্বাস বচনে
পতি, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা আত্মীয়ের মাঝে।
সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে ক্লান্ত তা'রা যবে
পারি লইবারে ভার নিজ শক্তিমত।
ভাগ্যবান সেই নর, পত্নী, মাতা যা'র
সঙ্কটে, দুর্দ্দিনে আসি' পার্শ্বে দাঁড়াইয়া
কহে তারে "ভয় নাই।"

রাণী ভবানীর উক্তি সকল সখীবাইর উক্তিতে সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছে—সখীবাইর উক্তি পড়িতে পড়িতে চক্ষে জলধারা বহে। এরূপ সহৃদয়তা, ধর্ম্মোপদেশ, এরূপ পতিভক্তি এদেশের কোন গ্রন্থে দেখি নাই।

স্বয়রা ও পুতলিকে বলিতেছেন—

"রাজ্যবৃদ্ধি তরে রাজা নহেন ব্যাকুল ;
সন্ন্যাস সঙ্কল্প যাঁর, ভোগত্যাগী যিনি,
কিবা প্রয়োজন তাঁর ঐশ্বর্য্যে, গৌরবে ?
তবে যে শোণিতপাত করেন আপন,
সে কেবল দেশ, ধর্ম্ম রাখিবার তরে।"

* * *

নিদ্রিত ছিল এ জাতি : প্রাণেশ মোদের
নিরখিয়া দেশমায় হইয়া কাতর,
সমপ্রাণগণ সঙ্গী, সহচর লয়ে
করেছেন যুদ্ধারম্ভ "

* * *

"কি বলিব ? জন্ম যাঁর বিপন্ন-উদ্ধারে
সঙ্কটে, বিপদে যদি ভীত হন তিনি,
কেমনে উদ্দেশ্য তাঁর হইবে সাধিত ?
না ডুবিলে সিন্ধুজলে উঠে কি মুকুতা ?"

বিভাগনীতির দলের লোকেরা বঙ্গদেশে মগ ও বর্গীর নামে অনেক কুৎসা প্রচার করিয়াছিল। এই গ্রন্থে বর্গীর দোষ-স্খালনের বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। শিবাজীর প্রাণটা কত উদার ছিল, এই এক কথায় তাহার উত্তর পাওয়া যায়।

"আবাজী সমরজয়ী, লভি' অনুমতি,
হয়ে অগ্রসর, করি আশীষ-বন্দনা
কহিলা বিনয়ে :—

"অবধান, যুবরাজ !
কল্যাণপ্রদেশ আজ পদানত তব।
শৃঙ্খলিত বন্দী এই মৌলানা আহম্মদ,
পরাজিত, হতবল বিজাপুর-সেনা।
হস্তী, অশ্ব, মণি, মুক্তা, রজত, কাঞ্চন
লভিয়াছি অগণিত। কিন্তু সব হ'তে
শ্রেষ্ঠ এই নারীরত্ন লভিয়াছি, প্রভো !
সর্ব্বরত্নাধিপ রাজা, উপহার তরে
আনিয়াছি তাই তা'রে করুন গ্রহণ।
বন্দিনী জেতার ভোগ্যা, রীতি যবনের
সুবিদিত, বীরবর। সেবি' রাজপদে
সার্থক জনম নিজ করুন যবনী॥"
সুতীব্র কটাক্ষে বীর আবাজীর পানে
দেখিলা চাহিয়া। হেরি' আবাজী দুরিত

আদেশিলা বন্দিনীরে হইতে বাহির
খুলিয়া শিবিকাদ্বার। কম্পান্বিতা ভয়ে
দাঁড়াইলা সভাতলে নম্রমুখী বালা,
কৌষেয় বসনাবৃতা। কি মূর্ত্তি সুঠাম!
অঙ্গের বরণ জিনে গোলাপের আভা,
কোকনদ পদযুগ; বাহু, বক্ষ, উরু
কিবা সুগঠিত; ঝরে প্রতি অঙ্গ হ'তে
লাবণ্য, আলোক যথা ঝরে উষাদেহে।
কিঙ্করী, ইঙ্গিত লভি', বদন হইতে
খুলিল অবগুণ্ঠন। সভাজন যত
ভাবিল কি স্বর্ণপ্রভা উঠিল চমকি';
বিরাজে কি হেন রূপ মানবীর দেহে?
কি ললাট, কি নাসিকা, কিবা ওষ্ঠাধর।
গ্রীবা, কপোল, কিবা চারু কেশদাম।
কি করুণ স্নিগ্ধদৃষ্টি সজল নয়নে।
অসম্ভব এ লালিত্য অস্থিমাংস মাঝে।
সুনিপুণ শিল্পী কেহ নবনীত দিয়া
গঠি' মূর্ত্তি প্রাণদান করিল কি তায়?
নির্নিমেষ পৌরজন রহিল চাহিয়া।
শিবাজী বিস্মিত, স্তব্ধ; অরিলা অন্তরে
মাতা জিজাবারে; চাহি' বন্দিনীর পানে
কহিলা, স্নেহার্দ্র, মৃদু মধুর বচনে :—
"নাহি চিন্তা মাত্র তব। নিজ জন সনে
যাও মা! আনন্দে তুমি যথা ইচ্ছা এবে।"
করিলাম মুক্তি দান শ্বশুরে তোমার;
জননীর দেহে যোগ্য এ সুন্দর রূপ
রহিত যদ্যপি, জুড়ি' জন্মি' গর্ভে তাঁর
আমারো এমন সুন্দর রূপ হইত, অম্বিকে।
লহ এই বস্ত্র, লহ এই অলঙ্কার,
সন্তানের দত্ত; নাহি সঙ্কোচ গ্রহণে।"
অন্যত্র—

কহিলেন সাজাহান;—
"জানি তাঁরে আমি,
সাজী ভোঁসলার পুত্র, সে ত দস্যু নয়,
তেজস্বী কৌশলী বীর, দীনতা স্বীকার
না করিবে কখন(ও) সে।"

অন্যত্র—

"অরাতি-শিবির
হস্তী, অশ্ব, অস্ত্র কোষ লভিলা শিবাজী।
হেন পরাজয় কভু মারাঠার করে
ঘটে নাই মোগলের। কাব্যে, ইতিহাসে
সালেরের সমর রবে চিরস্মরণীয়।"
সন্তুষ্ট শিবাজী; করি আলিঙ্গন দান
তুষিলা প্রতাপে, মোরোপন্তে প্রণমিলা।
আহত সৈনিকগণে আদেশিলা বীর,
শত্রু মিত্র অবিচ্ছেদে, অতি সাবধানে
লইবারে রায়গড়ে। আপনি তথায়
করিলা ব্যবস্থা পথ্য, চিকিৎসার তরে।
মহারাষ্ট্র, গৃহগামী মোগল সৈনিকে
আলিঙ্গন-দানে পরে করিলা বিদায়;
আশীর্ব্বাদ করি' তা'রা গেল গৃহে চলি'।
বুঝিল মোগল সৈন্য আপাত-কঠোর
পাষাণের মাঝে বহে কি স্নিগ্ধ ধারা
বুঝিল বিজিত হিন্দু লুপ্তবীর্য্য নয়।"

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এ সব কবির উক্তি, প্রামাণ্য নহে। তাহা নয়, যোগীন্দ্রনাথ পারসীকাদি প্রভৃতি কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

আমরা পাদটীকা বহুল এরূপ বাঙ্গালা কাব্য আর দেখি নাই। সেজন্য অনেক সময়ে কবিদের কীর্ত্তিতে বিরক্ত হইয়াছি; কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই ভাবিয়াছি, এরূপ না করিলে শিবাজীর মাহাত্ম্য সম্যক পরিস্ফুট হইত কিনা, সন্দেহ, অনেকে কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। ঐতিহাসিকতা বজায় রাখিয়া এরূপ কাব্য লেখা যে কত কষ্টকর, তাহা কৃতী লেখকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা কল্পনার রাজ্যে পরিভ্রমণ করেন, তাঁহারা